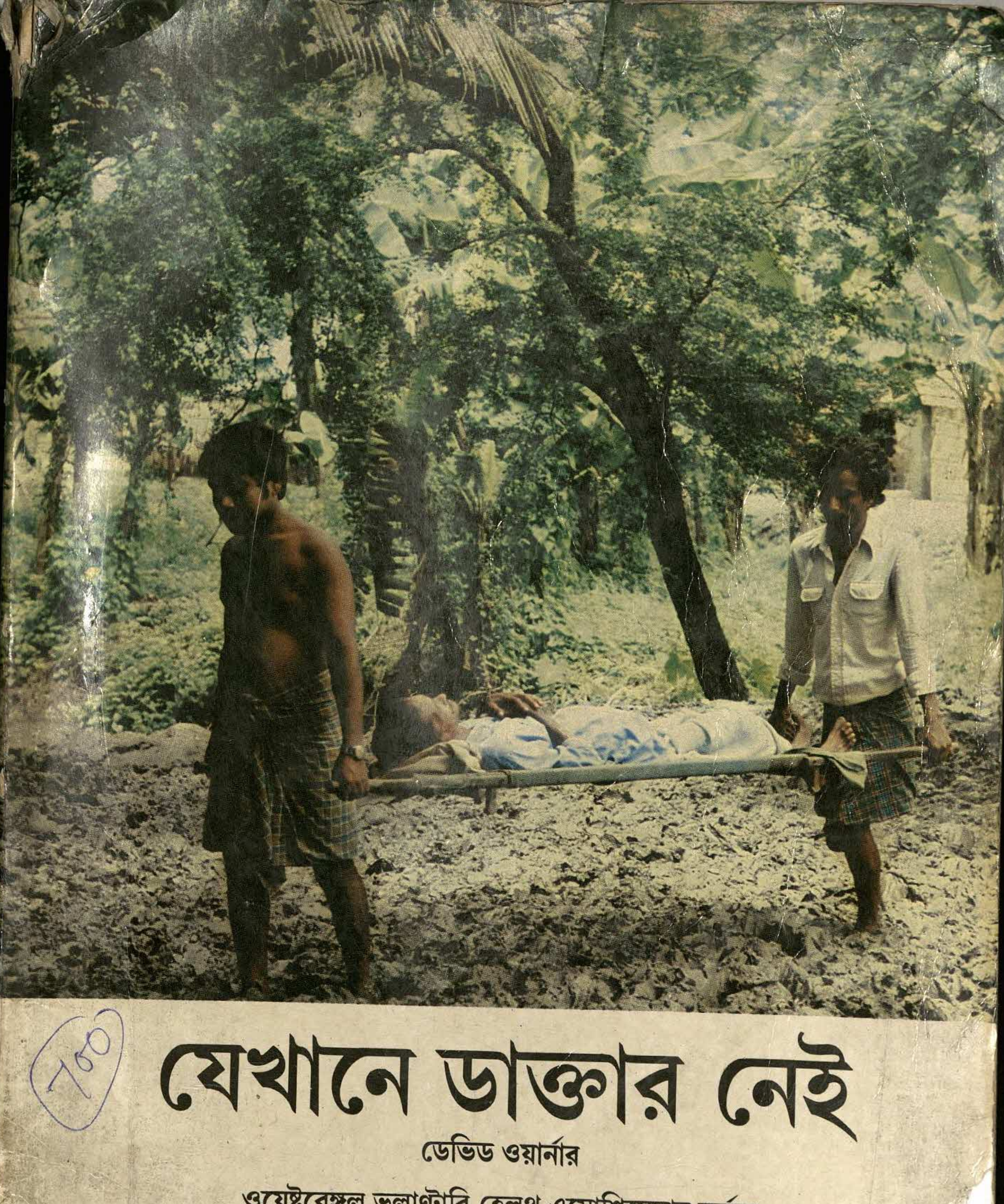


যেখানে ডাক্তার নেই

ডেভিড ওয়ার্নার

ওয়েষ্টবেঙ্গল ভলাণ্টারি হেলথ এসোশিয়েসান কর্ত্তৃক
সংশোধিত বাংলা অনুবাদ

এই বইটি কিভাবে কাজে লাগাবেন

এই বইটি হাতে পেলে:

শুরুতে যে **সূচীপত্র** দেয়া আছে সেটি পড়ুন। ওতে প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের বিষয় আর আলোচনার বিষয়গুলির পৃষ্ঠার নম্বর দেয়া আছে।

কোনো রোগ বা স্বাস্থ্যের অন্য কোনো বিষয় দেখে নিতে হলে:

১· বইয়ের শেষে **হলদে পৃষ্ঠাগুলিতে** দেখুন। ওটি একটি **অনুক্রমণী** । ওতে বর্ণমালা অনুসারে এই বইয়ের সব বিষয়ের তালিকা দেয়া আছে। যা চাইছেন তা খুঁজে না পেলে সেটা অন্য নামে দেয়া আছে কি না দেখুন। অথবা...

২· **সূচীপত্র** দেখে নিন। যা চাইছেন সেটা পেলে পরে, নম্বর দেয়া পৃষ্ঠা বার করুন।

এই বইয়ে দেয়া শব্দগুলির মধ্যে কোনোটির **মানে না বুঝতে পারলে:**

বইয়ের পেছনে—সবুজ পৃষ্ঠাগুলির ঠিক পরে—যে, **শব্দতালিকা** দেয়া আছে, সেখানে দেখুন। শব্দতালিকার শব্দগুলি কোনো পরিচ্ছেদে প্রথম বার ব্যবহার করার সময় *বেঁকা* হরফে ছাপা হয়েছে।

কোনো ওষুধ ব্যবহার করার আগে সর্বদা:

সেটির ব্যবহার, মাত্রা, ঝুঁকি আর সাবধানতার বিষয়ে তথ্যের জন্যে **সবুজ পৃষ্ঠাগুলি** দেখে নেবেন। সবুজ পৃষ্ঠাগুলির গোড়ায় ওষুধের একটি **তালিকা** ও একটি **অনুক্রমণী** দেয়া আছে।

জরুরি অবস্থার জন্যে তৈরি থাকতে:

১· পরিচ্ছেদ ২৩-এ যেমন বলা আছে সেই ধরনের একটি ওষুধের বাকস বাড়িতে বা গ্রামে হাতের কাছে রাখবেন।

২· দরকার হবার **আগেই** এই বইটি ভালো করে পড়ে রাখবেন, বিশেষ করে **পরিচ্ছেদ ১০—প্রাথমিক প্রতিবিধান**, আর **পরিচ্ছেদ ৪—রোগীর দেখাশোনা কিভাবে করতে হয়।**

আপনার বাড়ির লোকদের সুস্থ রাখতে:

পুষ্টির ব্যাপারে পরিচ্ছেদ ১১ আর রোগ **এড়ানোর** ব্যাপারে পরিচ্ছেদ ১২ মন দিয়ে পড়ুন; আর নির্দেশ আর সাবধানতাগুলির দিকে নজর রাখুন।

আপনার পাড়ার লোকদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে:

পাড়ার সকলকে নিয়ে একটা মীটিং ডেকে এই বইটা পড়ুন আর স্থানীয় স্বাস্থ্যের সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করুন। অথবা কোনো শিক্ষককে বলুন এই বইটির সাহায্যে ছেলেপিলে আর বড়দের পাঠ দিতে। বইয়ের গোড়ার দিকে **'গ্রামস্বাস্থ্যকর্মীর জন্যে কয়েকটি কথায়'** অনেক দরকারি পরামর্শ পাবেন।

যেখানে ডাক্তার নেই

গ্রামবাসীদের জন্য স্বাস্থ্য সহায়িকা

"ওয়েষ্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেল্‌থ এসোশিয়েসন্"
কি এবং কেন

ওয়েষ্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেল্‌থ এসোশিয়েসন (সংক্ষেপে WBVHA) একটি মুনাফা বিহীন জাতিধর্ম্মনিরপেক্ষ নিবন্ধভুক্ত সমিতি।এর জন্মকাল ১৯৭৪ সাল। যে কোনরকম স্বাস্থ্যসংক্রান্ত কাজে লিপ্ত প্রতিষ্ঠানই WBVHA এর সভ্যশ্রেণীভুক্ত হতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গবাসীদের সুস্বাস্থ্যকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে এবং তাঁদের স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যসংস্থাগুলির মারফৎ সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য ,WBVHA নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যেসব প্রতিষ্ঠান WBVHA এর সভ্যশ্রেণীভুক্ত, তাদের স্বাস্থ্য ও উন্নয়নমূলক কর্ম্মসূচীকে বিশেষ পরামর্শদান থেকে শুরু করে নানা ভাবে সাহায্য করে চলেছে এই সমিতি। স্বাস্থ্যসম্বন্ধে যথাযথ খবরাখবর, স্বাস্থ্যকর্ম্মী ও স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের প্রশিক্ষন, স্বাস্থ্য বিষয়ে লিপ্ত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ও সহযোগিতা,স্বেচ্ছাসেবীসংস্থাগুলিকে যথাযোগ্য পরামর্শ দান ইত্যাদিও এই সমিতির অন্যতম কর্ম্মসূচী।

এছাড়া WBVHA এর পাব্লিকেশন ইউনিট বা পুস্তক প্রকাশন বিভাগ থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে একটি দ্বিমাসিক পত্রিকা "নিউজলেটার", স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যসমস্যা ও তার প্রতিকার বিষয়ে আর একটি দ্বিমাসিক পত্রিকা "বিদ্যালয় স্বাস্থ্যদর্পণ"। সময় সময় আরও অনেক পুস্তিকা প্রকাশ করেছে WBVHA যেমন : "ওষুধের কবলে ভারতবাসী", ঔষধ সমস্যা ও জাতীয় ঔষধ নীতি, স্বাস্থ্য, বিকাশ এবং রাজনীতি", "জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি" "পঞ্চাশটি-সার্ব্বজনীন স্বাস্থ্য বার্ত্তা" ইত্যাদি।

WBVHA স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যসংস্থাগুলিকে "কমুনিটি ডেভেলপমেন্ট মেডিসিনাল ইউনিট " বা সংক্ষেপে CDMU নামে একটি প্রতিষ্ঠান মারফৎ স্বল্পদামে ভাল ওষুধ সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে।

সামাজিক স্তরেও কাজ সুরু করেছে WBVHA। তার লক্ষ্য হচ্ছে সুস্থ, সবল, স্বনির্ভর সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ব্যক্তি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হোক—এটাই WBVHAর লক্ষ্য ও কাম্য।

জনসাধারণের সহযোগীতায় কাজ করছে WBVHA এবং জোর দিচ্ছে অল্প খরচে প্রাথমিক স্বাস্থ্য তত্ত্বাবধানের উপর-যাতে করে ২০০০ সালের মধ্যে সবাই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়।

যেখানে ডাক্তার নেই

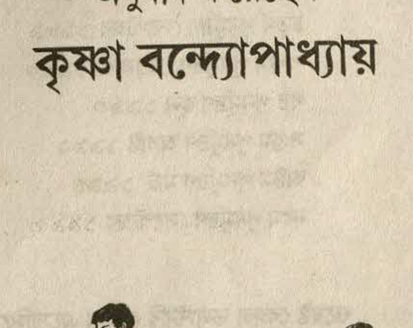
গ্রামবাসীদের জন্যে স্বাস্থ্য সহায়িকা

লেখক

ডেভিড ওয়ার্নার

পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী করে বাংলায় অনুবাদ করেছেন

কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়



অলংকরণ

লেখক, জি জাকারিয়া, পদম খান্না, আমিনুল আহসান এবং বিশ্বনাথ বসু

যেখানে ডাক্তার নেই
লেখক : ডেভিড ওয়ার্নার

হেসপেরিয়ান ফাউন্ডেশন
পোস্ট বক্স নং ১৬৯২
পালো এলটো, ক্যালিফোর্নিয়া ৯৪৩০২
আমেরিকা
কর্তৃক

প্রথম ইংরাজি সংস্করণ ১৯৭৭
দ্বিতীয় সংশোধিত সংস্করণ ১৯৭৮
তৃতীয় সংশোধিত সংস্করণ ১৯৭৮

প্রথম বাংলা সংস্করণ জুলাই ১৯৮৬
দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারী ১৯৮৭
তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮
চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯
পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ ফেব্রুয়ারী ১৯৯০
ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ জুন ১৯৯০
সপ্তম পুনর্মুদ্রণ আগষ্ট ১৯৯২
অষ্টম পুনর্মুদ্রণ মার্চ ১৯৯৪
নবম পুনর্মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫

ওয়েষ্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ এসোসিয়েশন
১৯এ, ডাঃ সুন্দরীমোহন এভিনিউ,
কলিকাতা-৭০০ ০১৪.

প্রচ্ছদ দীপক মণ্ডল
ফটোটাইপ সেটিং বর্তমান কলিকাতা-১৪

মুদ্রণে রিক্তা প্রিন্টার, কলিকাতা-৪

মূল্য ঃ একশ টাকা মাত্র

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক,
ভারত সরকারের
ঘোষিত নীতি :
‘২০০০ সালে সকলের জন্যে স্বাস্থ্য’
রূপায়িত করার কাজে যাঁরা ব্রতী
তাঁদের উদ্দেশ্যে এই বইটি
উৎসর্গ করা হল

সম্পাদকমণ্ডলী

প্রধান সম্পাদকদ্বয় :

ভাষা উপদেষ্টা :

শ্রীমতী কল্যাণী কার্লেকার
প্রেসিডেন্ট, ক্যালকাটা সোশ্যাল প্রোজেক্ট

স্বাস্থ্য উপদেষ্টা :

ডাঃ লাবণ্য কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
প্রাক্তন অধ্যক্ষ, নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল কলেজ

অন্যান্য :

ডাঃ সমীর নারায়ণ চৌধুরী
ডাইরেক্টর, চাইল্ড ইন নীড ইনস্টিটিউট

ডাঃ শান্তনু ভট্টাচার্য
ডাইরেক্টর, বেঙ্গল রুরাল ওয়েলফেয়ার সারভিস

ডাঃ এন বি মহান্তি
জয়েন্ট ডাইরেক্টর অব হেলথ সারভিসেস, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রী হরিশ জৈন
প্রোগ্রাম অফিসার, ইউনিসেফ

শ্রীমতী ইন্দ্রাণী রায়চৌধুরী
ফিল্ড অফিসার, অক্সফ্যাম (ইণ্ডিয়া) ট্রাস্ট

শ্রীমতী কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়
সেক্রেটারী, ক্যালকাটা সোশ্যাল প্রোজেক্ট

শ্রী ডি পি পোদ্দার
একজিকিউটিভ সেক্রেটারী
ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ এসোসিয়েশন

শ্রী নারায়ণ চৌধুরী, জয়েন্ট ডাইরেক্টর অব হেলথ সারভিসেস (মাস মিডিয়া)
ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ এণ্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার গভঃ অব ওয়েস্ট বেঙ্গল

এই বইটির প্রকাশে ডাঃ লাবণ্য কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর সাহায্য এবং সহযোগিতার কথা আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

সূচীপত্র

প্রত্যেক পরিচ্ছেদে যা যা আলোচনা করা হয়েছে সেগুলির তালিকা

পরিচ্ছেদ ১০

প্রাথমিক প্রতিবিধান ৮৭

পরিচ্ছেদ ১১

পুষ্টি : সুস্থ থাকতে হলে কি কি খেতে হয় ১২৫

পরিচ্ছেদ ১২

রোগ প্রতিরোধ : অনেক রোগ কিভাবে এড়ানো যায় ১৫৫

পরিচ্ছেদ ১৩

কয়েকটি খুব সাধারণ রোগ ১৮১

পরিচ্ছেদ ১৪

পরিচ্ছেদ ১৫

পরিচ্ছেদ ১৬

পরিচ্ছেদ ২০

পরিচ্ছেদ ২১

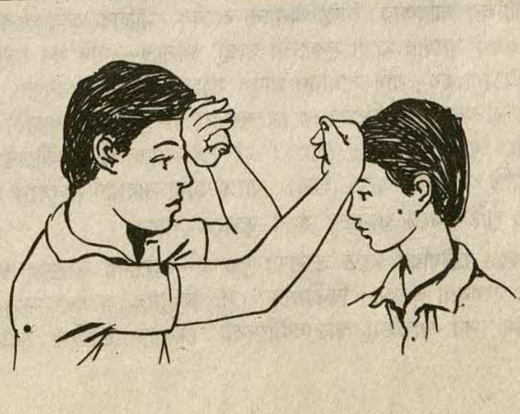
পরিচ্ছেদ ২২

পরিচ্ছেদ ২৩

ওষুধ সম্বন্ধে সতর্কতা :

সবুজ পৃষ্ঠাগুলিতে যে সব ওষুধের নাম, মাত্রা, ব্যবহার সাবধানতা এবং ঝুঁকির কথা বলা হয়েছে সেগুলির সম্বন্ধে যতটা সম্ভব আধুনিক তথ্য দেয়া হয়েছে। কিন্তু, প্রতিদিনই বিভিন্ন ওষুধ সম্বন্ধে নানা নতুন তথ্য বার হচ্ছে এবং প্রকাশিত হচ্ছে ; কোনো কোনো ওষুধ ক্ষতিকর কোনোটা বা বিশেষ ক্ষেত্রে উপকারী বলে প্রমাণিত হচ্ছে। কাজেই স্বাস্থ্যকর্মীদের উচিত—নিয়মিত এই সব তথ্য সংগ্রহ করা। **ওয়েষ্ট বেঙ্গল ভলাণ্টারি হেলথ এসোসিয়েশন** থেকে এ বিষয়ে সাহায্য পাওয়া যাবে।

এই বইয়ে, **স্বাস্থ্যকর্মী** বলতে ডাক্তার, নার্স, বিশেষ ট্রেনিং পাওয়া কর্মী থেকে শুরু করে গ্রামের সাধারণ মানুষকেও বোঝানো হয়েছে। বিভিন্ন সমস্যার জন্যে যে সব চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, সেগুলি স্বাস্থ্যকর্মীরা নিজ নিজ ট্রেনিং, অভিজ্ঞতা এবং ক্ষমতা অনুসারে ব্যবহার করবেন।



বাংলা সংস্করণের মুখবন্ধ

ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ এসোসিয়েশন পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটিস এক্ট, ১৯৬১, অনুসারে একটি রেজিস্টার্ড জনহিতকর সংস্থা। দরিদ্র মানুষের জন্যে কম খরচে উপযুক্ত স্বাস্থ্য প্রকল্প গড়ে তোলাই এই সংস্থার উদ্দেশ্য। আমাদের লক্ষ্য—সুস্থ সমাজ। ২০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সকলের স্বাস্থ্য—সারা বিশ্বের এই দাবিতে আমরাও যোগ দিয়েছি। আমাদের প্রধান ভাবনা—মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যচেতনা জাগিয়ে তাদের সুস্বাস্থ্য গড়ে তোলা ও বজায় রাখা। এই কারণে, যে সব স্বাস্থ্যকর্মী সাধারণ মানুষকে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যপ্রকল্পের কাজ শেখাবে, তাদের আমরা নিয়মিত ট্রেনিং দিয়ে থাকি। এছাড়া স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বহু বই, পুস্তিকা, পোষ্টার ইত্যাদি আমরা প্রকাশ করি এবং নানা আলোচনাচক্রের আয়োজন করি।

ভারতের সংবিধানে সাম্য, স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার ও ব্যক্তি-মর্যাদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এতে দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও অস্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে জনসাধারণের পুষ্টি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে শ্রমজীবী মানুষ বিশেষতঃ শিশুরা স্বাস্থ্যরক্ষা ও বিকাশের সবরকম সুযোগ সুবিধা পায়। উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও দেশের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক চিত্রটি ভয়ানক উদ্বেগজনক। জনসংখ্যার দ্রুতবৃদ্ধি মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মানের অবনতি ঘটাচ্ছে। নারী ও শিশুমৃত্যুর হার এখনো শোচনীয়ভাবে বেশি; দেশের মোট মৃত্যুসংখ্যার তিনভাগের একভাগ হলো ৫ বছর বা তার কমবয়সী শিশু; এক হাজার শিশু জন্মালে তার মধ্যে ১২৯ জন একবছর বয়েসের আগেই মারা যায়। মানুষের উপযুক্ত পুষ্টিসাধনের চেষ্টার কোনো ফল এখনো পাওয়া যায়নি এবং অপুষ্টির পরিমাণ ভয়াবহই থেকে গেছে। সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ নির্মূল করা তো দূরের কথা, দমন করাও সম্ভব হয়নি। অন্ধত্ব, কুষ্ঠ ও যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাব আগের মতই বিস্তৃত। গ্রামবাসীদের মধ্যে শতকরা ৩১ জন বিশুদ্ধ পানীয় জল পান এবং প্রতি হাজারে ৫ জনের পায়খানা ব্যবস্থা আছে। দেশে ব্যাধি ও মৃত্যুর আধিক্যের অন্যতম প্রধান কারণগুলি হলো—পেটের রোগ বিশেষতঃ শিশুদের, অন্যান্য নিবারণযোগ্য ও সংক্রামক রোগ, বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, দূষিত পরিবেশ, দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা। যদি সাধারণ মানুষ তার স্বাস্থ্যের জন্য কি কি দরকার এবং কোন্‌টা আগে দরকার সেটা নিজেই স্থির করে বিভিন্ন স্বাস্থ্যপ্রকল্পে সক্রিয় অংশ না নেন, তাহলে সকলের জন্য স্বাস্থ্যরক্ষার সন্তোষজনক ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না।

যাতে আমাদের দেশে সকলের মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষার রীতিনীতি বোধগম্য হয় এবং যাতে সুস্বাস্থ্যের একটা আকাঙ্ক্ষা গড়ে ওঠে সেই উদ্দেশ্যেই এই বইটি রচিত হয়েছে।

'যেখানে ডাক্তার নেই' বইটি একটি সর্বাত্মক গ্রামস্বাস্থ্য সহায়িকা। এটি ডেভিড ওয়ার্নারের লেখা এবং ১৯৭৭ সালে আমেরিকার হেসপেরিয়ান ফাউণ্ডেশন এটি প্রথম ইংরাজীতে প্রকাশ করে। বইটি প্রথমে স্পেনদেশীয় ভাষায় লেখা হয়েছিল নাম ছিল 'ডন্ডে নো হে ডক্টর'। লেখক মেক্সিকো দেশের পাহাড়ি অঞ্চলের চাষীদের মধ্যে ১৩ বছর ধরে স্বাস্থ্যপ্রকল্পের কাজ করেছিলেন। এখন গ্রামবাসিরা নিজেরাই প্রকল্পগুলি চালায়। এই বই এখন দক্ষিণ আমেরিকার সব দেশে ব্যবহার করা হয়।

১৯৮০ সালে ভলান্টারি হেলথ এসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া, নিউ দিল্লী, ডাঃ সি· সত্যমালার তত্ত্বাবধানে এই বইটির প্রথম ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে।

এই বইয়ের বিশাল্‌ উপযোগিতা এবং চাহিদার কথা ভেবে আমরা পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী করে এটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করছি। শ্রীমতী কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদের কাজটি করেছেন।

স্বাস্থ্য মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। কিন্তু অন্যান্য অনেক মৌলিক অধিকারের মতোই এ থেকে বেশির ভাগ গরিব মানুষেরা বঞ্চিত। '২০০০ সালের মধ্যে সকলের স্বাস্থ্য' আসবে—যদি সব মানুষের মধ্যে জমি, টাকাকড়ি আর অন্যান্য সংগতির ভাগ বাঁটোয়ারা হয়; যদি সাধারণ মানুষ সচেতন হয়ে অদরকারি, ক্ষতিকর ওষুধ, শিশুদের জন্যে টিনের দুধ ইত্যাদির ব্যবহার না করে বরং নিজেদের দেশের স্বাস্থ্যের যত্নের উপকারী দিকটা এবং আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সুফলটুকু মিলিয়ে ব্যবহার করতে শেখে। এই সব কাজে স্বাস্থ্যকর্মীদের এগিয়ে আসতে হবে। তাদের সমাজসচেতন এবং রাজনীতি সচেতন হতে হবে, যাতে তারা সাধারণ মানুষকে কতকগুলি বিষয়ে যেমন পানীয় জল, পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা ও পুষ্টি সম্বন্ধে স্বনির্ভর করে তুলতে পারে।

বাংলাদেশের ডাঃ জাফরুল্লা চৌধুরির মতে ডাক্তার দুরকম—জ্ঞানের ডাক্তার আর ত্রাণের ডাক্তার। প্রথমজন ডাক্তারি বিদ্যা শেখেন এবং গবেষণা করেন। দ্বিতীয়জন সেই বিদ্যাকে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে কাজে লাগান। ত্রাণের ডাক্তার এবং অন্যান্য সব সচেতন স্বাস্থ্যকর্মীদেরই 'যেখানে ডাক্তার নেই' বইটি কাজে লাগবে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে অনেকদূরে—যেখানে ডাক্তার নেই—সেখানে যারা থাকে, মূলতঃ তাদের জন্যেই এ বইটি লেখা হয়েছিল। কিন্তু, যেখানে ডাক্তার আছে, সেখানেও সাধারণ লোক নিজেদের স্বাস্থ্যের যত্ন নেয়ার ব্যাপারে অনেক কিছু করতে পারে আর তাদের তা করা উচিত। কাজেই, যারাই স্বাস্থ্যের জন্যে ভাবে, তাদেরই জন্যে এ বই।

লেখক বিশ্বাস করেন :

১· স্বাস্থ্যের যত্নে যে শুধু প্রত্যেকের অধিকার আছে তাই নয়, এতে প্রত্যেকের দায়িত্বও আছে।

২· যে কোনো স্বাস্থ্যপ্রকল্প বা কাজকর্মের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত—জেনে বুঝে নিজের যত্ন নিজেনেয়া।

৩· সাধারণ লোককে যদি পরিষ্কার, সহজ তথ্য দেয়া হয়, তবে তারা নিজেদের বাড়িতেই কম সময়ে, কম খরচে, আর প্রায়ই, ডাক্তারদের থেকেও ভালোভাবে স্বাস্থ্যের অনেক সাধারণ সমস্যা এড়াতে আর সারাতে পারে।

৪· ডাক্তারি বিদ্যাটা কয়েকজন বাছাই করা লোকের কাছে গোপনে না রেখে বরং সকলকে ভাগ করে দেয়া উচিত।

৫· পুঁথিগত বিদ্যা যাদের কম, তাদের 'পণ্ডিত'দের মতোই বিশ্বাস করা যায়—বুদ্ধিশুদ্ধিও তাদের কম নয়।

৬· স্বাস্থ্যের মূল যত্নটা সাধারণ মানুষকে বাইরে থেকে পাইয়ে না দিয়ে, যতটা সম্ভব, তাদের নিজেদের করে নিতে উৎসাহ দেয়া উচিত।

অবশ্য নিজের ক্ষমতার দৌড় জানাটা, জেনেবুঝে নিজের যত্ন নিজে নেয়ার মধ্যে পড়ে। সেই কারণে, কি করতে হবে, শুধু যে সে বিষয়ে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা নয়, কখন সাহায্য চাইতে হবে তাও বোঝানো হয়েছে। কোন্ কোন্ অবস্থায় অভিজ্ঞ স্বাস্থ্যকর্মী বা ডাক্তারের সাহায্য চাইতে হবে, সে বিষয়ে এই বইয়ে অনেক তথ্য দেয়া আছে। কিন্তু অভিজ্ঞ স্বাস্থ্যকর্মী বা ডাক্তার তো সবসময় পাওয়া যায় না, তাই ইতিমধ্যে কি করতে হবে—এমনকি খুব গুরুতর ব্যাপারেও—সে বিষয়েও পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

বইটি সহজ বাংলায় লেখার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে অল্প লেখাপড়া জানা লোকেও বুঝতে পারে। কয়েকটা শক্ত কথা আছে, সেগুলির মানে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিছু জরুরি কথার মানে বইয়ের পেছনের দিকে শব্দতালিকায় পাওয়া যাবে।

এই বাংলা সংস্করণটি অবশ্যই ত্রুটিমুক্ত নয়। এটিকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে যাঁরা স্বাস্থ্যের কাজ করছেন, তাঁরা নিজ নিজ এলাকার স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, রীতিনীতি, বিশেষ ধরনের চিকিৎসাপদ্ধতি আর বাংলাভাষার বিশেষ আঞ্চলিক ব্যবহার অনুসারে বইটিকে বদলে এবং মানিয়ে নেবেন। এই বইয়ের যে কোনো অংশ যে কোনো ভাবে ব্যবহার করা যাবে—তার জন্যে লেখক বা প্রকাশকের অনুমোদন লাগবে না; তবে তার থেকে আর্থিক লাভ করা চলবে না। আপনি কি ভাবে বইটি ব্যবহার করছেন এবং বইটি কতখানি কাজে এসেছে সে সমন্ধে একটি প্রশ্নমালা বইটির শেষে দেওয়া হল সেটি যথাযথভাবে পূরণ করে আমাদের পাঠাতে অনুরোধ করছি।

ডি পি পোদ্দার
এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি

ওয়েষ্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ এসোসিয়েশন
১৯এ, ডাঃ সুন্দরীমোহন এভিনিউ,
কলিকাতা-৭০০ ০১৪.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বহুলোকের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অকুণ্ঠ সহযোগিতায় এ বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। এঁদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই:

অক্সফ্যাম (ইনডিয়া) ট্রাস্ট। এঁদের উৎসাহ, সহযোগিতা এবং আর্থিক সাহায্য ছাড়া এ বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হত না।

ডাঃ আনন্দ রায় এবং ডাঃ প্রতীপ দেবনাথ আয়ুর্বেদ কলেজ, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন।

বর্তমান প্রিন্টার্স্ এণ্ড্ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের কর্মীবৃন্দ।

শ্রীমতী তপশ্রী দাস, শ্রী রংগন চক্রবর্তী এবং শ্রী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রুফ দেখে এবং অন্য নানাভাবে আমাদের সহায়তা করেছেন।

গ্রাম স্বাস্থ্যকর্মীর জন্যে কয়েকটি কথা

গ্রাম স্বাস্থ্যকর্মী কে?

যে নিজের বাড়ির লোক আর পাড়ার লোকদের স্বাস্থ্য ভালো করার পথে এগিয়ে নিয়ে যায় সেই গ্রামস্বাস্থ্যকর্মী। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, সে বেশ কাজের লোক, তার দয়ামায়াও আছে আর তাই দেখেই গ্রামের অন্য সকলে তাকে এই কাজের জন্যে বেছে নিয়েছে। কোনো কোনো স্বাস্থ্যকর্মী সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তর বা ওই ধরনের অন্য কোনো পরিকল্পনা থেকে ট্রেনিং আর সাহায্য পায়। আবার অনেকে আছে যাদের কোনো সরকারী পদ নেই। তারা ঐ এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যেই পড়ে, কিন্তু রোগ সারাতে বা স্বাস্থ্যের কাজে এগিয়ে আসে বলে আর পাঁচজনে তাদের মান্য করে। তারা সাধারণতঃ নিজে নিজেই দেখেশুনে, লক্ষ্য করে বা কাজে হাত লাগিয়ে শেখে।

মোটের ওপর—**যে নিজের গ্রামকে আরো স্বাস্থ্যকর জায়গা করে গড়ে তোলার কাজে সাহায্য করে সেই গ্রামস্বাস্থ্যকর্মী।**

এর মানে হল, প্রত্যেকেই স্বাস্থ্যকর্মী হতে পারে আর প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্যকর্মী হওয়া উচিত।

- বাবা মা তাদের ছেলেমেয়েদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে শেখাতে পারেন।
- চাষীরা একসঙ্গে কাজ করতে পারেন যাতে তাঁদের জমিতে বেশি ফসল ফলে।
- মাষ্টারমশাইরা ছাত্রছাত্রীদের শেখাতে পারেন কেমন করে অনেক সাধারণ রোগ বা কাটাকুটি এড়ানো যায়।
- স্কুলে যা শেখানো হয় ছাত্রছাত্রীরা তা তাদের বাবামাদের বলতে পারে।
- দোকানিরা যেসব ওষুধ বিক্রি করেন সেগুলির ঠিক ঠিক ব্যবহার সম্বন্ধে জেনে নিয়ে খদ্দেরদের পরামর্শ দিতে পারেন বা দরকার মতো সাবধান করে দিতেও পারেন।
- দাইরা বাচ্চা পেটে থাকার সময় মায়ের ভালো খাওয়াদাওয়ার, শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানোর বা পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজন সম্বন্ধে বাবামাদের পরামর্শ দিতে পারেন।

এই রকম মোটামুটি অর্থে যাঁরা গ্রামস্বাস্থ্যকর্মী, তাঁদেরই জন্যে এ বই। যে কেউ নিজের, বাড়ির লোকের বা পাড়ার লোকের উপকার করতে চান, তাঁরই জন্যে এ বইটি লেখা হয়েছে।

যদি আপনি একজন সমাজস্বাস্থ্যকর্মী, সহায়িকা নার্স, এমনকি একজন ডাক্তারও হন, মনে রাখবেন এটা আপনার একার বই নয়—**এটা সকলের**, সকলের সঙ্গে একে ভাগ করে নিন।

আপনি যা জানেন তা অন্যদের জানাতে এ বইটি ব্যবহার করুন। এর জন্যে কয়েকজনকে নিয়ে একটা দল গড়ে একটা করে পরিচ্ছেদ পড়ে সবাই মিলে আলোচনা করতে পারেন।



গ্রাম স্বাস্থ্যকর্মী সকলের সঙ্গে সমানভাবে থেকে কাজ করেন। তাঁর প্রথম কাজ হল নিজের জ্ঞান সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেয়া

প্রিয় গ্রামস্বাস্থ্যকর্মী,

এই বইয়ে লোকের **স্বাস্থ্য সম্বন্ধেই** বেশি বলা হয়েছে। কিন্তু আপনার গ্রামকে যদি একটা স্বাস্থ্যকর জায়গা হিসেবে গড়ে তুলতে হয়, তবে গ্রামের লোকদের **মানুষ হিসেবে** বেঁচে থাকার জন্যে **যা যা প্রয়োজন**, তার সঙ্গেও আপনার পরিচয় থাকা দরকার। ওষুধ আর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আপনার যেমন জ্ঞান থাকা দরকার, মানুষকে বোঝার ক্ষমতা বা তাদের সম্বন্ধে আগ্রহ থাকাটাও তেমনি জরুরি।

স্বাস্থ্যের প্রয়োজন আর মানবিক প্রয়োজন মেটানোর ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে কয়েকটি পরামর্শ দেয়া হল:

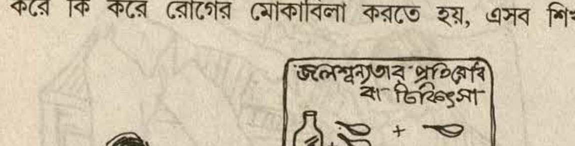
১· **মানুষকে দরদ দিয়ে বুঝুন**— প্রায়ই দেখা যায়, দুটো মিষ্টি কথা, একটু হাসি, কাঁধের ওপর হাত রাখা— সহানুভূতির এই ধরনের প্রকাশ, অন্য কিছুর চেয়ে অনেক বেশি কাজ দেয়। **অন্যদের নিজের সমান মনে করে সেইমতো ব্যবহার করুন**। নিজের খুব তাড়া বা দুশ্চিন্তা থাকলেও অন্যের মনের অবস্থা আর দরকারের কথাটা মাথায় রাখুন। "এ যদি আমার বাড়ির লোক হত তাহলে আমি কি করতাম?" এই প্রশ্নটা নিজেকে করলে অনেক সময় সুবিধা হয়।

রোগীর সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করুন। বেশি অসুস্থ বা মরতে বসেছে এমন রোগীর সঙ্গে বিশেষ সদয় ব্যবহার করবেন। তাদের পরিবারের লোকের সঙ্গেও ভালো ব্যবহার করবেন। তারা যেন বোঝে যে আপনি তাদের কথা ভাবছেন।



মনে সহানুভূতি রাখুন
দরদ অনেক সময় ওষুধের চেয়ে বেশি কাজ দেয়। আপনি যে লোকের কথা চিন্তা করছেন এটা জানাতে ভয় পাবেন না।

২· **নিজের জ্ঞান সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিন**। স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে আপনার প্রথম কাজ হল শিক্ষা দেয়া। অর্থাৎ কি করে রোগের হাত থেকে বাঁচা যায়, রোগ হলে কিভাবে তা চেনা যায়, ঘরোয়া আর সাধারণ ওষুধ ঠিকমতো ব্যবহার করে কি করে রোগের মোকাবিলা করতে হয়, এসব শিখতে মানুষকে সাহায্য করা।



নিজের জ্ঞান সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেয়ার উপায় খুঁজুন

আপনি নিজে যা শিখেছেন, ভালো করে বুঝিয়ে শেখালে তার কোনোকিছুর থেকেই কোনো বিপদ হতে পারে না। কোনো কোনো ডাক্তার, **নিজের দেখাশোনা নিজে করা** সম্বন্ধে এমনভাবে কথা বলেন, যেন সেটা একটা ভয়ঙ্কর কিছু। হয়তো তাঁরা চান যে সাধারণ লোক প্রচুর পয়সা খরচ করে তাঁদেরই ডাকুক। কিন্তু, সত্যি কথা বলতে গেলে, **স্বাস্থ্যের বেশিরভাগ সাধারণ সমস্যা লোকে নিজের বাড়িতেই অনেক তাড়াতাড়ি আর অনেক ভালোভাবে মেটাতে পারে।**

৩· দেশের লোকের প্রচলিত রীতিনীতি আর ধ্যানধারণার ওপর শ্রদ্ধা রাখুন।

আধুনিক ডাক্তারি সম্বন্ধে কিছু শিখেছেন বলেই যে আপনি পুরোনো চিকিৎসা ব্যবস্থার উপকারিতা বুঝতে পারবেন না, এটা ঠিক নয়। ডাক্তারি বিদ্যা ঢুকে পড়লে প্রায়ই চিকিৎসায় দরদের ছোঁয়াটা চলে যায়। এটা খুবই দুঃখের কথা, কারণ :

> **আধুনিক ওষুধের সেরাটুকু নিয়ে,**
> **দেশি উপায়ের ভালো যা কিছু মিশিয়ে,**
> **ব্যবহার কর যদি দুটোকে মিলিয়ে,**
> **ভালো ফল পাবে,—কোনো একটার চেয়ে।**

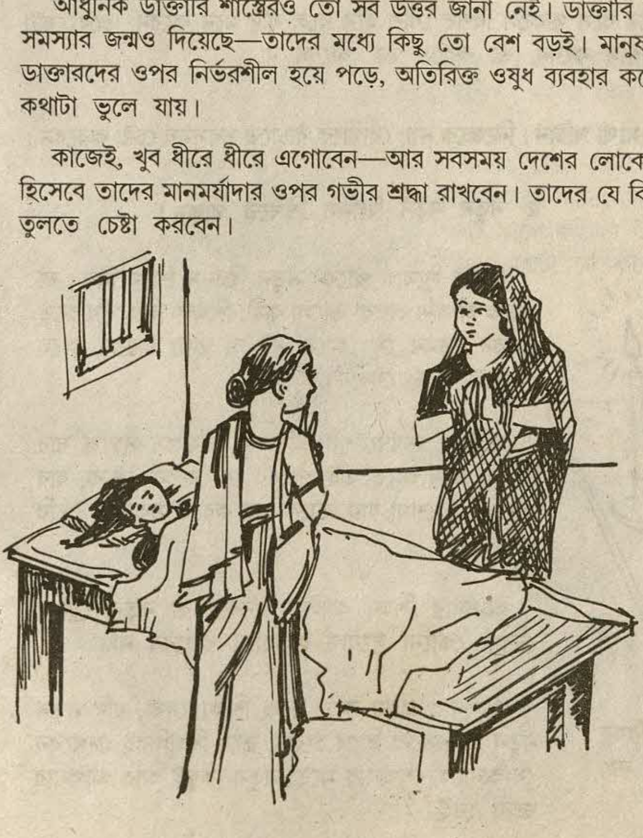
এইভাবে দেশের রীতিনীতিকে একেবারে বাতিল না করে বরং তার উন্নতি করা সম্ভব হবে।

অবশ্য যদি দেখেন যে কোনো ঘরোয়া চিকিৎসা বা প্রথা সত্যিই ক্ষতি করে (যেমন, কচি বাচ্চার নাড়িতে গোবর লাগানো) সেটা বদলে নিতে নিশ্চয়ই চেষ্টা করবেন। কিন্তু খুব সাবধানে, যারা এসবে বিশ্বাস করে তাদের ওপর শ্রদ্ধা রেখেই, এ কাজটা করবেন। "তোমরা ভুল করছ" শুধু এইটুকুই লোককে বলবেন না ; কেন তাদের অন্যরকম কিছু করা দরকার সেটা বোঝাতে চেষ্টা করবেন।

কোনো ধারণা বা প্রথা পাল্টাতে সময় লাগে, আর তার কারণও আছে। মানুষ যেটা ঠিক বলে মনে করে সেটাই আঁকড়ে ধরে থাকে। এটা আমাদের বোঝা উচিত।

আধুনিক ডাক্তারি শাস্ত্রেরও তো সব উত্তর জানা নেই। ডাক্তারি বিদ্যা অনেক সমস্যা মিটিয়েছে, আবার অনেক সমস্যার জন্মও দিয়েছে—তাদের মধ্যে কিছু তো বেশ বড়ই। মানুষ বড় তাড়াতাড়ি আধুনিক ডাক্তারি বিদ্যা আর ডাক্তারদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, অতিরিক্ত ওষুধ ব্যবহার করে আর নিজেদের আর পরস্পরের যত্ন নেয়ার কথাটা ভুলে যায়।

কাজেই, খুব ধীরে ধীরে এগোবেন—আর সবসময় দেশের লোকের ওপর, তাদের রীতিনীতির ওপর আর মানুষ হিসেবে তাদের মানমর্যাদার ওপর গভীর শ্রদ্ধা রাখবেন। তাদের যে বিদ্যাবুদ্ধি আর ক্ষমতা রয়েছে সেগুলোই বাড়িয়ে তুলতে চেষ্টা করবেন।



দেশি চিকিৎসক আর দাইদের সঙ্গে কাজ করুন
—তাদের বিরুদ্ধে নয়। তাদের কাছে শিখুন, আবার
আপনার কাছে শিখতে তাদের উৎসাহ দিন।

৪· নিজের ক্ষমতা কতদূর তা জানুন

আপনার জ্ঞান বা ক্ষমতা বেশি বা কম যাই হোক না কেন, আপনি যদি সেটা বুঝে তার ভেতরে কাজ করেন তবে অনেক উপকার করতে পারবেন। অর্থাৎ, **যা করতে জানেন তাই করবেন**। যা কখনো শেখেননি বা যা সম্বন্ধে আপনার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা নেই, তা করতে চেষ্টা করবেন না—যদি তার থেকে কারো ক্ষতি বা বিপদ হবার ভয় থাকে।



নিজের ক্ষমতার দৌড় জানুন

কিন্তু সবসময় নিজের বুদ্ধি বিবেচনা ব্যবহার করবেন।

অনেক সময় কি করবেন বা করবেন না, সেটা নির্ভর করে বিশেষজ্ঞের সাহায্য কতদূরে তার ওপর।

যেমন : কোনো মা সদ্য সন্তান প্রসব করেছে আর তার অতিরিক্ত রক্তপাত হচ্ছে। যদি স্বাস্থ্যকেন্দ্র মাত্র আধঘণ্টার পথ হয়, তবে তাকে তখনই সেখানে নিয়ে যাওয়াটাই হবে বুদ্ধির কাজ। কিন্তু মায়ের যদি খুব বেশি রক্তপাত হয় আর স্বাস্থ্যকেন্দ্র যদি বহু দূরে হয় তবে ঠিকমতো শেখা না থাকলেও আপনি তার তলপেটে মালিশ করতে বা তাকে অক্সিটসিক ইনজেকশন দিতে পারেন।

অকারণ ঝুঁকি নেবেন না। কিন্তু কিছু না করে বসে থাকলে বিপদ বেশি হবে বলে যদি মনে করেন, তবে যেটা করলে উপকার হবে বলে মোটামুটিভাবে বিশ্বাস করেন, তা করতে ভয় পাবেন না।

নিজের ক্ষমতার সীমা জানুন—কিন্তু নিজের মাথা খাটান। নিজেকে নয়, রোগীকে বাঁচাতে সবসময় চেষ্টা করবেন।


শিখে চলুন। কেউ যদি বলে এমন সব বিষয় আছে যা আপনার শেখা বা জানা উচিত নয়, তার কথা শুনবেন না।

৫· নতুন নতুন জিনিস শিখতে থাকুন।

যখনই সুযোগ পাবেন নতুন জিনিস শিখে নিন। যা থেকে আপনি আরো ভালো কর্মী, শিক্ষক বা মানুষ হতে পারেন তেমন যে কোনো বই বা তথ্য হাতের কাছে পেলেই পড়ে ফেলুন।

ডাক্তার, স্যানিটেশন অফিসার, চাষবাস সম্বন্ধে যার বিশেষ জ্ঞান আছে, এই ধরনের যে কোনো লোক, যার কাছে কিছু শেখা যায়, তাকে প্রশ্ন করতে সবসময় তৈরি থাকুন।

আপনার শিক্ষা ঝালিয়ে নেবার বা নতুন ট্রেনিং নেবার কোনো সুযোগ হাতছাড়া করবেন না।

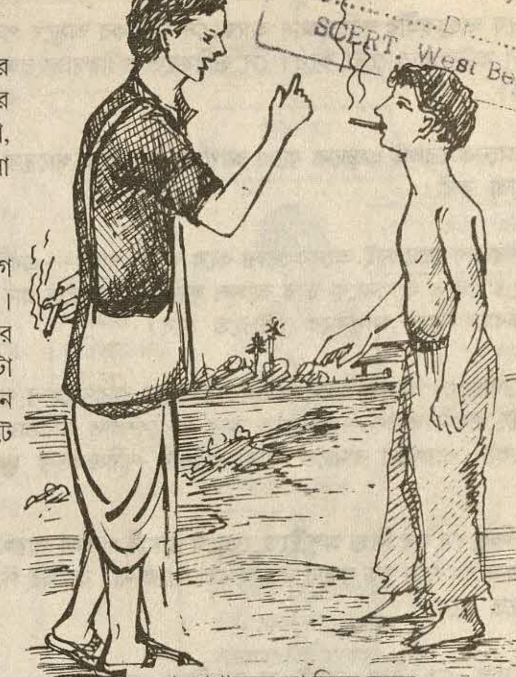
আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে শিক্ষা দেয়া, যদি নতুন নতুন জিনিস না শিখে চলেন, তবে শিগ্‌গিরই দেখবেন যে অন্যকে শেখাবার মতো নতুন কিছুই আর আপনার জানা নেই।

৬· লোককে যা শেখাচ্ছেন নিজে সেইমতো কাজ করুন।

আপনার কথার থেকে কাজের দিকেই লোকের নজর থাকে বেশি। স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে আপনার উচিত নিজের ব্যক্তিগত জীবন আর অভ্যাস সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়া, যাতে পাড়ার লোকের কাছে আপনি একটা ভালো উদাহরণ হয়ে ওঠেন।

অন্য লোককে পায়খানা তৈরি করতে বলার আগে দেখুন আপনার নিজের বাড়িতে একটা আছে কিনা। আবার ধরুন সকলের ব্যবহারের জন্যে ময়লা ফেলার একটা গর্ত খুঁড়ে ফেলা দরকার। এই কাজের জন্যে একটা কর্মীদল গড়ে তুলতে আপনি সাহায্য করলেন। এখন আপনি দলের অন্য সকলের সঙ্গে সমানভাবে খেটে কাজটা করবেন।

> **আসল নেতা বলে নাকো "এটা ওটা কর"।**
> **করে যে দেখায় জেনো সেই নেতা বড়॥**



যা শেখাচ্ছেন তা নিজে করুন,
নইলে আপনার কথা কে শুনবে ?

৭· আনন্দে কাজ করুন

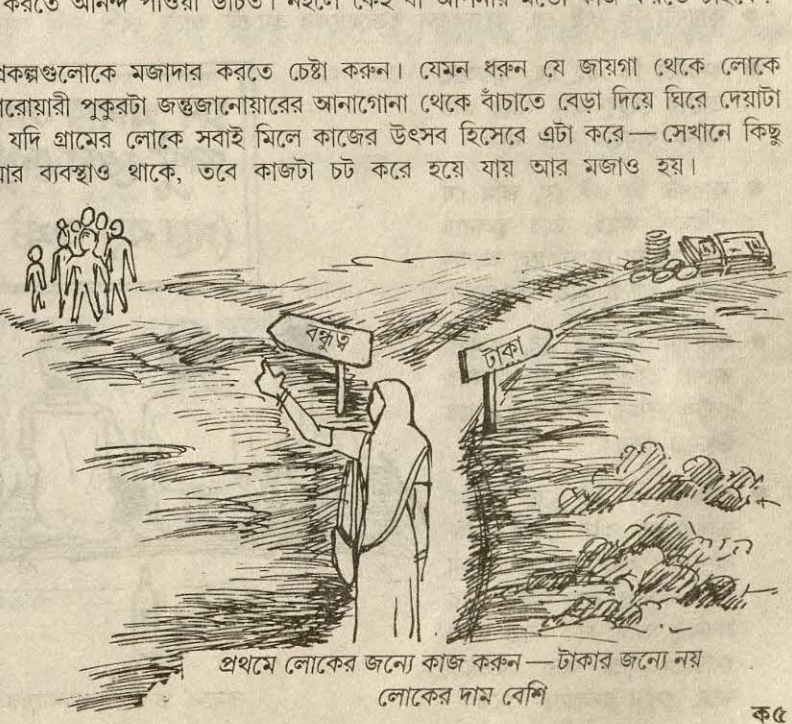
যদি আপনি চান যে, অন্যরা তাদের গ্রামের উন্নতি করার বা তাদের স্বাস্থ্যের যত্ন নেবার কাজে হাত লাগাক তবে আপনার নিজের সে কাজটা করতে আনন্দ পাওয়া উচিত। নইলে কেই বা আপনার মতো কাজ করতে চাইবে ?

দল বেঁধে কাজ করার প্রকল্পগুলোকে মজাদার করতে চেষ্টা করুন। যেমন ধরুন যে জায়গা থেকে লোকে ব্যবহারের জল আনে সেই বারোয়ারী পুকুরটা জন্তুজানোয়ারের আনাগোনা থেকে বাঁচাতে বেড়া দিয়ে ঘিরে দেয়াটা খুবই পরিশ্রমের কাজ। কিন্তু যদি গ্রামের লোকে সবাই মিলে কাজের উৎসব হিসেবে এটা করে— সেখানে কিছু গানবাজনা আর খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাও থাকে, তবে কাজটা চট করে হয়ে যায় আর মজাও হয়।

কাজটা যদি খেলা হিসেবে নেয়া যায় তবে ছোটরা ফূর্তি করে প্রচুর খাটতে পারে।

কাজটার জন্যে আপনি মজুরি পেতে পারেন বা নাও পেতে পারেন। কিন্তু কেউ গরিব, পয়সা দিতে পারে না বলে কখনো তাকে তুচ্ছ ভাববেন না বা তার দিকে কম মনোযোগ দেবেন না।

এতে আপনাকে লোকে দেবে ভালবাসা আর শ্রদ্ধা। এগুলোর দাম টাকার চেয়ে অনেক বেশি।



প্রথমে লোকের জন্যে কাজ করুন — টাকার জন্যে নয়
লোকের দাম বেশি

যে স্বাস্থ্যকর্মীর দায়িত্বজ্ঞান আছে সে লোকের অসুখে পড়ার জন্যে অপেক্ষা করে না। রোগ শুরু হবার আগেই সেটা আটকাবার চেষ্টা করে। সে ভবিষ্যতে শরীরস্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্যে **এখনই** কাজে লাগতে লোককে উৎসাহ দেয়।

অনেক রোগই এড়ানো যায়। আপনার কাজ হল স্বাস্থ্যের সমস্যাগুলো সম্বন্ধে বুঝতে আর ব্যবস্থা নিতে লোককে সাহায্য করা।

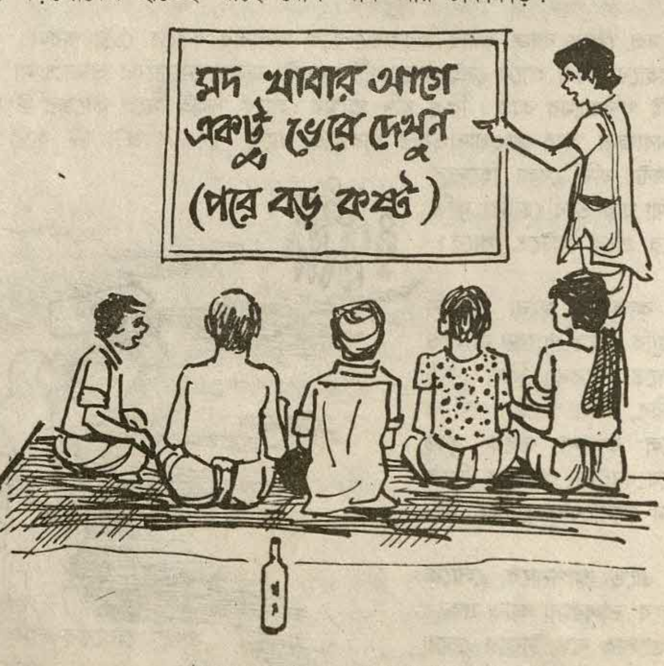
বেশিরভাগ রোগেরই অনেকগুলো করে কারণ থাকে—একটার থেকে আর একটা আসে। সমস্যাটার স্থায়ী সমাধান করতে গেলে আপনাকে তার **আসল কারণগুলো** খুঁজে বার করে সেগুলো দূর করার ব্যবস্থা নিতে হবে। সমস্যার একেবারে মূলে আপনাকে পৌঁছতে হবে।

উদাহরণ: অনেক গ্রামে শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণ হোল পাৎলা পায়খানা। পাৎলা পায়খানার রোগ ছড়িয়ে পড়ার একটা প্রধান কারণ—ব্যক্তিগত আর পরিবেশগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব। এটার সম্বন্ধে কিছু করার জন্যে কয়েকটা পায়খানা বানাতে আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মূল নিয়মগুলো শেখাতে পারেন (পৃঃ ১৬৭)।

কিন্তু যে সব শিশু অপুষ্টিতে ভোগে তারাই পাৎলা পায়খানায় বেশি কষ্ট পায় আর মরে। তাদের শরীরে জীবাণুর আক্রমণের সঙ্গে যুদ্ধ করার মত ক্ষমতা থাকে না। কাজেই পাৎলা পায়খানা থেকে মৃত্যু বন্ধ করতে হলে অপুষ্টিও বন্ধ করতে হবে।

কিন্তু এত শিশু কেনই বা অপুষ্টিতে ভোগে?

- কারণটা কি এই যে, মায়েরা বোঝেন না কোন খাবার সব চেয়ে ভালো (যেমন বুকের দুধ)?
- কারণটা কি এই যে, বাড়ির লোকের দরকারমত খাবার যোগাবার উপযুক্ত জমি বা টাকা নেই?
- কারণটা কি এই যে, কয়েকজন বড়লোকের হাতেই আছে বেশি জমি আর টাকাকড়ি?
- কারণটা কি এই যে, গরিবরা, তাদের যেটুকু জমি আছে তার সঠিক ব্যবহার করে না?
- কারণটা কি এই যে, জমি যে পরিমাণ আছে, তার তুলনায় বাবা মাদের ছেলেপিলে অনেক বেশি, আরো হয়েই চলেছে?
- কারণটা কি এই যে, বাবারা আশা হারিয়ে ফেলে, আর যেটুকু পয়সা আসে মদ খেয়ে উড়িয়ে দেয়?
- কারণটা কি এই যে, লোকে ভবিষ্যতের কথা ভেবে কাজ করে না? কারণ তারা বোঝে না যে একসঙ্গে কাজ করে আর সবকিছু ভাগ করে নিয়ে তারা যেভাবে বাঁচে আর যেভাবে মরে, সেটা বদলাতে পারে?

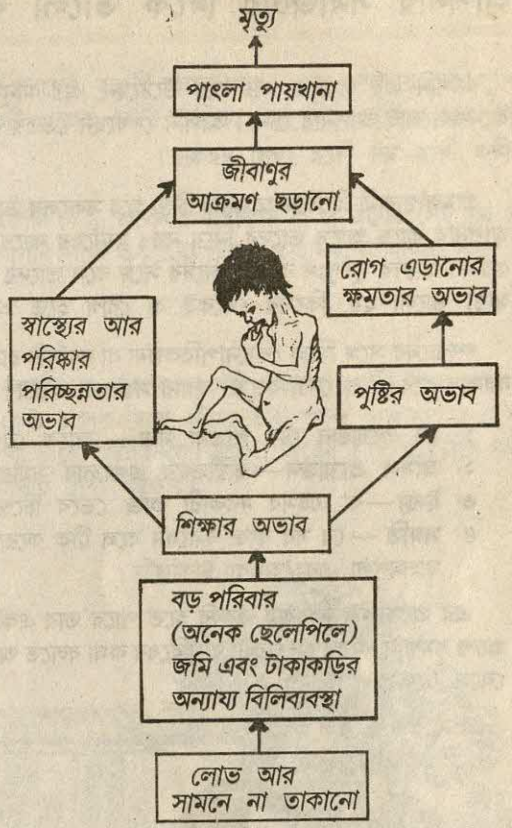


সামনে তাকাতে অন্যদের সাহায্য করুন

আপনি হয়তো দেখবেন যে, আপনার এলাকায় শিশুমৃত্যুর কারণ-এর সবগুলো না হলেও অনেকগুলোই। আপনি নিজে অন্য অনেক কারণও খুঁজে পেতে পারেন। স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে আপনার কাজ হল এই কারণগুলো যতটা সম্ভব বুঝে তাদের মোকাবিলা করতে মানুষকে সাহায্য করা।

কিন্তু মনে রাখবেন: পাৎলা পায়খানা থেকে মৃত্যু এড়াতে হলে পায়খানা তৈরি, বিশুদ্ধ জল আর পুষ্টিকেন্দ্র ছাড়াও আরো অনেক কিছু দরকার। হয়তো দেখবেন যে, পরিবার পরিকল্পনা, জমির সুষ্ঠু ব্যবহার, টাকাকড়ি; জমি, আর ক্ষমতার ঠিকমতো ভাগাভাগি—শেষ পর্যন্ত এইগুলোই বেশি জরুরি হয়ে দাঁড়াবে।

অনেক রোগ আর মানুষের বহু কষ্টের কারণ হল সামনে না তাকানো আর লোভ। যদি লোকের ভালোর জন্যে আপনার কিছুমাত্র মাথাব্যথা থাকে, তবে সবকিছু ভাগ করে নিতে, একসঙ্গে কাজ করতে আর ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে শিখতে তাদের সাহায্য করুন।



পাৎলা পায়খানা থেকে শিশুমৃত্যুর পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকা কারণগুলি

স্বাস্থ্যের যত্নের সঙ্গে বহু জিনিসের সম্বন্ধ আছে

পাৎলা পায়খানা আর অপুষ্টির কতকগুলি মূল কারণ আমরা দেখলাম।
সেইরকম, দেখবেন যে, স্বাস্থ্যের অনেক সমস্যার পেছনে রয়েছে—**খাদ্য উৎপাদন, জমির ভাগবাঁটোয়ারা, শিক্ষা, লোকের সঙ্গে লোকের ভালো বা মন্দ ব্যবহার**—এই ধরণের অনেক ব্যাপার।

সমস্ত সমাজের চিরকালের মঙ্গলের জন্যে যদি আপনার আগ্রহ থাকে, তবে এই সমস্ত বড় বড় প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মানুষকে আপনি নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন।

শুধু রোগ না হওয়াটাই স্বাস্থ্য নয়। স্বাস্থ্য হল সুস্থতা: শরীরে, মনে এবং সমাজে। মানুষের বাস করার পক্ষে সবচেয়ে ভালো হল স্বাস্থ্যকর পরিবেশ—যেখানে মানুষ পরস্পরকে বিশ্বাস করতে, প্রতিদিনের প্রয়োজন মেটাতে একসঙ্গে কাজ করতে, সুখে দুঃখে সব কিছু ভাগ করে নিতে, শিখতে, বড় হতে আর প্রত্যেকের পক্ষে যতটা সম্ভব পরিপূর্ণভাবে বাঁচতে পরস্পরকে সাহায্য করতে পারে।

প্রতিদিনের সমস্যাগুলো মেটাতে যতটা সম্ভব চেষ্টা করুন। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনার সবচেয়ে বড় কাজ হল সমাজকে আরো স্বাস্থ্যকর, মানুষের বাস করার পক্ষে আরো উপযুক্ত করে গড়ে তোলা।

স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে আপনার দায়িত্ব খুব বড়।

কোথায় শুরু করবেন?

আপনার সমাজটার দিকে ভালো করে তাকান

আপনি এই সমাজে বড় হয়ে উঠেছেন, এর মানুষদের ভালো করে চেনেন, তাই এদের স্বাস্থ্যের সমস্যার অনেকগুলোই আপনার চেনা। আপনি দেখছেন ভেতর থেকে। কিন্তু ছবিটা পুরোপুরি দেখতে গেলে সমাজকে নানা দিক দিয়ে মন দিয়ে দেখা দরকার।

গ্রামস্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে আপনার চিন্তা হবে **সকলের** ভালোমন্দ নিয়ে, শুধু যাদের আপনি ভালোভাবে চেনেন বা যারা আপনার কাছে আসে তাদের নিয়ে নয়। মানুষের কাছে যান। তাদের বাড়িতে, ক্ষেতে, আড্ডায়, স্কুলে গিয়ে দেখা করুন। তাদের সুখদুঃখ বুঝুন। তাদের সঙ্গে বসে তাদের রোজকার অভ্যাসগুলি খুঁটিয়ে দেখুন, কোনগুলোতে তাদের স্বাস্থ্য ভালো হয়, কিসের থেকেই বা রোগ হতে অথবা আঘাত লাগতে পারে।

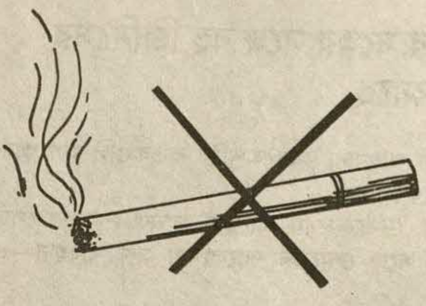
দশজনের সঙ্গে মিলে কোনোপরিকল্পনা বা কর্মসূচী হাতে নেবার আগে ভালো করে ভেবে দেখুন তার জন্যে কি কি দরকার হবে—বা সেটা কাজে লাগার সম্ভাবনা কতটা। এটা করতে হলে কতকগুলো বিষয় বিবেচনা করতে হবে:

১· **যে প্রয়োজন টের পাওয়া যায়**— লোকে যেগুলোকে তাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে মনে করে।
২· **আসল প্রয়োজন**—স্থায়ীভাবে এগুলোর সমাধান করতে হলে যা যা কাজ লোকের করা দরকার।
৩· **ইচ্ছা**—বা এইসব দরকারী কাজ ভেবে চিন্তে করায় লোকের আগ্রহ।
৪· **সঙ্গতি** — যে সব কাজ করবেন বলে ঠিক করেছেন তার জন্যে যা যা লাগবে—লোকজন, কাজের দক্ষতা, মালমশলা এবং/অথবা টাকাকড়ি।

এর প্রত্যেকটা কিরকম জরুরি হতে পারে তার একটা খুব সাধারণ উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক্—একজন লোক প্রচণ্ড ধূমপান করে। সে একটা অসুবিধের কথা বলতে আপনার কাছে এসেছে—তার কাশি হয়েছে আর সেটা ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে।



১· সে দরকার বলে টের পাচ্ছে বা ভাবছে কাশি সারানোটাকে।



২· তার আসল দরকার হল (কষ্টটা দূর করতে) ধূমপান ছেড়ে দেয়া।



৩· কাশি সারাতে হলে ধূমপান ছেড়ে দেয়ায় তার সত্যিকারের আগ্রহ দরকার। এর জন্যে তাকে বুঝতে হবে এটা সত্যিসত্যিই কতটা জরুরি।



৪· সঙ্গতি—যে সমস্ত জিনিস ধূমপান ছেড়ে দিতে লোকটিকে সাহায্য করবে তার মধ্যে একটা হল—ধূমপান তার আর তার বাড়ির লোকদের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর সে সম্বন্ধে খবরাখবর; আর একটা হল তার পরিবারের, বন্ধুদের এবং আপনার সহায়তা আর উৎসাহ।

প্রয়োজন কি তা বার করা

স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে আপনি প্রথমেই লোকের স্বাস্থ্যের সবচেয়ে জরুরি সমস্যা আর তাদের সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তার কারণ খুঁজে বার করবেন। এই কাজের জন্যে কয়েকটি প্রশ্নের একটা তালিকা করে নিলে সুবিধে হতে পারে।

পরের ২টি পৃষ্ঠায় প্রশ্নের কিছু নমুনা দেয়া হল। আপনি কিন্তু, **আপনার এলাকায়** যা যা জরুরি সেই সব প্রশ্নের কথাই মাথায় রাখবেন। এমন প্রশ্ন করবেন, যা থেকে আপনি নিজে শুধু তথ্য পাবেন তাই নয়, অন্যেরাও নিজে নিজে জরুরি প্রশ্ন করতে শিখবে।

আপনার প্রশ্নের তালিকাটা খুব লম্বা বা গোলমেলে করবেন না—বিশেষতঃ যদি সেটা বাড়ি বাড়ি নিয়ে যেতে হয়। মনে রাখবেন, **মানুষ সংখ্যা নয়**, আর সংখ্যা হিসেবে কেউ তাদের দেখে, এটাও তারা পছন্দ করে না। তথ্য সংগ্রহ করার সময় আপনার প্রথম চিন্তা হবে প্রত্যেকে কি চায় বা ভাবে, সেটা নিয়ে। হয়তো, প্রশ্নের তালিকাটা সঙ্গে করে না নিয়ে গেলেই ভালো হবে। কিন্তু কিছু মূল প্রশ্ন মাথায় রাখা দরকার।



প্রশ্নের তালিকার নমুনা



এতে লোকের স্বাস্থ্যের প্রয়োজন বোঝা যাবে
আবার মানুষকে ভাবতেও শেখাবে।



লোকে দরকার বলে যা মনে করে

লোকের প্রতিদিনের জীবনে কি কি জিনিস (ঘরদোরের অবস্থা, কাজকর্ম করার ধরন, বিশ্বাস) তাদের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে সাহায্য করে বলে তারা মনে করে?

লোকে কোনগুলোকে তাদের সবথেকে বড় সমস্যা, চিন্তা বা প্রয়োজন বলে ভাবে—শুধু স্বাস্থ্যের ব্যাপারে নয়, সাধারণভাবে?



বাড়ি-ঘর জল, পায়খানা নর্দমার ব্যবস্থা



বিভিন্ন বাড়িগুলি কি জিনিস দিয়ে তৈরি? দেয়াল? মেঝে? বাড়িগুলি কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে রাখা আছে? রান্না কোথায় করা হয়—মেঝেতে না অন্য কোথাও? ধোঁয়া কোনপথে বার হয়? লোকে কিসের ওপর শোয়? মাছি, উকুন, ছারপোকা, ইঁদুর এইসব ক্ষতিকারক জীব কি একটা সমস্যা? কেমনভাবে? এগুলো কমাতে লোকে কি করে? আর কি কি করা যায়?

খাবার জিনিস কি নোংরা বা রোগের ছোঁওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয়? আরো ভালভাবে রাখার জন্যে কি করা যায়?

বাড়ির ভেতরে কুকুর মুরগি শুয়োর ইত্যাদি কোনো জন্তুজানোয়ারকে কি ঢুকতে দেয়া হয়? তাদের থেকে কোনো সমস্যা হয় কি?

জন্তুজানোয়ারদের সাধারণতঃ কি কি রোগ হয়? এগুলোর থেকে মানুষের স্বাস্থ্যের কি ভাবে ক্ষতিবৃদ্ধি হয়? এই সমস্ত রোগ সম্বন্ধে কি করা হচ্ছে?

পরিবারগুলি জল কোথা থেকে পায়? সেই জল খাওয়া কি নিরাপদ? লোকে কি ভাবে সাবধান হয়?

কটা বাড়িতে পায়খানা আছে? কজন সেগুলো ঠিকমত ব্যবহার করে?

গ্রামটা কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন? লোকে জঞ্জাল কোথায় ফেলে? কেন?



লোকজনের হিসেব



গ্রামে কতজন লোক বাস করে? এর মধ্যে ১৫ বছরের নিচে কজন আছে?

কতজন পড়তে লিখতে পারে? স্কুলে গিয়ে কি কিছু লাভ হয়? ছেলেমেয়েদের যা যা জানা দরকার তা কি শেখানো হয়? অন্য কি কি উপায়ে তারা শেখে?

এ বছরে কতজন শিশু জন্মেছে? কতজন লোক মারা গেছে? কিসে মারা গেল? কোন কোন বয়সে? তাদের মৃত্যু কি ঠেকানো যেত? কি ভাবে?

জনসংখ্যা কি বাড়ছে না কমছে? এর থেকে কি কোনো সমস্যা হচ্ছে?

গত বছরে বিভিন্ন লোকে কতবার অসুস্থ হয়েছিল? এসের প্রত্যেকে কতদিন ধরে অসুস্থ ছিল? প্রত্যেকের কি কি অসুখ হয়েছিল বা আঘাত লেগেছিল? কি কারণে?

কতজনের পুরোনা অসুখ আছে? অসুখগুলো কি কি?

বেশির ভাগ বাপমায়ের কটি করে ছেলেমেয়ে? কতজন ছেলেমেয়ে মারা গেছে? কিসে মারা গেল? কোন বয়সে? **আসল কারণ কি কি ছিল?**

কতজন বাপ মা আর ছেলেমেয়ে না হওয়ায় বা ঘনঘন ছেলেমেয়ে না হওয়ায় উৎসাহী, কি কি কারণে এই উৎসাহ? (পরিবার পরিকল্পনা পৃঃ ৩২৯-৩৪০ দেখুন)

পুষ্টি



কজন মা তাদের বাচ্চাদের বুকের দুধ খাওয়ায়? কত দিন ধরে? যারা বুকের দুধ পায় না সেইসব শিশুদের থেকে এদের স্বাস্থ্য কি বেশি ভালো? কেন?

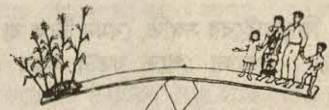
লোকে প্রধানতঃ কি কি খাবার খায়? সেগুলো কোথা থেকে আসে?

যে সব খাবার পাওয়া যায় লোকে কি তার সবগুলোই ভালোভাবে কাজে লাগায়?

কতগুলি বাচ্চার ওজন কম আছে? (পৃঃ ১৩২ দেখুন) কতগুলির মধ্যেই বা অপুষ্টির চিহ্ন দেখা যাচ্ছে? বাবামায়েরা বা স্কুলের ছেলেমেয়েরা পুষ্টি জিনিসটা যে জরুরি এ কথাটা কতটা জানেন?

কতজন খুব বেশি বিড়ি সিগারেট তামাক খায়? কতজনই বা মদ বা সোডা জাতীয় জিনিস ঘনঘন খায়? এ থেকে তাদের নিজেদের বা তাদের বাড়ির লোকের স্বাস্থ্যের কতটা ক্ষতিবৃদ্ধি হয়?

জমি ও খাদ্য



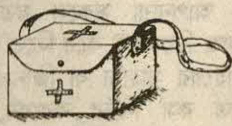
জমি থেকে যা ফসল পাওয়া যায় তা কি পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট? পরিবার যদি বাড়তেই থাকে তবে জমি থেকে পাওয়া ফসলে কতদিন কুলোবে?

চাষের জমি কেমন ভাবে ভাগ করা আছে? কজনের নিজের জমি আছে?

জমিতে বেশি ফসল ফলাবার জন্যে কি কি চেষ্টা করা হচ্ছে?

ফসল বা অন্য খাবার কেমন করে মজুত করা হয়? বেশি ক্ষয় ক্ষতি হয় কি? কি কারণে?

চিকিৎসা, স্বাস্থ্য



স্থানীয় দাই বা চিকিৎসকরা স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে কি ধরনের কাজ করেন?

কি কি পুরোনা চিকিৎসা বা ওষুধ ব্যবহার করা হয়? কোনগুলি সবথেকে কাজে লাগে? ক্ষতি বা বিপদ হতে পারে এমন কিছু কি আছে?

কাছাকাছি স্বাস্থ্যরক্ষার কি কি ব্যবস্থা আছে? সেগুলি কি ভালো? সেগুলির জন্য খরচ কিরকম পড়ে? সেগুলি লোকে কতটা ব্যবহার করে?

কতজন শিশুকে টিকে দেয়া হয়েছে? কি কি অসুখের জন্যে?

রোগ এড়াবার জন্যে আর কি কি ব্যবস্থা নেয়া হয়? আর কি কি নেয়া যায়? সেগুলি কতটা জরুরি?

নিজের পায়ে দাঁড়ানো



যে সমস্ত জিনিসের ওপর লোকের স্বাস্থ্য আর ভালো থাকা এখন বা ভবিষ্যতে নির্ভর করে তাদের মধ্যে সব চেয়ে জরুরি কোনগুলো?

লোকে তাদের স্বাস্থ্যের সাধারণ সমস্যাগুলোর মধ্যে কতগুলো নিজেরাই মেটাতে পারে? বাইরের সাহায্য বা ওষুধের ওপর তাদের কতটা নির্ভর করতে হয়?

নিজের দেখাশোনা নিজে করাটাকে আরো নিরাপদ করতে এবং আরো ভালো করে, বেশি করে কাজে লাগাতে লোকের কি আগ্রহ আছে? কেন? কি করেই বা তারা এ ব্যাপারে আরো বেশি শিখতে পারে? এ কাজে কি কি বাধা হয়ে দাঁড়ায়?

বড়লোকদের অধিকার কি কি? গরিবদেরই বা কি কি আছে? পুরুষদের? মেয়েদের? শিশুদের? এদের মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে কি ধরনের ব্যবহার করা হয়? কেন? এটা কি ন্যায্য? কোনটা বদলানো দরকার? কেই বা বদলাবে? কেমনভাবে?

লোকে সাধারণ সমস্যা মেটাতে একসঙ্গে কাজ করে কি? যখন খুব দরকার হয় তখন কি তারা সবকিছু ভাগ করে নেয় বা একে অপরকে সাহায্য করে?

আপনার গ্রামকে আরো ভালো, আরো স্বাস্থ্যকর জায়গা করে গড়ে তুলতে হলে কি কি করা যায়? কাজটা আপনারা ঠিক কোথায় শুরু করবেন?

দরকার মেটাতে স্থানীয় সঙ্গতি ব্যবহার করা

একটা সমস্যার কিভাবে মোকাবিলা করবেন তা নির্ভর করবে হাতের কাছে কি পাওয়া যাবে তার ওপর।

কিছু কাজকর্ম আছে যাতে বাইরের সঙ্গতি (জিনিসপত্র, টাকাকড়ি, লোকজন) লাগে। যেমন—টিকে দেয়ার জন্যে ওষুধ বাইরে থেকে—এমনকি প্রায়ই বিদেশ থেকে—আনতে হয়।

অন্য অনেক কাজকর্ম আছে যা কাছাকাছি যা পাওয়া যায় তাই দিয়েই পুরোপুরি চালানো যায়। হাতের কাছে যা পাওয়া যায় সেইসব জিনিস দিয়েই একটা বাড়ির বা একটা পাড়ার সব লোক মিলে একটা পুকুরের চারদিকে বেড়া লাগাতে বা কয়েকটা সাদাসিধে পায়খানা তৈরি করে নিতে পারেন।

কিছু বাইরের সঙ্গতি, যেমন টিকে বা কয়েকটা জরুরি ওষুধপত্র, লোকের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে বিরাট পরিবর্তন আনতে পারে। এগুলো পেতে যতটা সম্ভব চেষ্টা করবেন। কিন্তু সাধারণ নিয়ম হিসেবে সকলকে বলবেন :

> **কাজে লাগাও যা সব আছে**
> **যতটা পাও, হাতের কাছে।**

স্থানীয় সম্পদ পুরোপুরি ব্যবহার করতে সকলকে উৎসাহ দিন

আপনারা সকলে যতই নিজেদের কাজ নিজেরাই করে নিতে পারবেন আর বাইরের সাহায্য বা জিনিসপত্রের ওপর যত কম নির্ভর করবেন, আপনাদের সমাজ তত শক্তিশালী আর সুস্থ হয়ে উঠবে।

স্থানীয় সঙ্গতি শুধু যে দরকারের সময় হাতের কাছে পাওয়া যায় তাই নয় সেগুলি প্রায়ই সবথেকে কম খরচে সবথেকে ভালো কাজ করে। যেমন, শিশুদের বোতলে দুধ খাওয়ানোর চেয়ে বুকের দুধ খাওয়ানোয় যদি আপনি মায়েদের বেশি উৎসাহ দিতে পারেন, তার থেকে আসবে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা—আর তা আসবে একটা উঁচুদরের স্থানীয় সঙ্গতি থেকে, যা হল মায়ের দুধ! আর এর থেকে বহু শিশুকে অসুখবিসুখ আর মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোও যাবে।



বুকের দুধ—উঁচুদরের স্থানীয় সঙ্গতি টাকা দিয়ে কেনা যে কোনো জিনিসের থেকে ভালো

স্বাস্থ্যের কাজে সব সময় মনে রাখবেন :

> **স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে সবচেয়ে দামী**
> **মানুষ নিজেই, মানে তুমি আর আমি।**

কি করতে হবে আর কোথায় আরম্ভ করতে হবে ঠিক করা

প্রয়োজন আর সঙ্গতি মন দিয়ে ভালো করে বুঝে নিয়ে এবার আপনাদের ঠিক করে নিতে হবে, কোন জিনিসগুলো সবচেয়ে জরুরি আর কোনগুলো আগে করতে হবে। স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে মানুষকে সাহায্য করতে অনেক কিছুই করা যায়। কতকগুলো এখনই দরকার। অন্যগুলো, বিভিন্ন লোকের বা পুরো সমাজটার ভবিষ্যতে ভালো থাকার ব্যাপারে সাহায্য করে।

অনেক গ্রামে পুষ্টির অভাব স্বাস্থ্যের অন্য অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে। **যথেষ্ট পরিমাণে খেতে না পেলে মানুষের স্বাস্থ্য ভালো থাকতে পারে না।** অন্য যা কিছু সমস্যার কথাই আপনি ভাবুন না কেন, যদি লোকে না খেয়ে থাকে বা বাচ্চাদের পুষ্টির অভাব থাকে, আপনার প্রথম চিন্তা হবে পুষ্টির উন্নতি।

অপুষ্টির সমস্যার মোকাবিলা করার নানা পথ আছে; কারণ নানা ধরনের অনেকগুলো কারণ থেকেই এটা হয়। আপনারা সকলে মিলে ভেবে দেখুন কি কি করা আপনাদের পক্ষে সম্ভব আর কোনগুলো কাজে লাগার আশা সবচেয়ে বেশি।

পুষ্টির উন্নতির সাহায্য করতে অনেকে যে সব পথ বেছে নিয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হচ্ছে। কিছু কাজের ফল চট করে পাওয়া যায়। অন্যগুলোর কাজ চলে অনেকদিন ধরে। আপনাদের এলাকায় কোনগুলো কাজে লাগা বেশি সম্ভব, সেটা আপনাদের সকলকেই ঠিক করতে হবে।

পুষ্টির উন্নতির জন্যে কাজ করার কয়েকটি পথ

পরিবারের নিজের বাগান



ধাপে ধাপে খাল কাটা
জমি যাতে ধুয়ে না যায়



পালাপালি করে ফসল লাগানো

এক বছর অন্তর চাষের সময় এমন একটা ফসল লাগান যা মাটির শক্তি ফিরিয়ে দেয়, যেমন, বরবটি, মটরশুঁটি, মুসুরি, চিনেঘাস (আলফালফা), চিনেবাদাম বা অন্য কোনো গাছ যার বীজ শুঁটিতে থাকে।



এ বছর ভুট্টা



পরের বছর বরবটি

জমিতে জলসেচন

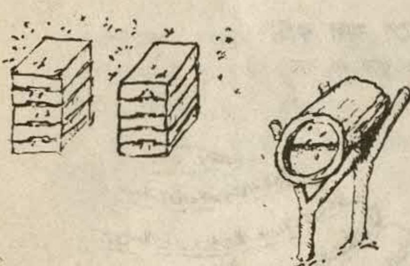


মাছের চাষ



প্রাকৃতিক সার

মৌমাছি পালন





পচানো সারের গাদা

ভালোভাবে ফসল মজুত রাখা



ছোট পরিবার



পরিবার পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে
(পৃঃ ৩২৯)

নতুন কোনো ভাবনা চিন্তা পরীক্ষা করে দেখা

একটু আগে যে সব উপায়ের কথা বলা হল তার সবগুলিই হয়তো আপনার এলাকায় কাজে লাগবে না। আপনাদের বিশেষ অবস্থা আর হাতের কাছের সঙ্গতির সঙ্গে মিলিয়ে কিছু কিছু বদলে নিলে হয়তো কয়েকটা কাজে লাগতে পারে। প্রায়ই দেখা যায় যে, কোনো কিছু কাজে লাগবে কি না তা জানবার একমাত্র উপায় হল সেটা যাচাই করে নেয়া অর্থাৎ পরীক্ষা করে দেখা।



ছোট করে শুরু করুন

যখনই নতুন কোনো ভাবনা পরীক্ষা করে দেখতে যাবেন—**সবসময় ছোট করে শুরু করবেন**। ছোট করে যদি আরম্ভ করেন, তবে পরীক্ষাটা ব্যর্থ হলে বা অন্যভাবে আবার করতে হলেও আপনার বেশি ক্ষতি হবে না। আর যদি সফল হয় তবে সেটা দেখে লোকে পরে বড় ভাবে কাজ করতে পারবে।

কোনো পরীক্ষা যদি সফল না হয় তবে হতাশ হবেন না। কিছু বদলে নিয়ে হয়তো আবার যাচাই করে দেখতে পারেন। সফলতার মতো ব্যর্থতা থেকেও শেখা যায়। কিন্তু শুরু করবেন ছোট করে।

নতুন ভাবনা নিয়ে পরীক্ষা করার একটা উদাহরণ:

আপনি শিখেছেন যে, এক ধরনের বরবটি, যেমন সয়াবীন, খুব ভালো শরীর গড়ার খাবার। কিন্তু আপনার এলাকায় কি সেটার চাষ করা যাবে? গেলেও, লোকে খাবে কি?

একটা ছোট্ট টুকরো জমি, কিংবা মাটি আর জলের অবস্থা আলাদা এমন দু তিনটে টুকরো জমি নিয়ে চাষ শুরু করুন। যদি বরবটিগুলো ভালোভাবে বেড়ে ওঠে, তবে নানাভাবে রান্না করে দেখুন লোকে খায় কি না। যদি খায়, তবে যে অবস্থায় সবচেয়ে ভালো চাষ হয়েছে, সেই রকম জমিতে আরো বেশি করে বরবটি লাগান। কিন্তু আরো ছোট ছোট টুকরো জমিতে অন্য নানারকম অবস্থায় চাষের পরীক্ষা চালিয়ে দেখুন আরো ভালো ফসল পান কি না।

অনেকগুলো অবস্থা হয়তো আপনি বদলে বদলে দেখতে চাইবেন, যেমন, মাটির ধরন, সার দেয়া, জলের পরিমাণ, বীজের রকম। কোনটা চাষের পক্ষে ভালো আর কোনটা নয় তা সবথেকে ভালোভাবে বুঝতে হলে একবারে শুধু **একটা** অবস্থা বদলাবেন, বাকিগুলো একই রাখবেন।

যেমন—গোবর সারে বরবটি চাষের উপকার হয় কি না আর সেটা কতটা ব্যবহার করতে হয় তা জানতে হলে পাশাপাশি কয়েক টুকরো জমিতে বরবটি লাগান—যেখানে জল আর রোদের অবস্থা এক; আর বীজ একই রকমের ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু বরবটি লাগানোর আগে প্রতিটি টুকরো জমিতে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ গোবর সার দিন—খানিকটা এইরকম ভাবে:



একটুও সার নেই — এক বেলচা সার — দু বেলচা সার — তিন বেলচা সার — চার বেলচা সার — পাঁচ বেলচা সার

এই পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সার দিলে উপকার হয়, কিন্তু খুব বেশি দিলে ক্ষতি হয়। এটা শুধু একটা উদাহরণ। আপনার পরীক্ষায় নানারকম ফল হতে পারে। নিজে যাচাই করে দেখুন!

মানুষ আর জমির মধ্যে ভারসাম্য রাখার জন্যে কাজ করা

স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে শিশুদের জীবন রক্ষার জন্যে যতটা পারেন ততটা করা আপনার উচিত। যদি আপনার চেষ্টার ফলে শিশুমৃত্যু কমে যায়, তবে ভবিষ্যতে ফল কি দাঁড়াবে? সমস্ত সমাজটা আর যে সব শিশুরা আসছে তারা কি ভালো থাকবে? কম মৃত্যু মানে বেশি মানুষ। সময়ে এর মানে হতে পারে খাদ্যের অভাব। কারণ একটা জমি থেকে কিছু সংখ্যক মানুষই খেতে পারে।

জমিটা যদি আরো ভালোভাবে ব্যবহার করা যায়, যাতে বেশি ফসল ফলে, তবে আপনার গ্রামের লোকসংখ্যা বেড়ে যেতে থাকলেও কিছুদিনের জন্যে খাদ্যের অভাবটা ঠেকিয়ে রাখা যায়। কিন্তু যদি বাবামায়ের অনেক ছেলেমেয়ে হয়েই চলে আর তাদের ছেলেমেয়েদের আবার বড় বড় পরিবার হয়, তবে এমন একটা সময় আসবেই যখন সকলের জন্যে যথেষ্ট জমি আর খাবার থাকবে না।

এখন শিশুদের মৃত্যু কমালে যদি ভবিষ্যতে বেশি শিশু না খেয়ে থাকে তবে সেটা হবে বড়ই দুঃখের বিষয়। কিন্তু বাপমায়ের বড় পরিবার হতে থাকলে এই জিনিসটা হতেই পারে। পৃথিবীর অনেক জায়গায় এটা এখনই ঘটছে।

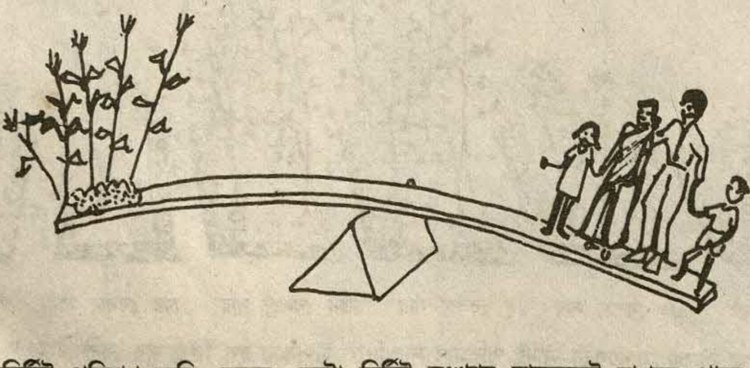
পরিবার ছোট রাখাটা যে কতটা জরুরি তা বুঝতে লোককে সাহায্য করাটা আপনার একটা অত্যন্ত দরকারি কাজ। যদি আপনাদের মধ্যে অনেকেরই নিজেদের বাড়ির লোকদের ঠিকমতো খাওয়ানোর মতো যথেষ্ট জমি না থাকে তবে এটা বিশেষভাবে দরকার।

২০ পরিচ্ছেদে পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন উপায় সম্বন্ধে তথ্য দেয়া হয়েছে। আপনার এলাকায় কোনগুলো চলবে আর কোনগুলো লোকে পছন্দ করবে, সেটা জেনে নিন। বাবামাদের আর স্থানীয় দাইদের খবরাখবর আর জিনিসপত্র পেতে সাহায্য করুন।

অনেক সময় লোকে আপনার কাছে স্বাস্থ্যের এমন সমস্যা নিয়ে আসবে যা পরিবার বড় হবার ফলেই হয়েছে। কোনো মাকে যদি দেখেন—যার একটির পর একটি বাচ্চা হচ্ছে, যাকে খুবই ক্লান্ত আর ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে বা যার বাচ্চার জন্যে বুকে দুধ হয়নি; অথবা যদি কোনো অপুষ্ট শিশুকে দেখেন, যারা অনেক ভাইবোন আর খুব গরিব, সেই সব বাবামায়ের সঙ্গে পরিবার পরিকল্পনার বিষয়ে কথা বলবেন। অনেক মা আর বাচ্চা চায় না, কিন্তু প্রশ্ন না করলে নিজে থেকে কিছু বলতেও চায় না।

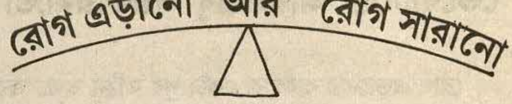
রোগ এড়ানোর সব উপায়ের মধ্যে **পরিবার পরিকল্পনাটা খুবই জরুরি**। লোকে যদি জমির ন্যায্য ভাগাভাগি করতে আর পরিবার ছোট রাখতে না শেখে, তবে রোগ এড়ানোর অন্য সবরকম চেষ্টার ফল এই দাঁড়াবে যে, আরো বেশি লোক না খেয়ে থাকবে।

শিশুমৃত্যু কমানোর কাজের সাথে, ভাই,
শিশুর জন্ম কম রাখবার কথাও বলা চাই।
বাচ্চা যদি হয়েই চলে, সংখ্যা বাড়ে আরো,
খাওয়া, পরা, শিক্ষা তাদের জুটবে নাকো কারো॥



নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি কেবল একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার মানুষকেই রাখতে পারে

রোগ এড়ানো আর রোগ সারানোর মধ্যে ভারসাম্য রাখার জন্যে কাজ করা



রোগ সারানো আর রোগ এড়ানোর মধ্যে ভারসাম্য রাখার মানে হল এখনই যা দরকার আর চিরকাল যা দরকার তার মধ্যে ভারসাম্য রাখা।

স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে আপনার কাজ হল লোকের কাছে যাওয়া, তাদের সঙ্গে তাদের মতে কাজ করা আর তারা যেগুলো প্রয়োজন বলে মনে করছে সেগুলো মেটাতে তাদের সাহায্য করা। প্রায়ই লোকের প্রথম চিন্তা হয় রুগ্ন আর অসুস্থ লোকের কষ্ট দূর করা নিয়ে। কাজেই **আপনার একটা প্রধান কাজ হবে রোগ সারাতে লোককে সাহায্য করা।**

কিন্তু ভবিষ্যতের দিকেও তাকাতে হবে। লোকে তখনই যেটা দরকার বলে মনে করছে তার ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে তাদের সাহায্য করবেন। তাদের এটা বুঝতে দিন যে, অনেক রোগ এড়ানো যায় আর এই এড়াবার ব্যবস্থা তারা নিজেরাই নিতে পারে।

কিন্তু সাবধান! কখনো কখনো স্বাস্থ্যের পরিকল্পনা বা কাজ যাঁরা করেন তাঁরা এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে ফেলেন। ভবিষ্যতে রোগ এড়াবার আগ্রহে, এখন যে অসুখ আর কষ্ট রয়েছে সেগুলোকে তাঁরা গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু লোকে যা দরকার বলে মনে করছে তাতে সাড়া না দিলে তাদের সহযোগিতা পাওয়া যায় না। তাতে রোগ এড়ানোর কাজও অনেকটা ব্যর্থ হয়ে যায়।

চিকিৎসা আর রোগ এড়ানো সাথে সাথে চলে। সাধারণতঃ, গোড়ার দিকে চিকিৎসা করলে অল্প অসুখ সাংঘাতিক হয়ে উঠতে পারে না। যদি স্বাস্থ্যের অনেক সাধারণ সমস্যা চিনতে আর সময় থাকতে নিজের বাড়িতেই সেগুলোর চিকিৎসা করতে লোককে সাহায্য করেন, তবে অনেক কষ্টই এড়ানো যাবে।

সময় থাকতে রোগ সারানো
রোগ এড়ানোর উপায় জেনো।

যদি লোকের সহযোগিতা চান, **তারা যেখানে আছে সেখানেই কাজ শুরু করুন।** চিকিৎসা আর রোগ এড়ানো—দুটোই এমনভাবে বজায় রাখুন, যা লোকে মেনে নেবে। এটা অনেকটাই নির্ভর করবে রোগ, চিকিৎসা আর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে লোকের এখনকার মনোভাবের ওপর। লোকে যখন অনেকটা সামনে তাকাতে শিখবে, তাদের মনোভাব বদলে যাবে; অনেক রোগও যখন কমে আসবে, তখন হয়তো দেখবেন যে, ভারটা আপনা থেকেই রোগ এড়ানোর দিকে ঝুঁকে গেছে।

যে মায়ের শিশু অসুস্থ তাকে যদি আপনি বলেন যে, রোগ এড়ানোটা চিকিৎসার চেয়ে বেশি দরকারি সে আপনার কথা শুনবে না। কিন্তু তার শিশুর শুশ্রূষায় তাকে সাহায্য করার সময় আপনি তাকে বলতে পারেন যে, রোগ এড়ানোটাও সমান জরুরি।

চেষ্টা চালিয়ে যাও রোগজ্বালা এড়াতে;
কিন্তু যেওনা যেন জোর তাতে খাটাতে॥

চিকিৎসাকে রোগ এড়ানোর দরজা হিসেবে ব্যবহার করুন। লোকে যখন চিকিৎসার জন্যে আসে, তখনই হল রোগ এড়ানো সম্বন্ধে কথা বলার একটা চমৎকার সময়। যেমন, যদি কোনো মা কৃমির জন্যে তার শিশুকে নিয়ে আসে, কেমন করে কৃমির চিকিৎসা করতে হয় তাকে যত্ন করে বোঝাবেন। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে, একটু সময় নিয়ে, মা ও শিশু দুজনকেই বুঝিয়ে দিন কৃমি কেমন করে ছড়ায় আর সেটা এড়াতে তারা কি কি করতে পারে (১৩ পরিচ্ছেদ দেখুন)। মাঝে মাঝে তাদের বাড়ি গিয়ে দেখুন, দোষ ধরতে নয়—বরং পরিবারটিকে নিজেদের যত্ন আরো ভালো করে নিতে সাহায্য করতে।

যখনই যাবে রোগ সারাতে,
শিখিয়ে দেবে রোগ এড়াতে।

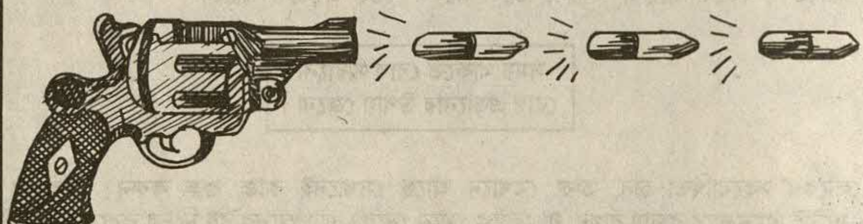
ভেবেচিন্তে আর শুধু দরকারমতো ওষুধের ব্যবহার

রোগ এড়ানোর ব্যবস্থার একটা খুব কঠিন অথচ জরুরি দিক হল লোককে ওষুধপত্র ভেবেচিন্তে আর সীমা রেখে ব্যবহার করতে শেখানো। কয়েকটা আধুনিক ওষুধ খুবই জরুরি; তারা প্রাণ বাঁচাতে পারে। কিন্তু **বেশির ভাগ রোগে কোনো ওষুধ দরকার হয় না**। ঠিকমতো বিশ্রাম, ভালো খাওয়াদাওয়া আর হয়তো কয়েকটা সাদাসিধে ঘরোয়া ওষুধ পেলে শরীর নিজেই রোগের সঙ্গে লড়ে যেতে পারে।

লোকে দরকার না থাকলেও ওষুধের জন্যে আপনার কাছে আসতে পারে। তাদের খুশী করতে, কিছু একটা ওষুধ দিয়ে দেবার লোভ আপনারও হতে পারে। কিন্তু যদি দেন, আর তারা ভালো হয়ে যায়, তাহলে তারা ভাববে যে আপনি ওষুধ দিয়ে তাদের ভালো করেছেন। আসলে তাদের শরীর নিজে থেকেই ঠিক হয়ে গেছে।

অদরকারি ওষুধের ওপর নির্ভর করতে লোককে না শিখিয়ে বরং একটু সময় নিয়ে তাদের বোঝান **কেন** যখন তখন ওষুধ ব্যবহার করা উচিত নয়। আর রোগীকে বলুন রোগ সারাতে **সে নিজে কি করতে পারে**।

এইভাবে আপনি লোককে ওষুধের মতো একটা বাইরের সঙ্গতির ওপর নির্ভর না করে নিজের সামর্থ্যের ওপর ভরসা করতে সাহায্য করবেন। কারণ **এমন কোনো ওষুধ নেই যার ব্যবহারে কোনো ঝুঁকি নেই**।



মনে রাখবেন: ওষুধ মেরে ফেলতেও পারে

স্বাস্থ্যের তিনটে সমস্যা আছে সেগুলোর জন্যে লোকে প্রায়ই অদরকারি ওষুধ চায়। সেগুলো হল,—(১) সাধারণ সর্দি, (২) অল্প কাশি আর (৩) পাৎলা পায়খানা।

সাধারণ সর্দির সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা হল বিশ্রাম, প্রচুর তরল খাবার, বড় জোর এসপিরিন খাওয়া। পেনিসিলিন, টেট্রাসাইক্লিন এইসব এনটিবায়োটিকে কোনো কাজ হয় না (পৃঃ ২০০ দেখুন)।

অল্প কাশির জন্যে—এমনকি বেশ জোর কাশির সঙ্গে পুরু কফ থাকলেও, প্রচুর জল খেলে শ্লেষ্মা তরল হয়ে যায় আর কাশির সিরাপের চেয়ে কাশি সারায় অনেক তাড়াতাড়ি আর ভালোভাবে। গরম জলের ভাঁপ শ্বাসের সঙ্গে নিলে আরো কাজ হয় (পৃঃ ২০৫ দেখুন)। লোককে কাশির সিরাপ বা অন্য অদরকারি ওষুধের ওপর নির্ভর করতে দেবেন না।

শিশুদের পাৎলা পায়খানা হলে বেশির ভাগ সময়ে ওষুধ ব্যবহার করলে ফল হয় না। কতকগুলো ওষুধে, যা প্রায়ই ব্যবহার করা হয়, (নিওমাইসিন, স্ট্রেপটোমাইসিন, কেওলিন পেকটিন, **লোমোটিল**, **এন্টারোভায়োফর্ম**, ক্লোরামফেনিকল) ক্ষতিও হতে পারে। এ রোগে যা সবচেয়ে জরুরি তা হল—শিশু যেন প্রচুর তরল জিনিস আর অন্য খাবার খায় (পৃঃ ১৮৬ থেকে ১৮৭ দেখুন)। **শিশুর ভালো হয়ে ওঠার চাবিকাঠিটি হল তার মা—ওষুধ নয়।** এটা বুঝতে আর কি কি করতে হবে সেটা শিখতে যদি মায়েদের সাহায্য করেন, অনেক শিশুর প্রাণ বাঁচবে।

ওষুধ প্রায়ই অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়। এটা ডাক্তাররাও করেন আবার সাধারণ লোকেও করে থাকে। এটা খুবই দুঃখের বিষয়, কারণ:

- এতে অপচয় হয়
- এতে অদরকারি (অনেক সময় সাধ্যের বাইরের) জিনিসের ওপর লোকে নির্ভর করে।
- প্রত্যেক ওষুধের ব্যবহারে ঝুঁকি আছে। কোনো অদরকারি ওষুধে রোগীর ক্ষতিই হতে পারে—এ ভয়টা থেকেই যায়।
- তাছাড়া এমন অনেক ওষুধ আছে, যেগুলোকে ছোটখাট অসুখে ঘনঘন ব্যবহার করতে থাকলে, সাংঘাতিক অসুখের সঙ্গে যুদ্ধ করবার ক্ষমতা তারা হারিয়ে ফেলে।

ওষুধের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলার একটা উদাহরণ হল ক্লোরামফেনিকল। এই জরুরি অথচ বিপজ্জনক এনটিবায়োটিক ছোটখাট সমস্যায় অতিরিক্ত ব্যবহার করার ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, পৃথিবীর অনেক জায়গায় টাইফয়েডের জ্বরের মতো একটা সাংঘাতিক জীবাণুর আক্রমণের বেলায় এটা আর কাজ করে না। ক্লোরামফেনিকলের অতিরিক্ত আর ঘনঘন ব্যবহারের ফলে টাইফয়েডের জীবাণু আর এতে ধ্বংস হয় না।

এই সমস্ত কারণে ওষুধের ব্যবহার কমিয়ে ফেলা উচিত।

কিন্তু কেমন করে? খুব কড়া আইন কানুন করে বা খুব শিক্ষিত লোকদের হাতে ওষুধের ব্যবহার ছেড়ে দিয়ে—কোনোভাবেই অতিরিক্ত ওষুধ ব্যবহার করা বন্ধ করা যায়নি। সাধারণ লোকে যখন ব্যাপারটা ভালো করে বুঝবে, তখনই কেবল সব জায়গায় ওষুধ ভেবেচিন্তে আর দরকারমত ব্যবহার করা হবে।

ওষুধ বিষুধ সব অসুখে বিসুখে,
ঠিক ঠিক ব্যবহার করে যেন লোকে।
এই কথা ভালো করে লোককে শেখানো,
স্বাস্থ্যকর্মীর খুব বড় কাজ জেনো ॥

যে সব এলাকায় আধুনিক ওষুধ ইতিমধ্যেই বড় বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে সেখানে এটা বিশেষভাবে সত্যি।



ওষুধের দরকার না থাকলে, একটু সময় নিয়ে কারণটা বোঝান।

ওষুধের ব্যবহার আর অপব্যবহার সম্বন্ধে আরো তথ্যের জন্যে ৬ পরিচ্ছেদ দেখুন, পৃঃ ৬১। ইনজেকশনের ব্যবহার আর অপব্যবহারের জন্যে ৯ পরিচ্ছেদ দেখুন, পৃঃ ৭৭। ভেবেচিন্তে ঘরোয়া ওষুধ ব্যবহারের জন্যে ১ পরিচ্ছেদ দেখুন।

কতটা উন্নতি হয়েছে তা খতিয়ে দেখা (মূল্যায়ন)

স্বাস্থ্যের কাজে, মাঝে মাঝে যদি মন দিয়ে দেখেন আপনারা **কোন** কাজ **কতটা** করতে পেরেছেন তাহলে উপকার হবে। আপনাদের সমাজে স্বাস্থ্য আর সুস্থতার উন্নতির কাজে কোনো পরিবর্তন বা কতটা পরিবর্তন এসেছে?

যে সমস্ত কাজকর্মের পরিমাণ মাপা যায়, সেগুলি প্রতিমাসে বা প্রতিবছরে লিখে রাখতে পারেন। যেমন:

- কটা বাড়িতে পায়খানা তৈরি করা হয়েছে?
- কটা পরিবারের লোক তাদের জমি আর ফসলের উন্নতির কাজে হাত লাগিয়েছে?
- কতজন মা আর শিশু, নিয়মিত পরীক্ষা আর শিক্ষার জন্যে, ৫ বছরের নিচের শিশুদের কর্মসূচীতে যোগ দিয়েছে?

এই ধরনের প্রশ্ন থেকে **কিরকম কাজ হয়েছে** তা মেপে নিতে সুবিধা হয়। কিন্তু এইসব কাজকর্মে স্বাস্থ্যের **কতটা ক্ষতিবৃদ্ধি** হয়েছে তা জানতে হলে অন্য কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর জানা দরকার। যেমনঃ

- পায়খানা তৈরি হওয়ার আগের অবস্থার তুলনায় গতমাসে বা বছরে কতজন শিশুর পাৎলা পায়খানা বা কৃমি হয়েছে?
- উন্নত ব্যবস্থা নেবার আগের অবস্থার তুলনায় এ বছরে কতটা ফসল (ভুট্টা, বরবটি ইত্যাদি) ফলেছে?
- ৫ বছরের নিচের শিশুদের কর্মসূচী নেবার আগের অবস্থার তুলনায় এখন "স্বাস্থ্যের পথ" নক্সায় (পৃঃ ৩৪৩) কতগুলি শিশুর স্বাভাবিক ওজন রয়েছে বা ওজন বাড়তে দেখা যাচ্ছে?

কোনো কাজ ঠিক হয়েছে কি না বিচার করতে গেলে কাজের আগের এবং পরের কতকগুলো খবর যোগাড় করতে হয়। যেমন, শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানোটা যে কত জরুরি সে কথা যদি মায়েদের শেখাতে চান, তবে প্রথমে ঠিক কতজন মা বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে, গুনে রাখুন। তারপর শিক্ষার কাজ শুরু করুন আর প্রতি বছর একবার করে হিসেব নিন। এইভাবে, আপনার শিক্ষার কতটা ফল হয়েছে তার একটা ভালো ধারণা পাওয়া যাবে।

কয়েকটা লক্ষ্য স্থির করে ফেলা ভালো। যেমন আপনাদের স্বাস্থ্যসমিতি স্থির করতে পারে যে, এক বছরের মধ্যে সবকটি পরিবারের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগের বাড়িতে পায়খানা তৈরি হয়ে যাবে। প্রত্যেক মাসে একবার করে গুনে নিন। যদি ৬ মাস পরে মাত্র ৩০ ভাগ বাড়িতে পায়খানা তৈরি হয়ে থাকে, তবে জানবেন যে, লক্ষ্যে পৌছতে গেলে আপনাদের অনেক বেশি খাটতে হবে।

লোককে কাজের লক্ষ্য দাও, যেটা তাদের ছুঁতে হবে;
খাটবে সবাই অনেক বেশি, দেখবে সুফল মিলবে তবে।

স্বাস্থ্যের কাজ খতিয়ে দেখতে হলে কাজের **আগে**, কাজের **সময়** আর কাজের **পরে** কতকগুলো জিনিস গুনে নিলে বা মেপে নিলে সুবিধা হয়।

কিন্তু মনে রাখবেন: **স্বাস্থ্যের কাজের সবচেয়ে জরুরি দিকটা মাপা যায় না।** সেটা হল আপনাদের পরস্পরের সম্পর্ক; সকলে একসঙ্গে শেখা আর কাজ করা; দয়ামায়া; দায়িত্ববোধ; সব কিছু ভাগ করে নেয়া; আর আশা রাখা। এগুলো মেপে দেখতে পারবেন না। কিন্তু পরিবর্তন কতটা হয়েছে তা ভেবে দেখার সময় এগুলোর কথা মনে রাখবেন।

সকলে মিলে শেখা আর শেখানো
শিক্ষক হিসেবে স্বাস্থ্যকর্মী

ক্রমশঃ যখন বুঝতে পারবেন স্বাস্থ্যের সঙ্গে কত জিনিসের সম্পর্ক রয়েছে তখন হয়তো আপনার মনে হবে যে, স্বাস্থ্যকর্মীর কাজটা একটা অসম্ভব ব্যাপার। আর সত্যিই, যদি সকলের স্বাস্থ্যের দেখাশোনার কাজটা আপনি একাই করার চেষ্টা করেন, বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারবেন না।

> **বড় বদল ঘটবে তখন,**
> **মানুষ নিজের থেকেই যখন**
> **স্বাস্থ্য সেবায় হাত লাগাবে,**
> **ঘরের, পরের দায়টা নেবে।**

শুধু একজন কাজে লাগলে সমাজের ভালো হবে না, সকলকেই দরকার। এটা ঘটাতে গেলে, দায়িত্ব আর জ্ঞান সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হবে। এইজন্যেই **স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে আপনার প্রথম কাজ হল শিক্ষা দেয়া**—শিশুদের বাবামাদের, চাষীদের, শিক্ষকশিক্ষিকাদের, অন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের—যাকে পারবেন তাকে শেখাবেন।

যে সব কাজ শিখে নেয়া যায় তার মধ্যে শিক্ষা দেয়ার বিদ্যেটা সবচেয়ে জরুরি। শিক্ষা দেয়া মানে অন্যকে উন্নতি করতে সাহায্য করা আর নিজে তাদের সঙ্গে উন্নতি করা। **যে অন্যের মাথায় ধারণা ঢুকিয়ে দেয় সে ভালো শিক্ষক নয়; সেই আদর্শ শিক্ষক যে অন্যদের, নিজেদের ধারণার উন্নতি করতে, নিজে নিজে নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করতে, সাহায্য করে।**

শেখানো আর শেখা যে, শুধু স্কুল বাড়িতে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চলবে তা নয়; বাড়িতে, মাঠে, রাস্তায় সবজায়গায় এগুলো চলা উচিত। স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে রোগীর চিকিৎসা করার সময় আপনি হয়তো শিক্ষা দেবার একটা খুব ভালো সুযোগ পাবেন। কিন্তু ভাবনাচিন্তার দেয়ানেয়া, সব কিছু ভাগ করে নেয়া, কোনো কাজ করে দেখানো, লোককে একসঙ্গে ভাবতে আর কাজ করতে সাহায্য করা, এসবের কোনো সুযোগ কখনো হাতছাড়া করবেন না।

পরের কয়েকটি পৃষ্ঠায় কয়েকটি জিনিসের কথা বলা হবে যেগুলো আপনাকে এই কাজে সাহায্য করতে পারে। এগুলো শুধু প্রস্তাব; আপনার নিজের অন্য অনেক ধারণা থাকতেই পারে।

স্বাস্থ্যের দেখাশোনার দুটি পথ



র্ভরশীলতা বাড়ে, স্বাধীনতা কমে যায়
ন্যদের ওপর খবরদারী করলে লোকের

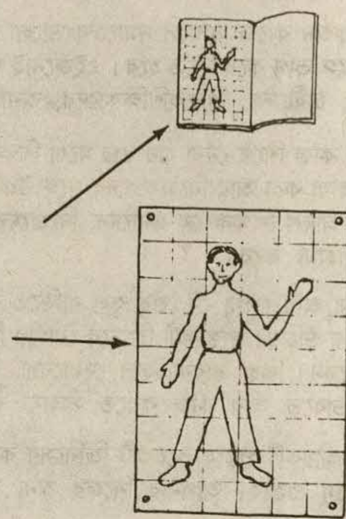
সকলকে নিজের দেখাশোনা করতে শেখান তবেই নিজের পায়ে দাঁড়াতে আর সকলকে সমান ভাবতে লোকে সাহস পাবে।

শেখানোর সাজসরঞ্জাম



ফ্লানেল গ্রাফ ছোট ছোট দলের সঙ্গে কথা বলার জন্যে বেশ ভালো, কারণ এতে নতুন নতুন ছবি তৈরি করা যায়। একটা চৌকো বোর্ড বা এক টুকরো কার্ডবোর্ড একটা ফ্লানেলের কাপড় দিয়ে ঢেকে দিন। নানা রঙের আঁকা ছবি বা ফোটো তার ওপর লাগাতে পারেন। ছবি কেটে নিয়ে তার পেছনে শিরীষ কাগজ বা ফ্লানেলের ফালি আঠা দিয়ে লাগিয়ে নিলে ফ্লানেলবোর্ডে আটকে রাখার সুবিধা হবে।

পোস্টার আর প্রদর্শনী। "একটা ছবির দাম একহাজার কথার সমান"। সাদাসিধে কয়েকটি ছবি, তাতে দুচারটে দরকারী কথা থাকতে বা নাও থাকতে পারে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা অন্য যে কোনো জায়গায় যেখানে লোকের চোখে পড়বে, টাঙ্গিয়ে দেয়া যেতে পারে। এই বইয়ের কিছু ছবি নকল করে নিতে পারেন।



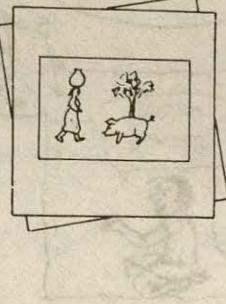
যদি কত বড় আর কেমন ছবি হবে ঠিক করতে অসুবিধে হয়, তবে যে ছবিটা নকল করতে চান তার ওপর হালকা করে পেনসিল দিয়ে সমান করে অনেকগুলো চৌখুপি আঁকুন।

এবার পোস্টার কাগজ বা কার্ডবোর্ডের ওপর একই সংখ্যার চৌখুপি হালকাভাবে, কিন্তু বড় করে আঁকুন। তারপর চৌখুপি মিলিয়ে ছবিটা নকল করুন।

সম্ভব হলে গ্রামের শিল্পীদের দিয়ে পোস্টার আঁকিয়ে বা রং করিয়ে নেবেন। কিংবা ছোটদের দিয়ে নানাধরনের পোস্টার আঁকান।



মডেল দিয়ে আর হাতেকলমে শেখানো—চিন্তা ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। যেমন, যদি কচি বাচ্চার নাড়ি কাটার সময় যত্ন নেবার সম্বন্ধে মায়েদের আর দাইদের সঙ্গে কথা বলতে চান, বাচ্চা বোঝাতে একটা পুতুল তৈরি করে নিতে পারেন। তার পেটে একটা কাপড়ের তৈরি নাড়ি গেঁথে দিন। অভিজ্ঞ দাইরা অন্যদরে হাতেকলমে শেখাতে পারবেন।



রঙিন স্লাইড ছবি আর ছোট ফিল্ম—স্বাস্থ্যের নানা বিষয়ের ওপর পৃথিবীর অনেক জায়গার জন্যে বিশেষভাবে তৈরি করা হয়। কতকগুলো একসঙ্গে থাকে, তাতে একটা গল্প বলা হয়। চোখ লাগিয়ে দেখার যন্ত্র বা ব্যাটারি দিয়ে চালানো যায় এমন প্রোজেক্টারও পাওয়া যায়।

আপনাদের গ্রামে স্বাস্থ্যশিক্ষায় ব্যবহার করার জন্যে শিক্ষার সরঞ্জাম ওয়েষ্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেল্‌থ্‌ এসোসিয়েশন-এ পাওয়া যায়।

পৃঃ ৪৩৭ থেকে ৪৪০ তে দেয়া ঠিকানাগুলিও দয়া করে দেখে নিন।

গল্প বলা : কোনো কিছু বুঝিয়ে বলতে যখন অসুবিধে হয়, একটা গল্প, বিশেষতঃ যদি সেটা সত্যি হয়, সহজেই কথাটা বলে দেয়।

যেমন : আমি যদি আপনাকে বলি যে, কখনো কখনো একজন গ্রামকর্মী ডাক্তারের থেকে ভালোভাবে রোগ ধরতে পারে, আপনি হয়তো আমাকে বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু আমি যদি আপনাকে যমুনা নামে একজনের কথা বলি যে, আমোদপুর নামে একটা গ্রামে কাজ করে, আপনি হয়তো ব্যাপারটা বুঝবেন।

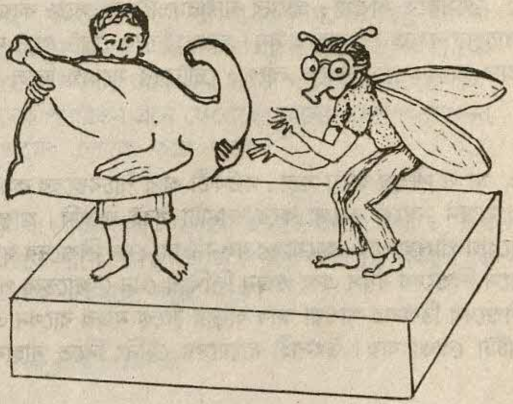
একদিন একটি ছোট্ট রুগ্ন শিশু পুষ্টিকেন্দ্রে এলো। তার পুষ্টির অভাব হওয়াতে তাকে কাছের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারকে দেখানো হয়েছিল। তার কাশিও ছিল; ডাক্তার তাকে একটা কাশির ওষুধ দিয়েছিলেন।

বাচ্চাটাকে নিয়ে যমুনা খুব ভাবনায় পড়ল। সে তাদের বাড়ি গিয়ে জানতে পারল যে, বাচ্চাটির বড় ভাই অনেকদিন ধরে অসুস্থ ছিল আর তার কাশির সঙ্গে রক্ত উঠত। যমুনা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে ডাক্তারকে বলল যে, তার ভয় হচ্ছে বাচ্চাটার যক্ষ্মা হয়েছে। পরীক্ষা করে দেখা গেল যমুনার কথাই ঠিক। তাহলেই দেখুন, স্বাস্থ্যকর্মী ডাক্তারের আগেই অসুখটা ধরেছিল—কারণ সে ওইসব লোককে চিনত আর তাদের বাড়ি যেত।

শিক্ষার ব্যাপারটাকে গল্প আরো মজাদার করে তোলে। স্বাস্থ্যকর্মীরা গল্প ভালো বলতে পারলে খুব সুবিধে হয়।

নাটক অভিনয় : যে সব গল্পে জরুরি কথা থাকে সেগুলো আরো জোরদার হয় যদি নাটক করে দেখানো হয়। আপনি, স্কুলের শিক্ষক বা স্বাস্থ্য সমিতির একজন মিলে ছেলেমেয়েদের নিয়ে ছোট ছোট নাটিকা বা নক্সা তৈরি করতে পারেন।

যেমন : অসুখ ছড়ানো বন্ধ করতে হলে খাবার জিনিস মাছির হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়—এটা বোঝাতে ছোট ছোট কয়েকটি ছেলেমেয়ে মাছি সেজে খাবারের চারদিকে ভনভন করে ঘুরতে পারে। মাছিরা আঢাকা খাবার নোংরা করল। তারপর সেটা খেয়ে ছেলেমেয়েরা অসুস্থ হয়ে পড়ল। কিন্তু জালের আলমারিতে খাবার থাকলে মাছি ঢুকতে পারে না। সেই খাবার যে ছেলেমেয়েরা খেল তারা সুস্থ থাকল।



**ভাবনাচিন্তা ছড়িয়ে দেবার যতই উপায় বার করবে,
বুঝবে, মনে রাখবে লোকে, কথাগুলো মনে ধরবে।**

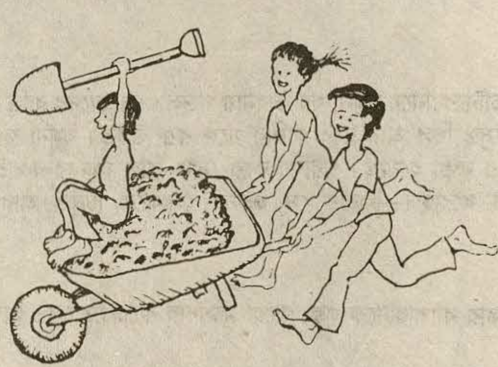
সকলের ভালোর জন্যে একসঙ্গে কাজ করা আর শেখা

সাধারণ দরকার মেটাতে একসঙ্গে কাজ করতে লোককে উৎসাহ দিন। এর কয়েকটা উপায়:

১. **গ্রাম স্বাস্থ্য সমিতি**: সমাজের উন্নতি করার জন্যে জঞ্জাল ফেলার গর্ত বা পায়খানা তৈরি—এই ধরনের কাজ করতে কয়েকজন শক্ত সমর্থ আগ্রহী লোককে গ্রামের লোকেরাই বেছে নিতে পারেন। স্বাস্থ্যকর্মীর উচিত স্বাস্থ্য সমিতির সকলের সঙ্গে কাজের দায়িত্ব ভাগ করে নেয়া।

২. **দল বেঁধে আলোচনা**: মায়েরা বাবারা, স্কুলের ছেলেমেয়েরা, অল্পবয়সীরা, গ্রামের চিকিৎসকরা বা অন্য ধরনের লোকে ছোট ছোট দল করে স্বাস্থ্যের প্রয়োজন বা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য হবে ভাবনাচিন্তা ভাগ করে নেয়া এবং যা আগে থেকেই জানেন তার উন্নতি করা।

৩. **কাজের উৎসব**: জলের ব্যবস্থা করা বা গ্রাম পরিষ্কার করার মতো সমাজের কাজ খুব তাড়াতাড়ি আর ফুর্তিতে হয়ে যায়, যদি সবাই হাত লাগায়। নানারকম খেলা, পাল্লা দেয়া, খাওয়াদাওয়া, ছোটখাট পুরস্কার থাকলে কাজটা খেলা হয়ে দাঁড়ায়। কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগান।



৪. **সমবায়**: যন্ত্রপাতি, গুদামের জায়গা, এমনকি জমিও যদি ভাগ করে নেয়া যায় তবে খরচ কম হয়। সহযোগিতা থাকলে সকলেরই ভালো হয়।

৫. **ক্লাসঘরে যাওয়া**: গ্রামের মাষ্টারমশাইদের সঙ্গে কাজ করুন; হাতেকলমে শিখিয়ে আর নাটক অভিনয় করে স্বাস্থ্যের কাজে উৎসাহ আনুন। ছাত্রছাত্রীদের ছোট ছোট দলকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসতে বলুন। ছোটরা চট করে শেখে আর অনেকভাবে কাজে লাগে। ছোটদের সুযোগ দিলে তারা খুশী হয় আর সমাজের দামী সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়।

৬. **মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সভা**: গর্ভবতী আর পাঁচবছরের কম বয়সের শিশুর মায়েদের, নিজেদের আর শিশুদের স্বাস্থ্যের প্রয়োজন সম্বন্ধে ভালো করে জানাটা খুবই জরুরি। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়মিত গেলে স্বাস্থ্য পরীক্ষা আর শেখা দুয়েরই সুযোগ পাওয়া যায়। মায়েদের বলুন তাঁরা যেন শিশুদের স্বাস্থ্যের খবর লেখা কাগজ কাছে রাখেন, প্রত্যেক মাসে নিয়ে এসে শিশুদের বয়স এবং ওজন লিখিয়ে নেন ("স্বাস্থ্যের পথ" নক্সা পৃঃ ৩৪৩)। নক্সাটা বুঝতে পারলে মায়েরা তাদের শিশুদের ঠিকমত খাওয়া আর বাড়ার দিকে নজর রাখেন এবং তাতে বেশ গর্ব বোধ করেন। লেখাপড়া না জানলেও চার্টটা বোঝা যায়। উৎসাহী মায়েদের ট্রেনিং দিতে সাহায্য করে তাদের দিয়ে এইসব কাজ শুরু করাতে পারেন।

৭. **বাড়ি বাড়ি যাওয়া**: লোকের বাড়িতে বন্ধুভাবে গিয়ে দেখা করুন। যাদের বিশেষ সমস্যা আছে, যারা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বেশি আসে না, যারা সকলের সঙ্গে মিলে কাজ খুব বেশি করে না, তাদের বাড়ি বেশি যাবেন। কিন্তু লোকের নিজস্ব ব্যাপারের ওপর শ্রদ্ধা রাখবেন। বন্ধুভাবটা বজায় না থাকলে যাবেন না—যদি না শিশুদের বা অসহায় লোকদের কোনো বিপদের ভয় থাকে।

স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে দেখবেন যে, লোকের স্বাস্থ্য উন্নতির কাজে আপনার সফলতা নির্ভর করে, যতটা আপনি কত ভালো শিক্ষক তার ওপর, আপনার ডাক্তারি বা অন্য কোনো বিদ্যার ওপর ততটা নয়। কারণ সমাজের সমস্ত লোক একসঙ্গে কাজে লাগলে তবেই বড় বড় সমস্যা পার হওয়া যায়।

লোককে যা বলা হয় তা থেকে তারা বেশি শেখে না; বেশি শেখে একসঙ্গে যা চিন্তা করে, বোঝে, আলোচনা করে, দেখে আর কাজে করে, তাই থেকে।

কাজেই, ভালো শিক্ষক টেবিলের পেছনে বসে লোকের দিকে কথা ছোঁড়েন না। তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলেন আর কাজ করেন। তিনি লোককে তাদের প্রয়োজনের কথা পরিষ্কারভাবে ভাবতে আর সেগুলো মেটাবার লাগসই উপায় বার করতে সাহায্য করেন। তিনি খোলাখুলি আর বন্ধুভাবে চিন্তা ভাগ করে নেবার প্রতিটি সুযোগ খুঁজে নেন।



লোকের সঙ্গে কথা বলুন — *তাদের দিকে নয়*

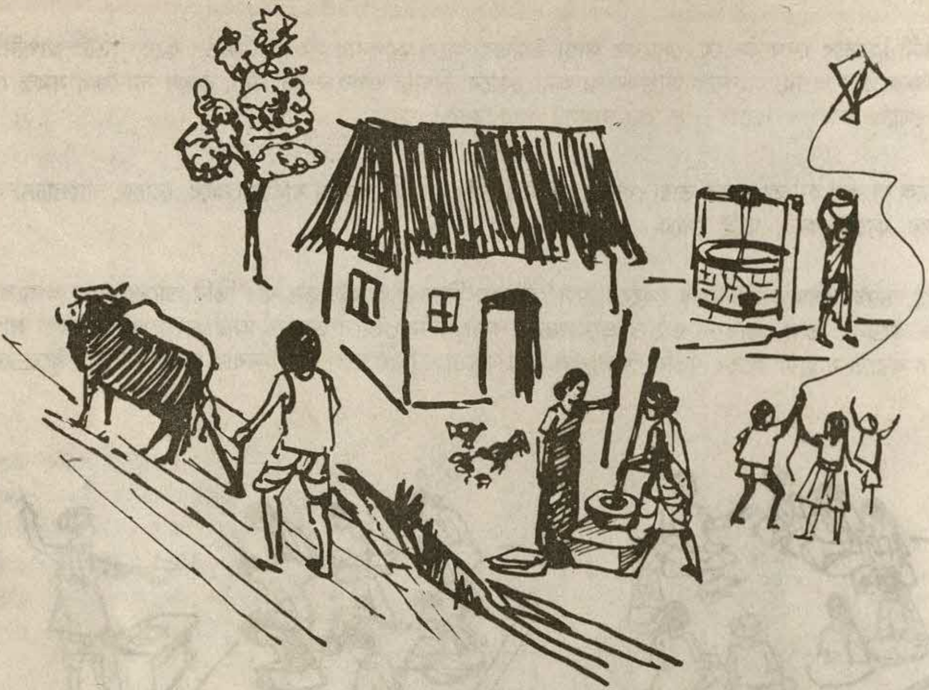
স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে হয়তো আপনার সবচেয়ে জরুরি কাজ হবে নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে লোকের চেতনা জাগিয়ে তোলা ...... নিজেদের ওপর বিশ্বাস আনতে তাদের সাহায্য করা। কখনো কখনো ভালো না লাগলেও কিছু ব্যাপার গ্রামের লোকে বদলায় না—কারণ তারা চেষ্টা করে না। তারা প্রায়ই নিজেদের অজ্ঞান আর অক্ষম ভাবে। কিন্তু তা তো তারা নয়। লিখতে পড়তে না জানলেও বেশিরভাগ গ্রামের লোকের আশ্চর্য জ্ঞান আর পটুতা থাকে। তারা যন্ত্রপাতি জমি বা নিজেদের তৈরি জিনিস দিয়ে ইতিমধ্যেই চারিদিকে অনেক পরিবর্তন এনে ফেলেছে। অনেক লেখাপড়া জানা লোক যা করতে পারে না, তেমন অনেক জরুরি কাজ গ্রামের লোকে করে থাকে।

যদি লোককে বুঝতে দেন যে, এর আগেই তারা কতটা জানে বা চারিদিকের পরিবর্তন আনতে কতটা করেছে, তবে তারা হয়তো বুঝবে যে, তারা আরো বেশি কাজ শিখতে আর করতে পারে। স্বাস্থ্য ভালো রাখতে আর সুস্থ থাকতে বড় বড় পরিবর্তন আনার ক্ষমতা তাদের মধ্যেই আছে, যদি তারা একসঙ্গে কাজ করে।

এখন কি করে এসব কথা লোককে বলবেন? প্রায়ই পেরে উঠবেন না!

তবে সকলকে আলোচনায় এনে তাদের নিজেদের দিয়েই এসবের কিছু কিছু বার করিয়ে নিতে পারেন। নিজে বেশি কিছু বলবেন না, কয়েকটা প্রশ্ন করে আলোচনা শুরু করিয়ে দিন। কিছু পরে একটি চাষী পরিবারের যে ছবিটি রয়েছে, সেটার মতো সাদাসিধে কিছু ছবি দিয়ে কাজ হতে পারে। আপনার নিজের এলাকায় যেসব বাড়িঘর, লোকজন, জন্তুজানোয়ার আর ফসল আছে, যতটা সম্ভব সেগুলোর মতো ছবি দিয়ে নিজে এঁকে নেবেন।

সকলের মিলেমিশে কথা বলা আর চিন্তা করার জন্যে ছবি ব্যবহার করুন



একদল লোককে এইরকম একটা ছবি দেখান আর এটা নিয়ে আলোচনা করতে বলুন। লোকে যা জানে আর করতে পারে সে সম্বন্ধে কথা বলার মতো প্রশ্ন করুন। এখানে কিছু প্রশ্নের নমুনা দেয়া হল।

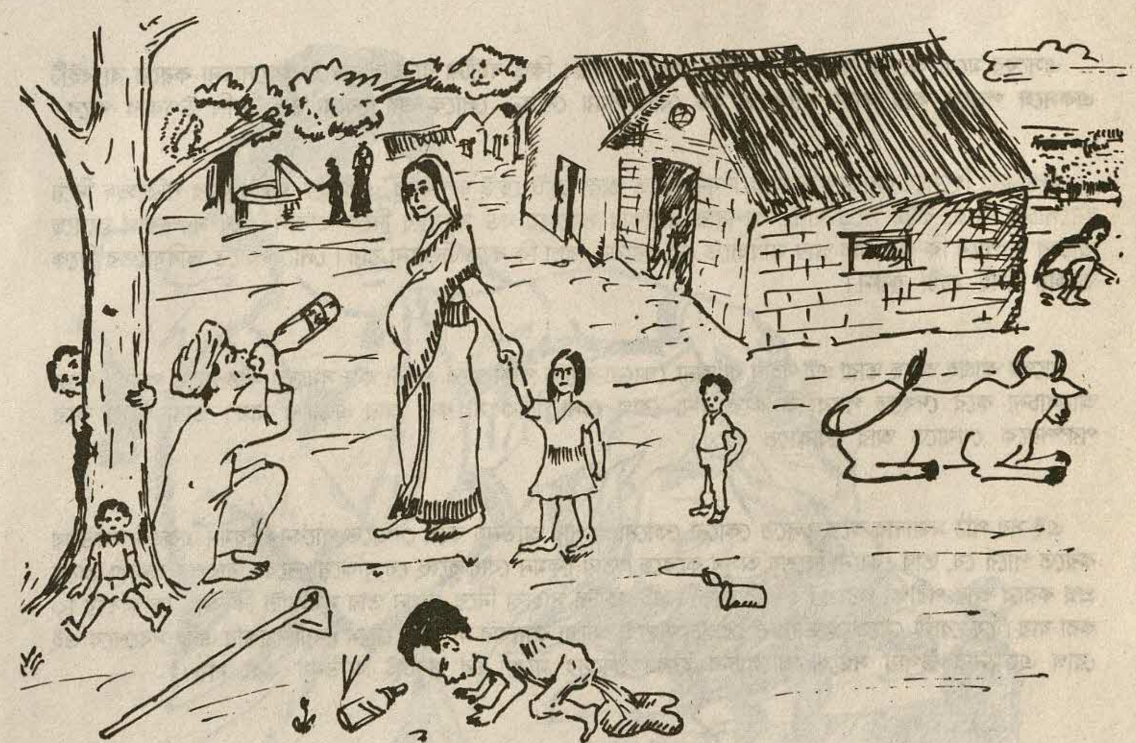
- ছবির লোকগুলি কে আর তারা কি করে?
- লোকজন আসার আগে এই জায়গাটা কেমন ছিল?
- লোকে কেমন ভাবে চারিদিকের পরিবর্তন এনেছে?
- এইসব পরিবর্তনে তাদের স্বাস্থ্যের আর ভালো থাকার কি ক্ষতিবৃদ্ধি হয়েছে?
- আর কি কি পরিবর্তন এরা আনতে পারত? আর কি কি কাজ শিখতে পারত? কিসে তারা বাধা পাচ্ছে? কেমন করে তারা আরো বেশি শিখতে পারে?
- ছবির এইসব লোকের সঙ্গে আমাদের কি কি মিল আছে?
- যদি এখানে একজন ডাক্তার বা উকীল আসতেন—আর তাঁদের এইসব লোকদের চেয়ে বেশি টাকাকড়ি বা যন্ত্রপাতি না থাকত, তাঁরা কি এদের মতো চাষ করতে পারতেন? কেন নয়?

এইধরনের দলগত আলোচনায় লোকের নিজেদের ওপর বিশ্বাস আসে। এতে নিজের সমাজের সঙ্গেও লোকে ঘনিষ্টবোধ করে।

প্রথম প্রথম হয়তো লোকে কথা বলবে না বা যা ভাবছে বলতে চাইবে না। কিন্তু কিছু পরেই তারা সহজভাবে কথা বলতে শুরু করবে আর নিজেরাই জরুরি প্রশ্ন তুলবে। যা মনে হচ্ছে বলতে আর লোকের সামনে কথা বলতে লোককে উৎসাহ দিন। যারা বেশি কথা বলে তাদের বলুন যারা একটু চুপচাপ তাদের বলার সুযোগ দিতে।

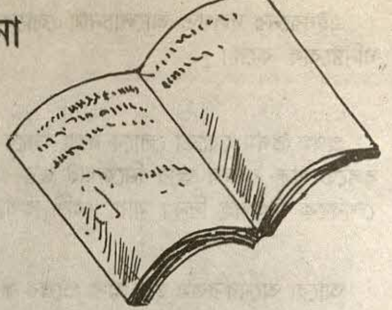
আরো অনেকরকম ছবি আর প্রশ্নের কথা ভাবুন যা লোককে সমস্যাগুলো, তাদের কারণ আর সেগুলো মেটাবার উপায় সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করতে সাহায্য করবে।

নিচের ছবিতে শিশুটির যে অবস্থা দেখা যাচ্ছে তার বিভিন্ন কারণ সম্বন্ধে লোকে যাতে ভাবতে শুরু করে তার জন্যে কি কি প্রশ্ন করা যায়?



এমন প্রশ্নের কথা ভাবুন যেগুলো থেকে আরও প্রশ্ন আসবে আর লোকে নিজে থেকেই প্রশ্ন তুলবে। এইরকম একটা ছবি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে পাৎলা পায়খানা থেকে মৃত্যুর কতগুলো মূল কারণের কথা লোকের মাথায় আসবে?

এই বইটিকে সবথেকে ভালোভাবে কাজে লাগানো



পড়তে পারে এমন যে কেউই এই বইটি নিজের বাড়িতে ব্যবহার করতে পারে। এমনকি যারা পড়তে পারে না, তারাও ছবিগুলি থেকে কিছু শিখতে পারে। কিন্তু এই বইটি পুরোপুরি আর সব চেয়ে ভালোভাবে কাজে লাগাতে হলে লোকের সাধারণতঃ কিছু নির্দেশের দরকার হয়। এটা নানাভাবে করা যেতে পারে।

স্বাস্থ্যকর্মী বা অন্য যে কেউ এই বইটি অন্যদের ব্যবহার করতে দেবেন, দেখবেন তারা যেন এর সূচীপত্র, শেষের বর্ণানুক্রমিক তালিকা, সবুজ পৃষ্ঠাগুলি, আর শব্দতালিকা কেমন করে কাজে লাগাতে হয় তা বোঝেন। কোনো ব্যাপারে কিভাবে **বইয়ে দেখে নিতে** হয় যত্ন করে উদাহরণ দিয়ে সেটা বোঝাবেন। প্রত্যেককে জোর দিয়ে বলবেন, তারা যেন বইটার সেইসব অংশগুলো পড়ে যা থেকে তারা বুঝতে পারে **কি করলে উপকার হয়, কি করলে ক্ষতি বা বিপদ হয়,** আর **কখন সাহায্যের দরকার হয়** (বিশেষ ক'রে ১, ২, ৩ আর ৯ পরিচ্ছেদ দেখুন তাছাড়া **বিপজ্জনক রোগের চিহ্ন** পৃঃ ৫২ দেখুন)। শুরু হবার আগেই **রোগ এড়ানো** কতটা জরুরি তা দেখিয়ে দিন। ১১ আর ১২ পরিচ্ছেদ, যাতে ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া (পুষ্টি) আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা (স্বাস্থ্য আর ময়লা নিকাশ) সম্বন্ধে বলা আছে, সেগুলোর দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে সকলকে উৎসাহ দিন।

এসবের মধ্যে অনেক কিছুই ছোট করে বোঝানো যায়। কিন্তু বইটির ব্যবহার সম্বন্ধে **আলোচনা করতে** বা বইটি **একসঙ্গে পড়তে আর কাজে লাগাতে** যত বেশি সময় দেবেন, লোকে এর থেকে তত বেশি উপকার পাবে।

স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে লোককে উৎসাহ দিন—যাতে তারা ছোট ছোট দল করে, একবারে একটা করে পরিচ্ছেদ দিয়ে আলোচনা করে, বইটা পড়ে যায়। আপনার এলাকার সবচেয়ে বড় সমস্যার দিকে তাকান—যে সব রোগ রয়েছে তাদের ব্যাপারে কি করা যায় আর ভবিষ্যতে এই ধরনের রোগ কি করে এড়ানো যায়। লোকে যাতে ভবিষ্যতের দিকে তাকায় সেই চেষ্টা করুন।

যাদের আগ্রহ আছে তারা এই বইটা বা অন্য কোনো বইকে পাঠ্য করে একটা কম সময়ের পাঠ নিতে পারে। তারা আলোচনা করে দেখতে পারে কি করে নানা রোগ চেনা, চিকিৎসা করা আর এড়ানো যায়। তারা পালা করে পরস্পরকে শেখাতে আর বোঝাতে পারে।

এই সব পাঠ মজাদার করে তুলতে কোনো কোনো ব্যাপার অভিনয় করে দেখাতে পারেন। যেমন একজন অভিনয় করতে পারে যে, তার কোনো বিশেষ অসুখ করেছে। তার কেমন বোধ হচ্ছে যে বুঝিয়ে দেবে। তারপর অন্যরা তাকে প্রশ্ন করবে আর পরীক্ষা করবে (৩ পরিচ্ছেদ)। এই বইটির সাহায্য নিয়ে দেখুন তার সমস্যাটা কি আর সে বিষয়ে কি করা যায়। যে রোগী সেজেছে তাকেও রোগটা সম্বন্ধে আরো জানবার ব্যাপারে টেনে নেয়া দরকার এবং সবশেষে ওই রোগ এড়ানোর উপায় সম্বন্ধে আলোচনা হবে। ক্লাসের মধ্যে এর সবটাই অভিনয় করা যায়।

লোককে এই বইটি ঠিকমতো কাজে লাগাতে সাহায্য করতে হলে, স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে আপনি একটা কাজ করতে পারেন : যখন লোকে চিকিৎসার জন্যে আপনার কাছে আসবে, তাদের বলবেন নিজেদের বা শিশুদের অসুখটা বই থেকে নিজে নিজে দেখে নিতে আর চিকিৎসার উপায়টাও বার করে নিতে। এতে বেশি সময় লাগবে, কিন্তু লোকের জন্যে কিছু করে দেবার থেকে কাজ হবে বেশি। যদি কারো ভুল হয় বা জরুরি জিনিস চোখ এড়িয়ে যায়, কেবলমাত্র তখনই আপনি তাকে সাহায্য করতে এগোবেন। এইভাবে **রোগকেও শিক্ষার কাজে লাগানো যাবে।**

প্রিয় গ্রামস্বাস্থ্যকর্মী,—আপনি যেই হন আর যেখানেই থাকুন, আপনার কোনো পদমর্যাদা থাকুক বা আপনি আমার মতো একজন সাধারণ লোক হন—যে অন্যের ভালো চায়,—এই বইটি ভালোভাবে কাজে লাগান। এটা আপনার জন্যে, সকলের জন্যে।

> ভালোবেসে সুখদুখ ভাগ করে নেয়া চাই;
> স্বাস্থ্যের চাবিকাঠি জেনে রেখো এইটাই।

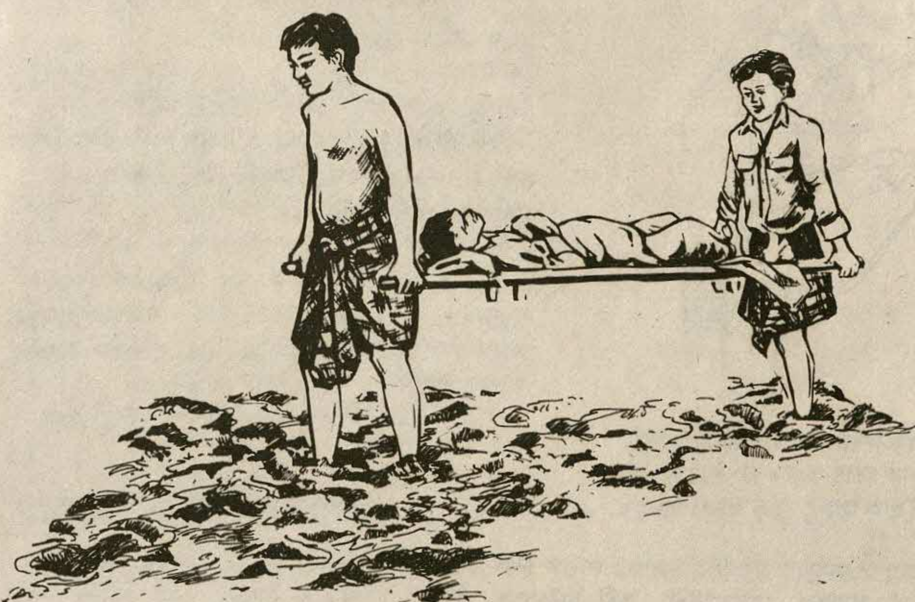
আপনাদেরই

ডেভিড ওয়ারনার



বিজ্ঞপ্তি

মানুষের সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যার প্রয়োজন মেটাতে এই বই তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু এতে সব প্রশ্নের উত্তর নেই। কঠিন রোগ হলে, কিংবা স্বাস্থ্যের কোনো সমস্যার মোকাবিলা করার বিষয়ে সন্দেহ থাকলে, যখনই সম্ভব অভিজ্ঞ স্বাস্থ্যকর্মী বা ডাক্তারের পরামর্শ নিন।



পরিচ্ছেদ

১ ঘরোয়া চিকিৎসা আর প্রচলিত বিশ্বাস

পৃথিবীর সব জায়গাতেই লোকে ঘরোয়া ওষুধপত্র ব্যবহার করে। কোনো কোনো জায়গায় চিকিৎসার পুরোনো বা **প্রচলিত** পদ্ধতি কয়েকশ বছর ধরে বংশগতভাবে চলে আসছে।

অনেক ঘরোয়া ওষুধের গুণ খুবই বেশি, কয়েকটির গুণ কম। আবার কয়েকটির ব্যবহারে ঝুঁকি আছে, ক্ষতিও হতে পারে। আধুনিক ওষুধের মতোই ঘরোয়া ওষুধ খুব সাবধানে ব্যবহার করা উচিত।

ঘরোয়া ওষুধ দেয়ার সময়
নিরাপদ কিনা জেনে নিতে হয়।
বিপদ এড়াতে আরো দরকার
জেনে নেয়া তার ঠিক ব্যবহার।

দেখবেন ঘরোয়া ওষুধ দিয়ে ক্ষতি করে ফেলবেন না!

যে সব ঘরোয়া ওষুধ কাজে লাগে

অনেকদিন ধরে উপকারী বলে দেখা গেছে এমন ঘরোয়া ওষুধ, অনেক রোগে, আধুনিক ওষুধের মতোই বা তার থেকে **আরো ভালো** কাজ দেয়। সাধারণতঃ এগুলো **আরো সস্তা**, আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে **আরো নিরাপদ**।

যেমন, কিছু ডাক্তার কাশির চিকিৎসার জন্যে যে সব সিরাপ বা কড়া ওষুধ দেন তার থেকে অনেক ঘরোয়া গাছগাছড়ার পাঁচন বেশি কাজ দেয়, আর ক্ষতি করে কম।

আবার বাচ্চাদের পাৎলা পায়খানা হলে, অনেক মা যে চিনি মেশানো চা বা অন্য তরল খাবার দেন তা যে কোনো আধুনিক ওষুধের চেয়ে ভালো কাজ করে আর বেশি নিরাপদ। যেটা জরুরি সেটা হল, যে শিশুর পাৎলা পায়খানা হচ্ছে সে যেন প্রচুর তরল খাবার পায় (পৃঃ ১৮১)।



কাশি, সর্দি আর পাৎলা পায়খানার জন্যে গাছগাছড়ার পাঁচন সাধারণতঃ আধুনিক ওষুধের থেকে ভালো, সস্তা আর নিরাপদ।

ঘরোয়া ওষুধপত্রের অসুবিধে

কিছু কিছু রোগে যদিও ঘরোয়া ওষুধে কাজ হয়, অন্য অনেক রোগের চিকিৎসা আধুনিক ওষুধেই আরো ভালো হয়। বেশির ভাগ মারাত্মক সংক্রমণের বেলায় শেষেরটাই ঠিক। নিউমোনিয়া, ধনুষ্টঙ্কার, টাইফয়েড, যক্ষ্মা, এপেনডিসাইটিস, যৌন রোগ, সূতিকা—এই সব রোগের চিকিৎসা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আধুনিক ওষুধ দিয়ে করা উচিত। এ সব রোগ হলে প্রথমে ঘরোয়া ওষুধ দিয়ে সারাবার চেষ্টা করে সময় নষ্ট করবেন না।

কোন ঘরোয়া ওষুধ কাজ করে আর কোনটা করে না, সেটা ঠিক করা কখনো কখনো খুব কঠিন। ভালোভাবে জিনিসটা পরীক্ষা করা দরকার। এইজন্যে:

ঘোরালো বা কঠিন রোগে ওষুধ লাগবে আধুনিক;
পারলে পরে, ডাক্তারের পরামর্শ নেয়াই ঠিক।

পুরোনো আর নতুন পদ্ধতি

স্বাস্থ্যের প্রয়োজন মেটাতে কিছু আধুনিক পদ্ধতি পুরোনো পদ্ধতির থেকে ভালো কাজ দেয়। কিন্তু কখনো কখনো পুরোনো প্রচলিত পদ্ধতিগুলোই সবথেকে ভালো বলে দেখা যায়। যেমন, শিশু ও বুড়োমানুষের দেখাশোনার জন্যে প্রচলিত রীতিগুলোর মধ্যে অনেক বেশি মায়ামমতা আছে আর সেগুলো কাজও করে অনেক ভালো। নতুন রীতিগুলোতে দরদের ছোঁয়া বড় কম।

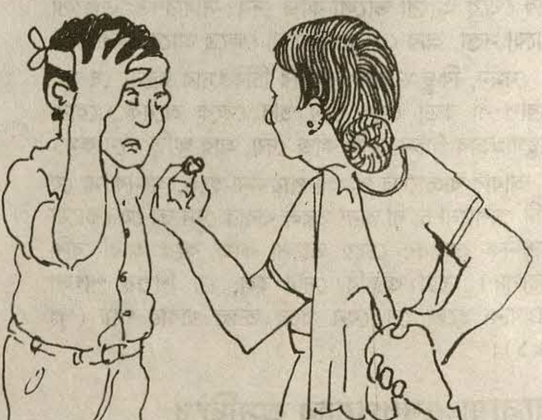
আগে লোকে ভাবত যে কচি বাচ্চার জন্যে মায়ের দুধই সবচেয়ে ভালো খাবার। তারা ঠিকই ভাবত! তারপর, যে সমস্ত বড় বড় কোম্পানি টিনের গুঁড়ো দুধ তৈরি করে, তার বলতে শুরু করল যে, বোতলে দুধ খাওয়ানো অনেক ভালো। কথাটা সত্যি নয়, কিন্তু অনেক মা তাদের বিশ্বাস করে ফেলল, আর বাচ্চাদের বোতলে খাওয়াতে শুরু করল। ফলে হাজার হাজার শিশু অকারণে সংক্রমণ বা খিদেয় কষ্ট পেল আর মারা গেল। **বুকের দুধই সেরা**—এর কারণগুলো জানতে পৃঃ ৩১৭ দেখুন।

দেশের রীতিনীতেতে শ্রদ্ধা রেখে সেগুলির ওপরেই ভিত্তি করে স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলুন।

যে সব বিশ্বাস লোককে ভালো করে তুলতে পারে

কোনো কোনো ঘরোয়া ওষুধ সোজাসুজি শরীরের ওপর কাজ করে। আবার কিছু কাজ করে লোকে সেগুলোতে বিশ্বাস করে বলে। **বিশ্বাসের রোগ সারাবার ক্ষমতা খুব বেশি।**

যেমন, একবার আমি একটি লোককে দেখেছিলাম—সে প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিল। এক মহিলা তাকে সারিয়ে তোলার জন্যে এক টুকরো রাঙা আলু দিয়ে বলল যে সেটা যন্ত্রণা সারাবার একটা কড়া ওষুধ। লোকটি তাকে বিশ্বাস করে সেটা খেতেই তার যন্ত্রণাটা চট করে সেরে গেল।



পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, মহিলার ওপর বিশ্বাসই লোকটিকে সুস্থ করেছিল, রাঙা আলুটা নয়।

অনেক ঘরোয়া ওষুধ এইভাবে কাজ করে। লোকে বিশ্বাস করে বলেই সেগুলোতে উপকার হয়। এইজন্যে সেগুলো **বিশেষভাবে সেই সব রোগে কাজ দেয়, যেগুলোর অনেকটাই লোকের মনের মধ্যে থাকে, বা লোকের বিশ্বাস, দুশ্চিন্তা বা ভয় থেকে জন্মায়।**

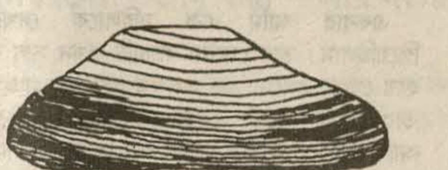
এই ধরনের রোগের মধ্যে আছে—ডাইন বা নজর লাগা, অহেতুক বা মূর্ছার রোগীর মত ভয়, অস্পষ্ট ব্যথা বা যন্ত্রণা, উৎকণ্ঠা বা ঘাবড়ে গিয়ে দুশ্চিন্তা, অনেক ধরনের হাঁপানি, হেঁচকি, বদহজম, পেটের আলসার, প্রচণ্ড মাথাধরা, এমনকি আঁচিলও।

এই সব সমস্যায়, **যে চিকিৎসা করে, তার আচার ব্যবহার বা "হাত"টা খুব জরুরি হতে পারে।** মোদ্দা কথা হল, আপনি যে রোগীর জন্যে ভাবছেন সেটা তাকে বুঝতে দেয়া, রোগী যে ভালো হয়ে উঠবে, তাকে এ কথা বিশ্বাস করতে সাহায্য করা,—কিংবা শুধু তাকে শান্ত থাকতে সাহায্য করা।

কখনো কখনো, যে সব রোগের পুরোপুরি শারীরিক কারণ আছে সেগুলোর ক্ষেত্রেও ওষুধে রোগীর বিশ্বাস খুবই কাজ দেয়।

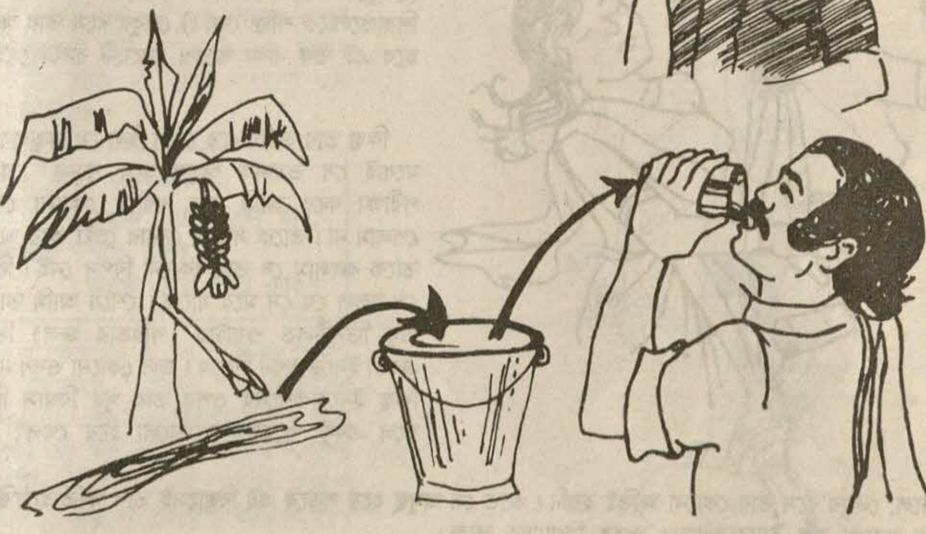
যেমন, আমাদের দেশে বিষাক্ত সাপের কামড়ের জন্যে গ্রামবাসীরা নিচের ঘরোয়া চিকিৎসাগুলি করেন:

১· বিষ পাথরের ব্যবহার।



২· এক মুঠো লঙ্কা বা নিমপাতা খাওয়া।





৩· এক বালতি থোড়ের রস খাওয়া।

অন্যান্য দেশেও তাদের নিজস্ব নানা ধরনের সাপের কামড়ের ওষুধ আছে। আমরা যতদূর জানি, **এইসব ঘরোয়া ওষুধের কোনোটাই সাপের বিষের ওপর সোজাসুজি কোনো কাজ করে না।** যে বলে, কোনো ঘরোয়া ওষুধের দরুণই সাপের বিষে তার কোনো ক্ষতি হয়নি, তাকে হয়তো বিষহীন সাপে কামড়েছিল।

তবে, এইসব ঘরোয়া ওষুধের প্রত্যেকটাই কিছু উপকার করতে পারে, যদি লোকে তাতে বিশ্বাস করে। এতে যদি তার ভয় কমে, তবে তার নাড়ির গতি ধীর হয়ে যাবে, তার ছটফট করা বা কাঁপুনি কমবে, ফলে বিষটা তার শরীরে যাবে অনেক ধীরে। বিপদও কমবে!

কিন্তু এইসব ঘরোয়া ওষুধের উপকার বেশি দূর যায় না। যদিও সাপে কামড়ালে এগুলো প্রায়ই ব্যবহার করা হয়, তবুও অনেকেই খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে বা মারাও যায়। যতদূর জানা আছে:

সাপ, বিছে বা অন্য বিষাক্ত জন্তুজানোয়ারের কামড়ের যে সব ঘরোয়া ওষুধ আছে, সেগুলির কোনোটাই বিশেষ কাজ দেয় না—একমাত্র বিশ্বাসের যে রোগ সারাবার ক্ষমতা আছে, তাতেই যেটুকু কাজ হয়।

সাপের কামড়ে সাধারণতঃ আধুনিক চিকিৎসা করাই ভালো। তৈরি থাকবেন: বিষাক্ত কামড়ের জন্যে *এনটিভেনিন* বা 'সিরাম'গুলো দরকারের আগেই যোগাড় করে রাখবেন (পৃঃ ১২২)। অপেক্ষা করবেন না—হয়তো বড় বেশি দেরি হয়ে যাবে।

যে সব বিশ্বাস লোককে অসুস্থ করে তুলতে পারে

বিশ্বাসের জোরে লোক ভালো হয়ে যায়। কিন্তু এটা তাদের ক্ষতিও করতে পারে। যদি কেউ তেমন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে কোনো কিছু তার অপকার করবে, নিজের ভয় থেকেই সে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। যেমন:



একবার আমি এক মহিলাকে দেখতে গিয়েছিলাম। তার পেটের বাচ্চাটি তখন সদ্য নষ্ট হয়ে গেছে, তখনো তার অল্পস্বল্প রক্তপাত হচ্ছিল। তার বাড়ির কাছেই একটা লেবুগাছ ছিল। তাই আমি তাকে এক গ্লাস লেবুর রস খেতে বললাম। (লেবুতে 'সি' ভিটামিন আছে যা রক্তবাহী শিরাগুলোকে শক্তি দেয়।) লেবুর রসে তার ক্ষতি হবে এই ভয় থাকা সত্ত্বেও মেয়েটি রসটা খেল।

কিন্তু তার ভয়টা এত বেশি ছিল যে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়ল। তাকে পরীক্ষা করে আমি তার শরীরে কোনো দোষ পেলাম না। তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে আমি তাকে বললাম যে তার কোনো বিপদ নেই। কিন্তু সে বলল যে সে মরে যাচ্ছে। শেষে আমি তাকে শুধু ডিস্‌টিল্‌ড্‌ ওয়াটার (পরিষ্কার জল) দিয়ে একটা ইনজেকশন দিলাম। জল কোনো ওষুধ নয়। কিন্তু ইনজেকশনের ওপর তার খুব বিশ্বাস ছিল বলে একটু পরেই সে ভালো হয়ে গেল।

আসলে, লেবুর রসে তার কোনো ক্ষতিই হয়নি। ওতে **সে অসুস্থ হয়ে পড়বে এই বিশ্বাসেই** তার ক্ষতি হয়েছিল। আর সে ভালো হল ইনজেকশনের ওপর বিশ্বাসের ফলে।

এই একইভাবে বহু লোক ডাইনি বিদ্যে, ইনজেকশন, বিশেষ বিশেষ খাবার, আরো অনেক কিছু সম্বন্ধে ভুল ধারণায় বিশ্বাস করে আসছে। এর ফলে নানারকম অকারণ অসুখবিসুখ হচ্ছে।

হয়তো কোনোভাবে সেই মহিলাকে আমি তখন সাহায্য করেছিলাম। কিন্তু পরে যত ভেবেছি, ততই আমার মনে হয়েছে যে তার ওপরে আমি অন্যায়ও করেছিলাম। কারণ আমার জন্যে সে কতকগুলো মিথ্যে ব্যাপারে বিশ্বাস করেছিল।

এইটা আমি শোধরাতে চেয়েছিলাম। তাই কয়েকদিন পর, যখন মেয়েটি একেবারে ভালো হয়ে গেছে, তখন তার বাড়ি গিয়ে আমি আমার আগের ব্যবহারের জন্যে ক্ষমা চাইলাম। তারপর তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে লেবুর রসের জন্যে নয়, তার **ভয়ের** জন্যেই সে অতটা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। আর জলের ইনজেকশনে নয়, **ভয় থেকে মুক্তি** পাওয়াতেই তার ভালো হয়ে যাবার সাহায্য হয়েছে।

লেবুর রস, ইনজেকশন আর তার নিজের মনের কারসাজি সম্বন্ধে সত্যি কথাটা জানার পর হয়তো সেই মেয়েটি আর তার বাড়ির লোকে ভবিষ্যতে ভয় কম পাবে আর নিজেদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আরো ভালোভাবে যত্ন নিতে পারবে। কারণ **স্বাস্থ্যের** সঙ্গে, **বোঝবার ক্ষমতা** আর **ভয়ের থেকে মুক্তি** পাওয়ার সম্পর্ক খুবই নিকট।

অপকারী বলে ধরে নেয় লোকে তাই,
নানান জিনিস ক্ষতিকর হয়ে যায়।

ডাইনি বিদ্যে—জাদু করা—আর নজর লাগা

যদি কেউ যথেষ্ট দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে অন্য একজন তার ক্ষতি করতে পারে, তবে সে সত্যিসত্যিই অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। কেউ যদি বিশ্বাস করে যে তাকে গুণ করা হয়েছে বা তার নজর লেগেছে, তবে সে নিজের ভয়ের ফাঁদে নিজেই পড়ে যাবে (পৃঃ ৩১)।

যাকে ডাইনি বলা হয় তার অন্যের ওপরে কোনো ক্ষমতাই নেই, সে কেবল এই বিশ্বাস ধরিয়ে দিতে পারে যে সেই ক্ষমতাটা তার আছে। এইজন্যে:

ডাইনি বিদ্যে ব্যাপারটাতেই
বিশ্বাস নেই আদৌ যার,
বশীকরণ করবে তাকে,
আছে এমন সাধ্য কার?



কোনো অস্বাভাবিক বা ভয়ানক অসুখ (যেমন যৌনাঙ্গে টিউমার বা লিভারের সিরোসিস পৃঃ ৩৭৪) হলে অনেকে মনে করে যে তাদের গুণ করা হয়েছে। এইসব অসুখের সঙ্গে ডাইনি বিদ্যের বা জাদু করার কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলো স্বাভাবিক কারণেই হয়।

যে "ওঝা" বলে যে তারা ঝাড়ফুঁক করে ডাইনি লাগা সারাতে পারে, তাদের কাছে গিয়ে পয়সা নষ্ট করবেন না। কোনো ডাইনির ওপর শোধ তুলতেও যাবেন না, কারণ তাতে কোনো সমস্যা মিটবে না। যদি কোনো মারাত্মক অসুখ হয়, ডাক্তারি সাহায্য নিন।

যদি অদ্ভুত কোনো অসুখ করে:



কোনো ডাইনিকে দোষ দেবেন না,



ওঝা বা ঝাড়ফুঁকের ব্যাপারে যাবেন না,



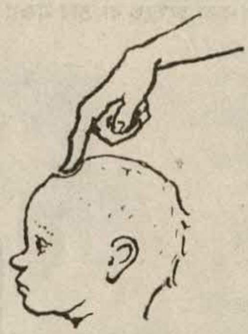
বরং ডাক্তারি সাহায্য নিন।



কতকগুলি সাধারণ বিশ্বাস এবং ঘরোয়া চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রশ্ন ও উত্তর

ভারতবর্ষের নানা জায়গা থেকে এই উদাহরণগুলি নেয়া হয়েছে। হয়তো আপনার এলাকায়ও এগুলির মধ্যে কিছু কিছু প্রচলিত আছে। আপনার এলাকায় কোন কোন বিশ্বাসে স্বাস্থ্যের উপকার হয় আর কোনটায় হয় না, তা জানবার উপায়ের কথা ভেবে দেখুন।

এ কথা কি সত্যি যে যদি কোনো শিশুর পাৎলা পায়খানা হয় আর তার মাথার তালুর নরম জায়গাটা ভেতর দিকে বসে যায়, তবে তাড়াতাড়ি বিশেষ চিকিৎসা না পেলে শিশুটি মারা যাবে?



এটা সাধারণতঃ সত্যিই হয়। শিশুর শরীরের জল অনেকটা বেরিয়ে যাবার জন্যেই (পৃঃ ১৮১) মাথার নরম জায়গাটা বসে যায়। যদি তাকে তাড়াতাড়ি প্রচুর তরল খাবার না দেয়া হয়, সে মারা যেতে পারে (পৃঃ ১৮২)।

একথা কি সত্যি যে গ্রহণ লাগার সময় চাঁদের আলো যদি পোয়াতি মায়ের গায়ে পড়ে, তবে শিশু বিকৃত বা জড়বুদ্ধি হয়ে জন্মাবে?



এটা একেবারেই সত্যি নয়! পেটের বাচ্চার ওপর গ্রহণ লাগা চাঁদের আলোর কোনো প্রভাব নেই। শিশু বিকৃত বা জড়বুদ্ধি হবার কারণ জানতে হলে পৃঃ ৩৬৫ দেখুন।

এটা কি সত্যি যে অন্ধকার ঘরেই মায়ের প্রসব হওয়া উচিত?



এটা ঠিকই যে অল্প আলো মা আর শিশু দুজনের চোখের পক্ষেই ভালো। কিন্তু ধাই যাতে দেখতে পায় সে নিজে কি করছে, তার জন্যে যথেষ্ট আলো থাকা দরকার।

এটা কি সত্যি যে প্রসবের পর দু-এক দিন যে জলের মত জিনিসটা মায়ের বুক থেকে বার হয়, তা শিশুর পক্ষে খারাপ?



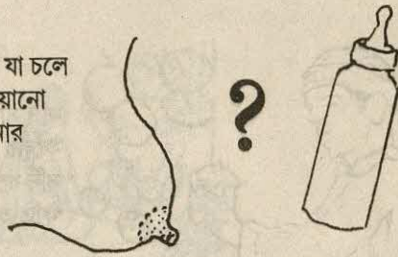
এটা সত্যি নয়। এই জলের মত দুধটাকে বলে **কলোস্ট্রাম**; এটা শিশুর পক্ষে খুবই ভালো। এতে অনেক প্রোটিন খাবার আছে, তাছাড়া এনটিবডি বলে কিছু জিনিস আছে, যেগুলো সংক্রমণ থেকে শিশুকে রক্ষা করে।

প্রসবের কদিন পরে মায়ের স্নান করা উচিত ?



প্রসবের পরদিন থেকেই মায়ের উচিত কুসুম গরম জলে স্নান করা। প্রসবের পর কয়েক সপ্তাহ মায়ের স্নান না করার যে নিয়ম আছে, তার থেকে সংক্রমণ ঘটতে পারে।

একথা কি সত্যি যে চিরকাল যা চলে আসছে সেই বুকের দুধ খাওয়ানো 'আধুনিক' বোতলে খাওয়ানোর থেকে ভালো ?



সত্যি ! বুকের দুধ, খাবার হিসেবে অনেক ভালো, তাছাড়া সংক্রমণ থেকে শিশুকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

প্রসবের পর প্রথম কয়েক সপ্তাহ মায়ের কোন কোন খাবার খাওয়া উচিত নয় ?



প্রসবের পরের কয়েক সপ্তাহে, মেয়েদের কোনো পুষ্টিকর খাবারই বাদ দেয়া উচিত নয়। বরং তাদের উচিত প্রচুর ফল, তরিতরকারি, গোটা দানাশস্য, বরবটি, দুধ, ডিম ও মাংস খাওয়া (পৃঃ ৩২২)।

রোগীকে স্নান করানোটা কি বুদ্ধির কাজ ? নাকি তাতে তার ক্ষতি হয় ?



এটা বুদ্ধিরই কাজ। রোগীকে প্রতিদিন কুসুম গরম জলে স্নান করানো উচিত।

সর্দি বা জ্বর হলে কমলালেবু, পেয়ারা বা অন্য কোনো ফল খেলে কি ক্ষতি হয় ?



না ! সর্দি বা জ্বরে সবরকম ফল বা ফলের রস খুব উপকারী। তাতে সর্দি বসে যাওয়া বা অন্য কোনো ক্ষতি হয় না।

এটা কি সত্যি যে বেশি জ্বর হলে রোগীকে ঢাকাঢুকি দিয়ে রাখা উচিত যাতে হাওয়া লেগে তার ক্ষতি না হয় ?



না ! বেশি জ্বর উঠলে রোগীর সমস্ত ঢাকা আর কাপড়চোপড় সরিয়ে দেবেন। তার শরীরে বাতাস লাগতে দিন। এতে তার জ্বর নেমে যাবার সাহায্য হবে (পৃঃ ৮৮)।

হাম, জল বসন্ত



ভারতবর্ষের অনেক জায়গাতেই লোকে বিশ্বাস করে যে তাদের পরিবারের ওপর বা আর পাঁচজনের ওপর শীতলা দেবীর কোপ হলেই এইসব রোগ হয়। এই সব রোগের মধ্যে দিয়ে শীতলা মা কোপটা প্রকাশ করেন।

লোকে বিশ্বাস করে যে শীতলামাকে পূজো দিয়ে সন্তুষ্ট করলে তবেই এ রোগ থেকে রক্ষে পাওয়া যাবে। তারা এই রোগ হলে শিশুকে খেতে দেয় না বা কোনো যত্ন করে না কারণ তারা মনে করে তাহলে শীতলা আরো রেগে যাবেন। ফলে **অসুস্থ শিশুটি খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে আর হয় মারা যায় না হয় বহুদিন ধরে ভোগে।**

এ সমস্ত অসুখ আসলে হয় ভাইরাস বলে একরকম জীবাণুর থেকে (পৃঃ ২৭)। এসব রোগ হলে শিশুকে প্রচুর পরিমাণে খেতে দেয়া দরকার যাতে এই সংক্রমণের সঙ্গে যুদ্ধ করার মত শক্তি তার থাকে। **শিশু যদি খুব ছোট হয় তবে তার বেলায় এটা আরো জরুরি।**

চিকিৎসা:

ওঝার ঝাড়ফুঁকে কিছু হবে না।



স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে শিশুকে এখনই নিয়ে যান।





খাবার দেয়া কখনোই বন্ধ করবেন না।

শিশুকে প্রচুর পুষ্টিকর খাবার এবং তরল খাবার খেতে দিন।

ছোঁয়াচে সব রোগের থেকে
বাঁচবে শিশু পেলে টিকে

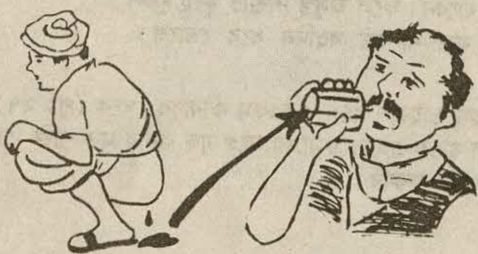
ঘরোয়া ওষুধে কাজ হচ্ছে কিনা কেমন করে বুঝবেন ?

অনেক লোকে ব্যবহার করে বলেই যে একটা ঘরোয়া ওষুধ কাজ করে বা নিরাপদ এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কোন ওষুধ কাজ করে, কোনটাই বা ক্ষতি করে এটা বোঝা প্রায়ই বেশ কঠিন। এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে গেলে মনোযোগ দিয়ে এগুলি পরীক্ষা করা দরকার। এখানে কয়েকটি নিয়ম দেয়া হল, যা থেকে বোঝা যেতে পারে কোন ওষুধের কাজ করার সম্ভাবনা খুবই কম অথবা কোন ওষুধে বিপদ হতে পারে।

১· যে সব নোংরা ওষুধে ঘেন্না হয়, সে সবে কাজ হবার সম্ভাবনা নেই, বরং সাধারণতঃ অপকারই হয়

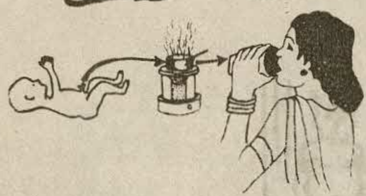
যেমন :

ক) মানুষের মল খেলে বিষক্ষয় হয় এই ধারণা।



করবেন না

খ) কচি বাচ্চার নাড়ি ফুটিয়ে খেলে বাঁজা মেয়ের সন্তান হবে এই ধারণা।



করবেন না

এই দুটি ওষুধে কোনো কাজই হয় না

২· যে সব ওষুধে মানুষের বা জানোয়ারের মল ব্যবহার করা হয় সেগুলি কোনো উপকার করে না। বরং তার থেকে ভয়ঙ্কর সংক্রমণ হতে পারে। এগুলি কখনোই ব্যবহার করবেন না

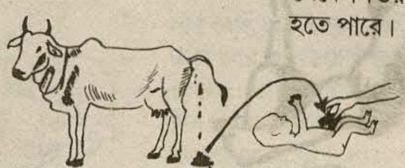
উদাহরণ :

ক) বসন্তের টিকের জায়গায় মানুষের মল লাগালে টিকের জন্যে যে অল্প জ্বর হয় তা এড়ানো যায় না, বরং সংক্রমণ ঘটতে পারে

করবেন না

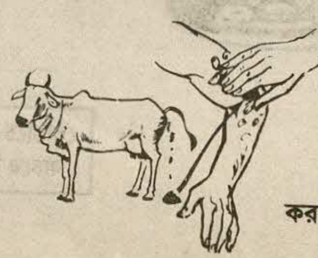


খ) কচি বাচ্চার নাড়ি কাটার পর তাতে গোবর লাগালে তা থেকে শিশুর ধনুষ্টঙ্কার হতে পারে।



করবেন না

গ) পোড়া ঘায়ের ওপর গোবর লাগালে সে ঘা সারে না, বরং মারাত্মক সংক্রমণ ঘটতে পারে।



করবেন না

৩· যে সব ঘরোয়া ওষুধে সাংঘাতিক ক্ষতি হতে পারে

উদাহরণ :

ক) যে সব বাচ্চার ফিট
হচ্ছে তাদের
নিমবীজের তেল দিলে
খুব ক্ষতি হতে পারে।

করবেন না



খ) অজ্ঞান রোগীর জ্ঞান
ফেরাবার জন্যে
তাদের মুখে দুধ ঢালা।

করবেন না



গ) বাচ্চাকে জন্মের পরে
কাঁদাবার জন্যে
গন্‌গনে লোহা দিয়ে
ছেঁকা দেয়া।

করবেন না



কোনো লোকের ফিট হলে বা সে অজ্ঞান হয়ে গেলে তাকে মুখ দিয়ে কিছু খাওয়াবেন না। কারণ, তরল জিনিসটা তার ফুসফুসে ঢুকে যেতে পারে ; তাতে সে দম আটকে মারা যেতে পারে অথবা তার নিউমোনিয়া হতে পারে (পৃঃ ৯১)।

৪· যে সব ঘরোয়া ওষুধ বা ব্যবস্থা মন্দ আর অন্যের ক্ষতি করে

উদাহরণ :

ক) দেবতার কাছে নরবলি দিলে বাঁজা
মেয়ের সন্তান হবে বলে বিশ্বাস।

করবেন না



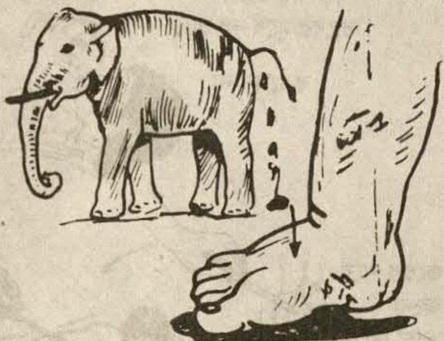
কোনো স্বামীস্ত্রীর ছেলেপিলে না হওয়ার অনেক কারণ থাকতে পারে (পৃঃ ২৮৮)। আর একজনকে মেরে ফেললে কোনোদিকে কোনো কাজ হবে না।

খ) যার বয়ঃসন্ধি হয়নি এমন মেয়ের সঙ্গে যৌন সংসর্গ করলে সিফিলিস সেরে যায় বলে ধারণা। এতে সিফিলিস সারে না। মেয়েটি সাধারণতঃ ভয়ে আর রক্তপাতে মারা যায়। যদি বাঁচে, তারও সিফিলিস হয়ে যেতে পারে।

বিপদ থেকে বাঁচতে গিয়ে
করলে ক্ষতি অন্য কারো,
লাভ হবে না তোমার কিছুই
কষ্ট শুধুই ঘটবে তারো।

৫· যে রোগটা সারাবার কথা, ঘরোয়া চিকিৎসাটা যদি সেই একই ধরনের হয়—তবে তাতে যেটুকু উপকার হয় সেটা বিশ্বাস থেকেই হয়

নিচের প্রত্যেক উদাহরণে রোগ আর চিকিৎসার মিল পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে :



ক) গোদের জন্যে হাতীর গোবর মাড়ানো।



খ) মাম্প্‌স-এর জন্যে পাড়ার লোকের কাছে ধার করে হার পরা।



গ) বিছে কামড়ানোয়, কামড়ানোর জায়গায় বিছের দাঁড়া বেঁধে দেয়া।



ঘ) গলা ব্যথায় গলার ওপর হলুদ বাটার প্রলেপ দেয়া।



ঙ) দাঁত ওঠার সময় পাৎলা পায়খানার জন্যে শিশুর গলায় একটা বাঘের দাঁত ঝুলিয়ে দেয়া।



চ) ন্যাবার জন্যে হলুদ জলে হাত ধোয়া।

এই সব ধরনের চিকিৎসার নিজের কোনো ভালো করার ক্ষমতা নেই। যদি লোকে ওগুলোতে বিশ্বাস করে, তবে কিছু উপকার হয়। কিন্তু যদি সাংঘাতিক অসুখ করে তবে দেখবেন, যেন ওগুলো ব্যবহার করতে গিয়ে,সত্যিই কাজ হয় তেমন চিকিৎসায় দেরি না হয়ে যায়।

কয়েকটি উপকারি ঘরোয়া চিকিৎসা

অনেক গাছগাছড়ার রোগ সারাবার ক্ষমতা আছে। অনেক ভালো ভালো আধুনিক ওষুধ বুনো গাছগাছড়া থেকে তৈরি হয়।

তবুও, যে সব গাছগাছড়া লোকে ব্যবহার করে, তার সবগুলোতেই ওষুধের গুণ নেই; যেগুলোয় আছে সেগুলো অনেক সময় ভুলভাবে ব্যবহার করা হয়। আপনার এলাকার গাছগাছড়া চিনুন আর কোনগুলো কাজে লাগে জেনে নিন।



সাবধান : কিছু ভেষজ গাছগাছড়া খুব বিষাক্ত। যেন ঠিক মাত্রার বেশি না দেয়া হয়। এই জন্যে অনেক সময় আধুনিক ওষুধ ব্যবহার করা বেশি নিরাপদ, কারণ তার মাত্রা সহজেই ঠিক করা যায়।

ঠিকমত ব্যবহার করলে উপকার হয় এমন কিছু গাছগাছড়া দিয়ে ঘরোয়া চিকিৎসার উদাহরণ দেয়া হল:

ঘরোয়া চিকিৎসা কেবল অল্প রোগেই কাজ দেয়। সাংঘাতিক অসুখে সবসময় আধুনিক ওষুধ ব্যবহার করবেন।

সর্দিকাশি (পৃঃ ২০০)

শিশুর যদি সর্দিকাশি হয়:

১· কয়েকটা তুলসী পাতা থেঁতো করে নিন। কচি বাচ্চাদের দিনে ৩ বার দু-এক ফোঁটা তুলসীর রসের সঙ্গে মধু মিশিয়ে দিন।

২· দু চামচ নারকেল তেল গরম করুন। ১ বড় চামচ কর্পূর গুঁড়ো করে তেলে গলিয়ে নিন। ছিপি আঁটা বোতলে রেখে দিন। সর্দি তরল করতে শিশুর বুকে আর গলায় মালিশ করতে পারেন। সরষের তেলে মাষকলাই ফুটিয়ে তাতে একটু কর্পূর মিশিয়ে অল্প গরম অবস্থায় বুকে পিঠে মালিশ করাও ভালো। পুরোনো ঘি মালিশ করা যায়।



তুলসি

৩ পিপুলের গুঁড়ো বা যষ্ঠিমধু গুঁড়ো ১ থেকে ২ গ্রেন, মধু দিয়ে মেখে দিনে ২/৩ বার শিশুদের খেতে দেবেন। বড়দের ৩-৪ গ্রেন দেবেন।

৪· বাসকপাতার রস, বড়দের ২ থেকে ৩ চা চামচ, ছোটদের $^{1}/_{4}$ থেকে ১ চা চামচ, মধু দিয়ে দিনে ২/৩ বার দেবেন।

৫· শুকনো বা খুসখুসে কাশিতে কফ বার করার জন্যে পাঁচন বা ক্বাথ:

শুঁট ১ টি, গোলমরিচ ১০ টি, তেজপাতা ৪ টি, মিছরি গুঁড়ো ১ চা চামচ; এগুলি একটু থেঁতো করে ৩ কাপ জলে সিদ্ধ করে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে অল্প গরম অবস্থায় দিনে দুবার খাবেন।



ইউক্যালিপটাস গাছ

বড়দের যদি সর্দিকাশি হয়:

৬· ২ গ্লাস জলে ১ মুঠো ইউক্যালিপটাসের পাতা ফুটিয়ে নিন। জল ফুটে ফুটে ১ গ্লাস হয়ে যাক। এই জলটা ছেঁকে চিনি মিশিয়ে নিন। দিনে ৩ বার করে এটা খান।

৭· সর্দিকাশির আর একটা ওষুধ হচ্ছে গুমা। এটা একটা বুনো গাছ—এর ফুলগুলো ঘণ্টার মত দেখতে। এর পাতা একটু হলুদ দিয়ে জলে ফুটিয়ে, সেই ভাপ শ্বাস দিয়ে টেনে নিলে সর্দি তরল হয়। ভাপ বাড়াবার জন্যে কয়েকটা গন্‌গনে পাথর জলে ফেলে দিন।

৭ দিনের বেশি সর্দিকাশি চললে বা জ্বর হলে চিকিৎসার জন্যে পৃঃ ২০৫-২০৬ দেখুন।

মাথায় সর্দি বসা (সাইনাসাইটিস পৃঃ ২০২)

১· রেড়ির তেলে এক টুকরো হলুদ ভিজিয়ে সেটা পুড়িয়ে তার ধোঁয়ায় শ্বাস নিন।

২· কয়েকটি গোলমরিচ পুড়িয়ে তার ধোঁয়ায় শ্বাস নিন। অথবা গুঁড়ো করে কাপড়ে ছেঁকে সেটা নস্যি নিন। কট্‌দাল গুঁড়ো করে কাপড়ে ছেঁকে নস্যি নিলে পুরোনো সাইনাসাইটিসে কাজ হয়।

৩· গরম ছাইয়ে রসুন সেঁকে দিনে ৩ বার খান।

৪· একটা মেঠো কাঁকড়া খোসা সমেত বেটে ফেলুন। তাতে একটু জল মিশিয়ে পাৎলা কাপড়ে ছেঁকে নিন। একটু ধনে, জিরে, রসুন, মরিচ আর নুন একসঙ্গে বেটে নিন। কাঁকড়ার রসের সঙ্গে এটা মেশান। সবটা ফুটিয়ে গরম গরম খেয়ে নিন। তারপর চাদর মুড়ি দিয়ে থাকুন। সর্দির সঙ্গে অল্প জ্বর থাকলে এতে উপকার হয়।

৫· আধ কাপ উচ্ছের সঙ্গে আধকাপ পাতিলেবুর রস আর এক বড় চামচ মধু মিশিয়ে নিন। দিনে ৩ বার খান।

৬· কালোজিরে একটু থেঁতো করে কাপড়ে পুঁটলি বেঁধে মাঝে মাঝে শুঁকুন।

গলা ব্যথা (পৃঃ ৩৫৬)

১· সমান সমান মধু আর লেবুর রস মেশান। ১০ মিনিট অন্তর অন্তর বড় চামচের এক চামচ খেলে খুব আরাম হয়।

২· খানিকটা জল ফোটান। একটা পাতিলেবুর রস আর চিনি বা নুন মিশিয়ে গরম গরম খেয়ে নিন।

৩· এক চিমটে হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দুধ ফুটিয়ে গরম গরম খান।

৪· এক গ্লাস দুধে ১ চিমটে গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে ফুটিয়ে গরম গরম খান।

গলা ভাঙা বা বসে যাওয়া

১· বচ ও যষ্ঠিমধু গুঁড়ো সমান মাত্রায় মিশিয়ে ১-৪ গ্রেন, মধু দিয়ে খান।

২· ২০ টা গোলমরিচ থেঁতো করে ১ কাপ জলে সেদ্ধ করে সেই জলে ২/৩ বার কুলকুচো করলে গলা বসায় কাজ হয়।

পেটে খিচ ধরা, পেটে ব্যথা, পিত্তকোষের ব্যথা (পৃঃ ৩৭৮)

ধুতরোর পাতায় একটা ওষুধ আছে যা পেটে খিচ ধরা, পেটে ব্যথা, এমনকি পিত্তকোষের ব্যথাও কমিয়ে দেয়।

১· ধুতরোর দুটো বা একটা পাতা বেটে সেটা ৭ বড় চামচ (১০০ মিঃ লিঃ) জলে এক দিন ভিজিয়ে রাখুন। শুধু বড়দের মাত্র ১০ থেকে ১৫ ফোঁটা ৪ ঘন্টা অন্তর অন্তর দেবেন।

২· শাঁখ পুড়িয়ে তার গুঁড়ো আর শুঁঠ গুঁড়ো সমান মাত্রায় মিশিয়ে ১ চা চামচ গরম জল দিয়ে খাবেন।
৩· সামান্য হিং গুঁড়ো আর সাবান মিশিয়ে পেটের ওপর থেকে নিচে মালিশ করলে গ্যাসের ব্যথা কমতে পারে।

সাবধান: মাত্রা যা দেয়া হল তার বেশি খেলে ধুতরো মারাত্মক বিষ। পাওয়া গেলে ব্যথার বড়ি খাওয়াই ভালো।



পাৎলা পায়খানা (পৃঃ ১৮১) আমাশয়, অম্বল ইত্যাদি

যদি পাৎলা পায়খানা বেশি না হয়, আর জ্বর, বমি, পায়খানায় রক্ত বা শরীরে জলের অভাবের চিহ্ন না থাকে:

১· চাল সেঁকে সেঁকে কালো করে নিন। বেটে নিন। প্রতিবার পাৎলা পায়খানা করার পর বড়দের ২ বড় চামচ, ছোটদের ১ বড় চামচ দেবেন।
২· অল্প পাৎলা পায়খানায়, দুধ চিনি ছাড়া কড়া চা লেবুর রস দিয়ে খেলে উপকার হয়।
৩· পেয়ারাপাতা বেটে জল মিশিয়ে ফুটিয়ে নিন। ছেঁকে নিয়ে দিনে তিনবার ২ চা চামচ করে খাওয়ান।
৪· একটা কচি ডালিম ছাড়িয়ে বেটে নিন। দই বা ঘোলের সঙ্গে মিশিয়ে দিনে দু বার খাওয়ান।
৫· অল্প পাৎলা পায়খানায় কাঁচকলা খুব কাজ দেয়।

যদি অল্প পাৎলা পায়খানার সঙ্গে রক্ত বা আম থাকে কিন্তু শরীরে জলের অভাবের কোনো চিহ্ন না থাকে:



৬· বটগাছের একটু সাদা দুধ (আঠা) খানিকটা জলে মিশিয়ে প্রতিবার পাৎলা পায়খানা করার পর বড়দের দু চা চামচ আর ছোটদের এক চা চামচ দিন।

যদি পাৎলা পায়খানার সঙ্গে বমি থাকে:

৭· কিছু জিরে সেঁকে তাতে একটা পাতিলেবুর রস আর একটু নুন মিশিয়ে নিন। দিনে ৩ বার খান।
৮· আমাশয় হলে থানকুনি পাতার রস বড়দের দিনে দু বার ১ থেকে ৩ চা চামচ দেবেন; ছোটদের ১/৪–১ চা চামচ দিনে দু বার দেবেন।
৯· হজমের গোলমাল থেকে পেট ফাঁপলে যমানী গুঁড়ো আর বিট নুন সমান মাত্রায় মিশিয়ে ১ চা চামচ করে দু বেলা খাওয়ার পর খাবেন। চোঁয়া ঢেকুর উঠলে যমানী ও সোরা সমানমাত্রায় বেটে গোঁড়ালেবুর রসে ভিজিয়ে ছোট ছোট বড়ি করে ১টি বা ২টি খাবেন।
১০· অম্বল, গলা জ্বালায় ধনে মৌরি ১ চা চামচ করে আর ২টি পলতাপাতা নিয়ে ১ কাপ জলে ভিজিয়ে ঐ জল দু বেলা খাবেন।
১১· শিশুদের অখিদে বা হজমের গোলমাল হলে প্রতিদিন সকালে ১/২টি করে কালমেঘ বড়ি খাওয়াবেন।

যাদের পাৎলা পায়খানা হয়েছে তাদের সকলকেই চিনি নুনের সরবৎ দিন (পৃঃ ১৮২)

পোয়াতি অবস্থায় বমি (পৃঃ ২৯৪)

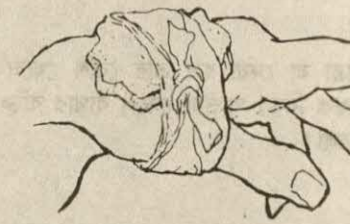
১· ৬–৭টি লবঙ্গ গুঁড়ো করে ১ গ্লাস জলে আধ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। এই জলটা ছেঁকে রোজ সকালে খান।

টাটকা কাটাকুটি বা ক্ষত (পৃঃ ৯৭)

১· কাটার জায়গাটা পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এক টুকরো টাটকা আদা ধুয়ে একটু চিনি দিয়ে বেটে নিন। কাটার ওপর লাগিয়ে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে বেঁধে নিন। যতক্ষণ না কাটাটা পুরো সেরে যায় আর আদাটা নিজেই খুলে পড়ে যায়—ব্যাণ্ডেজটা সরাবেন না। ব্যাণ্ডেজটা একদম শুকনো রাখা দরকার।

২· দূর্বাঘাস ধুয়ে থেতো করে কাটার জায়গায় লাগান।
৩· নিমপাতা সেদ্ধ করে তার জলে ঘা বা ক্ষত ধুলে উপকার হয়।

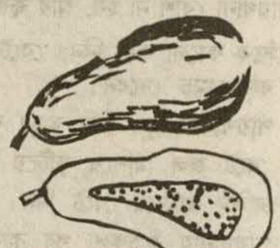
পরিষ্কার ঘা



যদি পুঁজ না থাকে, তবে জলে কিছু ভেলা ফুটিয়ে নিন। জলটা ছেঁকে তাই দিয়ে ধুয়ে নিন। তারপর বাদামগুলো বেটে মলমটা ঘায়ে লাগান। ঘাটা পরিষ্কার রাখবেন।

পুরোনো ঘা আর ক্ষত (পৃঃ ১০১)

ঘা বা ক্ষতের চিকিৎসা না করলে অনেক সময় তাতে সংক্রমণ হয় আর অনেকটা পুঁজ হয়।



১· একটা কাঁচা পেঁপে ফালি করুন। ভেতরের শাঁসটা বার করে ঘায়ের ওপর লাগান। পরের দিন ধুয়ে ফেলে আবার টাটকা শাঁস লাগান। যতদিন না ঘাটা পরিষ্কার হচ্ছে এইভাবে চালিয়ে যান। তারপর পরিষ্কার ঘায়ের মত (উপরে দেখুন) ভেলা দিয়ে চিকিৎসা করুন। **কুষ্ঠের ঘায়ে এই চিকিৎসা খুব কাজ করে।**

২· বটের আঠা পুঁজ ভরা ঘা পরিষ্কার করার জন্যে খুব ভালো। এটা গোড়ালির ফাটা সারানোর জন্যেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

যে ঘা পরিষ্কার, তা কোনো এনটিসেপটিক ছাড়াই সারে।

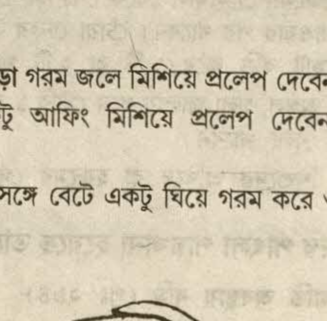
৩· **এক চা চামচ দই-এ এক টুকরো তুঁতে ঘষে নিন—যতক্ষণ না দইটা হালকা নীল রঙের হয়ে যায়। পোড়া হাঁড়ির তলা থেকে একটু পরিষ্কার ভুসো মেশান। ঘায়ে লাগান। এতে ঘায়ে মাছি বসা বন্ধ হয়। ঘা ধোবেন না। সেরে গেলে কালো মামড়িটা আপনিই খসে পড়বে।**

৪· **যজ্ঞডুমুরের পাতা সেদ্ধ করে সেই জল দিয়ে পচা ঘা বা ক্ষত ধোবেন।**

আঘাত থেকে ক্ষত বা ঘা

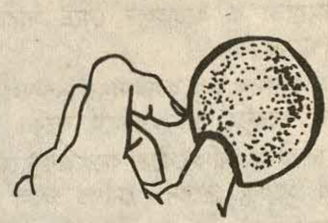
১· শরীরের কোনো জায়গায় আঘাত পেয়ে ব্যথা, ফোলা থাকলে **নালুকার গুঁড়ো** গরম জলে মিশিয়ে প্রলেপ দেবেন।
২· মুসব্বর, সমুদ্রের ফেনা আর ধুতরো সমান মাত্রায় বেটে তাতে একটু আফিং মিশিয়ে প্রলেপ দেবেন।
৩· আঘাতের ব্যথায় **চুনহলুদের** প্রলেপ খুব উপকার দেয়।
৪· কেটে বা কিছু ফুটে ব্যথা হলে এক কোয়া **রসুন** ও একটি পানপাতা একসঙ্গে বেটে একটু ঘিয়ে গরম করে ওই জায়গায় লাগাবেন।

ডায়াবেটিসের ঘা



একটা বেগুন পোড়ান। কর্পূর মিশিয়ে ঘায়ে লাগান, ঘা সেরে যাবে। ডায়াবেটিসে যা যা খাওয়া উচিত তাই খাবেন (পৃঃ ১৪৯)।

নখের নিচে পুঁজ



১· একটা পাকা হলদে পাতিলেবুতে গর্ত করে তার মধ্যে আঙুলটা ঢুকিয়ে রাখুন, যতক্ষণ না পুঁজটা চলে যায়।

২· নখকুনি হলে, লোহার পাত্রে কাঁচা হলুদের রসে হরিতকী ঘষে লাগাবেন।

ফোড়া (পৃঃ ২৪৪)

ফোড়ায় যখন যন্ত্রণা থাকে

১· সাবান আর হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে মলম তৈরি করে লাগান। হলুদ এনটিসেপটিক। ফোড়া চট করে ফেটে যাবে আর তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে।

২· ফোড়ায় একটু রেড়ির তেল লাগান। চাল গুঁড়ো আর হলুদ গুঁড়ো একসঙ্গে মিশিয়ে সেদ্ধ করে ফোড়ায় লাগান। পরিষ্কার ছেঁড়া কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখুন। ১২ ঘন্টার মধ্যে ফোড়াটা ফেটে যাবে। ফোড়া ফাটার পর পুঁজ ভরা ঘায়ের মত চিকিৎসা করুন (উপরে দেখুন)।

৩· কাঁচা ফোড়ায় কেলেকড়ার পাতা বা গোয়ালেলতার পাতা বেটে লাগালে ফোড়া তাড়াতাড়ি সারে।

মুখ আর জিভের ঘা (পৃঃ ২৭৬)

যা যা খাওয়া দরকার সেই সব জিনিস না খেলেই (অপুষ্টি) সাধারণতঃ এই ধরনের ঘা হয়। এই ঘায়ে যন্ত্রণা হয়, খাবার ইচ্ছে চলে যায়। তার থেকে অপুষ্টি আরো বাড়ে।

এই রোগের যন্ত্রণা কমানো যায়, তাতে রোগী ঠিকমত খেতে পারে। ঠিকমত পুষ্টি হলে তবেই এই ঘা পুরোপুরি সারে।

নিচে কতকগুলি ওষুধ দেয়া হল। এগুলো ঘায়ের ওপর প্রলেপ দিয়ে দেয় বলে যন্ত্রণাটা কমে যায়।

১· বটগাছের ছাল বেটে তার রস ঘায়ে লাগান।

২· ঘায়ের যন্ত্রণা কমাতে বটের আঠাও লাগানো যেতে পারে।

৩· খাবার আগে কয়েকটা পেয়ারা পাতা চিবিয়ে নেবেন। এই পাতায় পেকটিন আছে, সেটা ঘায়ের ওপর প্রলেপ দিয়ে ব্যথা কমিয়ে দেয়। যজ্ঞডুমুর বা পেয়ারাপাতা সেদ্ধ করে সেই জল দিয়ে খাবার আগে কুলকুচো করলেও কাজ হয়।

৪· ভেলা বেটে ঘায়ের ওপর লাগান।

৫· সোহাগার খৈ করে মধু দিয়ে সেটা মুখের ভেতরে, জিভে লাগাবেন।

পেটের আলসার (ঘা) আর বুক জ্বালা (পৃঃ ১৪৯)

১· খানিকটা ভাত জলে এক রাত ভিজিয়ে রাখুন। সকাল বেলা সেই ভিজে ভাতে ২ চা চামচ মেথি মিশিয়ে খালি পেটে খেয়ে নিন।



২· প্রতি সকালে টাটকা চালকুমড়োর রস খেলে পেট জ্বালা কমে।

৩· থোড়ের রস জলে মিশিয়ে দিনে ৩ বার খান। এই রস এলকালাইন বলে পেটের এসিডের কাজ কমিয়ে দেয়।

৪· অম্বলের জন্যে এক গ্লাস জলে এক চিমটে খাবার সোডা মিশিয়ে খেয়ে নেবেন। এটা বার বার খাবেন না।

৫· একটা আস্ত নারকেল ছাড়িয়ে ফুটো করে ভেতরে সমান পরিমাণ যোয়ান আর সৈন্ধব নুন ভরে কাপড় জড়িয়ে কাদামাটি মাখিয়ে শুকিয়ে নিন। তারপর সেটা ঘুঁটের আগুনে পুড়িয়ে নিন। পরে খুব মিহি গুঁড়ো করে রাখুন। খাবার পর ১ চা চামচ করে খাবেন।

জল বসন্তের গুটি (পৃঃ ৩৫৮)

১· নিমের পাতা রোগীর বিছানায় বিছিয়ে দিন, আর সারা শরীরে বোলান। নিমপাতা এনটিসেপটিক আর শরীর ঠাণ্ডা রাখে। চুলকুনিও কমায়। নিমপাতা জলে ফুটিয়ে সেই জল দিয়ে রোগীকে স্নান করান। রোজ স্নান





করা ভালো। হাম বা বসন্ত সারার পর নিমপাতা ও কাঁচাহলুদ বেটে সারা শরীরে মাখাবেন।

২· হাম ও বসন্ত শুরু হবার সময় নিশাদল গুঁড়ো করে, বয়স অনুসারে ১ থেকে ৬ গ্রেন, চিনির জলে মিশিয়ে দিনে ৩ বার খাবেন। গুটি বেরিয়ে যাবে।

৩· ১ চা চামচ মেথি থেতো করে একটু মৌরি আর মিছরির সঙ্গে ১ কাপ জলে ফুটিয়ে দিনে দু বার খাবেন। ছোটদের এর অর্ধেক দেবেন। মেথির জলে গা মোছাবেন।

৪· কালমেঘের বড়ি বয়স অনুসারে ¼ থেকে ১ টি দিনে দু বার খাবেন।

৫· হাম বা বসন্তে জ্বর হলে মহালক্ষ্মীবিলাস বড়ি বয়স অনুসারে ¼ থেকে ১ টি, মধু বা গরম জল দিয়ে দিনে দু বার খাবেন।

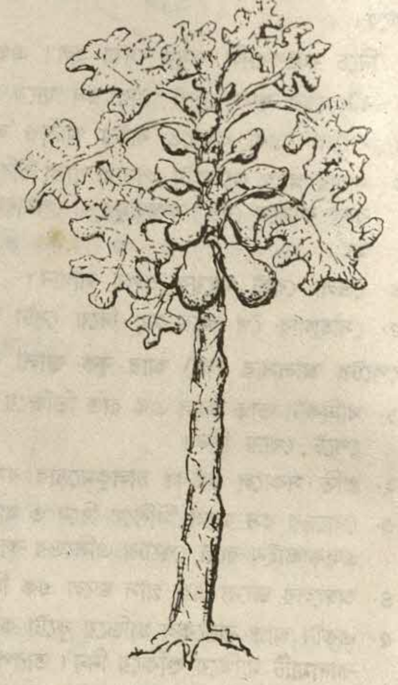
বিছের কামড় (পৃঃ ১২৩)

১· এক টুকরো পেঁয়াজ কেটে কামড়ের জায়গায় ঘষে দিন। এতে ব্যথা কমে।

২· এক চিমটি পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট আর এক চিমটি সাইট্রিক এসিড একসঙ্গে গুঁড়িয়ে নিন (সাইট্রিক এসিড না পেলে ১ ফোঁটা পাতিলেবুর রস নেবেন)। গুঁড়োটা একটা কাগজের টুকরোয় নিয়ে আস্তে আস্তে কামড়ের **ঠিক** ওপরে দিন। এক ফোঁটা জল দিয়ে দিন। ওষুধটা জোর বুড়বুড়ি কাটবে, আর খুব গরম হয়ে যাবে। এতে সাধারণতঃ ব্যথাটা তখনকার মত পুরোপুরি বা অনেকটাই চলে যায়।

সাবধান: নরম চামড়া বেশি পুড়ে যেতে পারে বা ফোসকা হয়ে যেতে পারে। **শুধু কামড়ের জায়গাটুকুতেই গুঁড়োটা দেবেন।**

৩· বকুলবীজ ঘষে বা গাঁদা ফুলের পাতা বেটে কামড়ের জায়গায় লাগান।



কৃমি (পৃঃ ১৯৩)

১· পেঁপে কৃমি সারাতে পারে, তবে আধুনিক ওষুধেই সাধারণতঃ বেশি কাজ হয়।

কাঁচা পেঁপে বা পেঁপে গাছের গা কাটলে যে দুধটা বার হয় সেটা ৩ বা ৪ চা চামচ (১৫-২০ মিঃ লিঃ) সংগ্রহ করুন। এর সঙ্গে সমান পরিমাণ মধু নিয়ে ১ কাপ গরম জলে নেড়ে মিশিয়ে নিন। সম্ভব হলে কোনো মৃদু জোলাপের সঙ্গে খেয়ে নিন।

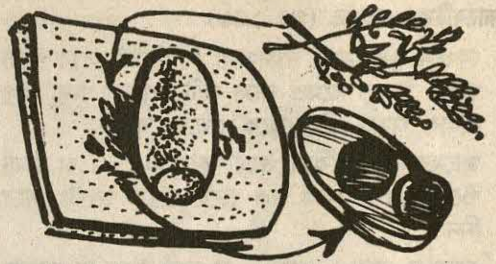
রাউণ্ডওয়ার্ম—কেঁচোকৃমি (পৃঃ ১৯৩)

১· পেঁপের দুটি বিচি থেঁতো করে এক গ্লাস দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেয়ে নিন। পরপর দু দিন এটা খাবেন।

২· কয়েকটি ডালিমের পাতা থেঁতো করে ১ গ্লাস দুধে ফুটিয়ে নিন। সকালে খাবার আগে অর্ধেকটা খান। বাকিটা ২ ঘন্টা পরে খেয়ে নিন। আরো দু ঘন্টা পর ২ বড় চামচ রেড়ির তেল খান।

এই চিকিৎসার ঠিক আগে বা চিকিৎসার সময় রোগীকে কিছু খেতে দেবেন না।

থ্রেডওয়ার্ম—সুতোকৃমি (পৃঃ ১৯৪)



১· নিমপাতা খুব মিহি করে বেটে নিন। এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন সকালে খালিপেটে এই নিমপাতা বাটার একটি করে গুলি খাবেন। সুতোকৃমি পুরোপুরি সারাতে হলে বাড়ির সকলের একসঙ্গে এই চিকিৎসা করা উচিত।

হুকওয়ার্ম—বক্রকৃমি (পৃঃ ১৯৫)

১· পলাশবীজ গুঁড়ো করে ১/৪ চা চামচ নিয়ে ১/২ চা চামচ যোয়ান গুঁড়োর সঙ্গে মিশিয়ে রোজ ২ বেলা খাবেন।

টেপওয়ার্ম—ফিতেকৃমি (পৃঃ ১৯৬)

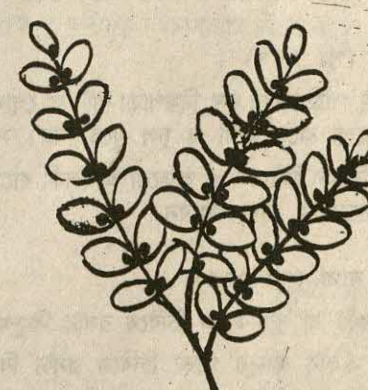
১· ছোট এক গ্লাস দুধের সঙ্গে একটি সুপুরি বেটে নিন। ভোরবেলা খালি-পেটে এটি খাবেন।

২· একমুঠো চালকুমড়োর বিচি গুঁড়ো করে নিন। সকালে খালিপেটে খান। ২ ঘণ্টা পর ২ চা চামচ রেড়ির তেল খেয়ে নেবেন।

৩· ছোট্ট একটুকরো হিং জলে গুলে খালি পেটে খাবেন। সব রকম কৃমিতে কাঁচা হলুদের রস একটু নুন মিশিয়ে ৪ চা চামচ করে রোজ সকালে খাবেন। ৫ দিন খাবেন। অথবা ১ চা চামচ করে কালমেঘ পাতার রস খাবেন। চিরেতা ভিজোনো জল একদিন অন্তর সকালে খালিপেটে খাবেন।

ন্যাবা আর হেপাটাইটিস (পৃঃ ২০৯)

১· ভিন আমলা: এটি একটি ছোট জংলী গাছ। পাতার নিচে নিচে ছোট ছোট জামের মত ফল থাকে। *চিকিৎসা:* পুরো একটা গাছ নিয়ে বেটে ফেলুন। এই বাটাটা ভোরবেলা খালি পেটে খাবেন। এতে ন্যাবা সারে না। কিন্তু বমি কমে আর রোগী খাবার জিনিস খেতে পারে।



২· কালমেঘ পাতার রস দিনে দুবার ১ থেকে ২ চা চামচ করে খেতে দিন।

৩· কুলেখাড়ার পাতার রস দিনে ২ বার ১ থেকে ২ চা চামচ করে খেতে দিন।

৪· দারুহরিদ্রা জল দিয়ে ঘসে সেই জল দিনে ২ বার ১ চা চামচ করে খেতে দিন।

৫· রোহিতক ডাল গুঁড়ো করে ১ চা চামচ করে দু বেলা খাবার পর খাবেন।

৬· ২/৩ টে রেড়ির পাতা বেটে প্রতিদিন একটা করে ঐ বাটার গুলি খান। এতেও বমি কমে।

হাই ব্লাড প্রেশার—রক্তের চাপ বাড়া (পৃঃ ১৪৭)

১· হলদে ডাঁটার রস ১ চা চামচ খাবার পরে খাবেন।

২· আদার রস ১ চা চামচ, মধু ১ চা চামচ আর জিরে গুঁড়ো ১ চা চামচ মিশিয়ে দিনে একবার করে খান।

৩· রক্তের চাপ কমানোর জন্যে দই, কাঁচা পেঁয়াজ, রসুন আর হলুদ গুঁড়ো খুব ভালো।

৪· সর্পগন্ধার গুঁড়ো ১ চা চামচ প্রতিদিন রাত্রে শোবার আগে খাবেন।

৫· ৩ গ্রাম জটামাংসী ১ কাপ জলে ভিজিয়ে রোজ সন্ধ্যায় চিনি দিয়ে ওই জলটা খাবেন। এতে ঘুমও হয়।

৬· শুসনি পাতার রসেও রক্তচাপ কমায়।

ডায়াবেটিস—বহুমূত্র (পৃঃ ১৪৯)

১· বেগুনি ফুলওয়ালা নয়নতারা (পেরিউইঙ্কল)। পুরো গাছটা শিকড় সমেত জলে ফুটিয়ে নিন। অন্য কিছু খাবার আগে এটা ছেঁকে খেয়ে ফেলুন।

২· জামের বিচি শুকিয়ে গুঁড়ো করে নিন। ১ চা চামচ গুঁড়োর ওপর গরম জল ঢেলে ছেঁকে জলটা খেয়ে নিন।

৩· রোজ দু বেলা ১ থেকে ৩ চা চামচ উচ্ছে বা করলার রস খাবেন।

৪· মেথি একটু সেঁকে নিয়ে রোজ সকালে ১ চা চামচ মাত্রায় খাবেন।

৫· রোজ সকালে খালি পেটে ১ থেকে ২ চা চামচ নিমপাতার রস খাবেন।

৬· একটা লজ্জাবতীলতা শিকড় শুদ্ধ উপড়ে তুলে নিন। বেটে নিন বা চালের সঙ্গে সেদ্ধ করে কাঁজি বানিয়ে নিন। রোজ এটা খাবেন।



হাঁপানি (পৃঃ ২০৪)

১· কয়েকটা মালাবার নাটের পাতা সেদ্ধ করে নিন। আর একটা ঐ পাতার ভেতরে সেদ্ধ পাতা রেখে, পাকিয়ে ধরিয়ে বিড়ির মত খান।

২· রোজ সকালে একটা করে অনন্তমূলের পাতা চিবিয়ে খাবেন।

৩· ৩ গ্রাম কন্টকারি ৪ কাপ জলে সেদ্ধ করে ১ কাপ হলে সেটা খাবেন।

খুসকি (পৃঃ ২৫৭)

১· দই, পাতিলেবুর রস, নিমপাতা বাটা বা গোলমরিচ ও জিরা বাটা মাথায় আর চুলে লাগান। এক ঘণ্টা রেখে দিন। ভালো করে মাথা ও চুল ধুয়ে নিন। সপ্তাহে একবার এটা করবেন।

২· খানিকটা রিঠাফল ও শুকনো আমলকী রাত্রে জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন ওই জলে মাথা ও চুল ধোবেন। সপ্তাহে ২ দিন করবেন।

দাঁতে ব্যথা (পৃঃ ২৭৫)

১· একটি বা দুটি লবঙ্গ চিবিয়ে রসটা কিছুক্ষণ মুখে রেখে দিন। ১ ফোঁটা লবঙ্গের তেলও লাগাতে পারেন।

২· দু একটা কাজুর পাতা চিবিয়ে রসটা কিছুক্ষণ মুখে রেখে দিন।

৩· আমপাতা পুড়িয়ে তার গুঁড়ো দিয়ে দাঁত মাজলেও দাঁতে ব্যথা কমে।

৪· পোকা খাওয়া দাঁতের যন্ত্রণায় একটু হিং গরম করে টিপে ওই জায়গায় লাগিয়ে দিন।

৫· যজ্ঞডুমুর পাতা সেদ্ধর জল বা ফটকিরির জল দিয়ে কুলকুচো করুন।

এই সব ওষুধে কিছুক্ষণের জন্যে ব্যথা কমে। এতে সমস্যাটা মেটে না। দাঁতটায় গর্ত বোজাবার দরকার আছে কি না বা দাঁতটা তুলতে হবে কি না জানার জন্যে স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ নিন।

মাসিকের ব্যথা (পৃঃ ২৯১)

১· উচ্ছের পাতা একটু গোলমরিচ আর রসুনের সঙ্গে বেটে নিন। এটা রোজ একবার করে তিন দিন ধরে খাবেন।

২· ছোট্ট এক ডেলা হিং গরম জল দিয়ে খেতে দিন।

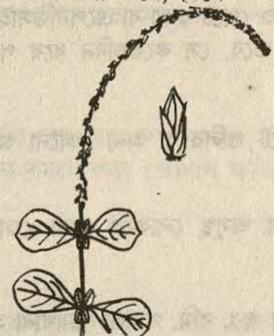
৩· ওলটকম্বলের মূলের ছাল গুঁড়ো ১/৪ থেকে ১/২ চা চামচ রোজ দু বার খাবেন।

৪· ১টি লাল জবাফুলের কুঁড়ি ১/২ কাপ চালধোয়া জলে বেটে মাসিকের সময় খাবেন।

পোয়াতি অবস্থায় পা ফোলা (পৃঃ ২৯৪)

ফোলা কমাবার জন্যে:

১· তালের গুড় আর মেথি একসঙ্গে সেদ্ধ করুন। ছেঁকে, যত দিন না ফোলা কমে, দিনে ৩ বার করে খান।



২· বিছুটির পাতা ফুটিয়ে সকালে খাবেন। রোগিনীর বেশি পেচ্ছাপ হবে। এতে পায়ের ফোলা কমবে।

৩· ভুট্টার ওপরে যে সিল্কের মত সুতো থাকে তার সরবতে কখনো কখনো পা ফোলা কমে যায়। বেশ বড় এক মুঠো ভুট্টার সুতো নিয়ে জলে ফুটিয়ে ১-২ গ্লাস খান। এতে কোন বিপদের ভয় নেই।



৪· শ্বেতপুনর্নবার রস রোজ ১-২ চা চামচ খাবেন।

ভুয়ো বা মিছিমিছি প্রসব যন্ত্রণা (পৃঃ ৩০৪)

১· সজনেপাতা গোটা ধনের সঙ্গে জলে সেদ্ধ করে, সেই জল এক গ্লাস খান। যদি ব্যথাটা আসল না হয়, তাহলে চলে যাবে।

২· দারচিনি বেটে জল বা দুধ দিয়ে খান। কিংবা শুঁঠ, দারচিনি, দেবদারু ও যষ্ঠিমধু সমানমাত্রায় নিয়ে গুঁড়ো করে ১-২ চা চামচ গরম জলের সঙ্গে দিনে ২ বার খান।

ডুস, মৃদু জোলাপ ও জোলাপ:
কখন ব্যবহার করা উচিত আর কখন উচিত নয়

অনেকে বড় ঘনঘন ডুস আর জোলাপ নিয়ে থাকেন। পেট পরিষ্কার করার বাতিকটা পৃথিবীর সব দেশেই দেখা যায়।

ঘরোয়া চিকিৎসা হিসেবে ডুস আর জোলাপ খুবই চালু পদ্ধতি। এগুলো প্রায়ই খুব ক্ষতি করে। অনেক লোক বিশ্বাস করে যে, জ্বর বা পাৎলা পায়খানার অসুখ, ডুস (মলদ্বার দিয়ে নাড়ি ভুঁড়ির ভেতরে জল ঢুকিয়ে দেয়া) বা কড়া জোলাপ দিয়ে ধুয়ে ফেলা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অসুস্থ শরীরকে এইভাবে পরিষ্কার করার বা ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করলে সাধারণতঃ দুর্বল নাড়িভুঁড়ির আরো ক্ষতি হয়ে যায়।



**ডুস আর জোলাপে উপকার বিশেষ হয় না।
এগুলো প্রায়ই বিপদ ডেকে আনে—
বিশেষ করে কড়া জোলাপ হলে।**

যে সব ব্যাপারে ডুস বা জোলাপ দেয়া বিপজ্জনক :

রোগীর যদি প্রচণ্ড পেটে ব্যথা বা এপেনডিসাইটিস বা পেটের সাংঘাতিক কোনো রোগের অন্য কোনো লক্ষণ থাকে (পৃঃ ১০৬) তবে, সে কয়েকদিন ধরে পায়খানা না করলেও, **কখনো** তাকে ডুস বা জোলাপ দেবেন **না**।

যে রোগীর পেটে গুলির বা অন্য কোনো আঘাত লেগেছে, তাকে **কখনো** ডুস বা কড়া জোলাপ দেবেন **না**।

কোনো দুর্বল বা অসুস্থ লোককে কড়া জোলাপ **কখনো** দেবেন **না**; দিলে সে আরো দুর্বল হয়ে যাবে।

শিশুর যদি বেশি জ্বর, বমি, পাৎলা পায়খানা হয় বা শরীরে জলের অভাবের লক্ষণ (পৃঃ ১৮১) দেখা যায়, তাকে **কখনো** মৃদু বা কড়া কোনো জোলাপ দেবেন না।

ঘনঘন জোলাপ ব্যবহার করাটা **অভ্যেস করে ফেলবেন না**। (পৃঃ ১৫১)।

ডুসের সঠিক ব্যবহার

১· সাদাসিধে ডুসে কোষ্ঠকাঠিন্য (শুকনো, শক্ত, কষ্টকর মল) দূর করতে সাহায্য করে। শুধু কুসুম গরম জল বা একটু সাবান মেশানো জল ব্যবহার করবেন।

২· বমি করতে করতে রোগীর যদি শরীরে জলের অভাব হয়ে যায়, তাকে চিনিনুনের সরবৎ দিয়ে **খুব ধীরে ধীরে** ডুস দিতে পারেন (পৃঃ ১৮২)।

যে সব কড়া ও মৃদু জোলাপ প্রায়ই ব্যবহার করা হয়:

সেনার পাতা **ক্যাসকারা** (ক্যাসকারা সাগ্রাডা)	এগুলো যন্ত্রণাদায়ক জোলাপ—এগুলোতে প্রায়ই উপকারের থেকে অপকারই বেশি হয়। এ সব ব্যবহার না করাই ভালো।
ম্যাগনেশিয়াম কার্বোনেট **মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া** **এপসম সল্টস** (ম্যাগনেশিয়াম সালফেট) (পৃঃ ৪১৭)	এগুলো নুনের জোলাপ। শুধু কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে, মৃদু জোলাপ হিসেবে কম মাত্রায় ব্যবহার করবেন। এগুলো ঘনঘন ব্যবহার করবেন না। **পেটে ব্যথা থাকলে কখনো ব্যবহার করবেন না।**
রেড়ির তেল	যে সব ব্যাপারে দিতে বলা হবে, সেখানে অল্প করে দিলে উপকার হবে।
খনিজ তেল (পৃঃ ৪১৭)	অর্শের রোগীর জন্যে জোলাপ হিসেবে এটা কখনো কখনো ব্যবহার করা হয়, কিন্তু ব্যবহার না করাই ভালো।

মৃদু ও কড়া জোলাপের সঠিক ব্যবহার

মৃদু জোলাপ কড়া জোলাপের মতই—শুধু তেজটা কম। যে সমস্ত জিনিসের তালিকা উপরে দেয়া হয়েছে সে সবগুলোই কম মাত্রায় নিলে মৃদু জোলাপ আর বেশি মাত্রায় নিলে কড়া জোলাপ হয়। মদু জোলাপে মল নরম হয় আর চট করে হয়ে যায়, কড়া জোলাপে পাৎলা মল হয়।

কড়া জোলাপ: যদি কোনো লোক বিষ খেয়ে থাকে যেটা তাড়াতাড়ি বের করে দেয়া দরকার, কেবল তখনি তার খুব কড়া জোলাপ ব্যবহার করা উচিত (পৃঃ ১১৮)। অন্য যে কোনো সময়ে কড়া জোলাপ ক্ষতিকর। দেশি কড়া জোলাপ:

১· এরণ্ডের তেল—৪ থেকে ৮ চা চামচ
২· সোনামুখী পাতা বাটা—২ থেকে ৪ চা চামচ

মৃদু জোলাপ: কোনো কোনো কোষ্ঠকাঠিন্যের বেলায় আপনি কম মাত্রায় মিল্ক অফ্ ম্যাগনেশিয়া বা অন্য ম্যাগনেশিয়াম সল্ট মৃদু জোলাপ হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। অর্শের রোগীদের কোষ্ঠকাঠিন্য হলে তারা খনিজ তেল খেতে পারে, তবে এতে তাদের পায়খানা পিছল হয়ে যায়, নরম হয় না। খনিজ তেলের মাত্রা হল—শোবার আগে ৩ থেকে ৬ চা চামচ (কখনো খাবার সঙ্গে নয়, কারণ তেলের জন্য খাবারের ভিটামিনটা শরীর পায় না)। এটা খুব ভালো উপায় নয়। কতকগুলি দেশি মৃদু জোলাপ:

১· ত্রিফলার গুঁড়ো—১ থেকে ৩ চা চামচ
২· যষ্ঠিমধুর গুঁড়ো—১ থেকে ৩ চা চামচ
৩· তেউড়ির গুঁড়ো—১ থেকে ৩ চা চামচ
৪· সোঁদালের আঠা—৬-১২ গ্রাম
৫· কটকি গুঁড়ো—$^1/_2$ থেকে ১ চা চামচ

এ সবের থেকে ভালো উপায়

ছিবড়েওয়ালা খাবার—আরো নরম আর ঘনঘন মল বার হবার সবথেকে স্বাস্থ্যকর উপায় হল স্বাভাবিক ছিবড়ে বা ভুষিযুক্ত খাবার—যেমন ট্যাপিওকা (সাবু), শস্যদানা, চাল, গম জাতীয় খাবার, ফল, শাকসবজি খাওয়া। **প্রচুর জল খেলেও কাজ হয়।**

যে সব লোকে বেশি পরিশোধন করা 'আধুনিক' খাবার খায় তাদের থেকে যে সব লোকের প্রথাই হচ্ছে প্রচুর ছিবড়েযুক্ত খাবার খাওয়া, তারা অর্শ, কোষ্ঠকাঠিন্য আর অন্ত্রের ক্যানসারে অনেক কম ভোগে। পেট আরো নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে গেলে পরিশোধিত খাবার এড়িয়ে চলবেন, আর ঢেঁকিছাঁটা বা অপরিশোধিত শস্যের থেকে তৈরি খাবার খাবেন।

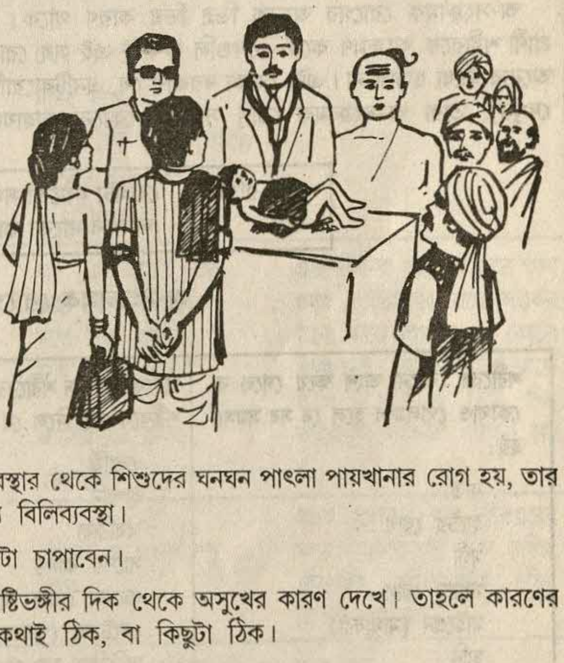
পরিচ্ছেদ

২ যে সব রোগ প্রায়ই গুলিয়ে ফেলা হয়

রোগ কেন হয় ?

নানা দেশের বা নানা ধরনের লোক নানাভাবে রোগের কারণ বোঝান।

শিশুর পাৎলা পায়খানা হয়। কিন্তু কেন?



ছোটখাট গ্রামের লোকে হয়তো বলবে যে এর কারণ হল শিশুটির বাবা মা কোনো পাপ করেছে অথবা তারা কোনো দেবতা বা অপদেবতার কোপদৃষ্টিতে পড়েছে।

ডাক্তার বলতে পারেন যে এর কারণ হচ্ছে শিশুটির কোনো সংক্রমণ হয়েছে।

জনস্বাস্থ্য আধিকারিক হয়তো বলবেন যে এর কারণ হল গ্রামের লোকের জলের ব্যবস্থা ভাল নয় বা তারা পায়খানা ব্যবহার করে না।

সমাজ সংস্কারক বলতে পারেন, যে অস্বাস্থ্যকর অবস্থার থেকে শিশুদের ঘনঘন পাৎলা পায়খানার রোগ হয়, তার পেছনে রয়েছে জমি আর টাকাকড়ির অন্যায্য বিলিব্যবস্থা।

শিক্ষক হয়তো শিক্ষার অভাবের ওপরেই দোষটা চাপাবেন।

লোকে তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা আর দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে অসুখের কারণ দেখে। তাহলে কারণের ব্যাপারে কার কথা ঠিক? হয়তো সকলের কথাই ঠিক, বা কিছুটা ঠিক। এর কারণ:

একটা কারণে শুধু নয়, অনেক মিলেই রোগ হয়



"আমার বাচ্চার এমন হল কেন"

শিশুর পাৎলা পায়খানার রোগের পেছনে হয়তো, ওপরে যে কারণগুলোর কথা বলা হয়েছে, তার প্রতিটিই আছে।

যদি ঠিকমত রোগ এড়াতে আর সারাতে হয়, তবে আপনার এলাকায় যে সব রোগ সাধারণতঃ হয়, আর যে সব কারণে হয়, সেই সব বিষয়ে যতটা সম্ভব বেশি জানা যায়, ততই সুবিধা হয়।

এই বইয়ে, আধুনিক আর বিজ্ঞানসম্মত ডাক্তারি বিদ্যার ধারা আর ভাষা অনুসারেই বিভিন্ন রোগের কথা বেশি আলোচনা করা হয়েছে।

এই বইটা ভালভাবে ব্যবহার করতে হলে আর এতে যে সব ওষুধের কথা বলা হয়েছে সেগুলো নিরাপদে ব্যবহার করতে হলে, ডাক্তারি শাস্ত্র অনুসারে রোগ আর রোগের কারণ সম্বন্ধে আপনার কিছু বোধ থাকা দরকার। এই পরিচ্ছেদটা পড়লে সাহায্য হতে পারে।

বিভিন্ন ধরনের রোগ এবং তার কারণ

নানা রোগ এড়াবার বা সারাবার কথা চিন্তা করতে গেলে সেগুলোকে দুটো দলে ভাগ করে নিলে সুবিধা হয়: সংক্রামক আর অ-সংক্রামক।

সংক্রামক রোগ একজনের থেকে আর একজনের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। এইসব রোগ যাদের হয়েছে তাদের কাছ থেকে সুস্থ লোকদের রক্ষা করা উচিত।

অ-সংক্রামক রোগ একজনের থেকে আর একজনের মধ্যে ছড়ায় না। তার কারণ আলাদা। কাজেই, কোন কোন রোগ সংক্রামক আর কোন কোনটা নয়, এটা জানা জরুরি।

অ-সংক্রামক রোগ

অ-সংক্রামক রোগের অনেক ভিন্ন ভিন্ন কারণ থাকে। কিন্তু, যে সব রোগের বীজ, জীবাণু বা অন্য জীবন্ত প্রাণী শরীরকে আক্রমণ করে—সেগুলি কখনই এই সব রোগের কারণ হয় না। এগুলো কখনো একজনের থেকে অন্যের মধ্যে ছড়ায় না। এটা বোঝা দরকার যে, এনটিবায়োটিক, বা যে সব ওষুধ জীবাণুর সঙ্গে যুদ্ধ করে (পৃঃ ৬৭ দেখুন), তারা অ-সংক্রামক রোগ সারাতে কোনো সাহায্যই করে না।

> মনে রাখবেন : রোগটা নয়কো সংক্রামক—যদি জানো ঠিক,
> লাগবে নাকো কাজে তাতে এনটিবায়োটিক।

অ-সংক্রামক রোগের উদাহরণ

শরীরের কোনো অংশ ক্ষয়ে গেলে বা কোথাও গোলমাল হলে যে সব সমস্যা হয়:	বাইরের জিনিস শরীরের ক্ষতি করলে বা শরীরকে কষ্ট দিলে যে সব সমস্যা হয়:	শরীরে যা যা দরকার তার মধ্যে কোনো কিছুর অভাবে যে সব সমস্যা হয়:
বাত হার্টের রোগ মৃগী সন্ন্যাস রোগ মাইগ্রেন (মাথাধরা) ছানি ক্যানসার বা কর্কট রোগ	এলার্জি হাঁপানি বিষক্রিয়া সাপের কামড় ধূমপান থেকে কাশি পেটে ঘা (আলসার) অতিরিক্ত মদ খাওয়া	অপুষ্টি পেলাগ্রা রক্তহীনতা গলগণ্ড লিভারের সিরোসিস (কিছুটা কারণ)

যে সব সমস্যা নিয়ে মানুষ জন্মায়:	যে সব সমস্যা মনে জন্মায় (মানসিক রোগ):
গন্নাকাটা টেরা বা বেঁকা চোখ শরীরের অন্যান্য খুঁত (বিকৃতি) মৃগী (কয়েক রকম) জড়বুদ্ধি (অপরিণত) শিশু জন্মের দাগ (জড়ুল)	যে জিনিস ক্ষতিকর নয় অথচ সেটা ক্ষতিকর এই ধারণার জন্যে ভয় স্নায়বিক উদ্বেগ (উৎকণ্ঠা) গুন করায় (ডাইনিবিদ্যেয়) বিশ্বাস বেসামাল ভয়

সংক্রামক রোগ

জীবাণু বা অন্য যে সমস্ত জীবন্ত প্রাণী শরীরের ক্ষতি করে সেগুলো থেকে সংক্রামক রোগ জন্মায়। এই রোগ গুলো নানাভাবে ছড়ায়। এখানে, যে সব জীবন্ত প্রাণী সংক্রমণ ঘটায় আর তাদের থেকে যে সব রোগ হয় সেগুলোর মধ্যে সবথেকে জরুরি কয়েকটির উদাহরণ দেওয়া হল:

সংক্রামক রোগের উদাহরণ

যে সব *প্রাণী* রোগ ঘটায়	রোগের নাম	রোগটা কি করে ছড়ায় বা শরীরে ঢোকে	প্রধান ওষুধ
জীবাণু (অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা যায় এমন প্রাণী বা বীজাণু)	যক্ষ্মা	বাতাস দিয়ে (কাশি)	এনটিবায়োটিক
	ধনুষ্টঙ্কার	নোংরা ক্ষত	
	কিছু পাৎলা পায়খানার রোগ	নোংরা হাত, জল, মাছি	
	নিউমোনিয়া (কয়েক রকমের)	বাতাস দিয়ে (কাশি)	
	গনোরিয়া আর সিফিলিস	যৌন সংস্পর্শে	
	কানে ব্যথা	সর্দির সঙ্গে	
	ক্ষতে সংক্রমণ	নোংরা জিনিসের সংস্পর্শে	
	পুঁজ সমেত ঘা	সরাসরি সংস্পর্শে (ছোঁওয়ায়)	
ভাইরাস (ব্যাকটিরিয়ার থেকে ছোট বীজাণু)	সর্দি, ফ্লু, হাম, মাম্‌প্‌স্‌, জলবসন্ত, বাচ্চাদের পক্ষাঘাত, ভাইরাসঘটিত পাৎলা পায়খানা	যার রোগ হয়েছে তার কাছ থেকে বাতাসের মধ্যে দিয়ে কাশি, মাছি ইত্যাদি দিয়ে	এসপিরিন বা যন্ত্রণা কমাবার অন্য ওষুধ (ভাইরাসের সঙ্গে লড়বার জন্যে কাজে লাগবার মত কোনো ওষুধ নেই। এনটিবায়োটিক কাজে লাগে না) টীকে দিয়ে কিছু ভাইরাসের সংক্রমণ এড়ানো যায়
	জলাতঙ্ক (রেবিস)	জানোয়ারের কামড়	
	আঁচিল	ছোঁওয়ায়	
ছত্রাক	দাদ হাজা	ছোঁওয়া বা জামাকাপড় থেকে	গন্ধক (সালফার) আর ভিনিগারের মলম: *আনডিসাইলেনিক এসিড,* বেনজইক, স্যালিসিলিক এসিড গ্রিসিওফালভিন
ভেতরের পরজীবী (যে সব ক্ষতিকর প্রাণী মানুষের শরীরের মধ্যে বাস করে)	নাড়িভুঁড়ির মধ্যে: কৃমি এমিবা (আমাশয়)	মল থেকে মুখ দিয়ে পরিচ্ছন্নতার অভাব থেকে	নানা রকম বিশেষ বিশেষ ওষুধ
	রক্তে: ম্যালেরিয়া গোদ	মশার কামড়	ক্লোরোকুইন ডাইএথিল কারবাম্যাজিন (হেট্রাজান)
বাইরের পরজীবী (যে সব ক্ষতিকর প্রাণী শরীরের ওপরে থাকে)	উকুন এঁটুলি ছারপোকা স্কেবিস	যাদের এসব রোগ হয়েছে তাদের বা তাদের জামাকাপড়ের সংস্পর্শ	কীটনাশক (পোকা-মাকড় ধ্বংস করার ওষুধ) লিনডেন

জীবাণু এবং অনেক প্রাণী যেগুলো সংক্রমণ ঘটায়, সেগুলো এত ছোট যে, খালি চোখে দেখা যায় না, অনুবীক্ষণ **বলে একরকম যন্ত্র** দিয়ে দেখতে হয়—এ দিয়ে ছোট জিনিসকে বড় দেখায়। ভাইরাস **ব্যাকটিরিয়ার থেকেও** ছোট।

এনটিবায়োটিক (পেনিসিলিন, টেট্রাসাইক্লিন ইত্যাদি) জীবাণুর থেকে ঘটে এমন কতকগুলো রোগের চিকিৎসায় কাজে লাগে: সর্দি, ফ্লু, মাম্‌প্‌স্‌, জলবসন্ত ইত্যাদি **যে সব রোগ ভাইরাস থেকে হয়, সেগুলোতে এনটিবায়োটিক কোনো কাজ করে না। ভাইরাসের সংক্রমণ হলে এনটিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করবেন না।** ওগুলো কাজে তো লাগবেই না, ক্ষতিও করতে পারে (এনটিবায়োটিক পৃঃ ৬৯ দেখুন)।

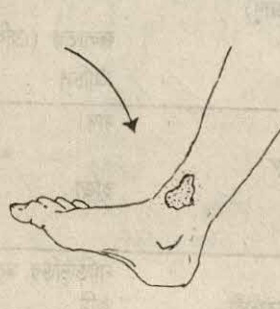
যে সমস্ত রোগের তফাৎ ধরা কঠিন

কখনো কখনো কয়েকটি রোগ—যেগুলো ভিন্ন ভিন্ন কারণে হয় আর যেগুলোর জন্যে আলাদা চিকিৎসা দরকার—প্রায় একই ধরনের চেহারার সমস্যার সৃষ্টি করে। যেমন:



১· **একটি শিশু যদি ধীরে ধীরে রোগা হয়ে শুকিয়ে যায়, আর তার পেটটা ক্রমশঃ ফুলে যেতে থাকে, তার নিচের রোগগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা (বা কয়েকটা) হয়ে থাকতে পারে:**

- অপুষ্টি (পৃঃ ১৩২ দেখুন)
- খুব বেশি কেঁচো কৃমির আক্রমণ (পৃঃ ১৯৩) (সাধারণতঃ সঙ্গে অপুষ্টি থাকে)
- বাড়াবাড়ি ধরনের যক্ষ্মা (পৃঃ ২১৯)
- পেচ্ছাপের পুরোনো ও কঠিন সংক্রমণ (পৃঃ ২৭৮)
- যকৃৎ (লিভার) বা পিলের যে সব রোগ হতে পারে তার মধ্যে কোনো একটা।
- রক্তের ক্যানসার (লিউকেমিয়া)



২· **কোনো বয়স্ক লোকের গোড়ালিতে যদি একটা বড় খোলা মুখের ঘা হয়ে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে তার হয়তো হয়েছে:**

- ভ্যারিকোস শিরা (ফুলে যাওয়া পায়ের শিরা) বা অন্য কারণে স্বাভাবিক রক্ত চলাচলের অভাব (পৃঃ ২৫৮)
- বহুমূত্র (পৃঃ ১৪৯)
- হাড়ে সংক্রমণ (অস্টিওমাইলাইটিস)
- কুষ্ঠ (পৃঃ ২৩২)
- চামড়ার যক্ষ্মা (পৃঃ ২৫৩)
- বাড়াবাড়ি রকম সিফিলিস (পৃঃ ২৮১)

এই রোগগুলোর প্রতিটির ডাক্তারি চিকিৎসা আলাদা, বলে ঠিকমত চিকিৎসা করতে হলে এগুলোর মধ্যে তফাৎ বোঝা দরকার।

অনেকগুলো রোগকে প্রথমটায় একরকম মনে হয়। কিন্তু সাধারণতঃ ঠিক ঠিক প্রশ্ন করলে আর কি খুঁজতে হবে জানলে, তথ্যগুলো জানতে পারবেন আর কতকগুলো লক্ষণ দেখতে পাবেন যা রোগীর অসুখটা ধরতে আপনাকে সাহায্য করবে।

এই বইয়ে অনেক রোগের বিশেষ ধারা আর লক্ষণ বর্ণনা করা আছে। কিন্তু সাবধান! রোগের যেসব লক্ষণ বর্ণনা করা আছে সেগুলো সবসময় দেখা যায় না—বা গোলমেলেভাবে দেখা যেতে পারে। **ঘোরালো রোগের বেলায় দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী বা ডাক্তারের সাহায্য প্রায়ই দরকার হয়।** কখনো কখনো বিশেষ পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের দরকার হয়।

নিজের সীমার ভেতরে কাজ করুন!
এই বইটা ব্যবহার করতে গিয়ে মনে রাখবেন, ভুল করা সহজ।
যা জানেন না, কখনো তা জানার ভাণ করবেন না।
যদি রোগটা কি আর সেটার কি চিকিৎসা, এ বিষয়ে ঠিক করে বুঝতে না পারেন বা যদি রোগটা খুব কঠিন হয়—ডাক্তারি সাহায্য নেবেন

যে সব রোগ প্রায়ই গুলিয়ে ফেলা হয় বা যাদের একই নাম দেয়া হয়

লোকে অসুখবিসুখকে যে সব সাধারণ নাম দেয় তার অনেকগুলোই, বীজাণু বা জীবাণু বা সেগুলোর সঙ্গে লড়বার ওষুধগুলোর বিষয়ে কেউ কিছু জানবার অনেক আগেই, দেয়া হয়েছিল। যে সব আলাদা আলাদা অসুখের ফলে একই ধরনের সমস্যা হয়—যেমন 'বেশি জ্বর' বা 'কোমরে ব্যথা'—সেগুলোর সাধারণতঃ একটা নামই দেয়া হত। পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই এই সাধারণ নামগুলো এখনো ব্যবহার করা হয়। শহুরে, শিক্ষিত ডাক্তাররা প্রায়ই এই নামগুলো জানেন না, ব্যবহারও করেন না। এইজন্যে লোকে কখনো কখনো ভাবে যে, ডাক্তাররা এই সব নামের অসুখগুলোর চিকিৎসা করেন না। তাই তারা গাছগাছড়া বা ঘরোয়া ওষুধ দিয়ে এইসব **ঘরোয়া অসুখের** চিকিৎসা করে।

আসলে, বেশির ভাগ ঘরোয়া অসুখ বা লোক-রোগ আর ডাক্তারি শাস্ত্রের জানা রোগগুলো একই। কেবল নামগুলো আলাদা।

অনেক রোগে ঘরোয়া ওষুধ ভাল কাজ দেয়। কিন্তু কয়েকটি রোগে আধুনিক ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করলে কাজ আরো ভাল হয় আর প্রাণও বাঁচতে পারে। নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, যক্ষ্মা ইত্যাদি সাংঘাতিক সংক্রমণে, যৌনরোগে বা সূতিকায় এটা বিশেষভাবে সত্যি।

কোন কোন রোগে আধুনিক ওষুধ অবশ্যই দরকার, তা জানতে হলে আর কোন ওষুধ ব্যবহার করতে হবে সেটা জানতে হলে, আপনার উচিত, **শিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীরা বা এই বইয়ে কোন রোগটাকে কি নাম দিয়েছে, সেটা জানবার চেষ্টা করা।**

> **যে রোগটা খুঁজছেন, সেটা যদি এই বইয়ে না পান—তাহলে অন্য নামে আছে কিনা দেখুন বা যে পরিচ্ছেদে একই ধরনের সমস্যার কথা বলা হয়েছে সেখানে দেখুন।**
>
> **সূচীপত্র আর শব্দতালিকা ব্যবহার করুন**

অসুখটা কি সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলে— বিশেষ করে রোগটা কঠিন বলে মনে হলে—ডাক্তারি সাহায্য নিতে চেষ্টা করুন।

এই পরিচ্ছেদের বাকিটায়, লোকে নানা রোগের যে সব সাধারণ বা প্রচলিত নাম ব্যবহার করে, সেগুলো দেয়া হল। ডাক্তারি শাস্ত্র অনুসারে যে সব রোগ আলাদা, তাদের প্রায়ই, একই নাম দেয়া হয়।

রোগের স্থানীয় নামের উদাহরণ

১· *দাওরা* বা *নজর লাগা* (খিচুনি, মূর্ছা, আচমকা শ্বাসকষ্ট, আচমকা ব্যথা)

ভারতবর্ষের উত্তর অঞ্চলে যে কোনো হঠাৎ মূর্ছা বা কখনো কখনো, অজ্ঞান হয়ে যাওয়াকে *দাওরা* বলা হয়। (পশ্চিমবঙ্গে এ ধরনের সমস্যাকে নজর লাগা বলে।) কখনো কখনো কারো যদি হঠাৎ শ্বাসকষ্ট, বুক ধড়ফড় বা ব্যথা হয়—এগুলোকেও *দাওরা বা নজর লাগা* বলে। এর থেকে গোলমাল লাগে, কারণ এই সব লক্ষণ নানা রোগ থেকে হয়, শুধু একটা রোগ থেকে নয়।

যে সব আলাদা আলাদা রোগকে *দাওরা বা নজর লাগা* বলা হয়:

- যে সব রোগে ফিট বা পক্ষাঘাত হয়: ফিট (পৃঃ ২১৬ দেখুন), ধনুষ্টঙ্কার (পৃঃ ২২২), মেনিনজাইটিস (পৃঃ ২২৫), সন্ন্যাস রোগ (পৃঃ ৩৭৩)
- আচমকা বা ভীষণ শ্বাসকষ্ট: এটা হাঁপানি (পৃঃ ২০৪) বা হার্টের অসুখ (পৃঃ ৩৭১) থেকে হয়।
- হার্ট অ্যাটাক: বেশিরভাগ সময় বেশি বয়সের লোকেদের হয় (পৃঃ ৩৭১)
- পিত্তকোষে পাথরের জন্যে পেটের পাশে হঠাৎ যন্ত্রণা হয় (পৃঃ ৩৭৫)

২· পিথম বা *খাবারে দোষ*

ভারতবর্ষের দক্ষিণ অঞ্চলে অনেক গ্রামে লোকে বিশ্বাস করে যে, কতকগুলো খাবার *পিথম* বলে এক রকম জিনিস আছে, সেইসব খাবার খেলে অনেক রকম অসুখ করে। (পশ্চিমবঙ্গে একে *খাবার দোষ* বলা হয়)। লোকে বলে যে, পথ্যের (পৃঃ ১৪৫) নিয়ম ভাঙলে, প্রসবের পর বা কোনো ওষুধ খাবার সময় যে সব খাবার খাওয়া নিষেধ তা খেলে *দোষ লাগে*, বা *পিথম* হয়। যে সব খাবারে *পিথম বা দোষ* আছে বলে ধরা হয়, সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি হল বেগুন, লাউ, শুঁটকি মাছ, চিনেবাদাম আর তেল ঘি। যদিও এসব খাবারে কোনো ক্ষতি হয় না, বরং কখনো কখনো শরীরের জন্যে এগুলো খাওয়া দরকার, তবু অনেকে *পিথম বা দোষ* হওয়াকে এত ভয় পায় যে, এগুলো তারা ছোঁয় না।

যে সব আলাদা আলাদা রোগকে কখনো কখনো *পিথম বা দোষ লাগা* বলা হয়:

- পেটের বা নাড়িভুঁড়ির যে কোনো আচমকা গোলমাল: পাৎলা পায়খানা দেখুন (পৃঃ ১৮৪)
- বমি (পৃঃ ১৯২) আর প্রচণ্ড পেট ব্যথা (পৃঃ ১০৭)
- বমি বমি ভাব: পাৎলা পায়খানার সঙ্গে বমি (পৃঃ ১৮৮), পোয়াতি অবস্থায় বমি (পৃঃ ২৯৪), ন্যাবা (পৃঃ ৩৭৪)
- হঠাৎ, বিশেষ করে সকালের দিকে মাথা ঘোরা: বেশি রক্তের চাপ (পৃঃ ১৪৭)
- অম্বল আর বুকজ্বালা, অতিরিক্ত এসিড হলে যেমন হয়।
- গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণাদায়ক ফোলা—রিউম্যাটিক আর্থ্রাইটিস হলে যেমন হয় (পৃঃ ২১১)

৩· হিস্টিরিয়া (ভয় পাওয়া)

আমাদের গ্রামের লোকে বিশ্বাস করে যে, হিস্টিরিয়ার কারণ হল হঠাৎ ভয় পাওয়া, ডাইনিবিদ্যা, গুণ করা বা দুষ্টু ভূতপ্রেত। যার হিস্টিরিয়া হয়েছে সে ভীষণ ঘাবড়ে যায় আর ভয় পায়। সে কাঁপতে বা অদ্ভুত ব্যবহার করতে পারে, তার ঘুম না হতে পারে, ওজন কমে যেতে পারে। এমনকি সে মারাও যেতে পারে।

হিস্টিরিয়ার যে সব ডাক্তারি ব্যাখ্যা সম্ভব:

১· অনেকের বেলায় হিস্টিরিয়া মানে একটা ভয় পাওয়া অবস্থা—হয়তো কোনো দৃঢ় বিশ্বাস থেকে হয় (পৃঃ ২ দেখুন)। যেমন কোনো মহিলার যদি ভয় থাকে যে, কেউ তাকে গুন করবে, তাহলে যে ঘাবড়ে যায়, ভাল করে খায় না বা ঘুমোয় না। সে দুর্বল আর রোগা হয়ে যেতে থাকে। এতে সে ধরে নেয় যে, তাকে সত্যিই গুন করা হয়ে গেছে, তাতে সে আরো ঘাবড়ে যায় আর ভয় পায়। তার হিস্টিরিয়া ক্রমশঃ আরো বেড়ে যায়।

২· কচি বাচ্চা ব ছোট ছেলেমেয়েদের বেলায় হিস্টিরিয়া সাধারণতঃ অনেকটা অন্যরকম হয়। দুঃস্বপ্ন দেখলে ছোট ছেলেমেয়েরা ঘুমের মধ্যে কেঁদে উঠে ভয় পেয়ে জেগে যেতে পারে। যে কোনো রোগে বেশি জ্বরে রোগী অদ্ভুত কথাবার্তা বলতে বা ব্যবহার করতে পারে (প্রলাপ)। কোনো ছোট শিশুর হাবভাব বা ব্যবহার দেখে যদি প্রায়ই মনে হয় সে দুশ্চিন্তা করছে, তবে তার হয়তো অপুষ্টি রয়েছে (পৃঃ ১২৫)। কখনো কখনো ধনুষ্টঙ্কার (পৃঃ ২২২) বা মেনিনজাইটিসের (পৃঃ ৩৫৩) গোড়ার দিকের **লক্ষণগুলোকেও** হিস্টিরিয়া বলা হয়।

চিকিৎসা :

কোনো বিশেষ রোগের দরুন হিস্টিরিয়া হলে, সেই রোগটার চিকিৎসা করবেন। রোগীকে সেটার কারণগুলো বুঝতে সাহায্য করুন। দরকার হলে ডাক্তারি পরামর্শ চাইবেন।

যদি ভয় থেকে হিস্টিরিয়া হয়, রোগীকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করুন আর, তার ভয়টাই যে তার সমস্যার কারণ, এটা বুঝতে তাকে সাহায্য করুন। কখনো কখনো ঝাড়ফুঁক বা ঘরোয়া ওষুধেও কাজ হয়।

ভয় পেয়ে রোগী যদি খুব জোরে ঘন ঘন শ্বাস নেয় তবে তার শরীরে অতিরিক্ত বাতাস (অক্সিজেন) ঢুকে যেতে পারে—আর এটাই সমস্যার কিছুটা হতে পারে।

ভীষণ ভয় পাওয়া বা হিস্টিরিয়ার সঙ্গে ঘন ঘন ভারি শ্বাস (অতিরিক্ত বাতাস চলাচল)



লক্ষণ :

- রোগীর অত্যন্ত ভয় পাওয়া
- শ্বাস ঘন ঘন আর গভীর হওয়া
- বুক দ্রুত ধড়াস ধড়াস করা
- মুখ, হাত, পা অসাড় হয়ে যাওয়া বা চিনচিন করা
- পেশিতে খিল ধরা

চিকিৎসা :

- রোগীকে যতটা সম্ভব শান্ত রাখুন
- তাকে একটা কাগজের ঠোঙার মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে বলুন। তার একই বাতাসে দু-তিন মিনিট ধরে শ্বাস নিয়ে যাওয়া উচিত। এতে রোগী সাধারণতঃ শান্ত হয়ে যায়।
- তাকে বোঝান যে ব্যাপারটা বিপজ্জনক কিছু নয়, সে শিগ্‌গিরই ভাল হয়ে যাবে।

যে সব বিভিন্ন রোগ থেকে জ্বর হয় সেগুলো গুলিয়ে ফেলা

জ্বর ....

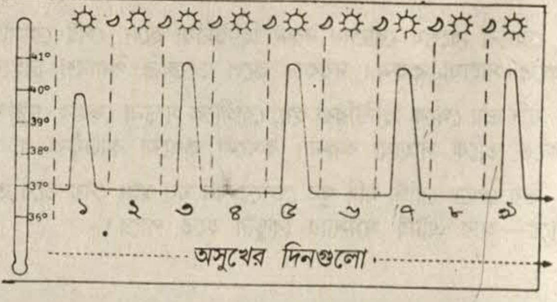


ঠিকমত বলতে গেলে জ্বর হল **শরীরের স্বাভাবিকের থেকে বেশি তাপ**। কিন্তু আমাদের দেশে শরীরের তাপ যাতে বাড়ে, এমন অনেক কঠিন রোগের সবগুলোকেই 'জ্বর' বলা হয়।

এই সব রোগগুলো ভালভাবে এড়াতে বা সারাতে গেলে এগুলোর একটার থেকে অন্যটার তফাৎ বোঝার উপায় জানা দরকার।

এখানে কয়েকটা প্রধান প্রধান শক্ত রোগের কথা বলা হচ্ছে যেগুলোতে জ্বর একটা বড় লক্ষণ। ছবিতে প্রত্যেক রোগে জ্বরের **বিশেষ ধারা** (তাপ বাড়া ও কমা) দেখানো হয়েছে।

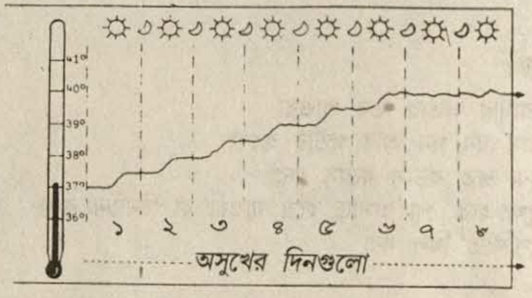
ম্যালেরিয়া— জ্বরের বিশেষ ধারা
একটানা লাইনগুলোতে তাপের ওঠা নামা দেখাচ্ছে



ম্যালেরিয়া : (পৃঃ ২২৭ দেখুন)

তাপ বাড়া আর শীত করার সঙ্গে হঠাৎ শুরু হয়। জ্বর কয়েক ঘন্টা থাকে। তাপ কমার সঙ্গে ঘাম শুরু হয়। সাধারণতঃ প্রত্যেক দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে আক্রমণ করে। জ্বরের ফাঁকে রোগীকে মোটামুটি সুস্থ মনে হয়। প্রত্যেকবার তাপ বাড়ার পর রোগী এক, দুই বা তিন দিন ভাল বোধ করতে পারে।

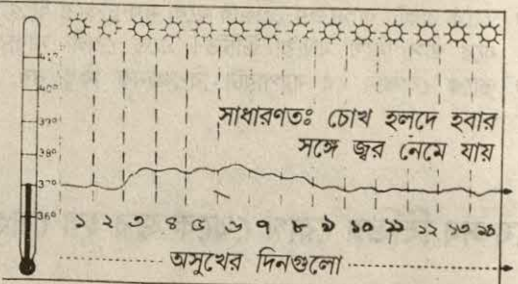
টাইফয়েড— জ্বরের বিশেষ ধারা
প্রতিদিন একটু করে জ্বর বাড়ে



টাইফয়েড : (পৃঃ ২২৯ দেখুন)

সর্দির মত শুরু হয়। প্রতিদিন একটু করে তাপ বাড়ে। নাড়ির গতি তুলনায় ধীর থাকে। কখনো কখনো পাৎলা পায়খানা আর শরীরে জলের অভাব হয়। কাঁপুনি আর প্রলাপ (বিকার) হয়। রোগী খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে।

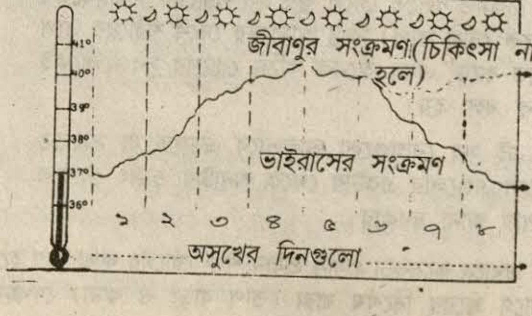
হেপাটাইটিস— জ্বরের বিশেষ ধারা
সাধারণতঃ জ্বর কম



হেপাটাইটিস (পৃঃ ২০৯ দেখুন)

রোগীর খিদে চলে যায়। খেতে বা ধূমপান করতে চায় না। বমি করতে চায় (গা বমি)। চোখ আর চামড়া হলদে, পেচ্ছাপ গাঢ় হলুদ বা খয়েরি আর পায়খানা সাদাটে রঙের হয়ে যায়। কখনো কখনো লিভার বড় হয়ে যায় আর যন্ত্রণা দেয়। জ্বর কম থাকে। রোগী খুব দুর্বল হয়ে পড়ে।

নিউমোনিয়া—জ্বরের বিশেষ ধারা



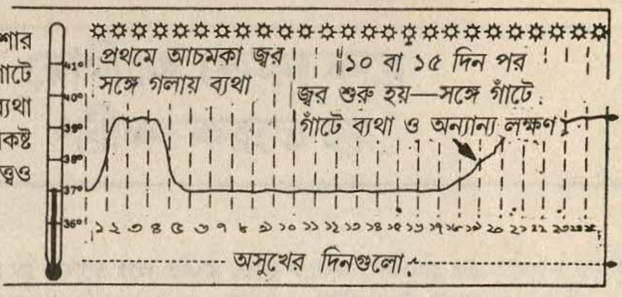
নিউমোনিয়া (পৃঃ ২০৮ দেখুন)

দ্রুত ওপর ওপর শ্বাস পড়ে। তাপ তাড়াতাড়ি ওঠে। কাশি-সঙ্গে সবুজ, হলদে বা রক্ত মেশা কফ ওঠে। বুকে ব্যথা থাকতে পারে। রোগী খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে।

বাতের জ্বর (পৃঃ ৩৫৬ দেখুন)

ছোট ছেলেমেয়েদের আর কিশোর কিশোরীদের মধ্যে খুব বেশি দেখা যায়। গাঁটে গাঁটে ব্যথা। বেশি জ্বর হয়। প্রায়ই গলায় ব্যথা হয়ে শুরু হয়। বুকে ব্যথার সঙ্গে শ্বাসকষ্ট থাকতে পারে। রোগীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাতপায়ের নড়াচড়া হতে পারে।

বাতের জ্বর—জ্বরের বিশেষ ধারা



যক্ষ্মা (পৃঃ ২১৯ দেখুন)

ক্লান্তি, ওজন কমে যাওয়া আর কাশির সঙ্গে ধীরে ধীরে শুরু হয়। বিকেলের দিকে জ্বর হয়। সকালে তাপ নেমে যায়। রাত্রে ঘাম হতে পারে। মাসের পর মাস এইরকম চলতে পারে।

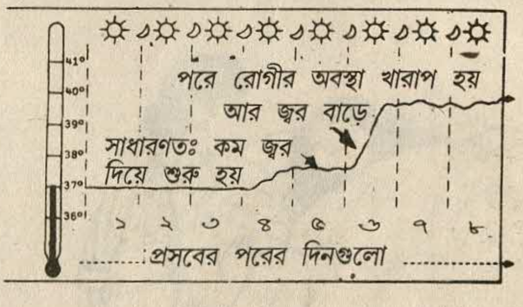
যক্ষ্মা—জ্বরের বিশেষ ধারা



সূতিকার জ্বর (পৃঃ ৩২২ দেখুন)

প্রসবের এক বা কয়েকদিন পরে শুরু হয়। অল্প জ্বর দিয়ে আরম্ভ হয়—পরে সাধারণতঃ সেটা বাড়ে। যোনিদ্বার দিয়ে দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব হয়। যোনিতে ব্যথা, কখনো কখনো রক্তপাতও হয়।

সূতিকার জ্বর —— জ্বরের বিশেষ ধারা



এই সব রোগগুলোই বিপজ্জনক হতে পারে। এখানে যেগুলো দেখান হল সেগুলো ছাড়া আরো অনেক রোগ আছে (বিশেষতঃ গরম দেশে) যেগুলোতে একই ধরনের লক্ষণ আর জ্বর হতে পারে। এই সব রোগগুলোর মধ্যে তফাৎ ধরা সবসময় সহজ নয়। বেশিরভাগই কঠিন আর বিপজ্জনক। যখনই সম্ভব—ডাক্তারি সাহায্য চাইবেন।

পরিচ্ছেদ

৩ রোগীকে কেমন করে পরীক্ষা করতে হয়

একজন রোগীর জন্যে কি কি করা দরকার তা জানতে হলে প্রথমে তাকে কয়েকটা দরকারি প্রশ্ন করবেন, তারপর তাকে যত্ন করে পরীক্ষা করবেন। যে সমস্ত লক্ষণ বা উপসর্গ থেকে বোঝা যায় রোগী কতটা অসুস্থ বা তার কি রোগ হয়েছে, সেগুলো লক্ষ্য করুন।

কয়েকটি মূল তথ্য—রোগীকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়া আর তাকে দেখে খুঁজে নেয়া উচিত। তার মধ্যে রয়েছে কিছু ব্যাপার যা রোগী টের পায় বা বলে (রোগের উপসর্গ), আর কিছু জিনিস আছে যা রোগীকে পরীক্ষা করার সময় আপনি লক্ষ্য করবেন (রোগের লক্ষণ)। শিশুদের বেলায়, বা যে রোগীরা কথা বলতে পারে না তাদের বেলায় এই লক্ষণগুলির দিকে দৃষ্টি দেয়া বিশেষ দরকার। এই বইয়ে 'লক্ষণ' কথাটায় উপসর্গ এবং লক্ষণ দুইই বোঝাবে।

সবসময় রোগীকে প্রচুর আলোয় (দিনের আলোয় হলেই ভালো) পরীক্ষা করবেন, অন্ধকার ঘরে **কখনই** নয় ।

রোগীকে পরীক্ষা করার সময় যে সব তথ্য পাবেন, সেগুলি লিখে রাখবেন, যাতে দরকার হলে স্বাস্থ্যকর্মীকে দেখাতে পারেন।

প্রশ্ন

প্রথমে রোগীকে নিজেকেই তার অসুবিধার কথা বলতে দিন। তার বলা শেষ হলে, তার অসুখ সম্বন্ধে আরও জানার জন্যে কয়েকটি প্রশ্ন করবেন। নিচের প্রশ্নগুলি করতে ভুলবেন না:

- এখন আপনার সব থেকে বেশি অসুবিধে কি?
- কি করলে একটু আরাম হয় আর কিসে কষ্টটা বাড়ে?
- কখন কিভাবে আপনার অসুখটা শুরু হয়েছিল?
- এই ধরনের অসুখ কি আপনার আগে কখনো হয়েছে? বাড়িতে বা পাড়ায় কারো কখনো এমন অসুখ হয়েছে কি?



রোগের খুঁটিনাটি জানার জন্যে এই ধরনের আরও প্রশ্ন করে যাবেন। যেমন: রোগীর যদি কোনো যন্ত্রণা থাকে, তাকে জিজ্ঞেস করবেন:

- কোথায় ব্যথা হচ্ছে? (রোগীকে একটা আঙুল দিয়ে ঠিক জায়গাটা দেখাতে বলবেন)।
- ব্যথাটা কি সবসময় রয়েছে, না আসছে যাচ্ছে?
- ব্যথাটা ঠিক কি রকম? (জোরালো? আস্তে? জ্বালার মত?)
- ব্যথার জন্যে ঘুমের অসুবিধে হচ্ছে কি?

রোগী যদি শিশু হয়—যে এখনও কথা বলতে শেখেনি—তবে ব্যথার লক্ষণ আছে কি না দেখবেন। তার নড়াচড়া লক্ষ্য করবেন, কেমনভাবে কাঁদছে তাও দেখবেন। (যেমন, যদি শিশুর কানে ব্যথা হয়, তবে সে কখনো কখনো মাথার সেই দিকটা রগড়াবে বা কানটা টানাটানি করবে।)

স্বাস্থ্যের সাধারণ অবস্থা

রোগীর গায়ে হাত দেবার আগে তাকে মন দিয়ে দেখুন। তাকে কতটা রুগ্ন বা দুর্বল দেখাচ্ছে, কিভাবে সে নড়াচড়া করছে, কেমন করে নিশ্বাস নিচ্ছে, তার মাথা ঠিক কাজ করছে কি না, এসব লক্ষ্য করুন। শরীরে জলের অভাব (পৃঃ ১৮১) বা শকের (পৃঃ ৮৯) লক্ষণ আছে কি না দেখুন।

রোগী পুষ্ট কি অপুষ্ট তা দেখুন। তার ওজন কি কমে যাচ্ছে? যদি অনেকদিন ধরে কারো ওজন ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকে, তবে সে হয়তো কোনো পুরোনো (ক্রনিক) রোগে ভুগছে।

রোগীর চামড়ার আর চোখের রং লক্ষ্য করুন।

- সাদাটে ভাব—বিশেষ করে ঠোঁটে আর চোখের পাতার নিচে, রক্তাল্পতার (এনিমিয়া) লক্ষণ (পৃঃ ১৪৬)।
- নীলচে রং, বিশেষতঃ যদি ঠোঁট বা নখ নীলচে বা কালচে দেখায়, তবে বুঝবেন রোগীর মারাত্মক শ্বাসকষ্ট (পৃঃ ৯১ ও ২০৪) বা হার্টের অসুখ (পৃঃ ৩৭১) হয়ে থাকতে পারে।
- চামড়া যদি পাঁশুটে সাদা রঙের হয়, আর ঠাণ্ডা, ভিজে থাকে, তবে রোগী হয়তো শকের অবস্থায় আছে (পৃঃ ৮৯)।
- চামড়ার ও চোখের হলুদ রং *(ন্যাবা)*,—লিভারের অসুখ, হেপাটাইটিস (পৃঃ ২০৯), সিরোসিস (পৃঃ ৩৭৪), এমেবিক এবসেস (পৃঃ ১৯৮) বা গল ব্লাডারের (পিত্তকোষের) রোগ (পৃঃ ৩৭৫) থেকে হয়। একেবারে কচি বাচ্চাদেরও এরকম হতে পারে (পৃঃ ৩২০)।

শরীরের তাপ (টেম্পারেচার)



রোগীর জ্বর হয়েছে বলে মনে না হলেও তার টেম্পারেচার মাপাটা বুদ্ধির কাজ। যদি রোগী খুবই অসুস্থ থাকে, তবে দিনে অন্ততঃ চারবার তার টেম্পারেচার নেবেন আর লিখে রাখবেন।



তাপ মাপবার যন্ত্র (থার্মোমিটার) না থাকলে আপনার এক হাতের উল্টো পিঠটা রোগীর কপালে রাখবেন, অন্যটা নিজের বা কোনো সুস্থ লোকের কপালে রাখবেন। রোগীর জ্বর হয়ে থাকলে, তাপের তফাৎটা নিশ্চয়ই ধরতে পারবেন।

জ্বরটা কখন, কিভাবে আসছে, কতক্ষণ থাকছে, কেমন করে ছাড়ছে—এগুলো দেখা দরকার। এর থেকে রোগটা ধরা যেতে পারে। যেমন:

- ম্যালেরিয়াতে সাধারণতঃ কাঁপুনি দিয়ে বেশি জ্বর আসে, কয়েক ঘণ্টা পরে ছেড়ে যায়, আবার দু-তিন দিন অন্তর আসে (পৃঃ ২২৭)।
- টাইফয়েডে জ্বরটা রোজ একটু করে বাড়ে (পৃঃ ২২৯)।
- যক্ষ্মাতে সাধারণতঃ বিকেলের দিকে অল্প করে জ্বর আসে। রাত্রে রোগীর ঘাম হয় আর জ্বরটা ছেড়ে যায় (পৃঃ ২১৯)।

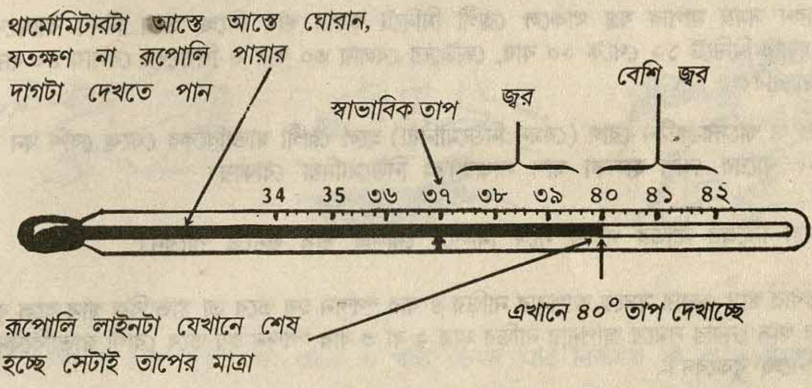
মনে রাখবেন: কচি বাচ্চাদের শরীরের তাপ যদি **অস্বাভাবিক রকম বেশি বা কম** (৩৬° সেঃ-র নিচে) হয়, তবে বুঝবেন যে, কোনো মারাত্মক জীবাণু তার শরীরকে আক্রমণ করেছে (পৃঃ ৩২১)।

■ অন্যান্য জ্বরের ধারা জানতে হলে, পৃঃ ৩২-৩৩ দেখুন।
■ থার্মোমিটারের ব্যবহার সম্বন্ধে জানতে হলে একটু পরে দেখুন।
■ জ্বর হলে কি করতে হয় জানতে হলে পৃঃ ৮৭ দেখুন।

থার্মোমিটার কেমনভাবে ব্যবহার করতে হয়

প্রত্যেক বাড়িতে একটি করে থার্মোমিটার থাকা উচিত। রোগীর টেম্পারেচার দিনে চারবার নিয়ে, লিখে রাখা উচিত।

থার্মোমিটার কেমন করে দেখতে হয় (এখানে সেন্টিগ্রেড ডিগ্রীতে—°C লেখা থার্মোমিটারের কথা বলা হয়েছে):



শরীরের তাপ মাপার নিয়ম:



১· প্রথমে থার্মোমিটারটি সাবান জলে ভালো করে ধুয়ে বা স্পিরিট দিয়ে মুছে নিন। যতক্ষণ না তাপের মাথা ৩৬ ডিগ্রী সেঃ-র নিচে দেখাচ্ছে, থার্মোমিটার জোরে ঝাঁকান।

২· থার্মোমিটার শরীরে লাগান. . . .

জিভের নিচে রেখে মুখ বন্ধ করে   বা   *যদি থার্মোমিটার কামড়ে ফেলার ভয় থাকে তবে বগলের নিচে*   বা   *ছোট শিশুর বেলায় ভিজিয়ে বা তেল লাগিয়ে সাবধানে মলদ্বারে*



যদি রোগী অজ্ঞান অবস্থায় থাকে, তার বগলে বা মলদ্বারে দেবেন।

৩· ২ মিনিট রেখে দিন।

৪· থার্মোমিটার শরীর থেকে বার করে নিয়ে তাপমাত্রা পড়ে নিন। (বগলের তাপ মুখের চেয়ে একটু কম আর মলদ্বারের তাপ মুখের চেয়ে একটু বেশি দেখাবে।)

৫· এবার থার্মোমিটারটি সাবান ও জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে রেখে দিন।

শ্বাস (নিঃশ্বাস প্রশ্বাস)

রোগী কিভাবে শ্বাস নিচ্ছে সেদিকে বিশেষ নজর রাখবেন। এইগুলি লক্ষ্য করবেন:

গভীরতা—ভেতর থেকে শ্বাস নিচ্ছে না ওপর ওপর।
গতি—কত ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে
কষ্ট—শ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছে কি না

শ্বাস নেবার সময় বুকের দুদিক সমানভাবে ওঠানামা করছে কি না দেখুন।

ঘড়ি বা সাধারণ সময় মাপার যন্ত্র থাকলে রোগী মিনিটে কবার শ্বাস নিচ্ছে গুনে নিন। বয়স্কদের আর ছেলেপিলেদের বেলায় মিনিটে ১২ থেকে ২০ বার, ছোটদের বেলায় ৩০ বার ও শিশুদের বেলায় ৪০ বার পর্যন্ত শ্বাস নেওয়াটা স্বাভাবিক।

বেশি জ্বর হলে বা শ্বাসের কঠিন রোগ (যেমন নিউমোনিয়া) হলে রোগী স্বাভাবিকের থেকে বেশি ঘন ঘন শ্বাস নেয়। মিনিটে ৪০ বারের বেশি **হালকা** শ্বাস সাধারণতঃ নিউমোনিয়া বোঝায়।

ঘড়ি না থাকলে নিজের নাড়ির গতির সঙ্গে মিলিয়ে রোগীর শ্বাস গুনতে পারেন।

যদি রোগী একবার শ্বাস নেবার সময়ে আপনার নাড়ির ৪ বার স্পন্দন হয় তবে তা স্বাভাবিক শ্বাস বলে বুঝবেন। যদি রোগী একবার শ্বাস নেবার সময়ে আপনার নাড়ির মাত্র ২ বা ৩ বার স্পন্দন হয় তবে রোগী স্বাভাবিকের থেকে তাড়াতাড়ি শ্বাস নিচ্ছে বুঝবেন।

শ্বাসের শব্দ মন দিয়ে শুনুন। যেমন:

- কষ্ট করে শিসের মতো বা সোঁ সোঁ করে শ্বাস নেয়া হাঁপানির লক্ষণ হতে পারে (পৃঃ ২০৪)।
- কোনো রোগী অজ্ঞান অবস্থায় যদি ঘড় ঘড় শব্দ করে বা নাক ডাকার মতো আওয়াজ করে শ্বাস নেয়, তবে বুঝবেন তার গলায় হয়তো তার নিজের জিভ, শ্লেষ্মা বা অন্য কিছু আটকেছে যাতে বাতাসটা ঠিক যাচ্ছে না।
- রাত্রিবেলা হঠাৎ শ্বাসকষ্ট হার্টের অসুখের লক্ষণ (পৃঃ ৩৭১)

শ্বাস টানবার সময় রোগীর দুটি পাঁজরের মাঝের চামড়া বা ঘাড়ের কোণের (কণ্ঠার হাড়ের পেছনের) চামড়া ভেতর দিকে ঢুকে যাচ্ছে কি না দেখুন। এর মানে ঢোকার পথে বাধা রয়েছে। এটা নানা কারণে হতে পারে—গলায় কিছু আটকে গেলে (পৃঃ ৯১), নিউমোনিয়া (পৃঃ ২০৯), হাঁপানি (পৃঃ ২০৪), বা ব্রঙ্কাইটিস্ হলে। (চামড়া অল্প ঢুকে যাওয়া পৃঃ ২০৭ দেখুন)।

রোগী যদি বলে যে, তার শ্বাসের কষ্ট হচ্ছে, তাকে কয়েকটি প্রশ্ন করবেন:

- বুকে কোনো ব্যথা আছে? শ্বাস নিলে বা কাশলে যদি বুকে ব্যথা বাড়ে, আর পাশ ফিরে শুলে কমে যায়, তবে সেটা নিউমোনিয়ার গোড়ার অবস্থার লক্ষণ। (পৃঃ ২০৮)
- যদি হাঁটা, দৌড়নো বা সিঁড়ি ওঠার সময় বুকে ব্যথা বাড়ে, আর কয়েক মিনিট বিশ্রাম নিলে চলে যায় তবে সেটা হার্টের অসুখের লক্ষণ (পৃঃ ৩৭১)।

রোগীর যদি কাশি থাকে তবে তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে, তাতে তার ঘুমের অসুবিধে হচ্ছে কি না। কাশির সঙ্গে শ্লেষ্মা উঠছে কি না—উঠলে কতটা উঠছে, তার কি রং এবং তার সঙ্গে রক্ত আছে কি না—এসব জেনে নেবেন।

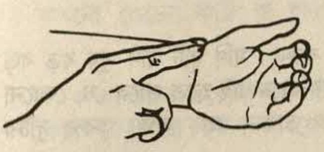
- সকালের দিকে শুকনো কাশি সাধারণতঃ বেশি ধূমপান করলে হয়।
- কাশির সঙ্গে অনেকটা করে সাদা রংয়ের শ্লেষ্মা উঠলে তা, ব্রঙ্কিয়েকটেসিস (পৃঃ ২০৮) বা পুরোনো ব্রঙ্কাইটিসের লক্ষণ (পৃঃ ২০৭)।
- কাশির সঙ্গে রক্তের ছিটে দেয়া শ্লেষ্মা, বিকেলের দিকে জ্বর, এবং ওজন কমে যাওয়া থাকলে যক্ষ্মা বলে ধরে নেবেন (পৃঃ ২১৯)। রোগীর বয়স যদি ৪০-এর ওপরে হয়, এবং সে যদি বেশি ধূমপান করে তবে এটা ফুসফুসের ক্যানসারও হতে পারে।

নাড়ি (হার্টের স্পন্দন)

রোগীর নাড়ি দেখতে হলে আপনার নিজের আঙুল (বুড়ো আঙুল নয় কিন্তু) তার কব্জির ওপর রাখুন—যেমন ছবিতে আছে।

যদি কব্জিতে নাড়ি না পান, রোগীর গলায় শব্দযন্ত্রের পাশে আঙুল রাখুন

কিংবা রোগীর বুকের ওপর কান রেখে হার্টের স্পন্দন শুনুন







নাড়ির স্পন্দনের (ধুক ধুক করা) জোর ও গতি কেমন আর নিয়মিত কি না মনোযোগ দিয়ে দেখুন।

বিশ্রামে থাকার সময় নাড়ির স্বাভাবিক গতি:

বড়দের বেলায়—মিনিটে ৬০ থেকে ৮০ বার
ছোটদের বেলায়—মিনিটে ৮০ থেকে ১০০ বার
শিশুদের বেলায়—মিনিটে ১০০ থেকে ১৪০ বার

ঘড়ি না থাকলে নিজের নাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে নিলে রোগীর নাড়ির গতি স্বাভাবিক কি না অনেকটা বুঝতে পারবেন। নিজে কয়েক মিনিট বিশ্রাম করে তবেই এই কাজটা করবেন। নয়তো পরিশ্রমের ফলে আপনার নাড়ির গতিবেগ বেশি থাকবে।

নাড়ির গতি অনেক তাড়াতাড়ি হয়—

- পরিশ্রম করলে
- ঘাবড়ে গেলে
- ভয় পেলে
- জ্বর হলে
- তীব্র যন্ত্রণা হলে

প্রতি ডিগ্রি (°C) জ্বরের জন্যে নাড়ির গতি ২০ বার করে বাড়ে বলে ধরে নেয়া যায়।

বেশি অসুস্থ রোগীর নাড়ি ঘন ঘন দেখে, তাপ ও শ্বাস যেখানে লেখা হয়েছে তার পাশে লিখে রাখবেন।

নাড়ির স্পন্দনের কোনো বদল হচ্ছে কি না দেখাটা জরুরি। যেমন:

- শকের অবস্থায় নাড়ি ক্ষীণভাবে কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে। (পৃঃ ৮৯)
- নাড়ির খুব তাড়াতাড়ি, খুব ধীরে, বা অনিয়মিত চলা হার্টের অসুখের লক্ষণ হতে পারে (পৃঃ ৩৭১)।
- জ্বর বেশি অথচ নাড়ি তেমন তাড়াতাড়ি চলছে না, এটা টাইফয়েডের লক্ষণ (পৃঃ ২২৯) হতে পারে।

চোখ

রোগীর চোখের সাদা অংশের রং লক্ষ্য করুন। রংটা স্বাভাবিক, না লাল (পৃঃ ২৬৩) না হল্‌দে? রোগীর দৃষ্টিশক্তি বদলাচ্ছে কি না দেখুন।

রোগীকে খুব ধীরে ধীরে ওপর দিকে, নিচের দিকে আর একপাশ থেকে অন্যপাশে তাকাতে বলুন। তাকানোর সময় চোখ যদি ঝাঁকি দিয়ে বা অসমানভাবে নড়ে যায় তাহলে মগজের কোনো ক্ষতি হয়ে থাকতে পারে।

চোখের মণির (চোখের ঠিক মাঝখানের কালো গোল অংশ) আকার নজর করুন। মণি দুটি যদি খুব বড় বড় দেখায়—তা শকের লক্ষণ হতে পারে (পৃঃ ৮৯)। মণি দুটি খুব ছোট দেখালে তার মানে এই হতে পারে যে, কোনো বিষ বা কোনো তীব্র ওষুধ শরীরে কোনোভাবে ঢুকেছে। দুটি চোখের দিকে তাকান আর লক্ষ্য করুন দুটির মধ্যে—বিশেষতঃ দুটির মণির আকারে কোনো তফাৎ আছে কি না।



দুটি চোখের মণি যদি ছোটবড় হয় তবে তা মারাত্মক কোনো রোগের লক্ষণ বলে ধরে নিয়ে তখনি ডাক্তার দেখান।

- যে চোখের মণি বড় সেই চোখে যদি এত প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয় যে, তার জন্য বমি হয় তবে তা সম্ভবতঃ **গ্লকোমার** লক্ষণ (পৃঃ ২৬৭)।
- যে চোখের মণি ছোট দেখাচ্ছে সেই চোখে যন্ত্রণা **আইরাইটিস** বলে একটা মারাত্মক রোগের লক্ষণ হতে পারে (পৃঃ ২৬৬)।
- অজ্ঞান রোগী বা যে রোগী অল্প আগে মাথায় আঘাত পেয়েছে তার দুটি চোখের মণি ছোট বড় হলে তা মগজের কোনো ক্ষতি অথবা **সন্ন্যাসরোগ** বোঝাতে পারে (পৃঃ ৩৭৩)।

অজ্ঞান বা মাথায় আঘাত পাওয়া লোকের দুটি চোখের মণি ছোটবড় কি না তা নিশ্চয়ই তুলনা করে দেখবেন।

কান

রোগীর কোনো কানে যন্ত্রণা বা ঘা আছে কি না সবসময় লক্ষ্য করবেন—বিশেষতঃ রোগী যদি শিশু হয় আর তার যদি জ্বর বা সর্দি হয়ে থাকে। শিশু বেশি কাঁদলে আর কান ঘষলে বা টানলে প্রায়ই দেখা যায় তার কানে ঘা হয়েছে (পৃঃ ৩৫৫)।



যদি কানের লতির পেছনের চামড়া লাল দেখায়, সেই জায়গাটা টিপে দেখুন। টিপলে যদি খুব বেশি যন্ত্রণা হয় তবে হয়তো হাড়ে জীবাণুর আক্রমণ হয়েছে। তেমন রোগীর সাধারণতঃ বেশি জ্বর হয় আর তাকে খুব অসুস্থ দেখায়। (চিকিৎসার জন্যে পৃঃ ৩৫৫ দেখুন)।

কানের ভেতরটা দেখার জন্যে আঙুল দিয়ে আস্তে কানটা টানুন। তাতে যদি ব্যথা বাড়ে তবে বুঝবেন কানের নালির ভেতরে ঘা হয়েছে।

কানের ভেতরটা লালচে দেখাচ্ছে বা সেখানে পুঁজ আছে কি না দেখুন। একটা টর্চ ব্যবহার করলে সুবিধে হবে। কখনো কোনো কাঠি বা অন্য কোনো শক্ত জিনিস কানের ভেতরে ঢোকাবেন না।

লক্ষ্য করুন—রোগী কানে ঠিকমত শুনছে কি না বা এক কানে অন্যটার থেকে কম শুনছে কি না। (কালা হওয়া বা কান ভোঁ ভোঁ করার বিষয়ে পৃঃ ৩৭৩ দেখুন)।

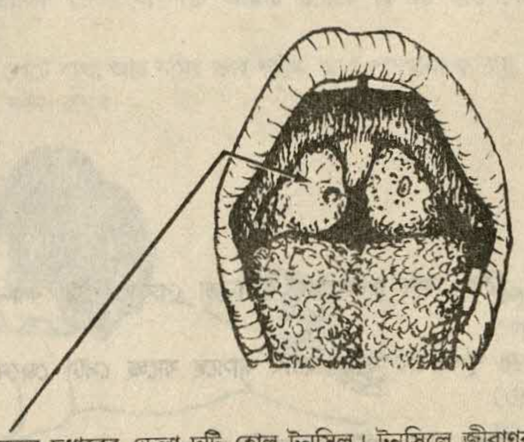
মুখ, জিভ ও গলা

রোগীকে খুব অসুস্থ না দেখালেও ভালো করে তার মুখ, জিভ আর গলা পরীক্ষা করুন।
ঠোঁটের কোণে ফাটা বা ঘা থাকলে তা ভিটামিনের অভাব থেকে হতে পারে (পৃঃ ২৭৬ দেখুন)।

জিভের রং আর চেহারা দেখুন:

- সাদাটে আর মসৃণ—এনিমিয়া (রক্তাল্পতা, পৃঃ ১৪৬)
- নীল—শ্বাসের বা হার্টের অসুখ (পৃঃ ৩৭১)
- শুকনো—শরীরে জলের অভাব (পৃঃ ১৮১)
- ছোট ছোট সাদা দাগ—ছত্রাকের আক্রমণ হতে পারে (পৃঃ ২৭৬)
- জিভের বা মুখের ভেতরের পুরোনো ঘা যদি সারতে না চায় তবে ক্যানসার হতে পারে। যে সব জায়গায় লোকে চুন বা তামাক দিয়ে পান খায়, সেখানে এ রোগ প্রায়ই দেখা যায়। এ ব্যাপারে স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ নিন।

গলার পেছনদিকটা দেখতে হলে একটা চামচের উল্টো পিঠটা দিয়ে জিভটা চেপে ধরে, টর্চ জ্বেলে দেখুন।



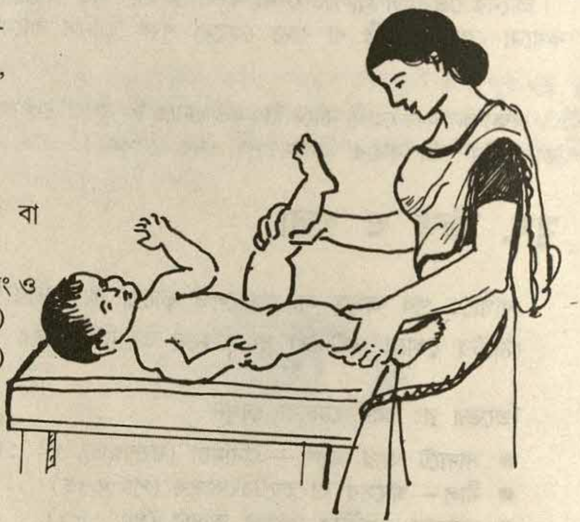
গলার পেছনে জিভের দুধারের ডেলা দুটি হোল টনসিল। টনসিলে জীবাণুর আক্রমণ হলে তাকে টনসিলাইটিস বলে (পৃঃ ৩৫৬)। এতে টনসিল দুটো বড় হয়ে যায় আর রোগীর জ্বর হয়। ছোটদের জ্বরের এটা একটা প্রধান কারণ।

ছোট শিশুদের টনসিলের ওপরে আর গলার পেছনে সাদা বা পাঁশুটে রঙের পর্দা থাকলে ডিপথিরিয়া (পৃঃ ৩৬১) বোঝাতে পারে।

চামড়া

অসুখ যতই অল্প মনে হোক্, রোগীর গাটা পরীক্ষা করা জরুরি। পরীক্ষার সময় শিশু বা ছোটদের সমস্ত জামাকাপড় খুলে ফেলা উচিত। লক্ষ্য করুন, এমন কিছু দেখতে পাচ্ছেন কি না যা ঠিক স্বাভাবিক নয়। যেমন:

- ঘা
- ফুসকুড়ি বা দাগড়া ফোলা
- ক্ষত
- চামড়ার ভেতরে কাঁটা ধরনের কিছু
- ফুটকি, চাপড়া বা অস্বাভাবিক কোনো দাগ—
- প্রদাহ (জীবাণুর আক্রমণের লক্ষণ হোল, লাল, গরম, ব্যথা করা ফোলা)
- ফুলে ওঠা
- অস্বাভাবিক ডেলা বা দলা দলা জিনিস
- ফুলে ওঠা লিমফের গ্রন্থি (গলায়, বগলে বা কুঁচকিতে ছোটছোট ফোলা পৃঃ ১০১)
- চুল অস্বাভাবিকভাবে পড়ে যাওয়া বা চুলের রং ও চক্চকে ভাব নষ্ট হয়ে যাওয়া (পৃঃ ১২৫)
- ভুরুর চুল পড়ে যাওয়া (কুষ্ঠ? পৃঃ ২৩২)



সবসময় ছোটদের পাছার মাঝখানটা, যৌনাঙ্গের জায়গাটা, হাতপায়ের আঙুলের ফাঁকগুলো, কানের পেছনটা, চুলের ভেতরে (উকুন, দাদ, ফুসকুড়ি বা ঘা আছে কি না দেখার জন্যে) পরীক্ষা করবেন

চামড়ার বিভিন্ন রোগ চিনবার জন্যেঃ পৃঃ ২৩৮-২৪০ দেখুন।

পেট

যদি রোগীর পেটে ব্যথা হয়, ঠিক কোন জায়গাটায় ব্যথা তা বোঝার চেষ্টা করুন।

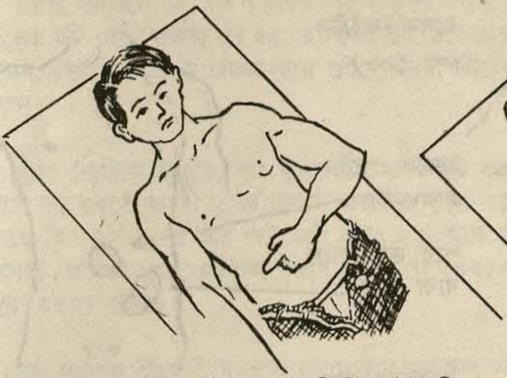
ব্যথাটা একটানা না খিলধরা না শূলব্যথার মতো হঠাৎ আসছে যাচ্ছে সেটা জেনে নিন।

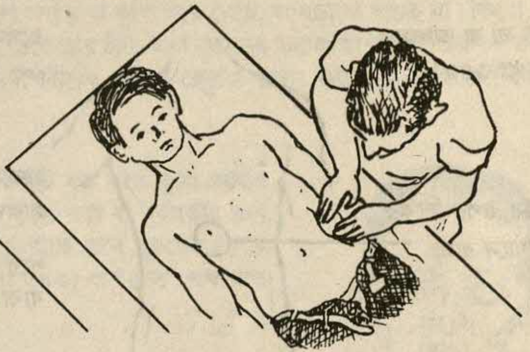
পেট পরীক্ষা করার সময় প্রথমে দেখুন সমস্ত পেটটা ফোলা কি না, তারপর দেখুন কোনো বিশেষ অংশ ফুলেছে বা ডেলা আছে কি না।

ব্যথার ঠিক জায়গাটা জানলে অনেক সময় কারণটা ধরা যায় (পৃঃ ৪৪)

প্রথমে রোগীকে ব্যথার ঠিক জায়গাটা একটা আঙুল দিয়ে দেখাতে বলুন

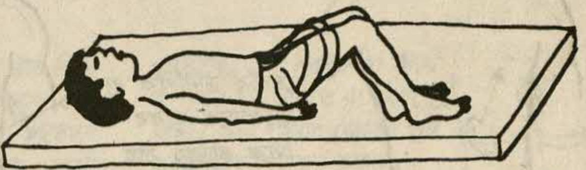
তারপর তার দেখানো জায়গার ঠিক উল্টোদিক থেকে শুরু করে পেটের সব জায়গায় আস্তে করে টিপে দেখুন কোথায় কোথায় সবচেয়ে বেশি ব্যথা





পেটটা কি নরম না শক্ত ঠেক্‌ছে? রোগী কি পেটটা ঢিলে করতে পারছে? পেট খুব শক্ত লাগলে ভেতরের কোনো সাংঘাতিক রোগ বোঝাতে পারে—যেমন, এপেনডিসাইটিস বা পেরিটোনাইটিস (পৃঃ ১০৮)

পেটটা ঢিলে করার জন্যে রোগীকে ছবির মত চিৎ হয়ে হাঁটু মুড়ে শুতে বলুন।



এপেনডিসাইটিস বা পেরিটোনাইটিস বলে সন্দেহ হলে পৃঃ ১০৮-এ যেমন বলা আছে সেইভাবে রিবাউণ্ড ব্যথার জন্যে একটা পরীক্ষা করুন।

পেটে কোনো অস্বাভাবিক ডেলা বা শক্ত জায়গা রয়েছে কি না হাত দিয়ে দেখুন।

রোগীর যদি সবসময় পেটে ব্যথা আর বমির ভাব থাকে, আর পায়খানা বা বায়ু একেবারেই বার না হয় তবে তার পেটের ওপর এইভাবে কান রাখুন:

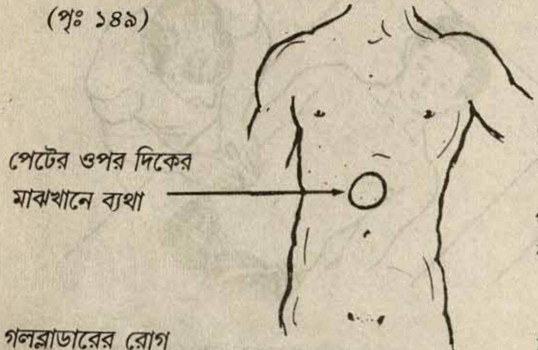


পেটের মধ্যের কলকল আওয়াজ শুনুন। যদি ২ মিনিটের মধ্যে কোনো আওয়াজ শুনতে না পান, তবে সেটা বিপদের সঙ্কেত। (দেখুন: নাড়িভুঁড়ির জরুরি সমস্যা, পৃঃ ১০৬)

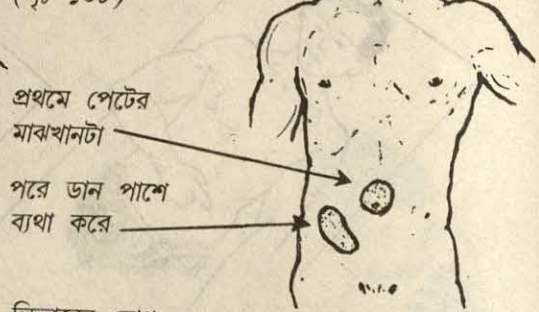
> **কুকুর বা পেট যদি চুপচাপ থাকে—**
> **সাবধান! পড়ে যাবে বিষম বিপাকে**

নিচের ছবিগুলিতে দেখানো হয়েছে কি কি অসুখ করলে পেটের কোন্ কোন্ জায়গায় ব্যথা করে:

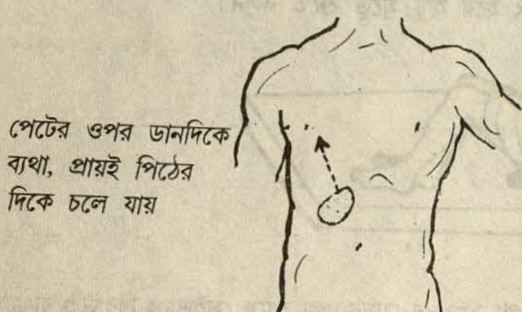
পেটে ঘা বা আলসার (পৃঃ ১৪৯)



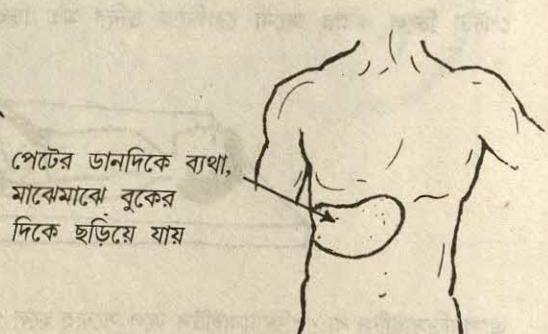
এপেনডিসাইটিস (পৃঃ ১০৮)



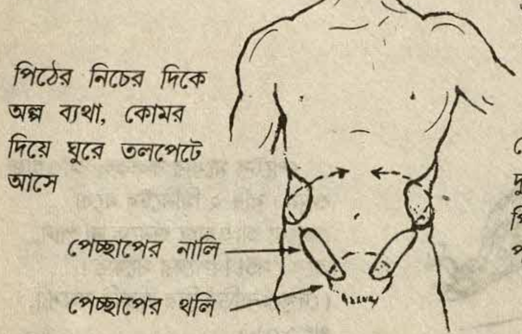
গলব্লাডারের রোগ (পৃঃ ৩৭৫)



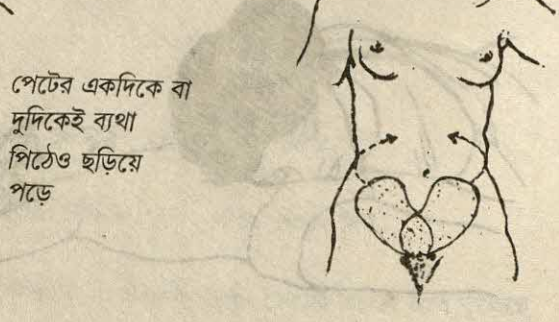
লিভারের রোগ (পৃঃ ২১০, ১৯৭, ৩৭৪)



পেচ্ছাপের রোগ (পৃঃ ২৭৮)



মেয়েদের ডিম্বকোষের প্রদাহ বা টিউমার (আব, পৃঃ ৩২৬)



দ্রষ্টব্য: পিঠে ব্যথার বিভিন্ন কারণ পৃঃ ২১১-তে দেয়া আছে।

পেশী এবং স্নায়ু

রোগী যদি বলে যে, তার শরীরের কোনো অংশ অসাড় বা দুর্বল হয়ে গেছে, বা নড়ানো যাচ্ছে না ; কিংবা আপনার নিজের যদি রোগী সম্বন্ধে ওই ধরনের সন্দেহ হয়, তবে তার হাঁটা আর নড়াচড়া ভালো করে লক্ষ্য করুন। তাকে দাঁড় করান, বসান বা একদম সোজা করে শুইয়ে দিন। শরীরের দুদিকে কোনো তফাৎ আছে কি না ভালো করে নজর করুন।

মুখ : রোগীকে হাসতে, ভুরু কুঁচকোতে, চোখ দুটি বড় করে খুলে আবার টিপে বন্ধ করতে বলুন। মুখের কোনো একদিকে ঝুলে পড়া বা দুর্বলতার ভাব আছে কি ? যদি থাকে আর সেটা যদি হঠাৎ হয়ে থাকে তবে বুঝবেন মাথায় আঘাত লেগেছে (পৃঃ ১০৪) বা সন্ন্যাস রোগ (পৃঃ ৩৭৩) বা "বেল" পক্ষাঘাত (পৃঃ ৩৭৩) হয়েছে।



যদি দুর্বলতা ধীরে ধীরে এসে থাকে তবে মগজের আব (টিউমার) হতে পারে। এইসব ব্যাপারেই ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন।

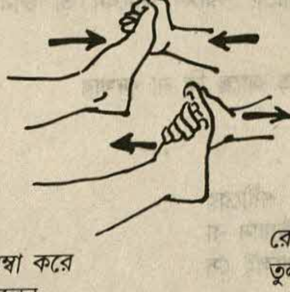
চোখের নড়াচড়া, চোখের মণির আকার (পৃঃ ২৬০) আর ভালো করে দেখতে পাচ্ছে কি না দেখুন।

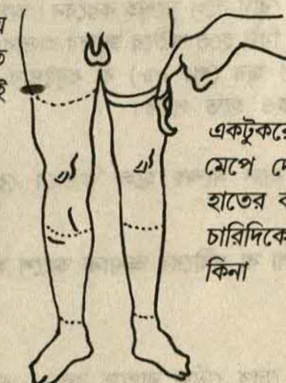
হাত ও পা : হাত, পা কি শুকিয়ে গেছে বা যাচ্ছে ? দুটি হাত বা দুটি পা সমান মোটা বা রোগা কি না লক্ষ্য করুন বা মেপে দেখুন।

রোগীকে বলুন তার দু হাত দিয়ে আপনার দু হাতের আঙুল যেন জোরে চেপে ধরে। এইভাবে তার দুহাতের জোর সমান রয়েছে কি না বোঝা যাবে।



রোগীকে তার একটা পা দিয়ে আপনার হাত টানতে বা ঠেলতে বলুন। অন্য পায়ের জোরও ওই একইভাবে পরীক্ষা করুন।





একটুকরো দড়ি দিয়ে মেপে দেখুন দুটি হাতের বা পায়ের চারিদিকের মাপ সমান কিনা

রোগীকে তার হাত দুটি সামনে লম্বা করে রেখে চিৎ এবং উপুড় করতে বলুন



কোথাও কোনো দুর্বলতা কি না লক্ষ্য করুন বা কাঁপুনি আছে

রোগীকে শোয়া অবস্থায় একটা করে পা তুলতে বলুন



যদি সমস্ত শরীরেই পেশীর ক্ষয় বা দুর্বলতা দেখা যায় তবে বুঝবেন রোগী অপুষ্টিতে (পৃঃ ১৩২) বা যক্ষ্মার মতো কোনো বেশি দিনের রোগে ভুগছে।

যদি পেশীর ক্ষয় বা শুকিয়ে যাওয়ার ভাব অসমান হয় কিংবা শরীরের একদিকে বেশি থাকে, তবে ছোটদের বেলায় তা পোলিও (পৃঃ ৩৬১) রোগের লক্ষণ বোঝাতে পারে। বড়দের বেলায় পিঠের কোনো রোগ, পিঠে বা মাথায় আঘাত, বা সন্ন্যাস রোগ হয়ে থাকতে পারে।

শরীরের কোনো জায়গার পেশী শক্ত বা টান হয়ে গেছে কি না পরীক্ষা করে দেখবেন:



- রোগীর চোয়াল যদি শক্ত হয়ে যায় বা খোলা না যায়, তবে তা ধনুষ্টঙ্কার (পৃঃ ২২৩) বা গলায় (পৃঃ ৩৫৬) বা দাঁতে (পৃঃ ২৭৫) সাংঘাতিক সংক্রমণ বোঝাবে।

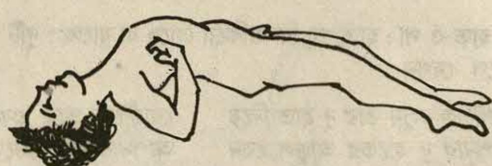
- বেশি অসুস্থ শিশুর ঘাড় আর পিঠ যদি শক্ত হয়ে পেছনদিকে বেঁকে যায়, তবে মেনিনজাইটিস (পৃঃ ২২৫) বলে সন্দেহ করবেন। রোগীর মাথা সামনে ঝোঁকানো বা দু হাঁটুর মধ্যে রাখা না গেলে মেনিনজাইটিস হয়ে থাকতে পারে।



মেনিনজাইটিস

- যদি শিশুর কোনো পেশী **সবসময়** শক্ত হয়ে থাকে আর সে যদি অদ্ভুত ধরনের ঝাঁকি দিয়ে নড়াচড়া করে, তবে সে স্প্যাস্টিক (পৃঃ ৩৬৭) হতে পারে।

- যদি হঠাৎ হঠাৎ অদ্ভুতভাবে ঝাঁকি দিয়ে নড়াচড়া করে রোগী অজ্ঞান হয়ে যায়, তবে সেটা ফিটের (পৃঃ ২১৭) লক্ষণ। ফিট ঘন ঘন হতে থাকলে মৃগী রোগ বলে সন্দেহ করবেন। অসুখের সময় এরকম ফিট হলে শরীরে জলের অভাব (পৃঃ ১৮১), বেশি জ্বর (পৃঃ ৮৮) বা ধনুষ্টঙ্কার (পৃঃ ২২২) থেকেও হতে পারে।



ধনুষ্টঙ্কার

ধনুষ্টঙ্কার বলে সন্দেহ হলে কিভাবে রোগীকে পরীক্ষা করবেন তা জানতে হলে পৃঃ ২২৪ দেখুন।

হাত বা পা বা শরীরের অন্যান্য অংশে সাড় আছে কি না দেখার নিয়ম:

রোগীকে চোখ ঢেকে রাখতে বলুন। তার শরীরের নানা জায়গায় আলতো করে আপনার হাত ছোঁয়ান বা আলপিন দিয়ে বেঁধান। রোগীকে বলুন টের পেলেই সে যেন 'হ্যাঁ' বলে।



- শরীরে কোনো বড় বা ছোট দাগের ওপরে বা পাশে অসাড়তা থাকলে তা কুষ্ঠ রোগের লক্ষণ হতে পারে (পৃঃ ২৩২)।

- দুটো হাত বা দুটো পায়েই অসাড় ভাব থাকলে বহুমূত্র (পৃঃ ১৪৯) বা কুষ্ঠ রোগ হয়ে থাকতে পারে।

- শরীরের একদিকে অসাড় ভাব থাকলে সেটা পিঠের অসুখ (পৃঃ ২১২) বা আঘাত থেকে হতে পারে।

পা



পা দুটিতে কোনো ফোলা আছে কি? এটা সাধারণতঃ চোখে দেখেই বোঝা যায়। ফোলা খুব অল্প হলে গোড়ালির হাড়ের ওপরের চামড়া টিপে দেখুন। ফোলা থাকলে সেখানে একটা টোল পড়ে যাবে। যে শিশুরা অপুষ্টিতে ভোগে তাদের পা আর মুখ প্রায়ই ফুলে থাকে (পৃঃ ১৩২)। পোয়াতি মায়ের বেলায় পা ফুলেছে কি না দেখাটা বিশেষ জরুরি (পৃঃ ২১৪)।

পেচ্ছাপের কোনো দোষ থাকলে (পৃঃ ২৭৮) বা হার্টের কোনো গোলমাল থাকলে (পৃঃ ৩৭১) পা দুটি ফুলে যায়। গোদ (পৃঃ ২২৯) হলেও পা আর কুঁচকির জায়গা ফুলে ওঠে। গোদ কি না বুঝতে হলে আগের মতো রোগীর গোড়ালির হাড়ের ওপরের চামড়া টিপে দেখুন। গোদের বেলায় কিন্তু আপনার আঙুলটা সরিয়ে নিলে সেখানে টোল পড়ে থাকবে না।

পরিচ্ছেদ

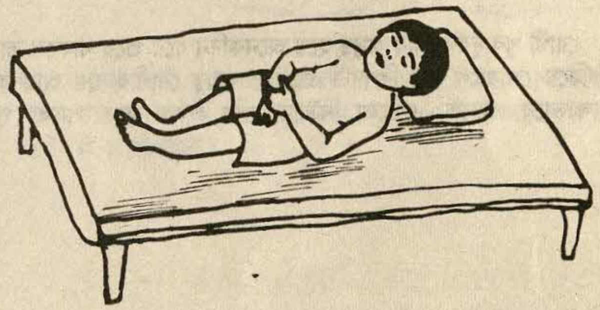
4 রোগীর দেখাশোনা কি ভাবে করতে হয়

রোগে শরীর দুর্বল হয়। শরীরে বল পেয়ে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠার জন্যে বিশেষ যত্ন লাগে।

> যে কোনো রোগের চিকিৎসায় সেবাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়।

ওষুধ সবসময় দরকার হয় না। কিন্তু ঠিকমতন যত্ন সর্বদাই জরুরি। উপযুক্ত যত্নের গোড়ার কথা হোল:

১· রোগীর আরাম



রোগীকে এমন জায়গায় বিশ্রাম করতে দেয়া উচিত যেটা নিরিবিলি, আরামদায়ক, আর যেখানে প্রচুর আলোবাতাস আছে। বেশি ঠাণ্ডা বা বেশি গরম লাগানো উচিত নয়। যদি বাতাসটা বেশি ঠাণ্ডা হয় বা রোগীর শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তবে তাকে একটা চাদর বা কম্বল দিয়ে ঢেকে দিন। কিন্তু গরমের সময়, বা রোগীর জ্বর হলে তার গায়ে কিছুই চাপা দেবেন না।



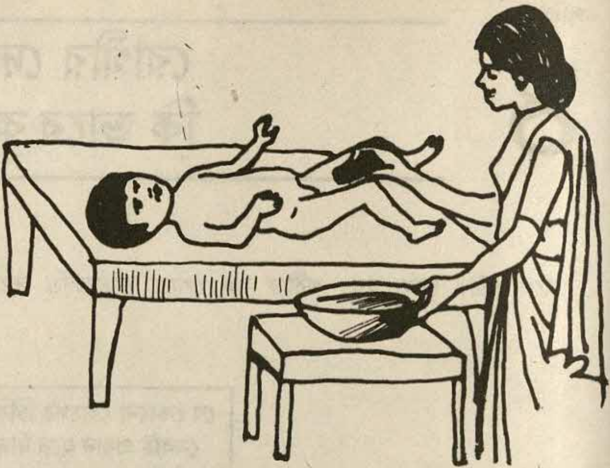
২· তরল খাবার

প্রায় সব রোগেই, বিশেষ করে জ্বর আর পাৎলা পায়খানায় রোগীকে প্রচুর তরল খাবার খেতে দেয়া উচিত: জল, চা, ফলের রস, ঝোল ইত্যাদি। যদি সে একসঙ্গে বেশি খেতে না পারে, তাকে বারে বারে অল্প অল্প করে খেতে দিন। যদি সে কোনোরকমে শুধু গিলতে পারে তাকে প্রতি ৫/১০ মিনিট অন্তর দু-এক চুমুক করে খেতে দিন।

রোগী দিনে কতটা তরল জিনিস খাচ্ছে তার একটা মাপ রাখুন। বড়দের—দিনে ২ লিটার বা তার বেশি তরল জিনিস খাওয়া আর ৩/৪ বার পেচ্ছাপ করা দরকার। যদি রোগী ঠিকমত তরল খাবার না খায় আর তার পেচ্ছাপ ঠিক না হয় অথবা তার শরীরে জলের অভাবের লক্ষণ দেখা দেয় (পৃঃ ১৮১) তবে তাকে বেশি করে তরল জিনিস খেতে উৎসাহ দিন। রোগীর উচিত একটু নুন মেশানো *পুষ্টিকর* তরল জিনিস খাওয়া। তা যদি না খেতে চায়, তবে তাকে শরীরে জলের অভাব দূর করার চিনি নুনের সরবৎ (পৃঃ ১৮২) দিন। যদি রোগী সেটাও না খেতে পারে, আর তার *শরীরে জলের অভাবের* লক্ষণ দেখা যায়, তবে ডাক্তার বা অভিজ্ঞ স্বাস্থ্যকর্মী তার *শিরার মধ্যে নুনজলের ইন্‌জেকশন্* দিতে পারেন। কিন্তু প্রথম থেকেই রোগীকে ঘনঘন অল্প করে তরল খাবার খাওয়াতে থাকলে এই ব্যাপারটা সাধারণতঃ এড়ানো যায়।

৩· পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

রোগীকে পরিষ্কার রাখাটা জরুরি। অল্প গরম জলে তাকে রোজ স্নান করানো উচিত। সে যদি এত অসুস্থ হয় যে বিছানা থেকে উঠতে না পারে, তবে একটুকরো কাপড় দিয়ে কুসুম গরম জলে তার গা মুছিয়ে দিন। তার জামাকাপড়, চাদর আর ঢাকা পরিষ্কার রাখা দরকার। দেখবেন, যেন বিছানায় খাবারের গুঁড়ো বা টুকরো পড়ে না থাকে।



রোগীকে রোজ স্নান করানো উচিত

রোগী যদি এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে নিজে নিজে পাশ ফিরতে পারে না, তবে তাকে সারাদিনে অনেকবার পাশ ফিরিয়ে দেয়া উচিত। এতে বিছানার ঘা (পৃঃ ২৫৫) এড়ানো যায়।

যে শিশু অনেকদিন ধরে ভুগছে তাকে ঘনঘন বিছানা থেকে মায়ের কোলে তুলে নেয়া দরকার।

রোগী খুব দুর্বল আর অসুস্থ হয়ে অনেকদিন ধরে শুয়ে থাকলে তার নিউমোনিয়ার ভয় থাকে। তাকে ঘনঘন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শোয়ালে এই বিপদটা এড়ানো যায়। রোগীর জ্বর আর কাশি থাকলে আর নিশ্বাস খুব তাড়াতাড়ি অথচ হাল্কাভাবে পড়লে, এগুলো নিউমোনিয়ার লক্ষণ হতে পারে (পৃঃ ২০৮)।

৪· উপযুক্ত খাবার



রোগীর খিদে পেলে তাকে খেতে দেবেন। বেশির ভাগ রোগে কোনো বিশেষ ধরনের পথ্যের দরকার হয় না। রোগীর প্রচুর তরল খাবার আর ডাল, বরবটি, শাক, ফল ও দুধ এইসব শরীর গড়ার আর পুষ্টিকর খাবার খাওয়া উচিত। সম্ভব হলে ডিম, মাছ, মাংস, মুরগি দেবেন। দুধ খুব ভালো খাবার, কারণ শরীরের যা যা দরকার দুধে তা আছে (১১ পরিচ্ছেদ)।

রোগী যদি বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে, তাকে এইসব খাবারের রস বা ঝোল করে দেবেন।

চাল, গম, ভুট্টা, রাগি ধরনের যে সমস্ত খাবারে শক্তি বাড়ায়, তাও দরকার। এ সবে একটু করে চিনি আর তেলজাতীয় জিনিস মিশিয়ে দিলে শক্তি আরো বাড়বে। রোগীকে প্রচুর চিনি মেশানো তরল খাবার দেবেন—বিশেষ করে যখন সে অন্য বিশেষ কিছু খেতে পারবে না। যেসব রোগী একসঙ্গে বেশি খেতে পারে না, তাদের বারে বারে অল্প অল্প করে খেতে দেবেন।

কয়েকটি রোগে বিশেষ ধরনের পথ্য লাগে।
সেগুলি সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হয়েছে:

পেটে ক্ষত (আলসার) ও বুকজ্বালা .... পৃঃ ১৪৯
এপেন্‌ডিসাইটিস্, নাড়িভুঁড়ির পথ আটকে থাকা, পেটে
প্রচন্ড যন্ত্রণা (এইসব রোগে খাবার একেবারেই খায় না) .... পৃঃ ১০৬
বহুমূত্র (ডায়াবেটিস) .... পৃঃ ১৪৯
হার্টের রোগ .... পৃঃ ৩৭১
গলব্লাডারের রোগ .... পৃঃ ৩৭৫
ছোটদের পেচ্ছাপের দোষ .... পৃঃ ৩৫৭

বেশি অসুস্থ রোগীর বিশেষ যত্ন



১· তরল খাবার

বেশি অসুস্থ রোগীর পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে তরল জিনিস খাওয়াটা খুবই জরুরি। যদি সে একসঙ্গে বেশি খেতে না পারে তবে তাকে বারে বারে অল্প অল্প করে তরল খাবার দেবেন। রোগী যদি কোনোরকমে শুধু ঢোক গিলতে পারে, তবে তাকে ৫/১০ মিনিট বাদে বাদে দু-এক চুমুক করে খাওয়ান।

২· খাবার

রোগী যদি শক্ত খাবার না খেতে পারে, তাকে ঝোল (স্যুপ), দই, ঘোল, ডালের জল, সবজির ঝোল, লেবুর রস, ডাবের জল—এই রকম সব পুষ্টিকর তরল খাবার দিন। চাল, গমের ডালিয়া, সুজি, রাগি এসবের খিচুড়িও খুব ভালো—যদি তার সঙ্গে শরীর গড়বার খাবারও কিছু মেশানো থাকে। স্যুপের মধ্যে সবুজ শাক, বরবটি, ডিম, কুচি কুচি মাংস, মাছ, মুরগি—এসব মেশানো যেতে পারে। রোগী যদি একসঙ্গে বেশি খেতে না পারে তবে তাকে একটু করে অনেকবার খাওয়ানো উচিত।

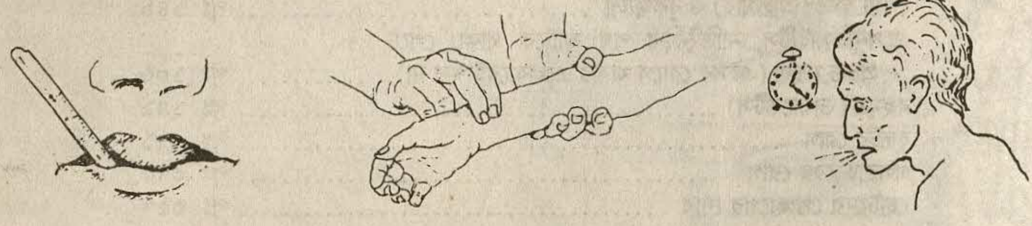
৩· পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

সাংঘাতিক রকম অসুস্থ রোগীর শরীর পরিষ্কার রাখাটা খুবই জরুরি। তাকে প্রতিদিন গরম জলে স্নান করানো উচিত। রোগীর বিছানা প্রতিদিন বা নোংরা হলেই বদলে দেবেন।

৪· রোগীর অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য করা

রোগীর অবস্থা ভালোর দিকে যাচ্ছে না খারাপ হচ্ছে সেদিকে নজর রাখুন। তার শরীর সম্বন্ধে জরুরি তথ্যগুলো লিখে রাখুন। সারাদিনে ৪ বার নিচের তথ্যগুলি লিখে রাখবেন:

টেম্পারেচার (কত ডিগ্রী)	নাড়ি (মিনিটে কবার ধুকধুক করছে)	শ্বাস (মিনিটে কবার পড়ছে)



রোগী সমস্ত দিনে কতটা তরল খাবার খেল, কবার পেচ্ছাপ করল, পায়খানা করল কি না এসবও লিখে রাখুন। এই সমস্ত খবর স্বাস্থ্যকর্মী বা ডাক্তারের পাওয়া দরকার।

খেয়াল রাখবেন—এমন কোনো লক্ষণ দেখা দিয়েছে কি না যা থেকে বোঝা যায় রোগীর অসুখটার বাড়াবাড়ি হচ্ছে বা সেটা বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। **বিপজ্জনক অসুখের লক্ষণের একটি তালিকা নিচে দেয়া হল।** এর মধ্যে কোনো একটিও নজরে এলে **তখনি ডাক্তারি সাহায্য নেবেন।**

কখন কি ভাবে ডাক্তারি সাহায্য চাইতে হয়

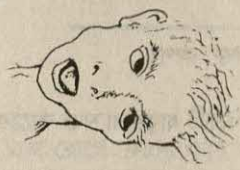
বিপদের লক্ষণ দেখা দিলেই ডাক্তারের সাহায্য চাইবেন। রোগী আরো অসুস্থ হয়ে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন না—কারণ তখন হয়তো আর তাকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা হাসপাতালে নিয়েই যাওয়া যাবে না।

যদি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে গেলে রোগীর অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যাবার ভয় থাকে, তবে একজন স্বাস্থ্যকর্মীকে রোগীর কাছে নিয়ে আসার চেষ্টা করুন। কিন্তু জরুরি অবস্থায়—যেখানে তাড়াতাড়ি বিশেষ চিকিৎসা বা অপারেশন দরকার (যেমন—এপেন্‌ডিসাইটিস্), —স্বাস্থ্যকর্মীর জন্যে অপেক্ষা করবেন না। রোগীকে তখনি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা হাসপাতালে নিয়ে যান।

যদি রোগীকে স্ট্রেচারে করে বয়ে নিয়ে যেতে হয়, তবে তাকে যতটা সম্ভব আরামে রাখুন,—দেখবেন সে যেন পড়ে না যায়। তার কোনো হাড় ভেঙে থাকলে তাকে নড়াবার আগে ভাঙা জায়গাটা কাঠের তক্তা দিয়ে বেঁধে দিন (পৃঃ ১১২) যদি রোদের তেজ বেশি হয়, তবে একটা চাদর স্ট্রেচারের ওপর খাটিয়ে নেবেন—যাতে রোগী ছায়ায় থাকে—অথচ চাদরের নিচ দিয়ে বাতাস চলাচল করে।



বিপজ্জনক অবস্থার লক্ষণ কি কি



নিচের লক্ষণগুলোর কোনো একটা বা কয়েকটা দেখা গেলে বুঝবেন যে রোগীর চিকিৎসা, উপযুক্ত ডাক্তারি সাহায্য ছাড়া বাড়িতে করা যাবে না। **যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তারের সাহায্য নিন।** সাহায্য না আসা পর্যন্ত নিচে দেয়া পৃষ্ঠায় যেমন যেমন শেখানো হয়েছে—করে যাবেন।

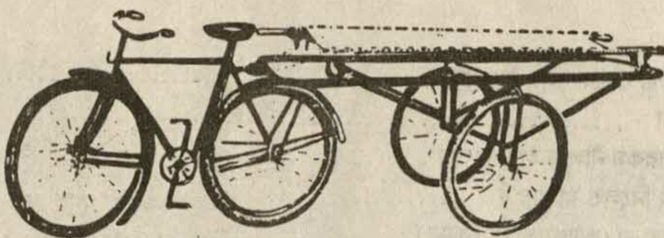
পৃষ্ঠা

সাইকেল এম্বুলেন্স (রোগীকে নিয়ে যাবার গাড়ি)

গ্রামে ব্যবহারের জন্যে খুব সহজে আর সস্তায় সাইকেল এম্বুলেন্স তৈরি করা যায়। সাইকেল কিনবারও দরকার নেই। গ্রামের কোনো পরোপকারী লোকের সাইকেল ব্যবহার করতে পারেন।

সরঞ্জাম

- ২½ মিটার লম্বা ২টি শক্ত কাঠের বা বাঁশের ডাণ্ডা
- ২¼ মিটার লম্বা আর ৯০ সেন্টিমিটার চওড়া ক্যানভাস বা অন্য শক্ত কাপড়
- রোগীকে ঢাকা দেবার চাদর
- স্ট্রেচার আটকাবার জন্যে ২ মিঃ ৩৫ সেঃ মিঃ লম্বা আর ৫৬ সেঃ মিঃ চওড়া একটি ধাতুর বা শক্ত কাঠের বা বাঁশের কাঠামো বা ফ্রেম
- ৭ সেঃ মিঃ চওড়া আর অন্ততঃ ১ মিঃ ৮০ সেঃ মিঃ লম্বা কয়েকটি ক্যানভাসের ফালি
- একটা লোহার ফ্রেমে আটকানো সাইকেলের দুটি চাকা। এটা গ্রামের কামারই করে দিতে পারবে।



- সাইকেলের পেছনের ফ্রেমের সঙ্গে ঝালাই করা একটা ধাতুর তৈরি আঙটা
- যে তাকের ওপর স্ট্রেচার থাকবে তার সামনে লাগানো একটা ইংরিজি L অক্ষরের মতো লোহার টুকরো। এটা সাইকেলের পেছনের আঙটার মধ্যে পরিয়ে দিলে সাইকেলের সঙ্গে স্ট্রেচারটা আটকে যাবে।

তৈরির আর ব্যবহারের নিয়ম:

ক্যানভাস কাপড়টা লম্বার দিকে দুপাশে ভাঁজ করে সেলাই করুন, যাতে কাঠ বা বাঁশের ডাণ্ডা দুটি ঢোকানো যায়। শক্ত সুতো দিয়ে ভালো করে সেলাই করবেন—দেখবেন যেন খুলে না আসে।

স্ট্রেচারের ফ্রেমে বেশ গভীর করে খাঁজ কেটে ফেলুন যাতে হাতলগুলো ভালোভাবে আটকে থাকে, আর সাইকেলটা চলতে থাকলে স্ট্রেচারটা পড়ে না যায়। আরো সাবধান হবার জন্যে হাতলগুলো ফ্রেমের সঙ্গে বেঁধে ফেলতে পারেন।

পৃঃ ১১৩ আর ১১৪-তে যেমন দেখানো হয়েছে রোগীকে সেইভাবে স্ট্রেচারে তুলুন।

স্ট্রেচারটি ফ্রেমে ঠিকমতো আটকানো হলে রোগীর গায়ে একটা চাদর ঢেকে দিন। রোগীকে ক্যানভাসের চওড়া ফালিগুলো দিয়ে স্ট্রেচারের সঙ্গে বেঁধে ফেলুন।

ঝাঁকানি আর হঠাৎ মোড় নেয়া এড়িয়ে সাবধানে সাইকেল চালান।

যেখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতাল দূরে, অথচ আহত লোকের বা রোগীর তাড়াতাড়ি ডাক্তারের সাহায্যের দরকার, সেখানে এই ধরনের এম্বুলেন্স খুব কাজে লাগে।

স্বাস্থ্যকর্মীকে কি বলবেন

চিকিৎসায় বা ওষুধের ব্যবহারে পরামর্শ দিতে গেলে স্বাস্থ্যকর্মীর বা ডাক্তারের রোগীকে দেখা দরকার। রোগীকে যদি সরানো না যায়, স্বাস্থ্যকর্মীকেই রোগীর কাছে নিয়ে আসুন। তাও যদি সম্ভব না হয় তবে কোনো দায়িত্বশীল লোককে—যে রোগের খুঁটিনাটি জানে—স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে পাঠান। **কখনই কোনো ছোট ছেলেমেয়েকে পাঠাবেন না।**

রোগীর যখন খুবই অসুখ যায় না কো নড়ানো,
স্বাস্থ্যকর্মী কাছাকাছি মিলছে না কো কোনো;
স্বাস্থ্যকেন্দ্রে লোক পাঠাবে পরামর্শ চাইতে,
সঙ্গে কাগজ—রোগের খবর লেখা থাকবে তাইতে।

পরিচ্ছেদ

৫ বিনা ওষুধে রোগ সারানো

বেশির ভাগ রোগে কোনো ওষুধ লাগে না। নিজেকে রক্ষা করবার ক্ষমতা বা রোগকে বাধা দেবার আর রোগের সঙ্গে লড়বার উপায়গুলো আমাদের শরীরেই আছে। বেশির ভাগ জায়গায় স্বাস্থ্যের জন্যে, এই স্বাভাবিক রক্ষাক্ষমতাগুলো ওষুধবিষুধের থেকে অনেক জরুরি হয়ে দাঁড়ায়।

সর্দি আর বহু রোগে লোকে নিজেরাই সেরে ওঠে, দেখা যায়, ওষুধ ছাড়াই

কোনো রোগের সঙ্গে লড়তে বা সেটাকে দমন করতে শরীরকে সাহায্য করতে হলে সাধারণতঃ দরকার শুধু:

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা *প্রচুর বিশ্রাম নেওয়া* *ভাল খাওয়াদাওয়া করা*



এমনকি যেসব শক্ত রোগে ওষুধের দরকার হতে পারে, সেখানেও **শরীরকেই রোগ দমন করতে হয়**; ওষুধ শুধু সাহায্য করে। সেখানেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, বিশ্রাম আর পুষ্টিকর খাবার খুবই জরুরি।

স্বাস্থ্যের যত্নের অনেকটাই ওষুধ ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে না—করা উচিত নয়। আপনি যদি এমন একটা এলাকায় থাকেন, যেখানে কোনো আধুনিক ওষুধ নেই, তবুও ঠিকমত শিখে নিলে বেশির ভাগ সাধারণ অসুখ এড়াবার আর সারাবার জন্যে আপনি অনেক কিছুই করতে পারবেন।

অনেক রোগই এড়াবার বা সারাবার কাজে ওষুধের ব্যবহার মোটেই লাগে না যে।

লোকে যদি **শুধু জল** ঠিকমত ব্যবহার করতে শেখে, কেবল তাই দিয়েই অনেক রোগ এড়ানো আর সারানো যেতে পারবে—হয়তো এখন যত ওষুধ তারা ব্যবহার বা অপব্যবহার করে সে সবের থেকে তাতেই অনেক বেশি কাজ হবে।

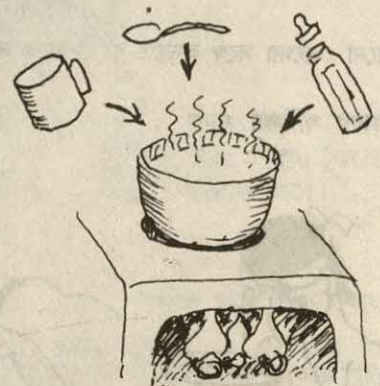
জল দিয়ে রোগ সারানো

আমাদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকই ওষুধ ছাড়া বাঁচতে পারে, কিন্তু জল বাদ দিয়ে কেউই বাঁচতে পারে না। আসলে মানুষের শরীরের অর্ধেকের বেশিই (শতকরা ৫৭ ভাগ) জল। যারা খামার বা গ্রামে বাস করেন, তাঁরা প্রত্যেকেই যদি জলের উপযুক্ত ব্যবহার করেন, তাহলে সম্ভবতঃ অর্দ্ধেক রোগ আর মৃত্যু কমে যাবে—বিশেষতঃ শিশুদের বেলায়।

যেমন, পাৎলা পায়খানা এড়াবার বা সারাবার কাজে জলের ঠিকমত ব্যবহারই মূল জিনিস। অনেক এলাকায় ছোট ছেলেমেয়েদের অসুখ আর মৃত্যুর সবথেকে সাধারণ কারণ হল পাৎলা পায়খানা। *দূষিত* (অপরিষ্কার) জল প্রায়ই এই রোগের কারণের মধ্যে পড়ে।

রোগ এড়ানো

পাৎলা পায়খানা এড়াবার জন্যে একটা খুব জরুরি কাজ হল—যে জল খাওয়া হয় আর যে জলে খাবার তৈরি করা হয় সেটা ফুটিয়ে নেয়া। শিশুদের বেলায় এটা বিশেষ দরকারি। শিশুদের খাওয়াবার বোতল বা অন্য বাসনও ফোটানো উচিত। মলত্যাগ করার পর আর খাওয়ার বা খাবার জিনিসে হাত দেবার আগে সাবান জলে হাত ধোয়াও সমান জরুরি।



রোগ সারানো



শরীরের জল সাংঘাতিকভাবে *কমে যাওয়াই* সাধারণতঃ পাৎলা পায়খানায় শিশুদের মারা যাওয়ার কারণ (পৃঃ ১৮১)। শিশুর পাৎলা পায়খানা হলে তাকে প্রচুর জল দিলে শরীরে জলের অভাব এড়ানো বা সারানো যায়—চিনি বা মধু আর নুন মিশিয়ে দিলে সবথেকে ভাল হয়। (চিনি নুনের সরবৎ পৃঃ ১৮২)।

যে শিশুর পাৎলা পায়খানা হচ্ছে তাকে প্রচুর তরল জিনিস খেতে দেয়া যে কোনো ওষুধ দেয়ার থেকে বেশি জরুরি। এমনকি, যদি যথেষ্ট তরল জিনিস দেয়া হয় তবে পাৎলা পায়খানা সারাতে কোনো ওষুধই সাধারণতঃ লাগে না।

পরের দুটি পৃষ্ঠায় আরো কতকগুলো অবস্থার কথা বলা হয়েছে, যেখানে **প্রায়ই ওষুধ ব্যবহার করার থেকে জল ঠিকমত ব্যবহার করাটা বেশি দরকার।**

যখন জলের উপযুক্ত ব্যবহার ওষুধের থেকে বেশি উপকার করতে পারে

রোগ এড়ানো

এই রোগ এড়াতে	জলের ব্যবহার	পৃষ্ঠা দেখুন
১· পাৎলা পায়খানা, কৃমি নাড়িভুঁড়িতে সংক্রমণ	খাবার জল ফোটান হাত ধুয়ে নিন ইত্যাদি	১৬৯
২· চামড়ায় সংক্রমণ	ঘনঘন স্নান করুন	১৬৭
৩· ক্ষতে সংক্রমণ ধনুষ্টঙ্কার	সাবান জল দিয়ে ভাল করে ক্ষত ধুয়ে ফেলুন	৯৭,১০২
৪· সর্দিগর্মি, গরমের জন্যে দারুণ শ্রান্তি	গরম কালে ঠাণ্ডা জলে দিনের মধ্যে অনেকবার স্নান করুন সারাদিন প্রচুর নুন-মেশানো জল খান	৯৪

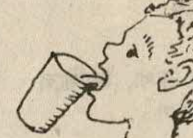




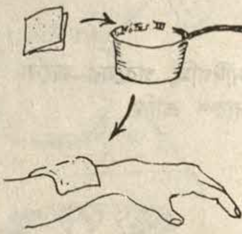


রোগ সারানো

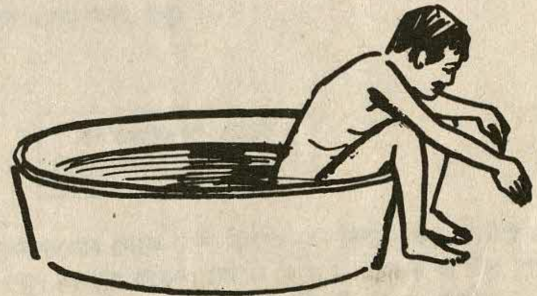
এই রোগ সারাতে	জলের ব্যবহার	পৃষ্ঠা দেখুন
১· পাৎলা পায়খানা, শরীরে জলের অভাব	প্রচুর তরল জিনিস খান	১৮২
২· যে সব রোগের সঙ্গে জ্বর থাকে	প্রচুর তরল জিনিস খান	৮৩
৩· বেশি জ্বর, সর্দিগর্মি গরমে দারুণ শ্রান্তি	সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে রাখুন	৮৮, ৯৩, ৯৪
৪· পেচ্ছাপের ছোটখাট সংক্রমণ (মেয়েদের প্রায়ই হয়)	প্রচুর জল খান	২৭৯





এই রোগ সারাতে	জলের ব্যবহার	পৃষ্ঠা দেখুন	
৫· কাশি, হাঁপানি, বুকে সর্দি বসা (ব্রঙ্কাইটিস) নিউমোনিয়া, হুপিং কাশি	প্রচুর জল খান আর গরম জলের ভাপের শ্বাস নিন (শ্লেষ্মা তরল করতে)	২০৫	
৬· খোস, পাঁচড়া, গায়ে বা মাথায় দাদ, শিশুদের চাপ খুসকি, ব্রণ	সাবান জল দিয়ে ঘষে ধুয়ে দিন	২৪২, ২৪৩, ২৪৬, ২৫২, ২৫৬	
৭· ক্ষতে সংক্রমণ, ঘা, ফোড়া	গরম জলে ভেজান বা সেঁক দিন	১০১, ২৪৩	
৮· পেশীতে বা গাঁটে খিল ধরা, ব্যথা	গরম জলের সেঁক দিন	১১৬, ২১১	
৯· চামড়ায় চুলকানি, জ্বালা করা বা রস পড়া	ঠাণ্ডা জলের সেঁক দিন	২৩৫, ২৩৬	
১০· ছোটখাট পোড়া	ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে রাখুন	১০৯·	
১১· গলা ব্যথা, টনসিলে সংক্রমণ	গরমজলে নুন মিশিয়ে কুলকুচি করুন	৩৫৬	
১২· চোখে এসিড, ক্ষার, ধুলোময়লা বা করকর করার মত কিছু পড়া	তখনই প্রচুর ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে দিন	২৬৪	
১৩· নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া	নুন জল নাক দিয়ে টেনে নিন	২০১	

১৪· মল পরিষ্কার না হওয়া (কোষ্ঠকাঠিন্য) শক্ত মল	প্রচুর জল খান (ডুস জোলাপ খাওয়ার থেকে বেশি নিরাপদ, কিন্তু সেটাও অতিরিক্ত ব্যবহার করবেন না)	১৫১
১৫· অর্শ মলদ্বারে ক্ষত	এক গামলা কুসুম গরম জলে এক চিমটি পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট দিয়ে তাতে পাছা ডুবিয়ে রাখুন	২১৩



কুসুম গরম জলে
পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট মেশান

উপরে যে সব অবস্থার কথা বলা হয়েছে, তাদের অনেকগুলোতেই জল ঠিকমত ব্যবহার করলে ওষুধ আর লাগে না। এই বইয়ে ওষুধ বাদ দিয়ে রোগ সারানোর বিষয়ে অনেক পরামর্শ পাবেন। নিতান্ত প্রয়োজন হলে শুধু তখনই ওষুধ ব্যবহার করবেন।

পরিচ্ছেদ

৬ আধুনিক ওষুধের ঠিক এবং ভুল ব্যবহার

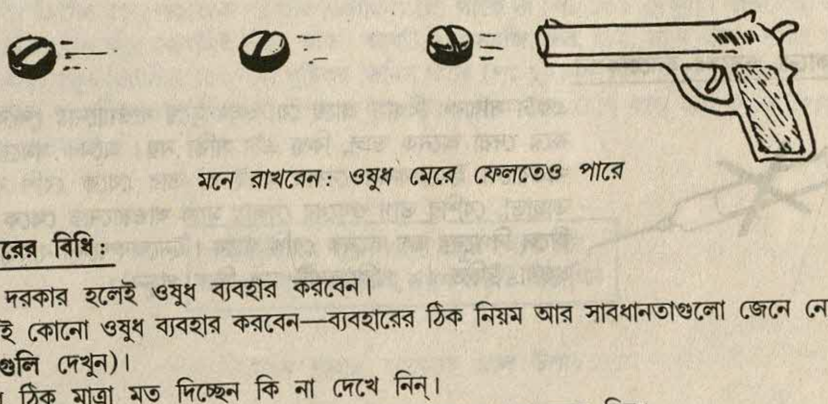
যে সব ওষুধ ওষুধের দোকানে বা গ্রামের মুদির দোকানে বিক্রি হয়, তার মধ্যে কতকগুলো খুবই উপকারি। অন্যগুলো কোনো কাজেই লাগে না। আবার, লোকে অনেক সময় সবথেকে ভাল ওষুধও ভুল ভাবে ব্যবহার করে, যার জন্যে তা দিয়ে উপকারের থেকে অপকারই হয় বেশি। **কাজে লাগাতে গেলে ওষুধ ঠিকমত ব্যবহার করতে হবে।**

অনেকেই—এমনকি বেশির ভাগ ডাক্তার আর স্বাস্থ্যকর্মীরাও—যা দরকার তার থেকে অনেক বেশি ওষুধ দেন—আর এই করে অনেক অকারণ রোগ আর মৃত্যু ঘটান।

সব ওষুধের ব্যবহারেই কিছু বিপদ থাকতে পারেই।

কিছু ওষুধ আছে যেগুলো অন্য অনেকগুলোর থেকে বেশি বিপজ্জনক। কিন্তু মুস্কিল হল এই যে, লোকে কখনো কখনো অল্প অসুখেই খুব বিপজ্জনক ওষুধ ব্যবহার করেন। (আমি দেখেছি, একজন মা তাঁর শিশুর সর্দি হওয়াতে ক্লোরামফেনিকল বলে একটা বিপজ্জনক ওষুধ খাওয়ালেন, ফলে শিশুটি মারা গেল।)

অল্প অসুখে কখনো বিপজ্জনক ওষুধ ব্যবহার করবেন না।



মনে রাখবেন: ওষুধ মেরে ফেলতেও পারে

ওষুধ ব্যবহারের বিধি:

১. শুধু দরকার হলেই ওষুধ ব্যবহার করবেন।
২. যখনই কোনো ওষুধ ব্যবহার করবেন—ব্যবহারের ঠিক নিয়ম আর সাবধানতাগুলো জেনে নেবেন (**সবুজ পৃষ্ঠাগুলি** দেখুন)।
৩. ওষুধ ঠিক মাত্রা মত দিচ্ছেন কি না দেখে নিন্।
৪. ওষুধে কাজ না হলে বা কোনো সমস্যা হলে ব্যবহার বন্ধ করে দিন।
৫. কখনো সন্দেহ হলে স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ নিন।
৬. **কবে ওষুধের কাজ শেষ হবে সেই তারিখটা** (কোন দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়) **সবসময় দেখে নেবেন।** ওই তারিখের পরে ওষুধটা দিলে উপকারের থেকে অপকারই বেশি হতে পারে।

দ্রষ্টব্য: কোনো কোনো স্বাস্থ্যকর্মী আর অনেক ডাক্তার দরকার না থাকলেও ওষুধ দেন—সাধারণতঃ এই কারণে যে, তাঁরা মনে করেন রোগীরা ওষুধ চায়, আর না পেলে, সন্তুষ্ট হয় না। আপনার ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীকে বলুন যে,

সত্যিসত্যিই দরকার থাকলে তবেই আপনি ওষুধ চান। এতে আপনার টাকা আর স্বাস্থ্য দুইই বাঁচবে।

> **দরকার আর ব্যবহার বিধি,ঠিকমতন জানবে,**
> **তবেই শুধু ওষুধ দেবে,এই কথাটি মানবে।**

ওষুধের সবথেকে বিপজ্জনক অপব্যবহার

১· ক্লোরামফেনিকল (পৃঃ ৪০১)



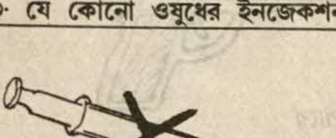
পাৎলা পায়খানার রোগে বা আরো অনেক ছোটখাট অসুখে অনেকেই এই ওষুধটি ব্যবহার করেন। অথচ এতে প্রচণ্ড ঝুঁকি আছে। টাইফয়েডের মত খুব কঠিন রোগ হলে তবেই ক্লোরামফেনিকল ব্যবহার করবেন (পৃঃ ২২৯ দেখুন)। কচি বাচ্চাদের এই ওষুধ কখনো দেবেন না।

২· অকসিটসিন, পিটুইট্রিন এবং এরগোনোভাইন (পৃঃ ৪২৪)



দুঃখের বিষয়, অনেক দাই প্রসব তাড়াতাড়ি হবার জন্যে বা মাকে 'শক্তি দেবার' জন্যে এই ওষুধগুলি ব্যবহার করেন। এই অভ্যাসটি খুবই বিপজ্জনক। এতে মা অথবা শিশুর মৃত্যুও ঘটতে পারে। **কেবলমাত্র শিশু জন্মাবার পরে** মায়ের অতিরিক্ত রক্তপাত বন্ধ করার জন্যে এই সব ওষুধ ব্যবহার করবেন (পৃঃ ৩১২ দেখুন)।

৩· যে কোনো ওষুধের ইনজেকশন



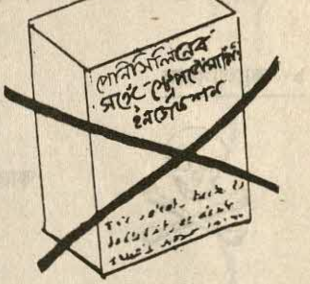
একটা সাধারণ বিশ্বাস আছে যে, ওষুধ মুখে খাওয়ানোর থেকে ইনজেকশন করে দেয়া অনেক ভাল, কিন্তু এটা **সত্যি নয়**। অনেক সময়েই ওষুধ মুখে খাওয়ানো ইনজেকশন দেয়ার মতই বা তার থেকে বেশি কাজে লাগে। তাছাড়া, বেশির ভাগ ওষুধের বেলায় **মুখে খাওয়ানোর থেকে ইনজেকশনে দিলে বিপদের ভয় অনেক বেশি থাকে**। ইনজেকশনের ব্যবহার **খুব সীমিত** হওয়া উচিত (৯ পরিচ্ছেদটি মন দিয়ে পড়ুন)।

৩· পেনিসিলিন

কেবল কতকগুলো বিশেষ সংক্রমণের বিরুদ্ধে পেনিসিলিন কাজ করে। মচকে যাওয়া, কালসিটে পড়া, কোনো ব্যথা বা জ্বরে ঘনঘন পেনিসিলিনের ব্যবহার একটা মস্ত ভুল। সাধারণ নিয়ম হল—আঘাত লেগে খুব বড় কালসিটে পড়লেও, যদি চামড়া না কাটে, তবে সংক্রমণের বিপদ থাকে না ; সেখানে পেনিসিলিন বা অন্য কোনো এনটিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করার দরকার হয় না। চামড়ার ওপর পেনিসিলিনের মলম বা পাউডার লাগালে রোগীর পেনিসিলিনে এলার্জি হয়ে যেতে পারে।

কিছু লোকের পক্ষে পেনিসিলিন খুবই বিপজ্জনক। এটি ব্যবহার করার আগে এতে কি ঝুঁকি আছে আর কি কি সাবধানতা নিতে হয়, দেখে নিন (পৃঃ ৩৯৭দেখুন)।

৫· পেনসিলিনের সঙ্গে স্ট্রেপটোমাইসিনের ইনজেকশন (পৃঃ ৪০০)



অনেক চেনা ওষুধ কোম্পানি এই ইনজেকশনটি তৈরি করে বিশেষ মার্কামারা নাম দিয়ে বাজারে ছাড়েন। এই ওষুধ, প্রায়ই, অতিরিক্তভাবে, ভুল কারণে ব্যবহার করা হয়। দুটি কারণে সর্দিকাশিতে এটি ব্যবহার করা উচিত নয়:

১ক· সর্দিকাশি বা ইনফ্লুয়েঞ্জায় এতে কোনো কাজ হয় না।

১খ· এর থেকে কঠিন সমস্যা হতে পারে—রোগী কালা হয়ে যেতে বা মারা যেতেও পারে।

২· **শুধু যক্ষ্মার চিকিৎসায় স্ট্রেপটোমাইসিন ব্যবহার করবেন।** অন্য রোগে এটি দিলে স্ট্রেপটোমাইসিনে রোগীর প্রতিরোধ জন্মে যায়। তারপর তার যদি যক্ষ্মা হয়, তাকে অনেক দামি ওষুধ ব্যবহার করে রোগ সারাতে হয়। এই ওষুধ অন্য কোনো রোগে দেবেন না।

৬· ভিটামিন বি-১২ আর লিভার এক্‌সট্রাকট (যকৃতের নির্যাস) (পৃঃ ৪২৫)



দুয়েকটি রোগীর বেলায় ছাড়া, এইসব ওষুধে এনিমিয়া (রক্তাল্পতা) বা দুর্বলতা সারে না। তাছাড়া ইনজেকশনে দিলে এগুলোতে কিছু ঝুঁকি আছে। **রক্ত পরীক্ষা করে** কোনো স্বাস্থ্যকর্মী নির্দেশ দিলে তবেই এইসব ওষুধ দেয়া উচিত। প্রায় সব এনিমিয়ার বেলায় আয়রনের বড়ি বেশি কাজে লাগে (পৃঃ ১৪৭)।

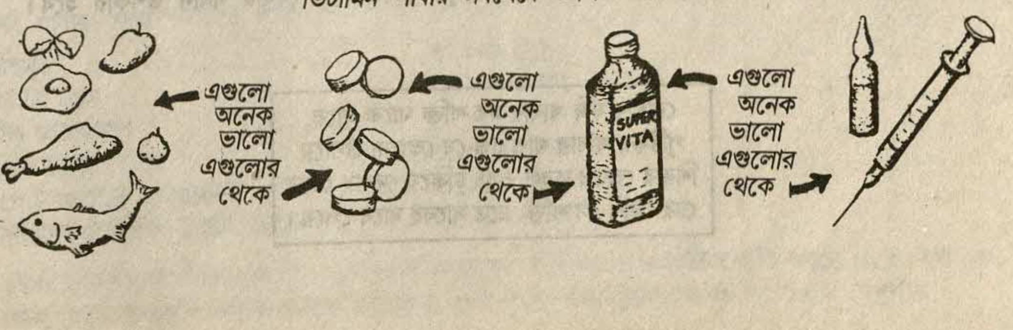
৭· অন্যান্য ভিটামিন (পৃঃ ৪২৪)

সাধারণ নিয়ম হল: **ভিটামিনের ইনজেকশন দেবেন না।** ইনজেকশনের বিপদ বেশি, দাম বেশি, অথচ উপকার সাধারণতঃ বড়ির থেকে বেশি নয়।

দুঃখের বিষয়, অনেকে ভিটামিন দেয়া সিরাপ, টনিক আর এলিকসিরের পেছনে তাঁদের পয়সা নষ্ট করেন। এগুলোর বেশির ভাগের মধ্যে সবথেকে দরকারি ভিটামিনগুলো থাকে না (পৃঃ ১৩৯ দেখুন)। থাকলেও, এগুলো না কিনে, ভাল খাবার বেশি করে কেনাটাই বুদ্ধির কাজ। বরবটি, শাকসবজি, ফল, ডিম, মাংস এইসব শরীর গড়ার আর রক্ষা করার খাবারে প্রচুর ভিটামিন আর অন্য পুষ্টিকর জিনিস থাকে (পৃঃ ১২৯—১৩১ দেখুন)। কোনো রোগা, দুর্বল লোককে ভিটামিন বা খনিজ ওষুধ দিলে যা উপকার হবে, তার থেকে ঢের বেশি কাজ হবে তাকে উপযুক্ত খাবার আরো ঘনঘন খাওয়ালে।

দরকারি সব খাবারগুলো প্রচুর খেতে দিন,
লাগবে নাকো মোটেই তখন বাড়তি ভিটামিন

ভিটামিন পাবার সবথেকে ভাল উপায়:



সব রকম ভিটামিন, কখন সেগুলো দরকার, কোন কোন খাবারে কি কি ভিটামিন আছে—এইসব খবরের জন্যে ১১ পরিচ্ছেদ পড়ুন, বিশেষ করে পৃঃ ১২৯ থেকে পৃঃ ১৩৮।

৮· ক্যালসিয়াম



শিরার মধ্যে ক্যালসিয়ামের ইনজেকশন দিলে সাংঘাতিক বিপদ হতে পারে! ইনজেকশনটি **খুব ধীরে ধীরে** না দিলে রোগী হঠাৎ মারা যেতে পারে। পাছায় ক্যালসিয়ামের ইনজেকশন দিলে কখনো কখনো সাংঘাতিক ফোড়া হতে পারে।

ক্যালসিয়াম ইনজেকশন দিয়ে দেবার আগে
ডাক্তারের পরামর্শ অবশ্যই লাগে।

যে সব খাবারে প্রচুর ক্যালসিয়াম আছে—যেমন সবুজ শাক,ট্যাপিওকা (সাবু), রাগি, দুধ, ছানা—সে সব খাওয়া অনেক ভালো।

৯· শিরার ভেতর দিয়ে খাওয়ানো (শিরার ভেতরে দেবার বা আই ভি তরল ওষুধ)

অনেক এলাকায় খুব রক্তহীন বা দুর্বল রোগীর শিরার ভেতরে দেবার জন্যে এক লিটার তরল ওষুধ কিনতে তাদের শেষ পয়সাটিও খরচ করে ফেলে। তারা বিশ্বাস করে যে, এই ওষুধে তাদের শক্তি বা রক্তের জোর বাড়বে। কিন্তু তারা ভুল করে।

শিরার ভেতরে দেবার তরল ওষুধ একটু নুন বা চিনি মেশানো পরিষ্কার জল ছাড়া আর কিছুই নয়। একমুঠো লজেন্চুস খেলে এর থেকে বেশি শক্তি পাওয়া যায়। রক্তাল্পতায় এটা কোনো কাজ দেয় না বা দুর্বলকে শক্তিও দেয় না।

তাছাড়া, যে লোক শিরার ভেতরে ইনজেকশন দিচ্ছে, তার যদি ঠিকমত ট্রেনিং না থাকে, তবে রোগীর রক্তে সংক্রমণ হবার বিপদ থাকে। এতে রোগী মারা যেতেও পারে।

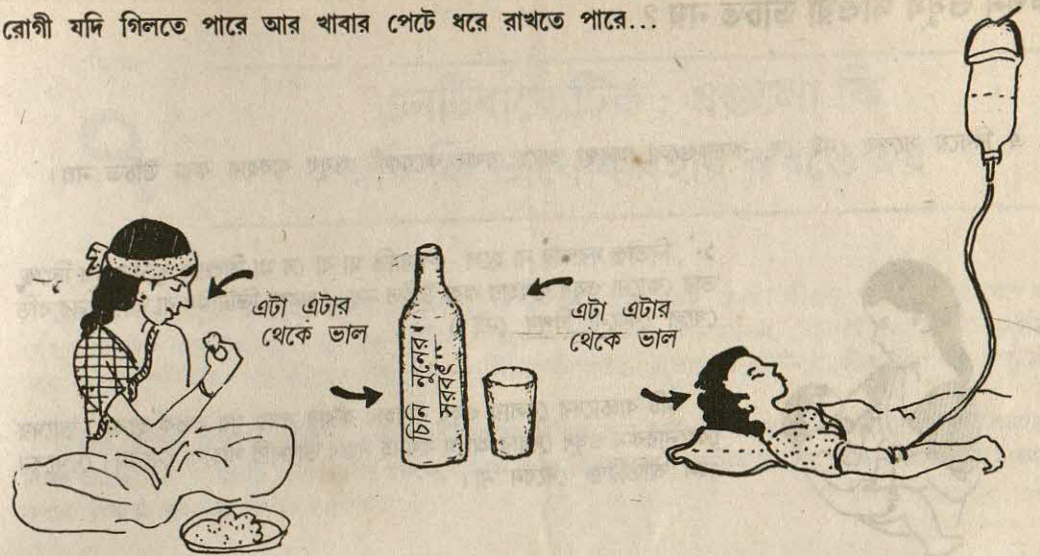
যখন রোগী মুখে একেবারেই কিছু খেতে পারে না, বা যখন তার শরীরে সাংঘাতিক জলের অভাব হয় (পৃঃ ১৮৩ দেখুন), শিরার ভেতরে তরল ওষুধ শুধু তখনই দেয়া উচিত।

এই ইনজেকশন শুধু ট্রেনিং পাওয়া কোনো স্বাস্থ্যকর্মীরই দেয়া উচিত।

রোগী যদি গিলতে পারে তাকে একটু চিনি আর নুন মিশিয়ে এক লিটার জল খেতে দিন (চিনি নুনের সরবৎ পৃঃ ১৮২ দেখুন)। এতে শিরার মধ্যে এক লিটার তরল ওষুধ ইনজেকশন দেবার সমান উপকার হবে।

রোগীর যদি খাবার মত শক্তি থাকে গায়ে,
পুষ্টিকর খাবার খাওয়াও যে কোনো উপায়ে
শিরার ভেতর তরল ওষুধ ঢুকিয়ে দেবার চেয়ে
ঢের বেশি সে শক্তি এতে যাবেই যাবে পেয়ে।

রোগী যদি গিলতে পারে আর খাবার পেটে ধরে রাখতে পারে...



১০· মৃদু ও কড়া জোলাপ (পৃঃ ৪১৭)

শিশু, বেশি দুর্বল লোক, যার শরীরে জলের অভাব হয়েছে বা যার পেটে প্রচণ্ড ব্যথা—এদের কাউকে জোলাপ দেয়া সবসময়ই বিপজ্জনক। দুঃখের বিষয়, লোকে প্রায়ই বিশ্বাস করে যে, জোলাপ স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনে বা শরীর থেকে বাজে জিনিসগুলো পরিষ্কার করে বার করে দেয়। প্রথম পরিচ্ছেদে বোঝানো হয়েছে যে, **রেচক বা কড়া জোলাপ প্রায় সবসময়ই উপকারের থেকে ক্ষতি করে বেশি।**

জোলাপ আর ডুসের ঠিক ব্যবহার জানতে হলে পৃঃ ২১ দেখুন।

ওষুধ খাবার সময় কি পথ্য খেতে হয়

অনেকে বিশ্বাস করে যে, যখন তারা কোনো ওষুধ খায়, তখন কয়েকটি খাবার—যেমন বেগুন, টম্যাটো, দই, লেবু, পেয়ারা, ডিম, মাংস, তেল, ঘি—তাদের খাওয়া উচিত নয়। তারা মনে করে যে, এইসব খাবারের সঙ্গে খেলে সব ওষুধই ক্ষতি করে। এটা সত্যি নয়! শুধু এইসব খাবারের সঙ্গে খাওয়া হয়েছে বলে কোনো ওষুধ ক্ষতি করে না।

কিন্তু কোনো কোনো রোগের বেলায়, কয়েকটি খাবার রোগটাকে আরো কঠিন করে তুলতে পারে, কারণ শরীর এইসব খাবার কাজে লাগাতে পারে না:

বহুমূত্র	পৃঃ ১৪৯ দেখুন
হার্টের রোগ	পৃঃ ৩৭১ দেখুন
উঁচু রক্তের চাপ	পৃঃ ১৪৮ দেখুন
পিত্ত কোষের রোগ	পৃঃ ৩৭৫ দেখুন
পেটে আলসার ও বুকজ্বালা	পৃঃ ১৫০ দেখুন
শিশুদের পেচ্ছাপের রাস্তায় সংক্রমণ.........	পৃঃ ৩৫৭ দেখুন

এইসব রোগে, কোনো ওষুধ খাওয়া হোক বা না হোক্, কয়েকটি খাবার সাংঘাতিক ক্ষতি করতে পারে। যদি কেউ মদ খায়, তবে কয়েকটি ওষুধে খারাপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে (মেট্রোনিডাজোল পৃঃ ৪০৭ দেখুন)।

কখন ওষুধ খাওয়া উচিত নয় ?

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, কতকগুলো অবস্থা আছে যখন কয়েকটি ওষুধ ব্যবহার করা **উচিত নয়**।

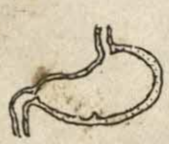


১· নিতান্ত দরকার না হলে পোয়াতি মা বা যে মা শিশুকে বুকের দুধ দিচ্ছে, তার কোনো ওষুধ ব্যবহার করা উচিত নয়। (অবশ্য ভিটামিন বা আয়রনের বড়ি খেলে কোনো বিপদ নেই।)

২· কচি বাচ্চাদের বেলায় ওষুধ ব্যবহার করার সময় খুব সতর্ক হবেন। তাদের কোনোরকম ওষুধ দেবার আগে যখনই সম্ভব ডাক্তারি সাহায্য নেবেন। দেখবেন যেন অতিরিক্ত দেবেন না।



৩· কোনো লোকের যদি পেনিসিলিন, এমপিসিলিন, কোনো সালফোনামাইড বা অন্য ওষুধ খেয়ে কখনো কোনোরকম এলার্জির প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে, তবে তার **সারাজীবনে আর কখনো ওই ওষুধ ব্যবহার করা উচিত নয়**—কারণ সেটা বিপজ্জনক হবে। (কিছু কিছু ওষুধের ইনজেকশন থেকে প্রতিক্রিয়া পৃঃ ৮৩ দেখুন।)



৪· যে সব লোকের আলসার (পেটে ঘা) বা বুকজ্বালা আছে তাদের এসপিরিন দেয়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়।

৫· কয়েকটি রোগে কিছু কিছু বিশেষ ওষুধ ব্যবহার করলে ক্ষতি বা বিপদ হয়। যেমন, যে সব লোকের হেপাটাইটিস (যকৃত প্রদাহ) হয়েছে তাদের এনটিবায়োটিক বা অন্য কড়া ওষুধ দেয়া উচিত নয়, কারণ তাদের লিভার বা যকৃত জখম হয়েছে বলে ওইসব ওষুধ থেকে তাদের শরীর বিষিয়ে যেতে পারে (পৃঃ ২১০ দেখুন)।

৬· যাদের শরীরে জলের অভাব হয়েছে বা যাদের বৃক্কর (কিডনির) রোগ আছে, ওষুধ ব্যবহার করা সম্বন্ধে তাদের বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। যদি বা যতক্ষণ রোগী স্বাভাবিকভাবে পেচ্ছাপ না করে, তাকে শরীর বিষিয়ে দিতে পারে এমন ওষুধ একমাত্রার বেশি দেবেন না। যেমন, যদি কোনো ছোট ছেলে বা মেয়ের বেশি জ্বর হয় আর তার শরীরে জলের অভাব হয় (পৃঃ ৮৮ দেখুন), সে পেচ্ছাপ করতে শুরু না করা পর্যন্ত তাকে একমাত্রার বেশি এসপিরিনি দেবেন না। **যার শরীরে জলের অভাব আছে তাকে কখনো সালফা দেবেন না।**

পরিচ্ছেদ

৭ এনটিবায়োটিক : এগুলো কি আর কি ভাবে ব্যবহার করতে হয়

ঠিকমত ব্যবহার করলে এনটিবায়োটিকগুলো অত্যন্ত উপকারি আর জরুরি ওষুধ। *জীবাণু* থেকে যে সব রোগ হয় সেগুলোর সঙ্গে এরা যুদ্ধ করে। নামকরা এনটিবায়োটিকের মধ্যে আছে পেনিসিলিন, টেট্রাসাইক্লিন, স্ট্রেপটোমাইসিন আর ক্লোরামফেনিকল। এই বইয়ে সালফা ওষুধ বা সালফোনামাইড গুলোকেও এনটিবায়োটিক বলে ধরা হয়েছে।

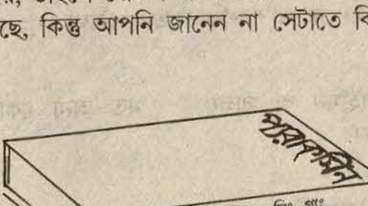
বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে বিভিন্ন এনটিবায়োটিকগুলো বিভিন্নভাবে কাজ করে। সব এনটিবায়োটিকের ব্যবহারেই বিপদ আছে, কিন্তু কয়েকটি অন্যগুলোর থেকে অনেক বেশি বিপজ্জনক। এনটিবায়োটিক বেছে নেবার আর ব্যবহার করার বিষয়ে খুব যত্ন নেয়া দরকার।

অনেক রকম এনটিবায়োটিক আছে, আবার প্রত্যেকটা অনেকগুলো কোম্পানির মার্কা দেয়া নামে বিক্রি হয়। এতে গোলমাল লাগতে পারে। অবশ্য, সব থেকে জরুরি এনটিবায়োটিকগুলো কয়েকটি প্রধান দলে পড়ে:

এনটিবায়োটিকের দল (জাতির নাম)	মার্কা বা কোম্পানির নামের উদাহরণ	আপনার এলাকার মার্কামারা নাম (লিখে নিন)	পৃঃ দেখুন
পেনিসিলিন	ভেরিপেন	____________	৩৯৭
টেট্রাসাইক্লিন	টেরামাইসিন	____________	৪০০
সালফোনামাইড	অরিসুল	____________	৪০২
ক্লোরামফেনিকল	ক্লোরোমাইসেটিন	____________	৪০১
এরিথ্রোমাইসিন	এরিথ্রোসিন	____________	৪০০
এমপিসিলিন*	এমপিলিন	____________	৩৯৯
স্ট্রেপটোমাইসিন	এমবিসট্রিন-এস	____________	৪০৩

***দ্রষ্টব্য**: এমপিসিলিন একধরনের পেনিসিলিন, যা সাধারণ পেনিসিলিনের থেকে বেশি রকমের জীবাণু ধ্বংস করে।

যদি আপনার কাছে একটা মার্কামারা নাম দেয়া এনটিবায়োটিক থাকে আর যদি আপনি বুঝতে না পারেন সেটা কোন দলের, তাহলে বোতল বা বাকসের ওপরের ছোট লেখাগুলি পড়ুন। যেমন, আপনার কাছে কিছু *প্যারাকসিন "এস"* রয়েছে, কিন্তু আপনি জানেন না সেটাতে কি আছে—ছোট লেখাগুলি পড়ুন। ওতে রয়েছে 'ক্লোরামফেনিকল'।



সবুজ পৃষ্ঠাগুলোতে (পৃঃ ৪০১) ক্লোরামফেনিকল দেখে নিন। দেখবেন যে, টাইফয়েডের মত মাত্র কয়েকটা খুব সাংঘাতিক অসুখেই শুধু এটা ব্যবহার করা উচিত আর কচি বাচ্চাকে এটা দেয়া বিশেষ বিপজ্জনক।

একটা এনটিবায়োটিক কোন দলের, কোন কোন রোগে কাজ করে, সেই রোগের পক্ষে ঠিক মাত্রা কতটা, আর কি কি সাবধানতা নিয়ে তবেই সেটা ব্যবহার করা যায়—এগুলো সব না জেনে কখনো সেটা ব্যবহার করবেন না।

এই বইয়ে যে সব এনটিবায়োটিক ব্যবহার করতে বলা হয়েছে সেগুলির ব্যবহার, মাত্রা, ঝুঁকি আর সাবধানতার বিষয়ে তথ্য **সবুজ পৃষ্ঠাগুলিতে** পাওয়া যাবে। ওষুধের নামের জন্যে ওই পৃষ্ঠাগুলির শুরুতে যে বর্ণানুক্রমিক তালিকা দেয়া হয়েছে সেখানে দেখুন।

সব রকম এনটিবায়োটিকের ব্যবহার বিধি

১· কি ভাবে ব্যবহার করতে হয় আর কোন কোন সংক্রমণে কাজে লাগে তা সঠিক জানা না থাকলে কোনো এনটিবায়োটিক ব্যবহার করবেন না।

২· যে রোগ সারাতে চাইছেন তার জন্যে যে এনটিবায়োটিক ব্যবহার করতে বলা হয়েছে শুধু তাই ব্যবহার করবেন। (রোগটার বিষয়ে এই বইয়ে দেখে নিন।)

৩· এনটিবায়োটিকটির ব্যবহারের ঝুঁকিগুলি জেনে নিন আর যে সমস্ত সাবধানতার কথা বলা হয়েছে সেগুলি নিন **(সবুজ পৃষ্ঠাগুলি দেখুন)**।

৪· যেমন বলা হয়েছে শুধু সেই মাত্রায় এনটিবায়োটিকটি দেবেন—বেশিও নয়, কমও নয়। রোগীর অসুখ, বয়স বা ওজনের ওপর মাত্রাটা নির্ভর করবে।

৫· যদি মুখে খেলে সমান কাজ হয় তবে এনটিবায়োটিকের ইনজেকশন কখনো দেবেন না। নিতান্ত দরকার হলে তবেই ইনজেকশন দেবেন।

৬· রোগ সম্পূর্ণ সারা পর্যন্ত অথবা জ্বর বা সংক্রমণের অন্য লক্ষণ চলে যাওয়ার পর অন্ততঃ আরো দু-দিন এনটিবায়োটিক ব্যবহার করুন। (কোনো কোনো রোগে যেমন যক্ষ্মা বা কুষ্ঠতে রোগী সুস্থ বোধ করার পরেও অনেক মাস বা বছর চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হয়। প্রত্যেক রোগের জন্যে যা নির্দেশ দেয়া আছে সেই মত করুন।)

৭· যদি এনটিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে চামড়ায় কোনো ফুসকুড়ি বা চুলকুনি বা শ্বাসকষ্ট বা অন্য কোনো মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হয় তবে রোগীর ওই ওষুধ ব্যবহার বন্ধ করে দিতে হবে এবং তার **আর কখনো সেটা ব্যবহার করা চলবে না** (পৃঃ ৮২ দেখুন)।

৮· **দরকার খুব বেশি হলে তবেই শুধু এনটিবায়োটিক ব্যবহার করবেন**। অতিরিক্ত ব্যবহার করলে এনটিবায়োটিক আর তেমন ভাল কাজ করে না।

কয়েকটি এনটিবায়োটিকের ব্যবহার বিধি

১· পেনিসিলিন বা এমপিসিলিন ইনজেকশন দেবার আগে কোনো এলার্জির প্রতিক্রিয়া হলে তা দমন করার জন্যে (পৃঃ ৮১) সবসময় **এড্রেনালাইনের** কয়েকটি এমপুল হাতের কাছে রাখবেন। কোনো স্পর্শকাতরতার পরীক্ষা (পৃঃ ৮১) করবার **আগে ও পরে** এড্রেনালাইন হাতের কাছে রাখবেন।

২· যাদের পেনিসিলিনে এলার্জি আছে তাদের জন্যে এরিথ্রোমাইসিন বা সালফা মত অন্য কোনো এনটিবায়োটিক ব্যবহার করবেন (পৃঃ ৪০০ এবং পৃঃ ৪০২ দেখুন)।

৩· যে রোগ পেনিসিলিন বা অন্য কোনো *সঙ্কীর্ণ পরিধির* এনটিবায়োটিকে সারতে পারে, সেটার বেলায় টেট্রাসাইক্লিন বা অন্য *প্রশস্ত পরিধির* এনটিবায়োটিক ব্যবহার করবেন না (পৃঃ ৭০ দেখুন)।

৪· সাধারণতঃ ক্লোরামফেনিকল শুধু টাইফয়েডের জ্বরে ব্যবহার করবেন। এটা একটা বিপজ্জনক ওষুধ। **কখনো** অল্প অসুখে ব্যবহার করবেন **না**, আর, **কখনো** কচি বাচ্চাদের দেবেন **না**।

৫· কখনো টেট্রাসাইক্লিন বা ক্লোরামফেনিকলের ইনজেকশন দেবেন না। মুখে খেলে এগুলো বেশি নিরাপদ, কম যন্ত্রণাদায়ক হয়, আর সমান বা আরো ভাল কাজ করে।

৬· পোয়াতি মায়ের ৪ মাস পেরিয়ে গেলে তাকে অথবা ৬ বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েদের টেট্রাসাইক্লিন দেবেন না (পৃঃ ৪০১ দেখুন)।

৭· স্ট্রেপটোমাইসিন বা যে ওষুধে সেটা আছে, তা শুধু যক্ষ্মার জন্যেই ব্যবহার করবেন—তাও সবসময় অন্য একটা যক্ষ্মার ওষুধের সঙ্গে (পৃঃ ৪০৩ দেখুন)।

৮· চামড়ার ওপর বা কাটা জায়গায় পেনিসিলিনের মলম বা পাউডার লাগাবেন না। এতে রোগীর পেনিসিলিনে এলার্জি হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া এ থেকে রোগীর পেনিসিলিনে প্রতিরোধ জন্মে যেতে পারে, তখন পরে কোনো সাধারণ অসুখ হলেও তার আরো কড়া আর দামি ওষুধ লাগবে (পৃঃ ৩৯৭)।

যদি মনে হয় কোনো এনটিবায়োটিকে কাজ হচ্ছে না তখন কি করা যায়

বেশির ভাগ সাধারণ সংক্রমণে এনটিবায়োটিক ব্যবহার করলে দু-একদিনের মধ্যেই অবস্থার উন্নতি হয়। **যে এনটিবায়োটিক ব্যবহার করছেন তাতে কোনো উন্নতি না হলে হয়তো:**

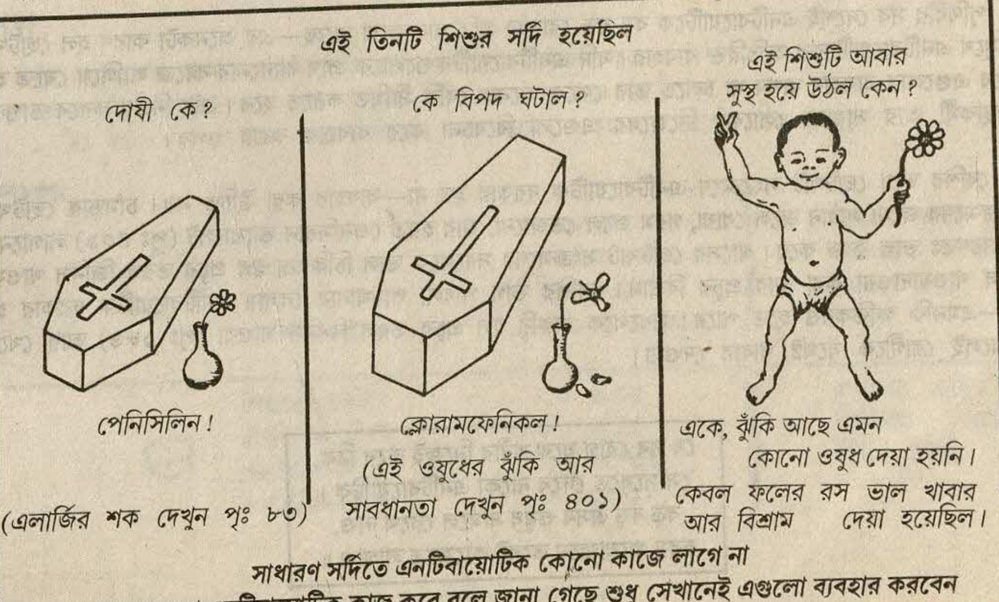
১· রোগটা আপনি যা ভেবেছেন তা নয়। আপনি হয়তো ভুল ওষুধ দিচ্ছেন। রোগটা কি তা আরো ঠিক করে বার করার আর ঠিক ওষুধ ব্যবহার করার চেষ্টা করুন।

২· এনটিবায়োটিকের মাত্রা ঠিক হয়নি। দেখে নিন।

৩· যে এনটিবায়োটিক ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে জীবাণুগুলোর *প্রতিরোধ* জন্মে গেছে (ওতে সেগুলোর আর ক্ষতি হয় না)। ওই রোগের জন্যে অন্য যেগুলোর কথা বলা হয়েছে সেগুলোর থেকে একটা এনটিবায়োটিক ব্যবহার করে দেখুন।

৪· রোগটা সারাবার ব্যাপারে আপনার যথেষ্ট জ্ঞান নেই। ডাক্তারি সাহায্য নিন—বিশেষতঃ অবস্থা যদি খারাপ হয় বা আরো খারাপের দিকে যায়।

এই তিনটি শিশুর সর্দি হয়েছিল



পেনিসিলিন! *(এলার্জির শক দেখুন পৃঃ ৮৩)*

ক্লোরামফেনিকল! (এই ওষুধের ঝুঁকি আর সাবধানতা দেখুন পৃঃ ৪০১)

একে, ঝুঁকি আছে এমন কোনো ওষুধ দেয়া হয়নি। কেবল ফলের রস ভাল খাবার আর বিশ্রাম দেয়া হয়েছিল।

সাধারণ সর্দিতে এনটিবায়োটিক কোনো কাজে লাগে না

যে সব সংক্রমণে এনটিবায়োটিক কাজ করে বলে জানা গেছে শুধু সেখানেই এগুলো ব্যবহার করবেন

এনটিবায়োটিকের সীমিত ব্যবহার কেন জরুরি

সব ওষুধই সীমা রেখে ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু এটা **এনটিবায়োটিকের** বেলায় বিশেষভাবে সত্যি। কারণ:

১· **বিষক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়া**—এনটিবায়োটিক কেবল জীবাণু ধ্বংস করে না, সঙ্গে সঙ্গে শরীরে বিষক্রিয়া বা এলার্জির প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে ক্ষতিও করতে পারে। দরকার না থাকলেও এনটিবায়োটিক ব্যবহার করার ফলে প্রতি বছর অনেক লোক মারা যায়।

২· **শরীরের প্রকৃতিদত্ত ভারসাম্য নষ্ট করা**—শরীরের সব জীবাণুই ক্ষতিকর নয়। শরীরের স্বাভাবিক কাজকর্মের জন্যে কয়েকটি দরকারি। এনটিবায়োটিক প্রায়ই ক্ষতিকর জীবাণুগুলোর সঙ্গে ভালগুলোও ধ্বংস করে ফেলে। শিশুদের এনটিবায়োটিক দিলে তাদের মুখে বা চামড়ায় অনেক সময় ছত্রাকের সংক্রমণ হয় (থ্রাশ পৃঃ ২৭৮, মনিলিয়াসিস পৃঃ ২৮৬)। এর কারণ হল, যে সব জীবাণু ছত্রাক দমন করতে সাহায্য করে, সেগুলোকে এনটিবায়োটিক ধ্বংস করে ফেলে।

একই রকম কারণে এমপিসিলিন বা অন্য প্রশস্ত পরিধির এনটিবায়োটিক কয়েকদিন ধরে খেলে রোগীর পাৎলা পায়খানা হতে পারে। হজমের জন্যে দরকার এমন কয়েক ধরনের জীবাণুকে এনটিবায়োটিক ধ্বংস করে ফেলতে পারে—এইভাবে পেটের ভেতরে যে প্রকৃতিদত্ত জীবাণুর ভারসাম্য আছে তা নষ্ট হয়ে যায়।

৩· **চিকিৎসায় প্রতিরোধ**—মোট কথা—এনটিবায়োটিকের ব্যবহার সীমিত করার প্রধান কারণ হল—এনটিবায়োটিক **অতিরিক্ত ব্যবহার করা হলে তাদের কাজ করার ক্ষমতা কমে যায়।**

একই সংক্রমণের জন্যে এনটিবায়োটিক বারবার ব্যবহার করলে জীবাণুর শক্তি বেড়ে যায়—ওতে আর সেগুলো মরে না। এনটিবায়োটিকটায় সেগুলোর *প্রতিরোধ* জন্মে যায়। এইজন্যে টাইফয়েডের মত কিছু বিপজ্জনক রোগের চিকিৎসা কয়েক বছর আগে যা ছিল তার থেকে এখন অনেক বেশি কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

কোথাও কোথাও টাইফয়েডের চিকিৎসার জন্যে যা সবথেকে ভাল ওষুধ, সেই ক্লোরামফেনিকলে এই রোগের প্রতিরোধ জন্মে গেছে। ছোটখাট অনেক সংক্রমণের জন্যে—যেখানে অন্য এনটিবায়োটিক অনেক নিরাপদে ভাল কাজ করত বা যেখানে কোনো এনটিবায়োটিক দরকারই ছিল না—সেখানে ক্লোরামফেনিকল অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়েছে।

পৃথিবীর সব দেশেই এনটিবায়োটিকে বড় বড় রোগের প্রতিরোধ জন্মে যাচ্ছে—এর অনেকটা কারণ হল ছোটখাট অসুখে এনটিবায়োটিকের অতিরিক্ত ব্যবহার। যদি **এনটিবায়োটিকগুলোকে প্রাণ বাঁচানোর কাজে লাগিয়ে যেতে হয়, তবে এগুলোর ব্যবহার এখন যা চলছে তার থেকে অনেক বেশি সীমিত করতে হবে।** এটা নির্ভর করবে ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী আর সাধারণ লোকের নিজেদের এগুলো বিবেচনা করে ব্যবহার করার ওপর।

বেশির ভাগ ছোটখাট সংক্রমণে এনটিবায়োটিক দরকার হয় না—ব্যবহার করা উচিত নয়। চামড়ার ছোটখাট সংক্রমণের জন্যে সাবান জলে ধোয়া, গরম জলে ভেজানো, আর হয়ত জেনসিয়ান ভায়োলেট (পৃঃ ৪০৯) লাগানোই সাধারণতঃ ভাল কাজ করে। শ্বাসের ছোটখাট সংক্রমণের সবথেকে ভাল চিকিৎসা হল প্রচুর তরল জিনিস খাওয়া, ভাল খাওয়াদাওয়া করা আর প্রচুর বিশ্রাম। বেশির ভাগ পাৎলা পায়খানার বেলায় এনটিবায়োটিক দরকার হয় না—এমনকি ক্ষতিকরও হতে পারে। সবথেকে জরুরি হল প্রচুর তরল জিনিস খাওয়া (পৃঃ ১৮৬) আর খেতে পারলেই রোগীকে যথেষ্ট খাবার দেওয়া।

> যে সব রোগ যুঝে শরীর নিজেই করে ঠিক,
> সে সবেতে দেবে নাকো এনটিবায়োটিক।
> বড় বড় এসব ওষুধ সামলে রেখে দাও,
> চরম প্রয়োজনে তবেই কাজেতে লাগাও ॥

পরিচ্ছেদ

৮ ওষুধ কেমন ভাবে মাপতে আর দিতে হয়



চিহ্ন :

= মানে : সমান বা
এটা আর ওটা একই

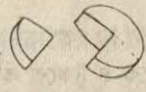
+ মানে এবং কিংবা যোগফল

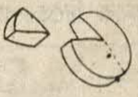
১	+	১	=	২
এক	যুক্ত	এক	সমান	দুই

'ভগ্নাংশ কখনো কখনো এইভাবে লেখা হয় :

½ বড়ি = একটা বড়ির অর্ধেক = 

১½ বড়ি = একটা আর অর্ধেকটা বড়ি = 

¼ বড়ি = একটা বড়ির সিকি বা চার ভাগের একভাগ 

⅛ বড়ি = একটা বড়ির আটভাগের একভাগ
(বড়িটাকে সমান ৮ টা ভাগ করে তার ১ টুকরো নেয়া) = 

মাপ

ওষুধ সাধারণতঃ গ্রাম (গ্রাঃ) বা মিলিগ্রাম (মিঃ গ্রাঃ) ওজন করা হয়।

১০০০ মিঃ গ্রাঃ = ১ গ্রাঃ (এক হাজার মিলিগ্রামে এক গ্রাম হয়)

১ মিঃ গ্রাঃ = ০·০০১ গ্রাঃ (এক মিলিগ্রাম এক গ্রামের একহাজার ভাগের এক ভাগ)

উদাহরণঃ



একটা বয়স্কদের এসপিরিন বড়িতে ৩০০ মিলিগ্রাম এসপিরিন থাকে	·৩ গ্রাঃ ০·৩ গ্রাঃ ০·৩০০ গ্রাঃ ৩০০ মিঃ গ্রাঃ	এগুলো সবই ৩০০ মিলিগ্রাম বলবার বিভিন্ন উপায়



শিশুদের একটা এসপিরিন বড়িতে ৭৫ মিলিগ্রাম এসপিরিন থাকে	·০৭৫ গ্রাঃ ০·০৭৫ গ্রাঃ ৭৫·০ মিঃ গ্রাঃ ৭৫ মিঃ গ্রাঃ	এগুলো সবই ৭৫ মিলিগ্রাম বলবার বিভিন্ন উপায়

দ্রষ্টব্য—এক বছরের কম বয়সের শিশুকে এসপিরিন দেবেন না।

একটা ওষুধে কত গ্রাম বা মিলিগ্রাম আছে সেটা জানা অনেক সময়েই জরুরি।

যেমন যদি আপনি একটি শিশুকে শিশুদের এসপিরিনের বদলে একটুকরো বড়দের এসপিরিন দিতে চান, অথচ কত বড় টুকরো দিতে হবে না জানেন......

ওষুধের লেবেলের ওপরে ছোট অক্ষরের লেখাটা পড়ে নিন। ওতে আছে: এসপিরিন: এসেটিলস্যালিসিলিক এসিড ·৩ গ্রাঃ (এসেটিলস্যালিসিলিক এসিড = এসপিরিন)



০·৩ গ্রাঃ = ৩০০ মিঃ গ্রাঃ আর ·০৭৫ গ্রাঃ = ৭৫ মিঃ গ্রাঃ। কাজেই দেখতেই পাচ্ছেন যে, একটা বয়স্কদের এসপিরিনের ওজন একটা শিশুদের এসপিরিনের ওজনের ৪ গুন।

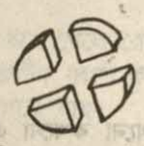
৭৫ মিঃ গ্রাঃ
৭৫ মিঃ গ্রাঃ
৭৫ মিঃ গ্রাঃ
৭৫ মিঃ গ্রাঃ



৪ টি শিশুদের এসপিরিন যোগ করলে

৩০০ মিঃ গ্রাঃ ১ টা সাধারণ এসপিরিন হয়

বয়স্কদের এসপিরিন ৪ টি সমান টুকরোয় কেটে নিলে

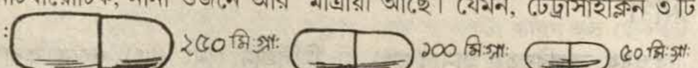


প্রত্যেক সিকিভাগ = একটি শিশুদের এসপিরিন



কাজেই, যদি একটা বয়স্কদের এসপিরিনকে ৪ টুকরো করে কেটে নেন, তাহলে শিশুকে, শিশুদের এসপিরিনের জায়গায়, ওই ১ টুকরো দিতে পারেন। দুটোই সমান, আর বয়স্কদের এসপিরিনের বড়ির দাম কম।

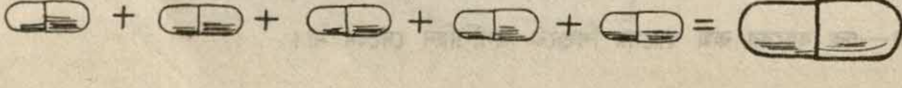
সাবধান: অনেক ওষুধ, বিশেষ করে এনটিবায়োটিক, নানা ওজনে আর মাত্রায় আছে। যেমন, টেট্রাসাইক্লিন ৩ টি মাত্রার ক্যাপসুলে পাওয়া যেতে পারে:



দেখবেন, যেমন বলা হয়েছে শুধু ঠিক সেই পরিমাণে ওষুধ দেবেন। ওষুধে কত গ্রাম ব মিলিগ্রাম আছে সেটা দেখে নেয়া বিশেষ জরুরি।

উদাহরণ: যদি প্রেসক্রিপশনে বলা হয়: দিনে ৪ বার ১ টা করে ক্যাপসুল বা ২৫০ মিঃ গ্রাঃ টেট্রাসাইক্লিন (১০০০ মিঃ গ্রাঃ), আর যদি আপনার কাছে শুধু ৫০ মিঃ গ্রাঃ-এর ক্যাপসুল থাকে, তাহলে দিনে ৪ বার ৫ টা করে ৫০ মিঃ গ্রাঃ-এর ক্যাপসুল আপনাকে খেতে হবে (দিনে ২০ টা = ১০০০ মিঃ গ্রাঃ)

৫০ মিঃ গ্রাঃ　৫০ মিঃ গ্রাঃ　৫০ মিঃ গ্রাঃ　৫০ মিঃ গ্রাঃ　৫০ মিঃ গ্রাঃ　২৫০ মিঃ গ্রাঃ



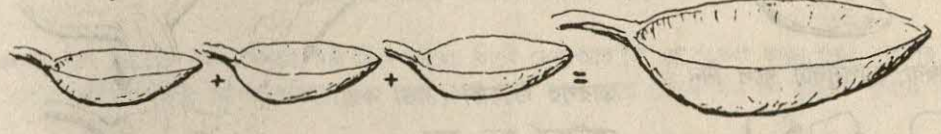
তরল ওষুধ

সিরাপ, সাসপেনশন এবং অন্য তরল ওষুধ মিলিলিটার মাপা হয়:

মিঃ লিঃ = মিলিলিটার　　　　১ লিটার = ১০০০ মিঃ লি

প্রায়ই তরল ওষুধের বোতলে বড় চামচ বা চা চামচের ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া থাকে:

১ চা চামচ = ৫ মিঃ লিঃ　　　　১ বড় চামচ = ১৫ মিঃ লিঃ



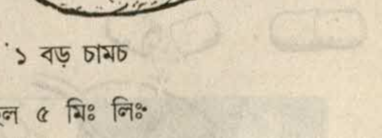
৩ চা চামচ = ১ বড় চামচ

যখন ওষুধের নির্দেশে বলা হয়: ১ চা চামচ খান, তার মানে হল ৫ মিঃ লিঃ

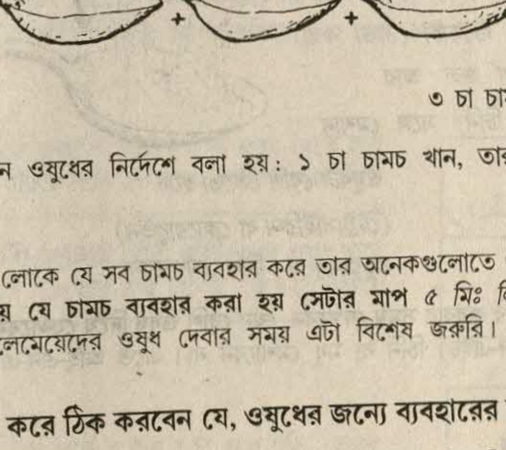
লোকে যে সব চামচ ব্যবহার করে তার অনেকগুলোতে ৩ মিঃ লিঃ থেকে ৮ মিঃ লিঃ পর্যন্ত ধরে। **ওষুধ দেবার সময় যে চামচ ব্যবহার করা হয় সেটার মাপ** *৫ মিঃ লিঃ* **হওয়া দরকার—বেশিও নয়, কমও নয়।** ছোট ছেলেমেয়েদের ওষুধ দেবার সময় এটা বিশেষ জরুরি।

কি করে ঠিক করবেন যে, ওষুধের জন্যে ব্যবহারের চা চামচটার মাপ ৫ মিঃলিঃ

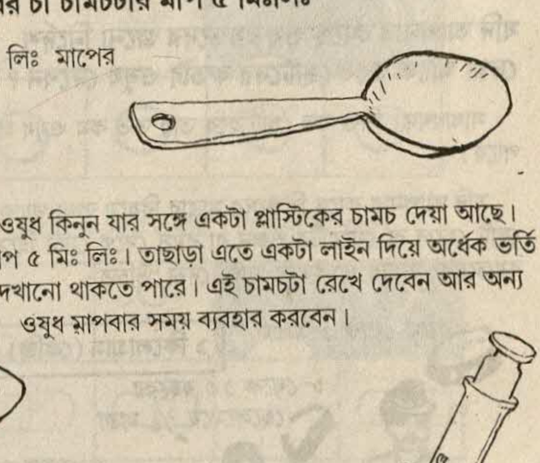
১. একটা ৫ মিঃ লিঃ মাপের চা চামচ কিনুন



অথবা



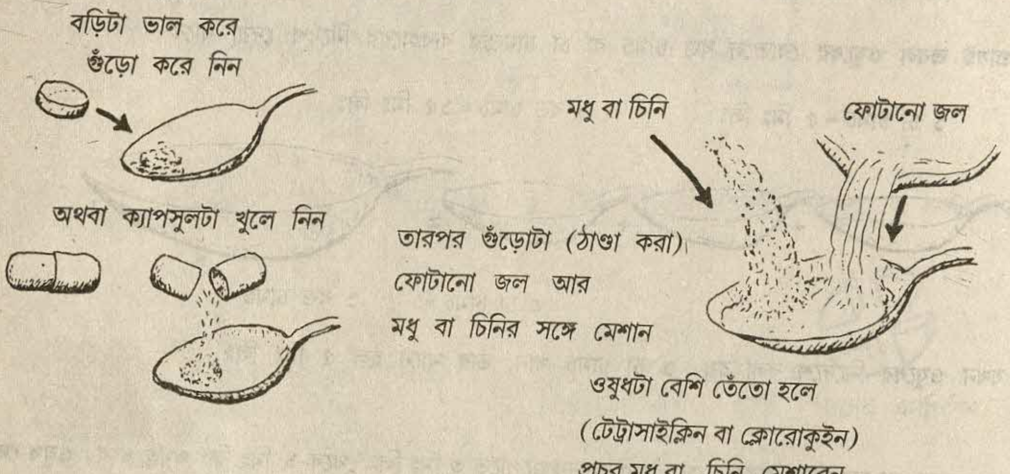
২. এমন একটা ওষুধ কিনুন যার সঙ্গে একটা প্লাস্টিকের চামচ দেয়া আছে। ভর্তি হলে এটার মাপ ৫ মিঃ লিঃ। তাছাড়া এতে একটা লাইন দিয়ে অর্ধেক ভর্তি (২.৫ মিঃ লিঃ) দেখানো থাকতে পারে। এই চামচটা রেখে দেবেন আর অন্য ওষুধ মাপবার সময় ব্যবহার করবেন।



৩. বাড়ির যে কোনো ছোট চামচে একটা সিরিঞ্জ বা অন্য কোনো মাপার জিনিস দিয়ে ৫ মিঃ লিঃ জল ভর্তি করুন, **আর জলের লাইনে চামচের ওপর একটা দাগ কেটে দিন।**

ছোট ছেলেমেয়েদের কি ভাবে ওষুধ দিতে হয়

যে সব ওষুধ বড়ি বা ক্যাপসুলে আসে তাদের মধ্যে অনেকগুলোই ছোটদের জন্যে সিরাপে বা সাসপেনশনে (বিশেষ তরল ওষুধ) পাওয়া যায়। যদি কতটা ওষুধ পাচ্ছেন সেটা তুলনা করেন, দেখবেন যে, সিরাপের দাম সাধারণতঃ বড়ি বা ক্যাপসুলের থেকে বেশি। নিচে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে সিরাপ তৈরি করে নিয়ে আপনি পয়সা বাঁচাতে পারেন:

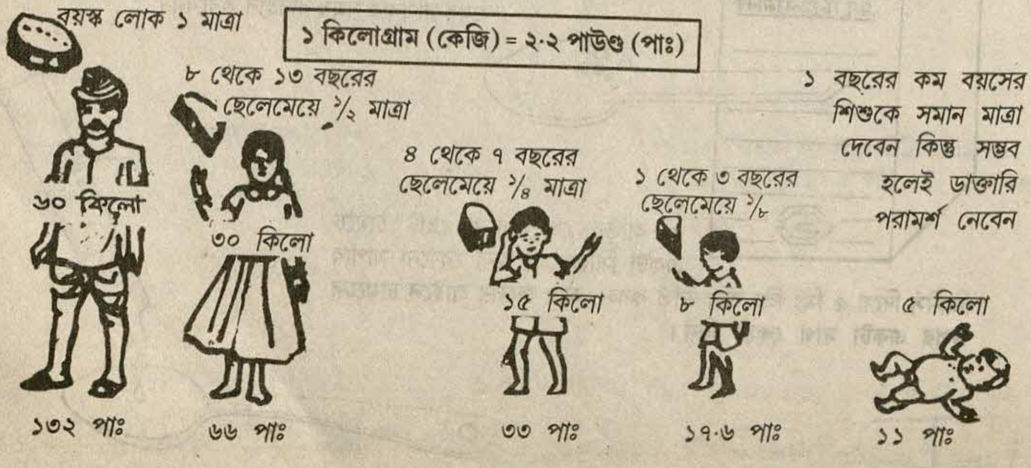


বড়ি বা ক্যাপসুল থেকে ছোটদের জন্যে সিরাপ তৈরি করবার সময় **দেখবেন, যেন বেশি ওষুধ দিয়ে ফেলবেন না।** যক্ষ্মার চিকিৎসার জন্যে আইসোনিয়াজিডে (আই-এন-এইচ) চিনি বা মধু মেশাবেন না। এতে আই-এন-এইচের উপকার কমে যায়।

যদি আপনার কাছে শুধু বয়স্কদের জন্যে নির্দেশ দেয়া থাকে তবে ছোটদের কতটা ওষুধ দেবেন?

সাধারণতঃ শিশু যত ছোট হবে তার তত কম ওষুধ লাগবে। দরকারের থেকে বেশি ওষুধ দেয়া বিপজ্জনক হতে পারে।

যদি আপনার কাছে শিশুদের মাত্রার বিষয়ে তথ্য থাকে, তবে তা সাবধানে মেনে চলবেন। যদি মাত্রাটা না জানেন, ছোট ছেলে বা মেয়েটির ওজন বা বয়স দেখে সেটা হিসেব করে নিন। নিচে যা দেয়া হয়েছে, ছোটদের সাধারণতঃ বয়স্কদের মাত্রার সেইমত ভাগ দেয়া উচিত:



ওষুধ কি ভাবে খেতে হয়

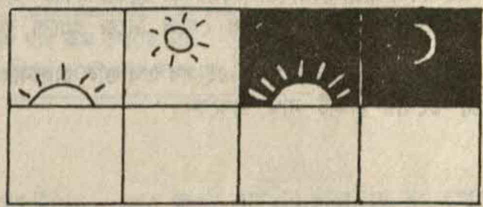


যেমন বলা হয়েছে মোটামুটি সেই রকম সময়ে ওষুধ খাওয়াটা জরুরি। কোনো ওষুধ দিনে শুধু একবার খেতে হয়, কিন্তু কোনোকোনোটা আরো বেশিবার খাওয়া দরকার। আপনার কাছে ঘড়ি না থাকলেও ক্ষতি নেই। যদি নির্দেশ থাকে 'প্রতি ৮ ঘন্টায় একটি করে বড়ি', দিনে ৩ টে খাবেন: সকালে একটা, দুপুরে একটা আর রাত্রে একটা। যদি থাকে 'প্রতি ৬ ঘন্টায় ১ টি বড়ি', প্রতিদিন ৪ টে বড়ি খাবেন, সকালে ১ টা, দুপুরে ১ টা, বিকেলে ১ টা, রাত্রে ১ টা। যদি নির্দেশ থাকে 'প্রতি ৪ ঘন্টায় ১ টি করে বড়ি, দিনে ৬ টা খাবেন, বড়িগুলো খাবার মাঝে মোটামুটি একই সময়ের তফাৎ রাখবেন।

যখনই অন্য কাউকে ওষুধ দেবেন, যদি নির্দেশগুলো লিখে দেন আর কি ভাবে এবং কখন ওষুধ ব্যবহার করতে হবে সেটা রোগীকে দিয়ে আবার বলিয়ে নেন তবে ভাল হয়। ভাল করে জেনে নিন সে বুঝতে পারছে কি না।

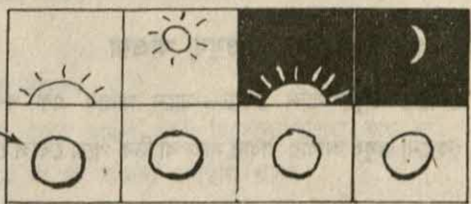
যারা পড়তে জানে না তাদের কখন ওষুধ খেতে হবে তা মনে করিয়ে দিতে এই রকম একটা কাগজ দিতে পারেন ——————————— →

নিচের খালি জায়গায় রোগী কতটা করে ওষুধ খাবে সেটা এঁকে দিন আর তার মানেটা যত্ন করে বুঝিয়ে দিন ——————————— →

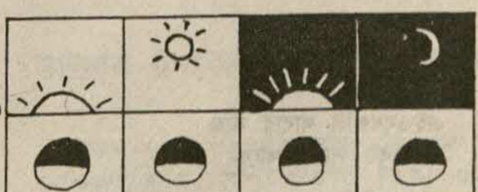


উদাহরণ:

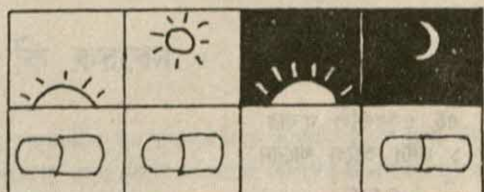
এর মানে হল দিনে ৪ বার ১ টা করে বড়ি, ভোরে ১ টা, দুপুরে ১ টা, সন্ধ্যেয় ১ টা আর মাঝরাতে ১ টা



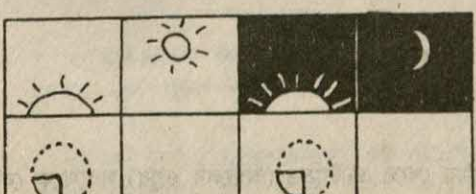
এর মানে দিনে ৪ বার ½ টা করে বড়ি



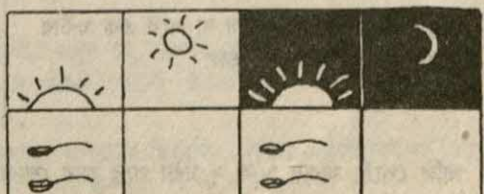
এর মানে দিনে ৩ বার ১ টা করে ক্যাপসুল



এর মানে দিনে ২ বার ¼ করে বড়ি



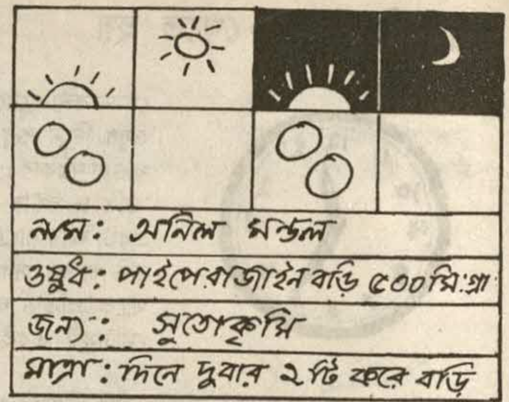
এর মানে দিনে ২ বার ২ চা চামচ করে



যখনই কাউকে ওষুধ দেবেন...

লোকটি পড়তে না জানলেও তাকে ওষুধের সঙ্গে একটি কাগজে নিচের সব তথ্যগুলি লিখে দেবেন:

- ■ রোগীর নাম ———————— →
- ■ ওষুধের নাম ———————— →
- ■ কি জন্যে দেয়া হয়েছে ———————— →
- ■ মাত্রা ———————— →



এই রকম মাত্রা দেয়া খালি কয়েকটি ছকের একটি পৃষ্ঠা এই বইয়ের শেষে দেয়া হল। এগুলো কেটে নিয়ে দরকার মত ব্যবহার করবেন। ফুরিয়ে গেলে নিজে আরো করে নিতে পারবেন।

কাউকে ওষুধ দেবার সময় এই সব তথ্যগুলি আপনার নিজের কাছেও রেখে দিলে ভাল হয়। সম্ভব হলে রোগীর পুরো তথ্যের একটি নথি রাখবেন।

ভর্তি বা খালি পেটে ওষুধ খাওয়া

কোনো ওষুধ খালি পেটে—মানে খাবার এক ঘণ্টা আগে—খেলে সবথেকে ভাল কাজ করে।

কোনো ওষুধ আবার খাবার সঙ্গে বা ঠিক পরে খেলে সেগুলো থেকে গোলমাল বা বুকজ্বালা হবার ভয় কম থাকে।

এই ওষুধগুলি খাবার ১ ঘণ্টা আগে খাবেন

- ■ পেনিসিলিন
- ■ এমপিসিলিন
- ■ টেট্রাসাইক্লিন

টেট্রাসাইক্লিন খাবার আগে বা পরে এক ঘণ্টার মধ্যে দুধ না খাওয়াই ভাল।

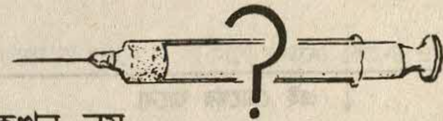
এইওষুধগুলি খাবার সঙ্গে বা একুট পরেই খাবেন

- ■ এসপিরিন বা যে ওষুধে এসপিরিন থাকে
- ■ আয়রন (ফেরাস সালফেট)
- ■ ভিটামিন
- ■ এরিথ্রোমাইসিন
- ■ পি-এ-এস

খালি পেটে, খাবার ১ বা দু ঘণ্টা পরে আর শোবার সময় খেলে এনটাসিড (অম্বলের ওষুধ) সবথেকে বেশি উপকার করে।

পরিচ্ছেদ

৯ ইনজেকশনের জন্যে নির্দেশ ও সাবধানতা



ইনজেকশন কখন দেয়া উচিত আর কখন নয়

ইনজেকশন প্রায়ই দরকার হয় না। যে সব রোগে ডাক্তারি চিকিৎসা লাগে সেগুলোর বেশির ভাগেরই চিকিৎসা ওষুধ খেলে সমান বা আরো ভাল হয়। সাধারণ নিয়ম হল:

চিকিৎসায় বিপদ যদি কম করতে চাও,
ইনজেকশন না দিয়ে মুখে ওষুধ দাও।

নিতান্ত দরকার হলে তবেই ইনজেকশন ব্যবহার করা উচিত। নেহাৎ জরুরি অবস্থায় ছাড়া, যে সব স্বাস্থ্যকর্মী বা অন্য যাঁরা ইনজেকশন দিতে শিখেছেন, শুধু তাঁদেরই ওগুলো দেয়া উচিত।

কেবল এই সময়গুলোতে ওষুধ ইনজেকশনে দেয়া উচিত:

১· যখন, যে ওষুধ ব্যবহার করতে বলা হয়েছে সেটা খাবার ওষুধ হিসেবে পাওয়া যায় না।

২· যখন রোগী ঘনঘন বমি করে, গিলতে পারে না বা অজ্ঞান অবস্থায় থাকে।

৩· কয়েকটি অস্বাভাবিক জরুরি অবস্থায় আর বিশেষ ক্ষেত্রে (পরের পৃষ্ঠা দেখুন)।

ডাক্তার ইনজেকশন দিতে বললে কি করবেন

দরকার না থাকলেও অনেক সময় ডাক্তার এবং অন্য স্বাস্থ্যকর্মীরা ইনজেকশন নিতে বলেন। যতই হোক, তাঁরা তো ইনজেকশনের জন্যে বেশি টাকা চাইতে পারেন। গ্রাম এলাকায় এসব দেবার সমস্যা বা বিপদের কথা তাঁরা ভুলে যান।

১· যদি কোনো স্বাস্থ্যকর্মী বা অন্য চিকিৎসক আপনাকে একটা ইনজেকশন দিতে চান, দেখবেন ওষুধটা যেন *ঠিক ঠিক* হয় আর তিনি যেন সব দরকারি সাবধানতাগুলো নেন।

২· যদি ডাক্তার ইনজেকশন দিতে বলেন, তাঁকে বুঝিয়ে বলুন যে, আপনি যেখানে থাকেন সেখানে ইনজেকশন দেবার ভাল ট্রেনিং কারো নেই, আর তাঁকে জিজ্ঞেস করুন কোনো খাবার ওষুধ দেয়া সম্ভব কি না।

৩· যদি কোনো ডাক্তার আপনার রক্ত পরীক্ষা না করেই আপনাকে ভিটামিন, লিভার একসট্রাকট বা ভিটামিন বি ১২-র ইনজেকশন নিতে বলেন, তাঁকে বলুন আপনি অন্য ডাক্তার দেখাতে চান।

যে সব জরুরি অবস্থায় ইনজেকশন দেয়া দরকার

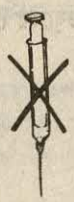
নিচের রোগগুলোর বেলায়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তারি সাহায্য নেবেন। যদি সাহায্য পেতে বা রোগীকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে কোনোরকম দেরি হয়, উপযুক্ত ওষুধটি যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ইনজেকশন করে দিন। মাত্রার বিষয়ে বিশদ জানতে নিচের তালিকায় দেয়া পৃষ্ঠাগুলি দেখে নিন। ইনজেকশন দেবার আগে, কি কি উপসর্গ হতে পারে জেনে নিন এবং দরকারি সাবধানতাগুলি নিন।

↓ এই রোগের জন্যে	↓ এই ওষুধের ইনজেকশন দিন
কঠিন নিউমোনিয়া (পৃঃ ২০৮) প্রসবের পর সংক্রমণ (পৃঃ ৩২২) গ্যাংগ্রিন বা পচা ক্ষত (পৃঃ ২৫৪)	বেশি মাত্রায় পেনিসিলিন (পৃঃ ৩৯৮—৯৯)
ধনুষ্টঙ্কার (পৃঃ ২২২)	পেনিসিলিন (পৃঃ ৩৯৭—৯৮) সঙ্গে টিটেনাস এনটিটকসিন (পৃঃ ৪২১) আর ফেনোবারবিটাল (পৃঃ ৪২২) বা ডায়াজিপাম (পৃঃ ৪২৩)
এপেনডিসাইটিস (পৃঃ ১০৮) পেরিটোনাইটিস (পৃঃ ১০৮) গুলি লেগে ক্ষত বা পেটে অন্য গভীর ক্ষত	পেনিসিলিন বা এমপিসিলিন
বিষাক্ত সাপের কামড় (পৃঃ ১২১) বিছের হুল ফোটানো (পৃঃ ১২৩)	সাপের এনটিভেনিন (পৃঃ ৪২১) বিছের এনটিভেনিন (পৃঃ ৪২১)
বমি (পৃঃ ১৯২) যখন সামলানো যায় না	বমি বন্ধের ওষুধ যেমন: প্রমেথাজাইন (পৃঃ ৪১৯, ৪২০)
সাংঘাতিক এলার্জির প্রতিক্রিয়া এলার্জির শক (পৃঃ ৮৩) আর ভীষণ হাঁপানি (পৃঃ ২০৪)	এড্রেনালাইন (পৃঃ ৪১৯)

নিচের পুরোনো রোগগুলিতে, জরুরি অবস্থা না হলেও, সাধারণতঃ ইনজেকশন লাগে। চিকিৎসার জন্যে স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ নেয়া সব থেকে ভাল।

যক্ষ্মা (পৃঃ ২১৯, ২২০)	স্ট্রেপটোমাইসিন (পৃঃ ৪০৩, ৪০৪) সঙ্গে আই· এন· এইচ· আর পি· এ· এস· বড়ি (পৃঃ ৪০৪)
সিফিলিস (পৃঃ ২৮১) গনোরিয়া (পৃঃ ২৮০)	খুব বেশি মাত্রায় প্রোকেন পেনিসিলিন (পৃঃ ৩৯৯)

ইনজেকশন কখন দেয়া উচিত নয় :



যদি তাড়াতাড়ি ডাক্তারি সাহায্য পেতে পারেন, **কখনো** ইনজেকশন দেবেন **না**।
রোগ কঠিন না হলে **কখনো** ইনজেকশন দেবেন **না**।
সর্দি বা ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্যে **কখনো** ইনজেকশন দেবেন **না**।
যে রোগের চিকিৎসা করতে চাইছেন তারই জন্যে ওষুধটা দেয়া না হলে **কখনো** সেই ওষুধের ইনজেকশন দেবেন **না**।
যে সব সাবধানতার কথা বলা হয়েছে সেগুলো না জেনে বা না নিয়ে **কখনো** কোনো ওষুধের ইনজেকশন দেবেন **না**।

যদি আপনার গ্রামে পোলিও রোগ মহামারী আকারে দেখা দেয়, ইনজেকশন পারতপক্ষে দেবেন না, বিশেষতঃ শিশুদের।

যে সব ওষুধের ইনজেকশন দেয়া উচিত নয়

সাধারণভাবে, নিচের ওষুধগুলোর ইনজেকশন না দেয়াই ভাল :

১. **সব ভিটামিন**—খাওয়ানোর থেকে ইনজেকশনে দিলে ভিটামিন খুব কম ক্ষেত্রেই বেশি ভাল কাজ করে। ইনজেকশনের দাম বেশি, বিপদও বেশি। ইনজেকশন না দিয়ে বরং ভিটামিনের বড়ি বা সিরাপ ব্যবহার করুন। ভিটামিনে ভর্তি খাবার খাওয়া আরো ভাল (পৃঃ ১৩০)।

২. **লিভার একসট্র্যাকট আর ভিটামিন বি-১২**—এগুলোর ইনজেকশন দেবেন না! প্রায় সব রক্তাল্পতার বেলায়ই আয়রনের বড়ি আরো ভালো কাজ করে (পৃঃ ৪২৪ দেখুন)।

৩. **ক্যালসিয়াম—খুব ধীরে ধীরে না** দিলে শিরার ভেতরে ক্যালসিয়ামের ইনজেকশন দেয়া ভীষণ বিপজ্জনক। পাছায় এই ইনজেকশন দিলে বড় *এবসেস* বা ফোড়া হয়ে পেকে যেতে পারে। ঠিকমত ট্রেনিং না থাকলে কখনো ক্যালসিয়ামের ইনজেকশন দেয়া উচিত নয়।

৪. **পেনিসিলিন**—যে সব সংক্রমণে পেনিসিলিন লাগে তার প্রায় সবগুলোরই চিকিৎসা খাবার পেনিসিলিনে ভাল হয়। ইনজেকশনে দিলে পেনিসিলিনের বিপদ বেশি। **শুধু বিপজ্জনক সংক্রমণের বেলায় পেনিসিলিনের ইনজেকশন ব্যবহার করুন**।

৫. **পেনিসিলিনের সঙ্গে স্ট্রেপটোমাইসিন**—এই মেশানো ওষুধটা এড়িয়ে চলুন। সর্দি বা ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্যে কখনো ব্যবহার করবেন না (পৃঃ ২০০)।

৬. **ক্লোরামফেনিকল বা টেট্রাসাইক্লিন**—খেলে এইসব ওষুধ সমান বা অনেক ভাল কাজ করে। ইনজেকশন না দিয়ে বরং ক্যাপসুল বা সিরাপ ব্যবহার করুন (পৃঃ ৪০১।

৭. **শিরায় দেবার তরল ওষুধ**—শরীরে সাংঘাতিক জলের অভাব হলে তবেই এবং শুধু ভাল ভাবে ট্রেনিং পাওয়া লোকেরই এগুলো ব্যবহার করা উচিত। ঠিকভাবে না দিলে এগুলো থেকে বিপজ্জনক সংক্রমণ বা মৃত্যু হতে পারে (পৃঃ ৬৪)।

৮. **শিরায় দেবার ওষুধ**—যে কোনো ওষুধ শিরার ভেতরে ইনজেকশনে দিলে এত বিপদ হতে পারে যে, **শুধু ভাল** ট্রেনিং পাওয়া স্বাস্থ্যকর্মীরই এই কাজটা করা উচিত। অবশ্য, যে ওষুধে লেখা আছে—'**শুধু** শিরায় দেবার জন্যে', সেটা কখনো পেশীতে (পাছায়) ইনজেকশন করবেন না। আবার যে ওষুধে লেখা আছে '**শুধু** পেশীতে দেবার জন্যে', সেটা কখনো শিরায় ইনজেকশন করবেন না।

ঝুঁকি এবং সাবধানতা

যে কোনো ওষুধের ইনজেকশন দেবার ঝুঁকি হল (১) ছুঁচের সঙ্গে বীজাণু ঢুকে সংক্রমণ আর (২) ওষুধের থেকে এলার্জির বা বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া।

১· ইনজেকশনে সংক্রমণের সম্ভাবনা কমাবার জন্যে সবকিছু পুরোপুরি পরিষ্কার রাখার দিকে ভাল করে নজর দিন। ইনজেকশন দেবার আগে ছুঁচ আর সিরিঞ্জ ফুটিয়ে নেয়া খুব জরুরি। ফোটানোর পর ছুঁচের ডগাটা আঙুল বা অন্য কিছু দিয়ে ছোঁবেন না (পৃঃ ৮৫ দেখুন)।



সবসময় প্রতিবারের ইনজেকশনের আগে ছুঁচটা ফোটাবেন, বিশেষ করে যদি অনেকের জন্যে একই ছুঁচ ব্যবহার করেন। ইনজেকশনের জন্যে দেয়া নির্দেশগুলো সাবধানে মেনে চলুন (পরের পৃষ্ঠাগুলো দেখুন)।





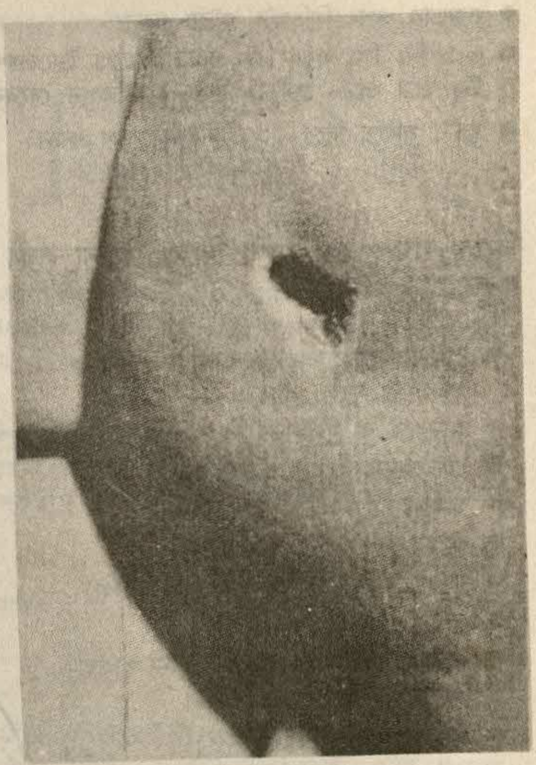
*ছুঁচ ভাল করে না ফুটিয়ে আর সম্পুর্ণ পরিষ্কার আর **জীবাণুমুক্ত** না করে, সেটা দিয়ে ইনজেকশন দিলে এইরকম পুঁজভর্তি ফোড়া হয়।*

২· যে ছুঁচ জীবাণুমুক্ত নয় তাই দিয়ে এই শিশুটিকে ইনজেকশন দেয়া হয়েছিল।



নোংরা ছুঁচটা থেকে সংক্রমণ হয়েছিল, তার ফলে শিশুটির একটা বড় যন্ত্রণাদায়ক পুঁজভর্তি ফোড়া আর জ্বর হয়েছিল। শেষে,ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে ফোড়াটা ফেটে গিয়েছিল।

শিশুটিকে সর্দির জন্যে ইনজেকশন দেয়া হয়েছিল। তাকে কোনো ওষুধ না দিলে অনেক ভাল হত। ইনকেজশনে তার উপকার হয়নি, বরং কষ্ট আর ক্ষতিই হয়েছে।



৩· এই ধরনের সমস্যা এড়াতে হলে:

- কেবল চরম দরকারেই ইনজেকশন দেবেন

- ইনজেকশন দেবার ঠিক আগে সিরিঞ্জ আর ছুঁচ ফুটিয়ে নিন আর ওগুলো সম্পূর্ণ পরিষ্কার রাখতে বিশেষ যত্ন নিন।

- রোগটার জন্যে যে ওষুধের কথা বলা হয়েছে, শুধু সেটাই ব্যবহার করুন আর দেখে নিন যে, সেটা ভাল অবস্থায় আছে, নষ্ট হয়ে যায়নি।

- ঠিক জায়গায় ইনজেকশন দিন (লক্ষ্য করুন যে, এই শিশুটিকে পাছার **বেশি নিচের দিকে** ইনজেকশন দেয়া হয়েছে—ওখানে স্নায়ুর ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।)

৪· ইনজেকশন দেবার আগে, ওষুধ থেকে কি কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা জানা আর যেগুলো বলা হয়েছে সেইসব সাবধানতা নেয়া খুব জরুরি।

কিছু ওষুধের ইনজেকশন থেকে বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়া

পেনিসিলিন, এমপিসিলিন আর এনটিটকসিন—এইরকম কয়েকটি ওষুধ থেকে *ভীষণ এলার্জির প্রতিক্রিয়া* হতে পারে। এইসব ওষুধ পুরোমাত্রায় দেবার আগে ওষুধটা লোকটি সইতে পারবে কি না তা জানার জন্যে **সবসময় স্পর্শকাতরতার পরীক্ষা করবেন।**

স্পর্শকাতরতার পরীক্ষা করার **আগে ও পরে** সবসময় এড্রেনালাইন তৈরি রাখবেন।

স্পর্শকাতরতার পরীক্ষা কি ভাবে করতে হয়:

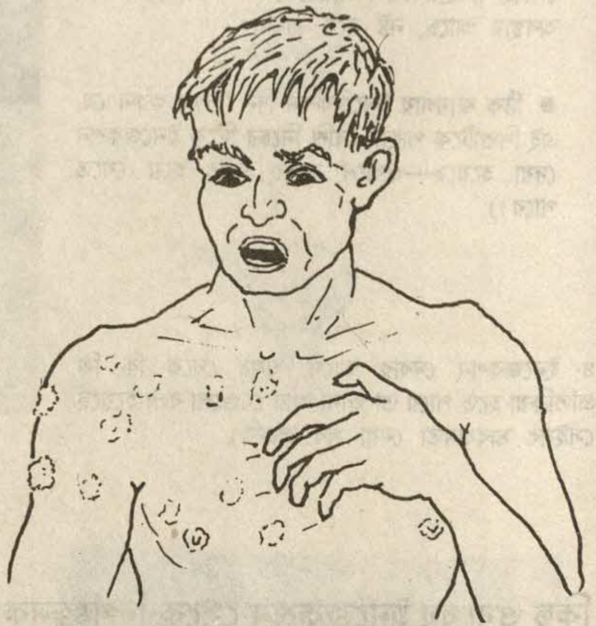
- পৃঃ ৮৫-তে যেমন দেখানো হয়েছে সিরিঞ্জটা ইনজেকশনের জন্যে সেইভাবে তৈরি করুন।
- খুব ছোট (২৬ নং মাপের) ছুঁচ ব্যবহার করুন।
- নিচের হাতের ভেতর দিকের চামড়া সাবান জল বা এলকোহল দিয়ে পরিষ্কার করুন।
- ইনজেকশন দেবার আগে দেখবেন **জায়গাটা** যেন **শুকনো থাকে।**

- চামড়ার ওপর সিরিঞ্জটা শুইয়ে ধরুন
- ০·১ মিঃ লিঃ ওষুধ ঠিক চামড়ার মধ্যে ইনজেকশন করে দিন। যাতে ঐ জায়গাটা একটু উঁচু হয়ে ওঠে। **চামড়ার নিচে ইনজেকশন দেবেন না।**
- ছুঁচটা সরিয়ে নিয়ে ৩০ মিনিট অপেক্ষা করুন।



নিচের লক্ষণগুলো দেখা দিচ্ছে কি না লক্ষ্য করুন:

- ইনজেকশনের জায়গাটা লাল, যন্ত্রণাদায়ক হওয়া বা ফুলে ওঠা।
- আমবাত বা ফুসকুড়ির সঙ্গে চুলকুনি
- যে কোনো জায়গা ফুলে যাওয়া
- শ্বাসকষ্ট
- শকের লক্ষণ (পৃঃ ৮৩ দেখুন)
- মাথা ঘোরা আর গা বমি (বমির ইচ্ছা)
- চোখে দেখার অসুবিধা
- কান ভোঁ ভোঁ করা বা শুনতে না পাওয়া
- পিঠে বা কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা
- পেচ্ছাপ করতে কষ্ট



এইসব লক্ষণের **কোনোটি দেখা দিলে—বাকি ওষুধটার ইনজেকশন দেবেন না। এই লোকটিকে আর কখনো ওই ওষুধ দেবেন না।** বয়স্ক লোককে ০·৫ মিঃ লিঃ আর ছোটদের ০·২৫ মিঃ লি *এড্রেনালাইনের* ইনজেকশন দিয়ে দিন।

যদি ৩০ মিনিটের মধ্যে এইসব লক্ষণের মধ্যে কোনোটি দেখা না যায়, তাহলে ৮৬ পৃষ্ঠায় যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে পাছার পেশীতে বাকি ওষুধটার ইনজেকশন দিয়ে দিন।

কখনো কখনো স্পর্শকাতরতার পরীক্ষার পর এলার্জির প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখা না গেলেও, পুরো মাত্রা দিলে লক্ষণগুলো দেখা যেতে পারে।

স্পর্শকাতরতার পরীক্ষা করার পরেও
সবসময় হাতের কাছে এড্রেনালাইন রাখবেন

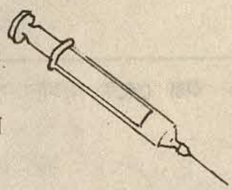
যদি পুরো মাত্রায় ইনজেকশন দেবার কয়েকদিন পরে কারো আমবাত বা ফুসকুড়ি ওঠে, তার হয়তো ওষুধটাতে এলার্জি আছে। তাকে ওই ওষুধ আর কখনো দেবেন না।

কখনো কখনো ইনজেকশন নেবার কয়েকঘণ্টা বা কয়েকদিন পরে আমবাত বা চুলকুনি বেরোয়।

নিচের দলের ওষুধগুলোর ইনজেকশন দিলে কখনো কখনো **এলার্জির শক** বলে একরকম বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়া হয়।

সবরকম পেনিসিলিন (এর মধ্যে এমপিসিলিনও আছে)

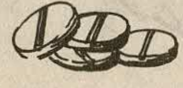
ঘোড়ার সিরাম থেকে তৈরি এনটিটকসিন { বিছের এনটিভেনিন, সাপের এনটিভেনিন, টিটেনাস এনটিটকসিন }



এই সব ওষুধের মধ্যে কোনোটা, বা একই দলের অন্য কোনো ওষুধের ইনজেকশন, যাকে আগে দেয়া হয়েছিল তার বেলায় **এলার্জির শকের** ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে। যদি ইনজেকশন দেবার কয়েকঘন্টা বা কয়েকদিন পরে এলার্জির প্রতিক্রিয়া (আমবাত, চুলকুনি, ফোলা বা শ্বাসকষ্ট) হয়ে থাকে, তবে এই ঝুঁকি বিশেষ বেশি থাকে।



ক্বচিৎ কখনো বোলতা বা মৌমাছির হুল ফোটানো বা কোনো খাওয়ার ওষুধ থেকে **এলার্জির শক** হতে পারে।



ইনজেকশন থেকে সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া এড়াতে হলে:

১· নেহাৎ দরকার হলে তবেই ইনজেকশন দেবেন।

২· ওপরের তালিকার ওষুধগুলোর মধ্যে কোনোটির ইনজেকশন দেবার আগে সবসময় দুটি এমপুল এড্রেনালাইন (পৃঃ ৪১৯), আর একটি এমপুল এনটিহিস্টামাইন—যেমন প্রমেথাজাইন বা ডাইফেনহাইড্রামাইন তৈরি রাখবেন।

৩· ইনজেকশন দেবার আগে সবসময় জিজ্ঞেস করে নেবেন, আগে কখনো একই ধরনের ইনজেকশনে চুলকুনি বা অন্য প্রতিক্রিয়া হয়েছিল কি না। যদি লোকটি হ্যাঁ বলে তবে ওই ওষুধ বা ওই দলের অন্য কোনো ওষুধ ইনজকেশনে বা খেতে দেবেন না। যদি সে না বলে, তবে পুরো মাত্রায় ওষুধটির ইনজেকশন দেবার আগে স্পর্শকাতরতার পরীক্ষা করুন।

৪· ধনুষ্টঙ্কার বা সাপের কামড়ের মত খুব মারাত্মক ব্যাপারে যদি এনটিটকসিন থেকে এলার্জির প্রতিক্রিয়া হবার সম্ভাবনা থাকে (যদি লোকটির এলার্জি বা হাঁপানি থাকে বা সে আগে ঘোড়ার সিরাম নিয়ে থাকে), তবে এনটিটকসিন দেবার ১৫ মিনিট আগে তাকে প্রমেথাজাইন বা ডাইফেনহাইড্রামাইনের ইনজেকশন দেবেন: বয়স্ক হলে ৩ মিঃ লিঃ, ছোটদের ওজন অনুসারে ১ বা ২ মিঃ লিঃ।

৫· যে কোনো ইনজেকশন দেবার পর, নিচের এলার্জির শকের লক্ষণগুলোর মধ্যে কোনোটা হচ্ছে কি না দেখার জন্যে লোকটির কাছে ৩০ মিনিট থাকুন:

- চামড়া ঠাণ্ডা, ভিজে, ফ্যাকাসে বা পাঁশুটে হয়ে যাওয়া
- ক্ষীণ, দ্রুত নাড়ি বা হার্টের স্পন্দন
- শ্বাসকষ্ট
- জ্ঞান হারানো

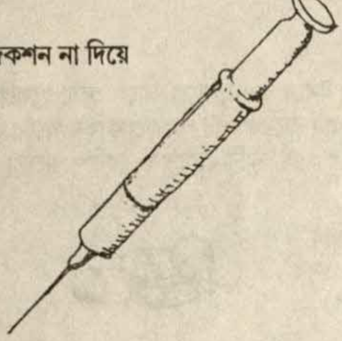
স্পর্শকাতরতার পরীক্ষার ফল স্বাভাবিক হলেও এই লক্ষণগুলো দেখা যেতে পারে।

৬· এই লক্ষণগুলো দেখা দিলে, তখনই *এড্রেনালাইনের* ইনজেকশন দিন: বয়স্কদের ০·৫ মিঃ লিঃ ছোটদের ০·২৫ মিঃ লিঃ। শকের চিকিৎসা করুন (পৃঃ ৮৯ দেখুন)। পরে একটা এনটিহিস্টামাইন দিন—সাধারণ মাত্রার দুগুন।

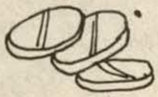
পেনিসিলিন ইনজেকশনের সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া কি করে এড়াতে হয়

১· অল্প থেকে মাঝারি সংক্রমণের জন্যে:

ইনজেকশন না দিয়ে



পেনিসিলিনের বড়ি দিন



২· ইনজেকশন দেবার আগে রোগীকে জিজ্ঞেস করুন:

"আগে পেনিসিলিন ইনজেকশন নিয়ে তোমার কি কখনো আমবাত, চুলকুনি, ফোলা বা শ্বাসকষ্ট হয়েছিল?"

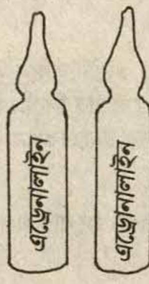


উত্তর যদি হয় হ্যাঁ, পেনিসিলিন বা এমপিসিলিন দেবেন না। অন্য একটা এনটিবায়োটিক যেমন এরিথ্রোমাইসিন (পৃঃ ৪০০) বা একটা সালফোনামাইড (পৃঃ ৪০২) ব্যবহার করুন।

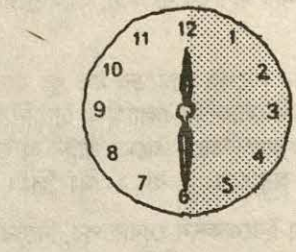
যদি উত্তর 'না' হয় তাহলে স্পর্শকাতরতার জন্যে পরীক্ষা করুন।

৩· পেনিসিলিনের ইনজেকশন দেবার আগে:

সবসময় *এড্রেনালাইনের* এমপুল তৈরি রাখবেন

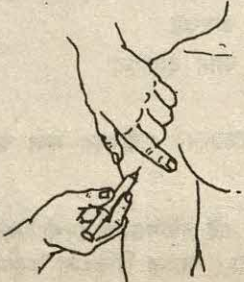


৪· ইনজেকশন দেবার পর:



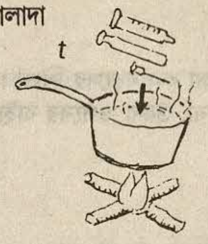
লোকটির কাছে অন্ততঃ ৩০ মিঃ থাকুন

৫· যদি রোগী খুব ফ্যাকাসে হয়ে যায়, তার হার্ট খুব দ্রুত চলে, শ্বাসকষ্ট হয় বা জ্ঞান চলে যেতে শুরু হয়, তখনই অর্ধেক এমপুল *এড্রেনালাইন* (শিশুদের বেলায় সিকি এমপুল) তার পেশীতে ইনজেকশন করে দিন, দরকার হলে ১০ মিনিট পর আবার দিন।

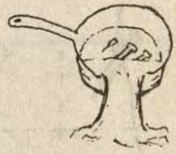


ইনজেকশনের জন্যে সিরিঞ্জ কি করে তৈরি করতে হয়

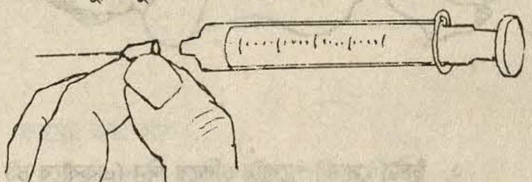
১· সিরিঞ্জের অংশগুলো আলাদা করে নিয়ে ছুঁচের সঙ্গে ১৫ মিনিট ধরে ফোটান



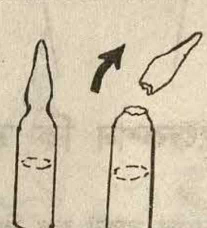
২· সিরিঞ্জ বা ছুঁচ না ছুঁয়ে ফোটানো জলটা ফেলে দিন



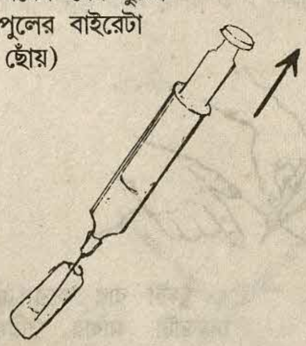
৩· শুধু ছুঁচের গোড়া আর সিরিঞ্জের ঠেলা দেবার জায়গাটা ছুঁয়ে ছুঁচ আর সিরিঞ্জ একসঙ্গে লাগান।



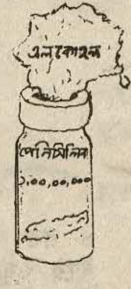
৪· ডিসটিলড ওয়াটারের এমপুলটা ভালভাবে পরিষ্কার করে আগাটা ভেঙে ফেলুন।



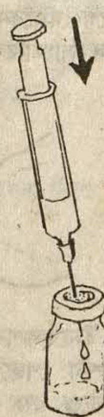
৫· সিরিঞ্জ ভর্তি করুন (দেখবেন যেন ছুঁচটা এমপুলের বাইরেটা না ছোঁয়)



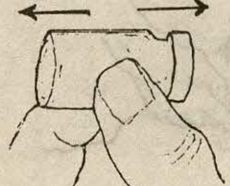
৬· ওষুধের শিশির রবারের ঢাকাটা এলকোহল বা ফোটানো জলে ভেজানো তুলো দিয়ে মুছে নিন।



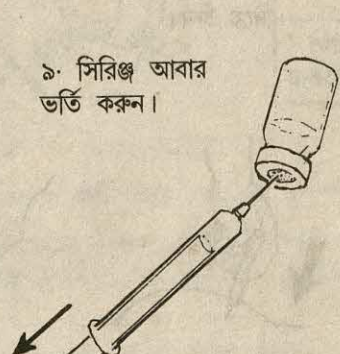
৭· গুঁড়ো ওষুধের শিশির মধ্যে ডিসটিলড ওয়াটার ইনজেকশন করে দিন



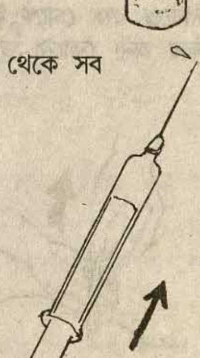
৮· জলে ওষুধটা গুলে যাওয়া পর্যন্ত ঝাঁকান।



৯· সিরিঞ্জ আবার ভর্তি করুন।



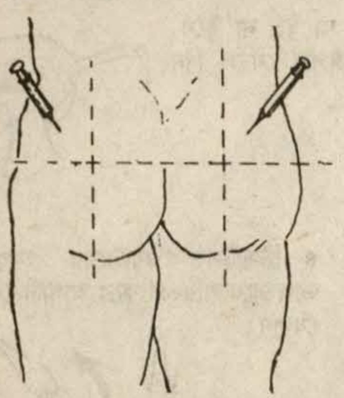
১০· সিরিঞ্জ থেকে সব হাওয়া বার করে দিন



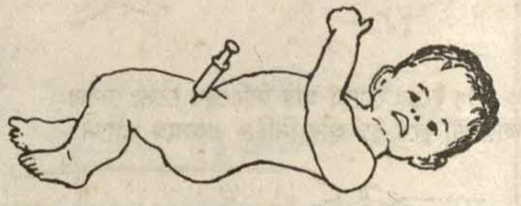
খুব সাবধান—ছুঁচের ডগা যেন কিছুই না ছোঁয়—এমনকি এলকোহল দেয়া তুলোও নয়। যদি কোনোভাবে ছুঁচের ডগা আপনার আঙুল বা অন্য কিছুর সঙ্গে ছুঁয়ে যায়, ওটা আবার ফুটিয়ে নিন।

কোথায় ইনজেকশন দেয়া হবে

পাছার পেশীতে ইনজেকশন দেয়াই ভাল, সবসময় ওপরের এবং বাইরের দিকের সিকি অংশে দেবেন।



২ বছরের কম বয়সের শিশুকে কখনো পাছায় ইনজেকশন দেবেন না, উরুর ওপরের বাইরের দিকের অংশে দেবেন।



ইনজেকশন কি ভাবে দেবেন

১· চামড়া সাবান জল দিয়ে পরিষ্কার করে নিন (এলকোহল দিতে পারেন। কিন্তু ইনজেকশন দেবার আগে দেখবেন যেন এলকোহলটা শুকিয়ে যায়, না হলে সাংঘাতিক যন্ত্রণা হবে)।



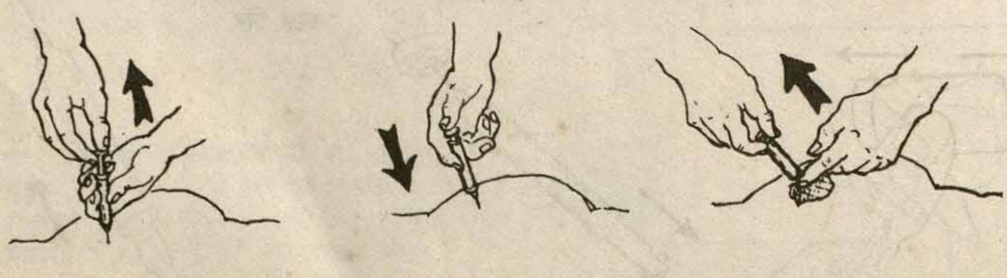
২· ছুঁচটা সোজা পুরোটা ঢুকিয়ে দিন (একবারে চট করে ঢোকালে, ব্যথা কম হয়)।



৩· ইনজেকশন দেবার আগে ঠেলার অংশটা পেছনে টেনে নিন। (যদি সিরিঞ্জে রক্ত ঢোকে, ছুঁচটা বার করে নিয়ে অন্য কোনো জায়গায় দিন।)

৪· রক্ত না ঢুকলে ধীরে ধীরে ওষুধটার ইনজেকশন দিয়ে দিন।

৫· ছুঁচটা বার করে এনে চামড়াটা আবার পরিষ্কার করে দিন।



৬· ইনজেকশন হয়ে গেলে তখনই সিরিঞ্জ আর ছুঁচ ধুয়ে ফেলুন। ছুঁচের ভেতর দিয়ে জল টেনে পিচকিরি করে ফেলুন, তারপর সিরিঞ্জটার অংশগুলো খুলে ধুয়ে নিন। আবার ব্যবহার করার আগে ফুটিয়ে নিন।

পরিচ্ছেদ

১০ প্রাথমিক প্রতিবিধান

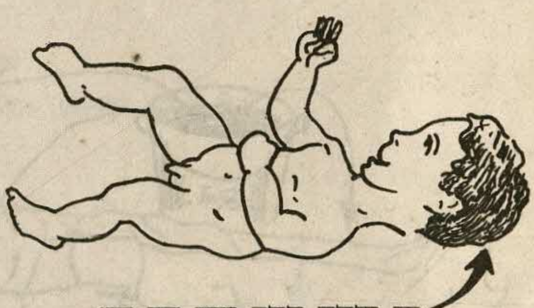
জ্বর

যখন কারো শরীরের তাপ খুব বেশি হয়, আমরা বলি তার জ্বর হয়েছে। জ্বরটা নিজে কোনো রোগ নয়, বরং অনেকগুলো বিভিন্ন রোগের লক্ষণ। **অবশ্য বেশি জ্বর বিপজ্জনক হতে পারে, বিশেষ করে ছোট শিশুর বেলায়।**

কারো জ্বর হলে :

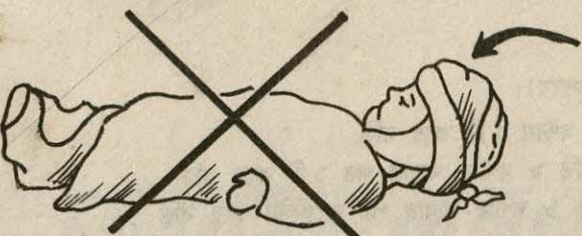
১· তার গায়ের ঢাকা একেবারে সরিয়ে দিন।

জ্বর কমে যাওয়া পর্যন্ত শিশুদের সব জামাকাপড় খুলে উলঙ্গ করে রাখা উচিত।



এতে জ্বর কমে যাবার সাহায্য হয়

শিশুকে **কখনো** জামাকাপড় বা কম্বল দিয়ে মুড়ে রাখবেন **না**।



এতে জ্বর বেড়ে যায়

শিশুর যখন জ্বর ওঠে,
ঢাকলে তাকে বিপদ ঘটে।

জ্বর হলে খোলা হাওয়া বা বাতাস ক্ষতি করে না। বরং খোলা বাতাস জ্বর কমাতে সাহায্য করে।

২· এছাড়া, জ্বর কমাতে এসপিরিন ব্যবহার করবেন (পৃঃ ৪১৪ দেখুন)। ছোটদের, এসেটামিনোফেন (প্যারাসিটামল পৃঃ ৪১৪), শিশুদের জন্যে এসপিরিন বা সাধারণ ৫ গ্রেনের (৩০০ মিঃ গ্রাঃ) এসপিরিন বড়ির এক টুকরো দেওয়া যায়।

৩· জ্বর হলে **প্রচুর জল**, রস বা অন্য তরল জিনিস **খাওয়া উচিত**। ছোটদের, বিশেষ করে শিশুদের, খাবার জল ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবেন।

৪· সম্ভব হলে, জ্বরের কারণ বার করে সেটার চিকিৎসা করুন।

খুব বেশি জ্বর

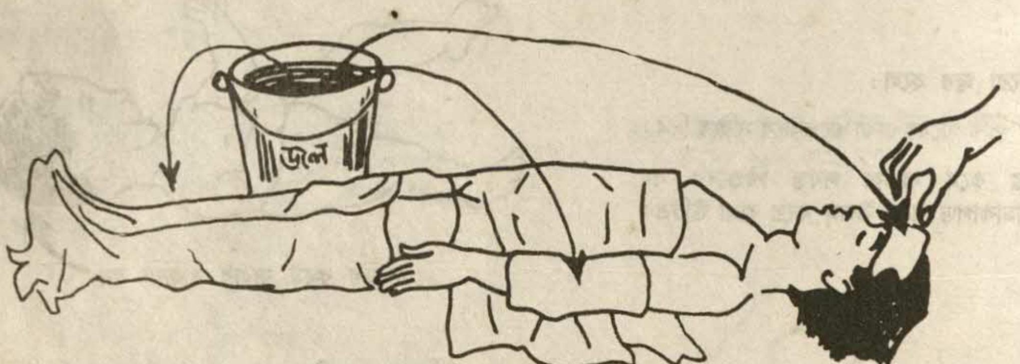
তাড়াতাড়ি কমিয়ে না আনলে খুব বেশি জ্বর বিপজ্জনক হতে পারে। এর থেকে ফিট (খিঁচুনি), এমনকি চিরকালের মত মগজের ক্ষতি (পক্ষাঘাত, মানসিক জড়তা, মৃগী ইত্যাদি) হতে পারে। ছোটদের বেলায় বেশি জ্বর খুবই বিপজ্জনক।

জ্বর যখন খুব বেশি (৪০°-র ওপরে) ওঠে, সেটা সঙ্গে সঙ্গে কমিয়ে ফেলা উচিত:

১· রোগীর গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিন বা কয়েক টুকরো কাপড় ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে রোগীর কপালে, হাতে আর পায়ে লাগান। ঠাণ্ডা রাখার জন্যে কাপড়ের টুকরোগুলোর ওপরে হাওয়া করুন আর ওগুলো ঘনঘন বদলে দিন। ৩৮°-র নিচে জ্বর না নামা পর্যন্ত এইরকম করে যান। দেখবেন যেন বরফ ঠাণ্ডা জল ব্যবহার করবেন না, কারণ তাতে কাঁপুনি হতে পারে আর জ্বর বেড়ে যেতে পারে।

২· জ্বর হলে শরীরের ক্ষমতা অনেক কমে যায়। রোগীর শক্তি বজায় রাখবার জন্যে প্রচুর চিনি বা গুড় মেশানো ঠাণ্ডা জল খেতে দিন।

৩· জ্বর কমাবার ওষুধ দিন। এসপিরিন ভালো কাজ করে।



মাত্রা (বড়দের ৩০০ মিঃ গ্রাঃ বড়ির মাত্রা অনুসারে):

১২ বছরের বেশি বয়সের লোক: প্রতি ৮ ঘণ্টায় ২টি করে বড়ি

৬ থেকে ১২ বছর বয়সের ছেলেমেয়ে: প্রতি ৮ ঘণ্টায় **খাবার পর** ১টি করে বড়ি

৩ থেকে ৬ বছর বয়সের ছেলেমেয়ে: প্রতি ৮ ঘণ্টায় **খাবার পর** অর্ধেকটা করে বড়ি

৩ বছরের নিচের বয়সের ছেলেমেয়ে: প্রতি ৮ ঘণ্টায় **খাবারের পর** সিকি ভাগ করে বড়ি

১ বছরের কম বয়সের শিশুদের কোনো এসপিরিনের বড়ি দেবেন না। তাদের উলঙ্গ করে রাখলে জ্বর কমে যাবে। তাদের প্যারাসিটামল দিতে পারেন।

অনেক ডাক্তার মনে করেন যে, শিশুদের পক্ষে এসপিরিনের থেকে এ্যাসেটামিনোফেন (প্যারাসিটামল) বেশি নিরাপদ। মাত্রার জন্যে পৃঃ ৪১৫ দেখুন।

বেশি জ্বর যদি তাড়াতাড়ি কমানো না যায় বা ফিট (খিঁচুনি) শুরু হয়, জল দিয়ে ঠাণ্ডা করা চালিয়ে যান আর সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারি সাহায্য নিন।

শক

শক একটা প্রাণ সংশয়ের অবস্থা, শরীরের রক্তের চাপ বিপজ্জনকভাবে কমে গেলে এটা হয়। প্রচণ্ড যন্ত্রণা, বড়সড় পোড়া, প্রচুর রক্তপাত, সাংঘাতিক অসুস্থতা, শরীরে জলের অভাব বা সাংঘাতিক এলার্জির প্রতিক্রিয়া থেকে এটা হতে পারে।

শকের লক্ষণ:

- **অজ্ঞান হয়ে যাবার পরে দুর্বলতা, বিশেষ করে দাঁড়িয়ে উঠলে**
- **বমির ভাব**
- **ঠাণ্ডা ভিজে ভিজে গা**
- **খুব বেশি ঘাম—এমনকি শীতের দিনেও**
- **সাংঘাতিক তেষ্টা**
- **ছটফটে ভাব, মানসিক গোলমাল বা জ্ঞান হারিয়ে ফেলা**
- **ক্ষীণ, দ্রুত নাড়ি (মিনিটে ১০০ বারের বেশি)**

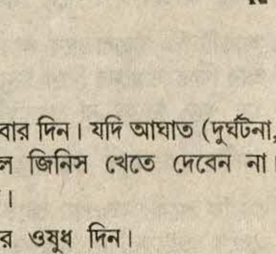
শক এড়াতে বা সারাতে কি করতে হয়:

শকের প্রথম লক্ষণ দেখা দিলে বা শকের ঝুঁকি থাকলে...

- পা দুটো মাথার থেকে উঁচু করে রেখে রোগীকে এইভাবে শুইয়ে দিন:



অবশ্য যদি মাথায় আঘাত লেগে শক হয় (পৃঃ ১০৪, ১০৫) পা উঁচু করে রাখবেন না, ঠেসান দিয়ে রোগীকে বসিয়ে দিন (একটা বালিশে হেলান দেয়া অবস্থায়) এইভাবে:



- রোগীর শীত করলে তাকে একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে দিন
- রোগীর জ্ঞান থাকলে তাকে কুসুম গরম জল বা অন্য অল্প গরম তরল খাবার দিন। যদি আঘাত (দুর্ঘটনা, ছুরির আঘাত ইত্যাদি, পৃঃ ১০৩) থেকে শক হয়, রোগীকে কোনো তরল জিনিস খেতে দেবেন না। তার অপারেশনের দরকার হতে পারে। তাড়াতাড়ি ডাক্তারি সাহায্য নিন।
- রোগীর যদি যন্ত্রণা থাকে, তাকে এসপিরিন বা অন্য কোনো ব্যথার ওষুধ দিন।
- নিজে শান্ত থেকে রোগীকে আশ্বাস দিন।
- যদি এলার্জির প্রতিক্রিয়ার জন্যে শক হয়, চিকিৎসার জন্যে পৃঃ ৮৩ দেখুন।

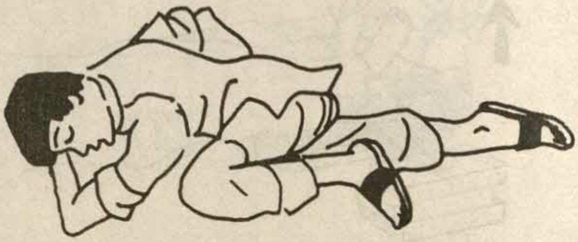
রোগী যদি অজ্ঞান হয়ে থাকে:

- তাকে পাশ ফিরিয়ে, মাথাটা নিচু করে পেছন দিকে একপাশ করে হেলিয়ে শুইয়ে দিন। যদি মনে হয় তার দম আটকে যাচ্ছে, আপনার আঙুল দিয়ে তার জিভটা সামনের দিকে টেনে আনুন।
- রোগী যদি বমি করে থাকে তার মুখের ভেতরটা তখনই পরিষ্কার করে দিন। দেখবেন তার মাথা যেন নিচু, পেছনেহেলানো আর একপাশে থাকে, যাতে সে শ্বাসের টানের সঙ্গে তার বমি ফুসফুসে ঢুকিয়ে না ফেলে।
- যতক্ষণ না রোগীর জ্ঞান ফিরছে, তাকে মুখ দিয়ে কিছু খাওয়াবেন না।
- যদি আপনি বা কাছাকাছি অন্য কেউ জানেন কি ভাবে দিতে হয়, তবে রোগীকে দ্রুত ফোঁটায় শিরার ভেতরে তরল ওষুধ (নর্ম্যাল সেলাইন) দিন।
- তাড়াতাড়ি ডাক্তারি সাহায্য নিন।

জ্ঞান হারানো

জ্ঞান হারানোর সাধারণ কারণ:

- মাতলামি
- মাথায় আঘাত
- শক (পৃঃ ৮৯)
- বিষক্রিয়া (পৃঃ ১১৬)
- বহুমূত্র (পৃঃ ১৪৯)
- মূর্চ্ছা (ভয়, দুর্বলতা ইত্যাদি থেকে)
- সর্দিগর্মি (পৃঃ ৯৪)
- সন্ন্যাস রোগ (পৃঃ ৩৭৩)
- হার্ট এটাক (পৃঃ ৩৭১)
- মৃগী (পৃঃ ২১৬)



যদি কেউ অজ্ঞান হয়ে পড়ে আর কারণটা আপনি না জানেন, **তখনই নিচের প্রত্যেকটা ব্যাপার দেখে নিন**:

১· লোকটি কি ভালোভাবে **শ্বাস** নিচ্ছে? যদি না নেয়, তার মাথা একেবারে পেছনদিকে হেলিয়ে দিয়ে তার চোয়াল আর জিভ সামনের দিকে টানুন। তার গলায় কিছু আটকে থাকলে সেটা টেনে বার করে দিন (পৃঃ ৯২)। যদি দেখেন সে শ্বাস নিচ্ছে না তখনই মুখে মুখ দিয়ে শ্বাস দিতে আরম্ভ করুন।

২· রোগীর কি **প্রচুর রক্তপাত** হচ্ছে? তাহলে রক্তপাত থামান (পৃঃ ৯৫)।

৩· সে কি শকের অবস্থায় আছে (ভিজে, ফ্যাকাসে গা, ক্ষীণ দ্রুত নাড়ি)? তাহলে তাকে পায়ের থেকে মাথা নিচুতে রেখে শুইয়ে দিন আর তার কাপড়চোপড় আলগা করে দিন।

৪· এটা কি **সর্দিগর্মি** হতে পারে (ঘাম নেই, জ্বর বেশি, গা গরম আর লাল, পৃঃ ৯৪)? তাহলে তাকে রোদ থেকে বাঁচিয়ে ছায়ায় রাখুন। মাথা পায়ের থেকে উঁচুতে রাখুন আর তাকে ঠাণ্ডা জলে (সম্ভব হলে বরফ জলে) ভিজিয়ে দিন।

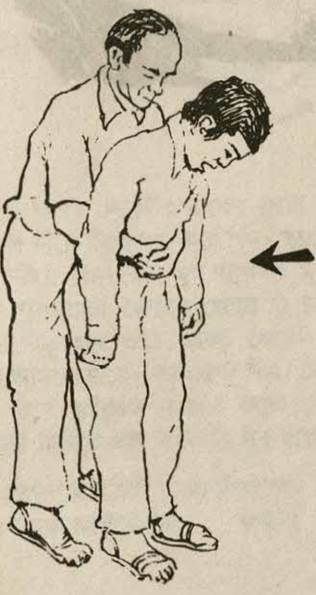
যদি অজ্ঞান রোগীর খারাপ ধরনের আঘাত লেগে থাকার কোনো সম্ভাবনা থাকে:

জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত রোগীকে না নড়ানোই সবথেকে ভাল। যদি নড়াতেই হয়, তাহলে খুব সাবধানে নড়াবেন, কারণ তার ঘাড় বা পিঠ ভেঙে থাকলে, অবস্থা বদল করলে আঘাত আরো বেড়ে যেতে পারে।

ক্ষত আছে বা হাড় ভেঙেছে কি না দেখুন, কিন্তু রোগীকে যতটা সম্ভব কম নড়াবেন। তার পিঠ বা ঘাড় বেঁকাবেন না।

রোগীর যদি জ্ঞান না থাকে,
মুখ দিয়ে খেতে দিও না তাকে।

গলায় কিছু আটকে গেলে



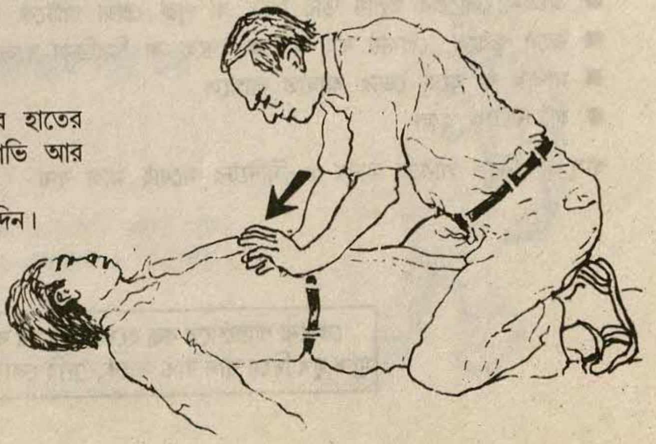
যদি কারো গলায় খাবার বা অন্য কিছু আটকে যায় আর সে শ্বাস নিতে না পারে তাড়াতাড়ি এইরকম করুন:



- তার পেছনে দাঁড়িয়ে তার কোমরটা আপনার দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরুন।
- আপনার হাতের মুঠি তার পেটের ওপর, নাভির থেকে উঁচুতে, পাঁজরের নিচে রাখুন।
- তারপর হঠাৎ জোরে ওপরদিকে ঝাঁকি দিয়ে পেটের ওপর চাপ দিন। এতে রোগীর ফুসফুস থেকে বাতাসটা বেরিয়ে গিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে দেয়। দরকার হলে কয়েকবার আবার করবেন।

যদি লোকটি আপনার থেকে অনেক বড়সড় হয় বা ইতিমধ্যেই অজ্ঞান হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তাড়াতাড়ি এইরকম করুন:

- তাকে চিৎ করে শোয়ান
- এইভাবে তার ওপরে বসুন, আপনার হাতের চেটোর গোড়াটা তার পেটের ওপর—নাভি আর পাঁজরের মাঝখানে রাখুন।
- ঝট করে, জোরে ওপরদিকে ঠেলা দিন।
- দরকার হলে আরো কয়েকবার করুন।
- যদি লোকটি তখনো শ্বাস নিতে না পারে, **মুখে মুখ দিয়ে শ্বাস** দিতে চেষ্টা করুন (পরের পৃষ্ঠা দেখুন)।



জলে ডোবা

যার শ্বাসের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে, তার আয়ু আর মাত্র ৪ মিনিট! যা করবার **তাড়াতাড়ি করুন!**

যদি সম্ভব হয়, ডুবে যাওয়া লোকটিকে জল থেকে তোলার আগেই, জলের গভীরতা যখনই দাঁড়াবার মত হবে, **তখনই মুখে মুখ দিয়ে শ্বাস দিতে শুরু করুন** (পরের পৃষ্ঠা দেখুন)।

যদি তার ফুসফুসে বাতাস ঢোকাতে না পারেন, তাহলে পাড়ে উঠেই তাড়াতাড়ি লোকটির মাথা পায়ের থেকে নিচু করে রাখুন আর আগে যেমন বলা হয়েছে সেইভাবে তার পেটে ঠেলা দিন। তারপর তখনও মুখে মুখ দিয়ে শ্বাস দিতে থাকুন।



সবসময় জলে ডোবা লোকের পেট থেকে জল বার করবার চেষ্টা করার আগেই প্রথমে মুখে মুখ দিয়ে শ্বাস দেয়া শুরু করবেন।

যদি কারো শ্বাস কষ্ট হয়:

- তার ঠোঁট, নখ আর জিভ নীল হয়ে যায়
- নাড়ি ধীরে আর অনিয়মিতভাবে চলে
- শ্বাস অনিয়মিতভাবে পড়ে বা পড়েই না
- সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে পারে

শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে কি করবেন: মুখে মুখ দিয়ে শ্বাস দেয়া

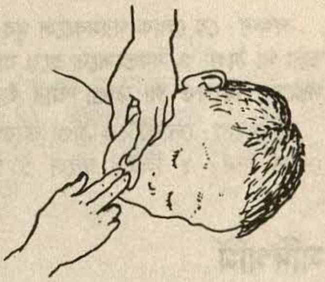
সাধারণতঃ এইসব কারণে শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়:

- গলায় কিছু আটকে গেলে
- অজ্ঞান লোকের গলায় তার জিভ বা পুরু শ্লেষ্মা আটকে গেলে
- জলে ডুবলে, ধোঁয়ায় দম আটকে গেলে বা বিষক্রিয়া হলে
- মাথায় বা বুকে জোর আঘাত লাগলে
- হার্ট এটাক হলে

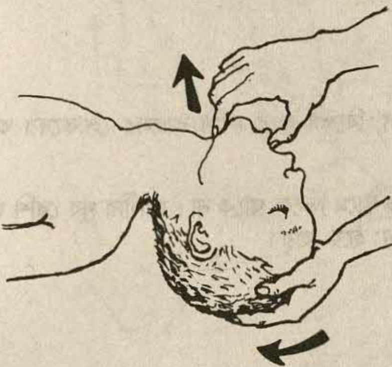
শ্বাস না নিতে পারলে মানুষ ৪ মিনিটের মধ্যেই মারা যায়

কোনো কারণেতে বন্ধ হয়েছে শ্বাসের কাজটি যার,
মুখে মুখ দিয়ে শ্বাস দাও তাকে, দেরি কোর নাকো আর।

নিচের কাজগুলো যত তাড়াতাড়ি পারেন, করুন:



প্রথম ধাপ: মুখে বা গলায় কিছু আটকে গেলে তাড়াতাড়ি বার করে দিন। জিভটা সামনের দিকে টানুন। গলায় শ্লেষ্মা থাকলে তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করে বার করে দেবার চেষ্টা করুন।



দ্বিতীয় ধাপ: তাড়াতাড়ি লোকটিকে চিৎ করে শুইয়ে দিন; তার মাথা একেবারে পেছন দিকে বেঁকিয়ে দিন, আর চোয়ালটা সামনের দিকে টেনে তুলুন।



তৃতীয় ধাপ: লোকটির নাকের ফুটো দুটো আপনার আঙুল দিয়ে টিপে বন্ধ করে দিন; তার মুখ বড় করে হাঁ করিয়ে দিন; তার মুখ আপনার মুখ দিয়ে ঢেকে তার ফুসফুসের ভেতরে জোরে ফুঁ দিন যাতে তার বুকটা উঁচু হয়ে ওঠে। একটু থেমে—বাতাসটা বার হয়ে আসতে দিয়ে—আবার ফুঁ দিন। মিনিটে প্রায় ১৫ বার করে এইরকম বারবার করুন। কচি বাচ্চাদের বেলায় মিনিটে প্রায় ২৫ বার **খুব আস্তে** ফুঁ দেবেন।

যতক্ষণ না রোগী নিজে নিজে শ্বাস নিচ্ছে অথবা সে যে মারা গেছে এটা নিঃসন্দেহে বোঝা যাচ্ছে, **মুখে মুখ দিয়ে শ্বাস** দেয়া চালিয়ে যান। কখনো কখনো এক ঘণ্টা বা তারো বেশি সময় ধরে এটা করে যেতে হয়।

গরমের জন্যে যে সব জরুরি অবস্থার সৃষ্টি হয়



গরমে খিল ধরা

গরমকালে যে সব লোক কঠিন পরিশ্রম করে আর প্রচুর ঘামে, তাদের পায়ে, হাতে বা পেটে কখনো কখনো যন্ত্রণাদায়ক খিল ধরে। শরীরে নুনের অভাব হলে এগুলো হয়।

চিকিৎসা: এক লিটার ফোটানো জলে এক চা চামচ নুন গুলে খেতে দিন। জলটাতে একটু চিনি আর লেবুর রসও মিশিয়ে নিতে পারেন।

গরমে দারুণ শ্রান্তি

লক্ষণ : যে লোক গরমকালে খুব পরিশ্রম করে আর ঘামে, সে খুব ফ্যাকাসে, দুর্বল আর অবশ হয়ে যেতে পারে। তার গা ঠাণ্ডা ও স্যাঁতসেতে হয়ে যায়। নাড়ি দ্রুত আর ক্ষীণ হয়ে যায়। **সবথেকে যা চোখে পড়ে তা হল যে, খুব গরমের দিনেও গা ঠাণ্ডা আর স্যাঁতসেতে থাকে।**

চিকিৎসা : লোকটিকে ঠাণ্ডা জায়গায় শুইয়ে দিন, পা দুটি উঁচু করে রাখুন আর পা দুটো ঘষে দিন। তাকে নুনজল খেতে দিন : ১ লিটার জলে ১ চা চামচ নুন। (জ্ঞান না থাকলে মুখ দিয়ে কিছু খাওয়াবেন না।)

সর্দিগর্মি

সর্দিগর্মি খুব বেশি হয় না কিন্তু হলে খুব বিপজ্জনক। গরমকালে, বিশেষ করে বেশি বয়সের লোকদের আর যারা বেশি মদ খায় তাদের এটা হয়।

লক্ষণ : গা লাল, খুব গরম আর শুকনো হয়ে যায়। এমনকি বগলও ঘামে ভিজে থাকে না। রোগীর খুব বেশি জ্বর হয়, কখনো কখনো ৪২° সেঃ-এরও বেশি। রোগী প্রায়ই অজ্ঞান হয়ে যায়।

চিকিৎসা : **শরীরের তাপ তখনই কমানো দরকার।**

- **রোগীকে ছায়ায় রাখুন**
- **তার জামাকাপড় খুলে ফেলে তার গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিন**
- **তাকে বাতাস করুন**
- **বরফ জলের ডুস দিন**
- **১০ মিনিট পর পর তার টেম্পারেচার (গায়ের তাপ) নিন**
- **জ্বর ৩৮° তে নেমে এলে ঠাণ্ডা জল ঢালা বন্ধ করুন আর**
- **ডাক্তারি সাহায্য নিন**

গরমে দারুণ শ্রান্তি আর সর্দিগর্মির তফাৎ :



গরমে দারুণ শ্রান্তি

- চামড়া ঘামে ভিজে, ফ্যাকাসে, ঠাণ্ডা
- চোখের মণি বড়
- জ্বর থাকে না
- দুর্বলতা

সর্দিগর্মি

- চামড়া শুকনো, লাল, গরম
- বেশি জ্বর
- রোগী খুব অসুস্থ বা অজ্ঞান হয়ে পড়ে

বেশি যখন গরম পড়ে, নানান রোগে ছেঁকে ধরে।
সেসব বিপদ যদি তুমি এড়িয়ে যেতে চাও,
নুনের জল তৈরি করে, সারাদিনে, বারে বারে
গরমকালের দিনে প্রচুর পরিমাণে খাও ॥

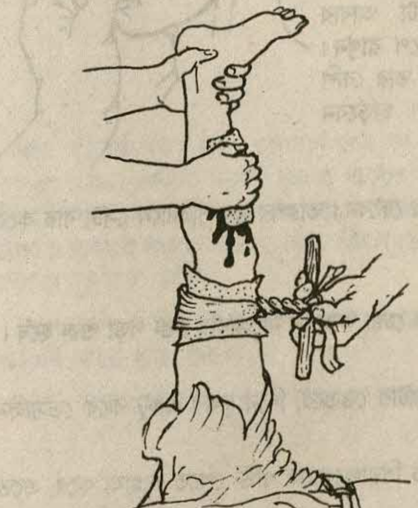
ক্ষত থেকে রক্তপাত কি ভাবে বন্ধ করতে হয়

১· আঘাতের জায়গাটা উঁচু করে রাখুন।

২· একটা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে (কাপড় না থাকলে আপনার হাত দিয়ে) সরাসরি ক্ষতের ওপর চাপ দিন। যতক্ষণ না রক্ত পড়া বন্ধ হয় চেপে ধরে থাকুন। এর জন্যে ১৫ মিনিট বা কখনো কখনো ১ ঘণ্টা বা তারো বেশি সময় লাগতে পারে।



৩· ক্ষতে চাপ দিয়ে যদি রক্ত পড়া থামানো না যায়, আর যদি প্রচুর রক্ত পড়ে যেতে থাকে, নিচের কাজগুলো করুন :



- ক্ষত চেপে ধরে থাকুন।
- ক্ষতের জায়গাটা, যতটা পারা যায়, উঁচু করে রাখুন।
- হাত বা পায়ে, ক্ষত আর বাকি শরীরের মাঝে ক্ষতের যতটা কাছে সম্ভব বাঁধন দিন। রক্ত পড়া বন্ধ করার মত শক্ত করে বাঁধুন।
  এত শক্ত করবেন না যাতে হাত বা পা নীল হয়ে যায়।
- **বাঁধনের জন্যে পাট করা কাপড় বা চওড়া ফিতে ব্যবহার করবেন; কখনো সরু দড়ি, সুতলি বা তার ব্যবহার করবেন না।**

সাবধানতা :

■ যদি রক্তপাত সাংঘাতিক হয় আর ক্ষতের ওপর সরাসরি চাপ দিলে না কমে শুধু তবেই বাঁধন দেবেন।

■ রক্ত চলাচল হতে দেবার জন্যে প্রত্যেক আধঘণ্টায় একবার একটুক্ষণের জন্যে বাঁধনটা ঢিলে করে দেবেন, আর দেখে নেবেন তখনো ওটার দরকার আছে কি না। খুব বেশি সময় বাঁধন রেখে দিলে হাত বা পায়ের এত বেশি ক্ষতি হয়ে যেতে পারে যে সেটা কেটে বাদ দিয়ে দিতে হয়।

■ **রক্ত বন্ধ করতে কখনো ধুলো, গোবর, কেরোসিন, চুণ বা কফি ব্যবহার করবেন না।**

■ রক্তপাত বা আঘাত সাংঘাতিক হলে শক এড়াতে (পৃঃ ৮৯) পা উঁচু আর মাথা নিচু করে রাখুন।

নাক দিয়ে রক্ত পড়া কি ভাবে বন্ধ করতে হয়



১· রোগীকে শান্ত ভাবে বসান।

২· ১০ মিনিট ধরে বা রক্তপাত বন্ধ হওয়া পর্যন্ত নাকটা টিপে বন্ধ করে রাখুন

এতে রক্তপাত না কমলে...



নাকের ফুটোয় তুলোর পুঁটলি গুঁজে দিন, পুঁটলির কিছুটা নাকের বাইরে যেন থাকে। সম্ভব হলে তুলোটা প্রথমে হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড, *ভেসলিন,* বা এপিনেফ্রিন দেয়ালিডোকেইন(পৃঃ ৪১৫) দিয়ে ভিজিয়ে নিন।



তারপর নাকটা আবার শক্ত করে টিপে রাখুন। ১০ মিনিট বা তার বেশি সময়ের আগে ছাড়বেন না।

রক্তপাত বন্ধ হবার পর তুলোটা কয়েকঘণ্টা একই জায়গায় রেখে দেবেন। তারপর খুব সাবধানে সেটা বার করে নেবেন।

নাকের ভেতরে খুঁটবেন না বা জমে যাওয়া রক্ত বার করে দেবার চেষ্টা করবেন না,আবার রক্ত পড়া শুরু হবে।

যদি কারো নাক দিয়ে ঘনঘন রক্ত পড়ে, তাহলে তার নাকের ফুটোর ভেতরে, দিনে দুবার একটু করে *ভেসলিন* মাখিয়ে দেবেন।

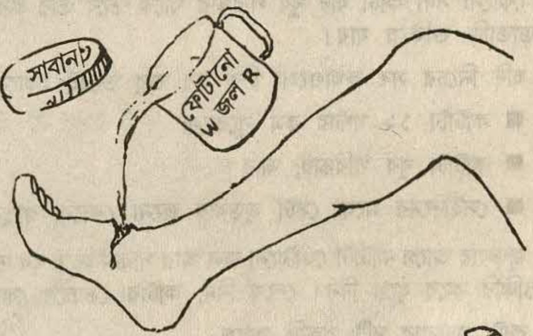
লেবু, টম্যাটো এবং অন্য ফল খেলে নাকের ভেতরের ছোট ছোট শিরাগুলোকে শক্তি পেতে সাহায্য করে, এতে নাক দিয়ে রক্ত পড়া কমে।

বিশেষ করে বয়স্ক লোকদের বেলায়, রক্তটা নাকের পেছন দিক থেকে পড়তে পারে; এতে নাক টিপে ধরে রক্তপাত বন্ধ করা যায় না। এরকম হলে লোকটিকে বলুন, সে যেন একটা ছিপি, ভুট্টার শাঁসের টুকরো বা ওই ধরনের কিছু দাঁতে করে ধরে সামনে ঝুঁকে শান্ত হয়ে বসে থাকে; আর যতক্ষণ না রক্তপাত বন্ধ হয়, ঢোক গেলা বন্ধ রাখতে চেষ্টা করে। (ছিপিটা ঢোক গেলা বন্ধ রাখতে সাহায্য করে—তাতে রক্তটা চাপ বেঁধে যাবার সময় পায়।)



কাটাছেঁড়া, ঘষটানো, আর ছোটখাট ক্ষত

সংক্রমণ এড়াবার আর ক্ষত শুকোবার কাজে সাহায্য করতে প্রথমেই দরকার—পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা



ক্ষতের চিকিৎসায়...

প্রথমেই আপনার হাতদুটি সাবান আর জল দিয়ে খুব ভাল করে ধুয়ে নিন।

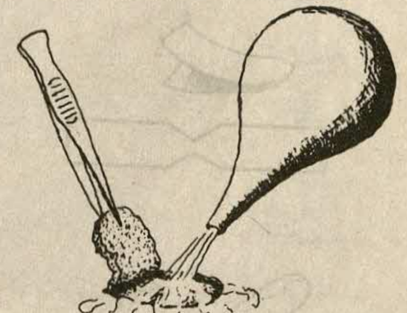
তারপর ক্ষতটা সাবান আর ফোটানো জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে নিন।



ক্ষত পরিষ্কার করার সময় দেখবেন যেন সব ময়লা পরিষ্কার করে দেয়া হয়। কোনো আলগা চামড়া থাকলে তা তুলে নিচটা পরিষ্কার করুন। ময়লার টুকরো বার করতে পরিষ্কার শন্না বা অন্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু জীবাণুমুক্ত করতে আগে সেগুলো ফুটিয়ে নেবেন।

সম্ভব বলে, সিরিঞ্জ বা ড্রপারে ফোটানো জল ভরে ক্ষতটা পিচকিরি করে ধুয়ে দেবেন।

ক্ষতে ময়লার টুকরো থেকে গেলে সংক্রমণ হতে পারে।



ক্ষতের ওপর কখনোই
লাগিও নাকো মল;
কিংবা গোবর, কিংবা কাদা,
ভীষণ হবে ফল।
ধনুষ্টঙ্কার আদি নানা
দারুণ রোগে ধরবে।
পরিষ্কার ক্ষত হলে
ওষুধ ছাড়াই সারবে।

কারো কাটাছেঁড়া বা ঘষটানো ক্ষত হলে তাকে তখনই একটা টিটেনাস টকসয়েডের ইনজেকশন দিয়ে দেবেন। সে যদি ধনুষ্টঙ্কারের টিকে আগে নিয়ে না থাকে, তবে পরের দুমাসে একটা করে ইনজেকশন দিয়ে দেবেন।

বড় কাটা: কেমন করে জুড়ে দিতে হয়

কোনো সদ্য কাটা যদি খুব পরিষ্কার থাকে তবে তার ধারগুলো একসঙ্গে করে দিলে কাটাটা জুড়ে যায় আর তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।

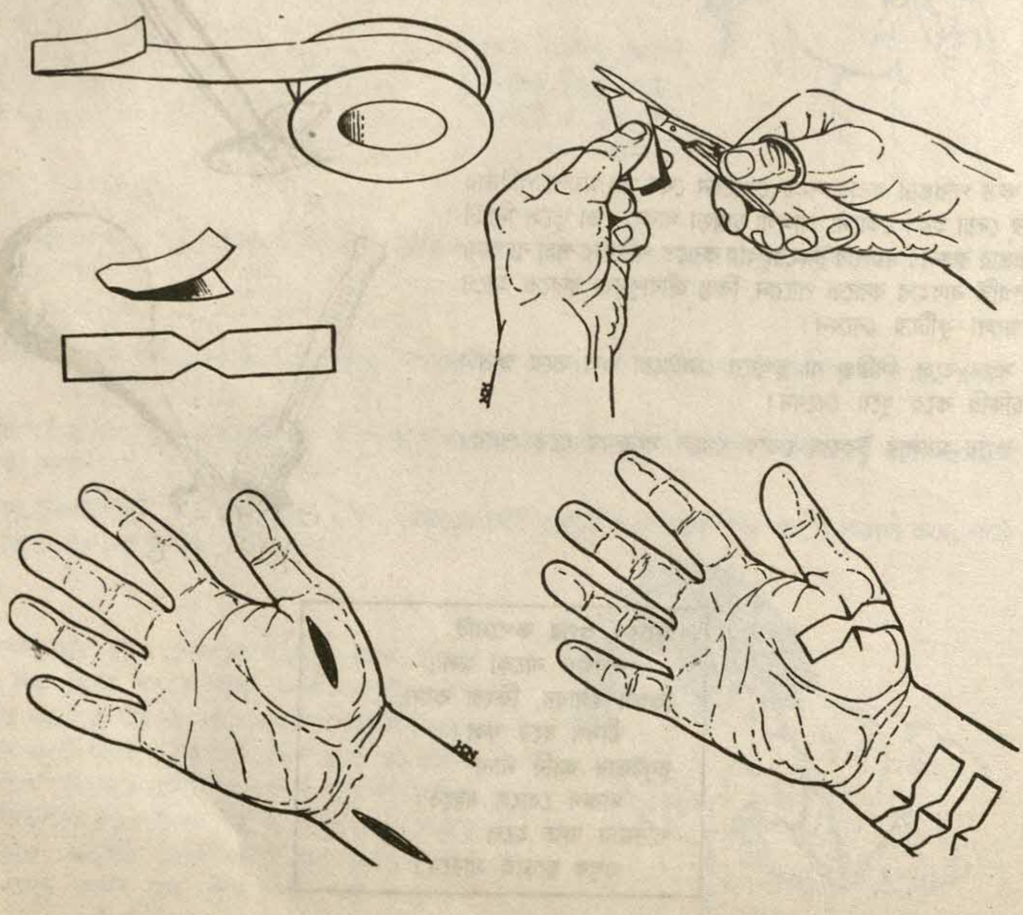
যদি নিচের সব কথাগুলো ঠিক হয় শুধু তবেই কোনো গভীর কাটা জুড়ে দেবেন:

- কাটাটা ১২ ঘন্টার কম পুরোনো
- কাটাটা খুব পরিষ্কার, আর
- সেইদিনের মধ্যে সেটা জুড়বার জন্যে কোনো স্বাস্থ্যকর্মী পাওয়া সম্ভব নয়।

জুড়বার আগে কাটাটা ফোটানো জল আর সাবান দিয়ে খুব ভাল করে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে সিরিঞ্জ আর জল দিয়ে পিচকিরি করে ধুয়ে দিন। দেখে নিন, কাটার ভেতরে কোনো ময়লা যেন লুকিয়ে না থাকে।

কাটা জুড়বার দুটি পদ্ধতি আছে:

স্টিকিং প্লাসটার দিয়ে প্রজাপতি ব্যাণ্ডেজ



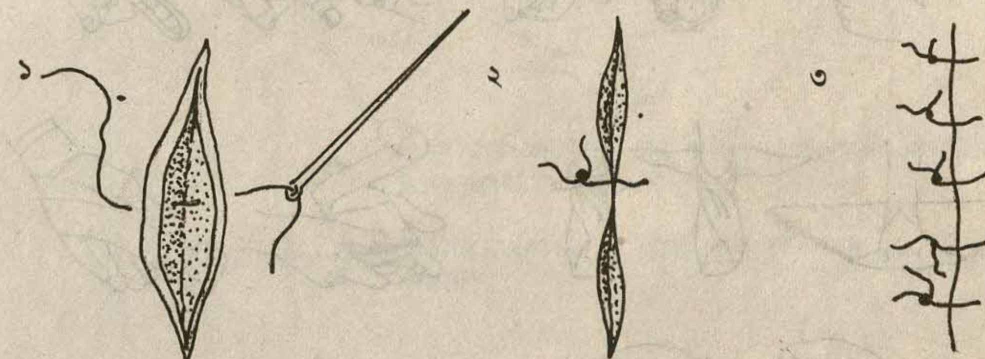
সুতো দিয়ে ফোঁড় বা সেলাই

কাটার জন্যে সেলাইয়ের দরকার কি না তা জানতে হলে দেখুন চামড়ার ধারগুলো নিজে থেকে এক জায়গায় এসে যায় কি না। নিজে থেকে এসে গেলে সাধারণতঃ কোনো সেলাই লাগে না।

ক্ষত সেলাই করতে হলে:

- একটা সেলাইয়ের ছুঁচ আর সরু সুতো (নাইলনের বা সিল্কের হলে সব থেকে ভাল হয়) ১০ মিনিট ধরে ফোটান।
- যেমন বলা হয়েছে সেইভাবে ক্ষতটা ফোটানো জল আর সাবান দিয়ে ধুয়ে নিন।
- আপনার হাত সাবান ও ফোটানো জল দিয়ে খুব ভাল করে ধুয়ে নিন।
- এইভাবে ক্ষতটা সেলাই করুন:





প্রথম সেলাইটা কাটার মাঝখানে করুন, তারপর বেঁধে জুড়ে দিন (১ আর ২)।

পুরো কাটাটা জুড়তে আরো যতগুলো দরকার, সেলাই করুন (৩)।

৬ থেকে ১২ দিন ধরে সেলাইগুলো রেখে দিন (মুখে হলে ৬ দিন; শরীরে ৮ দিন ; হাত বা পায়ে ১২ দিন)। তারপর সেলাই কেটে দেবেন: গিটের একদিকে সুতোটা কেটে, যতক্ষণ না সুতোটা বেরিয়ে আসে, গিট ধরে টানুন।

সাবধান: যে ক্ষত খুব পরিষ্কার আর ১২ ঘন্টার বেশি পুরোনো নয় শুধু সেটাই জুড়বেন। পুরোনো, ময়লা বা যাতে সংক্রমণ হয়েছে এমন ক্ষত খুলে রাখা উচিত। মানুষ, কুকুর, শুয়োর বা অন্য জানোয়ারের কামড়ও খুলে রাখা উচিত। এগুলো জুড়ে দিলে বিপজ্জনক সংক্রমণ হতে পারে।

ক্ষত জুড়ে দেবার পর যদি তাতে কোনো সংক্রমণের লক্ষণ দেখা দেয়, তখনই সেলাইগুলো খুলে ফেলে ক্ষতটা খুলে রেখে দেবেন (পৃঃ ১০১)।

ব্যাণ্ডেজ

ক্ষত পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করতে ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার করা হয়। এইজন্যে ক্ষত ঢাকবার ব্যাণ্ডেজ বা কাপড়ের টুকরোগুলোর সবসময় পরিষ্কার হওয়া দরকার। ব্যাণ্ডেজের জন্যে ব্যবহার করার কাপড় ধুয়ে, পরিষ্কার, ধুলোবালি নেই এমন জায়গায় ইস্ত্রি করে বা রোদে শুকিয়ে নেয়া উচিত।

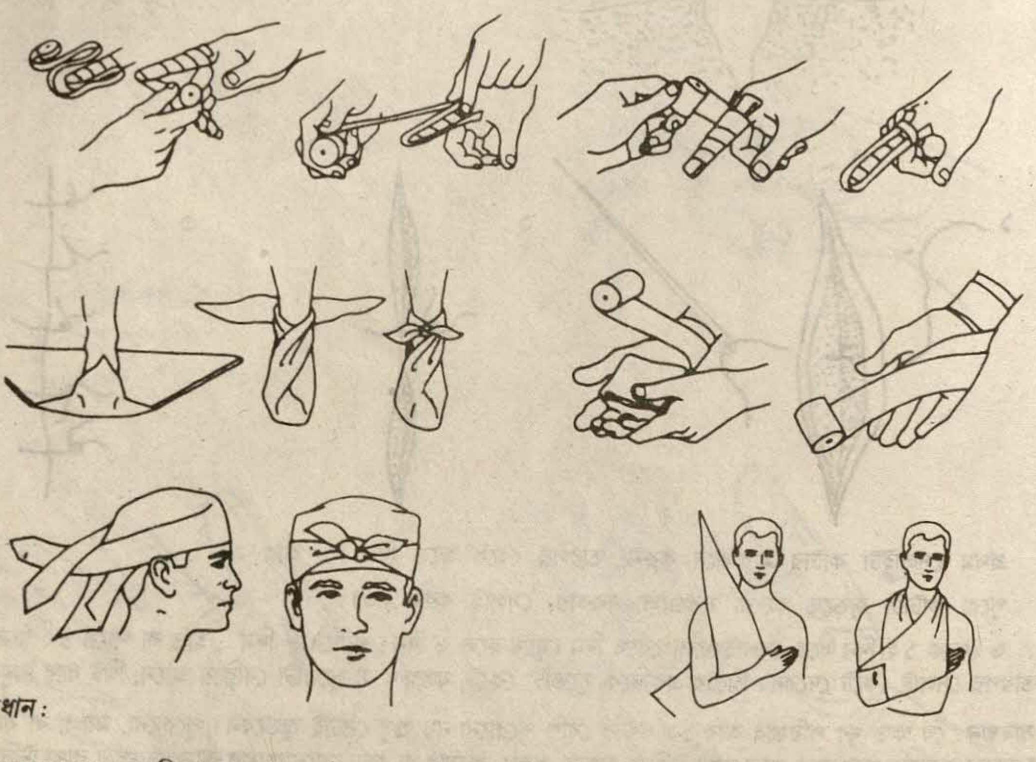
সম্ভব হলে ব্যাণ্ডেজ করবার আগে ক্ষতটা একটা জীবাণুমুক্ত গজের প্যাড দিয়ে ঢেকে দিন। এই প্যাডগুলো প্রায়ই মুখআঁটা খামের মধ্যে ওষুধের দোকানে বিক্রি হয়।

অথবা, নিজেই জীবাণুমুক্ত গজ বা কাপড় তৈরি করুন। জিনিসটা মোটা কাগজে মুড়ে, স্টিকিং প্লাসটার দিয়ে এঁটে ২০ মিনিট ধরে উনুনের তাপে সেঁকে নিন। মোড়কটা একটা পাত্রে জলের ভাঁপে রাখলে সেটা পুড়ে যাবে না।

ভিজে নোংরা ব্যাণ্ডেজের থেকে কোনো ব্যাণ্ডেজ না থাকাই ভাল।

ব্যাণ্ডেজ ভিজে গেলে বা সেটার তলায় ময়লা ঢুকে গেলে, ব্যাণ্ডেজটা খুলে নিন, কাটাটা আবার ধুয়ে একটা পরিষ্কার ব্যাণ্ডেজ লাগান।

ব্যাণ্ডেজের উদাহরণ:



সাবধান:

হাত বা পা বেড় দিয়ে যে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়, দেখবেন, সেটা যেন এত শক্ত না হয় যাতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

অনেক ছোটখাট ঘষটানো বা কাটাছেঁড়ায় ব্যাণ্ডেজ লাগে না। ওগুলো সাবান জলে ধুয়ে বাতাসে খুলে রেখে দিলে সব থেকে ভালভাবে শুকোয়। ওগুলো পরিষ্কার রাখাটাই সব থেকে জরুরি।

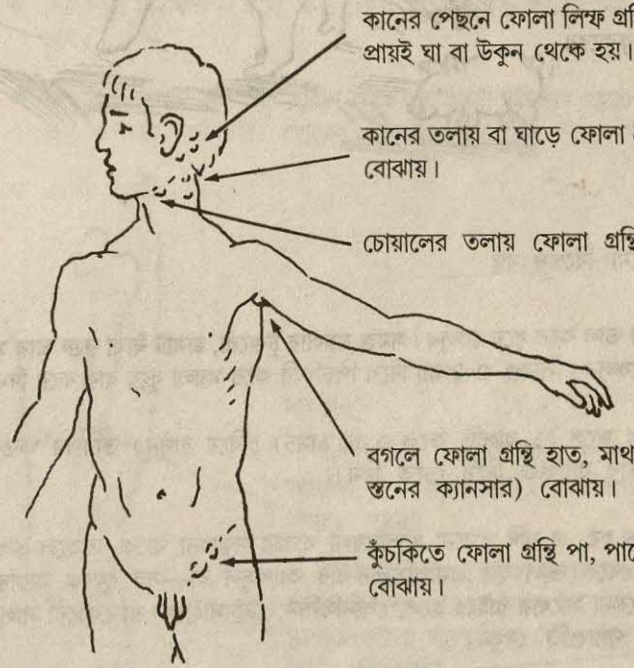
সংক্রমিত ক্ষত :
ওগুলো কি ভাবে চিনতে আর চিকিৎসা করতে হয় :

ক্ষতটাকে সংক্রমিত বলে বুঝবেন যদি :

- সেটা লাল হয়, ফুলে যায়, গরম আর যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে,
- তাতে পুঁজ হয়,
- বা তাতে দুর্গন্ধ হতে শুরু হয়।

সংক্রমণটা শরীরের অন্য জায়গাতেও ছড়িয়ে পড়ছে বলে বুঝবেন যদি :

- তার থেকে জ্বর হয়,
- ক্ষতের ওপর দিকে একটা লাল দাগ দেখা যায়,
- বা লিম্ফ গ্রন্থিগুলো ফুলে যায় আর টিপলে ব্যথা করে। লিম্ফ গ্রন্থিগুলো—সাধারণতঃ এগুলোকে গ্ল্যাণ্ড বলা হয়—জীবাণু ধরার ছোট ছোট ফাঁদ, সংক্রমিত হলে চামড়ার নিচে ছোট ছোট দলা তৈরি করে।



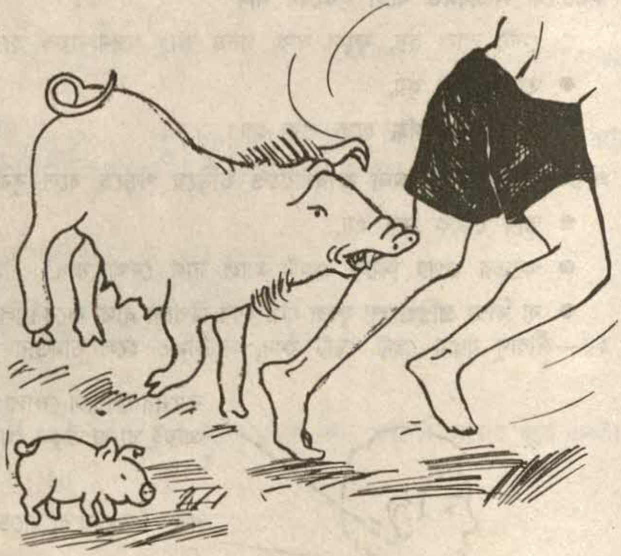
- ক্ষতের ওপর দিনে ৪ বার ২০ মিনিট ধরে গরম সেঁক দিন। সেঁকের জন্যে গরম জলের সঙ্গে নুন, সাবান বা পটাশিয়াম পারমাংগানেট ব্যবহার করবেন।
- সংক্রমিত জায়গাটা বিশ্রামে রাখবেন আর উঁচু করে (হার্টের থেকে ওপরে তুলে) রাখবেন।
- যদি সংক্রমণ সাংঘাতিক হয় অথবা রোগীর ধনুষ্টঙ্কারের টিকে না নেয়া থাকে, পেনিসিলিনের মত কোনো এনটিবায়োটিক (পৃঃ ৩৯৭, ৩৯৮) ব্যবহার করুন আর ধনুষ্টঙ্কারের টিকে দিন।

সাবধান : যদি ক্ষতে দুর্গন্ধ থাকে, যদি সেটার থেকে খয়েরি রা ছাই রংয়ের তরল জিনিস চুঁইয়ে বার হয়, বা যদি চারদিকের চামড়া কাল হয়ে যায় আর তাতে বুজকুড়ি কাটে বা ফোস্কা পড়ে যায়, সেটা পচা ঘা (গ্যাংগ্রিন) হতে পারে। তাড়াতাড়ি ডাক্তারি সাহায্য নিন। ততক্ষণ, পচা ঘায়ের জন্যে ২৫৪ পৃষ্ঠায় যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেইরকম করুন।

যে সব ক্ষতে বিপজ্জনক সংক্রমণ হবার সম্ভাবনা আছে

এই সব ক্ষত বিপজ্জনকভাবে সংক্রমিত হবার সম্ভাবনা সবথেকে বেশি

- নোংরা ক্ষত বা নোংরা জিনিস থেকে হওয়া ক্ষত
- গর্ত করা ক্ষত বা অন্যান্য যে সব গভীর ক্ষত থেকে বেশি রক্ত পড়ে না
- গোয়াল, শুয়োরের খোঁয়াড় ইত্যাদি জানোয়ার রাখার জায়গায় যে সব ক্ষত হয়
- সাংঘাতিক ভাবে পিষে যাওয়া বা কালসিটে পড়ে যাওয়া বড় ক্ষত
- কামড়—বিশেষ করে শুয়োরের, কুকুরের বা মানুষের
- বন্দুকের গুলি থেকে ক্ষত



এই ধরনের "বেশি ঝুঁকি"র ক্ষতের জন্যে বিশেষ যত্ন:

১· ফোটানো জল আর সাবান দিয়ে ক্ষতটা ভাল করে ধুয়ে ফেলুন। **সমস্ত ময়লার টুকরো, জমাট বাঁধা রক্ত আর মরা বা খুব ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া মাংস সরিয়ে ফেলুন**। সিরিঞ্জ বা ড্রপার দিয়ে পিচকিরি করে ময়লা ধুয়ে বার করে দিন।

২· ক্ষতটা পটাশিয়াম পারমাংগানেট দেয়া জলে (১ বালতি জলে ১ চা চামচ) চুবিয়ে রাখুন। তারপর ক্ষততে জেনসিয়ান ভায়োলেট মাখিয়ে পরিষ্কার ব্যাণ্ডেজ দিয়ে ঢেকে দিন।

৩· যদি ক্ষতটা খুব গভীর হয়, যদি কামড় হয়, বা যদি তখনো ধুলোময়লা থাকার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে একটা এনটিবায়োটিক ব্যবহার করুন। সব থেকে ভাল হল এমপিসিলিন-এর ক্যাপসুল বা—সব থেকে মারাত্মক অবস্থায়—ইনজেকশন। এমপিসিলিন কেনা সাধ্যের বাইরে হলে, পেনিসিলিন, টেট্রাসাইক্লিন বা কোনো সালফা ব্যবহার করুন। মাত্রার জন্যে **সবুজ পৃষ্ঠাগুলি** দেখুন।

৪· এই ধরনের ক্ষত **কখনো** সেলাই বা প্রজাপতি ব্যাণ্ডেজ দিয়ে জুড়ে দেবেন **না**। **ক্ষতটা খোলা রাখুন।**

ধনুষ্টঙ্কারের টিকে যাদের দেয়া হয়নি তাদের বেলায় এই মারাত্মক রোগটির ভয় খুব বেশি। যার ধনুষ্টঙ্কারের টিকে নেয়া নেই তার এই ধরনের ক্ষত হলে—ছোট হলেও—ঝুঁকি কমাবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে তাকে পেনিসিলিন বা এমপসিলিন দেবেন।

ধনুষ্টঙ্কারের টিকে যে নেয়নি তার যদি এই ধরনের খুব সাংঘাতিক ক্ষত হয়, তবে তার উচিত এক সপ্তাহ বা তার বেশি সময় ধরে বেশি মাত্রায় পেনিসিলিন বা এমপিসিলিন ব্যবহার করা। টিটেনাস এনটিটকসিনের কথাও ভেবে দেখা উচিত—কিন্তু এটা ব্যবহারের দরকারি সাবধানতাগুলো নিতে ভুলবেন না (পৃঃ ৮৩)।

বন্দুকের গুলি বা ছুরি থেকে ক্ষত বা অন্য সাংঘাতিক ক্ষত 

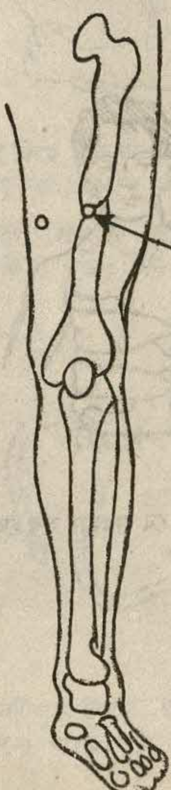
সংক্রমণের ভয়: যে কোনো বন্দুকের গুলির বা ছুরির আঘাত থেকে হওয়া গভীর ক্ষতে বিপজ্জনক সংক্রমণের ঝুঁকি খুব বেশি থাকে। এই জন্যে সঙ্গে সঙ্গে কোনো এনটিবায়োটিক—পেনিসিলিন (পৃঃ ৩৯৭) বা এমপিসিলিন (পৃঃ ৩৯৯) হলেই ভালো—ব্যবহার করা উচিত।

যাদের ধনুষ্টঙ্কারের টিকে দেয়া হয়নি, তাদের টিটেনাস এনটিটকসিনের ইনজেকশন আর ধনুষ্টঙ্কারের টিকেও দেয়া উচিত।

সম্ভব হলে ডাক্তারি সাহায্য নেবেন।

হাতে বা পায়ে বন্দুকের গুলির ক্ষত 

- ক্ষত থেকে যদি খুব রক্ত পড়ে তবে ৯৫ পৃষ্ঠায় যেমন দেখানো আছে সেইভাবে রক্ত পড়া কমিয়ে ফেলুন।
- রক্ত পড়া মারাত্মক না হলে, ক্ষত থেকে কিছুক্ষণ রক্ত পড়তে দিন। এতে ক্ষতটা পরিষ্কার হয়ে যাবার সাহায্য হবে।
- ক্ষতটা ফোটানো জল আর সাবান দিয়ে ধুয়ে একটা পরিষ্কার ব্যাণ্ডেজ লাগান। বন্দুকের গুলি থেকে ক্ষত হলে শুধু ওপরটা (বাইরেটা) ধোবেন। গর্তের মধ্যে কিছু দিয়ে খোঁচাখুঁচি না করাই সাধারণতঃ ভালো।
- এনটিবায়োটিক দিন।



সাবধান:

যদি গুলিটা কোনো হাড়ে লাগার সম্ভাবনা থাকে তবে হাড়টা ভেঙে গিয়ে থাকতে পারে।

আহত হাত বা পা ব্যবহার করলে বা তার ওপর ভর দিলে (যেমন দাঁড়ালে) ভাঙাটা আরো সাংঘাতিক হয়ে যেতে পারে, এই ভাবে:

যদি ভেঙেছে বলে সন্দেহ হয়, সব থেকে ভাল হল হাত বা পা তক্তা দিয়ে বেঁধে দেয়া আর কয়েক সপ্তাহ ব্যবহার না করা।



হাড়টা ভেঙেছে সন্দেহ যদি হয়,
মালিশ সেখানে কোরনাকো কক্ষনো।
মালিশেতে ভাঙা আরো বেশি বেড়ে যায়,
সারানোটা আরো মুশকিল হয় জেনো।

ক্ষতটা যদি সাংঘাতিক হয়, আঘাতের জায়গাটা হার্টের চেয়ে উঁচুতে রাখুন আর আহত লোকটিকে একদম স্থির অবস্থায় রাখুন।

এইভাবে ক্ষত তাড়াতাড়ি শুকোয় আর সংক্রমণের ভয়ও কম থাকে।



হ্যাঁ

পায়ে আঘাত লাগলে হাঁটাচলা করলে বা পা ঝুলিয়ে রাখলে ঘা শুকোতে দেরি হয়, সংক্রমণকেও ডেকে আনা হয়।



না



হাতে বন্দুকের গুলির ক্ষত বা অন্য সাংঘাতিক আঘাত হলে হাতের ভর রাখার জন্যে এইরকম একটা স্লিং (ঝোলা বা পটি) তৈরি করুন।

বুকে গভীর ক্ষত

বুকের ক্ষত খুব বিপজ্জনক হতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারি সাহায্য নেবেন।

- যদি ক্ষতটা ফুসফুস অবধি চলে যায় আর ওই গর্ত দিয়ে শ্বাসের সঙ্গে বাতাস ঢুকে যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতের জায়গা ঢাকা দিয়ে দিন, যাতে আর বাতাস না ঢোকে। একটা গজের প্যাড বা পরিষ্কার ব্যাণ্ডেজের ওপর *ভেসলিন* বা বনস্পতি মাখিয়ে সেটা এইভাবে গর্তটার ওপর শক্ত করে জড়িয়ে বেঁধে দিন।



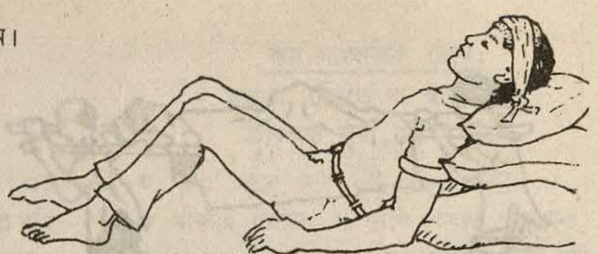
ভেসলিন বা বনস্পতি না থাকলে খানিকটা পরিষ্কার কাপড় পাট করে প্যাড করে নিয়ে ক্ষতের ওপর রেখে শক্ত করে ব্যাণ্ডেজ করে দিন।

- এটা একটা সাংঘাতিক অবস্থা। তাড়াতাড়ি ডাক্তারি সাহায্য নিন। ততক্ষণ, আহত লোকটি যে অবস্থায় সব থেকে আরাম পায়, সেইভাবে তাকে রাখুন।
- শকের লক্ষণ থাকলে ঠিকমত চিকিৎসা করুন (পৃঃ ৮৯)।
- এনটিবায়োটিক আর ব্যথা কমাবার ওষুধ দিন।

মাথায় বন্দুকের গুলির ক্ষত

- ক্ষতটা একটা পরিষ্কার ব্যাণ্ডেজ দিয়ে ঢেকে দিন।

- আহত লোকটিকে আধবসা অবস্থায় রাখুন।
- এনটিবায়োটিক (পেনিসিলিন) দিন।
- ডাক্তারি সাহায্য নিন।

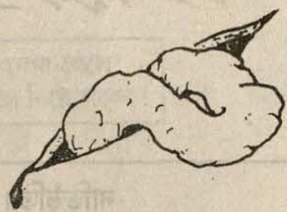


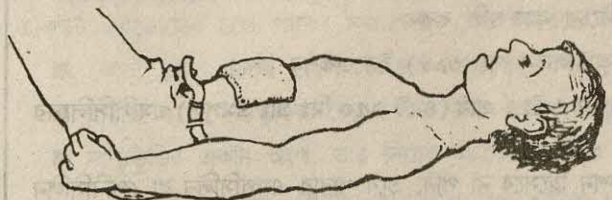
পেটে গভীর ক্ষত

পেটের ভেতরে বা নাড়িভুঁড়ির ভেতরে চলে গেলে যে কোনো ক্ষত বিপজ্জনক হয়। **সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারি সাহায্য নিন।** কিন্তু ততক্ষণ:

ক্ষতটা একটা পরিষ্কার ব্যাণ্ডেজ দিয়ে ঢেকে দিন।

যদি নাড়িভুঁড়ির কোনো অংশ ক্ষতের বাইরে বেরিয়ে আসে, তাহলে একটা পরিষ্কার কাপড়, অল্প নুন দেয়া ফোটানো জলে ভিজিয়ে তাই দিয়ে ওগুলো ঢেকে দিন। নাড়িভুঁড়িগুলো ভেতরে ঠেলে ঢোকাতে চেষ্টা করবেন না।



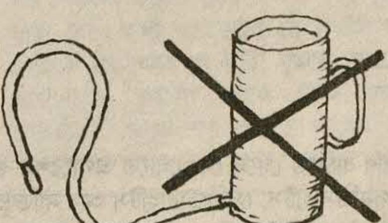


যদি আহত লোকটি শকের অবস্থায় থাকে, তার পা মাথার থেকে উঁচুতে রাখুন।

মুখ দিয়ে একেবারে কিছুই খেতে দেবেন না। খাবার নয়, তরল কিছু নয় এমনকি জলও নয়।

আহত লোকটির তেষ্টা পেলে তাকে একটুকরো কাপড় জলে ভিজিয়ে চুষতে দিন।





আহত লোকটির পেট ফুলে উঠলেও বা কয়েকদিন ধরে পায়খানা না হলেও **কখনো তাকে ডুস দেবেন না।** যদি নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে গিয়ে থাকে, ডুস বা জোলাপ দিলে সে মারা যেতে পারে।

এনটিবায়োটিকের ইনজেকশন দিন (নির্দেশের জন্যে পরের পৃষ্ঠা দেখুন)।





স্বাস্থ্যকর্মীর জন্যে অপেক্ষা করবেন না।

আহত লোকটিকে তখনই সব থেকে কাছের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা হাসপাতালে নিয়ে যান। তার অপারেশনের দরকার হবে।

নাড়িভুঁড়ির ভেতরের ক্ষতের জন্যে ওষুধ

(এগুলো এপেনডিসাইটিস বা পেরিটোনাইটিসেও লাগে)

যতক্ষণ না ডাক্তারি সাহায্য পাওয়া যায়, নিচের কাজগুলি করুন:

সঙ্গে সঙ্গে পেনিসিলিনের (সম্ভব হলে কৃস্টালাইন পৃঃ ৩৯৮) ইনজেকশন দিন।

যদি পেনিসিলিন না থাকে প্রত্যেক ৪ ঘন্টায় ১টা ১ গ্রাম (৪ টে ২৫০ মিঃ গ্রাঃ এমপুল) এমপিসিলিনের (পৃঃ ৩৯৯) ইনজেকশন দিন।

যদি এই এনটিবায়োটিকগুলো ইনজেকশন হিসেবে না পান, তবে খাবার এমপসিলিন বা পেনিসিলিন দেবেন, সঙ্গে ক্লোরামফেনিকল বা টেট্রাসাইক্লিন দেবেন, আর জল খুব কম দেবেন।

নাড়িভুঁড়ির জরুরি সমস্যা (একিউট এবডোমেন)

নাড়িভুঁড়ির কয়েকটি সাংঘাতিক অবস্থা, যেগুলো হঠাৎ হয়, আর প্রাণ বাঁচাতে গেলে যেগুলোতে অপারেশন করার দরকার হয়, সেগুলোকে *একিউট এবডোমেন* বলে। উদাহরণ হল, এপেনডিসাইটিস, পেরিটোনাইটিস আর নাড়িভুঁড়ির পথ আটকে যাওয়া (পরের পৃষ্ঠাগুলি দেখুন)। প্রায়ই, সার্জেন (ডাক্তার) পেটটা কেটে খুলে ভেতরটা দেখা পর্যন্ত একিউট এবডোমেনের সঠিক কারণটা বোঝা যায় না।

যদি কারো একটানা প্রচণ্ড পেটে ব্যথার সঙ্গে বমি হয়,
কিন্তু পাৎলা পায়খানা না হয়, একিউট এবডোমেন বলে সন্দেহ করবেন।

একিউট এবডোমেন:

হাসপাতালে নিয়ে যান, অপারেশনের দরকার হতে পারে

- একটানা প্রচণ্ড ব্যথা যা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে
- **কোষ্ঠকাঠিন্য আর সবুজ রংয়ের দুর্গন্ধে ভরা বমি**
- ফোলা আর শক্ত পেট, রোগী সেটাকে আগলে রাখে
- রোগী সাংঘাতিক অসুস্থ

কম সাংঘাতিক রোগ:

হয়তো বাড়িতে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা করা যেতে পারে

- ব্যথা আসে আর যায় (খিল ধরে)
- মাঝারি ধরনের বা বেশি পাৎলা পায়খানা
- কখনো কখনো সংক্রমণের লক্ষণ, হয়তো সর্দি বা গলাব্যথা
- রোগীর আগেও এই ধরনের ব্যথা হয়েছে
- রোগী শুধু মাঝারি রকম অসুস্থ

কারো একিউট এবডোমেনের লক্ষণ দেখা গেলে, তাকে যত তাড়াতাড়ি পারেন হাসপাতালে নিয়ে যাবেন।

নাড়িভুঁড়ির পথ আটকে যাওয়া

নাড়িভুঁড়ির কোনো অংশে কিছু আটকে গেলে বা বাধা থাকলে যদি খাবার বা মল যেতে না পারে, তবে তা থেকে একিউট এবডোমেন হতে পারে। সাধারণতঃ যেসব কারণে এটা হয়:

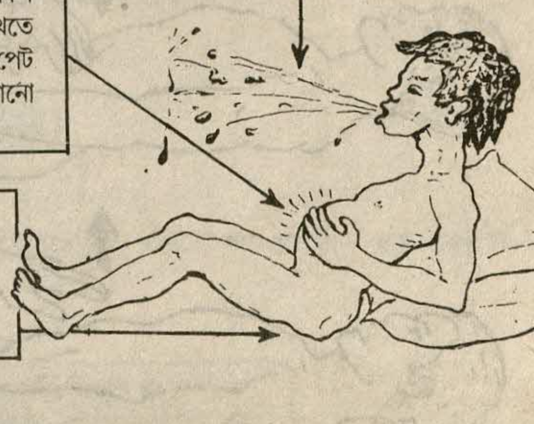
- কেঁচো কৃমির একটা গোলা বা জট (এসকারিস পৃঃ ১৯৩)
- হার্নিয়া হয়ে নাড়িভুঁড়ির কোনো বাঁক চিপে যাওয়া (পৃঃ ২১৫)
- নাড়িভুঁড়ির একটা অংশ, তার নিচের অংশের ভেতরে ঢুকে যাওয়া (ইনটাসাসেপশন)

প্রায় যে কোনো ধরনের একিউট এবডোমেনে, পথ আটকে যাওয়ার লক্ষণ দেখা যেতে পারে কারণ ক্ষতিগ্রস্ত নাড়িভুঁড়ি নড়লে যন্ত্রণা হয় বলে সেটার নড়াচড়া আপনিই বন্ধ হয়ে যায়।

নাড়িভুঁড়ির পথ আটকে যাওয়ার লক্ষণ:

খুব জোরের সঙ্গে হঠাৎ বমি! বমি এক মিটার বা আরো বেশি ছিটকে যেতে পারে। তাতে সবুজ পিত্তি থাকতে পারে বা সেটার মলের মত চেহারা বা গন্ধ হতে পারে।

পেটে একটানা সাংঘাতিক ব্যথা।
এই শিশুটির পেটটা ফোলা, শক্ত আর খুব **যন্ত্রণাদায়ক**। ছুঁলে বেশি ব্যথা করে বলে সে পেটটা আগলে রাখতে চেষ্টা করছে আর পা দুটো দুমড়ে রাখছে। তার পেট সাধারণতঃ 'চুপচাপ' থাকে (কান লাগালে কোনো স্বাভাবিক গড়গড় শব্দ শুনতে পাবেন না।)

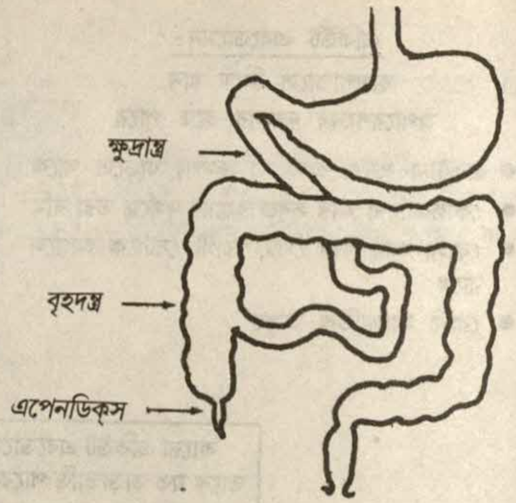


শিশুটির সাধারণতঃ কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে (পায়খানা অল্প হয় বা একেবারেই হয় না) পাৎলা পায়খানা হলে তা খুবই কম পরিমাণে হয়। কখনো কখনো শুধু রক্তমেশানো আম বার হয়।

একে **এখনই** হাসপাতালে নিয়ে যান। এর প্রাণ সংশয় হয়েছে। অপারেশনের দরকার হতে পারে।

এপেনডিসাইটিস, পেরিটোনাইটিস

এই সমস্ত বিপজ্জনক অবস্থায় প্রায়ই অপারেশনের দরকার হয়। তাড়াতাড়ি ডাক্তারি সাহায্য নিন।



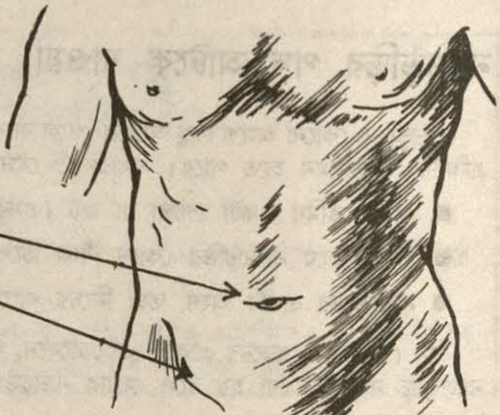
এপেনডিসাইটিস হল—পেটের নিচে ডানদিকে বৃহদন্ত্রের সঙ্গে লাগানো আঙুলের আকারের থলি, যাকে *এপেনডিক্স* বলে—তাতে সংক্রমণ। সংক্রমিত এপেনডিক্স কখনো কখনো ফেটে গিয়ে *পেরিটোনাইটিস* হয়ে যায়।

পেরিটোনাইটিস হল—নাড়িভুঁড়ি ধরে রাখার গহ্বর বা থলির ভেতরের দেয়ালে—তীব্র, কঠিন, সংক্রমণ। এপেনডিকস্ বা নাড়িভুঁড়ির অন্য কোনো অংশ ফেটে বা ছিড়ে গেলে এটা হয়।

এপেনডিসাইটিসের লক্ষণ:

- প্রধান লক্ষণ হল পেটে একটানা ব্যথা, যেটা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে।
- ব্যথাটা সাধারণতঃ নাইয়ের চারদিকে শুরু হয়, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই নিচে ডানদিকে সরে যায়।

খিদে কমে যেতে পারে, বমি, কোষ্ঠকাঠিন্য বা অল্প জ্বর হতে পারে।



এপেনডিসাইটিস বা পেরিটোনাইটিসের জন্যে পরীক্ষা:



তলপেটের বাঁদিকে সমানভাবে চাপ দিলে পেটের মধ্যে নাড়িভুঁড়ি বাঁদিক থেকে সরে ডান দিকে যায়। যদি এর ফলে ডানদিকের তলপেটে ব্যথা অনুভূত হয় তাহলে সম্ভবত এপেন্ডিসাইটিস হয়েছে বলে বুঝতে হবে।



যদি বাঁদিকের কুঁচকির ওপরে তাড়শের ব্যথা না হয়, তবে ডানদিকের কুঁচকির ওপরে একই পরীক্ষা করবেন।

যদি মনে হয় রোগীর এপেনডিসাইটিস বা পেরিটোনাইটিস হয়েছে:

- **তখনই ডাক্তারি সাহায্য নিন।** সম্ভব হলে অপারেশন করা চলে এমন জায়গায় রোগীকে নিয়ে যান।
- **মুখে কিছু খেতে দেবেন না** আর ডুস দেবেন না। যদি রোগীর শরীরে জলের অভাবের লক্ষণ দেখা যায়, তবেই শুধু দু এক চুমুক জল বা চিনি নুনের সরবৎ (পৃঃ ১৮২) দেবেন কিন্তু অন্য কিছু নয়।
- রোগীর উচিত আধবসা অবস্থায় খুব শান্তভাবে বিশ্রাম করা।

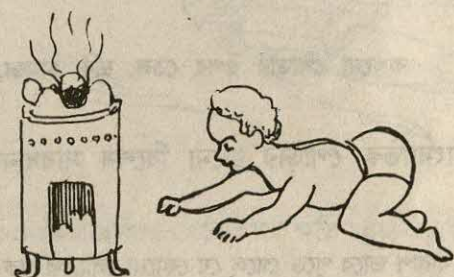
দ্রষ্টব্য : পেরিটোনাইটিস বেড়ে গেলে পেট তক্তার মত শক্ত হয়ে যায়, আলতো করে ছুঁলেও রোগীর প্রচণ্ড ব্যথা করে। তার প্রাণ সংশয় অবস্থা হয়, তাকে তখনই ডাক্তারি চিকিৎসার জায়গায় নিয়ে যান আর ১০৬ পৃষ্ঠার ওপরদিকে যেসব ওষুধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, পথে সেগুলো রোগীকে দিন।

পোড়া

এড়ানো :

বেশির ভাগ পোড়া এড়ানো যায়। শিশুদের বেলায় বিশেষ যত্ন নেবেন:

- ছোট শিশুদের আগুনের কাছে যেতে দেবেন না।
- বাতি আর দেশলাই নাগালের বাইরে রাখুন।
- উনুনের ওপরে রাখা প্যানের হাতল ঘুরিয়ে রাখবেন যাতে ছোটরা সেগুলোর নাগাল না পায়।



ছোটখাট পোড়া যাতে ফোস্কা হয় না (প্রথম ডিগ্রী)

ছোটখাট পোড়ার যন্ত্রণায় আরাম দিতে আর ক্ষতি কমাতে পোড়া জায়গাটা সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে দেবেন। অন্য কোনো চিকিৎসার দরকার নেই। ব্যথার জন্যে এসপিরিন দেবেন।

যে পোড়ায় ফোস্কা হয় (দ্বিতীয় ডিগ্রী)

ফোস্কা গালবেন না।

যদি ফোস্কা গেলে যায় সাবান আর ঠাণ্ডা করা ফোটানো জল দিয়ে আলতো করে ধুয়ে দিন। একটু *জেনসিয়ান ভায়োলেট* লাগিয়ে পোড়াটা খুলে রাখুন।

পরিষ্কার রাখা পোড়া জায়গাটা, নিতান্ত প্রয়োজন।
ধুলো, মাছি আর ময়লা না লাগে, সে দিকেতে দিও মন।

পুঁজ, দুর্গন্ধ, জ্বর বা ফোলা লিম্ফ গ্রন্থি ইত্যাদি সংক্রমণের লক্ষণ দেখা দিলে পটাশিয়াম পারমাংগানেট জলে গুলে দিনে ৩ বার সেঁক দিন। পটাশিয়াম পারমাংগানেট না পাওয়া গেলে গরম নুনজল ব্যবহার করতে পারেন (১ লিটার জলে ১ চা চামচ নুন)। ব্যবহারের আগে জল আর কাপড় দুটোই ফুটিয়ে নেবেন। মরা চামড়া আর মাংস খুব সাবধানে সরিয়ে দেবেন। নিওস্পোরিনের (পৃঃ ৪০৯) মত কোনো এনটিবায়োটিকের মলম একটু মাখিয়ে দিতে পারেন। সাংঘাতিক অবস্থায় পেনিসিলিন ব এমপিসিলিনের মত কোনো এনটিবায়োটিক খেতে দেবার কথা ভেবে দেখবেন।

গভীর পোড়া (তৃতীয় ডিগ্রী)

যদি চামড়া নষ্ট হয়ে কাঁচা বা পোড়া মাংস বেরিয়ে পড়ে অথবা যদি শরীরের অনেকখানি জায়গা জুড়ে পুড়ে যায়—তাহলে সেগুলো সবসময়ই সাংঘাতিক হয়। রোগীকে তাড়াতাড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। ততক্ষণ পোড়া জায়গাটা খুব পরিষ্কার কাপড় বা তোয়ালে দিয়ে মুড়ে রাখুন।

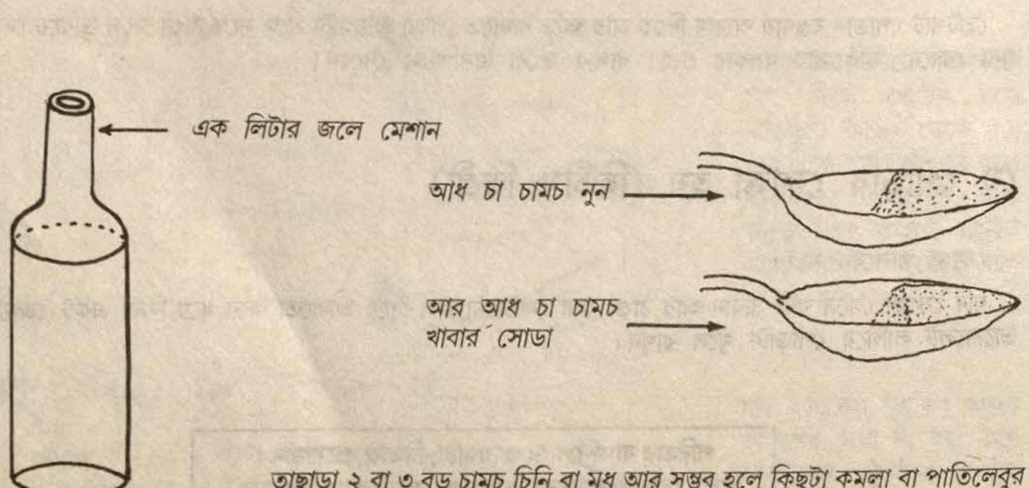
যদি ডাক্তারি সাহায্য পাওয়া অসম্ভব হয়, আগে যেমন বলা হয়েছে, সেইভাবে পোড়াটার চিকিৎসা করুন। কিছুটা জেনসিয়ান ভায়োলেট লাগিয়ে পোড়াটা খোলা বাতাসে রাখুন—শুধু ধুলো আর মাছি থেকে বাঁচাবার জন্যে আলগা সুতির কাপড় বা চাদর দিয়ে ঢেকে দেবেন। কাপড়টা খুব পরিষ্কার রাখবেন, আর যতবার পোড়া থেকে বার হওয়া রস বা রক্তে নোংরা হয়ে যাবে, ততবার বদলে দেবেন। পেনিসিলিন দিন।

কখনো পোড়ার ওপর তেল, চর্বি, চামড়া, কফি, গাছগাছড়া বা মল লাগাবেন না।

খুব সাংঘাতিক পোড়ার জন্যে বিশেষ সাবধানতা

খুব খারাপ ভাবে পুড়ে গেলে যে কোনো লোকের *শক* হতে পারে (পৃঃ ৮৯)। যন্ত্রণা, ভয় আর পোড়া থেকে রস বেরিয়ে শরীরের জল বেরিয়ে যাওয়া—এই সব মিলে এটা হয়।

যে পুড়ে গেছে, তাকে সান্ত্বনা আর আশ্বাস দেবেন। ব্যথার জন্যে *প্যারাসিটামল*, আর কোডিন পাওয়া গেলে তাও, দিন। অল্প নুন দেয়া জলে খোলা ক্ষত ধুয়ে দিলেও ব্যথায় আরাম দিতে সাহায্য করে। প্রতি এক লিটার ঠাণ্ডা করা ফোটানো জলে ১ চা চামচ নুন দেবেন। পোড়ার রোগীকে প্রচুর তরল খাবার দিন। পোড়া জায়গাটা যদি বড় হয় (রোগীর হাতের মাপের দুগুনের বেশি), নিচের সরবৎটা তৈরি করুন:



তাছাড়া ২ বা ৩ বড় চামচ চিনি বা মধু আর সম্ভব হলে কিছুটা কমলা বা পাতিলেবুর রস।

পোড়ার রোগীর, এই সরবৎ যত ঘনঘন পারা যায়, খাওয়া উচিত—বিশেষ করে যতক্ষণ না তার বারবার পেচ্ছাপ হচ্ছে।

যারা খারাপ ভাবে পুড়ে গেছে তাদের প্রোটিনে ভরা খাবার খাওয়া দরকার (পৃঃ ১২৮)। অন্য সব খাবারও তারা খেতে পারে।

গাঁটের চারদিকে পোড়া

আঙুলের ফাঁকে, বগলে, বা অন্য গাঁটের জায়গায় খারাপ ভাবে পুড়ে গেলে, পোড়া জায়গাগুলো শুকিয়ে যাবার সময় যাতে একসঙ্গে জুড়ে না যায়, সেই জন্যে সেগুলোর মাঝখানে ভেসলিন দেয়া গজের প্যাড লাগিয়ে দেয়া উচিত। তাছাড়া, ঘা শুকোবার সময়, দিনে কয়েকবার আঙুল, হাত আর পা একেবারে সোজা করে দেয়া উচিত। এটা যন্ত্রণাদায়ক. কিন্তু গজানো চামড়া শক্ত হয়ে গিয়ে নড়াচড়ার যে অসুবিধে হয়, সেটা এতে এড়ানো যায়।



হাড় ভেঙে যাওয়া (ফ্র্যাকচার)

হাড় ভেঙে গেলে যা সব থেকে জরুরি, তা হল **হাড়টাকে একভাবে রাখা**। এতে আরো ক্ষতি হওয়া এড়ানো যায় আর হাড়টা জুড়ে যাবার সুযোগ পায়।

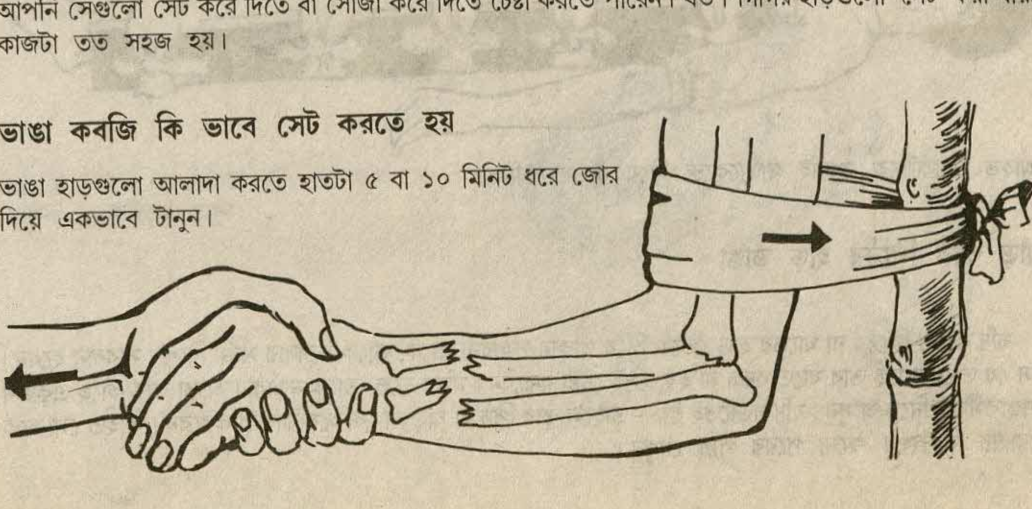
যার হাড় ভেঙে গেছে, তাকে সরাবার বা বয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করার আগে হাড়গুলো যাতে না নড়ে যায় তার জন্যে তক্তা, গাছের ছাল বা পিজবোর্ডের টুকরো লাগিয়ে নিন। পরে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্লাস্টার করে দেয়া যেতে পারে বা আপনি নিজে স্থানীয় পদ্ধতিতে একটা কাস্ট (জমে শক্ত হয়ে যাওয়া জিনিস) তৈরি করে নিতে পারেন।

ভাঙা হাড় 'সেট' করা (ঠিকভাবে লাগিয়ে দেয়া): যদি মনে হয়, হাড়গুলো মোটামুটি ঠিক জায়গায় আছে, সেগুলো না নড়ানোই ভাল—নড়ালে উপকারের থেকে ক্ষতিই বেশি হতে পারে।

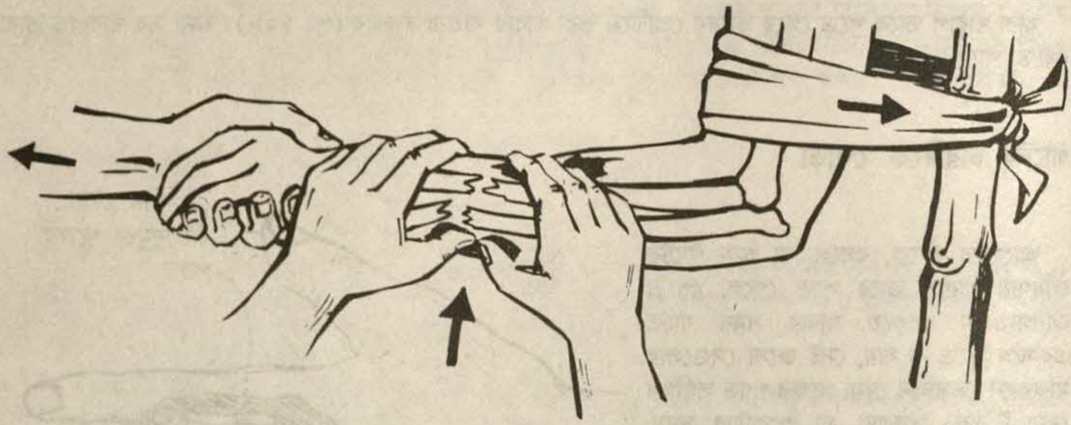
যদি হাড়গুলো নিজ জায়গা থেকে অনেকটা সরে গিয়ে থাকে, আর ভাঙাটা টাটকা হয়, প্লাস্টার লাগনোর আগে আপনি সেগুলো সেট করে দিতে বা সোজা করে দিতে চেষ্টা করতে পারেন। যত শিগগির হাড়গুলো 'সেট' করা যায়, কাজটা তত সহজ হয়।

ভাঙা কবজি কি ভাবে সেট করতে হয়

ভাঙা হাড়গুলো আলাদা করতে হাতটা ৫ বা ১০ মিনিট ধরে জোর দিয়ে একভাবে টানুন।



তারপর, একজন হাতটা টেনেই থাকবে, আর সেই সময়ে অন্য একজন সাবধানে হাড়গুলো এক লাইনে এনে সোজা করে দেবে।



সাবধান: হাড় সেট করার চেষ্টা করতে গিয়ে অনেক ক্ষতি করে ফেলতে পারেন। সবচেয়ে ভালো হয় যদি এই কাজে অভিজ্ঞ কোনো লোকের সাহায্য পাওয়া যায়।

ভাঙা হাড় জোড়া লাগতে কত সময় লাগে?

ভাঙাটা যতটা খারাপ হয়, আর রোগীর বয়স যত বেশি হয়, জুড়তে তত বেশি সময় লাগে। শিশুদের হাড় চট করে জুড়ে যায়। বুড়োমানুষের হাড় কখনো কখনো একেবারেই জোড়ে না। হাত ভেঙে গেলে প্রায় এক মাস প্লাস্টার করে রাখা উচিত, আরো একমাস তাতে কোনো জোর দেয়া উচিত নয়। পা ভেঙে গেলে প্রায় দু মাস প্লাস্টারে রাখা উচিত।

উরুর হাড় ভাঙা

উরুর হাড় ভাঙলে সাধারণতঃ বিশেষ যত্ন লাগে। এইভাবে সমস্ত শরীরটা তক্তা দিয়ে বেঁধে রাখলে সব থেকে ভালো হয়:



আহত লোকটিকে তখনই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া উচিত।

ঘাড় আর পিঠের হাড় ভাঙা

যদি কারো পিঠের বা ঘাড়ের হাড় ভেঙে গিয়ে থাকার সম্ভাবনা থাকে, তাকে নড়াবার সময় বিশেষ সাবধান হবেন। সে যে ভাবে আছে তার যাতে বদল না হয়, সেই চেষ্টা করবেন। সম্ভব হলে, তাকে নড়াবার আগে তার কাছে একজন স্বাস্থ্যকর্মীকে নিয়ে আসুন। যদি নড়াতেই হয়—তাহলে তার পিঠ বা ঘাড় না বেঁকিয়ে কাজটা করবেন। আহত লোককে সরাবার নির্দেশের জন্যে পরের পৃষ্ঠা দেখুন।

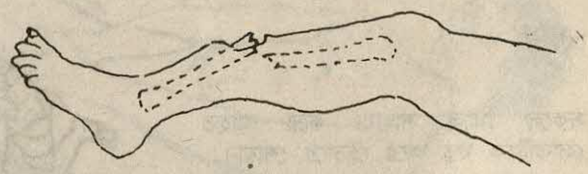
ভাঙা পাঁজর

এটা খুব যন্ত্রণাদায়ক, কিন্তু প্রায় সবসময়ই নিজে থেকে জুড়ে যায়। বুকে তক্তা দিয়ে বা অন্যভাবে না বাঁধাই ভালো। সব থেকেভালোচিকিৎসা হল এসপিরিন খাওয়া—আর বিশ্রাম নেয়া। ব্যথাটা সম্পূর্ণ যেতে কয়েক মাস লাগতে পারে।

পাঁজরের হাড় ভাঙলে সাধারণতঃ ফুসফুসে ফুটো করে না। কিন্তু লোকটির যদি কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠে বা শ্বাসকষ্ট হয়, তবে এনটিবায়োটিক (পেনিসিলিন বা এমপিসিলিন) ব্যবহার করুন আর ডাক্তারি সাহায্য নিন।

যে ভাঙা হাড় চামড়া কেটে বার হয়ে আসে (ওপন, কম্পাউণ্ড বা জটিল ফ্র্যাকচার)

এই সব ক্ষেত্রে সংক্রমণের বিপদ খুবই বেশি বলে এই সব আঘাতের চিকিৎসায় স্বাস্থ্যকর্মী বা ডাক্তারের সাহায্য নেয়া সবসময়ই ভালো। ক্ষত আর বেরিয়ে আসা হাড় ফোটানো জল দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে দিন। **যতক্ষণ না ক্ষত আর হাড় সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হয়, কখনো হাড়টা ক্ষতের মধ্যে আবার ঢুকিয়ে দেবেন না।**



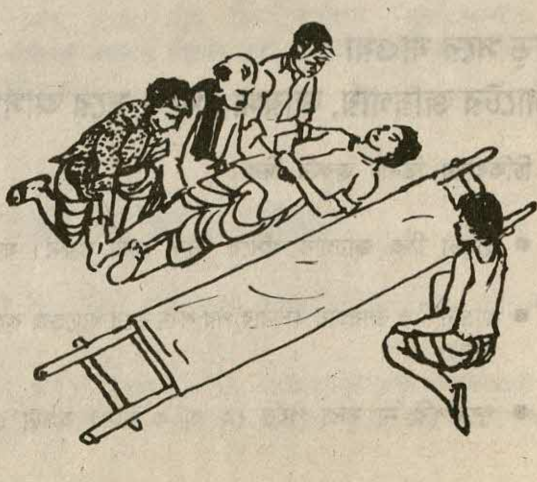
আঘাত যাতে না বেড়ে যায় তার জন্যে ভাঙা হাত বা পা তক্তা দিয়ে বেঁধে দিন।

হাড় ভেঙে চামড়া ছিঁড়ে বেরিয়ে এলে সংক্রমণ এড়াতে তখনই একটা এনটিবায়োটিক : বেশি মাত্রায় পেনিসিলিন বা এমপিসিলিন দিন (পৃঃ ৩৯৭ আর ৩৯৯)।

> **সাবধান :** হাত বা পা ভেঙে গেলে বা ভেঙেছে বলে মনে হলে কখনো সেটা রগড়াবেন না বা মালিশ করবেন ন।

সাংঘাতিক ভাবে আহত লোককে কি ভাবে সরাবেন

কোনো জায়গা না বেঁকিয়ে, খুব যত্ন করে আহত লোকটিকে তুলুন।





অন্য একজনকে দিয়ে স্ট্রেচারটা ঠিক জায়গায় রাখান।



সকলে মিলে সাহায্য করে আহত লোকটিকে যত্ন করে স্ট্রেচারে শোয়ান।



ঘাড়ে যদি আঘাত থাকে বা ভেঙে থাকে, তবে মাথাটা যাতে না নড়ে সে জন্যে মাথার দুদিকে বালিভর্তি থলি বা আঁট করে ভাঁজ করা কাপড় রাখুন।

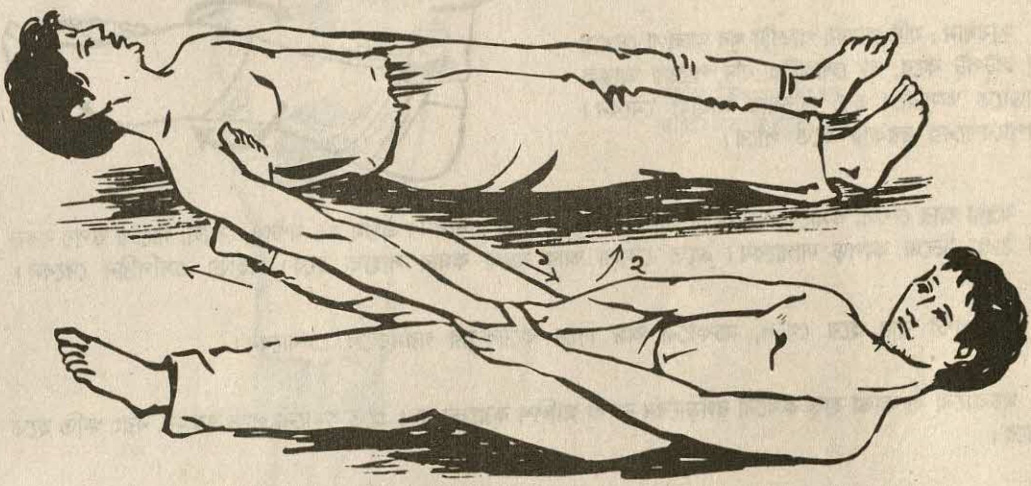
হাড় সরে যাওয়া
(গাঁটের জায়গায়, জায়গা থেকে সরে আসা হাড়)

চিকিৎসার তিনটি জরুরি দিক :

- হাড়টা ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিতে চেষ্টা করুন। **যত তাড়াতাড়ি হয় তত ভালো।**
- হাড়টা ঠিক জায়গায় বসাবার পর শক্ত করে ব্যাণ্ডেজ করে রাখুন যাতে আবার পিছলে না সরে যায় (প্রায় এক মাস)।
- পুরোপুরি না সারা পর্যন্ত (২ বা ৩ মাস) অঙ্গটা জোর দিয়ে ব্যবহার করা বন্ধ রাখুন।

কাঁধের হাড় সরে গেলে কি ভাবে সেট করতে হয়:

আহত লোকটির পাশে মাটিতে শুয়ে পড়ুন। আপনার খালি পা তার বগলে রেখে যেমন দেখানো হয়েছে (১), তার শরীরের সঙ্গে ত্যারছাভাবে ১০ মিনিট ধরে ধীরে ধীরে নিচের দিকে টানুন।



তারপর আপনার পা দিয়ে হাড়টা ঠিক জায়গায় রেখে তার হাতটা তার শরীরের আরেকটু কাছে দুলিয়ে নিয়ে যান (২)। কাঁধটা টক্ করে ঠিক জায়গায় চলে যাবে।



কাঁধটা ঠিক জায়গায় বসে গেলে, হাতটা শরীরের সঙ্গে শক্ত করে ব্যাণ্ডেজ করে দিন। এক মাস ব্যাণ্ডেজ করে রাখুন। কাঁধটা যাতে একেবারে শক্ত না হয়ে যায়, তার জন্যে বয়স্ক লোকদের উচিত প্রতিদিন ৩ বার করে কয়েক মিনিটের জন্যে ব্যাণ্ডেজটা খুলে, হাতটা পাশে ঝুলিয়ে, ধীরে ধীরে সেটা ঘোরানো।

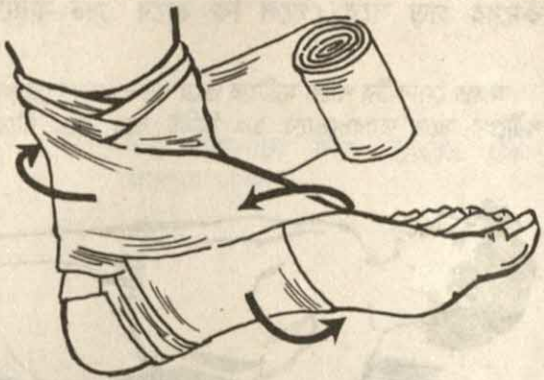
যদি সরে যাওয়া হাড় ঠিক জায়গায় নিয়ে আসতে না পারেন—তখনই ডাক্তারি সাহায্য নেবেন। যত দেরি করবেন, ঠিক করা ততই কঠিন হবে।

টান ধরা আর মচকে যাওয়া
(মুচড়ে যাওয়া গাঁটে কালসিটে পড়া বা ছিঁড়ে যাওয়া)

হাত বা পায়ে কালসিটে পড়েছে, মচকে গেছে না ভেঙে গেছে—তা বোঝা অনেক সময় সম্ভব নয়। তখন একস রে করলে সুবিধে হয়।

তবে সাধারণতঃ ভাঙা আর মচকানোর চিকিৎসা মোটামুটি একই। গাঁটটা অনড়ভাবে রাখুন। শক্তভাবে ধরে রাখবার মত করে কিছু দিয়ে বাঁধুন। সাংঘাতিক মচকানো সারাতে অন্ততঃ ৩ বা ৪ সপ্তাহ লাগে। হাড় ভাঙলে আরো বেশি সময় লাগে।

যে গাঁটটা মুচড়ে গেছে সেটা সারাবার জন্যে ঠিকভাবে রাখতে একটা ইলাস্টিক ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার করতে পারেন। এখানে যেমন দেখানো হয়েছে মুচড়ে যাওয়া পায়ের গোড়ালি সেইভাবে জড়িয়ে দেবেন।

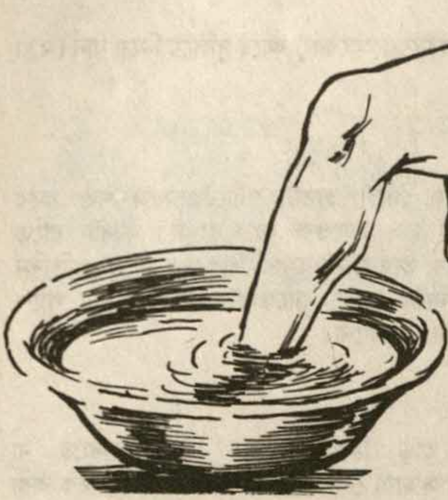


সাবধান : যদি পায়ের পাতাটা খুব আলগা দেখায় বা লট্‌পট্ করে, বা লোকটির যদি পায়ের আঙুল নাড়াতে অসুবিধে হয়, ডাক্তারি সাহায্য নেবেন। অপারেশনের দরকার হতে পারে।

যন্ত্রণা আর ফোলা কমাতে, মচকে যাওয়া অঙ্গ উঁচুতে তুলে রাখবেন। প্রথম ২৪ ঘণ্টায়, ফোলা গাঁটের ওপর বরফ বা ঠাণ্ডা ভিজে কাপড় লাগাবেন। এতে ফোলা আর যন্ত্রণা কমার সাহায্য হবে। এছাড়া এসপিরিন দেবেন।

২৪ ঘণ্টা পার হয়ে গেলে, মচকানো অঙ্গ দিনে কয়েকবার গরমজলে চোবাবেন।

মচকানো বা ভাঙা হাড় কখনো রগড়াবেন না বা মালিশ করবেন না। এতে কোনো লাভ হয় না, বরং ক্ষতি হতে পারে।



প্রথম দিন মচকানো গাঁট বরফ জলে চোবান।



প্রথমদিনের (২৪ ঘণ্টার) পর গরম জলে চোবান।

বিষক্রিয়া

বিষাক্ত জিনিস খেয়ে অনেক ছেলেপিলে মারা যায়। আপনার ছেলেপিলেদের বাঁচাতে নিচের সাবধানতাগুলো নিন :



কেরোসিন, পেট্রোল বা অন্য বিষাক্ত জিনিস কখনো সোডা বা অন্য তরল খাবারের বোতলে রাখবেন না, কারণ ছোটরা সেগুলো খেতে চেষ্টা করতে পারে।



সমস্ত বিষ ছোটদের নাগালের বাইরে রাখুন:

কিছু কিছু সাধারণ বিষের দিকে নজর রাখা উচিত:

- ইঁদুর মারা বিষ
- ডি ডি টি, লিনডেন, জানোয়ারের গা ধোয়ার ওষুধ এবং অন্যান্য পোকামাকড় মারার ওষুধ
- ওষুধ (যে কোনো ওষুধ বেশি খেয়ে ফেললে; **আয়রনের বড়ি সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন নেবেন**)।
- টিংচার আয়োডিন
- ক্ষার আর কাপড় কাচার বা বাসন ধোয়ার গুঁড়ো সাবান
- সিগারেট
- কাঠের বার্নিস বা মেথিলেটেড্ স্পিরিট
- বিষাক্ত পাতা, বীজ বা ফল
- রং
- না পোড়া দেশলাই কাঠি—ডগাগুলো বিষাক্ত
- কেরোসিন, ডিজেল আর পেট্রোল
- উগ্র ক্ষার

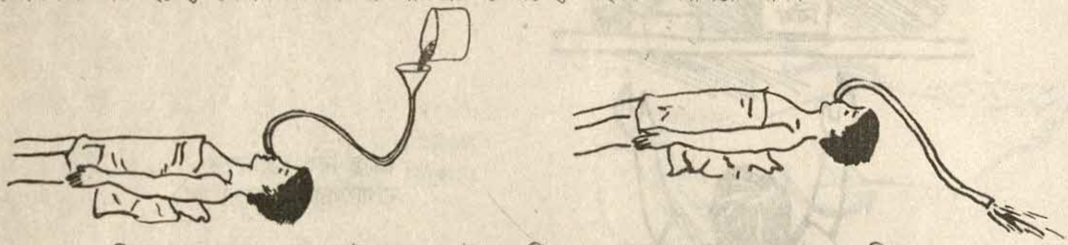
চিকিৎসা:

যদি কেউ বিষ খেয়েছে বলে সন্দেহ হয় **তখনই** এই কাজগুলি করুন:

লোকটির জ্ঞান থাকলে:

* তাকে বমি করান। তার গলায় আপনার আঙুল দিয়ে দিন বা তার গলার পেছনদিকে একটা **চামচ** দিয়ে সুড়সুড়ি দিন, বা তাকে অনেকটা নুন মিশিয়ে গরম জল খাওয়ান।

* যদি লোকটি বমি না করে, তাকে খাটে শোয়ান। একটা চপচপে করে তেল মাখানো স্টমাক টিউব (পেটে লাগানোর নল) লোকটির মুখ দিয়ে ঢুকিয়ে দিন। নলের অন্য মুখে ফানেলের মধ্যে দিয়ে ১ বা ২ লিটার জল ঢেলে দিন। তারপর সে দিকটা খাটের নিচে নাবিয়ে দিন। পেটের ভেতরের তরল জিনিস বেরিয়ে আসবে। যে তরল জিনিসটা বার হচ্ছে, সেটা যতক্ষণ না পরিষ্কার দেখাচ্ছে, এইরকম চালিয়ে যান।



* লোকটি যত পারে তাকে ততটা দুধ, ফেটানো ডিম বা ময়দা গোলা জল খেতে দিন। আপনার কাছে কাঠকয়লার গুঁড়ো (পৃঃ ৪২২) থাকলে তাকে ১ বড় চামচ ভর্তি দিন। লোকটিকে আরো দুধ, ডিম বা ময়দাগোলা জল দিয়ে যান আর বমি করাতে থাকুন যতক্ষণ না বমিটা পরিষ্কার দেখায়।

লোকটি অজ্ঞান হয়ে গেলে:

তাকে বমি করাবেন না। শ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকলে মুখে মুখ দিয়ে শ্বাস দিন। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারি সাহায্য নিন।

সাবধান: কেরোসিন, ডিজেল, পেট্রোল, কড়া এসিড ব উগ্র ক্ষারের মত ক্ষয়কর কিছু খেলে লোকটিকে বমি করাবেন না। লোকটির শীত করলে তাকে ঢেকে দিন—কিন্তু বেশি গরম যেন না হয়। **বিষক্রিয়া সাংঘাতিক হলে ডাক্তারি সাহায্য নিন।**

পেস্টিসাইড বা পোকামারা ওষুধ থেকে বিষক্রিয়া:

পেস্টিসাইড হল পোকামাকড়, ইঁদুর, আগাছা ইত্যাদি যেসব ক্ষতিকর জীব শস্য ধ্বংস করে বা রোগ ছড়ায় (মাছি, মশা) সেগুলোকে তাড়াবার বা মেরে ফেলবার ওষুধ। এইসব ওষুধ হেলাফেলা করে, দরকারি সাবধানতা না নিয়ে ব্যবহার করলে, বা এগুলো ছড়াবার সময় নিজের নাক আর মুখ না ঢাকলে, অথবা বাড়িতে এইসব ওষুধ ছড়াবার সময় সমস্ত খাবার আর জল ঢেকে না রাখলে, বিষক্রিয়া হয়।

পেস্টিসাইডের বিষক্রিয়ার লক্ষণ:

* মাথাধরা
* বমি
* পেটে ব্যথা
* খিচুনি
* শকের লক্ষণ (পৃঃ ৮৯)
* শ্বাসকষ্ট
* জ্ঞান হারানো

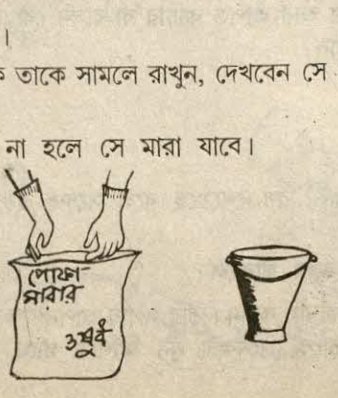
সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক প্রতিবিধান না করলে, লোকটি মারা যাবে।

পেস্টিসাইডের বিষক্রিয়া হলে কি করতে হয়:

* আর বিষ যাতে না লাগে, সেইজন্যে লোকটিকে সরিয়ে নিন।
* খিচুনি হলে তাকে ঘুমের ওষুধ (পৃঃ ৪২২) দিন আর জখম থেকে তাকে সামলে রাখুন, দেখবেন সে যেন জিভ কামড়ে না ফেলে।
* **তাকে শীগগির স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান।** সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা না হলে সে মারা যাবে।

বিষক্রিয়া কি ভাবে এড়াতে হয়:

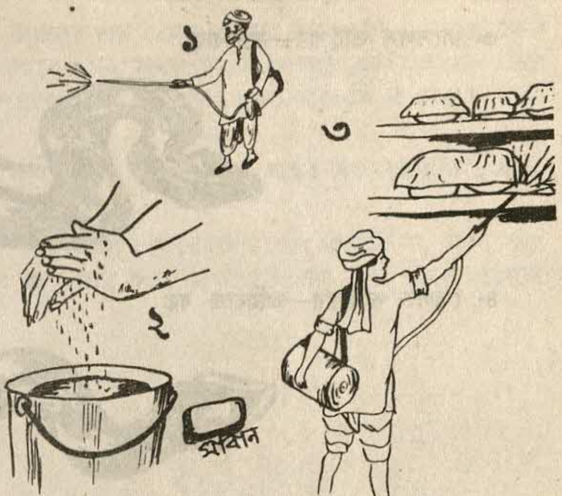
* পেস্টিসাইড নিয়ে নাড়াচাড়া করবার সময় রবারের দস্তানা পরবেন বা হাত দুটি প্লাস্টিকে মুড়ে রাখবেন



* পেস্টিসাইড যদি স্প্রে করেন, কাপড় দিয়ে নাক আর মুখ ঢেকে রাখবেন।

* কোনো পেস্টিসাইড নাড়াচাড়া করবার পরে সাবান আর জল দিয়ে ভালো করে হাত ধুয়ে নেবেন।

* বাড়িতে পেস্টিসাইড দিয়ে স্প্রে করার সময় সমস্ত খাবার আর খাবার জল ঢেকে রাখবেন।



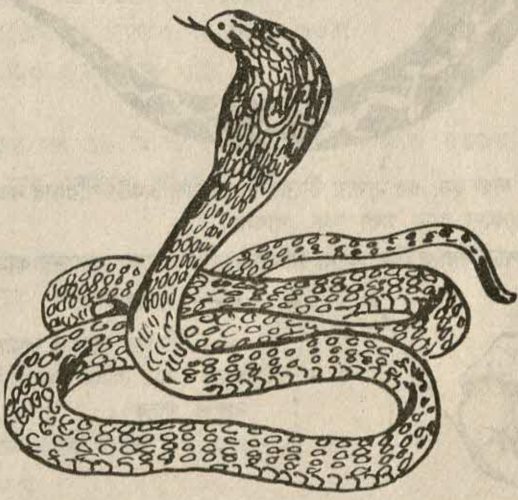
> চামড়া দিয়ে ঢুকে পড়ে পোকা মারার ওষুধ যত ;
> খালি হাতে নাড়লে ও বিষ, বিপদ ঘটে অবিরত।

সাপের কামড়

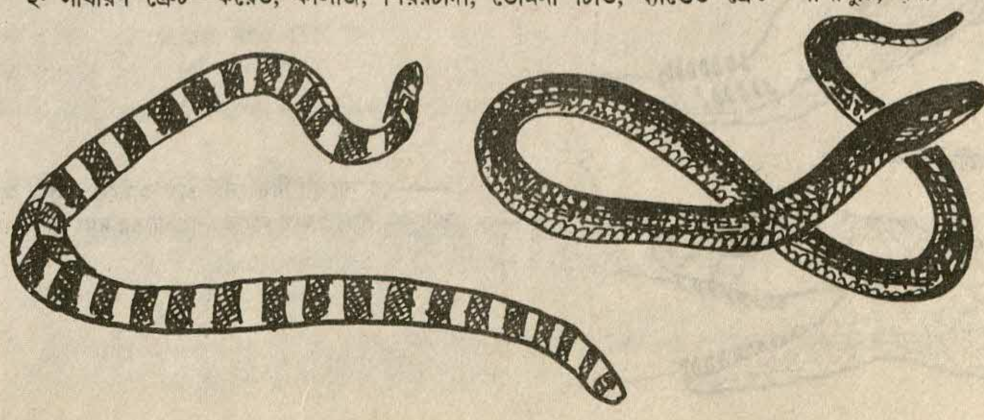
সব সাপ বিষাক্ত নয়, তারা মানুষের থেকে জোরে দৌড়তেও পারে না—যদিও সাধারণতঃ এইরকমই বিশ্বাস করা হয়।

ভারতবর্ষে সাধারণতঃ মাত্র চার রকম বিষাক্ত সাপ দেখা যায়।

১· সাধারণ কোবরা—গোখরো, কেউটে, বা তোঁপ



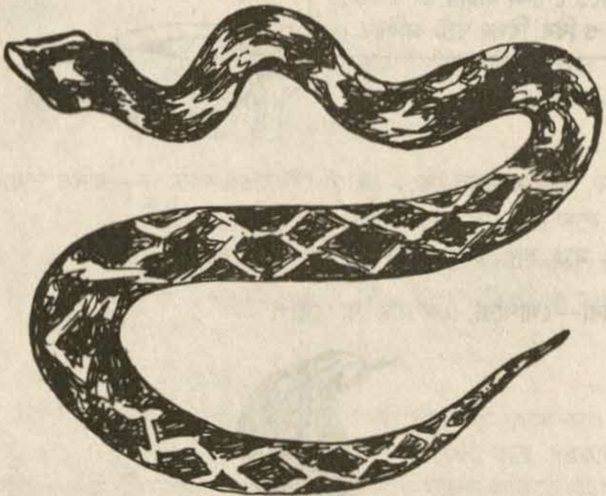
২· সাধারণ ক্রেট—করেত, কালাজ, শিয়রচাঁদা, ডোমনা চিতি, ব্যাণ্ডেড ক্রেট—শাঁখামুটি, রনা



৩· রাসেলস ভাইপার—চন্দ্রবোড়া



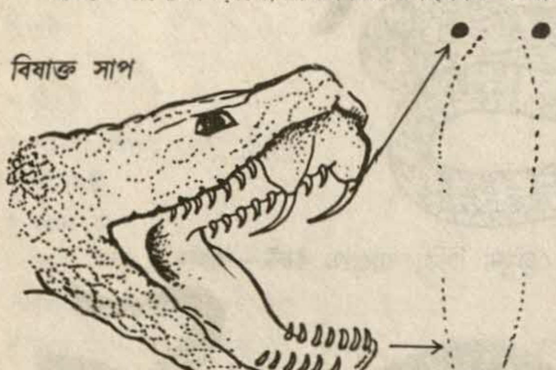
৪· স্কেলড ভাইপার—অহিরাজ বঙ্ক



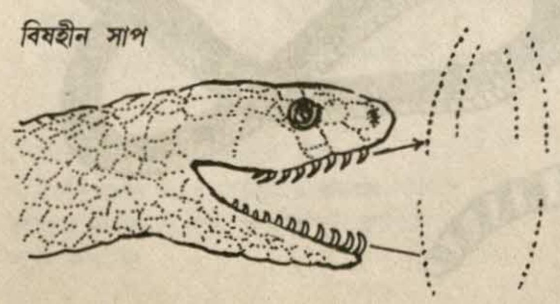
এই সাপটা এক ফুটেরও কম লম্বা হয়, এর মাথায় তীরের ফলার মত একটা পরিষ্কার নকসা থাকে। চন্দ্রবোড়া আর বঙ্ক দুটো সাপেরই মাথা তিনকোণা আর গলা সরু, পাৎলা।

কাউকে সাপে কামড়ালে, সাপটা বিষাক্ত ছিল কি না জানবার চেষ্টা করবেন। তাদের কামড়ের দাগে তফাৎ আছে।

বিষাক্ত সাপ



বিষহীন সাপ



বেশির ভাগ সময়, ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, কামড়ের দাগ তেমন পরিষ্কার ভাবে পড়ে না। শুধু একটা বিষদাঁতের দাগ বা শুধু একসারি সাধারণ দাঁতের দাগ থাকতে পারে, অথবা ক্ষতের জায়গায় একটা অসমান ছেঁড়া থাকতে পারে। সন্দেহ হলে, সেই জায়গাটায় বা সাধারণভাবে শরীরে বিষক্রিয়ার লক্ষণ আছে কি না দেখবেন, আর লোকটিকে অন্ততঃ একদিন নজরে রাখবেন।

গোখরো আর করেতের বিষ শরীরের স্নায়ু ব্যবস্থার ক্ষতি করে। চন্দ্রবোড়া আর বঙ্কের বিষ রক্তের ক্ষতি করে, রক্তকে জমাট বাঁধতে দেয় না।

লোকে অনেক সময় অনেক নিরীহ সাপকে বিষাক্ত বলে বিশ্বাস করে। বিষহীন সাপ মারবেন না, কারণ তারা কোনো ক্ষতি করে না। বরং, ইঁদুর ইত্যাদি যে সব জীব প্রচুর ক্ষতি করে, সেগুলোকে এরা মেরে ফেলে। কোনো কোনো সাপ এমনকি বিষাক্ত সাপকেও মারে।

বিষাক্ত সাপের কামড়ের লক্ষণ:

সাপের কামড়ের জায়গায়: স্থানীয় লক্ষণ

কামড়ের পর ১৫ থেকে ২০ মিনিটের মধ্যে এই লক্ষণগুলো দেখা দেয়।

* যন্ত্রণা—বেশ জোর হতে পারে আর অনেক দিন থাকতে পারে।
* ফোলা—রক্তে কতটা বিষ ঢুকেছে তার ওপর নির্ভর করে। চন্দ্রবোড়া বা বঙ্কের কামড়ের বেলায়, কামড়ের জায়গায় যন্ত্রণা আর ফোলা অনেক বেশি হয়।
* কামড় থেকে রক্তপাত: চন্দ্রবোড়া আর বঙ্কের কামড়ে এটা বেশি দেখা যায়।
* কামড়ের জায়গার চারিদিকের চামড়ার রং বদলে যাওয়া
* সংক্রমণ এবং পচা ঘাও হয়ে যেতে পারে

সাধারণ লক্ষণ: কামড়ের পর ১৫ মিনিট থেকে এক ঘন্টার মধ্যে এগুলো হয়

গোখরো আর করেত স্নায়ু ব্যবস্থাকে আক্রমণ করে—

* ঘুমঘুম ভাব
* পেশীর দুর্বলতা, বিশেষ করে চোখের চারদিকের পেশীতে। লোকটি সব জিনিস দুটো করে দেখতে (ডবল দেখা) আর টেরা হয়ে যেতে পারে।
* পেশীতে পক্ষাঘাত
* শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যেতে পারে

চন্দ্রবোড়া আর বঙ্ক রক্ত জমে যাওয়া বন্ধ করে—

* মাথা ধরা, মাথা ঘোরা
* গা বমি বমি, বমি হওয়া
* কাশির সঙ্গে রক্তের ছিটে দেয়া কফ
* চামড়ার নিচে রক্তপাত
* রক্তপাত খুব বেশি হলে শকের লক্ষণ (পৃঃ ৮৯)

বিষাক্ত সাপের কামড়ের চিকিৎসা:

১· **রোগীকে শান্ত রাখুন, যে জায়গায় কামড়েছে সেখানটা নড়াবেন না।** যত নড়ানো হবে, বিষটা তত তাড়াতাড়ি সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়বে। পায়ে কামড়ালে হাঁটা চলা করা উচিত নয়, যদি পারা যায়—এক পাও নয়। লোকটিকে স্ট্রেচারে করে বয়ে নিয়ে যাবেন।

২· কামড়ের একটু ওপরে হাত বা পায়ের চারদিকে কাপড় দিয়ে বাঁধন দিন। খুব বেশি শক্ত করে বাঁধবেন না, আর আধ ঘন্টা পর পর ১ মিনিটের জন্যে আলগা করে দেবেন।



৩· খুব পরিষ্কার ছুরি দিয়ে (আগুনের শিখায় জীবাণুমুক্ত করে নিয়ে) প্রত্যেক বিষদাঁতের দাগের মধ্যে কেটে দিন : প্রায় ১ সেঃ মিঃ লম্বা আর ½ সেঃ মিঃ গভীর করে।

৪· তারপর, যদি আপনার মুখে বা দাঁতে ঘা না থাকে, তাহলে ১৫ মিনিট ধরে বিষটা শুষে নিন আর থুথু ফেলে বার করে দিন।



দ্রষ্টব্য : কামড়ানোর পরে আধঘণ্টার বেশি সময় কেটে গেলে কামড়ের জায়গা কেটে দেবেন না বা শুষবেন না। তাতে উপকারের থেকে ক্ষতিই বেশি হতে পারে।

৫· যদি আগে যে সব সাধারণ লক্ষণের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে কোনোটি দেখা দেয়, **এনটিভেনিনের** ইনজেকশন দিন—ওষুধের সঙ্গে যে নির্দেশগুলো দেয়া থাকে, সেগুলো সাবধানে মেনে চলবেন। লোকটির যাতে **এলার্জির শক** (পৃঃ ৮৩) না হয়, তার জন্যে, তাকে চামড়ার নিচে ½ সি সি **এড্রেনালাইনের** ইনজেকশন দিয়ে দিন। কামড়ানোর ৩ ঘণ্টার মধ্যে ইনজেকশন দিলে এনটিভেনিনে সব থেকে বেশি কাজ হয় (গোখরোর মতো কিছু সাপের বেলায় সঙ্গে সঙ্গে দেয়া দরকার)।

৬· যদি বরফ পাওয়া যায়, মোটা কাপড়ে কয়েকটুকরো মুড়ে যে জায়গায় কামড়েছে তার চারপাশে গুঁজে দেবেন।

৭· ধনুষ্টঙ্কার এড়াতে টিটেনাস টকসয়েডের ইনজেকশন দিন।

৮· সংক্রমণের লক্ষণ দেখা দিলে, পেনিসিলিন ব্যবহার করুন।

বিষাক্ত সাপের কামড় বিপজ্জনক। **সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারি সাহায্য চাইতে পাঠান—তবে** ওপরে যে সব জিনিস বলা হয়েছে সেগুলো **তখনই** করে যান।

সাপের কামড়ের বেশির ভাগ টোটকা চিকিৎসা বিশেষ কিছু কাজ করে না (পৃঃ ৩)। সাপে কামড়ানোর পর কখনো **মদ খাবেন না।** তাতে অবস্থা আরো খারাপ হবে।

দ্রষ্টব্য : ওপরে যে সব সাপের কামড়ের কথা বলা হয়েছে সেগুলোতে পলিভ্যালেণ্ট এনটিভেনিন কাজ দেয়, এটা আপনি পাবেন এইখানে :

হ্যাফকিন ইনস্টিটিউট
আচার্য ডান্ডে মার্গ
বম্বে ৪০০০১২

সাপে কাউকে কাটার আগেই—
তৈরি রাখুন এনটিভেনিন।
ব্যবহারের নিয়মগুলো
আগেভাগেই ঠিক জেনে নিন।

গোসাপ

ভারতবর্ষে প্রায় ৬ রকম গোসাপ আছে। এগুলো প্রায় ২ থেকে ৩ ফুট লম্বা হয়। এদের খুব শক্ত নখ থাকে আর এরা খুব জোরে আঁকড়ে ধরতে পারে। এদের জিভ সাপের মত চেরা।

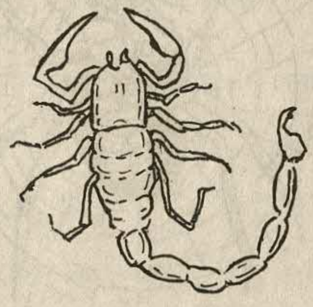
গোসাপের বিষ নেই।

অনেকে বিশ্বাস করে যে গোসাপের নিশ্বাসও বিষাক্ত, বিশেষ করে বিষকোপরা বলে একটা জাতের। কিন্তু এটা ভুল।

চিকিৎসা :

এনটিভেনিনের কোনো দরকার নেই। যাকে কামড়েছে তার কথাটা ধৈর্য ধরে শুনে তাকে আশ্বাস দেয়া দরকার। তার নিজের ভয় থেকেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে (পৃঃ ৪, যে সব বিশ্বাস থেকে লোকে অসুস্থ হয়ে পড়ে)।

কাঁকড়া বিছের হুল ফোটানো



কিছু কাঁকড়া বিছে অন্যগুলোর থেকে অনেক বেশি বিষাক্ত। ৫ বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েদের বেলায় কাঁকড়া বিছের হুল ফোটানো বিপজ্জনক হতে পারে, বিশেষতঃ যদি মাথায় বা শরীরে (ধড়ে) ফোটানো হয়।

বয়স্কদের বেলায় প্রথম বারেরটা কদাচিৎ বিপজ্জনক হয়। কিন্তু দ্বিতীয়বার হলে, তাড়াতাড়ি চিকিৎসা না করলে লোকটি মারা যেতে পারে। প্রথম বারের ফোটানোর পর শরীরের ওতে এলার্জি হয়ে যায়। তাই তাকে আগে কখনো কাঁকড়া বিছে হুল ফুটিয়েছে কি না সেটা জানা জরুরি। লোকটির সাধারণতঃ শকের লক্ষণ (পৃঃ ৮৩) দেখা দেয় বা হার্ট ঠিকমত কাজ করে না (পৃঃ ৩৭১) আর তার কাশির সঙ্গে রক্ত বার হয়।

বিছে হুল ফোটালে কি করবেন :

যদি বয়স্ক লোকের বেলায় প্রথম বার হয়, নিচের কাজগুলো করুন :

* এসপিরিন দিন, সম্ভব হলে ফোটানোর জায়গায় বরফ দিন, জায়গাটার চারপাশে নোভোকেইন ইনজেকশন (১ থেকে ৫ মিঃ লিঃ) দিন। এতে ব্যথা কমার সাহায্য হয়, তবে শুধু সাময়িক ভাবে কমাতে পারে।
* এনটিহিস্টামাইনের বড়িও দেয়া যেতে পারে। বিশদ বিবরণের জন্যে সবুজপৃষ্ঠাগুলি দেখুন।

বয়স্ক লোককে যদি দ্বিতীয়বার হুল ফোটানো হয় বা যদি ৫ বছরের কম বয়সের শিশুকে হুল ফোটানো হয় নিচের কাজগুলি করবেন :

* তাড়াতাড়ি ডাক্তারি সাহায্য নিন।
* শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে মুখে মুখ দিয়ে শ্বাস দিন (পৃঃ ৯২)।
* যদি লোকটির শক হয়ে থাকে, শকের চিকিৎসা করবেন (পৃঃ ৮৩)।
* যাকে হুল ফোটানো হয়েছে সে যদি খুব কচি শিশু হয়, বা তার শরীরের জরুরি কোনো অংশে ফোটানো হয়ে থাকে, অথবা হুল ফোটানোটা যদি দ্বিতীয়বার হয়—তাড়াতাড়ি ডাক্তারি সাহায্য নিন।

বয়স্কদের বেলায় কাঁকড়াবিছের প্রথমবারের কামড়ের উপকারী ঘরোয়া চিকিৎসার জন্যে পৃঃ ১৮ দেখুন।

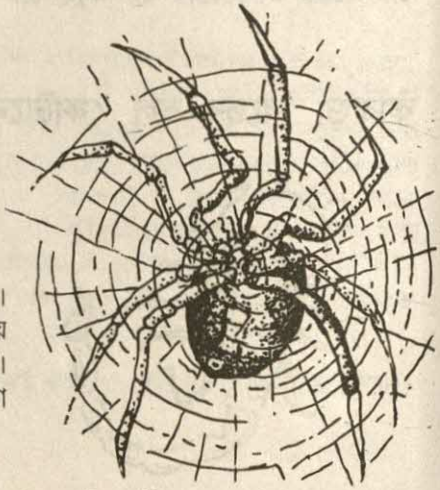
মৌমাছি আর বোলতার হুল ফোটানো :

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই হুল ফোটানো বিপজ্জনক নয়, কিন্তু ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক। কারো কারো এগুলো থেকে এলার্জির শক হতে পারে (পৃঃ ৮৩)। হুল ফোটানোর জায়গাটা লাল, গরম হয়ে যায়, ফুলে যায় আর যন্ত্রণা দেয়।

চিকিৎসা :

* **হুল ফোটানোর জায়গায় গরম সেঁক দিন।**
* **যন্ত্রণার জন্যে এসপিরিন আর এনটিহিস্টামাইনের বড়ি দিন (সবুজপৃষ্ঠাগুলি দেখুন)।**
* **শকের লক্ষণ দেখা দিলে, এলার্জির শকের মত চিকিৎসা করুন (পৃঃ ৮৩)।**

মাকড়সার কামড়



বেশির ভাগ মাকড়সার কামড় যন্ত্রণাদায়ক, কিন্তু বিপজ্জনক নয়। কয়েক জাতের মাকড়সার কামড়ে একজন বয়স্ক লোক বেশ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। ছোট শিশুর পক্ষে এগুলো বিপজ্জনক হতে পারে। এইসব কামড়ে অনেক সময়ে পেটের পেশীতে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। (কখনো কখনো একে এপেনডিসাইটিস-এর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়।)

এসপিরিন দিন আর ডাক্তারি সাহায্য নিন। এতে যে সব ওষুধ সব থেকে উপকারী, সেগুলো গ্রামের দোকানে পাওয়া যায় না। ১০ মিঃ লিঃ ১০% ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট ১০ মিনিট ধরে **খুব ধীরে ধীরে** শিরার ভেতরে ইনজেকশন করে দিলে পেশীর খিচুনি কমাতে সাহায্য করে। তাছাড়া ডায়াজিপাম (পৃঃ ৪২৩) কাজে লাগতে পারে। শকের লক্ষণ দেখা দিলে, এলার্জির শকের চিকিৎসা করবেন (পৃঃ ৮৩)। শিশুদের বেলায় কর্টিসনের ইনজেকশনের দরকার হতে পারে।

পরিচ্ছেদ

১১ পুষ্টি : স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্যে কি কি খাওয়া দরকার

ভালো খাওয়াদাওয়া না করলে যে সব রোগ হয়

ভালোভাবে বেড়ে উঠতে, খেটেখুটে কাজ করতে আর স্বাস্থ্য ভালো রাখতে গেলে ভালো খাবারের দরকার। অনেক সাধারণ রোগের কারণ হল—শরীরের যা যা দরকার সেই সব খাবার যথেষ্ট পরিমাণে না খাওয়া।



যে ঠিক ঠিক খাবার খায় না বা যথেষ্ট পরিমাণে খায় না, সে দুর্বল বা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে অপুষ্ট বা *পুষ্টিহীন* বলা হয়। সে *অপুষ্টিতে* ভোগে।

নিচের স্বাস্থ্যের সমস্যাগুলি সাধারণতঃ পুষ্টির অভাব থেকেই হয়:

শিশুদের বেলায়

- শিশুর স্বাভাবিক বাড় বন্ধ হওয়া বা ওজন না বাড়া (পৃঃ ৩৪৯ দেখুন)
- হাঁটা, কথা বলা বা চিন্তায় পেছিয়ে পড়া
- ফোলা পেট, রোগা হাত পা
- মনমরা ভাব, ফুর্তির অভাব
- পা, মুখ ও হাত ফুলে যাওয়া তার সঙ্গে প্রায়ই চামড়ায় ঘা বা দাগ থাকা
- চুল পাৎলা হয়ে যাওয়া বা পড়ে যাওয়া, চুলের রং বা চকচকে ভাবটা চলে যাওয়া
- চোখ শুকিয়ে যাওয়া, দেখতে না পাওয়া

যে কোনো লোকের বেলায়

- দুর্বলতা আর ক্লান্তি
- খিদের অভাব
- রক্তাল্পতা
- ঠোঁটের দু কোণে ঘা
- জিভে ব্যথা বা ঘা
- পায়ে জ্বালা করা বা অসাড় ভাব

নিচের সমস্যাগুলির যদিও অন্য কারণ থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ ভালোভাবে খাওয়াদাওয়া না করলে এগুলো হতে বা বেড়ে যেতে পারে:

- পাৎলা পায়খানা
- মাথাধরা
- মাড়ি থেকে রক্ত পড়া বা মাড়ি লাল হয়ে যাওয়া
- পেটে অসোয়াস্তি
- গায়ের চামড়া শুকিয়ে আর ফেটে যাওয়া
- ছোট শিশুদের ফিট হওয়া বা তড়কা
- বুক ধড়ফড় করা
- উৎকণ্ঠা আর নানারকম নার্ভের (স্নায়ুর) বা মনের রোগ
- সিরোসিস্ (যকৃতের রোগ)
- ঘনঘন নানারকম সংক্রমণ হওয়া

খাওয়াদাওয়া যদি ঠিকমত হয়,
শরীর সহজে রোগ করে জয়।

একটু আগে যে সব সমস্যার তালিকা দেওয়া হল সেগুলোর সরাসরি কারণ হয়তো ভালো খাওয়াদাওয়ার অভাব। কিন্তু এসব ছাড়াও পুষ্টির অভাবে, শরীরের নানা রোগ—বিশেষ করে সংক্রমণ—ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতাটা কমে যায়।

- হৃষ্টপুষ্ট শিশুদের থেকে, অপুষ্ট শিশুরাই সাংঘাতিক পাৎলা পায়খানার রোগে বেশি ভোগে আর তা থেকে মারা যায়।
- অপুষ্ট শিশুদের বেলায় হাম বিশেষ বিপজ্জনক।
- যাদের পুষ্টির অভাব রয়েছে তাদেরই সাধারণতঃ যক্ষ্মা হয়, বা সেটা তাড়াতাড়ি খারাপের দিকে যায়।
- যকৃতের সিরোসিস, যার অনেকটা কারণ হল অতিরিক্ত মদ খাওয়া, সেটাও যারা পুষ্টিহীন তাদেরই সাধারণতঃ হয় আর বাড়াবাড়ি রকমেরও হয়।
- যারা পুষ্টিহীন, তাদের সর্দিকাশির মত সাধারণ রোগও বেশি হয় আর তারা ভোগেও অনেকদিন ধরে।

ঠিকমত খেলে পরে
সহজেই রোগ সারে।

ভালো খাবার যে শুধু রোগ এড়াতে সাহায্য করে তাই নয়, অসুস্থ শরীরকে রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আর আবার ভালো হয়ে উঠতেও সাহায্য করে। কাজেই, কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে, পুষ্টিকর খাবার বিশেষভাবে জরুরি।

দুঃখের বিষয়, শিশুরা অসুস্থ হয়ে পড়লে বা তাদের পাৎলা পায়খানা হলে অনেক মা তাদের পুষ্টিকর খাবার দেয়া বন্ধ করে দেন—ফলে শিশুরা দুর্বল হয়ে পড়ে আর রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে না, আর মারাও যেতে পারে। **অসুস্থ শিশুদের পুষ্টিকর খাবারের দরকার। অসুস্থ শিশু খেতে না চাইলে, তাকে খেতে উৎসাহ দিন।**

প্রায়ই, অন্য কোনো অসুখ হলে তবেই পুষ্টির অভাবের লক্ষণগুলো দেখা যায়। যেমন, একটি শিশুর কয়েকদিন ধরে পাৎলা পায়খানা হলে তারপরে তার হাত পা আর মুখ ফুলে যেতে পারে, তার পায়ে ছাল ওঠা ঘা হতে পারে। এগুলো পুষ্টির অভাবের লক্ষণ। শিশুটির বেশি করে ভালো খাবারের দরকার।

যে কোনো রোগের সময়ে এবং পরে, পুষ্টিকর খাবার খাওয়া খুব জরুরি।

ভালো
খাওয়াদাওয়া
আর পরিষ্কার
পরিচ্ছন্ন থাকা
ভালো স্বাস্থ্যের
সবথেকে বড়
নিশ্চয়তা





এই মায়ের হাতে যে সব ছোপ ছোপ দাগ দেখা যাচ্ছে তার থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তার পেলাগ্রা বলে একরকম অপুষ্টির রোগ হয়েছে। এর কারণ হল মেয়েটি শুধু একরকমের খাবার (ভুট্টা) বেশি খেয়েছিল—বরবটি, ঘন সবুজ রঙের শাকসবজি এইসব নানারকম খাবার মিশিয়ে খায়নি।

সে ভালো খায়নি বলে তার বুকে শিশুর জন্যে দুধ হয়নি। ফলে, শিশুটির সাংঘাতিক অপুষ্টি হয়েছে। এই ছবিটা তোলার সময়ে শিশুটির বয়স দুবছর ছিল। সে খুবই ছোট্ট এবং রোগা, তার পেটটা ফোলা, চুল পাৎলা। বাকি জীবনটা সে হয়ত জড়বুদ্ধি হয়ে থাকবে।

এই অবস্থা এড়াতে হলে, মায়েদের আর তাদের শিশুদের আরো ভালোভাবে খাওয়া দরকার।

শরীরকে সুস্থ রাখতে হলে যে সব খাবারের দরকার

সুস্থ আর শক্তসমর্থ থাকতে হলে আমাদের শরীরে প্রতিদিন মাপমত নানারকম পুষ্টিকর খাবারের দরকার হয়। প্রতিবার খাওয়ার সময় আমাদের উচিত নিচের চারটি ধরনের খাবারের প্রতিটি থেকে কিছু খাওয়া:

১· প্রধান খাবার:

প্রধান খাবারটি থেকে কম দামে শক্তি পাওয়া যায়। এগুলিকে শক্তি যোগানোর খাবারও বলা হয়। আগুনের জন্যে যেমন কাঠ—তেমনি শরীরের জন্যে এগুলো দরকার। যে যত বেশি খাটে, তার তত বেশি শক্তি যোগানোর খাবারের দরকার হয়। আমাদের খাবারের তালিকায় প্রচুর প্রধান খাবার থাকে। কিন্তু আমরা যদি অন্য তিনধরনের খাবার বাদ দিয়ে শুধু এই ধরনের খাবারই খাই, তবে আমাদের শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে।

প্রধান খাবারের কিছু উদাহরণ:

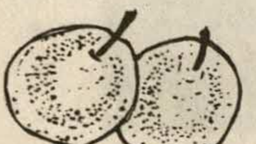
খাদ্যশস্য আর দানাশস্য—গম, চাল, জোয়ার, ভুট্টা, রাগি





শ্বেতসার জাতীয় খাবার—আলু, রাঙা আলু, সাবু

শ্বেতসার জাতীয় ফল—কলা







২· যে সব খাবার থেকে আমরা বাড়তি প্রোটিন পাই:

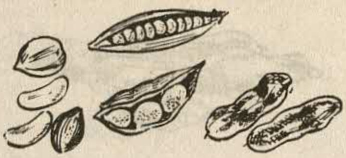
প্রোটিন হল শরীর গড়ার খাবার। ঠিকমত বেড়ে ওঠার জন্যে, মাংসপেশী, মাথার ঘিলু আর শরীরের আরো নানা অংশ সুস্থ রাখার জন্যে এগুলো দরকার হয়।

আমাদের শরীরে যা প্রোটিন লাগে তার মাত্র অর্দ্ধেকটা আসে প্রধান খাবার থেকে, তাই সুস্থ থাকতে হলে আমাদের খাদ্যতালিকায় অন্ততঃ একটা এই ধরনের খাবার থাকা উচিত। **শক্তসমর্থ আর সুস্থ হয়ে থাকতে হলে প্রত্যেকের উচিত প্রতিদিন যথেষ্ট প্রোটিন খাওয়া।**

প্রোটিন খাবারের কিছু উদাহরণ:

ডাল
মটরশুঁটি, বরবটি
সয়াবীন
চিনেবাদাম

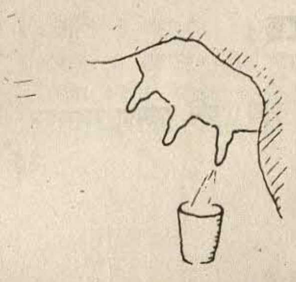
নানারকম বাদাম

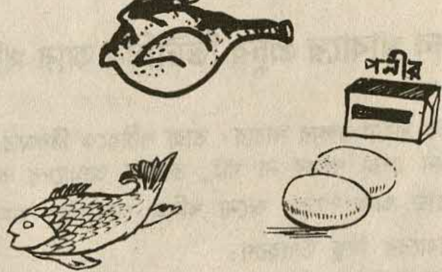


ঘন সবুজ রঙের শাকসবজি



পশুপাখি থেকে পাওয়া খাবার যেমন
দুধ, দই, ছানা, ডিম, মাংস, মাছ





সয়াবীন আর চিনেবাদামে প্রচুর প্রোটিন আছে। প্রধান খাবারের সঙ্গে রোজ একমুঠো চিনেবাদাম খেলে শরীরে যথেষ্ট প্রোটিন যায়।

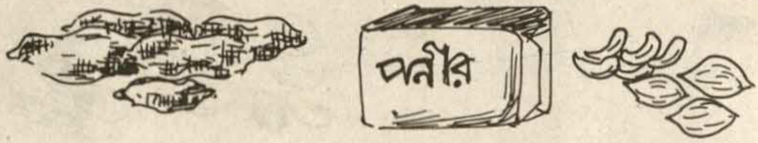
৩· যে সব খাবার আমাদের বাড়তি শক্তি যোগায়:

তেল, ঘি, চর্বি আর চিনিতে অনেকটা শক্তি জমা করা থাকে। বেশি শক্তির দরকার হলে আমাদের শরীর চর্বিকে চিনি করে নেয়। প্রতিবার খাবার সময় একটু চর্বি বা তেল, ঘি খেতে চেষ্টা করবেন।

বাড়তি শক্তি দেবার খাবারের কিছু উদাহরণ:
স্নেহজাতীয় খাবার—তেল, মাখন, ঘি, মাংসের চর্বি



স্নেহপদার্থ ভরা খাবার—নানারকম বাদাম, তেলবীজ, পনীর



চিনি জাতীয় খাবার—সাদা চিনি, মধু, গুড়



৪· যে সব খাবারে প্রচুর ভিটামিন আর খনিজ পদার্থ আছে :

ভিটামিনগুলো শরীর রক্ষার খাবার। তারা শরীরকে ঠিকমত কাজ করতে সাহায্য করে। যদি আমরা সবরকম দরকারি ভিটামিন দেয়া খাবার না খাই, তাহলে আমাদের অসুখ করে।

সুস্থ রক্ত, হাড় আর দাঁতের জন্যে খনিজ পদার্থের দরকার হয়।

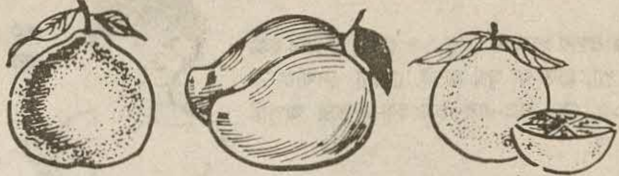
ভিটামিন খাবারের কিছু উদাহরণ:
ঘন সবুজ রঙের শাকসবজি—পালং, সজনেশাক, নটে শাক



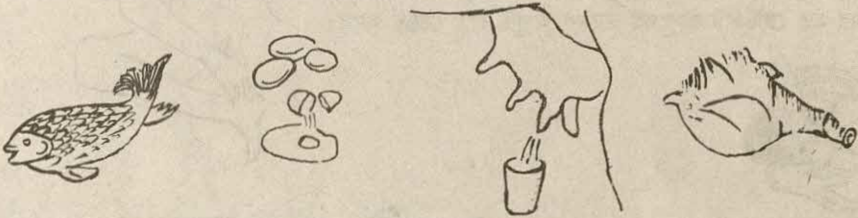
ঘন হলুদ রঙের তরিতরকারি—গাজর, পাকা কুমড়ো
অন্য তরকারি—টমেটো



ফল—পেঁপে, আমলকি, কমলালেবু, আম, পাতিলেবু

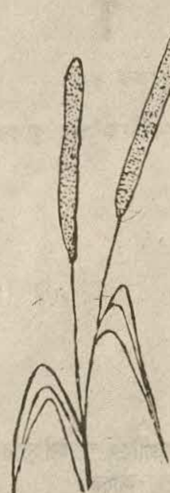


পশুপাখি থেকে পাওয়া খাবার—মাংস, ডিম, মুরগি, মাছ



খনিজ পদার্থ দেয়া খাবারের কিছু উদাহরণ:

রাগি ও বাজরার মত দানা শস্যে প্রচুর ক্যালসিয়াম আর লোহা থাকে।
গুড় ও তেঁতুলে সুস্থ রক্ত তৈরি করার মত লোহা থাকে।
গাঢ় সবুজ রঙের শাকসবজিতেও অনেক লোহা থাকে।
সমুদ্রের গাছগাছড়ায় আয়োডিন থাকে।





ঠিকমত খাওয়ার মানে কি?

ঠিকমত খাওয়া মানে হল **যথেষ্ট খাওয়া**। কিন্তু তার মানে এটাও যে, **শরীরের যে সব নানারকম খাবার দরকার সেগুলো সুষম ভাবে খাওয়া**। স্বাস্থ্য ভালো রাখতে গেলে, একটু আগে যে সব ধরনের খাবারের কথা বলা হল, তার প্রত্যেকটা থেকে যথেষ্ট পরিমাণ খাবার খাওয়া দরকার। অনেকে চাল, ভুট্টা, সাবু, কলা এইসব শ্বেতসার ধরনের শক্তি বাড়ানোর খাবার বেশি পরিমাণে খান। কিন্তু শরীরকে গড়বার বা রক্ষা করবার ধরনের খাবার—যেমন বরবটি, মটরশুঁটি, ডাল, গাঢ় সবুজ শাক আর ফল—এসব যথেষ্ট পরিমাণে খান না। এইসব লোকেদের অপুষ্টি হতে পারে। **সুস্থ থাকতে হলে, প্রত্যেকবার** খাওয়ার সময় প্রতি ধরনের খাবার থেকে অন্ততঃ একটি করে খাওয়ার চেষ্টা করুন।

শিশুদের ভালোভাবে বেড়ে ওঠার জন্যে আর সুস্থ থাকার জন্যে প্রচুর পুষ্টিকর খাবারের দরকার হয় বলেই তাদের অপুষ্টি প্রায়ই খুব মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। যে দু ধরনের মারাত্মক অপুষ্টিকর রোগ প্রায়ই দেখা যায়, তা হল **কোয়াসিওরকর** আর **ম্যারাসমাস**।

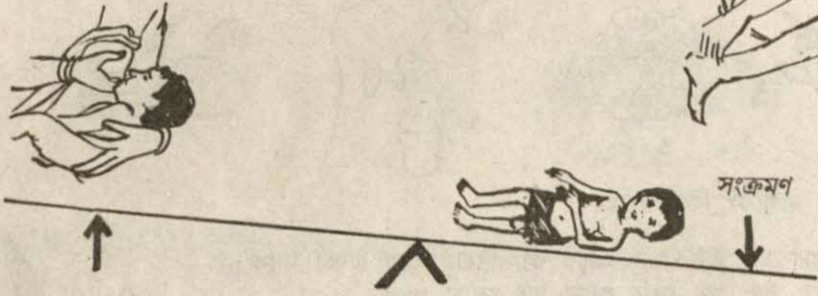
কোয়াসিওরকর বা ম্যারাসমাস কোনোটাই হঠাৎ হয়ে যায় না। শিশু বেশ অপুষ্টিতে ভুগলেও অনেক সময় তার লক্ষণগুলো বাইরে থেকে দেখা যায় না। শিশুর পুষ্টির অভাব রয়েছে কি না সেটা পরীক্ষা করার একটা ভালো উপায় হল তার ওপরের হাতের বেড়টা মেপে দেখা।

পুষ্টির পরীক্ষা : ওপর হাতের লক্ষণ :



এক বছর বয়সের পরেও যে শিশুর ওপর হাতের বেড় ১৩ সেঃ মিঃ-এর কম থাকে, সে অপুষ্টিতে ভুগছে, তার পা, হাত বা মুখ যতই 'মোটা' দেখাক না কেন। যদি ওপর হাতের মাপ ১২ সেঃ মিঃ-এর কম হয়—তার অপুষ্টি মারাত্মক।

যে সব শিশুকে অন্য কোনো খাবার না দিয়ে শুধু বুকের দুধ দেয়া হয় তাদের প্রায়ই বেশ হৃষ্টপুষ্ট দেখায়। কিন্তু তারা অপুষ্টির ধারে কাছেই থাকে। সর্দি বা পাৎলা পায়খানার মত ছোটখাট অসুখেই তাদের অপুষ্টি হয়ে যেতে পারে।



১· এই শিশুটিকে শুধু বুকের দুধ দেয়া হয়েছিল। সর্দির মত ছোট একটা সংক্রমণেই সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।



২· এই শিশুটিকে বুকের দুধের সঙ্গে অন্য খাবারও দেয়া হয়েছিল। সংক্রমণের সঙ্গে সে যুদ্ধ করতে পেরেছে আর তাই সে সুস্থ আছে।

শিশুর পুষ্টি ঠিক আছে না সে অপুষ্টিতে ভুগছে, এটা জানবার আর একটা ভালো উপায় হল তাকে মাসে একবার করে ওজন করা। সুস্থ, পুষ্ট শিশুর ওজন নিয়মিত বাড়বেই।

২১ পরিচ্ছেদে ৩৪৩ পৃষ্ঠায় শিশুদের ওজন নেয়া আর 'স্বাস্থ্যের পথ' চার্টটি পুরো আলোচনা করা হয়েছে।

কোয়াসিওরকর—শিশুর পাৎলা পায়খানা বা হামের মত অন্য কোনো সংক্রমণ হলে সাধারণতঃ প্রথম দেখা যায়। যে সব শিশুকে শুধু বুকের দুধ দেয়া হয়, অন্য কোনো খাবার বিশেষ দেয়া হয় না, তাদের মধ্যে এই রোগ বেশি দেখা যায়।

এই শিশুটির কোয়াসিওরকর হয়েছে। এ প্রধান খাবার যথেষ্ট খাচ্ছে না। এ যেটুকু প্রধান খাবার আর বুকের দুধ খায়, তার মধ্যের সবটুকু প্রোটিন, শক্তি তৈরি করতেই 'পুড়িয়ে ফেলে' বলে বাড়বার বা শরীর শক্ত করবার মত কোনো বাড়তি প্রোটিন থাকে না। এর কোয়াসিওরকর হয়েছে। এই রোগকে ভিজে অপুষ্টি বলা হয়, কারণ এতে পা, হাত আর মুখ ফুলে যায়।

ফোলা থাকে আর কিছু চর্বিও থাকে বলে শিশুর কোয়াসিওরকর হলে তাকে রোগা না দেখিয়ে বরং মোটাসোটাই দেখায়। কিন্তু তার পেশী শুকিয়ে যায়। তার ওপর হাতের দিকে তাকালে দেখবেন সে দুটি আশ্চর্যরকম সরু। **শিশুটির আরো খাবারের দরকার।**

ভেজা অপুষ্টি
বা কোয়াসিওরকর
—যথেষ্ট প্রোটিন না খেলে হয়—



এই শিশুটির শরীরে শুধু হাড়, চামড়া আর জল আছে

শুকনো অপুষ্টি
বা ম্যারাসমাস
—যথেষ্ট না খেলে হয়—



এই শিশুটির শরীরে শুধু হাড় আর চামড়া আছে

কখনো কখনো শিশু কোনো খাবারই যথেষ্ট খায় না। অর্থাৎ সে উপোসে থাকে।

তার শুকনো অপুষ্টি বা ম্যারাসমাস হয়। তার শরীর ছোট্ট, খুব রোগা আর শুকনো হয়ে যায়। সে হাড় চামড়া সার হয়ে পড়ে। **এই শিশুরও আরো বেশি খাবারের দরকার।**

প্রায়ই, একই শিশুর শরীরে এক সঙ্গে কোয়ারসিওরকর আর ম্যারাসমাসের লক্ষণ দেখা যায়। তার পা কোয়াসিওরকরে যেমন হয় সেইরকম ফোলা হতে পারে, আবার হাত দুটো ম্যারাসমাসে যেমন হয় সেইরকম রোগা হতে পারে। এই শিশুর আরো খাবারের দরকার।

কয়েকটা প্রধান খাবারে—যেমন কলা আর মূল (মূলো, সাবু, শালগম ইত্যাদি)—এত জল আর ছিবড়ে থাকে যে সেগুলো খেলে শিশুর পেট ভরে যায় কিন্তু শক্তির জন্যে দরকারি খাবার সে যথেষ্ট পরিমাণে পায় না। তার পেটে আর কিছু না ধরলেও সে উপোসেই থাকে।

এই ধরনের শিশুদের পক্ষে, দিনে অন্ততঃ ৩ বার খাওয়া আর **খাবার সময়ের ফাঁকে ফাঁকে টুকটাক** খাওয়া, খুব জরুরি। শিশুর খাবারের সঙ্গে একটু বীজতেল মিশিয়ে দিলে সাহায্য হয়। যখনই সম্ভব তার উচিত অন্য—কম ভারি, বেশি পুষ্টিকর খাবার খাওয়া—শক্তি বাড়াবার আর প্রোটিন খাবার দুইই।



মুরগি যেমন সারাদিন ধরে
ঘনঘন খুঁটে খায়—
ছোটদেরও জেনো টুকটাক করে
এটা ওটা খাওয়া চাই।



অপুষ্টি এড়ানো আর সারানো:

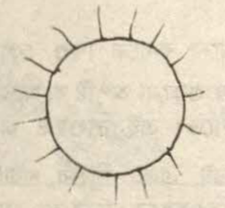
পুষ্টিকর খাবার সুষম ভাবে আর যথেষ্ট পরিমাণে খেলে ম্যারাসমাস আর কোয়াসিওরকর দুটোই এড়ানো বা সারানো যায়। শিশুদের পক্ষে বুকের দুধ সবথেকে ভালো সম্পূর্ণ খাবার। যতদিন সম্ভব বুকের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যাওয়া উচিত। অনেক মা তাঁদের শিশুদের ২ বছর বা আরো বেশিদিন ধরে বুকের দুধ খাওয়ান। প্রথম ৪ বা ৬ মাসের পর শিশুকে বুকের দুধ ছাড়াও অন্য পুষ্টিকর খাবার দেয়া উচিত। ১৪২ পৃষ্ঠায় এটা আরো বড় করে আলোচনা করা হয়েছে।

কোয়াসিওরকর বা ম্যারাসমাস হলে শিশুদের বাড়তি খাবারের দরকার হয়। ডিম, দুধ, মুরগি, মাংস আর মাছ—ভালো খাবার হিসেবে ধরা হয়—কিন্তু এগুলোর দাম বেশি। প্রধান খাবার আর প্রোটিন খাবার মিশিয়ে দেয়া উচিত। হজমের সুবিধার জন্যে খাবারটা ভালোভাবে সেদ্ধ করে চটকে দেয়া উচিত। খাবারে শক্তির পরিমাণ বাড়াতে সেটাতে একটু তেল বা চর্বি মিশিয়ে দেয়া যেতে পারে।

অন্যান্য ধরনের অপুষ্টি:

গরিবদের মধ্যে যে অপুষ্টি সবথেকে বেশি দেখা যায় তা হল ম্যারাসমাস বা কোয়াসিওরকর (খিদে বা উপোসের জন্যে)। তবে, লোকে যে খাবার খায় তাতে ভিটামিন বা খনিজ পদার্থের অভাব ঘটলে অন্য ধরনের অপুষ্টি হতে পারে। যেমন:

- ছোট ছেলেমেয়েরা কোনো হলুদ বা গাঢ় সবুজ রঙের ফল বা শাকসবজি বা ভিটামিন 'এ'-তে ভরা অন্য খাবার না খেলে রাতকানা হয়ে যেতে পারে, তাদের চোখ শুকিয়ে যেতে পারে, আর শেষকালে তারা অন্ধও হয়ে যেতে পারে (পৃঃ ২৭১)।



- যে সব ছেলেমেয়ে দুধ খায় না, আর যাদের গায়ে প্রায় কখনই রোদ লাগে না, তাদের পা ধনুকের মত বেঁকে যেতে পারে বা তাদের হাড়ের অন্য বিকৃতি হয়ে যেতে পারে (রিকেট)। দুধ আর ডি ভিটামিন (মাছের লিভারের তেলে পাওয়া যায়) শিশুকে খাওয়ালে এই রোগ সারানো যেতে পারে, কিন্তু এটা এড়ানো আর সারানোর সবথেকে সহজ আর সস্তা উপায় হল শিশুর গায়ে যেন রোদ লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

- যাতে লোহা আছে এমন খাবার, যেমন গাঢ় সবুজ রঙের শাক, ডিম বা মাংস, যারা খায়না, তাদের রক্তাল্পতা হতে পারে (পৃঃ ১৪৬)।

- ফল, তরিতরকারি বা বিশেষ ভিটামিনে ভরা অন্য কয়েকরকম খাবার (পৃঃ ১২৯) না খেলে অনেক চামড়ার রোগ (পৃঃ ২৪৮), বা ঠোঁটে আর মুখে ঘা (পৃঃ ২৭৬) হতে পারে বা মাড়ি থেকে রক্ত পড়তে পারে।



রিকেটের সবচেয়ে ভালো প্রতিষেধক ও চিকিৎসা হল সূর্যের আলো।

এই সব সমস্যা আর পুষ্টির সঙ্গে সম্বন্ধ আছে এমন আরো কিছু সমস্যার বিষয়ে এই পরিচ্ছেদে এবং অন্য কয়েকটা পরিচ্ছেদে আরো বড় করে আলোচনা করা হয়েছে।

বেশি টাকা বা জমি না থাকলেও কি ভাবে আরো ভালোভাবে খাওয়াদাওয়া করা যায়



খিদে আর অপুষ্টির অনেক কারণ আছে। একটা হল দারিদ্র্য। পৃথিবীর অনেক জায়গাতে অল্প কয়েকজন লোকই বেশির ভাগ টাকাকড়ি আর জমির মালিক। তারা হয়তো কফি বা তামাকের চাষ করে—পুষ্টির দিক থেকে যেগুলোর কোনো দাম নেই; এগুলো তারা বেশি টাকা রোজগার করবার জন্যে বিক্রি করে। অথবা, গরিবরা হয়তো অন্যের ছোট ছোট টুকরো জমি চাষ করে, যার ফসলের একটা বড় ভাগ জমির মালিকরা নিয়ে নেয়। **যতদিন না মানুষ পরস্পরের মধ্যে ন্যায্য বিলিব্যবস্থা করতে শিখবে, খিদে আর পুষ্টির সমস্যা কখনো পুরোপুরি মিটবে না।**

কিন্তু কম দামে আরো ভালো খাবারের জন্যে গরিব লোকে অনেক কিছুই করতে পারে, আর ভালো খেয়ে শক্তি লাভ করে নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্যে দাঁড়াতে পারে। "গ্রাম স্বাস্থ্যকর্মীর জন্যে কয়েকটি কথা"র ক১৩ আর ক১৪ পৃষ্ঠায় পুষ্টি আরো ভালো করার জন্যে কয়েকটি পরামর্শ পাবেন। তার মধ্যে আছে **ফসল পালটাপালটি করা, উচুঁনিচু খাল কাটা** আর **জলসেচের** মধ্যে দিয়ে জমির আরো ভালো ব্যবহার; তাছাড়া আছে **মাছের চাষ, মৌমাছি পালন, ফসল** আরো ভালোভাবে **গুদামজাত করা** আর পরিবারের জন্যে বাগান করা। সমস্ত গ্রামের বা কয়েকটি পরিবারের লোক দল বেঁধে সবাই মিলে এর মধ্যে কিছু জিনিস নিয়ে কাজ করলে, পুষ্টির উন্নতির জন্যে অনেক কিছুই করা যায়।

খাবার আর জমির ব্যাপারটা ভাববার সময় এটা মনে রাখা দরকার যে **একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি কেবল একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার লোককেই খাওয়াতে পারে**। যদি আপনার পরিবারের জমি বা অন্য সম্পত্তি বেশি না থাকে, তবে আগে থেকে ভেবে চিন্তে, যে কটি ছেলেমেয়েকে ভালোভাবে খাওয়াতে পারবেন শুধু সেই কজনের জন্ম দেওয়াই বুদ্ধির কাজ। বেশি ছেলেমেয়ে মানে হয়তো বেশি কাজের লোক, কিন্তু তার মানে নিশ্চয় কাজের জন্যে আরো বেশি জমি নয়।

পেটে খিদে নিয়ে বেশি ছেলেমেয়ে
বেশি কাজ করে নাকো।
মরে যে শুকিয়ে অনেকেই তারা,
এ কথাটি মনে রাখো।

ভালো পুষ্টির জন্যে ছোট পরিবার ক্রমশঃ খুব জরুরি হয়ে উঠছে। এটা আগে থেকে ভেবে কাজ করুন। ক১৬ পৃষ্ঠায় মানুষ আর জমির মধ্যে ভার বজায় রাখার বিষয়ে আলোচনা পাবেন। পরিবার পরিকল্পনার বিষয়ে আলোচনার জন্যে ২০ পরিচ্ছেদ দেখুন।

টাকা যখন কম, তখন সেটা বুদ্ধি করে খরচ করাটা জরুরি। এর মানে হল সহযোগিতা আর সামনের দিকে তাকানো। প্রায়ই দেখা যায় যে একটা গরিব পরিবারের বাবা তার যেটুকু টাকা আছে তা, পুষ্টিকর খাবার কিনতে, ডিম দেবার জন্য একটা মুরগি কিনতে, বা পরিবারের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যে কিছু করতে খরচ না করে, মদ আর বিড়ি সিগারেটে খরচ করছে। যে সব লোক একসঙ্গে বসে মদ খায়, হুঁস থাকার সময় তারা যদি একসঙ্গে এইসব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে আর একটা সুস্থ সমাধান খোঁজে, তাহলে ভালো হয়।

এছাড়া, মায়েরা কখনো কখনো ছেলেমেয়েদের জন্যে লজেঞ্চুস, টফি কেনেন; তাঁরা দুধ, ডিম বা অন্য পুষ্টিকর খাবারের জন্যে ওই টাকাটা খরচ করতে পারতেন। তাহলে ওই পয়সায়ই তাঁদের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য আরো ভালো হতে পারত।

না



আছে কি তোমার অল্প পয়সা?
শিশুকে তোমার চাও কি পুষ্ট?
লেমনেড, সোডা, লজেন্স কিনো না—
দুটি ডিম দিয়ে কর গো তুষ্ট।

হ্যাঁ



কম দামে ভালো খাবার:

পৃথিবীর অনেক লোক প্রধান আর শ্বেতসারজাতীয় খাবার প্রচুর পরিমাণে খায়, অথচ প্রোটিন, ভিটামিন আর খনিজ পদার্থে ভরা খাবার যথেষ্ট পরিমাণে খায় না, কারণ, এইসব 'ভালো' খাবারের বেশির ভাগের দাম খুব বেশি। দুধ আর মাংসের মত যে সব প্রোটিন পশুপাখি থেকে পাওয়া যায়, সেগুলো খুব পুষ্টিকর, কিন্তু খুব দামিও। তাছাড়া পশুপাখি যে পরিমাণে প্রোটিন দেয়, তার তুলনায় তাদের জন্যে জমি বেশি লাগে।

জীবজন্তু থেকে পাওয়া খাবার অনেকটা করে খাওয়া বেশির ভাগ লোকের সাধ্যের বাইরে। অনেক ধর্মে মাংস খাওয়া নিষেধ। সত্যিই, গরিব লোকে যদি **বরবটি, মটরশুঁটি, মুসুরি, চিনেবাদাম আর গাঢ় সবুজ রঙের শাক ফলায় বা কেনে**, তাহলে তারা, সাধারণতঃ **মাংস আর মাছের মত দামি জীবজন্তুর প্রোটিনের থেকে বেশি প্রোটিন** আর পুষ্টি পেতে পারে।

> **গাছপালা থেকে যে প্রোটিন মেলে,**
> **তাই যদি বেশি খায়,**
> **শক্তি, স্বাস্থ্য দুইই পায় লোকে—**
> **সন্দেহ নাই তায়।**

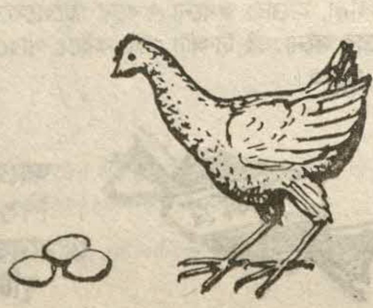
দু-এক রকমের শাকসবজি বেশি করে না খেয়ে **নানারকম শাকসবজি** খেতে চেষ্টা করুন। বিভিন্ন গাছ, শরীরকে বিভিন্ন প্রোটিন, ভিটামিন আর খনিজ পদার্থ দেয়। যেমন, বরবটি বা ভুট্টার মধ্যে যে কোনো একটা শরীরের দরকার যেটুকু মেটায়, দুটো মিলে তার থেকে অনেক বেশি মেটায়। আর যদি অন্য তরকারি আর ফল যোগ করা যায়, তবে আরো ভালো হয়। **সম্ভব হলে, রোজ আলাদা একটা করে তরকারি খাবেন।**

কম দামে বেশি প্রোটিন, ভিটামিন আর খনিজ পদার্থ পাবার জন্যে কয়েকটা পরামর্শ দেয়া হল:



১· **বুকের দুধ**—শিশুর পক্ষে এটা সব থেকে সস্তা, স্বাস্থ্যকর আর সম্পূর্ণ খাবার। মা নিজে প্রচুর সবজির প্রোটিন খেয়ে তাই দিয়ে চমৎকার একটা শিশুর খাবার তৈরি করে দিতে পারেন—বুকের দুধ। বুকের দুধ যে শুধু শিশুর পক্ষে সব থেকে ভালো তাই নয়, এতে পয়সাও বাঁচে!

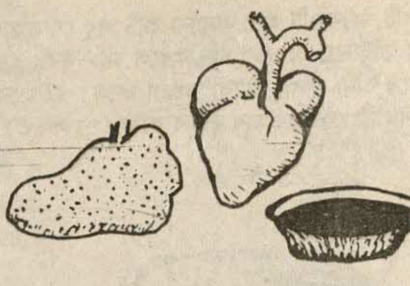
২· **ডিম আর মুরগি**—অনেক জায়গায় ডিম সব থেকে সস্তা আর ভালো জীবজন্তুর থেকে পাওয়া প্রোটিন। যে শিশু বুকের দুধ পায় না, তার খাবারে ডিম মিশিয়ে দেয়া যেতে পারে। অথবা, শিশু যখন বড় হতে থাকে, তাকে বুকের দুধের সঙ্গে ডিম দেয়া যেতে পারে।



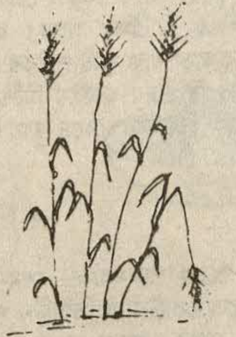
পোয়াতি মায়েদের ঘা হলে, বা দাঁত নড়ে গেলে, অথবা পেশীতে খিল ধরলে, ডিমের খোলা ভালো করে গুঁড়ো করে খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে দরকারি ক্যালসিয়াম পাওয়া যাবে।

আমিষ প্রোটিন হিসেবে মুরগি খুব ভালো খাবার—সাধারণতঃ বেশ সস্তা, বিশেষ করে বাড়িতে যদি মুরগি পোষা হয়।

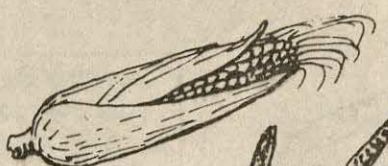
৩· **মেটে, কলজে, কিডনি আর রক্ত**—এগুলোতে প্রোটিন, ভিটামিন আর লোহা (রক্তাল্পতার জন্যে) খুব বেশি আছে, আর অন্য মাংসের থেকে সাধারণতঃ সস্তা। এছাড়া **মাছ** সাধারণতঃ অন্য মাংসের থেকে সস্তা, যদিও সমান পুষ্টিকর। ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় শুকনো (শুঁটকি) মাছ খুব সস্তা। এটা খুবই ভালো জিনিস—বিশেষ করে যে মায়েরা বুকের দুধ দিচ্ছে তাদের জন্যে।



৪· **চাল, গম ও অন্যান সব শস্য**—পালিশ করা না হলে এগুলো বেশি পুষ্টিকর হয়। সাদা, বেশি পালিশ করা থেকে অল্প পালিশ করা ধান আর আছাঁটা গমে বেশি ভিটামিন থাকে। অল্প সেদ্ধ করে নিলে ধানের খোসার মধ্যে যে ভিটামিন থাকে তা চালের ভেতরে ঢুকে যায়। অল্প সেদ্ধ ধানের ঢেঁকিছাঁটা চাল কাঁচা ধানের পালিশ করা চালের থেকে ভালো।



৫· **শুকনো ভুট্টা** (মকাই) রান্নার আগে চুণের জলে ভিজিয়ে রাখলে তা থেকে শরীরের ব্যবহারের জন্যে বেশি ভিটামিন (নিয়াসিন) আর প্রোটিন পাওয়া যায়।

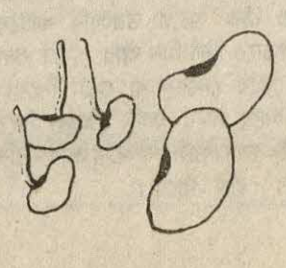


৬· **রাগি আর বাজরা**—এগুলোতে প্রচুর খনিজ পদার্থ আছে—বিশেষ করে ক্যালসিয়াম আর লোহা। চাল বা গমের থেকে এগুলো সস্তা, অথচ বেশি পুষ্টিকর। ভালো খাবার হিসেবে চাল বা গমের বদলে এগুলো ব্যবহার করা যায়।

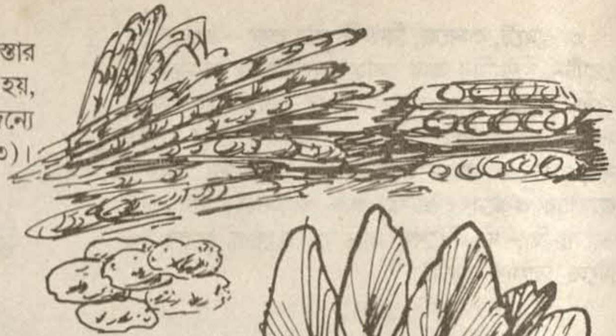


৭· শুধু একরকম **শস্য** খাওয়ার থেকে **অনেকরকম মিশিয়ে খাওয়া** ভালো। নানারকম শস্য শরীরকে নানা ধরনের প্রোটিন দেয়। অনেকরকম শস্য মিশিয়ে খেলে শরীরের যত প্রোটিন দরকার সবটাই পাওয়া যায়।

৮· **বরবটি আর অন্যান্য শুঁটির সবজি (কড়াইশুঁটি, ডাল)—এগুলো খুব ভালো সস্তা প্রোটিন খাবার—বিশেষ করে সয়াবীন আর সিম**। যদি রান্না করে খাবার আগে, অঙ্কুর বার হতে দেন, তবে এদের ভিটামিন বেড়ে যায়। বরবটি ভালো করে সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে চটকে নিলে তা থেকে শিশুর খাবার তৈরি করা যায়।



বরবটি, মটরশুঁটি আর অন্যান্য শুঁটি শুধু যে সস্তার প্রোটিন তাই নয়, এগুলো চাষ করলে জমি উর্বর হয়, আর পরে অন্য ফসল আরো ভালো ফলে। এইজন্যে পালটাপালটি ফসলের চাষ বুদ্ধির কাজ (পৃঃ ক১৩)।



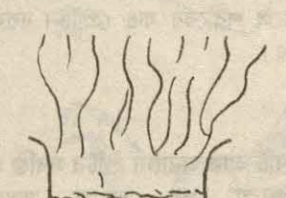


৯· **গাঢ় সবুজ রঙের শাকে** কিছুটা প্রোটিন, কিছু লোহা আর প্রচুর এ ভিটামিন আছে। রাঙাআলু, বরবটি, মটর আর কুমড়ো শাক খুবই পুষ্টিকর। এগুলো শুকিয়ে গুঁড়ো করে শিশুদের জাউয়ে মিশিয়ে দিলে তাতে প্রোটিন আর ভিটামিন বেড়ে যায়।

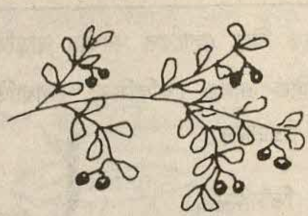
হালকা সবুজ রঙের শাকসবজি—যেমন লেটুস পাতা বা বাঁধাকপিতে প্রোটিন বা ভিটামিন খুব কমই আছে। পুষ্টির দিক থেকে ওগুলো চাষ করার কোনো দাম নেই।



১০· **যে সব সবজি গাছের শেকড়**—যেমন মূলো, ট্যাপিওকা (সাবু)—তাদের **সবুজ পাতাগুলোতে** অনেক বেশি প্রোটিন থাকে—যদিও শেকড়গুলোই সাধারণতঃ বেশি খাওয়া হয়। ট্যাপিওকার পাতায় শেকড়ের থেকে সাতগুণ বেশি প্রোটিন আর অনেক বেশি ভিটামিন থাকে। পাতাগুলো শেকড়ের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে বাড়তি খরচ না করেও খাবারের গুণটা বেড়ে যায়। কচি পাতাগুলো সব থেকে ভালো।



১১· **তরিতরকারি, ভাত আর অন্য সব খাবার কম জলে রান্না করবেন।** রান্নার ঠিক আগে তরকারি কাটবেন। বেশি সেদ্ধ করবেন না। এইভাবে ভিটামিন আর খনিজ পদার্থ কম নষ্ট হবে। বাড়তি জলটা খেয়ে নেবেন বা সেটা দিয়ে ঝোল বানাবেন। তরকারি রান্না করার সময় **একটু তেঁতুল** দিয়ে দেবেন। এতে ভিটামিন কম নষ্ট হয়। বাসি, শুকনো শাকসবজির থেকে টাটকা জিনিসে পুষ্টিগুণ বেশি থাকে।



১২· অনেক **বুনো ফল আর জামে** প্রচুর সি ভিটামিন আর স্বাভাবিক চিনি থাকে। এগুলো থেকে ভালোরকম বাড়তি ভিটামিন আর পুষ্টি পাওয়া যায়। (দেখবেন যেন বিষাক্ত ফল খাবেন না।)



১৩· **লোহার পাত্রে রান্না করলে** অথবা যে পাত্রে বরবটি বা অন্য খাবার রান্না করা হচ্ছে, তাতে একটুকরো পুরোনো লোহা বা মরচে পড়া নাল ফেলে দিলে খাবারে লোহা যোগ হয়—এতে রক্তাল্পতা এড়ানোর সাহায্য হয়।



১৪· **গুড়** লোহার পাত্রে তৈরি হয় বলে এতে প্রচুর লোহা থাকে। যে সাদা চিনি সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয় তার বদলে এটা ব্যবহার করুন।

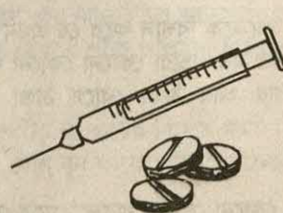
ভিটামিন কিসে পাবেন: বড়িতে, ইনজেকশনে, সিরাপে—না খাবারে?

ভালোভাবে খাওয়াদাওয়া করলে সব দরকারি ভিটামিনই পাওয়া যায়। ভিটামিনের বড়ি, ইনজেকশন, সিরাপ বা টনিক কেনার থেকে ভালোভাবে খাওয়া সবসময়ই বেশি ভালো।



হ্যাঁ

ভিটামিন যদি তুমি পেতে চাও,
ইনজেকশন, বড়ি ছেড়ে দাও।
তার থেকে কেনো ফল, ডিম, আর
পুষ্টি যোগায় যে যে খাবার।



না

কখনো কখনো পুষ্টিকর খাবারের অভাব হয়। যে লোক অপুষ্ট, তার যতটা সম্ভব ভালো খাওয়া আর তার সঙ্গে হয়তো কিছু ভিটামিন খাওয়া উচিত।

প্রায় সব ক্ষেত্রেই, খাবার ভিটামিন ইনজেকশনের সমানই কাজ করে, দামে কম পড়ে, আর তত বিপজ্জনকও হয় না। **ভিটামিনের ইনজেকশন দেবেন না। ওগুলো খাওয়াই ভালো—পুষ্টিকর খাবার হিসেবে খেলে আরো ভালো।**

ভিটামিনের ওষুধ কিনবার সময় দেখে নেবেন, সেগুলোতে যেন শ্বেতসার জাতীয় খাবারে সাধারণতঃ যেগুলোর অভাব ঘটে, সেই সব ভিটামিন আর খনিজ পদার্থগুলো থাকে।

এগুলো হল:

নিয়াসিন (নিয়াসিনামাইড)
বি-১ ভিটামিন (থিয়ামিন)
বি-২ ভিটামিন (রিবোফ্ল্যাভিন)
লোহা (ফেরাস সালফেট ইত্যাদি) পোয়াতি মেয়েদের আর যারা রক্তাল্পতায় ভুগছে বিশেষভাবে তাদের জন্যে।

এছাড়াও কিছু লোকের দরকার বাড়তি:

ফলিক এসিড (ফলিসিন), পোয়াতি মেয়েদের জন্যে

এ ভিটামিন সি ভিটামিন (এসকরবিক এসিড) ডি ভিটামিন	ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে

বি-৬ ভিটামিন (পাইরিডকসিন) ছোট ছেলেমেয়েদের আর যারা যক্ষ্মার ওষুধ খাচ্ছে তাদের জন্যে

ক্যালসিয়াম—ছোটরা আর যে মায়েরা বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে, তাদের মধ্যে যারা দুধ, পনীর, বা চুণ দিয়ে তৈরি খাবার থেকে যথেষ্ট ক্যালসিয়াম পায় না, তাদের জন্যে

খাবারের তালিকা থেকে কি কি বাদ দিতে হয়

অনেকে বিশ্বাস করে যে এমন অনেক খাবার আছে যাতে তাদের ক্ষতি হয়, অথবা রোগ হলে যা তাদের খাওয়া উচিত নয়। তারা কোনো কোনো খাবারকে 'গরম'—আবার অন্য কয়েকটাকে 'ঠাণ্ডা' ভাবে। আর 'গরম' রোগে গরম খাবার আর ঠাণ্ডা রোগে ঠাণ্ডা খাবার খেতে দেয় না।

কোনো কোনো খাবার 'খেতে নেই' ভেবে সেগুলো তারা বাদ দিয়ে দেয় (পৃঃ ৩০ দেখুন), অথবা তারা বিশ্বাস করে যে অনেকরকমের খাবার কচি বাচ্চার মায়ের পক্ষে খারাপ। এইসব বিশ্বাসে উপকারের থেকে ক্ষতিই বেশি হতে পারে। রোগ হলে যে সব খাবার বাদ দেয়া লোকে উচিত বলে মনে করে, প্রায়ই, ভালো হয়ে ওঠার জন্যে সেই খাবারগুলোই দরকার হয়।

সুস্থ লোকের থেকে রোগীরই শরীর গড়ার খাবারের আরো বেশি দরকার। কি কি খাবারে রোগীর ক্ষতি হতে পারে, সেই চিন্তা ছেড়ে কি কি খাবার তাকে সুস্থ হয়ে উঠতে সাহায্য করে সেইগুলোর কথা ভাবাই আমাদের উচিত। —যেমন ফল, শাকসবজি, দুধ, মাংস, ডিম আর মাছ।

**সুস্থ থাকলে যে সব খাবারে হয় বেশি উপকার,
রোগে যদি পড়, কাজে লাগে সেই একই সব খাবার।**

আবার, সুস্থ অবস্থায় যে সব জিনিসে আমাদের ক্ষতি হয়, রোগ হলে সেগুলো আরো বেশি ক্ষতি করে। এই সব জিনিস বাদ দেবেন:



■ মদ খেলে লিভারের, পেটের আর স্নায়ুর রোগ হয় বা বাড়ে। তাছাড়া, এ থেকে সামাজিক সমস্যাও হয়।

■ ধূমপান থেকে পুরোনো (অনেকদিনের) কাশি, ফুসফুসের ক্যানসার আর অন্যান্য সমস্যা (পৃঃ ১৭৮ দেখুন) হতে পারে। যাদের যক্ষ্মা, হাঁপানি আর ব্রঙ্কাইটিসের মত ফুসফুসের রোগ আছে, তাদের, আর পোয়াতি মেয়েদের পক্ষে ধূমপান বিশেষ ক্ষতিকর।

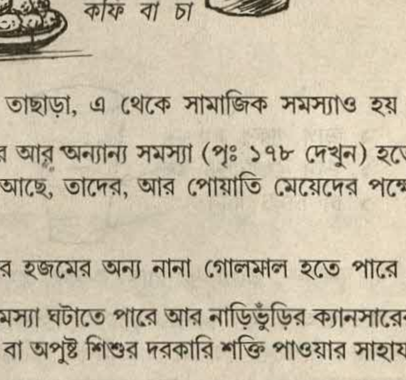
■ বেশি তেল ঘি, ঝালমশলা, বা কফি খেলে পেটের আলসার আর হজমের অন্য নানা গোলমাল হতে পারে।

■ খুব বেশি চিনি বা মিষ্টি খিদে নষ্ট করে, দাঁতের ক্ষতি করে, হার্টের সমস্যা ঘটাতে পারে আর নাড়িভুঁড়ির ক্যানসারের কিছুটা কারণ হতে পারে। তবে, খানিকটা চিনি খেলে, খুব অসুস্থ লোক বা অপুষ্ট শিশুর দরকারি শক্তি পাওয়ার সাহায্য হয়।

কয়েকটা রোগে কিছু বিশেষ খাবার বাদ দেয়া দরকার। যেমন, যাদের রক্তের চাপ উঁচু বা হার্টের বিশেষ সমস্যা আছে, অথবা পা ফুলছে, তাদের নুন কম খাওয়া বা একেবারেই না খাওয়া উচিত। খুব বেশি নুন কারো পক্ষেই ভালো নয়। পেটের আলসার বা বহুমূত্রেও বিশেষ পথ্য লাগে (পৃঃ ১৪৯ দেখুন)।

ছোট শিশুদের সবথেকে ভালো খাবার

জীবনের প্রথম ২ থেকে ৪ মাস:



দু মাসেরটি — শিশু না হয় — যতদিন,
বুকের দুধই—আর কিছু নয়—তাকে দিন॥

শিশুদের পক্ষে সবথেকে ভালো আর খাঁটি খাবার হল বুকের দুধ। যে কোনো কেনা বেবিফুড বা টিনের খাবারের থেকে এটা ভালো। যদি প্রথম ২ থেকে ৪ মাস শিশুকে শুধু বুকের দুধ দেন, তবে পায়খানা আর অনেক সংক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করার সুবিধা হয়।

যদি মায়ের বুকে যথেষ্ট দুধ না আসে:

● মায়ের উচিত প্রচুর জল আর অন্য **তরল জিনিস খাওয়া। সে যত** তরল জিনিস খাবে, তার বুকে তত দুধ আসবে।

● মায়ের আরো ভালো খাওয়াদাওয়া করা উচিত। বরবটি, গাঢ় সবুজ রঙের শাক, পেঁপে, রসুন, মাংস, দুধ, পনীর, ডিম আর শুকনো মাছ—এইসব প্রোটিন আর ভিটামিনে ভরা খাবার খেলে শিশুর জন্যে আরো দুধ তৈরি করার সাহায্য হবে।

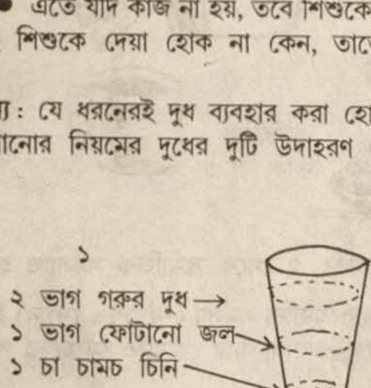
যদি মায়ের বুকে একেবারেই দুধ না আসে:

● মাকে প্রচুর তরল জিনিস আর ভালো খাবার খাওয়ান। শিশুকে ঘনঘন মায়ের বুক চুষতে দিন। এতে কখনো কখনো বুকে দুধ আসতে শুরু হয়।

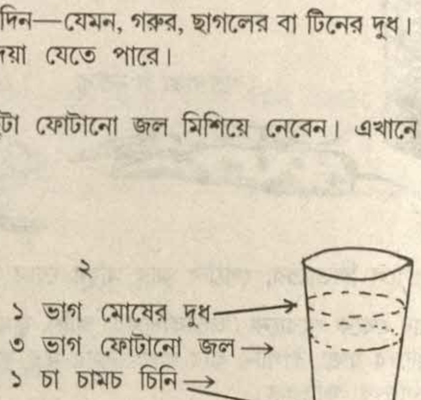
● এতে যদি কাজ না হয়, তবে শিশুকে অন্য কোনো দুধ দিন—যেমন, গরুর, ছাগলের বা টিনের দুধ। যে রকম দুধই শিশুকে দেয়া হোক না কেন, তাতে একটু চিনি দেয়া যেতে পারে।

দ্রষ্টব্য: যে ধরনেরই দুধ ব্যবহার করা হোক না কেন, কিছুটা ফোটানো জল মিশিয়ে নেবেন। এখানে ঠিকমত মেশানোর নিয়মের দুধের দুটি উদাহরণ দেয়া হল:

১



২



যদি মাখন তোলা দুধ ব্যবহার করা হয়, তাহলে তাতে এক বড় চামচ খাবার তেল মিশিয়ে দেবেন।

● দুধ আর জল সবসময় ফুটিয়ে নেবেন। **বোতল ব্যবহার করার থেকে কাপ আর চামচে করে খাওয়ানো বেশি নিরাপদ।** শিশুদের বোতল আর নিপল পরিষ্কার রাখা কঠিন, ওগুলো থেকে পাৎলা পায়খানা এবং আরো অনেক সংক্রমণ হয় (পৃঃ ১৮৫)। যদি বোতল ব্যবহার করা হয়, প্রত্যেকবার শিশুকে খাওয়াবার আগে বোতল আর নিপল দুটোই ফুটিয়ে নেয়া উচিত।

বোতলে দুধ খাওয়ানোটা মোটেই ভালো নয়,
বিপদ ঘটে, অনেক শিশুর মৃত্যু এতে হয়।

যদি শিশুর জন্যে দুধ কেনার মত যথেষ্ট পয়সা না থাকে, তবে চাল, ভুট্টার আটা বা অন্য শস্য দিয়ে একটা জাউ তৈরি করে নিতে পারেন। সম্ভব হলে সঙ্গে খোসা ছাড়ানো বরবটি দানা, ডাল বা অন্য প্রোটিন খাবার মিশিয়ে দেবেন। এগুলো ভালো করে চটকে তরল করে দিতে হবে।

সাবধান: **শুধু ভুট্টার আটা বা ভাতের ফেন শিশুর পক্ষে যথেষ্ট পুষ্টিকর নয়। এতে শিশু ঠিকমত বাড়বে না, সময়ে হাঁটবে না বা কথা বলবে না। সে সহজেই অসুস্থ হয়ে পড়বে, মারাও যেতে পারে। শিশুকে নানারকম খাবার মিশিয়ে দিতেই হবে।**

৪ মাস থেকে ১ বছর বয়স অবধি:

১· শিশুকে বুকের দুধ দিয়ে যান, সম্ভব হলে তার ২ বছর বয়স পর্যন্ত।

২· শিশুর ৪ মাস বয়স হলে, তাকে অন্য খাবারও দিতে শুরু করুন। **এইসব খাবার ভাল করে সেদ্ধ করে চটকে দিতে হবে।** প্রথম মুখে দিলে শিশু প্রায়ই এইসব খাবার থু থু করে ফেলে দেয়। **আগে খায়নি বলে এগুলি** তার খেতে অদ্ভুত

লাগে। কিন্তু মায়ের এই সব খাবার তাকে খাইয়ে যাওয়া উচিত। কিছুদিনের মধ্যেই শিশুর অভ্যেস হয়ে যাবে আর সে ফুর্তি করে খাবে। নিচের তালিকাগুলোর প্রত্যেকটা থেকে অন্ততঃ একটা নিয়ে মিশিয়ে সস্তা পুষ্টিকর খাবার তৈরি করা যায়:

প্রধান খাবার	**প্রোটিন খাবার**	**বেশি শক্তি দেবার খাবার**	**ভিটামিন আর খনিজ পদার্থের খাবার**
গম	ডাল	চর্বি	গাঢ় সবুজ শাক
চাল	মটরশুঁটি	তেল	ফল
রাগি	বরবটি	পনীর	জীবজন্তু থেকে
জোয়ার	চিনেবাদাম	মাখন	পাওয়া খাবার
বাজরা	সয়াবীন	ঘি	যেমন দুধ, ডিম,
আলু	গাঢ় সবুজ শাক	গুড়	মাংস, মাছ
ট্যাপিওকা (সাবু)	জীবজন্তু থেকে	মধু	
	পাওয়া খাবার	চিনি	
	যেমন দুধ, ডিম,		
	মাছ মাংস		

এখানে প্রত্যেকটি তালিকা থেকে খাবার নিয়ে তৈরি সুষম খাবারের কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হল:

৪ থেকে ৬ মাস

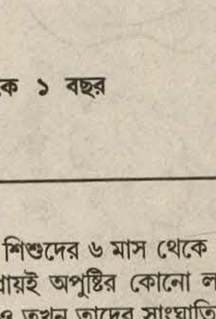
ডাল আর শাক সেদ্ধ করার সময় জলে একটু গুড় আর দুধ মিশিয়ে সেই জলটা। ডাল ভালো করে সেদ্ধ করে চটকে, চটকানো রুটি বা ভাতের সঙ্গে মেশানো।

৬ মাস থেকে ১ বছর

ভালো করে সেদ্ধ করা সবুজ শাক। কলা, পেঁপে বা অন্য পাকা ফল চটকানো, আধ সেদ্ধ ডিমের কুসুম, দুধ বা চটকানো রুটির সঙ্গে মেশানো ডালিয়া, গম, রাগি, জোয়ার আর অন্য প্রধান খাবার থেকে তৈরি জাউ। চটকানো ভাত বা রুটির সঙ্গে ডাল, শাকসবজি, দুধ, ডিম, আলু ইত্যাদি মেশানো। পাকা ফল।

সাবধান: শিশুদের ৬ মাস থেকে ১ বছর অবধি বয়সে অপুষ্টি হবার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি থাকে। প্রায়ই অপুষ্টির কোনো লক্ষণ দেখা যায় না বলে বিপদ ঘটে। সর্দির মত ছোটখাট সংক্রমণেও তখন তাদের সাংঘাতিক রকম পুষ্টির অভাব ঘটে যায়। তাদের আরো বেশি খেতে দিতে হবে।

এই বয়সের ছেলেমেয়েদের সুস্থ রাখতে হলে আমাদের উচিত:



তাদের বুকের দুধ খাইয়ে যাওয়া,
অন্য পুষ্টিকর খাবারও খাওয়ানো,
তাদের খাবার জলটা ফোটানো, আর
শিশুদের আর তাদের চারিদিকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।

৩· ছোট শিশুর পেটটাও ছোট। সে একবারে বেশি খাবার খেতে পারে না। তাই তাকে বারে বারে খাওয়ান। তাকে যত বেশি সম্ভব খাবার দিন। ৬ মাস বয়স হলে শিশুর দিনে পাঁচ থেকে ছবার খাওয়া উচিত।

এক বছর এবং তার বেশি বয়সে :

১ বছর বয়স হলে শিশু, বড়রা যা খায় তাই খেতে পারে। কিন্তু তার যখনই সম্ভব দুধ খাওয়া উচিত।

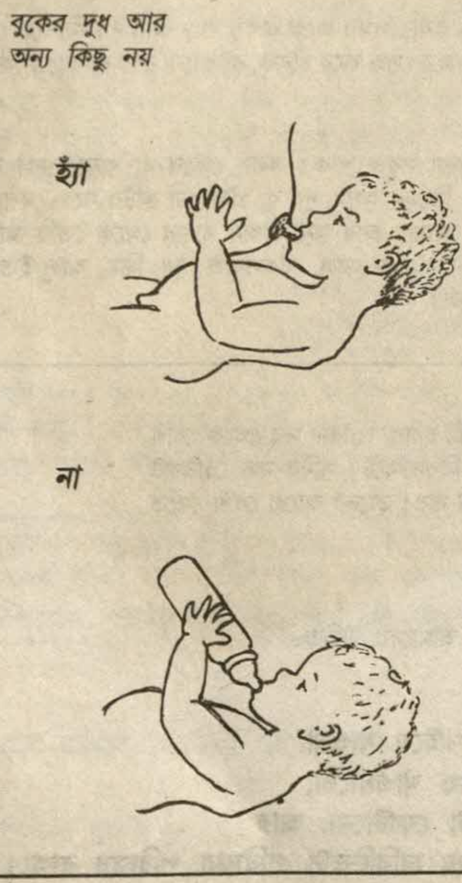
শিশুকে প্রতিদিন প্রচুর প্রোটিন, ভিটামিন, লোহা আর অন্য খনিজ পদার্থ দেয়া খাবার (১২৮ এবং ১২৯ পৃষ্ঠায় যেমন দেখানো হয়েছে) দিতে চেষ্টা করুন, যাতে সে শক্তসমর্থ আর সুস্থ হয়ে বেড়ে ওঠে।

শিশু ও লজেঞ্চুস টফি : ছোট ছেলেমেয়েদের লজেঞ্চুস, মিষ্টি আর সোডা লেমনেড খাওয়ার অভ্যেস করাবেন না। খুব বেশি মিষ্টি খেলে, তারা আর দরকারি খাবার খেতে চায় না। তাছাড়া মিষ্টি তাদের দাঁতের পক্ষেও খারাপ।

তবে, খাবার যখন কম থাকে, দুধ বা অন্য খাবারে একটু চিনি বা বীজতেল মিশিয়ে দিলে, খাবারের যে প্রোটিনটা ছোটরা পায়, তা আরো পুরোপুরি কাজে লাগে।

ছোটদের সবথেকে ভালো খাবার

প্রথম দুই থেকে চার মাস



চার মাস থেকে ২ বছর



খাবার সম্বন্ধে ক্ষতিকর ধারণা

১· প্রসবের পর মায়ের পথ্য:

অনেক জায়গায় একটা বিপজ্জনক ধারণা আছে যে, সদ্য প্রসব হয়েছে এমন মায়ের কয়েকটা খাবার খাওয়া উচিত নয়। এই লোক-পথ্য—যা নতুন মাকে কয়েকটা সবথেকে পুষ্টিকর খাবার খেতে নিষেধ করে, আর **ভাত বা রুটি আর জলের মত একটা ঝোল** ছাড়া আর বিশেষ কিছুই খেতে দেয় না—মাকে দুর্বল আর রক্তহীন করে দেয়। রক্তপাত আর সংক্রমণের সঙ্গে লড়বার ক্ষমতা কমিয়ে দিয়ে এটা তার মৃত্যুও ঘটাতে পারে।

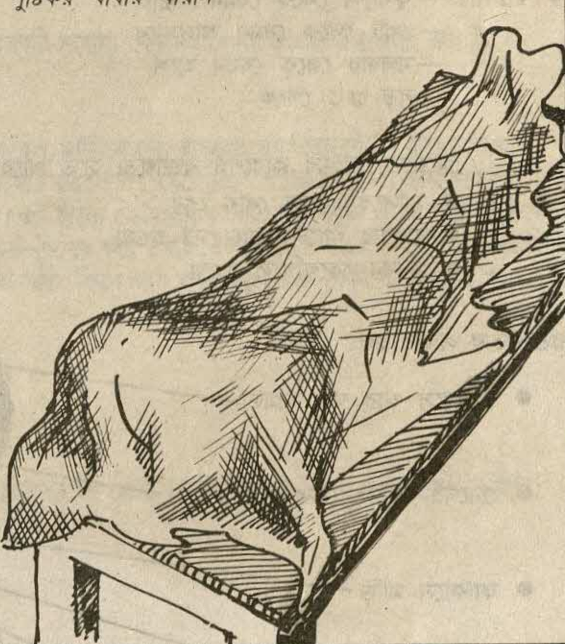
কাঁচা পোয়াতির বেশি দরকার
পুষ্টিতে ভরা যা কিছু খাবার।

সংক্রমণ আর রক্তপাতের সঙ্গে লড়াই করতে আর শিশুর জন্যে দুধ দিতে গেলে, **নতুন মায়ের বরবটি, ডিম, মুরগি, দুধ থেকে তৈরি খাবার, মাংস, মাছ, ফল আর শাকসবজির মত শরীর গড়ার খাবার প্রচুর পরিমাণে খাওয়া উচিত।** এ সব খাবারের কোনোটাতেই তার ক্ষতি হবে না। সবগুলোই তার স্বাস্থ্য আরো ভালো করবে।

এ একজন সুস্থ মা, যে প্রসবের পর অনেকরকম পুষ্টিকর খাবার খেয়েছে



এখানে একজন মা শুয়ে আছে, যে প্রসবের পর, ভয়ে কোনো পুষ্টিকর খাবার খায়নি



২· **এ কথাও সত্যি নয় যে, সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা বা কাশি হলে লেবু, পেয়ারা বা অন্য ফল খাওয়া খারাপ।** বরং লেবু বা টমেটোর মত ফলে প্রচুর সি ভিটামিন আছে, যা সর্দি আর অন্য সংক্রমণের সঙ্গে লড়াই করতে সাহায্য করতে পারে।

৩· **এ কথা সত্যি নয় যে ওষুধ খাওয়ার সময় মশলা বা পেয়ারা ধরনের খাবার খাওয়া যায় না।** তবে পেটের রোগ বা অন্য হজমের গোলমাল হলে চর্বি বা মশলা খেলে আরো ক্ষতি হয়—তা সে রোগী ওষুধ খাক বা নাই খাক।

লোকে যা যা খায় তার সঙ্গে যে সব স্বাস্থ্যের সমস্যার সম্বন্ধ আছে

কয়েকটি রোগ এড়ানোয় বা সারানোয় বিশেষ বিশেষ পথ্য সবথেকে ভালো কাজ দেয়। এখানে সেইরকম কয়েকটা রোগের কথা বলা হল:

রক্তাল্পতা

রক্তাল্পতায় লোকের রক্তটা পাৎলা হয়। রক্ত তৈরি করতে শরীরের যতটা সময় লাগে, যখন তার থেকেও তাড়াতাড়ি রক্ত পড়ে বা নষ্ট হয়ে যায় তখনই এটা ঘটে।

যদি খাবারের তালিকায় মাংস, সবুজ শাকসবজি বা লোহায় ভরা অন্য খাবার না থাকে, তবে রক্তাল্পতা হতে বা বেড়ে যেতে পারে। শিশুর ৬ মাস বয়স হয়ে যাবার পর যদি তাকে বুকের দুধের সঙ্গে অন্য খাবার না দেয়া হয়, তবে তার রক্তাল্পতা হতে পারে।

রক্তাল্পতার অন্যান্য কারণ হল:

- হুকওয়ার্মের সংক্রমণ
- আমাশা
- ম্যালেরিয়া
- রক্তপাত — ফুসফুস থেকে যেমন যক্ষ্মায়
  — পেট থেকে যেমন আলসারে
  — মলদ্বার থেকে যেমন অর্শে
  — বড় ক্ষত থেকে

মেয়েদের এইসব কারণেও রক্তাল্পতা হতে পারে:

- মাসিকের সময় বেশি স্রাব
- বারবার পেটের বাচ্চা নষ্ট হওয়া
- ঘনঘন ছেলেপিলে হওয়া

রক্তাল্পতার লক্ষণ হল:

- ফ্যাকাসে আর স্বচ্ছ চামড়া
- চোখের পাতার ভেতরটা ফ্যাকাসে
- ফ্যাকাসে মাড়ি
- চকচকে মসৃণ জিভ
- সাদাটে হাতের নখ



* দুর্বলতা আর ক্লান্তি

* রক্তাল্পতা সাংঘাতিক হলে রোগীর মুখ আর পা ফুলে যেতে পারে, তার নাড়ি দ্রুত চলতে পারে আর তার হাঁপ ধরে যেতে পারে। হাতের নখ সোজা বা কখনো কখনো চামচের মত হয়ে যায়। এটা দেখার জন্যে একটা নখের ওপর একফোঁটা জল দিন, যদি গড়িয়ে না পড়ে ওখানেই থেকে যায়, তবে নখ চামচের মত হয়ে গেছে।

রক্তাল্পতার চিকিৎসা আর এড়ানোর উপায়:

● **লোহায় ভরা খাবার খান।** বাজরা আর রাগিতে বেশ ভাল পরিমাণে লোহা আছে। সবুজ শাকসবজি—বিশেষ করে পালং, নটেশাক, বরবটি আর মটরশুঁটিতে প্রচুর লোহা আছে। লোহার পাত্রে তৈরি হয় বলে গুড়ে লোহা থাকে। মাংস, মাছ, মুরগি, ডিমে বেশি পরিমাণে লোহা আছে। মেটেতে খুবই বেশি আছে।

● যদি লোহায় ভরা খাবার পাওয়া কঠিন হয়, অথবা যদি রক্তাল্পতা সাংঘাতিক হয়, তবে রোগীর আয়রন (ফেরাস সালফেটের বড়ি পৃঃ ৪২৪) খাওয়া উচিত। পোয়াতি মেয়েদের রক্তাল্পতা হলে তাদের পক্ষে এটা বিশেষ দরকারি। প্রায় সব রক্তাল্পতার বেলায়ই লিভার একসট্র্যাকট বা বি-১২ ভিটামিনের থেকে ফেরাস সালফেটের বড়ি অনেক ভালো। সাধারণ নিয়ম হল **আয়রন মুখে দেয়া উচিত। ইনজেকশনে নয়।** কারণ আয়রনের ইনজেকশন বিপজ্জনক।

● যদি আমাশা (পাৎলা পায়খানার সঙ্গে রক্ত), হুকওয়ার্ম, ম্যালেরিয়া বা অন্য কোনো রোগ থেকে রক্তাল্পতা হয়, রোগটারও চিকিৎসা করা উচিত।

● যদি রক্তাল্পতা সাংঘাতিক হয় বা না সারে, তবে ডাক্তারি সাহায্য নেবেন। পোয়াতি মায়ের বেলায় এটা বিশেষ জরুরি।

অনেক মেয়ে রক্তাল্পতায় ভোগে। সাধারণতঃ এর কারণ হল, মাসিকের বা প্রসবের সময় তাদের যে রক্ত চলে যায় সেটা পূরণ করার মত যথেষ্ট লোহা ভরা খাবার তারা খায় না। রক্তাল্পতায় মেয়েদের পেটের শিশু নষ্ট হয়ে যাবার বা প্রসবের সময় বিপজ্জনক রক্তপাত হবার ঝুঁকি বেশি থাকে। এই জন্যে মেয়েদের বরবটি, গাঢ় সবুজ রঙের শাকসবজি, আর যতটা সম্ভব মাংস, মুরগি অর ডিম খাওয়া খুবই জরুরি—বিশেষ করে পোয়াতি অবস্থায়। পরিবার পরিকল্পনা করে দুটি শিশুর জন্মের মধ্যে ২ বা ৩ বছরের তফাৎ রাখলে মা শক্তি ফিরে পায় আর নতুন রক্ত তৈরি করে নিতে পারে (২০ পরিচ্ছেদ)।

উঁচু রক্তের চাপ (ব্লাড প্রেশার)

উঁচু রক্তের চাপ থেকে অনেক সমস্যা হতে পারে—যেমন হার্টের রোগ, মূত্রাশয়ের রোগ আর সন্ন্যাসরোগ। মোটা লোকদের রক্তের চাপ উঁচু হবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে।

উঁচু রক্তের চাপের লক্ষণ:

● ঘনঘন মাথাধরা, বেশির ভাগ সময় মাথার পেছনদিকে। বিশেষ করে সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময়

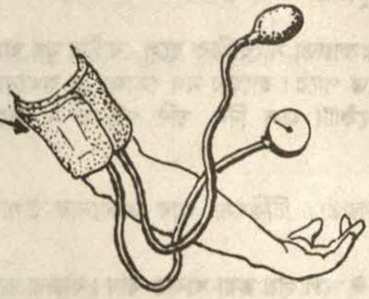
● বুক ধড়ফড় করা আর অল্প পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে ওঠা

● দুর্বলতা আর মাথা ঘোরা

● বাঁ কাঁধে আর বুকে মাঝে মাঝে ব্যথা

এই সব সমস্যা অন্য রোগ থেকেও হতে পারে। কাজেই, যদি কারো সন্দেহ হয় যে তার রক্তের চাপ উঁচু হয়েছে, তার স্বাস্থ্যকর্মীর সঙ্গে দেখা করে রক্তের চাপ মাপিয়ে নেয়া উচিত।

রক্তের চাপ মাপার যন্ত্র



উঁচু রক্তের চাপ এড়াতে বা তার জন্যে যত্ন নিতে কি করতে হয়:

- মোটা লোকদের ওজন কমানো উচিত (নিচে দেখুন)
- স্নেহজাতীয় খাবার আর বেশি চিনি বা শ্বেতসার দেয়া খাবার এড়িয়ে চলা উচিত। মাখন বা ঘিয়ের বদলে সবসময় বীজতেল ব্যবহার করবেন। সূর্যমুখীর তেল সবথেকে ভাল।
- রান্নায় বা খাবারের সঙ্গে অল্প নুন দেয়া বা একেবারে নুন না দেয়া উচিত।
- রক্তের চাপ খুব বেশি হলে, সেটা নামাতে স্বাস্থ্যকর্মী ওযুধ দিতে পারেন। মোটা হলে ওজন কমিয়ে (নিচে দেখুন) আর শরীর ও মনকে শান্ত রাখতে শিখে অনেকেই নিজের রক্তের চাপ কমাতে পারেন।

বেশি ওজন

খুব মোটা হওয়াটা স্বাস্থ্যকর নয়। খুব বেশি চর্বি—উঁচু রক্তের চাপ, হার্টের রোগ, পিত্তকোষের পাথর, বহুমূত্র, পায়ে আর পায়ের পাতায় গেঁটে বাত এবং অন্যান্য সমস্যা তৈরি করতে সাহায্য করে।



মোটা লোকদের এইভাবে ওজন কমানো উচিত:

- চর্বি দেয়া বা তেলা খাবার না খাওয়া।
- চিনি বা মিষ্টি না খাওয়া।
- বেশি পরিশ্রম আর ব্যায়াম করা।

- কোনো জিনিস **খুব বেশি না খাওয়া**—বিশেষ করে শ্বেতসার জাতীয় খাবার যেমন ভুট্টা, রুটি, আলু, ভাত, সাবু ইত্যাদি। মোটা লোকদের প্রতিবার খাবার সময় একখানার বেশি রুটি বা একমুঠোর বেশি ভাত খাওয়া উচিত নয়। তবে, তারা বেশি করে ফল, শাকসবজি আর চর্বিছাড়া মাংস খেতে পারে।

ওজনটা যদি কমিয়ে ফেলতে চাও,
খাচ্ছ যা তার অর্ধেক শুধু খাও।

বহুমূত্র

বহুমূত্রের রোগীর রক্তে খুব বেশি চিনি থাকে।

বহুমূত্রের লক্ষণ হল:

- ঘনঘন তেষ্টা পাওয়া
- ঘনঘন এবং বেশি পেচ্ছাপ
- অকারণে ক্লান্তি
- চুলকুনি আর অনেকদিন ধরে চামড়ার সংক্রমণ যেমন ফোড়া
- খিদে বেড়ে যাওয়া

আর সাংঘাতিক অবস্থায়:

- ওজন কমে যাওয়া
- হাতে বা পায়ে অসাড় ভাব বা ব্যথা
- পায়ের পাতায় ঘা যা সারতে চায় না
- জ্ঞান হারানো

এই সব লক্ষণ অন্য অনেক রোগ থেকেও হয়। বহুমূত্র হয়েছে কি না জানবার জন্যে রোগীর পেচ্ছাপ পরীক্ষা করে দেখা উচিত তাতে চিনি আছে কি না।

পরীক্ষা করার একটা উপায় হল ৫ মিঃ লিঃ **বেনেডিকটস সলিউশন** বলে একটা বিশেষ তরল ওষুধের সঙ্গে ৮ ফোঁটা পেচ্ছাপ ফোটানো। দু মিনিট ধরে ফোটান। যদি লোকটির বহুমূত্র থাকে তবে তরল জিনিসটার রং নীল থেকে বদলে সবুজ, হলদে বা লাল হয়ে যাবে। যদি তরল জিনিসটার রং নীলই থেকে যায়, তবে লোকটির বহুমূত্র হয়নি।

পরীক্ষা করার আর একটি উপায় হল বিশেষ কাগজের ফালি (যেমন ইউরিস্টিকস) ব্যবহার করা। পেচ্ছাপে ডোবালে যদি এগুলোর রং বদলে যায়, তবে লোকটির বহুমূত্র আছে। এই বিশেষ কাগজের ফালিগুলোর দাম খুব বেশি।

আরো লক্ষ্য করবেন যে বহুমূত্রের রোগীর পেচ্ছাপে পিঁপড়ে লাগে।

৪০ বছর বয়স হয়ে যাবার পর যদি কারো বহুমূত্র হয়, তবে সাধারণতঃ কোনো ওষুধ ছাড়াই, ঠিকমত খেয়ে এটা সব থেকে ভালোভাবে কমিয়ে রাখা যায়। **বহুমূত্রের রোগীর পথ্যটা খুবই জরুরি জিনিস, সারা জীবন তাকে এটা মেনে চলতে হবে।**

বহুমূত্রের পথ্য: **মোটা লোকদের বহুমূত্র হলে তাদের ওজন স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সেটা কমিয়ে যাওয়া উচিত। বহুমূত্রের রোগীদের একটুও চিনি বা মিষ্টি খাওয়া চলবে না।** তাদের এমন খাবার খাওয়া উচিত যা প্রোটিনে ভর্তি (গাঢ় সবুজ রঙের শাকসবজি, বরবটি, বদাম, ডিম, মাছ, চর্বিছাড়া মাংস ইত্যাদি) আর যাতে শ্বেতসার কম। তাদের ভাত, ভুট্টা, গম, আলু, ট্যাপিওকার (সাবু) মত খাবার আর কলা, আপেল, কাঁঠাল ইত্যাদি ফল বাদ দেয়া উচিত।

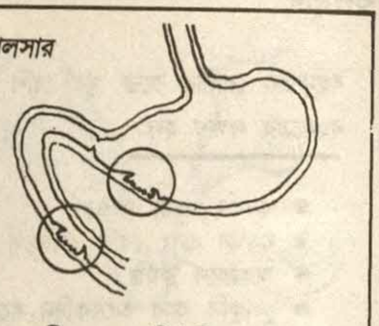
কোনো কোনো বহুমূত্রের রোগীর, বিশেষ করে কমবয়সীদের বিশেষ ওষুধ (ইনসুলিন) দরকার হয়।

বহুমূত্র সাংঘাতিক হলে স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ নেয়া উচিত।

পেটের আলসার, বুকজ্বালা আর অম্বল

সাধারণতঃ বেশি গুরুপাক বা তেলা খাবার খেলে বা বেশি মদ খেলে অম্বল আর বুকজ্বালা হয়। এতে পেটে বাড়তি এসিড তৈরি হয় আর তা থেকে পেটে বা বুকের মাঝখানে একটা অস্বস্তি বা জ্বালার ভাব হয়। অনেকে 'বুকজ্বালা' বলে যে বুকের ব্যথা হয় সেটাকে বদহজমের বদলে হার্টের অসুখ বলে ভুল করেন।

আলসার হল পাকস্থলীতে বা নাড়িভুঁড়িতে অনেকদিনের ঘা—যা বেশি এসিড থেকে হয়। পেটের ঠিক মাঝখানে একটা পুরোনো, একঘেয়ে (কখনো কখনো তীব্র) ব্যথা থেকে এটা চেনা যায়। **প্রায়ই খাবার বা দুধ খেলে ব্যথাটা কমে যায়।**



পাকস্থলীর বা নাড়িভুঁড়ির মধ্যে ঘা

খাবার ২ বা ৩ ঘন্টা পরে, একবার খাওয়া বাদ দিলে বা মদ বা তেল বা মশলা দেয়া খাবার খেলে ব্যথা বাড়ে। প্রায়ই রাত্রে ব্যথাটা বাড়ে।

আলসারটা সাংঘাতিক হলে, বমি হতে পারে, কখনো কখনো তাতে রক্ত থাকে। আলসার থেকে যে রক্তমাখা পায়খানা হয়, সেটা সাধারণতঃ আলকাৎরার মত কালো হয়।

এড়ানো আর সারানো:

● আলসারকে খোঁচায় তেমন খাবার না খেয়ে সেটাকে সারিয়ে তোলে এমন খাবার খান:

এগুলোতে আলসার সারে:	এগুলোতে কোনো ক্ষতি হয় না:	এগুলোতে আলসার বাড়ে
ফোটানো দুধ	সবরকম সেদ্ধ তরিতরকারি	মদ
পনীর	সেদ্ধ বা পোচ করা ডিম	কফি
সর/ননী	আলুসেদ্ধ	সিগারেট
ওট		লঙ্কা আর মশলা
কলা		তেলা খাবার

● আলসার আর অম্বলের পক্ষে দুধ সবথেকে ভালো ওষুধ। আলসার সাংঘাতিক হলে, প্রথম কয়েকদিন এক ঘন্টা অন্তর ১ গেলাস করে দুধ খাবেন আর শুধু প্রথম তালিকার খাবারগুলো (যেগুলো আলসার সারায়) খাবেন। কয়েকদিন পর, যখন ব্যথা কমে যাবে, মাঝের তালিকার খাবারগুলো (যেগুলো কোনো ক্ষতি করে না) খেতে শুরু করবেন। কয়েকমাস ধরে, প্রত্যেকবার খাবার সময়, তাছাড়া মাঝ-সকালে, বিকেলে, আবার শুতে যাবার আগে—(দিনে ৬ বার) কিছুটা করে দুধ খাওয়া বুদ্ধির কাজ।

● এনটাসিড—যেমন মিল্ক অব ম্যাগনেসিয়াম আর এলুমিনিয়াম হাইড্রোকসাইড (পৃঃ ৪১৬) পেটের এসিডের সঙ্গে লড়ে আলসার সারিয়ে তুলতে সাহায্য করে। যন্ত্রণা যদি সাংঘাতিক হয়, ব্যথার ওষুধে সাহায্য হতে পারে (পৃঃ ৪১৫)।

● আলসার সেরে যাবার পরেও লোকটির ডানদিকের তালিকায় (যেগুলোতে আলসার বাড়ে) কোনো খাবার বা পানীয় খাওয়া উচিত নয়, কারণ তাতে আবার আলসার হয়ে যেতে পারে। সম্ভব হলে শুতে যাবার সময় এনটাসিড বা দুধ খাওয়াটা চালিয়ে যাওয়া উচিত।

স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ কখন নিতে হবে:

● যদি প্রথম তালিকার খাবারগুলো (যেগুলো আলসার সারায়) খাওয়ার পরেও যন্ত্রণা না যায়, কিংবা আরো বাড়ে,

● যদি রোগী রক্তবমি করতে শুরু করে,

● যদি পায়খানা আলকাৎরার মত কালো হয়ে যায়,

● যদি হঠাৎ প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয়ে পেরিটোনাইটিসের লক্ষণ (পৃঃ ১০৮) দেখা যায়।

এই লোকদুটির পেটে আলসার হয়েছিল

এই লোকটি এইসব খাবার খেয়েছিল: *এই লোকটি এইসব খেয়েছিল:*



আর সেরে গিয়েছিল *আর আরো অসুস্থ হয়ে পড়েছিল*

সময় থাকতে আলসার সারিয়ে নেয়া দরকার। না হলে এর থেকে বিপজ্জনক রক্তপাত বা পেরিটোনাইটিস হয়ে যেতে পারে। রোগী যদি নিজের খাওয়াদাওয়ার বিষয়ে যত্ন নেয় তাহলে আলসার সাধারণতঃ ভালো হয়ে যায়। রাগ, উৎকণ্ঠা হলে বা ঘাবড়ে গেলে আলসার বাড়ে। শরীর-মন আলগা করে শান্ত হয়ে থাকতে শিখলে সাহায্য হয়। আবার আলসার হওয়া এড়াতে হলে সমানে যত্ন নিয়ে চলা দরকার।

আরো ভালো হল—**বুদ্ধি করে খাওয়াদাওয়া করে, বেশি মদ না খেয়ে আর সিগারেট খাওয়া বাদ দিয়ে আলসার হওয়াটা চিরকালের মত এড়িয়ে যাওয়া।**

কোষ্ঠকাঠিন্য

কারো শক্ত পায়খানা হলে আর ২ বা তার বেশি দিন ধরে পায়খানা না হলে বলা হয় যে তার কোষ্ঠকাঠিন্য হয়েছে। সাধারণতঃ ভুল খাওয়াদাওয়া (বিশেষ করে যথেষ্ট ফল, সবুজ শাকসবজি বা স্বাভাবিক ছিবড়েওয়ালা খাবার না খাওয়া) বা পরিশ্রমের অভাব থেকে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়।

জোলাপ নেয়ার থেকে বেশি করে জল খাওয়া আর বেশি ফল, শাকসবজি আর সাবু বা গমের ভুষির মত স্বাভাবিক ছিবড়েওয়ালা খাবার খাওয়া ভালো। বয়স্ক লোকদের নিয়মিত পায়খানা হবার জন্যে হাঁটা বা ব্যায়াম করার দরকার হতে পারে।

কারো ৩ বা তার বেশিদিন ধরে পায়খানা না হলে, সে মিল্ক অব ম্যাগনেশিয়ার মত কোনো হালকা নুনের জোলাপ খেতে পারে—অবশ্য যদি তার পেটে কোনো তীব্র ব্যথা না থাকে। **কিন্তু ঘনঘন জোলাপ খাবেন না।**

কখনই কড়া জোলাপ খাবে না—
হলে পেটে ব্যথা একদম মানা।

গলগণ্ড (গলায় ফোলা বা দলা)

থাইরয়েড বলে একটা গ্রন্থি অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গেলে গলায় যে ফোলা বা বড়সড় দলা হয়, তাই হল গলগণ্ড। বেশির ভাগ গলগণ্ড—খাবারে আয়োডিনের অভাব থেকে হয়। পাহাড়ি জায়গায় এটা বেশি দেখা যায়। কখনো কখনো পোয়াতি মায়ের খাবারে আয়োডিনের অভাব হলে শিশু মারা যায় বা জড়বুদ্ধি আর/অথবা কালা হয়ে জন্মায় (ক্রেটিনিজম পৃঃ ৩৬৫)। মায়ের গলগণ্ড না হলেও এরকম হতে পারে।

গলগণ্ড কি ভাবে এড়াতে বা সারাতে হয় আর ক্রেটিনিজম কি ভাবে এড়াতে হয়:

যারা পাহাড়ি অঞ্চলে, বা যে সব অঞ্চলে গলগণ্ড বেশি দেখা যায় সেখানে, বাস করে, তাদের প্রত্যেকেরই **আয়োডিন দেয়া নুন খাওয়া উচিত**। আয়োডিন দেয়া নুন খেলে সাধারণ জাতের গলগণ্ড এড়ানো যায় আর অনেক ধরনের গলগণ্ড সারানোর সাহায্য হয় (গলগণ্ড পুরোনো আর শক্ত হয়ে গেলে অপারেশন করে বাদ দিতে হয়, তবে এটা সাধারণতঃ দরকার হয় না।)

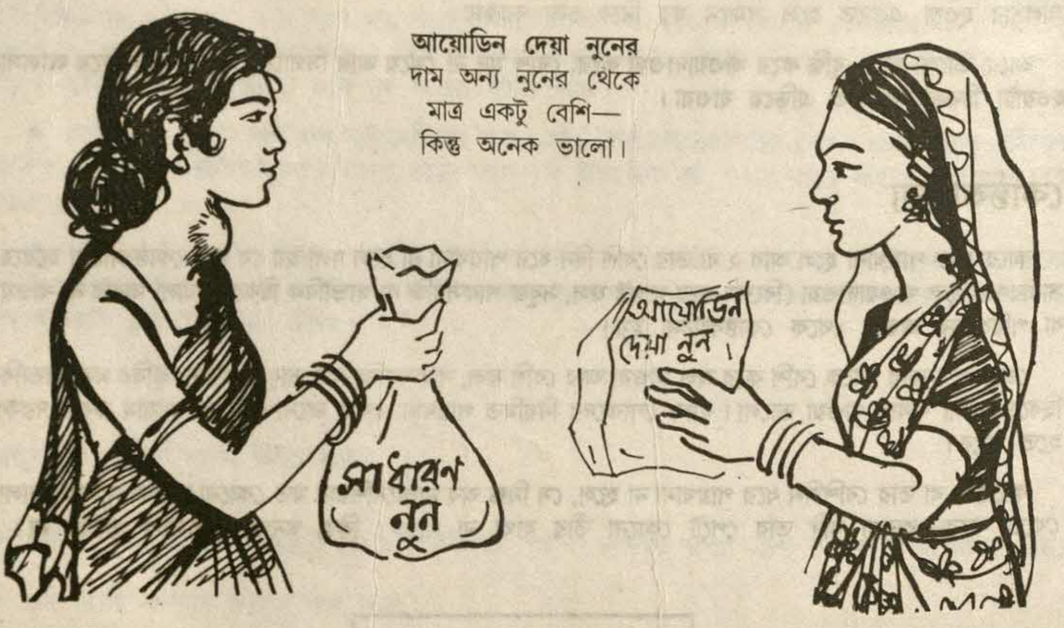
যদি আয়োডিন দেয়া নুন না পাওয়া যায়, টিংচার আয়োডিন ব্যবহার করুন। রোজ এক গেলাস জলে ১ ফোঁটা দিয়ে খাবেন। **সাবধান**: বেশি টিংচার আয়োডিন বিষাক্ত। দিনে শুধু ১ ফোঁটা খাবেন। বোতলটা ছোটদের নাগালের বাইরে রাখবেন। আয়োডিন দেয়া নুন অনেক নিরাপদ।

গলগণ্ডের বেশির ভাগ ঘরোয়া চিকিৎসায় কোনো কাজ হয় না। তবে, কাঁকড়া বা অন্য সমুদ্রের খাবারে আয়োডিন থাকে বলে, এগুলো খেলে কিছু কাজ হতে পারে। খাবারের সঙ্গে একটু সমুদ্রের গাছগাছড়া মিশিয়ে দিলেও আয়োডিন বাড়ে। কিন্তু সবথেকে সহজ উপায় হল আয়োডিন দেয়া নুন খাওয়া।

গলগণ্ড হওয়া কি করে এড়ানো যায়

কখনো সাধারণ নুন ব্যবহার করবেন না

সবসময় আয়োডিন দেয়া নুন ব্যবহার করবেন



দ্রষ্টব্য: যার গলগণ্ড হয়েছে সে যদি কাঁপে, খুব ঘাবড়ে যায় আর তার চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায় তাহলে সেটা হয়তো অন্য ধরনের গলগণ্ড (বিষক্রিয়ার গলগণ্ড)। ডাক্তারি পরামর্শ নিন।

ল্যাথিরিজম

খেসারির ডাল বেশি খেলে এই রোগ হয়। খেসারির ডালের চাষে খুব কম জল লাগে তাই এর চাষ শুকনো অঞ্চলে ভালো হয়। অন্য ডালের থেকে এটা সস্তা।

মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ আর বিহারের কিছু অংশে খেসারির ডালের চাষ হয়। এই সব অঞ্চলে মজুরি হিসেবে প্রায়ই এই ডাল দেয়া হয়। তাই যারা মজুরের কাজ করে তাদের মধ্যেই এই রোগ বেশি দেখা যায়।

ল্যাথিরিজম শরীরের স্নায়ু ব্যবস্থাকে আক্রমণ করে। যার এই রোগ হয় সে প্রথমটায় পা দুটো সোজা করতে পারে না। আড়ষ্টতা ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে এমন হয় যে রোগী আর হাঁটতে পারে না। শেষে তার নিচের অঙ্গে পুরোপুরি পক্ষাঘাত হয়ে যায়। একবার লক্ষণগুলো দেখা দিতে শুরু করলে, এই রোগের কোনো চিকিৎসা নেই।

ল্যাথিরিজম কি করে এড়ানো যায়:

এই সব করলে খেসারির ডালের মধ্যেকার বিষাক্ত জিনিসটার পরিমাণ কমানো যায়:

> ল্যাথিরিজম এড়াবার সব থেকে নিশ্চিত উপায় হল **খেসারির ডাল খাওয়া বন্ধ করা। মজুরি হিসেবে খেসারির ডাল নিতে অস্বীকার করুন।**

- **ভেজানো**—অনেকটা জল ফোটান। ডালটা এই গরম জলে ২ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখুন। জলটা ফেলে দিয়ে ডালটা ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে নিন। রোদে শুকিয়ে নিন।
- **আধ সেদ্ধ করা**—খেসারির ডাল ১২ ঘণ্টা ধরে জলে ডুবিয়ে রাখুন। তারপর আধঘণ্টা ধরে ডালটা দমে সেদ্ধ করুন। পরে এক ঘণ্টা ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে রাখুন।



পরিচ্ছেদ

১২ রোগ এড়ানো : কি ভাবে অনেক রোগ এড়ানো যায়

এক ছটাক এড়ানোর দাম এক সের চিকিৎসার থেকে বেশি! যদি আমরা সবাই **ভাল খেতে** আর **নিজের শরীর, ঘরদোর** আর **গ্রামকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন** রাখতে একটু বেশি যত্ন নিতাম, আর **আমাদের ছেলেমেয়েরা যেন সবরকম টিকে নেয় সেটা দেখতাম,** তাহলে আমরা বেশির ভাগ রোগ হবার আগেই এড়াতে পারতাম।

সাধারণ আর বড় রকমের সব রোগের বেশির ভাগই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আর ভালো খাওয়াদাওয়া দিয়ে এড়ানো যায়

আমাদের দেশে অনেকেরই একবেলা খাওয়ার মতও যথেষ্ট খাবার বা যথেষ্ট খাবার জলও জোটে না। কিন্তু এইসব লোক খাবার বা জল পায় না কেন?

- গ্রামের জমি আর একমাত্র কুয়োটা উঁচু জাতের লোকদের দখলে রয়েছে বলে কি?
- ভালো খাবার বা খাবার জল ফোটাবার জন্যে জ্বালানি কাঠ কিনবার মত পয়সা লোকের নেই বলে কি?
- গ্রামের প্রত্যেক লোকের নিজের খরচ চালাবার মত জমি বা কাজ নেই বলে কি?
- লোকে ভবিষ্যতের দিকে তাকায় না বা ভেবেচিন্তে কাজ করে না বলে কি? তা সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করলে আর সবকিছু ভাগ করে নিলে, তারা যে নিজেদের অবস্থা বদলে ফেলতে পারে তারা বোঝে না বলে কি?

স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে আপনার কাজ হল লোককে তাদের নিজের অবস্থা বুঝে তার উন্নতির জন্যে কিছু করতে সাহায্য করা। এইসব প্রশ্নের উত্তর পেতে যদি আপনি লোককে সাহায্য করেন তবেই রোগ এড়ানোর ব্যাপারে আপনার পরামর্শের মানে থাকবে।

সুপুষ্টি যে শুধু রোগ এড়ায় তাই নয়, রোগীকে রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করতেও সাহায্য করে। ১১ পরিচ্ছেদ দেখুন।

অন্ত্রের, চামড়ার, চোখের, ফুসফুসের আর সমস্ত শরীরের অনেক রকম সংক্রমণ এড়াবার জন্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা খুবই জরুরি। নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা (স্বাস্থ্যবিধি) আর সাধারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা (জলের আর ময়লা নিকাশের ব্যবস্থা)—দুটোই দরকারি।

কেমন করে রোগ ছড়ায়

স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চলা আর জলের আর ময়লা নিকাশের ব্যবস্থার অসুবিধের জন্যে অন্ত্রের অনেক সাধারণ সংক্রমণ একজনের থেকে আর একজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। যার সংক্রমণ হয়েছে, তার মলের সঙ্গে হাজার হাজার জীবাণু আর কৃমি (বা তাদের ডিম) বেরিয়ে আসে। নোংরা আঙুল, *দূষিত* খাবার বা জলের মধ্যে দিয়ে এগুলো একজনের মল থেকে অন্যের মুখে চলে যায়। এইভাবে *মল থেকে মুখে* যে সব রোগ ছড়িয়ে পড়ে তার মধ্যে আছে:

- নানা রকম অন্ত্রের কৃমি
- পাৎলা পায়খানা, আমাশা (এমিবা আর পরজীবী থেকে হয়)
- কলেরা, টাইফয়েড, আর হেপাটাইটিস
- পোলিওর মত কয়েক ধরনের রোগ

সরাসরি ছোঁয়াচ: যার সংক্রমণ হয়েছে তাকে ছুঁলে, তার জামাকাপড় ব্যবহার করলে, তার বিছানা বা কম্বলে শুলে এইসব রোগ ছড়ায়। এগুলোর মধ্যে আছে:

- স্কেবিস (চুলকুনি) বা দাদ ইত্যাদি চামড়ার রোগ
- উকুন, এঁটুলি
- সিফিলিস, গনোরিয়ার মত যৌন রোগ যৌন সংস্পর্শে ছড়ায়

কাশি, হাঁচি: কেউ কাশলে বা হাঁচলে তার শ্বাসনালীর ভেতরের জীবাণুগুলো খুব জোরে বেরিয়ে আসে। অন্যেরা সেইসব জীবাণু শ্বাসের সঙ্গে টেনে নিলে তাদেরও রোগটা হতে পারে। যার সংক্রমণ হয়েছে সে যদি কফ ফেলে, কফটা চারপাশে ধুলোর সঙ্গে মিশে যায়। কফে রোগের জীবাণু থাকে। ধুলোটা বাতাসে ওড়ে, আর অন্যেরা এই বাতাসে শ্বাস নিলে তাদেরও রোগ হয়। এই ধরনের রোগের মধ্যে আছে:

- যক্ষ্মা
- হাম
- সাধারণ সর্দি
- নিউমোনিয়া
- ডিপথিরিয়া

পোকামাকড় এবং অন্য পশুপাখি দিয়ে: রোগ ঘটায় এমন কিছু জীবাণু কোনো পোকা বা পশুপাখির শরীরে থাকে। পোকা কামড়ালে, সংক্রমিত জানোয়ারের মাংস কাঁচা খেলে বা জানোয়ার কামড়ালে এইসব জীবাণু ছড়িয়ে যায়।

যে সব রোগ এইভাবে ছড়ায় তাদের মধ্যে আছে:

- ম্যালেরিয়া
- ফাইলেরিয়া (গোদ)
- ফিতে কৃমির সংক্রমণ
- জলাতঙ্ক

মল থেকে মুখে সংক্রমণ:

এইসব সংক্রমণ খুব সোজাসুজি চলে আসতে পারে। যেমন: একটি ছোট্ট ছেলের কৃমি হয়েছে, সে মলত্যাগ করার পর হাত ধুতে ভুলে গিয়ে তার বন্ধুকে একটা বিস্কুট দিল। তার হাত তখনো তার নিজের মল লেগে নোংরা হয়ে রয়েছে, তাতে শয়ে শয়ে ছোট্ট ছোট্ট কৃমির ডিম (এত ছোট্ট যে দেখা যায় না) লেগে রয়েছে। এইসব কৃমির ডিমের কয়েকটা বিস্কুটে লেগে গেল। তার বন্ধু যখন বিস্কুটটা খেল, তখন সে কৃমির ডিমগুলোও খেয়ে ফেলল।



কিছুদিনের মধ্যে বন্ধুটিরও কৃমি হবে। তার মা হয়তো বলবে যে বেশি মিষ্টি খেয়েছে বলেই এটা হয়েছে। কিন্তু না। এটা হয়েছে সে মল খেয়েছে বলে।

অনেক সময় শুয়োর, কুকুর, মুরগি এবং অন্যান্য পশুপাখি অন্ত্রের রোগ আর কৃমির ডিম ছড়ায়। যেমন,



যদি বাড়ির লোকে নিচের সাবধানতাগুলোর **একটাও** বা সবগুলোই নিত, তাহলে রোগ ছড়ানোটা এড়ানো যেত।

- যদি লোকটি পায়খানা বা আলাদা ঘর ব্যবহার করত।
- পায়খানাঘর না থাকলেও, যদি লোকটি মাটি দিয়ে তার মলটা চাপা দিত।
- যদি বাড়ির লোকে বাড়ির ভেতরে শুয়োর আসতে না দিত।
- শুয়োর যেখানে এসেছিল সেখানে যদি শিশুকে খেলতে না দেয়া হত।
- শিশুকে নাড়াচাড়া করবার পর খাবার তৈরি করবার আগে যদি মা হাত ধুত।

মাছি আর অন্য পোকামাকড় পেটের নানা সংক্রমণ ছড়ায়। যেমন:



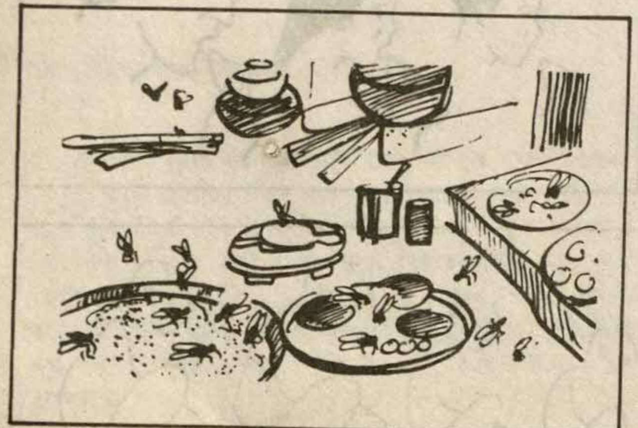
কলেরার রোগী বাড়ির কাছে মলত্যাগ করল।



তার মলে মাছি বসলে কলেরার জীবাণু মাছির গায়ে লেগে গেল।



এরকম কতকগুলো মাছি রান্নাঘরে ঢুকল।



মাছি গুলো খাবারে বসে পা ঘষল।



বাড়ির লোকে সেই খাবার খেল।



বাড়ির লোকের কলেরা হল।



মা বাড়ির কাছে মলত্যাগ করল।



তার মলেও মাছি বসল।



এইসব মাছির মধ্যে কয়েকটা মিষ্টির দোকানে ঢুকে মিষ্টির ওপর বসল।



একটি ছোট ছেলে সেইসব মিষ্টি কিনে খেল।



কয়েকদিনের মধ্যে তারও কলেরা হল।

যদি লোকে নিচের সাবধানতাগুলোর **একটাও** নিত, কলেরা ছড়িয়ে যাওয়াটা এড়ানো যেত:

- যদি লোকটি এবং অন্য রোগীরা মলত্যাগের জন্যে পায়খানা বা আলাদা ঘর ব্যবহার করত।
- পায়খানা না থাকলেও তারা যদি মাটি দিয়ে তাদের মল চাপা দিত।
- রান্নাঘরে খাবার যদি ঢাকা থাকত।
- যদি দোকানে মিষ্টিগুলো ঢাকা থাকত।
- শিশুটি যদি আঢাকা মিষ্টি না কিনত।

কলেরা আর যে সব রোগ মাছি থেকে ছড়ায় তা এড়াতে হলে:

- সম্ভব হলে, রান্নাঘরের দরজায় আর জানলায় জাল লাগান, যাতে মাছি ঢুকতে না পারে।
- সব খাবার আর জল ঢাকা দিয়ে রাখুন।

নোংরা জল খেয়েও অনেক অন্ত্রের আর পেটের রোগ ছড়ায় যেমন:



এই লোকটির হেপাটাইটিস (জণ্ডিস বা ন্যাবা) হয়েছে।



সে একটা পুকুরের ধারে মলত্যাগ করল। রোগের জীবাণু জলে চলে গেল।



মেয়েটি পুকুর থেকে বাড়িতে জল নিয়ে গেল।



তার বাড়ির লোক জলটা খেল।



তাদের সকলেরই হেপাটাইটিস হল।



শিশুটি মলত্যাগ করে তার কাপড়চোপড় নোংরা করে ফেলল।

মা সেগুলো খোলা কুয়োর কাছে কাচল





আর একটি মেয়ে কুয়ো থেকে জল নিল।



তার বাড়ির লোক সেই জল খেল।



তার বাড়ির লোকেরও হেপাটাইটিস হল।

লোকে যদি নিচের সাবধানতাগুলোর **একটাও** নিত, তাহলে হেপাটাইটিস ছড়িয়ে যাওয়াটা এড়াতে পারত:

- খাবার জল যেখান থেকে নেয়া হয়, লোকটি যদি তার কাছে মলত্যাগ না করত।
- যদি দুটি মেয়েই বাড়ির লোককে জল খেতে দেবার আগে সেটা ফুটিয়ে নিত।
- যদি মেয়েটি কুয়োর কাছে নোংরা কাপড়চোপড় ন্া কাচত।
- যদি কুয়োটাকে পাঁচিল আর বাঁধানো পাড় দিয়ে রক্ষা করা হত।

অন্ত্রের সংক্রমণ সহজেই ছড়িয়ে যায় বলে প্রায়ই একটা গোটা গ্রাম বা এলাকাকে একই সময়ে আক্রমণ করে (মহামারী)।

যদি আপনার গ্রামে অনেকের পাৎলা পায়খানা, কৃমি বা অন্য অন্ত্রের পরজীবী হয়, বুঝবেন যে লোকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে যথেষ্ট যত্ন নিচ্ছে না। যদি অনেক ছেলেপিলে পাৎলা পায়খানায় মারা যায়, তাহলে খুব সম্ভব অপুষ্টিও কতকটা সমস্যা। **পাৎলা পায়খানা থেকে মৃত্যু এড়াতে হলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আর সুপুষ্টি—দুইই সমান জরুরি** (পৃঃ ১৮৫ আর ১১ পরিচ্ছেদ দেখুন)।

সরাসরি ছোঁয়া থেকে সংক্রমণ:

ছোঁয়া বা এক জামাকাপড়, বিছানা, কম্বল, গামছা ব্যবহার করা থেকে এই ধরনের অনেক রোগ ছড়ায়। এমনকি পাশাপাশি বসে থাকলেও এরকম কয়েকটা রোগ ছড়িয়ে পড়ে। যেমন: উকুন, চুলকুনি (স্কেবিস)।





যদি ছেলেটি আর তার বাড়ির লোকে নিচের সাবধানতাগুলোর একটাও নিত, তাহলে চুলকুনি ছড়িয়ে পড়াটা এড়ানো যেত:

- যদি ছেলেরা আলাদা শুত আর স্কুলে আলাদা বসত।
- যখন বাড়ির লোকে জানল যে ছেলেটির চুলকুনি হয়েছে তখন যদি তারা সকলে একসঙ্গে সেটার চিকিৎসা করাত।
- যদি তারা নিয়মিত কাপড়চোপড় কেচে রোদে শুকিয়ে নিত।

যৌন রোগও যৌন সংসর্গ থেকে একজনের থেকে অন্যের মধ্যে সরাসরি ছড়ায়। উদাহরণ:



এই লোকটির সিফিলিস হয়েছে



সে একজন অচেনা মেয়ের সঙ্গে যৌন সংসর্গ করল









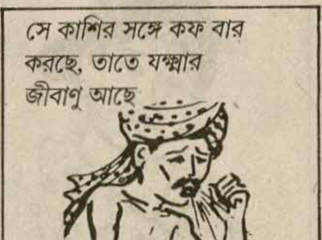


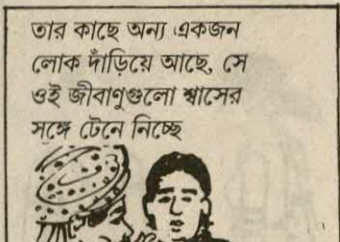
সব যৌন রোগ যৌন সংসর্গ থেকেই ছড়ায়। যদি আপনার কোনো যৌন রোগ হয়েছে বলে সন্দেহ হয়, স্বাস্থ্যকর্মীকে বলুন। যতদিন না স্বাস্থ্যকর্মী বলে, কারো সঙ্গে যৌন সংসর্গ করা বন্ধ রাখুন।

কাশি আর হাঁচি থেকে যে সব সংক্রমণ ছড়ায় :

যে সব জীবাণু থেকে এইসব রোগ হয় সেগুলো আমাদের চারপাশের বাতাসে স্বাভাবিক ভাবেই থাকে বলে এইসব সংক্রমণ সহজে হয়। উদাহরণ :








তারও যক্ষ্মা হল
সে হুঁকো টানল আর জীবাণুগুলো হুঁকোতে চলে গেল
তার বন্ধু একই হুঁকো টানল আর তারও যক্ষ্মা হল
সে তার পোয়াতি স্ত্রীর কাছে জীবাণুগুলো ছড়িয়ে দিল (কাশির সঙ্গে)
মেয়েটির প্রসব হল। কিছুদিনের মধ্যে শিশুটিরও যক্ষ্মা হল
মা তার রোগ সারাতে চিকিৎসা শুরু করল। স্বাস্থ্যকর্মী তাকে বলল যে তাকে অন্ততঃ দেড় বছর চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে।
ছ-মাস পরে মা অনেক সুস্থ বোধ করল
সে চিকিৎসা বন্ধ করে দিল আর তার শরীরের ভেতরের জীবাণুগুলোর ওষুধে প্রতিরোধ জন্মে গেল





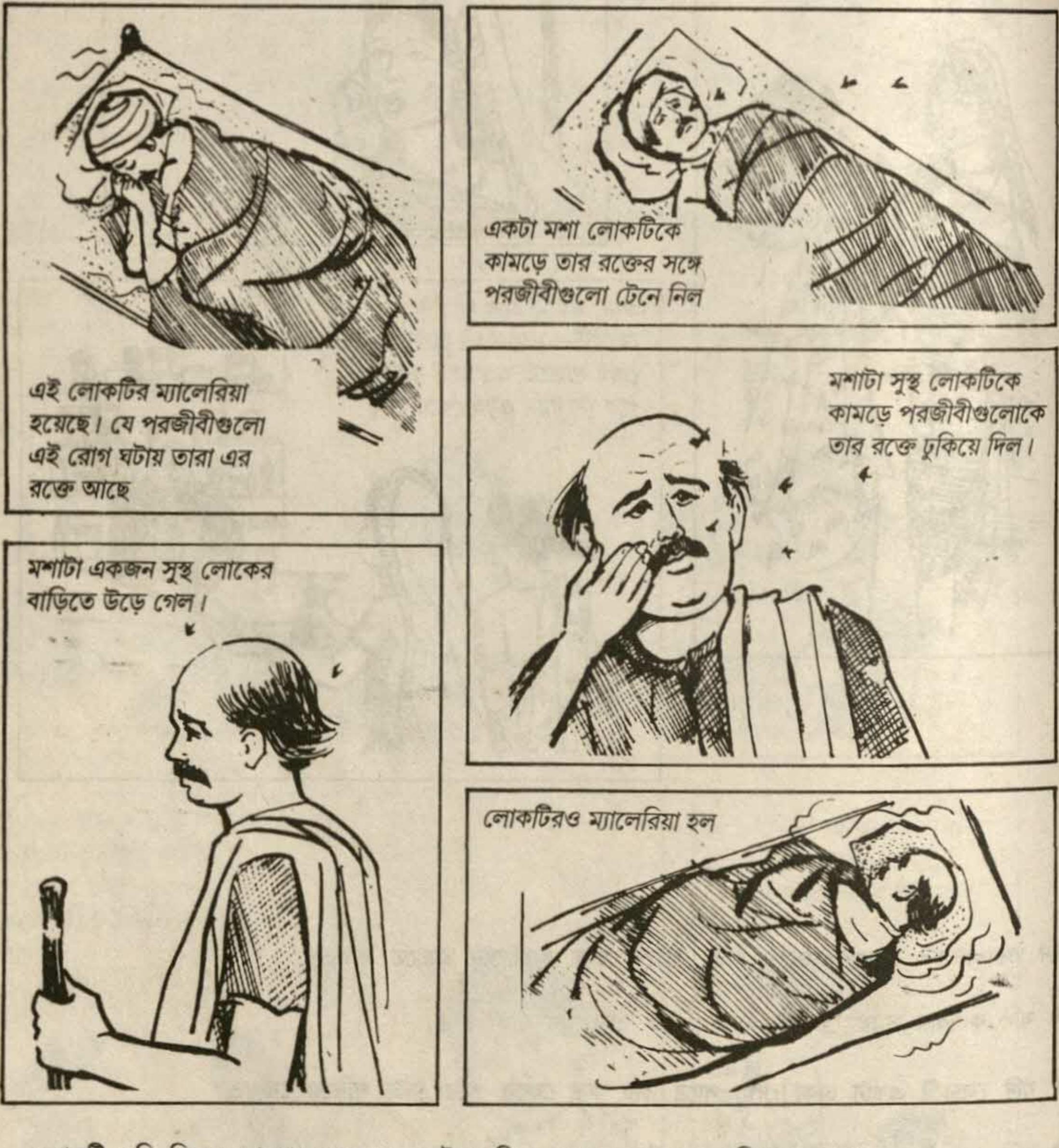


যদি ওরা নিচের সাবধানতাগুলো নিত, তাহলে যক্ষ্মা ছড়ানোটা এড়াতে পারত:

- যদি কাশবার সময় লোকটি নিজের নাক আর মুখ ঢাকা দিত।
- যদি লোকটি একটা ঢাকা দেয়া পাত্রে তার কফ ফেলে পরে সেটা পুড়িয়ে ফেলত।
- যদি লোকটি তার বন্ধুকে হুঁকোটা না দিত।
- যদি তারা সকলেই সময় থাকতে চিকিৎসা করাত।
- যদি মা ১½ বছর ধরে নিয়মিত ভাবে সম্পূর্ণ চিকিৎসা করাত।
- যদি যক্ষ্মা হবার আগেই তারা সকলে যক্ষ্মার টিকে নিত।

পোকামাকড় আর অন্য পশুপাখি থেকে যে সব রোগ ছড়ায় :

এইভাবে ছড়ানো রোগের মধ্যে আছে ম্যালেরিয়া।



লোকটি যদি নিচের সাবধানতাগুলোর **একটাও** নিত, তাহলে তার ম্যালেরিয়া হত না:

- যদি সে মশারির নিচে বা গা ঢাকা দিয়ে শুত।
- যদি সে বাড়িতে মশা মারা তেল ছড়িয়ে দিত।

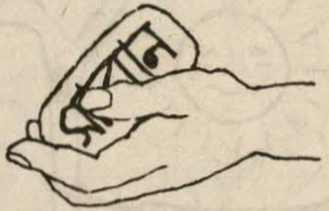
যে সব উপায় এখানে দেখানো হল, বেশির ভাগ ধরনের সংক্রমণ সেইভাবে একজনের থেকে আর একজনের শরীরে ছড়ায়। নিজেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে আর আশেপাশে পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা থাকলে এগুলোর বেশির ভাগই এড়ানো যায়।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মূল বিধি

নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা (স্বাস্থ্যবিধি):



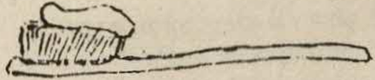
১· সকালে ঘুম থেকে উঠে, মলত্যাগ করার পর, আর খাওয়ার বা খাবার তৈরি করার আগে সর্বদা সাবান দিয়ে হাত ধোবেন। **হাত ধোবার জন্যে মাটি বা কাদা ব্যবহার করবেন না।**



২· প্রায়ই স্নান করবেন—গরমকালে রোজ। কঠিন পরিশ্রম করার বা ঘেমে যাবার পর স্নান করবেন। ঘনঘন স্নান করলে চামড়ার সংক্রমণ, খুসকি, ব্রণ, চুলকুনি আর র‍্যাশ এড়ানো যায়। রোগীদের আর শিশুদেরও রোজ স্নান করানো উচিত।

৩· যে সব অঞ্চলে বেশি হুকওয়ার্ম আছে, সেখানে খালি পায়ে ঘুরবেন না বা শিশুদেরও ঘুরতে দেবেন না। হুকওয়ার্মের সংক্রমণ থেকে সাংঘাতিক রক্তাল্পতা হয়। এই কৃমিগুলো পায়ের পাতার চামড়া দিয়ে ঢোকে (পৃঃ ১৯৫)।



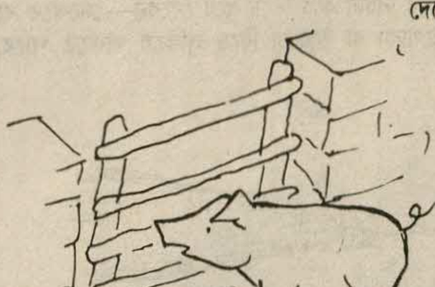


৪· প্রতিদিন আর প্রতিবার মিষ্টি খাওয়ার পর দাঁত মাজবেন। টুথব্রাশ আর টুথপেষ্ট যদি না থাকে নুন আর খাবার সোডা দিয়ে দাঁত ঘষে নেবেন (পৃঃ ২৭৪)।

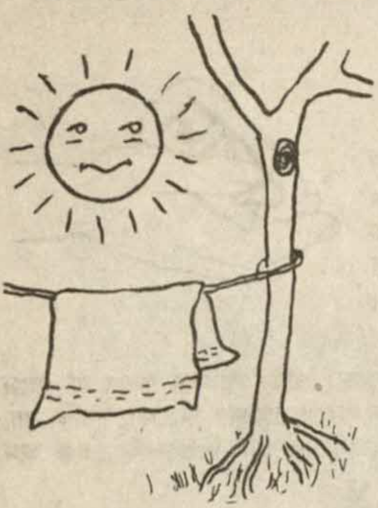
বাড়ির ভেতরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা:

১· বাড়ির ভেতরে বা যেখানে শিশুরা খেলা করে সেখানে শুয়োর ঢুকতে দেবেন না।

২· কুকুরদের, শিশুদের চাটতে বা বিছানার ওপরে উঠতে দেবেন না। কুকুরও রোগ ছড়াতে পারে।







৩· যদি বাড়ির কাছে ছোটরা বা কোনো পশুপাখি মলত্যাগ করে, তখনই সেটা পরিষ্কার করে ফেলবেন। তাদের পায়খানা ব্যবহার করতে বা অন্ততঃ বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে যেতে শেখান।



৪· চাদর আর কম্বল প্রায়ই রোদে টাঙিয়ে বা মেলে দেবেন। যদি ছারপোকা হয়, তবে একই দিনে খাটে ফুটন্ত জল ঢেলে দেবেন আর চাদর আর কম্বলগুলো কেচে ফেলবেন।

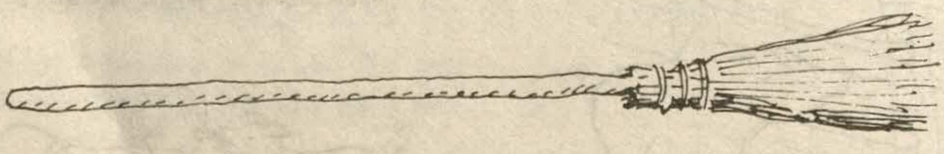


৫· বাড়ির সকলেরই ঘনঘন উকুনের চিকিৎসা করাবেন (পৃঃ ২৪২)। উকুন আর কুকুরের মাছি নানা রোগ বয়ে আনে। কুকুর আর অন্য যে সব জন্তুজানোয়ার মাছি আনে তাদের বাড়ির ভেতরে আসা উচিত নয়।



৬· মাটিতে থুতু ফেলবেন না। থুতু থেকে রোগ ছড়াতে পারে। কাশবার ব হাঁচবার সময় মুখটা নিজের হাত বা একটা কাপড় বা রুমাল দিয়ে ঢাকা দেবেন।

৭· প্রায়ই বাড়ি পরিষ্কার করবেন। মেঝে, দেয়াল আর আসবাব পত্রের নিচটা ঝাঁট দিয়ে ধুয়ে দেবেন—মেঝেতে বা দেয়ালে যদি এমন ফাটল বা গর্ত থাকে যেখানে আরশোলা, ছারপোকা বা কাঁকড়া বিছে লুকিয়ে থাকতে পারে, সেগুলো বুজিয়ে ফেলবেন।



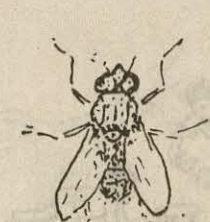
৮· পোকামাকড় দূর করতে কাঁচা বাড়ি নিয়মিত কাদা দিয়ে নিকিয়ে নেবেন।

খাওয়া আর জল খাওয়ায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা :



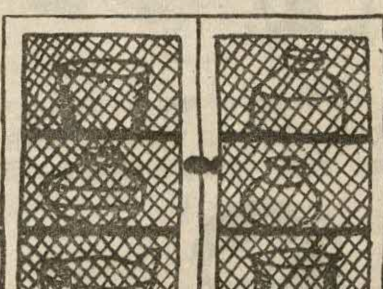
১· পরিষ্কার জল সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকলে সব জলটাই খাবার আগে ফুটিয়ে নেয়া সবথেকে ভালো। ছোট শিশুদের বেলায় আর যখন অনেক লোকের পাৎলা পায়খানা, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস বা কলেরা হয়, সেই সব সময়—এটা বিশেষ জরুরি। ডোবা বা নদীর জল পরিষ্কার দেখালেও ফুটিয়ে ব্যবহার না করলে রোগ ছড়াতে পারে।

ফোটানো জল মাটির পাত্রে ঢাকা দিয়ে রাখুন।



২· মাছি বা অন্য পোকামাকড়কে খাবারে বসতে বা ঘুরে বেড়াতে দেবেন না। এইসব পোকামাকড় জীবাণু নিয়ে আসে আর রোগ ছড়ায়। খাবারের টুকরো বা এঁটো বাসনপত্র ফেলে রাখবেন না, তাতে মাছি আসে আর জীবাণু জন্মায়। খাবার ঢেকে রেখে বা জালের আলমারি বা বাকসতে রেখে রক্ষা করুন।

সবসময় ঢাকা দিয়ে রাখা খাবার খাবেন



৩· আঢাকা খাবার খাবেন না। লাড্ডু, জিলিপি, মিষ্টি, কাটা ফল ইত্যাদি যে সব খাবার রাস্তায় বিক্রি করা হয়, সেগুলো সাধারণতঃ আঢাকা থাকে। হয়তো দেখে থাকবেন যে সেগুলোর ওপর মাছি বসে। তারা খাবারকে দূষিত করে। সেই খাবার খেলে পাৎলা পায়খানা হতে পারে। এইভাবে কলেরা আর টাইফয়েড ছড়ায়।



৪· চাষ বা বাগানের জন্যে যে জল ব্যবহার করা হয় সেটা প্রায়ই পরিষ্কার থাকে না। জলে পাৎলা পায়খানা ঘটাবার জীবাণু থাকে। ফল আর অন্য তরিতরকারি, বিশেষ করে গাজর, মূলো, শালগম ইত্যাদি যে সব তরকারি মাটির নিচে জন্মায়, এই জলে থাকে বলে সেগুলিতেও জীবাণু থাকে। **খাবার আগে সবসময় তরিতরকারি আর ফল ধুয়ে নেবেন।**



৫· মাটিতে খসে পড়া ফল খাবার আগে ভাল করে ধুয়ে নেবেন। ছোটদের মাটিতে পড়ে যাওয়া খাবার কুড়িয়ে খেতে দেবেন না— আগে সেটা ধুয়ে নেবেন।



৬· মাংস ভাল করে সেদ্ধ করে তবেই খাবেন। দেখবেন যেন সেঁকা মাংসের, বিশেষতঃ শুয়োরের মাংসের ভেতরে কাঁচা থেকে না যায়। কাঁচা শুয়োরের মাংসে বিপজ্জনক রোগ থাকে।



৭· বাসি বা দুর্গন্ধযুক্ত খাবার খাবেন না। সেটা বিষাক্ত হতে পারে। টিন ফুলে গেলে বা কাটবার সময় তার থেকে পিচকিরি দিয়ে কিছু বেরোলে, সেই টিনের খাবার খাবেন না। টিনের মাছ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হবেন।





৮· যক্ষ্মা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, সর্দি বা অন্য ছোঁয়াচে রোগ হলে, রোগীর উচিত অন্যদের থেকে আলাদা খাওয়া। রোগীর থালাবাসন ফুটিয়ে নিয়ে তবে তাতে অন্যদের খেতে দেয়া উচিত।

আপনার ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য কি ভাবে রক্ষা করবেন :



←এর মত একজন অসুস্থ শিশুর
সুস্থ শিশুদের থেকে আলাদা শোয়া উচিত→

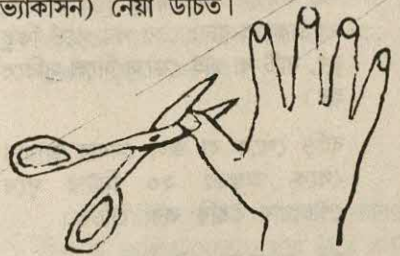


১· অসুস্থ ছেলেপিলের বা যার ঘা, চুলকুনি বা উকুন হয়েছে, তার সুস্থ শিশুদের থেকে আলাদা শোয়া উচিত। হুপিং কাশি, হাম বা সর্দির মত ছোঁয়াচে রোগ হলে, ছেলেপিলেদের, সম্ভব হলে আলাদা ঘরে শোয়া উচিত, আর তাদের কচি বাচ্চা বা ছোট শিশুর কাছে আসতে দেয়া উচিত নয়।

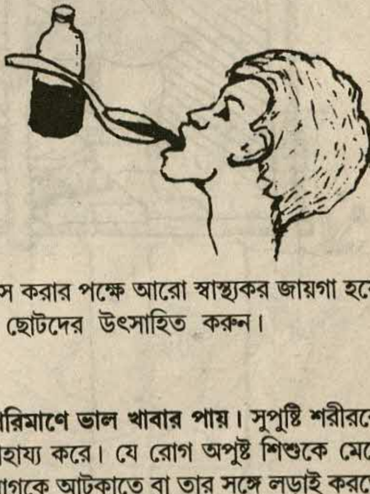


২· শিশুদের যক্ষ্মার থেকে বাঁচান। যাদের পুরোনো কাশি বা যক্ষ্মার অন্যান্য লক্ষণ আছে তাদের কাশির সময় মুখ ঢাকা উচিত। তাদের কখনো শিশুদের সঙ্গে এক ঘরে শোয়া উচিত নয়। তাদের উচিত—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে গিয়ে চিকিৎসা করানো।

যক্ষ্মা রোগীর সঙ্গে যে শিশুরা থাকে তাদের যক্ষ্মার টিকে (বি সি জি ভ্যাকসিন) নেয়া উচিত।



৩· শিশুদের প্রায়ই স্নান করাবেন, তাদের জামাকাপড় বদলে দেবেন আর নখ কেটে দেবেন। বড় বড় নখের নিচে প্রায়ই জীবাণু আর কৃমির ডিম লুকিয়ে থাকে।



৪· শিশুদের ছোঁয়াচে রোগ হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের চিকিৎসা করাবেন, যাতে রোগ অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে না পড়ে।

৫· এই পরিচ্ছেদে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার যে সব বিধি দেয়া হয়েছে সেগুলো মেনে চলুন। শিশুদের এগুলো মেনে চলতে শেখান আর এগুলো কেন জরুরি তা বুঝিয়ে দিন।

যে সব কাজকর্মে, বাড়ি বা গ্রাম—বাস করার পক্ষে আরো স্বাস্থ্যকর জায়গা হয়ে ওঠে, সেগুলোতে সাহায্য করতে ছোটদের উৎসাহিত করুন।



৬· **দেখবেন, শিশুরা যেন যথেষ্ট পরিমাণে ভাল খাবার পায়।** সুপুষ্টি শরীরকে অনেক রোগ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। যে রোগ অপুষ্ট শিশুকে মেরে ফেলে, পুষ্ট শিশু সাধারণতঃ সেই রোগকে আটকাতে বা তার সঙ্গে লড়াই করতে পারে (১১ পরিচ্ছেদ পড়ুন)।

সাধারণ পরিচ্ছন্নতা (জলের আর ময়লা নিকাশের ব্যবস্থা) :

১· সাধারণের ব্যবহারের কুয়ো আর পুকুর পরিষ্কার রাখবেন। লোকে যেখান থেকে খাবার জল নেয়, তার কাছে জন্তুজানোয়ারদের যেতে দেবেন না। জন্তুজানোয়ারদের বাইরে রাখতে, দরকার হলে, জায়গাটার চারিদিকে একটা বেড়া তৈরি করে নেবেন।

পুকুর বা কুয়োর কাছে মলত্যাগ করবেন না বা জঞ্জাল ফেলবেন না। যেখান থেকে খাবার জল নেয়া হয় সেসব নদী বা নালার উজানের দিকটা পরিষ্কার রাখতে বিশেষ যত্ন নেবেন।

২· যে সব জঞ্জাল পোড়ানো যায় তা পুড়িয়ে ফেলুন। যে জঞ্জাল পোড়ানো যায় না তা বাড়িঘর থেকে বা লোকের খাওয়ার জল নেবার জায়গা থেকে অনেক দূরে বিশেষ গর্তে বা জায়গায় পুঁতে ফেলা উচিত।

৩· পায়খানা (বাইরে যাবার ঘর, শৌচাগার) তৈরি করুন, যাতে শুয়োর বা অন্য জীবজন্তু মানুষের মলের কাছে যেতে না পারে। একটা গভীর গর্তের ওপরে একটা ছোট ঘর করলে ভাল কাজ হবে।



সহজে তৈরি করা যায়, এমন একটা সাদাসিধে শৌচাগারের ছবি এখানে দেয়া হল।

গন্ধ কমাতে আর মাছি দূরে রাখতে, প্রত্যেকবার ব্যবহারের পর গর্তে কিছু চুণ, মাটি বা ছাই ফেলে দিলে সুবিধে হয়।

বাড়ি থেকে বা জল নেবার জায়গা থেকে অন্ততঃ ২০ মিটার দূরে শৌচাগার তৈরি করা উচিত।

যদি আপনার শৌচাগার না থাকে, লোকে যেখানে স্নান করে বা খাওয়ার জল নেয়, সে জায়গা থেকে অনেক দূরে যাবেন। আপনার ছেলেমেয়েদেরও এটা শেখাবেন।

পায়খানা যদি কর ব্যবহার,
নানা রোগ থেকে পাবে নিস্তার।

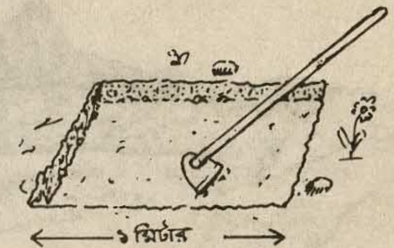
পরের পৃষ্ঠাগুলিতে আরো ভালো পায়খানা তৈরি করার কিছু পরামর্শ দেয়া আছে। বাগানের জন্যে ভালো সার তৈরি করার জন্যেও পায়খানা তৈরি করা যায়। নকসার জন্যে আই· টি· ডি· জি· বা ভি· আই· টি· এ-–তে লিখুন (পৃঃ ৪৩৮)।

<u>উন্নত শৌচাগার</u> :

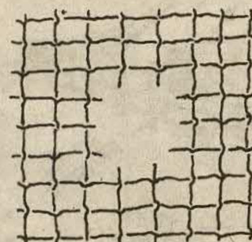
উপরে যে পায়খানাটি দেখানো হয়েছে সেটা খুব সাদাসিধে, আর তৈরি করার খরচ প্রায় কিছুই নেই। কিন্তু এটার ওপরটা খোলা বলে মাছি আসে।

বন্ধ পায়খানা এর চেয়ে ভালো, কারণ মাছি বাইরে থাকে, আর গন্ধ বন্ধ থাকে। বন্ধ পায়খানায় একটা ঢাকনা দেয়া গর্তওয়ালা কাঠ বা সিমেন্টের (শানের) পাটাতন থাকে। পাটাতনটা কাঠ বা সিমেন্ট দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে। সিমেন্ট বেশি ভালো, কারণ তাতে পাটাতনটা শক্তভাবে বসে আর পচেও যায় না।

সিমেন্টের পাটাতন তৈরি করার একটা উপায়:



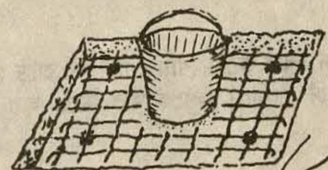
১· প্রায় ১ মিটার চৌকো আর ৭ সেঃ মিঃ গভীরতার একটা অগভীর গর্ত করুন। দেখবেন যেন গর্তের তলাটা সমান আর মসৃণ হয়।



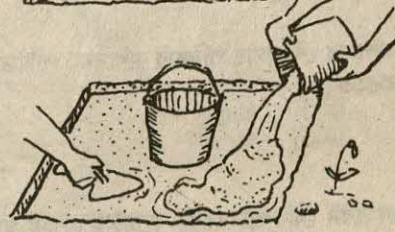
২· ১ মিটার লম্বা আর ১ মিটার চওড়া একটা তারের জালি তৈরি করুন বা কেটে নিন। তারগুলো ১/৪ থেকে ১/২ সেঃ মিঃ মোটা হতে পারে আর প্রায় ১০ সেঃ মিঃ তফাতে থাকতে পারে। জালির মাঝখানে প্রায় ২৫ সেঃ মিঃ ব্যাসের একটা ফুটো করুন।



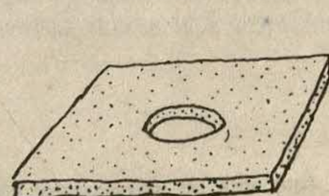
৩· জালিটা গর্তটাতে রাখুন। তারগুলোর ডগা বেঁকিয়ে দিন বা জালির কোণাগুলোর নিচে একটা করে ছোট পাথর রাখুন, যাতে জালিটা মাটির প্রায় ৩ সেঃ মিঃ ওপরে থাকে।



৪· জালির ফুটোর মধ্যে একটা পুরোনো বালতি রাখুন।

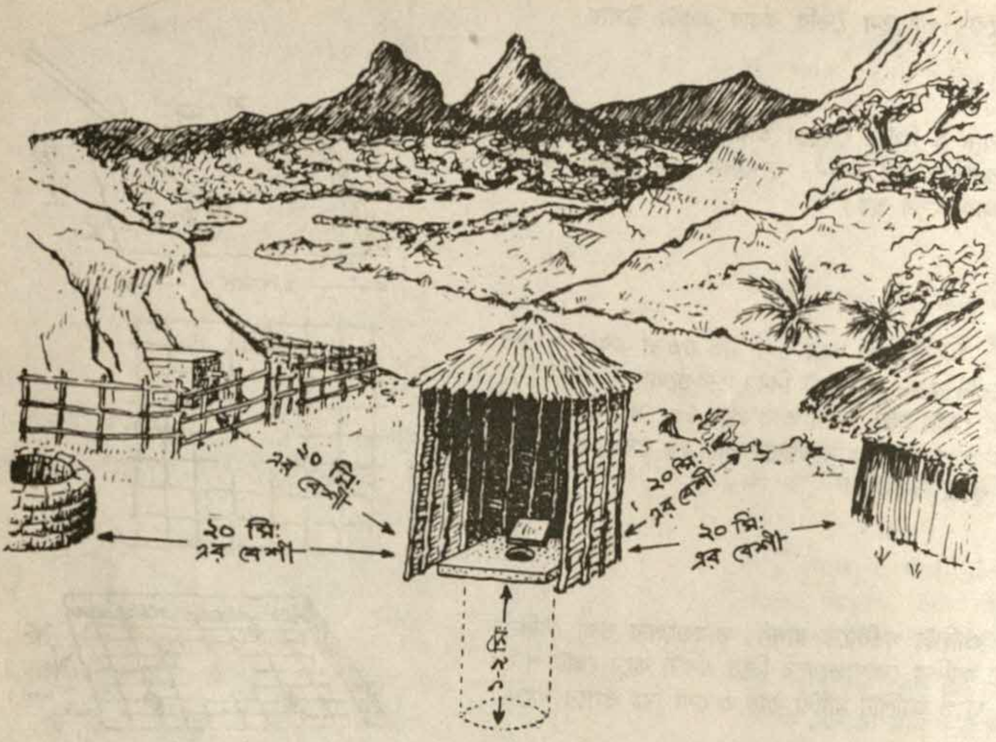


৫· সিমেন্টের সঙ্গে বালি, কাঁকর আর জল মিশিয়ে প্রায় ৫ সেঃ মিঃ পুরু করে ঢেলে দিন। (প্রত্যেক বেলচা সিমেন্টে ২ বেলচা বালি আর ৩ বেলচা কাঁকর মেশাবেন।)



৬· সিমেন্ট শক্ত হতে শুরু করার সময় (প্রায় ৩ ঘন্টা) বালতিটা সরিয়ে নিন। তারপর সিমেন্টটা ভিজে কাপড়, বালি, খড় বা প্লাস্টিকের চাদর দিয়ে ঢেকে দিন আর ভিজিয়ে রাখুন। ৩ দিন পর পাটাতনটা উঠিয়ে নিন।

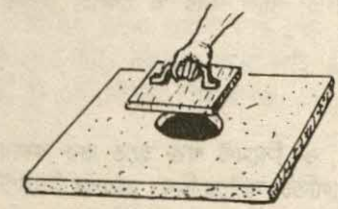
বদ্ধ পায়খানা করতে হলে এই পাটাতনটা মাটিতে একটা গোল গর্তের ওপর রাখতে হবে। গর্তটা ১ মিটারের থেকে একটু কম চওড়া আর ১ থেকে ২ মিটার গভীর করে খুঁড়বেন।



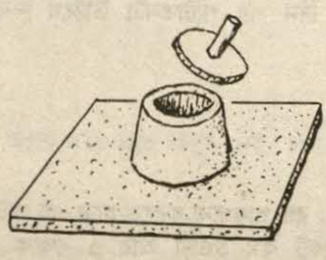
নিরাপদ হবার জন্যে, পায়খানাটা সব বাড়ি থেকে, কুয়ো, ঝরণা, নদী বা নালা থেকে অন্ততঃ ২০ মিটার দূরে হওয়া উচিত। যদি যেখানে লোকে জল নিতে যায়, তার কাছাকাছি হয়—দেখবেন যেন পায়খানাটা ভাঁটির দিকে হয়।

আপনার শৌচাগার পরিষ্কার রাখবেন। পাটাতনটা প্রায়ই ধোবেন। ছোটদের আর অন্যদেরও শেখাবেন ওটা নোংরা না করতে।

দেখবেন যেন পাটাতনের ফুটোটার ঢাকনা থাকে আর ঢাকনাটা ঠিক জায়গায় রাখা থাকে। কাঠ দিয়ে একটা সাদাসিধে ঢাকনা তৈরি করে নেয়া যায়।



মলত্যাগ করার সময় পা ঝুলিয়ে বসতে চাইলে, এইরকম একটা সিমেণ্টের বসার জায়গা তৈরি করে নিতে পারেন।



আপনাকে একটা ছাঁচ করে নিতে হবে, অথবা ভিন্ন মাপের দুটো বালতি—একটার ভেতরে অন্যটা রেখে—ব্যবহার করতে পারেন।

টিকে দেয়া (প্রতিষেধের ব্যবস্থা) সহজ, নিশ্চিত রক্ষার উপায়

টিকে অনেক বিপজ্জনক রোগ থেকে মানুষকে রক্ষা করে। যদি আপনার গ্রামে স্বাস্থ্যকর্মীরা টিকে না দেয়, তবে আপনার ছেলেমেয়েদের টিকে নেয়ানোর জন্যে সবথেকে কাছের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। অসুস্থ বা মরমর অবস্থায় চিকিৎসার জন্যে নিয়ে যাবার থেকে সুস্থ অবস্থায় টিকের জন্যে নিয়ে যাওয়া অনেক ভালো। টিকে সাধারণতঃ বিনে পয়সায় দেয়া হয়।

শিশুদের জন্যে সবথেকে জরুরি টিকেগুলি হল:

১· **বি সি জি, যক্ষ্মার জন্যে**—ডান কাঁধের চামড়ার মধ্যে একটিমাত্র ইনজেকশন দেয়া হয়। জন্মের সময় বা পরে যে কোনো সময় এই টিকে দেয়া যায়। বাড়ির কোনো লোকের যক্ষ্মা থাকলে, তাড়াতাড়ি টিকে দেয়া বিশেষ দরকার। টিকে থেকে ঘা হয়, চার সপ্তাহ পরে সেটা সেরে যায়, একটা দাগ থেকে যায়।

২· **ডি পি টি**—ডিপথিরিয়া, হুপিং কাশি আর ধনুষ্টঙ্কারের জন্যে। পুরোপুরি রক্ষাব্যবস্থার জন্যে শিশুর তিনটি ইনজেকশনের দরকার হয়। পুরো ফল পেতে হলে, তিনটের সব কটাই ৩ থেকে ৯ মাস বয়সের মধ্যে দেয়া উচিত। দুটো ইনজেকশনের মাঝে অন্ততঃ এক থেকে দুমাসের তফাৎ থাকা উচিত।

৩· **পোলিও** (শিশুদের পক্ষাঘাত) শিশুর অন্ততঃ তিন মাত্রা পোলিওর টিকে দরকার। এটাও ৩ মাস থেকে ৯ মাস বয়সের মধ্যে এক মাসের তফাতে খাওয়ানো উচিত।



পোলিওর টিকে—যার স্বাদ মিষ্টি

দ্রষ্টব্য: ডি পি টি আর পোলিওর টিকের চতুর্থ (বুষ্টার) মাত্রা ১৮ থেকে ২৪ মাস বয়সের মধ্যে দেয়া যেতে পারে।

৪· **ধনুষ্টঙ্কার**—বড়দের আর ১২ বছরের বেশি বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্যে সবথেকে দরকারি টিকে হল ধনুষ্টঙ্কারের (চোয়াল আটকে যাওয়া) জন্যে। এক মাসের তফাতে দুটি ইনজেকশন দেয়া হয়। দ্বিতীয় ইনজেকশনের ২ থেকে ৩ বছর পরে তৃতীয় ইনজেকশনটি দেয়া হয়। এতে লোকটি পরের দশ বছরের জন্যে ধনুষ্টঙ্কারের হাত থেকে রক্ষা পায়। প্রত্যেকেরই ধনুষ্টঙ্কারের টিকে নেয়া উচিত—বিশেষ করে পোয়াতি মায়েদের, যাতে তাদের শিশুরা জন্মের পরের ধনুষ্টঙ্কারের থেকে রক্ষা পায় (পৃঃ ২২৩ আর ২৯৬)।

ছেলেমেয়েদের— সবরকমের টিকেগুলো দিয়ে নিন।
প্রতিটির যেন সব দফা পায়, সে দিকে নজর দিন।

৫· **টাইফয়েড (টি এ বি)**—এটা প্রতি ৬ মাসে একবার দেয়া হয়। গরমের মাসগুলোতে এই টিকে দেয়া অনেক ভালো। ইনজেকশনের জায়গায় ব্যথা হতে আর ফুলে যেতে পারে। ব্যথা কমাতে এসপিরিনের বড়ি দেবেন।

৬· এখন বড়দের আর ছোটদের জন্যে মেনিনজাইটিসের টিকে পাওয়া যাচ্ছে। একটিমাত্র মাত্রা দেয়া হয়। হাম, জার্মান হাম ও মাম্প্সের জন্যে একটা টিকে পাওয়া যাচ্ছে। এ দুটির মাত্রা, নির্দেশ আর সাবধানতার জন্যে বা অন্য জায়গায় খোঁজ নিন।

রোগ আর আঘাত এড়াবার অন্য উপায়

এই পরিচ্ছেদে, আমরা, **স্বাস্থ্যবিধি, জল আর ময়লা নিকাশের ব্যবস্থা** আর **টিকে** দিয়ে অন্ত্রের বা অন্য সংক্রমণ এড়াবার কথা বলেছি। এই বইটায় আগাগোড়াই পুষ্টিকর খাবার খেয়ে সুস্থ শরীর গড়ে তোলা থেকে আরম্ভ করে ঘরোয়া চিকিৎসা আর আধুনিক ওষুধের বুদ্ধি করে ব্যবহার করা পর্যন্ত রোগ আর আঘাত এড়াবার জন্যে অনেক পরামর্শ পাবেন।

গ্রামস্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি ভূমিকায়, যে সব অবস্থায় স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় সেগুলো বদলানোর জন্যে সকলে মিলেমিশে কাজ করার অনেক পরামর্শ পাবেন।

বাকি পরিচ্ছেদগুলোতে—যেখানে স্বাস্থ্যের বিশেষ বিশেষ সমস্যা আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে সেগুলো এড়ানোর জন্যে অনেক পরামর্শ পাবেন। এইসব পরামর্শ মেনে চলে আপনি আপনার বাড়ি আর গ্রামকে বাস করার পক্ষে অনেক স্বাস্থ্যকর জায়গা করে তুলতে পারবেন।

মনে রাখবেন, কঠিন রোগ আর মৃত্যু এড়াবার একটা সবথেকে ভালো উপায় হল তাড়াতাড়ি ঠিকমত চিকিৎসা।

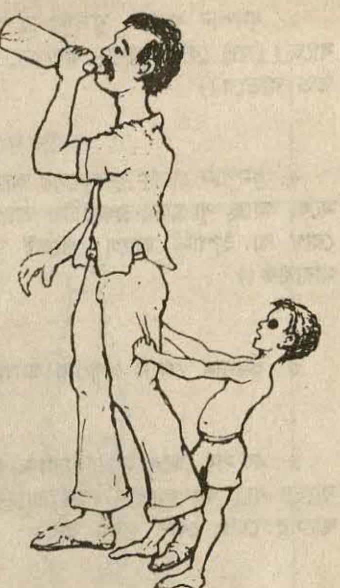
সময়মতো রোগ সারানো
বুদ্ধি করে ঠিক,
রোগ এড়ানোর ব্যবস্থাটার
দরকারি এক দিক।

এই পরিচ্ছেদ শেষ করার আগে রোগ এড়ানোর কয়েকটি দিকের কথা বলতে চাই। বইয়ের অন্যান্য জায়গায় সেই বিষয়গুলো ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে, কিন্তু এগুলির দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয়া উচিত।

স্বাস্থ্যের ওপরে যে সব অভ্যেসের প্রভাব পড়ে

লোকের এমন কতকগুলো অভ্যেস আছে যা শুধু তাদের নিজেদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে, তাই নয়, চারপাশের অন্য লোকজনদেরও কোনো না কোনো ভাবে অপকার করে। এর মধ্যে অনেক অভ্যেস ভাঙা বা এড়িয়ে চলা যায়—কিন্তু তার প্রথম ধাপ হল, কেন এগুলো ভাঙা এত জরুরি, সেটা বোঝা।

মদ খাওয়া



মদ হয়তো অনেক আনন্দ দিয়েছে, কিন্তু অনেক কষ্টও দিয়েছে—বিশেষ করে যে পুরুষরা মদ খায়, তাদের বাড়ির মেয়েদের আর শিশুদের। কখনো কখনো একটুআধটু মদ খেলে ক্ষতি হয় না। কিন্তু প্রায়ই, একটু থেকে অনেকটা হয়ে যায়। পৃথিবীর অনেক জায়গায় বেশি বা অতিরিক্ত মদ খাওয়া স্বাস্থ্যের প্রধান প্রধান সমস্যার একটা মূল কারণ—এমনকি যারা মদ খায় না তাদের পক্ষেও। যারা মদ খায়, মাতলামি যে শুধু তাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে (যকৃতের সিরোসিসের মত রোগ থেকে পৃঃ ৩৭৪) তাই নয়, এটা বাড়ির লোক আর সমাজকেও নানাভাবে কষ্ট দেয়। মাতাল অবস্থায় মাথার ঠিক থাকে না, আবার সুস্থ অবস্থায় নিজের সম্মান থাকে না বলে, এর থেকে সবথেকে প্রিয়জনদের বেলায়ও অনেক দুঃখ, অপচয় আর হিংসের সৃষ্টি হয়।

ছেলেপিলে খিদেয় জ্বললেও কজন বাপ তাদের শেষ পয়সাটি মদের পেছনে খরচ করেছে? যেটুকু বাড়তি পয়সা একজন রোজগার করে, সেটুকু বাড়ির লোকের অবস্থার উন্নতির জন্যে খরচ না করে, মদের পেছনে খরচ করে, কত রোগের সৃষ্টি হয়েছে? কতজন, প্রিয়জনদের কষ্ট দিয়ে, নিজেদের ওপর ঘেন্নায়, সব ভুলে যেতে আবার মদ খেয়েছে?

একবার যদি কেউ বোঝে যে মদ থেকে তার চারপাশের সকলের স্বাস্থ্য আর সুখশান্তি নষ্ট হচ্ছে, সে কি করতে পারে? প্রথমেই তাকে স্বীকার করতে হবে যে তার মদ খাওয়াটা একটা সমস্যা। তাকে নিজের, এবং অন্যদের কাছে খাঁটি থাকতে হবে। কেউ কেউ সহজেই মন ঠিক করে মদ খাওয়া ছেড়ে দিতে পারে। কিন্তু বেশির ভাগ সময়, বাড়ির লোকের, বন্ধুবান্ধবের, আর যারা বোঝে এই অভ্যেস ছাড়া কত কঠিন, তাদের সাহায্য আর সমর্থন দরকার হয়। যারা খুব মদ খেত, কিন্তু ছেড়ে দিয়েছে, তারাই সাধারণতঃ এ বিষয়ে সবথেকে ভালোভাবে সাহায্য করতে পারে।

মদ খাওয়া, যতটা সমস্ত সমাজের সমস্যা, ততটা একজনের নয়। সমাজ এটা বুঝলে, যে বদলাতে চায়, তাকে উৎসাহ দিতে অনেক কিছু করতে পারে। যদি আপনাদের সমাজে মদের অপব্যবহার সম্বন্ধে আপনারা ভাবেন, তবে এইসব সমস্যা আর এ বিষয়ে কি করা যায় সেই নিয়ে আলোচনা করার জন্যে একটা সভার আয়োজন করতে সাহায্য করুন।

মিলে মিশে যদি কাজ করে চলে
সমাজের সব লোকে,
একে অপরকে করে সাহায্য,
নানা সমস্যা চোকে।

ধূমপান:

ধূমপান নানা কারণে আপনার নিজের আর বাড়ির লোকের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক।



১· ধূমপান করলে, ফুসফুসের আর ঠোঁটের ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে। (যত বেশি ধূমপান করবেন, ক্যানসারে মারা যাবার সম্ভাবনা তত বাড়বে।)

২· ধূমপান থেকে ফুসফুসের অনেক সাংঘাতিক রোগ হয়, তার মধ্যে আছে পুরোনো ব্রঙ্কাইটিস আর এমফিসিমা। (যাদের এইসব রোগ বা হাঁপানি আগে থেকেই আছে, তাদের পক্ষে ধূমপান মারাত্মক।)

৩· ধূমপান থেকে পেটের আলসার হয় বা বাড়ে।

৪· যে সব ছেলেমেয়ের বাবা মা ধূমপান করে না, তাদের থেকে যাদের বাবা মা ধূমপান করে তাদের মধ্যে নিউমোনিয়া বা অন্য শ্বাসের রোগ বেশি দেখা যায়।

৫· ধূমপান করলে হার্টের রোগ বা সন্ন্যাস রোগ থেকে ভোগার বা মারা যাবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

৬· পোয়াতি অবস্থায় যে মায়েরা ধূমপান করেনি তাদের থেকে যে মায়েরা ধূমপান করেছে তাদের শিশুরা অনেক ছোট হয় আর তারা অনেক দেরিতে বাড়ে।

৭· বাবা মা, শিক্ষকশিক্ষিকা, স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে যাঁরা ধূমপান করেন, তাঁরা ছেলেমেয়েদের আর অল্পবয়সীদের জন্যে একটা অস্বাস্থ্যকর উদাহরণ রাখেন, আর তাদেরও ধূমপান করা শুরু করার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলেন।

৮· তাছাড়া, ধূমপান করতে পয়সা লাগে। দেখে মনে হয় অল্পই খরচ হচ্ছে, কিন্তু যোগ করলে অনেকটা হয়। গরীব দেশে, দেশের প্রতিটি লোকের স্বাস্থ্যের কাজে যা খরচ হয় সবথেকে গরিব লোকদের মধ্যে অনেকে তামাকের পেছনে তার থেকে বেশি খরচ করে। **তামাকের পেছনে যা খরচ হয় তা খাবারে খরচ করলে শিশুদের আর পুরো পরিবারটারই স্বাস্থ্য অনেক ভালো হত।**

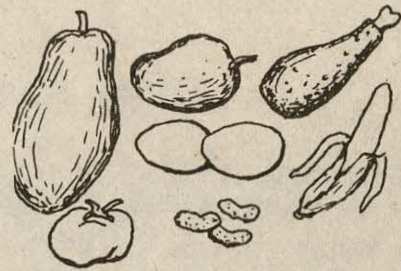
অন্যের হোক স্বাস্থ্যটা ভালো,
এটা যদি কেউ চান,
যত্ন নেবেন—কেউ না কখনো
করে যেন ধূমপান।

বোতলের সরবৎ (সোডা লেমনেড):

কিছু এলাকায় এই সরবৎগুলো খুব চলছে। অনেক সময়ে কোনো গরিব মা তাঁর অপুষ্ট শিশুর জন্যে রঙিন জল কিনে দেন, যখন একই দামে দুটো ডিম বা অন্য পুষ্টিকর খাবার কিনলে অনেক ভালো হত।

যদি সুস্থ ছেলেমেয়ে চান
আর তাদের কিছু কিনে দিতে আপনার অল্প পয়সা থাকে...

তাদের দুটো ডিম বা অন্য পুষ্টিকর খাবার কিনে দিন



হ্যাঁ

চা, কফি, সোডা বা লেমনেড নয়



না

বোতলের সরবতে চিনি ছাড়া আর কোনো পুষ্টিকর জিনিস নেই। আর, যেটুকু চিনি থাকে তার তুলনায় দাম খুব বেশি। বেশি সোডা লেমনেড বা অন্য মিষ্টি জিনিস খেতে দিলে প্রায়ই ছেলেমেয়েদের অল্পবয়সেই দাঁতে ফুটো হয় বা দাঁত পচে যায়। যাদের অম্বল বা পেটের আলসার আছে বিশেষ করে তাদের পক্ষে বোতলের সরবৎ খুব খারাপ।

ফল থেকে যে স্বাভাবিক সরবৎ করা হয় তা বোতলের সরবতের থেকে অনেক স্বাস্থ্যকর আর সাধারণতঃ অনেক সস্তা হয়।

দেখবেন যেন আপনার ছেলেমেয়ে—
সোডা লেমনেড চলে না কেবল খেয়ে।

পরিচ্ছেদ

১৩ কয়েকটি খুব সাধারণ রোগ

শরীরে জলের অভাব

পাৎলা পায়খানার রোগে যে সব শিশু মারা যায় তাদের মধ্যে বেশির ভাগেরই মৃত্যু হয় তাদের শরীরে জল কমে যায় বলে। জলের এই অভাবকে ডি-হাইড্রেশন বলা হয়।

শরীরে যতটা তরল জিনিস ঢোকে তার থেকে বেশি বেরিয়ে গেলে জলের অভাব ঘটে। সাংঘাতিক পাৎলা পায়খানায়, বিশেষ করে তার সঙ্গে বমি থাকলে, এটা হতে পারে। খুব কঠিন রোগে, যখন রোগী এত অসুস্থ হয়ে পড়ে যে যথেষ্ট খাবার বা জল খেতে পারে না, তখনো এটা হতে পারে।

যে কোনো বয়সের লোকেরই শরীরে জলের অভাব হতে পারে কিন্তু **ছোট ছেলেপিলেদের বেলায় জলের অভাবটা আরো তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়, সবথেকে বেশি বিপজ্জনকও হয়।**

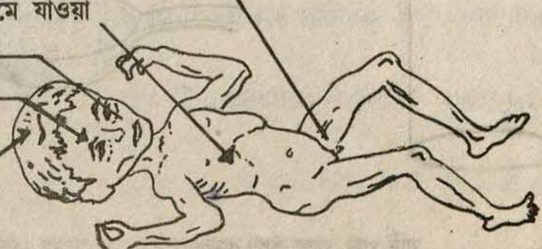
শিশুর জল খাওয়া দরকার—বিশেষ করে গরমের সময়। অনেক সময় ৬ মাস বয়স না হলে মা শিশুকে জল খেতে দেন না। শিশু মাকে বলতে পারে না যে তার তেষ্টা পেয়েছে। কিন্তু দিনে কয়েকবার তার জল খাওয়ার দরকার হয়। মায়ের উচিত পরিষ্কার জায়গা থেকে জল নিয়ে একটা ঢাকা দেয়া পাত্রে রাখা। সম্ভব হলে শিশুর খাবার জল ফুটিয়ে নেয়া উচিত। বিশেষ করে পাৎলা মল বা বমি হলে শিশুর শরীর থেকে অনেকটা জল বেরিয়ে যায়। তখন তার দিনে অনেকবার বাড়তি জলের দরকার হয়।

**বারবার হলে জলের মতন মল,
কমে যেতে পারে শিশুর দেহের জল।**

শরীরে জলের অভাবের লক্ষণগুলো আর সেটা এড়াবার আর সারাবার উপায় সকলের জানা দরকার, বিশেষ করে মায়েদের।

শরীরে জলের অভাবের লক্ষণ:

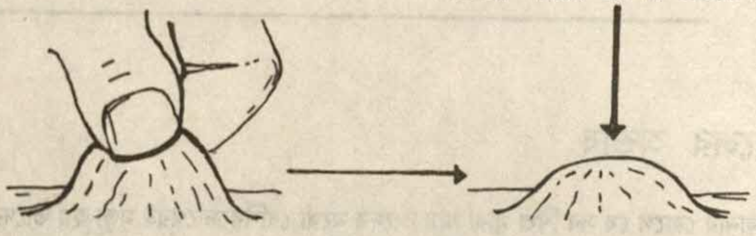
- পেচ্ছাপ খুব কম, বা একেবারেই নেই; পেচ্ছাপের রং গাঢ় হলুদ
- **আগের ওজন জানা থাকলে, হঠাৎ তা কমে যাওয়া**
- মুখের ভেতরটা শুকনো
- চোখ বসে যাওয়া, চোখের জল নেই
- কচি বাচ্চার মাথার তালুর নরম জায়গা বসে যাওয়া



● চামড়ার স্থিতিস্থাপকতা বা
রবারের মতো টানটান ভাব চলে যাওয়া

দু আঙুল দিয়ে চামড়াটা এইভাবে টেনে তুলুন…

ছেড়ে দিলে যদি চামড়ার ভাঁজ
একেবারে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে না আসে,
শিশুটির শরীরে জলের অভাব হয়েছে।



জলের অভাব খুব সাংঘাতিক হলে নাড়ির গতি দ্রুত অথচ ক্ষীণ (শক পৃঃ ৮৯), শ্বাস দ্রুত আর গভীর, জ্বর বা ফিট (খিচুনি পৃঃ ২১৭) হতে পারে।

শরীরে জলের অভাব এড়ানো আর তার চিকিৎসা:

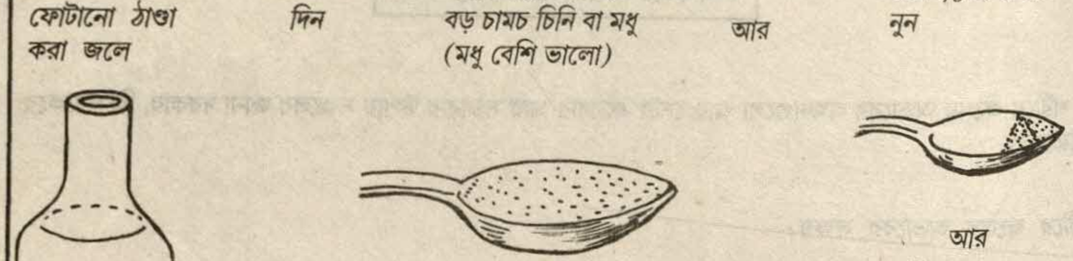
● শরীরে জলের অভাব হলে প্রচুর পরিমাণে তরল জিনিস: জল, চা, ঝোল, ইত্যাদি খাওয়া উচিত। তবে, জলের অভাব হয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করবেন না।

● কারো পাৎলা পায়খানা হলে, সঙ্গে বমি থাকলে বা নাও থাকলে, তাকে যদি প্রথম থেকেই প্রচুর তরল জিনিস বা চিনি নুনের সরবৎ খাওয়ানো হয়, তবে শরীরে জলের অভাব সাধারণতঃ এড়ানো যায়। ছোট শিশুদের জলের মত মল হলে এটা বিশেষ জরুরি।

● নিচের চিনি নুনের সরবৎটি শরীরে জলের অভাব এড়াতে বা পুরণ করতে বিশেষ কাজে লাগে:

শরীরে জলের অভাব এড়াতে বা পুরণ করতে—চিনি নুনের সরবৎ

১ লিটার ফোটানো ঠাণ্ডা করা জলে *দিন* *সমান করে ভর্তি ২ বড় চামচ চিনি বা মধু (মধু বেশি ভালো)* *আর* *আর ১/৮ চা চামচ নুন*



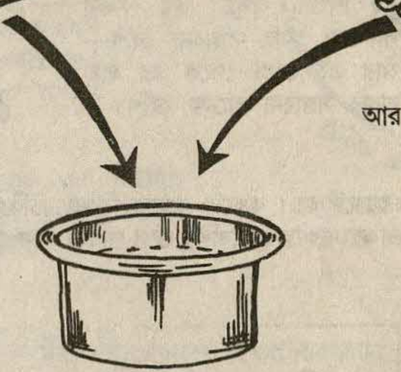
যদি পান, আধ কাপ কমলালেবুর রস অথবা একটু পাতিলেবুর রসও মিশিয়ে দেবেন।

মা এইভাবেও সরবৎটা বানাতে পারেন :



তিনি এক আঁজলা চিনি বা গুড়

আর ৩ আঙুলের ১ চিমটে নুন নিয়ে



এক লিটার ফোটানো ঠাণ্ডা করা জলে মিশিয়ে দেবেন

যার শরীরে জল কমে গেছে তাকে এই সরবৎ দিনেরাতে ৫ মিনিট অন্তর একটু করে চুমুক দিয়ে খেতে দিন—যতক্ষণ না সে স্বাভাবিক ভাবে পেচ্ছাপ করতে শুরু করে। বড়সড় লোকের দিনে ৩ লিটার বা তার বেশি সরবৎ দরকার। ছোট শিশুর দিনে অন্ততঃ ১ লিটার দরকার।

রোগীর বমি হতে থাকলেও তাকে **ঘনঘন** এক চুমুক করে চিনি নুনের সরবৎ দিন। রোগী যদি শরীরে জলের অভাব মেটাবার মত যথেষ্ট সরবৎ খেতে না পারে, বা যা খাচ্ছে সবটাই বমি করে দেয়, তবে যে স্বাস্থ্যকর্মী শিরার ভেতরে দিয়ে তরল জিনিস দিতে জানে, তাকে ডেকে আনবেন।

দ্রষ্টব্য : সম্ভব হলে, সরবৎটা চিনির বদলে মৌমাছির মধু বা গুড় দিয়ে তৈরি করবেন। মধুতে কিছুটা সরল চিনি (গ্লুকোজ) আছে—শরীর সেটাকে বেশি সহজে নিতে পারে। গ্লুকোজের গুঁড়ো মধুর থেকেও ভাল। শিশুর যদি বেশি অপুষ্টি বা সাংঘাতিক পাৎলা পায়খানা হয়ে থাকে, তাহলে গ্লুকোজ বা মধু দিয়ে সরবৎ তৈরি করা বিশেষ জরুরি। কোথাও কোথাও শরীরে জলের অভাব মেটাবার জন্যে গ্লুকোজ আর পরিমাণ মত নানারকম নুন মেশানো ছোট ছোট পুরিয়া পাওয়া যায় (পৃঃ ৪১৬)।

পাৎলা পায়খানা আর আমাশা

আলগা বা জলের মত মল হলে পাৎলা পায়খানার রোগ বলা হয়। মলে আম আর রক্ত দেখা গেলে রোগীর আমাশা হয়েছে বলা যায়।

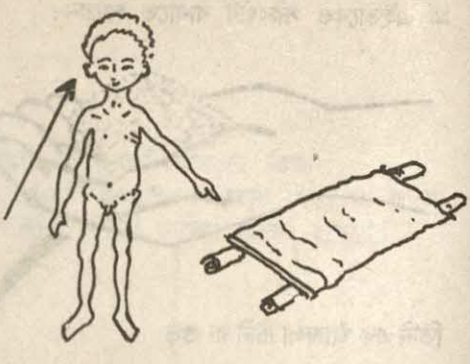
পাৎলা পায়খানার রোগ অল্পস্বল্প বা সাংঘাতিক হতে পারে। সেটা তীব্র (হঠাৎ আর সাংঘাতিক) অথবা পুরোনো (অনেক দিনের) হতে পারে।

ছোট ছেলেপিলে, বিশেষ করে যাদের পুষ্টি কম, তাদের মধ্যে পাৎলা পায়খানা বেশি দেখা যায় আর বেশি বিপজ্জনক হয়।



এই শিশুটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট। এর পাৎলা পায়খানা হবার সম্ভাবনা কম, হলেও সাধারণতঃ চট করে আবার সেরে উঠবে।

এই শিশুটি অপুষ্ট। এর পাৎলা পায়খানা হবার সম্ভাবনা বেশি—আর এই রোগ থেকে এর মারা যাবার সম্ভাবনা অনেক বেশি।



পাৎলা পায়খানা অনেক কারণে হয়। কখনো কখনো বিশেষ চিকিৎসা দরকার হয়, তবে সঠিক কারণটা বা কারণগুলো নিশ্চিতভাবে জানা না থাকলেও, **বেশির ভাগ পাৎলা পায়খানার রোগ বাড়িতেই ভালোভাবে সারানো যায়।**

পাৎলা পায়খানার প্রধান প্রধান কারণ :

অপুষ্টি (পৃঃ ১৮৫)-এতে শিশু দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন অন্য সব কারণে আরো ঘনঘন আর বেশি খারাপ পাৎলা পায়খানা হয়।

ভাইরাসের সংক্রমণ, অন্ত্রের ইনফ্লুয়েঞ্জা (সাধারণতঃ অল্পস্বল্প পাৎলা পায়খানা)

অন্ত্রে জীবাণুর সংক্রমণ (পৃঃ ১৫৫) এমিবা (পৃঃ ১৯৭) বা জিয়ারডিয়া (পৃঃ ১৯৮)

কৃমির সংক্রমণ (পৃঃ ১৯৩ থেকে পৃঃ ১৯৭)

অন্ত্রের বাইরে সংক্রমণ (কানে সংক্রমণ পৃঃ ৩৫৫, টনসিলের সংক্রমণ পৃঃ ৩৫৬, হাম পৃঃ ৩৫৮, পেচ্ছাপের সংক্রমণ পৃঃ ২৭৮)

ম্যালেরিয়া (ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ফ্যালসিপেরাম জাতীয় পৃঃ ২৭৮)

খাবারে বিষক্রিয়া (পচা খাবার পৃঃ ১৭০)

দুধ হজম করতে না পারা (প্রধানতঃ সাংঘাতিক অপুষ্ট ছেলেপিলের আর কোনো কোনো বয়স্ক লোকের হয়)। এই ছেলেপিলেদের বিশেষ এনজাইমের বড়ির দরকার হতে পারে। স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ নিন।

শিশুদের নতুন রকম খাবার হজম করার অসুবিধা।

কয়েকটা বিশেষ খাবারে (সমুদ্রের খাবার, চিংড়ি, কাঁকড়া ইত্যাদি, পৃঃ ২০৩); কখনো কখনো শিশুদের গরুর দুধ বা অন্য দুধে, এলার্জি হয়।

এমপিসিলিন বা টেট্রাসাইক্লিনের মত কয়েকটা ওষুধের ফল।

মৃদু বা কড়া জোলাপ, কষ্টদায়ক বা বিষাক্ত গাছগাছড়া, কোনো কোনো বিষ।

বেশি কাঁচা ফল বা তেলা খাবার খাওয়া।

পাৎলা পায়খানার রোগ এড়ানো:

অনেক রকম কারণ থাকলেও, সাধারণতঃ **সংক্রমণ** আর **অপুষ্টি** থেকেই পাৎলা পায়খানা হয়। **স্বাস্থ্যবিধি মানা আর ভালো খাওয়াদাওয়া দিয়ে বেশির ভাগ পাৎলা পায়খানার রোগ এড়ানো যেতে পারতো** এছাড়া, ঠিকমত চিকিৎসা করলে, পাৎলা পায়খানার রোগ হলেও অনেক কম শিশু মারা যেতো।

পুষ্ট শিশুদের থেকে অপুষ্ট শিশুদের পাৎলা পায়খানা বেশি হয় আর এই রোগে তারাই অনেক বেশি মারা যায়। কিন্তু পাৎলা পায়খানাও অপুষ্টির কিছুটা কারণ হতে পারে। আবার, আগে থেকে অপুষ্টি থাকলে পাৎলা পায়খানা থেকে সেটা তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়।



অপুষ্টি আর পাৎলা পায়খানার দুষ্টচক্র থেকে অনেক শিশুর মৃত্যু হয়

অপুষ্টি থেকে পাৎলা পায়খানা হয়
পাৎলা পায়খানা থেকে অপুষ্টি হয়

এর থেকে একটা দুষ্টচক্র হয়—যাতে একটা অন্যটাকে বাড়িয়ে তোলে। এই কারণে পাৎলা পায়খানা এড়ানো আর সারানো দুটোতেই পুষ্টিটা জরুরি।

অপুষ্টিকে এড়িয়ে এড়াও পাৎলা পায়খানা।
পেটের অসুখ সামলে ঠেকাও অপুষ্টির হানা।

নানা ধরনের যে সব খাবার পাৎলা পায়খানা এবং অন্য অনেক রোগ এড়াতে বা দূর করতে সাহায্য করে, সেগুলির বিষয়ে জানতে হলে পরিচ্ছেদ ১১ পড়ুন।

ঠিকমত পুষ্টি আর **পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা** দুটোর ওপরেই পাৎলা পায়খানা এড়ানোটা নির্ভর করে। নিজের আর সাধারণের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্যে অনেক পরামর্শ পরিচ্ছেদ ১২-তে দেয়া হয়েছে। এগুলোর মধ্যে আছে **পায়খানার** ব্যবহার, **পরিষ্কার জলের** প্রয়োজনীয়তা, ধুলোময়লা আর মাছির হাত থেকে **খাবার রক্ষা করা**।

শিশুদের পাৎলা পায়খানা এড়াবার জন্যে এখানে আরো কয়েকটা জরুরি পরামর্শ দেয়া হল:



বুকের দুধ খাওয়ালে পাৎলা পায়খানা এড়ানোয় সাহায্য হয়

- **শিশুদের বোতলে না খাইয়ে বুকের দুধ খাওয়ান।** প্রথম ৪ মাস শুধু বুকের দুধ দিন। যে সব সংক্রমণ থেকে পাৎলা পায়খানা হয়, বুকের দুধ সেগুলো ঠেকাতে সাহায্য করে। যদি শিশুকে বুকের দুধ দেয়া সম্ভব না হয়, তাকে ঝিনুক বাটিতে বা বাটি আর চামচে খাওয়ান। **বোতল ব্যবহার করবেন না,** কারণ ওটা পরিষ্কার রাখা শক্ত তাই ও থেকে সংক্রমণ হবার সম্ভাবনা বেশি।
- যখন শিশুকে কোনো নতুন বা শক্ত খাবার দিতে শুরু করবেন, প্রথমে খুব অল্প পরিমাণে আর ভাল করে চটকে দেবেন। নতুন রকম খাবার হজম করতে শিশুকে শিখতে হবে, একসঙ্গে অনেকটা দিয়ে শুরু করলে তার পাৎলা পায়খানা হতে পারে।
- শিশুকে পরিষ্কার করে পরিচ্ছন্ন জায়গায় রাখুন। যে যাতে নোংরা জিনিস মুখে না দেয় সেই চেষ্টা করুন।
- শিশুদের অকারণে ওষুধ দেবেন না।

পাৎলা পায়খানার চিকিৎসা:

বেশির ভাগ পাৎলা পায়খানায় কোনো ওষুধ দরকার হয় না। রোগটা সাংঘাতিক হলে সবথেকে বড় বিপদ হয়—**শরীরে জল কমে যাওয়া**। রোগটা অনেক দিন ধরে চললে সবথেকে বড় বিপদ হয়—**অপুষ্টি**। তাই চিকিৎসার

সবথেকে জরুরি দিক হচ্ছে যথেষ্ট তরল জিনিস আর ভালো খাবার দেয়া। পাৎলা পায়খানার কারণ যাই হোক না কেন, নিচের জিনিসগুলো সম্বন্ধে যত্ন নেবেন:

১· **শরীরে জলের অভাব এড়ান বা কমিয়ে রাখুন।** জলের মত পাৎলা মল হলে রোগীর প্রচুর পরিমাণে তরল জিনিস খাওয়া উচিত। রোগ সাংঘাতিক হলে বা শরীরে জলের অভাবের লক্ষণ দেখা দিলে রোগীকে চিনি নুনের সরবৎ (পৃঃ ১৮২) দিন। খেতে না চাইলেও তাকে বুঝিয়ে খেতে বলুন। কয়েক মিনিট অন্তর কয়েক ঢোক করে খেতে দিন।

২· **পুষ্টির প্রয়োজন মেটান। পাৎলা পায়খানার রোগীর খেতে পারলেই খাওয়া দরকার।** ছোট ছেলেপিলেদের বা যে সব লোক আগে থেকেই অপুষ্ট তাদের বেলায় এটা বিশেষ জরুরি।

- শিশুর পাৎলা পায়খানা হলে তাকে বুকের দুধ খাইয়ে যাওয়া উচিত।
- ছোট বা রোগা শিশুর বা যেকোনো রোগা, দুর্বল লোকের যতদিন পাৎলা পায়খানা থাকে—আর ভালো হয়ে যাবার পরও—প্রচুর শরীর গড়বার খাবার (প্রোটিন) আর শক্তি যোগাবার খাবার খাওয়া উচিত। বেশি অসুস্থ হয়ে বা বমির জন্যে যদি খাওয়া বন্ধ হয়, তবে যখনি খেতে পারবে তখনি আবার তার খাওয়া উচিত। **খাবার দিলে যদিও প্রথমে বেশি ঘনঘন পায়খানা হয় তবু তাতে রোগীর প্রাণ বাঁচতে পারে।**
- রোগা ছেলেপিলের অনেকদিন ধরে বা প্রায়ই পাৎলা পায়খানা হলে তাকে প্রোটিনে ভর্তি খাবার বেশি করে দেবেন। অন্য কোনো চিকিৎসা সাধারণতঃ দরকার হয় না।
- যে সব বড় ছেলেপিলে বা বয়স্ক লোক বেশ হৃষ্টপুষ্ট তাদের সাংঘাতিক তীব্র পাৎলা পায়খানা হলে, চা, সুরুয়া বা চিনি নুনের সরবতের মত তরল পথ্য খেয়ে তারা বেশি তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে পারে। কিন্তু রোগটা ১ দিনের বেশি চললে খাবার খাওয়া শুরু করা উচিত।

পাৎলা পায়খানার রোগীর খাবার

রোগী যদি বমি করে বা বেশি অসুস্থতার জন্যে খেতে না পারে তার এই সব তরল খাবার খাওয়া উচিত:

- চা
- ভাতের ফেন
- মুরগি, মাংস, ডিম বা বরবটির সুরুয়া
- মিষ্টি সরবৎ
- চিনি নুনের সরবৎ
- মায়ের দুধ

রোগী যখনি খেতে পারবে, বাঁদিকে যে সব তরল খাবারের তালিকা দেয়া হয়েছে, সেগুলো ছাড়া নিচের বা ওই ধরনের কিছু খাবার থেকে কয়েকটা বেছে সুষমভাবে খাওয়া উচিত:

শক্তি যোগাবার খাবার	**শরীর গড়বার খাবার**
পাকা বা সেদ্ধ কলা	নানা ধরনের ডাল
ভাত	বরবটি, মুসুরি বা মটর (ভালোভাবে সেদ্ধ করে চটকানো)
দালিয়া (গম ভাঙা) বা ভালোভাবে সেদ্ধ করা অন্য শস্য	দুধ (এর থেকে অনেক সময় সমস্যা হতে পারে—পরের পৃষ্ঠা দেখুন)
টাটকা ভুট্টা (ভালোভাবে সেদ্ধ করে চটকানো)	ডিম (সেদ্ধ)
আলু	মুরগি (সেদ্ধ বা ঝলসানো)
পেঁপে	মাংস (ভালোভাবে সেদ্ধ, চর্বি বা তেল ঘি ছাড়া)
	মাছ (ভালোভাবে সেদ্ধ)

এগুলো খাবেন না

চর্বি বা তেল ঘি ভর্তি খাবার। বেশির ভাগ কাঁচা ফল	বেশি মশলা দেয়া খাবার	কোনো রকম মৃদু বা কড়া জোলাপ

পাৎলা পায়খানা আর দুধ:

শিশুর সবথেকে ভালো খাবার হল **বুকের দুধ**। শিশুর পাৎলা পায়খানা হলে তাকে বুকের দুধ দিয়ে যান। এতে পাৎলা পায়খানা হয় না, বরং তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে শিশুকে সাহায্য করে।

গরু, মোষ বা ছাগলের দুধ—শিশুর পাৎলা পায়খানা হলে এগুলো ভালো প্রোটিন যোগাতে পারে। তবে শিশুর বেশি অপুষ্টি থাকলে দুধ হজম করতে তার অসুবিধে হতে পারে আর তাতে আরো বেশি পাৎলা পায়খানা হতে পারে। এরকম হলে দুধ কম দিয়ে অন্য খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে দেখুন। কিন্তু মনে রাখবেন, অপুষ্ট শিশুর পাৎলা পায়খানা হলে তার যথেষ্ট প্রোটিন দরকার। কাজেই দুধ কম দিলে, সঙ্গে ডাল, বরবটি, ডিমের কুসুম, মুরগি, মাংস বা মাছের মত খাবার—ভালো করে সেদ্ধ করে চটকে—দেয়া উচিত। বরবটির খোসা ছাড়িয়ে সেদ্ধ করে চটকে দিলে হজম করা সহজ হয়।

শিশু যেমন যেমন ভালো হতে থাকবে তেমন তেমন আরো বেশি দুধ খেলে পাৎলা পায়খানা হবে না।

পাৎলা পায়খানার ওষুধ:

বেশির ভাগ পাৎলা পায়খানার রোগের বেলায় কোনো ওষুধ লাগে না। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঠিকমত ওষুধ ব্যবহার করা জরুরি হতে পারে। তবে, পাৎলা পায়খানার জন্যে সাধারণতঃ যে সব ওষুধ ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে অনেকগুলোই বিশেষ বা কোনো কাজে লাগে না। কয়েকটা তো ক্ষতিই করে:

সাধারণভাবে, পাৎলা পায়খানার চিকিৎসায় নিচের ওষুধগুলো ব্যবহার না করাই ভালো:

যে সব 'পাৎলা পায়খানা বিরোধী' ওষুধে কেওলিন আর পেকটিন আছে (যেমন কেওপেকটেট পৃঃ ৪১৭), সেগুলো মলকে ঘন করে আর বারে কমিয়ে দেয়, কিন্তু শরীরে জলের অভাবটা ঠিক করে না বা সংক্রমণও কমায় না। এমনকি কয়েকটা পাৎলা পায়খানা বিরোধী ওষুধ যেমন ডাইফেনকসিলেট (লোমোটিল) সংক্রমণকে আরো বেশিদিন ধরে রাখে।



পাৎলা পায়খানা বিরোধী ওষুধ ছিপির মত কাজ করে।
যে দূষিত জিনিসগুলো বেরিয়ে যাওয়া দরকার সেগুলোকে এরা শরীরে ধরে রাখে।



যে সব পাৎলা পায়খানা বিরোধী ওষুধে নিওমাইসিন বা স্ট্রেপটোমাইসিন আছে সেগুলো ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ এতে অন্ত্রে কষ্ট হতে পারে, আর উপকারের থেকে ক্ষতিই বেশি হয়।

কয়েক ধরনের পাৎলা পায়খানায় এমপিসিলিন বা টেট্রাসাইক্লিনের মত এনটিবায়োটিক কাজে লাগে। কিন্তু কখনো কখনো এগুলো থেকেই আবার পাৎলা পায়খানা হয়, বিশেষ করে ছোট ছেলেপিলের। যদি ২/৩ দিন এইসব এনটিবায়োটিক খাবার পরে পাৎলা পায়খানা না কমে আরো বেড়ে যায় তবে ওগুলো খাওয়া বন্ধ করে দেবেন—ওষুধটাই কারণ হতে পারে।

৮ বছরের কম বয়সের শিশুকে টেট্রাসাইক্লিন দেবেন না।

ক্লোরামফেনিকলের ব্যবহারে কিছু বিপদ আছে (পৃঃ ৪০১), অল্পস্বল্প পাৎলা পায়খানায় বা ১ মাসের কম বয়সের শিশুদের বেলায় এটা ব্যবহার করা উচিত নয়।

পাৎলা পায়খানার রোগীকে কখনো মৃদু বা কড়া কোনো জোলাপ দেয়া উচিত নয়। এগুলো থেকে রোগটা বাড়বে; শরীরে জলের অভাবের বিপদটাও বেড়ে যাবে।

অল্পস্বল্প পাৎলা পায়খানায় কয়েকটা ভালো ঘরোয়া চিকিৎসার জন্যে পরিচ্ছেদ ১ দেখুন।

বিভিন্ন ধরনের পাৎলা পায়খানার রোগে বিশেষ চিকিৎসা:

প্রচুর তরল জিনিস আর পুষ্টিকর খাবার দিয়ে বেশির ভাগ পাৎলা পায়খানার রোগের চিকিৎসা করা গেলেও কখনো কখনো বিশেষ চিকিৎসার দরকার হয়।

চিকিৎসার ব্যাপারে মনে রাখবেন, কিছু পাৎলা পায়খানার রোগ, বিশেষ করে ছোট ছেলেপিলের বেলায়, **অন্ত্রের বাইরে সংক্রমণ** থেকে হয়। **কানে, গলায়** আর **পেচ্ছাপের** কোনো **ব্যবস্থায় সংক্রমণ** আছে কি না সবসময় দেখে নেবেন। থাকলে, এই সব সংক্রমণের চিকিৎসা করা উচিত। এছাড়া, **হামের লক্ষণ** আছে কি না দেখবেন।

যদি শিশুর অল্প পাৎলা পায়খানা হয়, সঙ্গে সর্দির লক্ষণ থাকে, রোগটা সম্ভবতঃ কোনো ভাইরাস বা পেটের ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে হয়েছে—সেখানে কোনো বিশেষ চিকিৎসার দরকার নেই। প্রচুর তরল খাবার দিন।

কয়েকটা কঠিন পাৎলা পায়াখানার রোগের ঠিকমত চিকিৎসার কথা জানবার জন্যে মল বা অন্য কিছু পরীক্ষা করা দরকার হয়। কিন্তু সাধারণতঃ, বিশেষ কয়েকটা প্রশ্ন করে, মলটা দেখে, আর কয়েকটা লক্ষণ আছে কি না জেনে, যথেষ্ট জানতে পারবেন। লক্ষণ অনুসারে চিকিৎসার কিছু বিধি দেয়া হল:

১· **হঠাৎ অল্প পাৎলা পায়খানা। জ্বর নেই** (পেটের গোলমাল? পেটের ইনফ্লুয়েঞ্জা?)

● প্রচুর তরল জিনিস খান। সাধারণতঃ কোনো বিশেষ চিকিৎসার দরকার হয় না। এর চিকিৎসায় কেওলিন কোনো কাজে লাগে না—কারণ সেটা সংক্রমণের সঙ্গে লড়াই করে না, জলের অভাবও মেটায় না (পৃঃ ৪১৭)।

● যদি সাংঘাতিক শূলবেদনা (যন্ত্রণাদায়ক খিল ধরা) সমস্যার সৃষ্টি করে, বেলাডোনার মত ব্যথার ওষুধে কাজ হতে পারে (সাবধানতা আর মাত্রার জন্যে পৃঃ ৪১৫ দেখুন)।

২· **পাৎলা পায়খানার সঙ্গে বমি** (অনেক কারণে হয়)



● পাৎলা পায়খানার রোগীর যদি বমিও হয়, তবে শরীরে জল কমে যাওয়ার বিপদ বাড়ে, বিশেষ করে ছোট ছেলেপিলের। চিনি নুনের সরবৎ (পৃঃ ১৮২), চা, ফলের রস বা রোগী যদি তরল জিনিস খেতে চায়, তা দেয়া খুবই দরকার। প্রতি ৫ থেকে ১০ মিনিটে দু এক চুমুক খেতে দিন। যদি কিছুক্ষণের মধ্যে বমি না কমে, প্রোমেথাজাইন (পৃঃ ৪১৯) বা ফেনোবারবিটালের (পৃঃ ৪২২) মত ওষুধ ব্যবহার করতে পারেন।

● বমি কমাতে না পারলে বা জলের অভাব বেড়ে গেলে তাড়াতাড়ি ডাক্তারি সাহায্য নেবেন।

৩· **পাৎলা পায়খানার সঙ্গে আম আর রক্ত।** অনেক সময়ে পুরোনো হয়। জ্বর থাকে না। (সম্ভবতঃ এমিবা ঘটিত আমাশা। বিশদ বিবরণের জন্যে পৃঃ ১৯৭ দেখুন।) মেট্রোনিডাজোল (পৃঃ ৪০৭) ব্যবহার করুন। যেমন বলা হয়েছে সেই মাত্রায় ওষুধ দেবেন। ৪ দিন চিকিৎসার পরেও পাৎলা পায়খানা হতে থাকলে ডাক্তারি পরামর্শ নেবেন।

৪· **জ্বরের সঙ্গে তীব্র পাৎলা পায়খানা, রক্ত থাকতে বা নাও থাকতে পারে।** (জীবাণু ঘটিত আমাশা? টাইফয়েড? ম্যালেরিয়া?)

● কারো পাৎলা পায়খানা হলে, জলের অভাব কমাবার চিকিৎসা শুরু করার পর ৬ ঘন্টার বেশি সময় ধরে তার যদি জ্বর থাকে, আর তাকে যদি খুব অসুস্থ মনে হয়, তবে সম্ভব হলে এমপিসিলিন (পৃঃ ৩৯৯), না হলে টেট্রাসাইক্লিন (পৃঃ ৪০০) দেবেন।

● যদি রোগীর অবস্থা খুব খারাপ হয়, অথবা এমপিসিলিন বা টেট্রাসাইক্লিনে কোনো উন্নতি না হয়, ডাক্তারি সাহায্য নেবেন। টাইফয়েডের জ্বরের লক্ষণ (পৃঃ ২২৯) থাকলে, যেমন বলা হয়েছে সেই মাত্রায় ক্লোরামফেনিকল (পৃঃ ৪০১) দেবেন।

● যে সব এলাকায় *ফ্যালসিপেরাম* জাতীয় ম্যালেরিয়া দেখা যায়, সেখানে রোগীর পাৎলা পায়খানার সঙ্গে জ্বর হলে তাকে ক্লোরোকুইন (পৃঃ ৪০৫) দিয়েও চিকিৎসা করা ভালো, বিশেষ করে পিলে যদি বড় থাকে।

৫· হলদে, দুর্গন্ধযুক্ত পাৎলা পায়খানায় বুদবুদ বা ফেনা, রক্ত বা আম নেই। (জিয়ারডিয়া? পৃঃ ১৯৮)

● এটা জিয়ারডিয়া বলে একরকম খুব ছোট পরজীবী বা পুষ্টির অভাব থেকে হতে পারে। যেটাই হোক্, সাধারণতঃ চিকিৎসা হিসেবে শুধু প্রচুর তরল জিনিস, পুষ্টিকর খাবার আর বিশ্রাম দরকার হয়। মেট্রোনিডাজোল (পৃঃ ৪০৭) দিয়ে জিয়ারডিয়ার সাংঘাতিক সংক্রমণের চিকিৎসা করা যেতে পারে। মেপাক্রিন *(এটাব্রিন)* আরো সস্তা, কিন্তু অতটা কাজে লাগে না।

৬· পুরোনো পাৎলা পায়খানার রোগ (যে পাৎলা পায়খানা অনেকদিন ধরে থাকে বা বার বার হয়)।

● বেশির ভাগ সময় এটা অপুষ্টি থেকে হয়, কখনো কখনো এমিবা বা অন্য কোনো পুরোনো সংক্রমণ থেকেও হয়। শিশু যেন আরো পুষ্টিকর, বিশেষ করে প্রোটিনে ভরা খাবার (পৃঃ ১২৮) খায় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। তাতেও যদি পাৎলা পায়খানা হয়ে চলে, ডাক্তারি সাহায্য নেবেন।

৭· চাল ধোয়া জলের মত পাৎলা পায়খানা (কলেরা?)

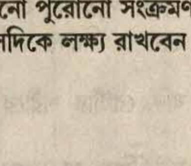
● চাল ধোয়া জলের মত মল কলেরার লক্ষণ (পৃঃ ২৩১)। কলেরা সাধারণতঃ *মহামারীর* আকারে আসে (অনেক লোকের একসঙ্গে হয়), আর বড় ছেলেমেয়েদের আর বয়স্কদের বেলায় বেশি বাড়াবাড়ি হয়। *কলেরা হলে স্বাস্থ্য অধিকর্তাদের জানানো উচিত।* সবথেকে কাছের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

এতে শরীরে দারুণ জলের অভাব হয়, বিশেষ করে যদি বমিও হয়। একটানা জলের অভাবের চিকিৎসা করে যান। হয় সাধারণ মাত্রার দুগুণ টেট্রাসাইক্লিন (পৃঃ ৪০০) না হয় সাধারণ মাত্রায় ক্লোরামফেনিকল (পৃঃ ৪০১) দিন। ডাক্তারি সাহায্য নিন। শরীরে জলের অভাবের জন্যেই কলেরায় মৃত্যু হয়।

পাৎলা পায়খানা হলে শিশুর যত্ন

শিশু আর ছোট ছেলেপিলেদের বেলায় পাৎলা পায়খানা বিশেষ বিপজ্জনক। প্রায়ই কোনো ওষুধ দরকার হয় না, কিন্তু বিশেষ যত্ন লাগে, কারণ শরীরে জলের অভাবের জন্যে শিশু খুব তাড়াতাড়ি মারা যেতে পারে।

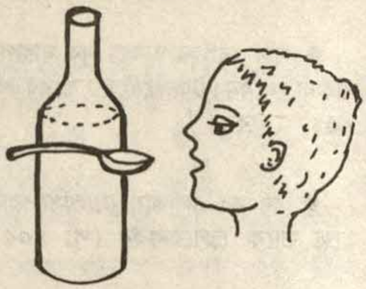
ওকে বুকের দুধ দিন



● বুকের দুধ খাইয়ে যান আর অল্প করে চুমুক দিয়ে চিনি নুনের সরবৎ খেতে দিন।

● বমি যদি সমস্যা হয়, ঘনঘন বুকের দুধ দেবেন—তবে একবারে শুধু অল্প করে। এছাড়া ৫ বা ১০ মিনিট অন্তর ছোট ছোট চুমুকে চিনি নুনের সরবৎ দেবেন।

আর এছাড়া চিনি নুনের সরবৎ



● বুকের দুধ না থাকলে, অন্য কোনো দুধ বা দুধের বদলি খাবার (যেমন, সয়াবীনের থেকে তৈরি দুধ) **ফোটানো জল মিশিয়ে স্বাভাবিকের** থেকে দুগুণ পাৎলা করে, অল্প করে বারে বারে দিয়ে দেখুন। যদি মনে হয় দুধে পাৎলা পায়খানা বেড়ে যাবে, তবে অন্য কোনো প্রোটিন (মুরগি, চর্বিছাড়া মাংস বা খোসা ছাড়ানো চটকানো বরবটি, ডিম—মধু, চিনি, গুড় বা ভালো করে সেদ্ধ করা অন্য কোনো শর্করাজাতীয় খাবার আর ফোটানো জল) দিন।

● শিশুর বয়স ১ মাসের কম হলে, কোনো ওষুধ দেবার আগে, কোনো স্বাস্থ্যকর্মীর খোঁজ করুন। স্বাস্থ্যকর্মী না থাকলে, আর শিশু বেশি অসুস্থ হলে তাকে এমপিসিলিন (পৃঃ ৩৯৯) দেয়া শিশুদের খাওয়ার সিরাপ দিন। অন্য কোনো এনটিবায়োটিক ব্যবহার না করাই ভালো।

পাৎলা পায়খানার রোগে কখন ডাক্তারি সাহায্য চাইতে হয়

পাৎলা পায়খানা আর আমাশা খবু বিপজ্জনক হতে পারে—বিশেষ করে ছোট ছেলেপিলেদের বেলায়। **নিচের অবস্থাগুলোতে ডাক্তারি সাহায্য চাওয়া উচিত:**

- পাৎলা পায়খানা যদি ৪ দিনের বেশি চলে, ভালোর দিকে না যায়—ছোট শিশুর সাংঘাতিক পাৎলা পায়খানা হলে ১ দিনের বেশি চললেই
- যদি রোগীর শরীরে জলের অভাব ঘটে আর সেটা খারাপের দিকে যায়
- যদি শিশু যা তরল জিনিস খায় সবটাই বমি করে ফেলে, বা কিছুই না খায়
- যদি শিশুর ফিট হয় আর হাত পা, মুখ ফুলে যায়
- যদি পাৎলা পায়খানা শুরু হবার আগেই রোগী (বিশেষ করে ছোট শিশু বা খুব বুড়োমানুষ) খুব অসুস্থ, দুর্বল বা অপুষ্ট হয়ে থাকে
- যদি মলে বেশি রক্ত থাকে—পাৎলা পায়খানা কম হলেও এটা বিপজ্জনক হতে পারে (নাড়িভুঁড়ির পথ আটকে যাওয়া পৃঃ ১০৭)

বমি

অনেকের, বিশেষ করে ছোটদের, মাঝে মাঝে "পেটের গোলমাল" হয়ে বমি হয়। প্রায়ই কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। পেটে বা অন্ত্রে একটু ব্যথা বা জ্বর থাকতে পারে। এই ধরনের সাধারণ বমি বিশেষ কঠিন হয় না, নিজে থেকে সেরেও যায়।

মারাত্মক পাৎলা পায়খানার রোগীর যত্ন

পাৎলা পায়খানা

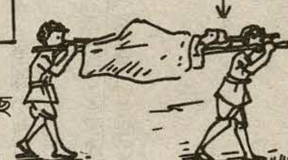
শরীরে জলের অভাবের লক্ষণ আছে কি? (অল্প পেচ্ছাপ বা একেবারেই নেই, চোখ বসে গেছে, মুখের ভেতরটা শুকনো ইত্যাদি)

- **না** → শরীরে জলের অভাব এড়ান: প্রচুর তরল জিনিস খান → অপুষ্টি এড়ান বা সারান
- **হ্যাঁ** → জলের অভাব কমান, প্রচুর তরল জিনিস আর চিনি নুনের সরবৎ খান (পৃঃ ১৮২) → অপুষ্টি এড়ান বা সারান
  - ভালো হয়নি → শরীরে সাংঘাতিক জলের অভাব আর চাল ধোয়া জলের মত মল। কলেরা? → প্রচুর চিনি নুনের সরবৎ দিয়ে যান → ডাক্তারি সাহায্য নিন

অপুষ্টি এড়ান বা সারান: রোগী খেতে পারলেই তাকে খেতে দিন। হালকা, ভালো করে চটকানো খাবার সবথেকে ভালো, সুষমভাবে প্রোটিন আর শক্তি যোগাবার খাবার। বুকের দুধ দিয়ে যান।

শরীরে জলের অভাবের চিকিৎসা শুরু করার পর ৬ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে জ্বর আছে কি?

- **হ্যাঁ** → আট দিন ধরে এমপিসিলিন দিন (পৃঃ ৩৯৯)
  - সেরে গেছে
  - ভালো হয়নি → টাইফয়েডের লক্ষণ আছে কি? (প্রতিদিন জ্বর বাড়ছে, নাড়ি আস্তে চলছে, খুবই অসুস্থ ইত্যাদি পৃঃ ২২৯)
    - **হ্যাঁ** → ২ সপ্তাহ ধরে ক্লোরামফেনিকল দিন (পৃঃ ৪০১)
      - ভালো হয়নি → ডাক্তারি সাহায্য নিন
      - সেরে গেছে
    - **না** → ডাক্তারি সাহায্য নিন
- **না** → পাৎলা পায়খানার সঙ্গে রক্ত বা আম আছে
  - **হ্যাঁ** → এমিবার জন্যে টেট্রাসাইক্লিন আর/বা মেট্রোনিডাজোল দিন (পৃঃ ৪০৭)
    - ভালো হয়নি
    - সেরে গেছে
  - **না** → মল হলদে আর খুব ফেনা ফেনা?
    - **হ্যাঁ** → জিয়ারডিয়ার জন্যে মেট্রোনিডাজোল বা কুইনাক্রিন দিন (পৃঃ ৪০৭)
      - ভালো হয়নি → ডাক্তারি সাহায্য নিন
      - সেরে গেছে
    - **না** → অল্পস্বল্প পাৎলা পায়খানায় কোনো ওষুধ দেবেন না বা কেওলিন আর পেকটিন দেবেন (পৃঃ ৪১৭)
      - ভালো হয়নি → ডাক্তারি সাহায্য নিন
      - সেরে গেছে



ডাক্তারি সাহায্য নিন

বমি হল নানা ধরনের সমস্যার লক্ষণ—সমস্যাগুলোর মধ্যে কিছু ছোটখাট, কয়েকটা বেশ কঠিন। কাজেই রোগীকে যত্ন করে পরীক্ষা করাটা জরুরি। প্রায়ই, পেটের বা অন্ত্রের কোনো সমস্যা, যেমন কোনো সংক্রমণ (পাৎলা পায়খানা পৃঃ ১৮৩), পচা খাবার থেকে বিষক্রিয়া (পৃঃ ১৭০), অথবা পেটের তীব্র যন্ত্রণা (যেমন এপেনডিসাইটিস) বা নাড়িভুঁড়িতে কিছু আটকে যাওয়া (পৃঃ ১০৭) থেকে বমি হয়। এছাড়া, প্রায় যে কোনো রোগেই বেশি জ্বর বা সাংঘাতিক যন্ত্রণা থাকলে বমি হতে পারে—বিশেষ করে ম্যালেরিয়া (পৃঃ ২২৭), হেপাটাইটিস (পৃঃ ২০৯), টনসিলে সংক্রমণ (পৃঃ ৩৫৬), কানে ব্যথা (পৃঃ ৩৫৫), মেনিনজাইটিস (পৃঃ ২২৬), পেচ্ছাপের সংক্রমণ (পৃঃ ২৭৮), পিত্তকোষে ব্যথা (পৃঃ ৩৭৫) বা মাইগ্রেনের মাথাধরা (পৃঃ ১৯৯) হলে।



বমির সঙ্গে বিপদের লক্ষণ—তাড়াতাড়ি ডাক্তারি সাহায্য নিন!

- শরীরে জলের অভাব—বেড়ে চলেছে—কমাতে পারছেন না (পৃঃ ১৮১)
- ২৪ ঘন্টার বেশি সময় ধরে সাংঘাতিক বমি
- বেগে বমি, বিশেষ করে বমির রং গাঢ় সবুজ বা খয়েরি হলে বা তাতে মলের মত গন্ধ থাকলে (অন্ত্রের পথ আটকে যাবার লক্ষণ পৃঃ ১০৭)
- নাড়িভুঁড়িতে একটানা ব্যথা, বিশেষ করে, রোগী যদি মলত্যাগ করতে না পারে অথবা তার পেটে কান রাখলে যদি গড়গড় আওয়াজ শুনতে না পান (অন্ত্রের পথ সাংঘাতিকভাবে আটকে যাওয়া, এপেনডিসাইটিস পৃঃ ১০৭)
- রক্ত বমি (পেটে ঘা পৃঃ ১৪৯, সিরোসিস পৃঃ ৩৭৪)

সাধারণ বমি কমাতে সাহায্য করতে হলে:

- যতক্ষণ বেশি বমি হচ্ছে কোনো শক্ত খাবার খাবেন না।
- ছোট ছোট চুমুকে চিনি দেয়া কিন্তু দুধ ছাড়া চা খান। আদা বা লেবুর রস মেশালে সুবিধা হতে পারে।



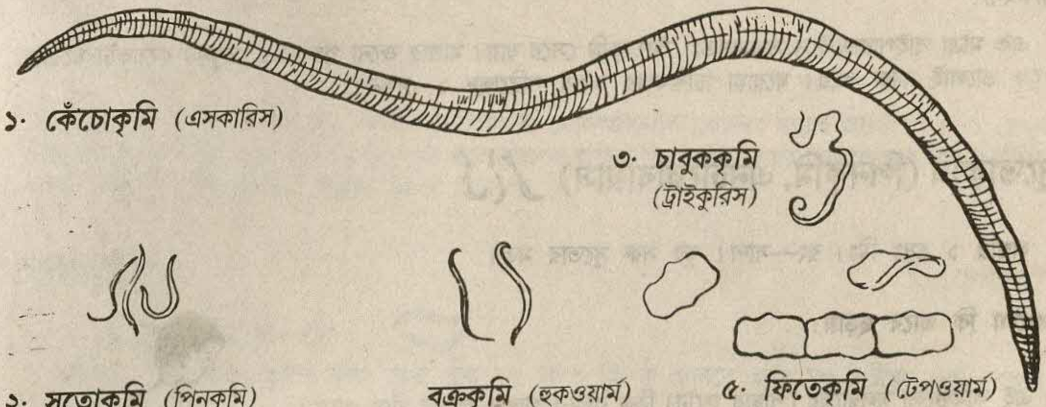
- বোতলের সরবৎ বা সোডা লেমনেড ছোট ছোট চুমুকে খান। কোনো কোনো ধরনের গাছগাছড়ার পাঁচনেও সাহায্য হতে পারে।
- শরীরে জলের অভাবের জন্যে বোতলের সরবৎ, চা বা চিনি নুনের সরবৎ (পৃঃ ১৮২) ছোট ছোট চুমুকে ঘনঘন খাবেন।
- কিছুক্ষণের মধ্যে যদি বমি না থামে, প্রমেথাজাইন (পৃঃ ৪১৯), ডাইফেনহাইড্রামাইন (পৃঃ ৪১৯) বা ফেনোবারবিটাল (পৃঃ ৪২২) ধরনের কোনো বমির ওষুধ খান।

এই সব ওষুধের বেশির ভাগই বড়ি, সিরাপ, ইনজেকশন আর সাপোজিটারি (যে নরম বাতি *মলদ্বারে* ঢুকিয়ে দেয়া হয়) হিসেবে আসে।

মুখে খেলে খুব কম জলের সঙ্গে ওষুধ খাওয়া উচিত, ৫ মিনিট অন্য কিছু খাওয়া উচিত নয়। যা বলা আছে তার থেকে বেশি মাত্রায় কখনো দেবেন না। যতক্ষণ না রোগীর শরীরে জলের অভাব কমছে আর সে পেচ্ছাপ করতে শুরু করছে, দ্বিতীয় মাত্রা দেবেন না। বমি আর পাৎলা পায়খানা যদি এমন সাংঘাতিক হয় যে মুখ বা মলদ্বার দিয়ে ওষুধ দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে, বমি কমাবার ওষুধগুলোর মধ্যে যে কোনো একটার ইনজেকশন দেবেন। হয়তো প্রমেথাজাইনেই সবচেয়ে বেশি কাজ হবে। দেখবেন যেন খুব বেশি দেবেন না।

কৃমি এবং অন্ত্রের অন্যান্য পরজীবী

অনেক ধরনের কৃমি এবং অন্য ছোট ছোট জীব (পরজীবী) মানুষের অন্ত্রের মধ্যে থেকে নানা রোগ ঘটাতে পারে। এদের মধ্যে বড়গুলো কখনো কখনো মলের মধ্যে দেখা যায়।



সাধারণতঃ শুধু কেঁচোকৃমি, সুতোকৃমি আর ফিতেকৃমিগুলোকেই মলের মধ্যে দেখা যায়। হুকওয়ার্ম আর চাবুককৃমি অন্ত্রের মধ্যে প্রচুর থাকলেও তাদের কোনোদিন মলের মধ্যে দেখা নাও যেতে পারে।

দ্রষ্টব্য : কৃমির সবথেকে চলতি যে ওষুধ তাতে পাইপারাজাইন থাকে। এটা শুধু কেঁচোকৃমি আর সুতোকৃমির বেলায় কাজ দেয়। অন্য কৃমির চিকিৎসা অন্য ওষুধ দিয়ে করতে হয়।

কোঁচোকৃমি, (এসকারিস)



২০ থেকে ৩০ সেঃ মিঃ লম্বা। রং গোলাপি বা সাদা।

এগুলো কি ভাবে ছড়ায় :

মল থেকে মুখে : পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবে, কেঁচোকৃমির ডিম একজনের মল থেকে অন্যদের মুখে চলে যায়।

স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব :

ডিমগুলো একবার খেয়ে ফেললে, বাচ্চা কৃমি বেরিয়ে রক্তে মিশে যায়। এতে সারা শরীরে চুলকুনি হতে পারে। বাচ্চা কৃমিগুলো তারপর ফুসফুসে চলে যায়—তার থেকে কখনো কখনো শুকনো কাশি হয়; অবস্থা খুব খারাপ হলে নিউমোনিয়া হয়ে কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠে। বাচ্চা কৃমিগুলো কাশির সঙ্গে বেরিয়ে এসে ঢোক গেলার সঙ্গে অন্ত্রে চলে গিয়ে সেখানে বড় হয়ে ওঠে।

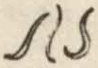
অন্ত্রে বেশি কেঁচোকৃমি থাকলে অস্বস্তি, বদহজম আর দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। ছোটদের বেশি কেঁচোকৃমি থাকলে পেটটা খুব বড় হয়ে ফুলে ওঠে। ক্বচিৎ কখনো কেঁচোকৃমি থেকে হাঁপানি বা ফিট হয় অথবা নাড়িভুঁড়ির পথ বিপজ্জনকভাবে আটকে বা বন্ধ হয়ে যায় (পৃঃ ১০৭)। শিশুর জ্বর হলে অনেকসময় কৃমিগুলো মলের মধ্যে বা মুখ বা নাক দিয়ে বেরিয়ে আসে। কখনো কখনো তারা শ্বাসনালিতে ঢুকে দম বন্ধ করে দেয়।

এড়ানো :

পায়খানা ব্যবহার করবেন। খাওয়ার বা খাবার নাড়াচাড়া করার আগে হাত ধোবেন, মাছি থেকে খাবার রক্ষা করবেন আর পরিচ্ছেদ ১২-র প্রথমদিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার যে সব বিধি দেয়া হয়েছে সেগুলো মেনে চলবেন।

চিকিৎসা:

এক মাত্রা পাইপারাজাইনে সাধারণতঃ কেঁচোকৃমি সেরে যায়। মাত্রার জন্যে পৃঃ ৪১১ দেখুন। কয়েকটা ঘরোয়া ওষুধ ভালোই কাজ করে। ঘরোয়া চিকিৎসার জন্যে পরিচ্ছেদ ১ দেখুন।

সুতোকৃমি (পিনকৃমি, এনটারোবায়াস) 

লম্বায় ১ সেঃ মিঃ। রং—সাদা। খুব সরু সুতোর মত।

এগুলো কি ভাবে ছড়ায় :



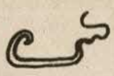
এই কৃমিগুলো মলদ্বারের (পাছার ফুটো) ঠিক বাইরে হাজার হাজার ডিম পাড়ে। এতে চুলকুনি হয়, বিশেষ করে রাত্রে। শিশু যখন চুলকোয়, তখন তার নখের তলায় ডিমগুলো লেগে যায়, তারপর খাবার বা অন্য জিনিসে চলে যায়। এইভাবে ওগুলো তার নিজের বা অন্যদের মুখে পৌঁছে যায়—আবার নতুন করে সুতোকৃমির সংক্রমণ হয়।

স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব :

এই কৃমিগুলো বিপজ্জনক নয়। চুলকুনি থেকে শিশুর ঘুমের অসুবিধে হতে পারে।

সারানো আর এড়ানো :

- সুতোকৃমি হলে শিশুকে আঁটসাঁট জাঙ্গিয়া পরিয়ে শোয়ানো উচিত, যাতে সে মলদ্বার চুলকোতে না পারে।
- ঘুম থেকে ওঠার পর আর মলত্যাগ করার পর শিশুর হাত এবং পাছা (মলদ্বারের আশপাশ) ধুয়ে দেবেন। খাবার আগে সর্বদা তার হাত ধুয়ে দেবেন।
- বারবার কাপড় বদল আর স্নান করিয়ে দেবেন—পাছা আর নখ খুব ভালো করে ধুইয়ে দেবেন
- তার নখ খুব ছোট ছোট করে কেটে দেবেন।
- শোবার সময় মলদ্বারের ভেতরে আর চারপাশে ভেসলিন বা একটু সরষের তেল মাখিয়ে দেবেন—তাতে চুলকুনি বন্ধ হবে।
- শিশুকে পাইপারাজাইন দেয়া কৃমির ওষুধ দেবেন। মাত্রার জন্যে পৃঃ ৪১১ দেখুন। একজন শিশুর এই কৃমির চিকিৎসা করার সময়, একই সঙ্গে বাড়ির সব লোকের চিকিৎসা করাই ভালো। ঘরোয়া ওষুধের জন্যে পরিচ্ছেদ ১ দেখুন।
- সুতোকৃমি এড়াবার সবথেকে ভাল উপায় হল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। ওষুধে কৃমি সেরে গেলেও, নিজেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে যত্ন না নিলে, আবার তা হবে। সুতোকৃমি মাত্র ৬ সপ্তাহ মত বাঁচে। **পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিধিগুলো যত্ন করে মেনে চললে—ওষুধ ছাড়াই—বেশির ভাগ কৃমি কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই চলে যাবে।**

চাবুককৃমি (ট্রাইকোফেলাস, ট্রাইকিউরিস): 

৩ থেকে ৫ সেঃ মিঃ লম্বা। রং গোলাপি বা ছাইছাই। কেঁচোকৃমির মতই এই কৃমিও একজনের মল থেকে অন্যদের মুখে চলে যায়। সাধারণতঃ এতে বিশেষ ক্ষতি হয় না, তবে এর থেকে পাৎলা পায়খানা হতে পারে। শিশুদের বেলায় এর ফলে মাঝে মাঝে অন্ত্রের কিছুটা অংশ মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসে *(মল নালির প্রোলাপ্স)*।

এড়ানো: কোঁচোকৃমির মত

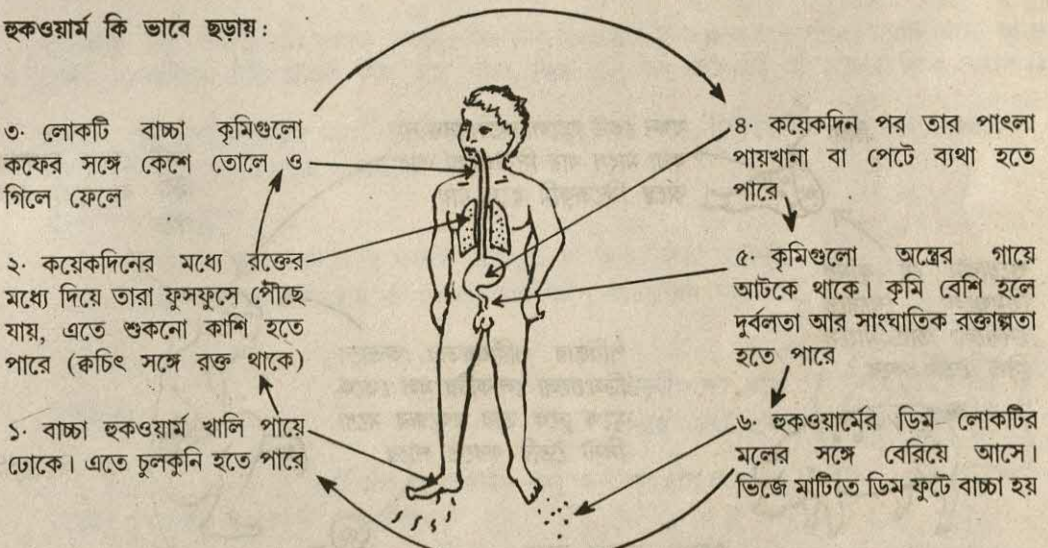
চিকিৎসা: যদি কৃমিগুলো কষ্ট দেয়, থিয়াবেনডাজোল বা মেবেনডাজোল দেবেন। মাত্রার জন্যে পৃঃ ৪১১ দেখুন। মলদ্বার বার হয়ে এলে এক গামলা কুসুম গরম জলে শিশুকে বসিয়ে দিন, এতে অন্ত্রের ভেতরে ঢুকে যাওয়া উচিত। এতে কাজ না হলে ডাক্তারি সাহায্য নিন।

হুকওয়ার্ম:

১ সেঃ মিঃ লম্বা। রং—লাল। 

হুকওয়ার্ম সাধারণতঃ মলের মধ্যে দেখা যায় না। আছে কি না জানতে হলে মল পরীক্ষা করা দরকার।

হুকওয়ার্ম কি ভাবে ছড়ায়:



হুকওয়ার্মের সংক্রমণ ছোটবেলায় একটা সবথেকে ক্ষতিকর রোগ হতে পারে। কোনো বাচ্চা যদি রক্তাল্পতা হয়ে খুব ফ্যাকাসে হয়ে যায় বা ধুলোবালি খায়—তার হয়তো হুকওয়ার্ম হয়েছে। সম্ভব হলে তার মল পরীক্ষা করে দেখা উচিত।

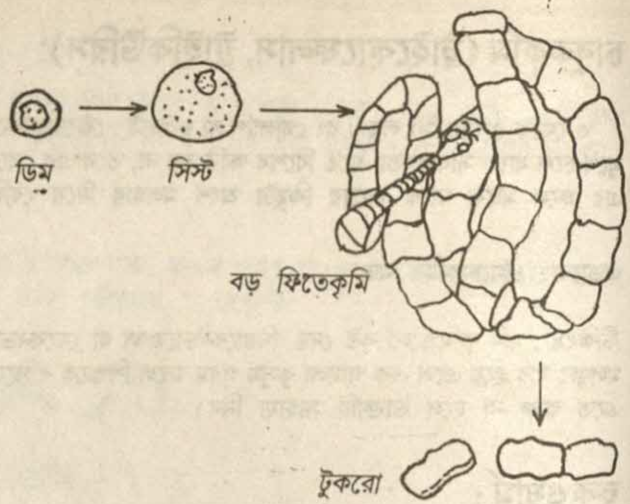
চিকিৎসা: থিয়াবেনডাজোল, মেবেনডাজোল, টেট্রাসাইক্লিন বা বেফেনিয়াম ব্যবহার করুন। মাত্রা ও সাবধানতার জন্যে পৃঃ ৪১১ আর ৪১২ দেখুন। রক্তাল্পতার চিকিৎসার জন্যে লোহা ভরা খাবার—দরকার হলে আয়রনের বড়ি (পৃঃ ১৪৭) খান।

মলত্যাগ করতে হলে পায়খানাতে যাও ;
খালি পায়েও হেঁটো নাকো, হুকওয়ার্ম এড়াও।

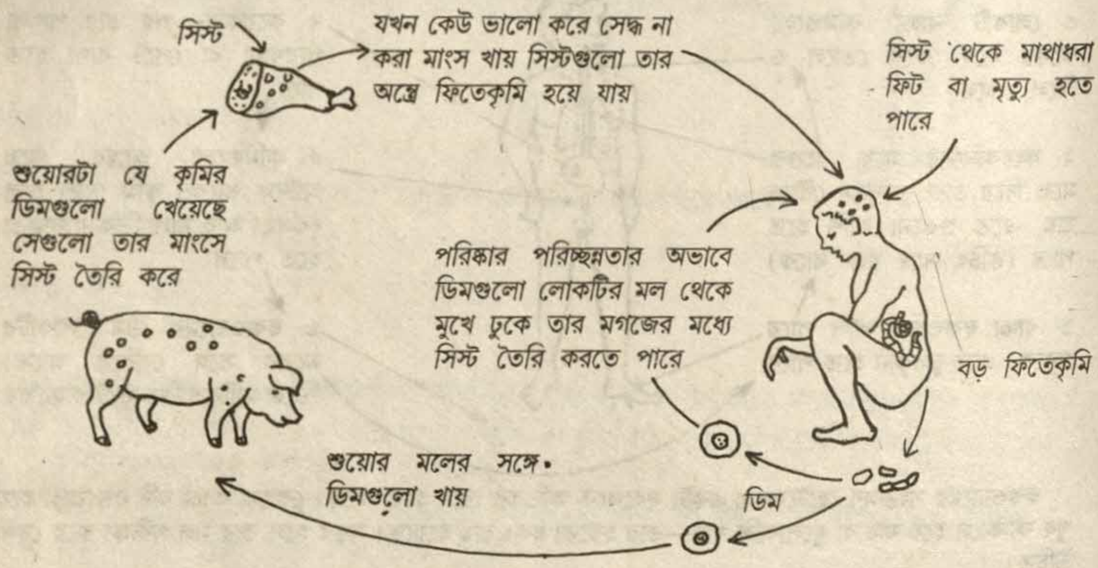
ফিতেকৃমি :

অন্ত্রের ভেতরে ফিতেকৃমি কয়েক মিটার লম্বা হয়। কিন্তু মলের মধ্যে যে ছোটখাট চ্যাপ্টা সাদা টুকরো (দেহের অংশ) গুলো দেখা যায় সেগুলো সাধারণত প্রায় ১ সেঃ মিঃ লম্বা হয়। কখনো কখনো একটা টুকরো নিজে নিজে বেরিয়ে আসে আর জাঙিয়াতে দেখা যায়।

শুয়োরের, গরুর বা অন্য মাংস ভালো করে সেদ্ধ না করে খেলে ফিতেকৃমি হয়।



এড়ানো : **মাংস—বিশেষ করে শুয়োরের—যেন ভালো করে সেদ্ধ করা হয়, সেটা দেখবেন।** ঝলসানো মাংসের মাঝের কোনো অংশ যেন কাঁচা না থাকে।



স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব : ফিতেকৃমি অন্ত্রে থাকলে কখনো কখনো অল্পস্বল্প পেটে ব্যথা হতে পারে—তবে তাতে বিশেষ কিছু সমস্যা হয় না।

সবথেকে বিপদ হয় যখন সিস্টগুলো (যে সব ছোট ছোট থলিতে বাচ্চা কৃমি থাকে) রোগীর মগজে ঢুকে যায়। মল থেকে মুখে ডিমগুলো গেলে এটা ঘটে। এই কারণে—**ফিতেকৃমি হলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিধিগুলো যত্ন করে মেনে চলা আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসা করানো উচিত।**

চিকিৎসা : নিক্লোসেমাইড (পৃঃ ৪১২) ডাইক্লোরাফেন (পৃঃ ৪১৩) বা কুইনাক্রাইন (মেপাক্রিন, *এটাব্রিন* পৃঃ ৪০৭) দিন। মন দিয়ে নির্দেশগুলি মেনে চলুন। ঘরোয়া চিকিৎসার জন্যে পরিচ্ছেদ ১ পৃঃ ১৯ দেখুন।

ট্রিকিনোসিস :

এই কৃমিগুলোকে মলের মধ্যে কখনো দেখা যায় না। এগুলো লোকের অন্ত্রের ভেতর দিয়ে গর্ত খুঁড়ে পেশীতে চলে যায়। ফিতেকৃমির মত এগুলোও ভালো করে না সেদ্ধ করে সংক্রমিত শুয়োরের মাংস বা অন্য মাংস খেলে হয়।

স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব : কতটা সংক্রমিত মাংস খাওয়া হয়েছে সেই অনুসারে কিছু নাও হতে পারে অথবা খুব অসুস্থতা বা মৃত্যুও হতে পারে। সংক্রমিত শুয়োরের মাংস খাবার পর কয়েক ঘণ্টা থেকে ৫ দিনের মধ্যে পাৎলা পায়খানা আর পেটের অসুখ হতে পারে।

সাংঘাতিক অবস্থায় রোগীর হতে পারে:

- শীত করে জ্বর
- পেশীতে ব্যথা
- চোখের চারপাশে আর কখনো কখনো পা ফোলা
- চামড়ায় ছোট ছোট কালসিটের দাগ (কালো বা নীল)
- চোখের সাদা অংশে রক্তপাত

রোগ সাংঘাতিক হলে ৩ থেকে ৪ সপ্তাহ থাকতে পারে।

চিকিৎসা : সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারি সাহায্য নেবেন। থিয়াবেনডাজোলে সামান্য কাজ হতে পারে। মাত্রার জন্যে পৃঃ ৪১১ দেখুন। (করটিকো স্টেরয়েডেও কাজ হতে পারে, কিন্তু এটা শুধু স্বাস্থ্যকর্মী বা ডাক্তার দিতে পারেন।)

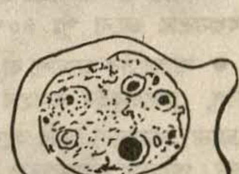
জরুরি : যদি একই শুয়োরের মাংস খেয়ে কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়ে, ট্রিকিনোসিস বলে সন্দেহ করবেন। এটা বিপজ্জনক হতে পারে, ডাক্তারি সাহায্য নিন।

ট্রিকিনোসিস এড়ানো :

- খুব ভালো করে সেদ্ধ হলে তবেই শুয়োরের বা অন্য মাংস খাবেন।
- শুয়োরকে কসাইখানার ছাঁট বা ফেলে দেয়া মাংস খাওয়াবেন না।

এমিবা :

অনুবীক্ষণের মধ্যে দিয়ে দেখা এমিবা



এগুলো কৃমি নয়—ছোট্ট ছোট্ট জীব বা পরজীবী—শুধু অনুবীক্ষণ (যে যন্ত্রে সবকিছু বড় দেখায়) দিয়েই দেখা যায়।

অনুবীক্ষণ



এগুলো কি ভাবে ছড়ায় :

সংক্রমিত লোকদের মলে লক্ষ লক্ষ এইসব ছোট্ট পরজীবী থাকে। জল ও ময়লা নিকাশের ভালো ব্যবস্থার অভাবে এগুলো খাওয়ার জলে বা খাবারে চলে যায় আর অন্যেরাও সংক্রমিত হয়ে যায়।

এমিবার সংক্রমণের লক্ষণ :

অনেক সুস্থ লোকের এমিবা থাকলেও তারা অসুস্থ হয় না। তবে সাংঘাতিক পাৎলা পায়খানা বা *আমাশা* (পাৎলা পায়খানার সঙ্গে রক্ত) সাধারণতঃ এমিবা থেকেই হয়—বিশেষ করে যারা অন্য রোগ বা অপুষ্টিতে আগে থেকেই দুর্বল হয়ে গেছে, তাদের বেলায়। কখনো কখনো এমিবা থেকে যকৃতে যন্ত্রণাদায়ক আর বিপজ্জনক এবসেস (ফোড়া) হয়।

এমিবার আমাশার বিশেষত্ব হল:

- পাৎলা পায়খানা—আসে যায়, কখনো কখনো তার মাঝে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়।
- পেটে মোচড় দেয়, ঘনঘন মলের বেগ হয়, যদিও মল খুব অল্পই হয় বা একটুও হয় না—বা শুধু আম বার হয়।
- অনেকবার পাৎলা (কিন্তু জলের মত নয়) মল হয়, তাতে প্রচুর আম, কখনো কখনো রক্তের ছিটে থাকে।
- সাংঘাতিক অবস্থায় অনেকটা রক্ত পড়ে। রোগী খুব দুর্বল আর অসুস্থ হয়ে যেতে পারে।
- সাধারণতঃ জ্বর থাকে না।

পাৎলা পায়খানার সঙ্গে রক্ত এমিবা বা জীবাণু থেকে হতে পারে। তবে জীবাণুঘটিত (শিগেলা) আমাশা আরো হঠাৎ করে শুরু হয়, মলটা আরো জলের মত হয়, আর প্রায় সব সময়ই জ্বর থাকে (পৃঃ ১৮৯)। সাধারণ নিয়ম হল:

পাৎলা পায়খানা + রক্ত + জ্বর = জীবাণুঘটিত সংক্রমণ (শিগেলা)
পাৎলা পায়খানা + রক্ত + জ্বর নেই = এমিবা

কখনো কখনো পাৎলা পায়খানার সঙ্গে রক্ত পড়ার অন্য কারণ থাকে। কারণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে গেলে *মল পরীক্ষা* করার দরকার- হতে পারে।

মাঝে মাঝে যকৃতের মধ্যে এমিবা ঢুকে পড়ে এবসেস বা পুঁজ ভর্তি গর্ত তৈরি করে। এর থেকে পেটের ডানপাশের ওপরদিকে টিপলে বা এমনিতেই ব্যথা হয়। ব্যথাটা বুকের ডানদিকে ছড়িয়ে যেতে পারে আর হাঁটলে বাড়ে। (এর সঙ্গে পিত্তকোষের ব্যথা পৃঃ ৩৭৫, হেপাটাইটিস পৃঃ ২০৯, সিরোসিসের পৃঃ ৩৭৪ তুলনা করুন।) এই সব লক্ষণ দেখা দেবার পর রোগীর যদি কাশির সঙ্গে খয়েরি রঙের তরল জিনিস ওঠে, তবে বুঝতে হবে যে এমিবার ফোড়ার পুঁজ তার ফুসফুসের মধ্যে চলে যাচ্ছে।

চিকিৎসা:

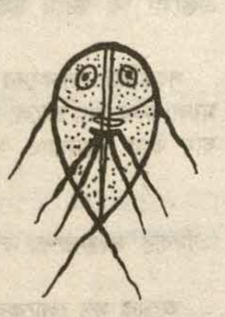
- সম্ভব হলে ডাক্তারি সাহায্য নিন আর মল পরীক্ষা করান।
- অন্ত্রে এমিবার ছোটখাট সংক্রমণের চিকিৎসা মেট্রোনিডাজোল দিয়ে করা যায়। (মাত্রা, চিকিৎসার ধারা আর সাবধানতার জন্যে পৃঃ ৪০৭ দেখুন।)
- সাংঘাতিক আমাশা বা এমিবার এবসেসের জন্যে মেট্রোনিডাজোল ব্যবহার করুন। মেট্রোনিডাজোল পাওয়া না গেলে, ক্লোরোকুইন ব্যবহার করুন (পৃঃ ৪০৫)। ডাক্তারি সাহায্য নিন।

এড়ানো: পায়খানা তৈরি করে ব্যবহার করুন। যেখান থেকে খাবার জল আসে সে জায়গাটা সংক্রমণ থেকে রক্ষা করুন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিধিগুলো মেনে চলুন। এমিবার আমাশা এড়াতে হলে ভালো খাওয়াদাওয়া করা, শ্রান্তি আর মাতলামি বাদ দেয়াও দরকার।

জিয়ারডিয়া:

এমিবার মত জিয়ারডিয়াও এমন একটা পরজীবী যা শুধু অনুবীক্ষণে দেখা যায়। এটা অন্ত্রে থাকে; এটা থেকে প্রায়ই পাৎলা পায়খানা হয়—বিশেষ করে ছোটদের। পাৎলা পায়খানাটা পুরোনো হতে পারে বা আসতে যেতে পারে।

হলদে, দুর্গন্ধযুক্ত, ফেনাফেনা (বুদবুদে ভরা) পাৎলা পায়খানা হলে, কিন্তু রক্ত বা আম না থাকলে রোগীর হয়তো জিয়ারডিয়া হয়েছে। পেট বাতাসে ফুলে গিয়ে অস্বস্তি হয়, অন্ত্রে অল্পস্বল্প মোচড়াতে পারে, রোগী প্রচুর বাতাস বার করে। সাধারণতঃ জ্বর থাকে না।


অনুবীক্ষণের নিচে দেখা জিয়ারডিয়া

জিয়ারডিয়ার সংক্রমণ প্রায়ই নিজের থেকেই সেরে যায়। পুষ্টিকর খাওয়াদাওয়াতে সাহায্য হয়। রোগ সাংঘাতিক হলে মেট্রোনিডাজোল দিয়ে চিকিৎসা করা সবথেকে ভালো (মাত্রার জন্যে পৃঃ ৪০৭ দেখুন)। কুইনাক্রিন (পৃঃ ৪০৭) আরো সস্তা, কিন্তু তত ভালো কাজ দেয় না।

মাথাধরা আর মাইগ্রেন (আধকপালে)

সাধারণ বা স্নায়ুর মাথাধরায় ঘরোয়া ওষুধ কখনো কখনো আধুনিক ওষুধের মতই কাজ করে।

সাধারণ মাথাধরায় বিশ্রাম আর এসপিরিন কাজ দিতে পারে। গরমজলে ভেজানো কাপড় ঘাড়ের পেছনে রাখলে, আর ঘাড় আর কাঁধ আস্তে আস্তে মালিশ করলে প্রায়ই উপকার হয়। আরো কয়েকটা ঘরোয়া ওষুধে কাজ হয় বলে মনে হয়।

এসপিরিন



যে সব রোগে জ্বর হয় সেগুলোতে প্রায়ই মাথা ধরে। সাংঘাতিক মাথা ধরলে মেনিনজাইটিসের (পৃঃ ২২৫) লক্ষণ আছে কি না দেখুন।

ঘনঘন মাথাধরা কোনো পুরোনো রোগ বা চোখ খারাপের লক্ষণ হতে পারে। ভালো খাওয়াদাওয়া করা আর যথেষ্ট ঘুমোনো দরকার। মাথাধরা না ছাড়লে ডাক্তারি সাহায্য নেবেন।

সাংঘাতিক দপদপ করা মাথাধরাকে **মাইগ্রেন** বলে—এটা প্রায়ই মাথার একদিকে হয়। মাইগ্রেনের আক্রমণ ঘনঘন হতে পারে আবার কয়েক মাস বা বছর অন্তরও হতে পারে।

মাইগ্রেনের বিশেষ লক্ষণ হল : শুরুতে দৃষ্টি আবছা হয়ে যাওয়া ; অদ্ভুত আলোর ফুটকি দেখা বা একটা হাত বা পা অসাড় হয়ে যাওয়া ; তারপরে প্রচণ্ড মাথাধরা—সেটা কয়েক ঘণ্টা বা দিন ধরে থাকে। প্রায়ই বমি হয়। মাইগ্রেন খুব যন্ত্রণাদায়ক হলেও বিপজ্জনক নয়।

মাইগ্রেন বন্ধ করতে বা থামাতে হলে প্রথম লক্ষণ দেখা দিলেই নিচের কাজগুলি করবেন :



এসপিরিন



- এক কাপ কড়া কফি বা দুধ ছাড়া চায়ের সঙ্গে ২ টো এসপিরিন খান।

- অন্ধকার, নিরিবিলি জায়গায় শুয়ে থাকুন। শরীর-মন যতটা পারেন আলগা করে দিন। নিজের সমস্যার কথা না ভাবতে চেষ্টা করুন।

- মাইগ্রেনের মাথাধরা খুব খারাপ হলে এরগোটামাইনের সঙ্গে ক্যাফিন মেশানো বড়ি (*কেফারগট* পৃঃ ৪১৫) আনিয়ে প্রথমে ২ টো তারপর যতক্ষণ না যন্ত্রণা যায় আধঘণ্টা অন্তর একটা করে বড়ি খান। এক দিনে ৬ টার বেশি বড়ি খাবেন না।



সর্দি আর ইনফ্লুয়েঞ্জা



সর্দি আর ইনফ্লুয়েঞ্জা হল সাধারণ ভাইরাসের সংক্রমণ। এর থেকে নাক দিয়ে জল পড়ে, কাশি, গলা ব্যথা, কখনো কখনো জ্বর বা গাঁটে গাঁটে ব্যথা হয়। অল্পস্বল্প পাৎলা পায়খানাও হতে পারে—বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়েদের বেলায়।

সর্দি আর ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রায় সবসময় ওষুধ ছাড়াই সেরে যায়। **পেনিসিলিন, টেট্রাসাইক্লিন, বা অন্য এনটিবায়োটিক ব্যবহার করবেন না,** কারণ ওগুলোতে কোনো উপকার হবে না, বরং ক্ষতি হতে পারে।

- প্রচুর জল খান আর যথেষ্ট বিশ্রাম নিন।

- এসপিরিন (পৃঃ ৪১৪) আর এসিটামিনোফিনে (পৃঃ ৪১৪) জ্বর নামাতে আর গায়ের ব্যথা, মাথাধরা কমাতে সাহায্য করে। বেশি দামি সর্দির বড়ি এসপিরিনের থেকে কিছু ভালো নয়। কাজেই পয়সা নষ্ট করবেন কেন?

- গরম ভাপে শ্বাস নিন, এতে বন্ধ নাক পরিষ্কার করার সাহায্য হয় (পৃঃ ২০৫)।

- কোনো বিশেষ পথ্যের দরকার নেই, তবে ফলের রস, বিশেষ করে কমলালেবুর রস বা পাতিলেবুর সরবতে উপকার হয়।

- সর্দির সঙ্গে যে কাশি আর নাক বন্ধ হয়, সেগুলোর চিকিৎসার জন্যে পরের পৃষ্ঠাগুলি দেখুন।

সর্দি বা ইনফ্লুয়েঞ্জা এক সপ্তাহের বেশি থাকলে, রোগীর জ্বর হলে, কাশির সঙ্গে অনেকটা কফ (পুঁজভরা শ্লেষ্মা), উঠলে, শ্বাস হালকা অথচ দ্রুত হলে বা বুকে ব্যথা হলে, তার হয়তো ব্রঙ্কাইটিস বা নিউমোনিয়া (পৃঃ ২০৭, ২০৮) হচ্ছে। একটা এনটিবায়োটিকের দরকার হতে পারে। বুড়োমানুষদের, ছোট শিশুদের আর পুরোনো ব্রঙ্কাইটিসের মতো যাদের ফুসফুসের সমস্যা আছে তাদের বেলায় সর্দি থেকে নিউমোনিয়া হয়ে যাবার ভয় বেশি থাকে।

গলা ব্যথা সাধারণতঃ সর্দিরই অংশ। কোনো বিশেষ ওষুধের দরকার নেই, তবে গরমজলে কুলকুচি করলে উপকার হতে পারে। তবে যদি বেশি জ্বরের সঙ্গে হঠাৎ গলায় ব্যথা শুরু হয়, সেটা গলাতে স্ট্রেপটোকক্কাসের আক্রমণ হতে পারে। বিশেষ চিকিৎসার দরকার (পৃঃ ৩৫৬)।

সর্দি এড়ানো:

- যথেষ্ট ঘুমোলে আর ভালোভাবে খাওয়াদাওয়া করলে সর্দি এড়ানোর সাহায্য হয়। কমলালেবু, টমেটো আর ভিটামিন-সি ভর্তি অন্য ফল খেলেও কাজ হতে পারে।

- লোকে যাই বিশ্বাস করুক না কেন, ঠান্ডা লাগলে বা ভিজলে সর্দি হয় না, তবে ভিজলে বাড়তে পারে। সংক্রমিত লোকেরা হাঁচির সঙ্গে ভাইরাসগুলো বাতাসে ছড়িয়ে দিলে, তাদের কাছ থেকেই সর্দি 'ধরে'।

- নিজের সর্দি যাতে অন্যদের না হয় সেজন্য রোগীর আলাদা খাওয়া আর শোয়া—আর ছোট শিশুদের থেকে দূরে থাকতে বিশেষ যত্ন নেয়া উচিত।

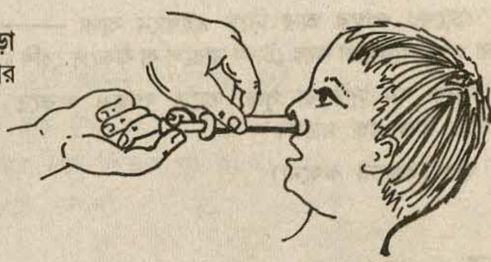
- সর্দি থেকে কানে ব্যথা বন্ধ করতে হলে (পৃঃ ৩৫৫) **নাক ঝাড়বেন না, শুধু মুছে নেবেন**। ছোটদেরও এইরকম করতে শেখান।

নাক বন্ধ আর নাক দিয়ে জল ঝরা

নাক বন্ধ আর জল ঝরা সর্দি বা এলার্জি (পরের পৃষ্ঠা দেখুন) থেকে হতে পারে। নাকে বেশি শ্লেষ্মা থাকলে ছোটদের কানে সংক্রমণ বা বড়দের সাইনাসের সমস্যা হতে পারে।

বন্ধ নাক পরিষ্কার করতে এইগুলো করুন:

১· ছোট ছেলেপিলেদের বেলায়, ড্রপার বা **ছুঁচ ছাড়া** সিরিঞ্জ দিয়ে এইভাবে সাবধানে নাক থেকে শ্লেষ্মা টেনে বার করে দিন:





২· বড় ছেলেপিলে বা বয়স্করা একটু নুনজল হাতে করে নিয়ে নাক দিয়ে টেনে নিতে পারে। এতে শ্লেষ্মা আলগা হতে সাহায্য করে। শুধু জলও ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩· ২০৫ পৃষ্ঠায় যেমন বলা হয়েছে সেইভাবে গরম জলের ভাপে শ্বাস নিলে বন্ধ নাক পরিষ্কার হতে সাহায্য করে।

৪· নাকে জল ঝরলে বা নাক বন্ধ থাকলে মুছে নেবেন, ঝাড়বেন না। নাক ঝাড়লে কান ব্যথা বা সাইনাসে সংক্রমণ হতে পারে।

৫· যাদের প্রায়ই সর্দির পরে কান ব্যথা বা সাইনাসের সমস্যা হয় তারা ফেনিলএফ্রিনের (পৃঃ ৪১৮) মত **নাক পরিষ্কার করার** তরল ওষুধ ব্যবহার করে এইসব সমস্যা এড়াতে পারে। একটু নুন জল নাক দিয়ে টেনে তারপর নাকে এইভাবে ওষুধ দেবেন:

মাথা কাৎ করে ২ বা ৩ ফোঁটা ওষুধ নাকের নিচের দিকের ফুটোয় দিন। মিনিট দুই অপেক্ষা করে অন্য ফুটোয় দিন।

সাবধান: নাক পরিষ্কার করার ওষুধ দিনে ৩ বারের বেশি—৩ দিনের বেশি ব্যবহার করবেন না। ড্রপারটা নাকের ফুটোয় ছোঁয়াবেন না।



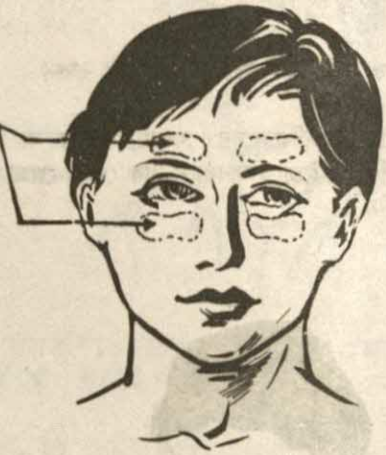
শ্লেষ্মা তরল করার সিরাপেও (ফেনিলএফ্রিন দেয়া) কাজ হতে পারে

কান আর সাইনাসের সংক্রমণ এড়ান—নাক মুছে নিন, ঝাড়বেন না।

সাইনাসের গোলমাল (সাইনাসাইটিস)

সাইনাসে—বা নাকের চারপাশের হাড়গুলোর মাঝের ফাঁকা জায়গায়—তীব্র বা পুরোনো (অনেক দিনের) প্রদাহকে সাইনাসাইটিস বলে।

লক্ষণ:



- চোখের ওপরে আর নিচে এইখানে ব্যথা (হাড়ের ওপর আলতো করে টোকা মারলে বা ঝুঁকলে বেশি লাগে।)
- নাকে ঘন সর্দি বা পুঁজ, তাতে দুর্গন্ধও থাকতে পারে। সাধারণতঃ নাক বন্ধ থাকে।
- জ্বর (কখনো কখনো)

চিকিৎসা:

- একটু নুনজল নাক দিয়ে টেনে নিন (পৃঃ ২০১)
- মুখের ওপর গরম সেঁক দিন।
- গরম ভাপে শ্বাস নিলে শ্লেষ্মা তরল হবার সাহায্য হয়।
- শ্লেষ্মা তরল করার নাকের তরল ওষুধ যেমন ফেনিলএফ্রিন (*নিও-সাইনেফ্রিন* পৃঃ ৪১৮) ব্যবহার করুন।
- টেট্রাসাইক্লিন (পৃঃ ৪০০), এমপিসিলিন (পৃঃ ৩৯৯) বা পেনিসিলিনের (পৃঃ ৩৯৭) মত কোনো এনটিবায়োটিক ব্যবহার করুন।
- রোগী ভালো না হলে ডাক্তারি সাহায্য নিন।

এড়ানো:

সর্দি হলে আর নাক বন্ধ হলে, নাক পরিষ্কার রাখতে চেষ্টা করুন। ২০১ পৃষ্ঠার নির্দেশগুলো মেনে চলুন।

এলার্জির রাইনাইটিস (হে ফিভার)

বাতাসে ভেসে থাকা কোনো জিনিস শ্বাসের সঙ্গে শরীরে গেলে আর এলার্জির প্রতিক্রিয়া থেকে (পরের পৃষ্ঠা) নাক দিয়ে জল ঝরতে আর চোখ কুটকুট করতে পারে। সাধারণতঃ এটা বছরের বিশেষ বিশেষ সময়ে বাড়ে।



চিকিৎসা:

ক্লোরফেনিরামিনের (পৃঃ ৪২০) মত কোনো এলার্জির ওষুধ ব্যবহার করুন। গা বমির ওষুধ হিসেবে সাধারণতঃ যে ডাইমেনহাইড্রিনেট (ড্রামামাইন পৃঃ ৪২০) বিক্রি হয়, তাও কাজে লাগে।

এড়ানো:

কোন জিনিস থেকে এই প্রতিক্রিয়া হচ্ছে (যেমন—ধুলো, মুরগির পালক, ফুলের রেণু, ছত্রাক) খুঁজে বার করে সেটাকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করুন।

এলার্জির প্রতিক্রিয়া

এলার্জি একটা গোলমাল বা প্রতিক্রিয়া, এটা শুধু কোনো কোনো লোকের হয়—যখন যে সব জিনিসে তারা স্পর্শকাতর সেগুলো তারা:

- শ্বাস দিয়ে টেনে নেয়
- খায়
- ইনজেকশনে নেয়
- বা ছোঁয়

এলার্জির প্রতিক্রিয়া অল্পস্বল্প বা খুব সাংঘাতিক হতে পারে। এগুলোর মধ্যে পড়ে:

- চুলকুনি যুক্ত র‍্যাশ, ফোলা ফোলা দাগ বা *চাক* (পৃঃ ২৪৪)
- নাকে জল ঝরা, চোখ কুটকুট বা জ্বালা করা (হে ফিভার পৃঃ ২০২)
- গলা খুসখুস, শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানি (পরের পৃষ্ঠা দেখুন)
- এলার্জির শক (পৃঃ ৮৩)
- পাৎলা পায়খানা (শিশুদের দুধে এলার্জি থাকলে হয়—পাৎলা পায়খানার কারণ হিসেবে কচিৎ পাওয়া যায় পৃঃ ১৮৪)

এলার্জি কোনো সংক্রমণ নয়—একজনের থেকে অন্যদের হয় না। তবে বাপমায়ের এলার্জি থাকলে ছেলেমেয়েদেরও এলার্জির ধাত থাকতে পারে।

এলার্জি থাকলে লোকে সাধারণতঃ কোনো কোনো ঋতুতে বা যে সব জিনিস তাদের কষ্ট দেয় সেগুলোর ছোঁয়ায় এলে—বেশি ভোগে। এই জিনিসগুলোতে এলার্জির প্রতিক্রিয়া বেশি হয়:



হাঁপানি



শ্বাস নিতে উঠে বসা

হাঁপানির রোগীর যখন তখন হঠাৎ শ্বাসকষ্ট হয়। ফোঁস ফোঁস বা সাঁই সাঁই আওয়াজ হচ্ছে কি না শুনুন—বিশেষ করে শ্বাস ছাড়ার সময়। শ্বাস নেবার সময়, বাতাস পাবার চেষ্টায়, রোগীর কণ্ঠার পেছনের আর পাঁজরের মাঝের চামড়া ভেতরদিকে ঢুকে যেতে পারে। যথেষ্ট বাতাস নিতে না পারলে রোগীর নখ আর ঠোঁট নীল হয়ে আর গলার শিরা ফুলে যেতে পারে। সাধারণতঃ জ্বর থাকে না। কাশির সঙ্গে অল্প সাদা কফ থাকতে পারে।

হাঁপানি প্রায়ই ছোটবেলায় শুরু হয়ে সারাজীবন ভোর সমস্যা হয়ে থাকে। এটা **ছোঁয়াচে নয়,** কিন্তু যে সব শিশুদের আত্মীয়স্বজনের হাঁপানি আছে তাদের মধ্যে এটা বেশি দেখা যায়। সাধারণতঃ বছরের বিশেষ কয়েকটা মাসে আর রাত্রে এ রোগ বাড়ে। অনেক বছর ধরে হাঁপানি হলে রোগীর এমফিসিমা (পৃঃ ২০৭) হয়ে যেতে পারে।

যে জিনিসে কারো এলার্জি আছে, সে সেটা খেলে বা শ্বাসের সঙ্গে নিলে তা থেকে তার হাঁপানির আক্রমণ হতে পারে (পৃঃ ২০৩)। ছোটদের প্রায়ই সাধারণ সর্দি দিয়ে হাঁপানি শুরু হয়। কোনো কোনো লোকের বেলায় ঘাবড়ে যাওয়া বা দুশ্চিন্তাও হাঁপানির আক্রমণের কতকটা কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

চিকিৎসা:

- ঘরের ভেতরে যদি হাঁপানি বাড়ে তবে বাইরে—যেখানে বাতাস সবথেকে পরিষ্কার সেখানে—রোগীর যাওয়া উচিত। শান্তভাবে রোগীর সঙ্গে সদয় ব্যবহার করবেন। তাকে আশ্বাস দেবেন।
- প্রচুর তরল জিনিস খেতে দেবেন। এতে শ্লেষ্মা আলগা হয়, শ্বাসের কাজও সহজ হয়। জলের ভাপে শ্বাস নিলে কাজ হতে পারে (পৃঃ ২০৫)।
- অল্পস্বল্প আক্রমণে এফিড্রিন বা থিওফাইলিন (পৃঃ ৪০৫) দেবেন।
- বাড়াবাড়ি হাঁপানি হলে এড্রেনালিনের ইনজেকশন দেবেন। বড়দের ১/২ এমপুল, ছোটদের ১/৪ এমপুল। দরকার হলে, আধঘণ্টা অন্তর আরো এক মাত্রা করে ৩ বার পর্যন্ত দিতে পারেন। সাবধানতার জন্যে পৃঃ ৪১৯ দেখুন।



চামড়ার ঠিক নিচে এড্রেনালিনের ইনজেকশন দেবেন

- যদি রোগীর জ্বর হয়, কিংবা আক্রমণটা ৩ দিনের বেশি থাকে, অথবা কফটা যদি ঘন আর হলদেটে হয়ে যায়, টেট্রাসাইক্লিনের ক্যাপসুল (পৃঃ ৪০০) বা এরিথ্রোমাইসিন (পৃঃ ৪০০) দেবেন।
- ক্বচিৎ কেঁচোকৃমি থেকে হাঁপানি হয়। যদি ছেলেপিলের হাঁপানি হয়, আর তাদের কেঁচোকৃমি আছে বলে মনে হয়, পাইপারাজাইন (পৃঃ ৪১১) দিতে পারেন।
- **রোগী ভালোর দিকে না গেলে ডাক্তারি সাহায্য নেবেন।**
- রোগীকে কোনো ঘুমের ওষুধ দেবেন না।

এড়ানো:

হাঁপানি থাকলে, যা থেকে আক্রমণ আসে, তেমন জিনিস রোগীর খাওয়া বা শ্বাসের সঙ্গে নেয়া উচিত নয়। বাড়ি বা কাজের জায়গা পরিষ্কার রাখা উচিত। ভেতরে মুরগি বা অন্য পশুপাখি ঢুকতে দেবেন না। বিছানা বাইরে রোদে দেবেন। কখনো কখনো বাইরে খোলা হাওয়ায় শুলে উপকার হয়। অন্য জায়গায়—যেখানে বাতাসে এলার্জি ঘটাবার জিনিস নেই সেখানে—চলে গেলে, হাঁপানির রোগীর অবস্থার উন্নতি হতে পারে।

থাকলে হাঁপানি বিড়ি সিগারেট ছাড়ো;
ফুসফুসটার ক্ষতি হয় ওতে আরো।

কাশি

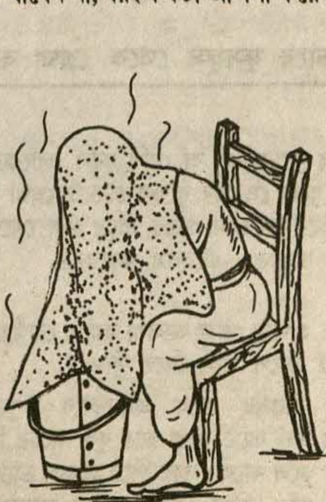
কাশি রোগ নয়,—গলা, ফুসফুস বা শ্বাসনালির (ফুসফুসের মধ্যে বাতাস চলাচলের যে সব নল বিছিয়ে আছে) নানা রোগের লক্ষণ। এখানে কিছু সমস্যার কথা বলা হল, যা থেকে নানা ধরনের কাশি হয়:

শুকনো কাশি, সঙ্গে অল্প কফ বা কফ নেই:	কাশির সঙ্গে কফ:	কাশির সঙ্গে সাঁই সাঁই বা ঘড় ঘড় টান আর শ্বাসকষ্ট:
সর্দি বা ইনফ্লুয়েঞ্জা (পৃঃ ২০০) কৃমি—ফুসফুসের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় (পৃঃ ১৯৩) হাম (পৃঃ ৩৫৮) ধূমপায়ীর কাশি (ধূমপান পৃঃ ১৭৮)	ব্রঙ্কাইটিস (পৃঃ ২০৭) ব্রঙ্কিয়েকটেসিস (পৃঃ ২০৮) ফুসফুসের ফোড়া (পৃঃ ২০৮) নিউমোনিয়া (পৃঃ ২০৮)	হাঁপানি (পৃঃ ২০৪) ঘুংড়ি কাশি (পৃঃ ৩৬০) ডিপথিরিয়া (পৃঃ ৩৬১) হার্টের রোগ (পৃঃ ৩৭১) এমফিসিমা (পৃঃ ২০৭)

পুরোনো বা একঘেয়ে কাশি:	কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠা:
যক্ষ্মা (পৃঃ ২১৯) ধূমপায়ীর বা খনি শ্রমিকের কাশি (পৃঃ ১৭৮) পুরোনো ব্রঙ্কাইটিস (পৃঃ ২০৭)	যক্ষ্মা (পৃঃ ২১৯) নিউমোনিয়া (হলদে, সবুজ বা রক্তের ছিটে দেয়া কফ (পৃঃ ২০৮) সাংঘাতিক কৃমির সংক্রমণ (পৃঃ ১৯৩) ফুসফুসের ক্যানসার (পৃঃ ১৭৮) হার্টের রোগ ব্রঙ্কিয়েকটেসিস

শরীর, কাশি দিয়ে, শ্বাস ব্যবস্থাকে পরিষ্কার করে, আর কফ (শ্লেষ্মার সঙ্গে পুঁজ) আর গলার বা ফুসফুসের ভেতরের জীবাণু বার করে দেয়। কাজেই কাশির সঙ্গে কফ উঠলে **কাশি থামাবার ওষুধ খাবেন না, বরং কফটা আলগা করে বার করে ফেলার জন্যে কিছু করবেন।**

কাশির চিকিৎসা:

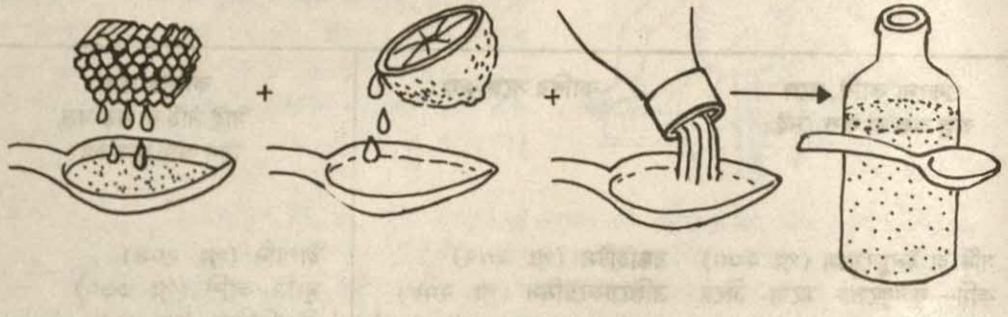


১· **শ্লেষ্মা আলগা করতে** আর যে কোনো ধরনের কাশিতে আরাম পেতে **প্রচুর জল খাবেন**। এতে যে কোনো ওষুধের থেকে বেশি কাজ হয়। (অবশ্য, পটাশিয়াম আয়োডাইডে কাজ হতে পারে পৃঃ ৪১৮।)

এছাড়া, **গরম ভাপে শ্বাস নেবেন**। একটা চেয়ারে বসে পায়ের কাছে এক বালতি খুব গরম জল রাখুন। মাথার ওপর একটা চাদর রেখে তা দিয়ে বালতিটা ঢেকে নিন যাতে ভাপটা যেমন উঠবে তেমন নিতে পারেন। ঐ ভাপে ১৫ মিনিট ধরে গভীর শ্বাস নিন। দিনে কয়েকবার করুন। অনেকে পুদিনা বা ইউক্যালিপটাসের পাতা, ভেপরাব বা টিংচার বেনজইন মেশানো পছন্দ করেন—কিন্তু শুধু গরম জলে সমান কাজ হয়।

২· **সব ধরনের কাশির জন্যে, বিশেষ করে শুকনো কাশিতে** নিচের কাশির সিরাপটি দেয়া যেতে পারে:

মেশান: *১ ভাগ মধু* *১ ভাগ পাতিলেবুর রস* *১ ভাগ জিন বা রাম*



ঘরোয়া চিকিৎসার জন্যে পৃঃ ১৩ দেখুন।

২ বা ৩ ঘন্টা অন্তর অন্তর ১ চা চামচ দেবেন। ছোট ছেলেপিলে আর যাদের শ্বাসকষ্ট আছে তাদের জন্যে, মদটা বাদ দেবেন।

৩· **সাংঘাতিক শুকনো কাশির জন্যে ঘুমের অসুবিধা হলে** কোডিন দেয়া সিরাপ (পৃঃ ৪১৮) খেতে পারেন। বেশি কফ থাকলে বা সাঁই সাঁই করলে কোডিন দেবেন না।

৪· **কাশির সঙ্গে সাঁই সাঁই করার** (কষ্ট আর শব্দ করে শ্বাস নেয়া) জন্যে হাঁপানি (পৃঃ ২০৪), পুরোনো ব্রঙ্কাইটিস (পৃঃ ২০৭) আর হার্টের রোগ (পৃঃ ৩৭১) দেখুন।

৫· **কোন রোগ থেকে কাশি হচ্ছে বার করার চেষ্টা করে তার চিকিৎসা করুন।** অনেকদিন ধরে কাশি চললে, সঙ্গে রক্ত, পুঁজ আর দুর্গন্ধযুক্ত কফ থাকলে অথবা রোগীর ওজন কমে যেতে থাকলে বা একঘেয়ে শ্বাসকষ্ট হলে, স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে যান।

৬· **যে কোনো রকম কাশি হলে ধূমপান করবেন না।** ধূমপান ফুসফুসের ক্ষতি করে।

কাশি এড়াতে হলে ধূমপান করবেন না।
কাশি সারাতে হলে, যে রোগ থেকে হচ্ছে তার চিকিৎসা করুন—ধূমপান করবেন না।
কাশি কমাতে আর কফ আলগা করতে হলে, প্রচুর জল খান—ধূমপান করবেন না।

কি ভাবে ফুসফুস থেকে শ্লেষ্মা বার করে দেয়া যায় (বিশেষভাবে শুইয়ে কফ বের করা):

খুব বুড়োমানুষ বা বেশি দুর্বল লোকের প্রচণ্ড কাশি হলে সে যদি বুকের চটচটে শ্লেষ্মা বা কফ বার করে দিতে না পারে, প্রচুর জল খেলে কাজ হবে। তাছাড়া, এইরকম করবেন:

● প্রথমে শ্লেষ্মা আলগা করতে রোগীকে গরম জলের ভাপে শ্বাস নিতে দিন।

● তারপর তাকে এমনভাবে উপুড় করে শুইয়ে দিন যাতে মাথা আর বুক খাটের কিনারার বাইরে ঝুলে থাকে। তার পিঠে হালকা ভাবে চাপড় দিন। এতে শ্লেষ্মা বেরিয়ে যাবার সাহায্য হবে।



ব্রঙ্কাইটিস

ব্রঙ্কাই বা যে সব নল দিয়ে ফুসফুসে বাতাস ঢোকে, তাদের সংক্রমণকে ব্রঙ্কাইটিস বলে। এতে শব্দ করে কাশি হয়, সঙ্গে প্রায়ই শ্লেষ্মা বা কফ থাকে। ব্রঙ্কাইটিস সাধারণতঃ ভাইরাস থেকে হয় বলে এনটিবায়োটিকে প্রায়ই কাজ হয় না। **ব্রঙ্কাইটিস এক সপ্তাহের বেশিদিন ধরে চললে,** ভালোর দিকে না গেলে, **নিউমোনিয়ার** লক্ষণ দেখা দিলে অথবা আগে থেকে **ফুসফুসের পুরোনো সমস্যা** থাকলে, **তবেই এনটিবায়োটিক ব্যবহার করবেন।**

পুরোনো ব্রঙ্কাইটিস ঃ

লক্ষণ:

● কাশির সঙ্গে শ্লেষ্মা, বছরে অন্ততঃ ৩ মাস ধরে থাকে আর প্রতি বছর ঘুরে ঘুরে হয়। কখনো কখনো কাশিটা বাড়ে, জ্বরও হতে পারে। এই ধরনের কাশি থাকলে, অথচ যক্ষ্মা বা হাঁপানির মত অন্য পুরোনো রোগ না থাকলে, রোগীর হয়তো পুরোনো ব্রঙ্কাইটিস আছে।

● যে সব বয়স্থ লোক আগে বেশি ধূমপান করত তাদের মধ্যে এ রোগ বেশি দেখা যায়।

● এর থেকে *এমফিসিমা* বলে ফুসফুসের একটা সাংঘাতিক আর দুরারোগ্য রোগ হয়ে যেতে পারে। এমফিসিমা হলে রোগীর শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হয়, বিশেষ করে পরিশ্রম করলে। রোগীর বুকটা 'পিপের মত' বড় হয়ে যায়।



পুরোনো হাঁপানি বা পুরোনো ব্রঙ্কাইটিস থেকে এমফিসিমা হতে পারে

চিকিৎসা:

● ধূমপান বন্ধ করুন।

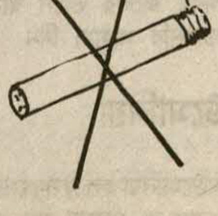
● এফিড্রিন বা থিওফাইলিন দেয়া কোনো হাঁপানির ওষুধ খান (পৃঃ ৪১৮—৪১৯)

● পুরোনো ব্রঙ্কাইটিসের রোগীর সর্দি বা ইনফ্লুয়েঞ্জার সঙ্গে জ্বর হলেই এমপিসিলিন বা টেট্রাসাইক্লিন খাওয়া উচিত।

● রোগীর যদি চটচটে কফ কাশির সঙ্গে বের করে ফেলতে অসুবিধে হয়, তাকে গরম জলের ভাপে শ্বাস নিতে দিন (পৃঃ ২০৫) আর তারপর বিশেষভাবে শুইয়ে কফ বের করতে সাহায্য করুন (পৃঃ ২০৬)।



পুরোনো কাশির রোগ
এড়াতে বা সারাতে কি চাও?
বিড়ি সিগারেট খাওয়া
একেবারে বাদ দিয়ে দাও।



ব্রঙ্কিয়েকটেসিস

যখন সংক্রমণ, অতিরিক্ত ধূমপান বা শ্বাসের সঙ্গে বেশি ধোঁয়া আর ধুলো নেয়া থেকে ফুসফুসের নরম জালিগুলোর ক্ষতি হয়ে যায়, তখন লোকের ব্রঙ্কিয়েকটেসিস হয়।

লক্ষণ:

- কাশির সঙ্গে প্রচুর সাদা কফ, বিশেষ করে সকালে। ব্রঙ্কিয়েকটিস হয়েছে কি না পরীক্ষা করার জন্যে রোগীকে একটা গেলাসের মধ্যে কফ ফেলতে বলুন। সেটা থিতোতে দিন। কিছুক্ষণ পর যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে কফটা ৩ টে স্তরে ভাগ হয়ে যাবে।
- যারা বেশি ধূমপান করে, তাছাড়া যারা খুব ভিড়ের জায়গায় বা কারখানা ইত্যাদির কাছে থাকে, তাদের এ রোগ হয়।
- সাধারণতঃ জ্বর থাকে না।
- এর থেকে **এমফিসিমা** হতে পারে।



চিকিৎসা:

- ধূমপান বন্ধ করুন
- বিশেষভাবে শুইয়ে কফ বের করুন (পৃঃ ২০৬) বিশেষ করে সকালে
- গরম জলের ভাপে শ্বাস নিন
- প্রোটিনে ভরা খাবার খান (পৃঃ ১২৮—১২৯)
- সম্ভব হলে থাকার জায়গা বদলাবার চেষ্টা করুন

ফুসফুসের ফোড়া (এবসেস)

ব্রঙ্কিওলের (ফুসফুসের মধ্যে ব্রঙ্কাসের সরু সরু শাখাপ্রশাখা—পৃঃ ২০৯-এর ছবি দেখুন) পথ আটকে গেলে এটা হয়। ব্রঙ্কিওলে সংক্রমণ হয়ে ফোড়া হয়। পুঁজটা ফুসফুসের মধ্যে চলে গিয়ে কফ হয়ে কাশির সঙ্গে বেরিয়ে আসে। এটা খুব বিপজ্জনক অবস্থা, কারণ সংক্রমণটা পুরো ফুসফুসে ছড়িয়ে যেতে পারে।

লক্ষণ:

- কাশির সঙ্গে ঘন হলদে, দুর্গন্ধযুক্ত কফ
- বেশি জ্বর—দিনে একবার করে ঘাম হয়ে কমে যায়
- দ্রুত নাড়ি
- রোগী খুব অসুস্থ

চিকিৎসা:

- বিশেষভাবে শুইয়ে কফ বের করা (পৃঃ ২০৬)
- পেনিসিলিনের ইনজেকশন (পৃঃ ৩৯৮)। পেনিসিলিন না পেলে এমপিসিলিন বা টেট্রাসাইক্লিন ব্যবহার করবেন (পৃঃ ৩৯৯, ৪০০)
- জ্বরের জন্যে এসপিরিন বা এসিটামিনোফেন খাবেন
- গরম জলের ভাপে শ্বাস নেবেন
- ডাক্তারি সাহায্য নিন

নিউমোনিয়া

নিউমোনিয়া হল ফুসফুসের একটা তীব্র সংক্রমণ, প্রায়ই হাম, ঘুংড়ি কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানির মত অন্য সব রোগ বা কোনো বড় রকম অসুখ থেকে এই রোগ হয়। ছেলেপিলেদের বেলায় এটা বিশেষ বিপজ্জনক।

লক্ষণ :

● দ্রুত, হালকা শ্বাস, কখনো কখনো সাঁই সাঁই করে। প্রতিবার শ্বাস নেবার সময় নাকের ফুটো বড় হয়ে যেতে পারে।

● কাশি (প্রায়ই সঙ্গে হলদে, সবজেটে বা অল্প রক্তের ছিটে দেয়া শ্লেষ্মা থাকে)।

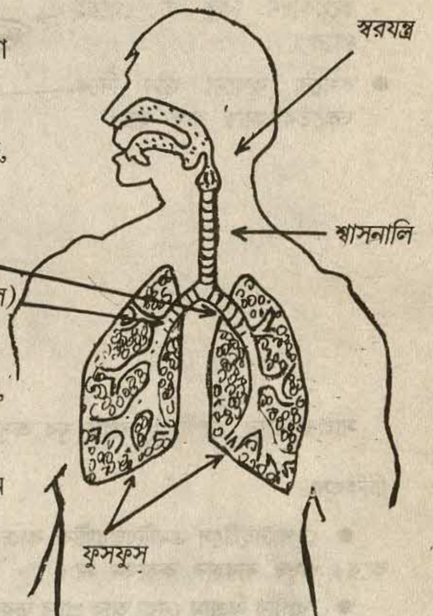
● কাশলে বা গভীর শ্বাস নিলে বুকে ব্যথা বাড়ে ; যে দিকে হয়েছে, সেই পাশ ফিরে শুলে ব্যথাটা কমে।

● বেশি জ্বর

● রোগীকে খুব অসুস্থ দেখায়

● খুব অসুস্থ শিশু যদি মিনিটে ৫০ বারের বেশি হালকা শ্বাস নেয়, তার হয়তো নিউমোনিয়া হয়েছে

(শ্বাস দ্রুত আর গভীর হলে, শরীরে জল কমে গেছে কি না দেখে নিন পৃঃ ১৮১)



চিকিৎসা :

● নিউমোনিয়াতে এনটিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা মরণবাঁচনের সমস্যার সমাধান করতে পারে। পেনিসিলিন (পৃঃ ৩৯৭) বা সালফোনামাইডের বড়ি (পৃঃ ৪০২) দিন। সাংঘাতিক অবস্থায়, প্রোকেন পেনিসিলিনের ইনজেকশন (পৃঃ ৩৯৯) দেবেন। ছোট ছেলেপিলেদের বয়স্কদের মাত্রার ১/৪ থেকে ১/২ ভাগ দেবেন।

● জ্বর আর ব্যথা কমাতে এসপিরিন বা এসেটামিনোফেন (পৃঃ ৪১৪) দেবেন।

● প্রচুর তরল খাবার দেবেন। রোগী খেতে না পারলে, তাকে তরল জিনিস বা চিনি নুনের সরবৎ (পৃঃ ১৮২) দেবেন।

● প্রচুর জল খেতে দিয়ে আর গরম জলের ভাপে শ্বাস নিতে দিয়ে রোগীর কাশি কমান আর শ্লেষ্মা আলগা করে দিন (পৃঃ ২০৫)। বিশেষভাবে শুইয়ে কফ বের করলে কাজে লাগতে পারে (পৃঃ ২০৬)।

● রোগী যদি সাঁই সাঁই করে শ্বাস নেয় থিওফাইলিন বা এফিড্রিন দেয়া হাঁপানির ওষুধও কাজে লাগতে পারে।

সংক্রামক হেপাটাইটিস

হেপাটাইটিস একরকম ভাইরাসের সংক্রমণ—যাতে যকৃতের ক্ষতি হয়। হেপাটাইটিসে সাধারণতঃ অল্প জ্বর হয়, বা একটুও হয় না। ছোট ছেলেপিলের বেলায় রোগটা সাধারণতঃ অল্পস্বল্প হয়—বড়দের বেলায় বেশি কঠিন হয়। এই রোগ প্রায়ই মহামারীর আকারে আসে।

লক্ষণ:



সাধারণভাবে, রোগী ২ সপ্তাহ খুব অসুস্থ থাকে আর তার পরের ১ থেকে ৩ মাস অবধি খুব দুর্বল থাকে।

চিকিৎসা:

- হেপাটাইটিসে এনটিবায়োটিক কাজ করে না। এমনকি, কোনো কোনো ওষুধ অসুস্থ যকৃতের আরো ক্ষতি করে। **ওষুধ ব্যবহার করবেন না।**
- রোগীর বিশ্রাম নেয়া আর প্রচুর তরল জিনিস খাওয়া উচিত। সে যদি বেশি কিছু খেতে না চায়, তাকে লেবুর রস, পেঁপে এবং অন্যান্য ফল, আখের রস, চটকানো বরবটি, ডাল, তরিতরকারি, মুরগি বা অন্য প্রোটিন খাবার (পৃঃ ১২৮) দিন। ভিটামিন খেলে সুবিধে হতে পারে।
- বমি কমাবার জন্যে পৃঃ ১৯২ দেখুন।
- রোগী যখন খেতে পারবে তাকে শক্তি যোগাবার খাবার আর প্রোটিন সুষমভাবে দিন। বরবটি, মাংস, মুরগি, সেদ্ধ ডিম—এগুলো ভালো।
- চর্বি আর তেলা খাবার বাদ দেবেন। পরে অন্ততঃ ৬ মাস **একটুও মদ খেতে দেবেন না।**

এড়ানো:

- হেপাটাইটিসের ভাইরাস দূষিত জল বা খাবার দিয়ে একজনের মল থেকে অন্যদের মুখে চলে যায় (পৃঃ ১৬০)। অন্যরা যাতে অসুস্থ হয়ে না পড়ে তার জন্যে রোগীর মল মূত্র পুঁতে বা পুড়িয়ে ফেলা আর রোগীকে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা বিশেষ জরুরি। যে রোগীর সেবা করছে, তার উচিত প্রত্যেকবার রোগীর কাছে যাবার পর নিজের হাত ভালো করে ধুয়ে ফেলা।
- ছোট ছেলেপিলেদের, অনেক সময়, কোনো লক্ষণ ছাড়াই হেপাটাইটিস হয়, কিন্তু তারা রোগটা অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারে। বাড়ির সকলেরই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিধিগুলো খুব যত্নের সঙ্গে মেনে চলা দরকার (পৃঃ ১৬৭ থেকে ১৭১ দেখুন)।

সাবধান: ছুঁচ জীবাণুমুক্ত না করে (ভালো করে না ফুটিয়ে) তা দিয়ে ইনজেকশন দিলে, তাই থেকেও হেপাটাইটিস ছড়াতে পারে। **প্রত্যেকবার ব্যবহারের আগে সর্বদা ছুঁচ আর সিরিঞ্জ ভালোভাবে ফুটিয়ে নেবেন।**

আরথ্রাইটিস (গাঁটে যন্ত্রণা আর প্রদাহ)

বয়স্থ লোকদের বেলায়, গাঁটের বেশির ভাগ পুরোনো ব্যথা পুরোপুরি সারানো যায় না। তবে নিচের ব্যবস্থাগুলো নিলে কিছু আরাম হয়:

● **বিশ্রাম**: সম্ভব হলে বেশি খাটুনি আর যে সব ভারি পরিশ্রমের কাজে যন্ত্রণাদায়ক গাঁটগুলোতে কষ্ট হয় সেগুলো, বাদ দেবেন। আরথ্রাইটিস থেকে যদি জ্বর হয়, তবে দিনের বেলা একটু করে ঘুমিয়ে নিলে উপকার হয়।

● যন্ত্রণাদায়ক গাঁটগুলোর ওপর **গরম সেঁক** (গরম জলে ভেজানো কাপড়) দেবেন (পৃঃ ২৩৫ থেকে ২৩৬ দেখুন)।

● **এসপিরিন** যন্ত্রণা কমাতে সাহায্য করে। অন্য সব ব্যথার থেকে আরথ্রাইটিসের ব্যথা কমানোর ওষুধের মাত্রাটা বেশি। দিনে ৪ থেকে ৬ বার ৩ টে করে বড়ি খাবেন। কান ভোঁ ভোঁ করতে শুরু করলে কম খাবেন। এসপিরিন থেকে যে সব পেটের গোলমাল হয় সেগুলো এড়াতে হলে ওষুধটা খাবার, দুধ, খাওয়ার সোডা বা প্রচুর জলের সঙ্গে খাবেন।

● গাঁটগুলোর নড়াচড়া ঠিক রাখতে বা বাড়াতে কয়েকটা সহজ **ব্যায়াম** করা দরকার।

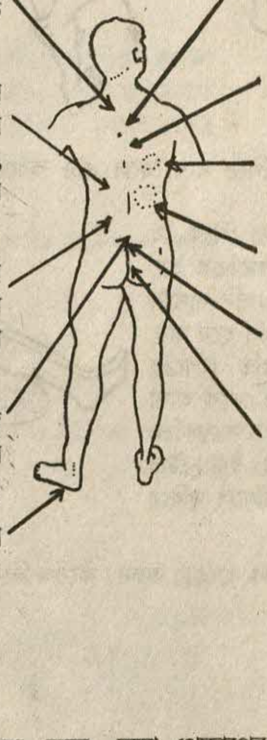


শুধু যদি একটা গাঁট ফুলে গরম হয়ে ওঠে, তবে হয়তো সেটাতে সংক্রমণ হয়েছে—বিশেষ করে যদি জ্বরও হয়ে থাকে। পেনিসিলিনের মত কোনো এনটিবায়োটিক ব্যবহার করবেন (পৃঃ ৩৯৭), আর সম্ভব হলে স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে যাবেন।

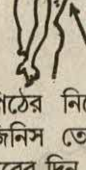
কমবয়সীদের বা ছেলেপিলেদের বেলায় গাঁটের যন্ত্রণা অন্য কোনো কঠিন রোগের—যেমন বাতের জ্বর (পৃঃ ৩৫৬) বা যক্ষ্মার (পৃঃ ২১৯) লক্ষণ হতে পারে।

পিঠে ব্যথা

পিঠে ব্যথার অনেক কারণ থাকে। এখানে কয়েকটা দেয়া হল:



পিঠের ওপরদিকে পুরোনো ব্যথার সঙ্গে কাশি হলে আর ওজন কমে যেতে থাকলে সেটা ফুসফুসের যক্ষ্মা (পৃঃ ২১৯) হতে পারে।



ছোটদের বেলায় পিঠের মাঝখানে ব্যথা হলে মেরুদণ্ডের যক্ষ্মা হতে পারে, বিশেষ করে যদি শিরদাঁড়ায় কোনো ঢিবি বা দলা থাকে।

পিঠের নিচের দিকের ব্যথা যদি ভারী জিনিস তোলা বা বেশি খাটাখাটি করার পরের দিন বেড়ে যায়, সেটা মচকে যাওয়া হতে পারে।

কিছু তুললে বা শরীরটা বেঁকালে যদি পিঠের নিচের দিকে সাংঘাতিক ব্যথা হয় তবে সেটা চাকতি সরে যাওয়া হতে পারে,

বিশেষ করে যদি একটা পা বা পায়ের পাতা যন্ত্রণাদায়ক বা অসাড় আর দুর্বল হয়ে যায়। কোনো স্নায়ু চিপটে গেলে এটা হতে পারে।



কাঁধ দুটো ঝুঁকিয়ে ভুলভাবে দাঁড়ানো বা বসা পিঠে ব্যথার একটা সাধারণ কারণ।

বয়স্কদের বেলায়, পিঠের পুরোনো ব্যথা হল সাধারণ আরথ্রাইটিস।

পিঠের ওপরদিকে ডানপাশে ব্যথা পিত্তকোষের সমস্যা (পৃঃ ৩৭৫) থেকে হতে পারে।

এইখানে তীব্র বা পুরোনো ব্যথা পেচ্ছাপের গণ্ডগোল হতে পারে (পৃঃ ২৭৮)।

কোনো কোনো মেয়ের, মাসিকের সময় বা পোয়াতি অবস্থায় স্বভাবতই পিঠের নিচের দিকে ব্যথা হয় (পৃঃ ২৯৪)।

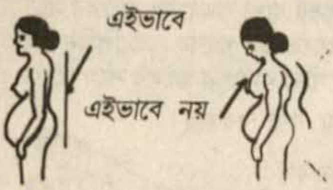
পিঠের নিচের দিকে ব্যথা কখনো কখনো জরায়ু, ডিম্বকোষ বা মলনালির সমস্যা থেকে হয়।

পিঠে ব্যথা সারানো আর এড়ানো:

● যদি পিঠে ব্যথার কোনো কারণ থাকে, যেমন—যক্ষ্মা, পেচ্ছাপের সংক্রমণ বা পিত্তকোষের রোগ—কারণটার চিকিৎসা করুন। কঠিন রোগ বলে সন্দেহ হলে ডাক্তারি সাহায্য নিন।

● সাধারণ পিঠে ব্যথা,—এর মধ্যে পোয়াতি অবস্থার ব্যথাও আছে—এইভাবে এড়ানো বা কমানো যায়:

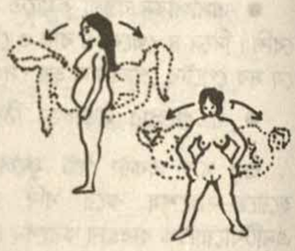
সব সময় সোজা দাঁড়িয়ে



এইভাবে কোনো শক্ত সমান বিছানায় বা মাটিতে শুয়ে



পিঠ বেঁকিয়ে ব্যায়াম করে



● এসপিরিন আর গরম ভিজে সেঁক (পৃঃ ২৩৫) বেশির ভাগ পিঠের ব্যথায় আরাম দিতে সাহায্য করে।

● ভারি জিনিস তুললে বা জোর দিলে পিঠের নিচের দিকে যে ব্যথা হয়, তাতে কখনো কখনো এইভাবে চট করে আরাম দেয়া যায়:

রোগীকে তার একটা পা হাঁটুর নিচে গুঁজে শুতে বলুন।





তারপর, তার অন্য কাঁধটা চেপে রেখে, তার হাঁটুটা এমনভাবে জোর করে ঠেলে দেবেন, যাতে তার পিঠ মুচড়ে যায়।

আগে একপাশে, তারপর অন্য পাশে এইরকম করুন।

সাবধান: পড়ে গিয়ে বা আঘাত পেয়ে পিঠে ব্যথা হলে এটা করতে চেষ্টা করবেন না।

● ভারি জিনিস তোলা বা মুচড়ে যাওয়া থেকে যে পিঠে ব্যথা হয়, সেটা যদি হঠাৎ আর সাংঘাতিক হয়, ঝুঁকতে গেলে যদি ছুরি বেঁধার মত লাগে, যদি ব্যথাটা পায়ে নেমে যায় বা একটা পা অসাড় বা দুর্বল হয়ে যায়, তবে রোগটা কঠিন। সরে যাওয়া চাকতি (পিঠের হাড়গুলোর মধ্যের পাৎলা গদি) দিয়ে পিঠের থেকে আসা কোনো স্নায়ু চিপটে গিয়ে থাকতে পারে। কয়েকদিন সোজা চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা সবথেকে ভালো। হাঁটু দুটোর আর পিঠের মাঝখানের নিচে শক্ত কিছু রাখলে সুবিধে হতে পারে।



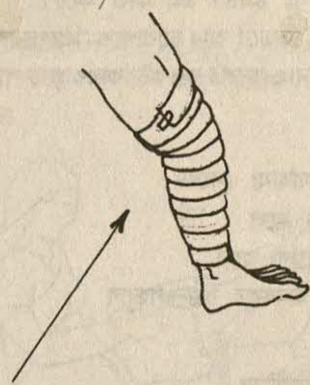
● এসপিরিন খান আর গরম ভিজে সেঁক ব্যবহার করুন। কয়েক দিনের মধ্যে ব্যথা কমে যেতে শুরু না করলে ডাক্তারি পরামর্শ নিন।

ভেরিকোজ শিরা

শিরা ফুলে, এঁকেবেঁকে গেলে তাকে ভেরিকোজ শিরা বলে ; এগুলো প্রায়ই যন্ত্রণাদায়ক হয়। বয়স্থ লোকদের আর পোয়াতি বা অনেক ছেলেপিলের মাদের পায়ে এগুলো প্রায়ই দেখা যায়।

চিকিৎসা:

ভেরিকোজ শিরার কোনো ওষুধ নেই। তবে নিচের ব্যবস্থাগুলো নিলে উপকার হয়:

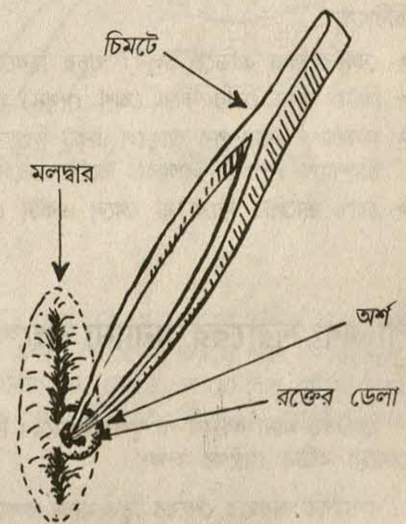


● বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে বা পা ঝুলিয়ে বসে থাকবেন না। যদি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে বা বসে থাকা ছাড়া অন্য উপায় না থাকে, আঁধঘণ্টা অন্তর কয়েক মিনিট ধরে পা উঁচু করে শুয়ে থাকার চেষ্টা করবেন। এছাড়া, শোবার সময় পা দুটো উঁচুতে (বালিশের ওপর) রাখবেন, অথবা খাটের পায়ের দিকটা ইট পেতে উঁচু করে দেবেন।

● শিরা চেপে ধরে রাখার জন্যে ইলাস্টিক বা ক্রেপ ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার করবেন। রাত্রে ওগুলো খুলে ফেলতে ভুলবেন না।

● এইভাবে শিরার যত্ন নিলে গুলফের পুরোনো ক্ষত বা ভেরিকোজ আলসার (পৃঃ ২৫৪) এড়ানোয় সাহায্য হবে।

অর্শ (হেমোরয়েড)



অর্শ হল মলদ্বার বা মলনালির ভেরিকোজ শিরা, এগুলো ছোট ছোট দলা বা গুলির মত মনে হয়। এগুলি যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে, কিন্তু বিপজ্জনক নয়। পোয়াতি অবস্থায় প্রায়ই দেখা দিয়ে পরে চলে যেতে পারে।

অর্শ থেকে রক্ত পড়তে শুরু হলে, রোগীর রক্তাল্পতার লক্ষণ হয় (পৃঃ ১৪৬)।

চিকিৎসা:

★ **সিট্জ্ স্নান**: যন্ত্রণা কমাতে হলে এক গামলা অল্প গরম জলে একটু পটাশিয়াম পারমাংগানেট দিন। এই জলে পাছাটা আধঘণ্টা ধরে ডুবিয়ে রাখুন। দিনে দুবার এইরকম করুন।



★ কোনো কোনো গাছের (ফণীমনসা ইত্যাদি) তেতো রস লাগালে অর্শ শুকিয়ে যাবার সাহায্য হয়। অর্শের সাপোজিটরিও (পৃঃ ৪২৪) এই কাজ করে।

★ মলদ্বারের ভেতরে আর চারিপাশে 'প্রিপেরেশন এইচ' লাগান। এটা ওষুধের দোকানে সহজেই পাওয়া যায়।

★ কোষ্ঠকাঠিন্যও অর্শের কতকটা কারণ হতে পারে। প্রচুর ফল, সাবু বা কাঁচকলার মত ছিবড়ে দেয়া খাবার খেলে কাজ হয়।

কখন ডাক্তারি সাহায্য নেবেন:

★ অর্শ খুব বড় হলে

★ সাংঘাতিক যন্ত্রণা হলে

★ অর্শ থেকে অনবরত রক্ত পড়লে

মলদ্বারের ফাটল

শক্ত মল বার করার সময় কখনো কখনো মলদ্বারটা ছিড়ে যেতে পারে। এর থেকে মলত্যাগ করার পর ২ থেকে ৩ ঘণ্টা পর্যন্ত ভীষণ যন্ত্রণা আর জ্বালা হয়। মলদ্বারের ছেঁড়া জায়গাটায় জল কেটে তা থেকে চুলকুনি হয়। ছেঁড়া জায়গায় সংক্রমণও হতে পারে।

চিকিৎসা:

★ কোষ্ঠকাঠিন্য এড়িয়ে চলুন। প্রচুর ছিবড়ে ভরা খাবার—যেমন তরিতরকারি—আর ফল খান।

★ সিট্‌জ্ স্নান তৈরি করে (অর্শ দেখুন) তার মধ্যে বসুন।

★ মলত্যাগ করার পর আঙুলে একটু লিগনোকেইন জেলি (সবুজ পৃষ্ঠা দেখুন) নিয়ে মলদ্বারের ভেতরে আর চারপাশে লাগান। লাগাবার আগে ভালো করে হাত ধোবেন।

★ রোগ ভালোর দিকে না গেলে একটা ছোট অপারেশন করলে সারতে সাহায্য হবে।

পা এবং শরীরের অন্যান্য অংশে ফোলা

ছোটবড় নানা কারণে পা ফুলতে পারে। কিন্তু যদি মুখ বা শরীরের অন্যান্য জায়গাও ফোলে, সাধারণতঃ সেটা কোনো কঠিন রোগের লক্ষণ।

পোয়াতি অবস্থার শেষের তিন মাসে কখনো কখনো মেয়েদের পা ফোলে। এটা সাধারণতঃ ভয়ের কিছু নয়। পায়ের থেকে যে শিরাগুলো আসে সেগুলোর ওপর শিশুর ওজনের চাপে রক্ত চলাচল কমে যায় বলে এটা হয়। তবে, যদি মেয়েটির হাত আর মুখও ফোলে, শরীর ঝিমঝিম করে, মাথা ধরে, দেখার অসুবিধে হয় বা যথেষ্ট পেচ্ছাপ না হয়, তবে সে হয়তো পোয়াতি অবস্থার বিষক্রিয়া বা *টকসিমিয়ায়* (পৃঃ ২৯৫) ভুগছে। তাড়াতাড়ি ডাক্তারি সাহায্য নিন।

যে সব বুড়োমানুষ অনেকক্ষণ এক জায়গায় বসে বা দাঁড়িয়ে কাটান, রক্ত চলাচল ভাল হয় না বলে তাঁদের পা দুটি প্রায়ই ফুলে যায়। তবে বয়স্থ লোকদের হার্টের গোলমাল বা কখনো গলায় স্ট্রেপটোকক্কাসের সংক্রমণের (পৃঃ ৩৫৭) ফলে মূত্রাশয়ের রোগ (পৃঃ ২৭৮) আর পেচ্ছাপের রাস্তায় সংক্রমণ থেকেও পা ফুলতে পারে।

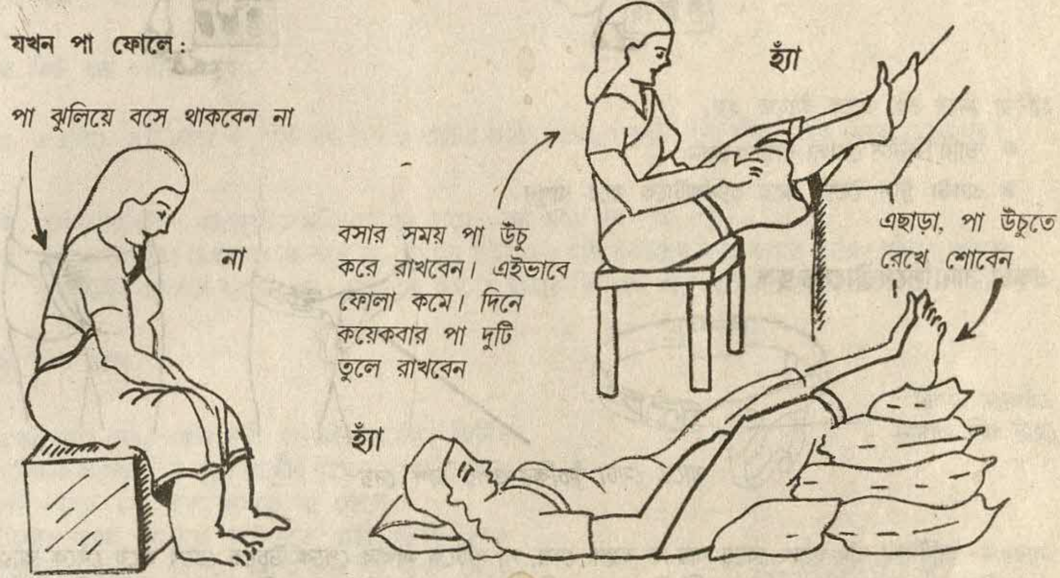
ছোট ছেলেপিলের পা রক্তাল্পতা (পৃঃ ১৪৭) বা অপুষ্টি (পৃঃ ১২৫) থেকে ফুলতে পারে। সাংঘাতিক অবস্থায় মুখ আর হাত দুটিও ফুলে যেতে পারে (কোয়াসিওরকর পৃঃ ১৩৩ দেখুন)।

পায়ের পাতায় কোনো ছোট কাটা বা ক্ষত সংক্রমিত হলে সেলুলাইটিস হয়ে পা ফুলতে পারে। জ্বর আর যন্ত্রণা হয়।

চিকিৎসা:

ফোলা কমাতে হলে, যে রোগ থেকে হয়েছে সেটার চিকিৎসা করুন। খাবারে নুন কম দেবেন বা একটুও দেবেন না। যে সব গাছগাছড়ার পাঁচনে প্রচুর পেচ্ছাপ হয়, সেগুলিতে সাধারণতঃ কাজ হয় (ঘরোয়া ওষুধ পরিচ্ছেদ ১ দেখুন)।

যখন পা ফোলে:



সেলুলাইটিস হলে পেনিসিলিন ইনজেকশন দরকার হয়। মাত্রার জন্যে পৃঃ ৩৯৮ দেখুন।

হার্নিয়া (ফাটা)

যে সব পেশী পেটকে ঢেকে রাখে সেগুলো কোথাও ফেটে বা ছিঁড়ে ফাঁক হয়ে গেলে তাকে হার্নিয়া বলে। এর মধ্যে দিয়ে নাড়িভুঁড়ির একটা ফাঁস ঠেলে বেরিয়ে এসে চামড়ার নিচে একটা দলা তৈরি করতে পারে। সাধারণতঃ কোনো ভারি জিনিস তুললে বা জোর দিলে (যেমন প্রসবের সময়) হার্নিয়া হয়। কোনো কোনো শিশু হার্নিয়া নিয়ে জন্মায় (পৃঃ ৩৬৪)। পুরুষদের বেলায় কুঁচকিতে বেশি হার্নিয়া দেখা যায়। ফোলা লিমফের গ্রন্থি থেকেও কুঁচকিতে দলা হতে পারে। তবে



হার্নিয়া এড়ানোর উপায়:

এই ভাবে ভারি জিনিস তুলুন

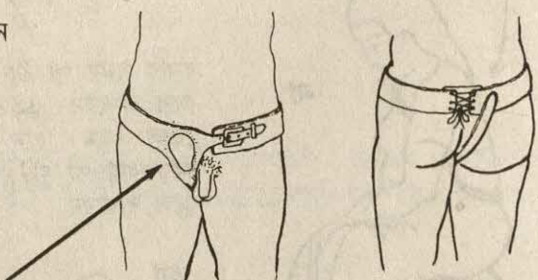


এইভাবে নয়



হার্নিয়া নিয়ে কি ভাবে বাঁচতে হয়:

- ভারি জিনিস তোলা এড়িয়ে চলুন
- একটা ট্রাস তৈরি করে হার্নিয়াটাকে ধরে রাখুন



একটা সাদাসিধে ট্রাসের ছক :

এইখানে একটা ছোট্ট গদি লাগান



যাতে সেটা কুঁচকির ওপর চাপ দেয়

সাবধান: হার্নিয়াটা যদি হঠাৎ বেড়ে যায় বা যন্ত্রণা দেয়, পা দুটিকে মাথার থেকে উঁচুতে রেখে শুয়ে থেকে আর ফোলাটার ওপরে আস্তে চাপ দিয়ে হার্নিয়াটা আবার ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন। যদি না ঢোকে, ডাক্তারি সাহায্য নেবেন।

হার্নিয়া যদি এত যন্ত্রণাদায়ক হয় যে বমি হয়, আর রোগী যদি মলত্যাগ করতে না পারে, সেটা খুব বিপজ্জনক হতে পারে। অপারেশনের দরকার হতে পারে, তাড়াতাড়ি ডাক্তারি সাহায্য নিন। ইতিমধ্যে, এপেনডিসাইটিসের মত চিকিৎসা করুন (পৃঃ ১০৭)।

ফিট (খিঁচুনি)

কেউ হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে অদ্ভুতভাবে হাত পা ছুঁড়লে (খিচুনি) আমরা বলি তার ফিট হয়েছে। মগজের কোনো সমস্যা থেকে ফিট হয়। ছোট ছেলেপিলেদের বেলায় সাধারণতঃ **বেশি জ্বর** আর **শরীরে সাংঘাতিক জলের অভাব** থেকে ফিট হয়। খুব অসুস্থ লোকদের বেলায় **মেনিনজাইটিস, মগজের ম্যালেরিয়া** বা **বিষক্রিয়া** থেকেও হতে পারে। যার ঘনঘন ফিট হয় তার হয়তো মৃগী রোগ আছে।

- ফিটের কারণ জানার চেষ্টা করে সম্ভব হলে সেটার চিকিৎসা করুন।
- ছেলেপিলেদের বেশি জ্বর হলে, তখনি ঠাণ্ডা জল দিয়ে তা কমাবার চেষ্টা করুন (পৃঃ ৮৮)।
- ছেলেপিলেদের শরীরে জলের অভাব হলে **ধীরে ধীরে** চিনি নুনের সরবৎ দিয়ে ডুস দেবেন। ডাক্তারি সাহায্য চেয়ে পাঠান। ফিটের সময় বা রোগী অজ্ঞান হয়ে থাকলে তার মুখে কিছু দেবেন না।
- মেনিনজাইটিসের লক্ষণ (পৃঃ ২২৫) থাকলে তখনি চিকিৎসা শুরু করে দিয়ে ডাক্তারি সাহায্য নিন।

মৃগী

এমনিতে দেখে সুস্থ মনে হলেও অনেকের মৃগী থেকে ফিট হয়। অনেক ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ বা মাসের তফাতে ফিট হতে পারে।

কেউ কেউ এতে অজ্ঞান হয়ে গিয়ে ভয়ানক হাত পা ছোঁড়ে। চোখ দুটি প্রায়ই উল্টে যায়। অল্পস্বল্প মৃগীতে রোগী মুহূর্তের জন্যে জ্ঞান হারাতে, অদ্ভুতভাবে হাত পা ছুঁড়তে বা অস্বাভাবিক ব্যবহার করতে পারে। জন্মের সময় মগজের কোনো ক্ষতি, শিশু অবস্থায় বেশি জ্বর বা মগজে ফিতেকৃমির সিস্ট (পৃঃ ১৯৬) থেকেও মৃগী হয়।

মৃগী কোনো সংক্রমণ নয়—ছোঁয়াচ লাগে না। এটা প্রায়ই সারা জীবনের সমস্যা হয়ে থাকে। তবে শিশুরা কখনো কখনো সেরে ওঠে।

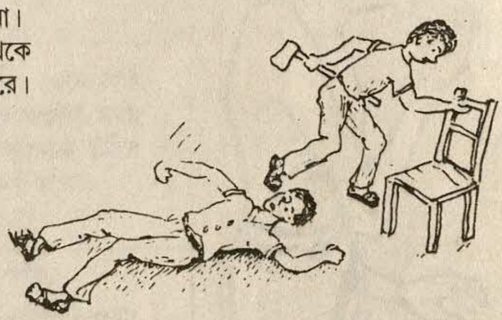
মৃগীর ফিট বন্ধ করার ওষুধ:

দ্রষ্টব্য: এগুলিতে মৃগী সারে না; ফিট বন্ধ করতে সাহায্য করে। প্রায়ই ওষুধটা সারা জীবন ধরে খেয়ে যেতে হয়।

- ফেনোবারবিটাল সাধারণতঃ মৃগী কমিয়ে রাখে; এর দাম খুব কম (পৃঃ ৪২২)।
- ফেনোবারবিটাল যেখানে কাজ করে না, সেখানে ডাইফেনিলহাইডেনটয়েন কাজ করতে পারে। কখনো কখনো দুটো ওষুধ একসঙ্গে দরকার হয়। সবথেকে কম যে মাত্রায় ফিট বন্ধ করে তাই ব্যবহার করুন (পৃঃ ৪২২)।

কারো ফিট হলে:

★ একটুকরো কাঠ, একটা চাবি বা ওইরকম কিছু জিনিস পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুড়ে রোগীর দাঁতের দু পাটির মাঝে দিন, যাতে সে জিভ কামড়ে না ফেলে।
★ ফিটের সময় রোগীকে আটকাতে চেষ্টা করবেন না।
★ রোগীকে আগুন, ধারালো পাথর ইত্যাদির বিপদ থেকে রক্ষা করুন, যাতে সে নিজের ক্ষতি করতে না পারে।



★ রোগীর চারপাশ থেকে লোকজন সরিয়ে দিন, যাতে সে শ্বাসের জন্যে যথেষ্ট খোলা বাতাস পায়।
★ রোগী যদি বমি করে বা থুতু ফেলে, তার মাথা একপাশে ঘুরিয়ে দিন যাতে তার গলায় আটকে না যায়। দরকার হলে তার মুখ থেকে বমি পরিষ্কার করে দেবেন।
★ ফিট থেমে গেলে রোগীকে প্রচুর চিনি মিশিয়ে চা দেবেন।
★ ফিটের পরে রোগীর ম্যাজমেজে বা ঘুমঘুম লাগতে পারে। স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করার আগে তাকে ঘুমোতে বা বিশ্রাম নিতে দিন।
★ ফিটটা অনেকক্ষণ ধরে চললে, ডায়াজিপাম (ভেলিয়াম) বা ফেনোবারবিটাল বা প্যারালডিহাইডের ইনজেকশন দিন (মাত্রার জন্যে পৃঃ ৪২৩ দেখুন)। ১৫ মিনিট পরেও ফিট না গেলে আবার এক মাত্রা দিন।

পরিচ্ছেদ

১৪ যে সব কঠিন রোগ হলে বিশেষভাবে ডাক্তার দেখাতে হয়

এই পরিচ্ছেদে যে সব রোগের কথা বলা হয়েছে ডাক্তারি সাহায্য ছাড়া সেগুলো সারানো শক্ত বা অসম্ভব। অনেকগুলির জন্যে যে সমস্ত বিশেষ ওষুধ লাগে তা গ্রামাঞ্চলে পাওয়া কঠিন। ঘরোয়া ওষুধে এসব রোগ সারে না। যদি কারো এই সব রোগের কোনোটা হয়, তবে **যত তাড়াতাড়ি সে ডাক্তারি সাহায্য পাবে, তার সেরে ওঠার সম্ভাবনা তত বেশি থাকবে।**

সাবধান: অন্য পরিচ্ছেদগুলিতে যে সব রোগের কথা বলা হয়েছে সেগুলিও কঠিন হতে পারে—ডাক্তারি সাহায্যও লাগতে পারে। **বিপজ্জনক রোগের লক্ষণ** পৃঃ ৫২ দেখুন।

যক্ষ্মা (টি বি, ক্ষয়রোগ)



ফুসফুসের যক্ষ্মা একটা পুরোনো (অনেকদিন থাকে), ছোঁয়াচে (সহজে ছড়ায়) রোগ, যে কোনো লোকের এটা হতে পারে। তবে বেশির ভাগ সময়, যারা দুর্বল, অপুষ্ট বা যক্ষ্মারোগীর সঙ্গে যারা থাকে, তাদেরই এটা হয়

যক্ষ্মা সারে। অথচ, প্রতিবছর, অকারণে, এই রোগ থেকে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যায়। এড়ানো আর সারানো, দুটোর জন্যেই **সময় থাকতে যক্ষ্মার চিকিৎসা করা দরকার**। কাজেই, আপনার উচিত **যক্ষ্মার লক্ষণগুলো জেনে সেগুলো সম্বন্ধে খেয়াল রাখা।**

যক্ষ্মার যে সব লক্ষণ সবথেকে বেশি দেখা যায়:

- সমানে ওজন কমে যাওয়া আর দুর্বলতা বেড়ে যাওয়া
- পুরোনো কাশি, বিশেষ করে ঘুম থেকে ওঠার ঠিক পরে
- বিকেলে অল্প জ্বর, রাত্রে ঘাম
- বুকে বা পিঠের ওপর দিকে ব্যথা থাকতে পারে

রোগ কঠিন হলে বা বেড়ে গেলে:

- কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠা (সাধারণতঃ অল্প, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনেকটা)
- ফ্যাকাসে, মোমের মত চামড়া
- গলার স্বর ভেঙে যায় (রোগ খুব কঠিন হলে)

ছোটদের বেলায় যক্ষ্মার লক্ষণ:

যক্ষ্মা হলে, ছোটদের সাধারণতঃ কাশি বা বিকেলের দিকে অল্প জ্বর হয় না। ছোটদের বেলায় সবথেকে প্রধান লক্ষণ হল—**ভালো খাওয়াদাওয়া করলেও ওজন কমে যাওয়া।**

তাদের শ্বাসকষ্টও হতে পারে। **ভালো খাওয়াদাওয়া সত্ত্বেও কোনো শিশুর যদি পর পর দু মাস ওজন না বাড়ে, নিশ্চয় যক্ষ্মা বলে সন্দেহ করবেন।** ছোট শিশুর বেলায় যক্ষ্মা খুব বিপজ্জনক, এর থেকে শিশু তাড়াতাড়ি মারা যেতে পারে।

যক্ষ্মা সাধারণতঃ শুধু ফুসফুসে হয়। কিন্তু এ রোগ শরীরের যে কোনো অংশে হতে পারে। ছোট ছেলেপিলের বেলায় এর থেকে মেনিনজাইটিস (পৃঃ ২২৫) হতে পারে। যক্ষ্মা থেকে চামড়ার রোগের জন্যে পৃঃ ২৫৩ দেখুন।

যদি আপনার যক্ষ্মা হয়েছে বলে মনে হয়:

ডাক্তারি সাহায্য নিন। যক্ষ্মার প্রথম লক্ষণ দেখা দিলেই এমন কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান, যেখানে কর্মীরা আপনার যক্ষ্মা হয়েছে কিনা দেখার জন্যে চামড়ার পরীক্ষা, এক্স রে, কাশির সঙ্গে যা ওঠে (কফ বা থুতু) তা পরীক্ষা করতে পারেন। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে আপনি বিনা পয়সায় যক্ষ্মার ওষুধ পাবেন। আপনাকে হয়তো নিচের ওষুধগুলির মধ্যে ২ বা ৩টি দেয়া হবে:

- স্ট্রেপটোমাইসিনের ইনজেকশন (পৃঃ ৪০৩)
- আইসোনিয়াজিড (আই এন এইচ)-এর বড়ি (পৃঃ ৪০৪)
- পি এ এস (এমাইনো স্যালিসাইলিক এসিড) বড়ি (পৃঃ ৪০৪)
- থিয়াসিটাজোন (পৃঃ ৪০৪)

ওষুধগুলো নির্দেশমত ব্যবহার করা খুবই জরুরি। সেগুলির মধ্যে অন্ততঃ ২টি একসঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। (এইসব ওষধু ব্যবহারে ঝুঁকি বা সাবধানতার বিষয়ে পৃঃ ৪০২ থেকে পৃঃ ৪০৪ দেখুন)।

যক্ষ্মার জীবাণু সহজে মরে না। অনেকদিন ধরে একটানা চিকিৎসা করলে তবে মরে।

যতদিন না স্বাস্থ্যকর্মী বলে যে আপনি ভালো হয়ে গেছেন ওষুধগুলো ব্যবহার করে যান। অনেকটা সুস্থ লাগছে বলেই ওষুধ ব্যবহার বন্ধ করবেন না। **যক্ষ্মা পুরোপুরি সারাতে সাধারণতঃ ১ থেকে ২ বছর লাগে।**

শক্তি যোগাবার খাবার ছাড়াও প্রোটিন আর ভিটামিনে ভরা খাবার যতটা সম্ভব ভালো করে প্রচুর পরিমাণে খাবেন (পৃঃ ১২৮ থেকে ১৩০)। বিশ্রাম নেয়া জরুরি। যতদিন না সুস্থ হতে শুরু করছেন, সম্ভব হলে ভারি আর ক্লান্তিকর কাজ বাদ দিয়ে একুট আরামে থাকবেন। তারপর থেকে চেষ্টা করবেন যেন এতটা বেশি পরিশ্রম না হয় যাতে ক্লান্ত হয়ে বা হাঁপিয়ে পড়েন। যথেষ্ট বিশ্রাম আর ঘুম যাতে হয় সেই চেষ্টা করবেন।



শিরদাঁড়ায় যক্ষ্মা

শরীরের অন্য যে কোনো অংশের যক্ষ্মার জন্যে ফুসফুসের যক্ষ্মার মতই চিকিৎসা করা হয়। ছোটদের শিরদাঁড়ায় কঠিন যক্ষ্মা হলে, পক্ষাঘাত এড়াবার জন্যে অপারেশনের দরকার হতে পারে।

যক্ষ্মা খুব ছোঁয়াচে। যক্ষ্মার রোগীর সঙ্গে যারা এক বাড়িতে থাকে, তাদের—বিশেষ করে ছেলেপিলেদের—এই রোগে ধরবার ঝুঁকি খুব বেশি থাকে।

বাড়িতে কারো যক্ষ্মা হলে: (পৃঃ ১৬৩—১৬৫)

- সম্ভব হলে, যাতে বাড়ির সব লোককে পরীক্ষা করে দেখা হয় যক্ষ্মা আছে কি না, তা করুন।
- ছেলেপিলেদের যক্ষ্মার টিকে দিন।
- সকলের, বিশেষ করে ছোটদের, পুষ্টিকর খাবার (পৃঃ ১২৮) খাওয়া উচিত।
- যার যক্ষ্মা হয়েছে, কাশি হলে তার মুখ ঢাকার বিষয়ে যত্ন নেয়া উচিত। তার কখনো মাটিতে থুতু ফেলা উচিত নয়। তার উচিত একটা ঢাকা দেয়া পাত্রে থুতু ফেলে কফটা রাত্রে পুড়িয়ে ফেলা।
- যদি কোনো ছেলেপিলের যক্ষ্মা হয়েছে বলে সন্দেহ হয়, বা তার যদি ২ সপ্তাহের বেশি সময় ধরে কাশি হয়, বা হঠাৎ তার ওজন কমে যেতে শুরু হয় বা শ্বাসকষ্ট হয়, তাকে তখনি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান।
- যক্ষ্মার চিকিৎসা সঙ্গে সঙ্গে করান। যার যক্ষ্মা সেরে গেছে তার থেকে আর রোগ ছড়ায় না।
- যক্ষ্মারোগী যদি নিয়মিত চিকিৎসা করায়, তাহলে তার আর বাড়ির লোকের থেকে আলাদা খাওয়া বা শোয়ার দরকার নেই।

রোগ এড়ানোর চাবিকাঠি হল তাড়াতাড়ি আর পুরোপুরি চিকিৎসা

জলাতঙ্ক (রেবিস)



পাগলা জানোয়ার—সাধারণতঃ পাগলা কুকুর, বেড়াল, খেঁকশেয়াল, নেকড়ে বা শেয়ালের কামড় থেকে জলাতঙ্ক ছড়াতে পারে।

জলাতঙ্কের লক্ষণ:

জানোয়ারের মধ্যে:

- অদ্ভুত ব্যবহার করে—কখনো কখনো মনমরা, ছটফটে বা খিটখিটে হয়ে থাকে।
- মুখে ফেনা ওঠে, খাবার বা জল খেতে পারে না।
- কখনো কখনো জানোয়ারটা খেপে (পাগলা হয়ে) গিয়ে যাকে বা যা কিছু কাছে পায়, কামড়ায়। জানোয়ারটার ঘুমঘুম ভাবও হতে পারে।
- ১০ দিনের মধ্যে জানোয়ারটা মারা যায়।

মানুষের মধ্যে লক্ষণ:

- কামড়ের জায়গায় ব্যথা আর চিনচিন করা।
- ঢোক গিলতে ব্যথা আর অসুবিধে। প্রচুর ঘন চটচটে লালা।
- শান্ত থাকতে থাকতে মাঝে মাঝে হঠাৎ রেগে যাওয়া।
- মৃত্যু এগিয়ে এলে ফিট (খিচুনি) আর পক্ষাঘাত।

যে জানোয়ার কাউকে কামড়েছে সেটা পাগলা বলে সন্দেহ হলে:

★ জানোয়ারটাকে ১০ দিন বেঁধে বা খাঁচায় ভরে রাখুন।

★ পাগলা হলে ১০ দিনের মধ্যেই তার জলাতঙ্কের লক্ষণ দেখা দেবে বা সে মরে যাবে।

★ কামড়ের জায়গাটা ভালো করে সাবান, জল আর হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড দিয়ে পরিষ্কার করে নিন। **এটা করতেই হবে।** ক্ষতটা ঢাকা দেবেন না—খুলে রাখুন।

★ কামড়টা পরিষ্কার করে তার ওপর ঘন কার্বলিক এসিড বুলিয়ে দিন। এক মিনিট পর স্পিরিট লাগিয়ে দিন। কার্বলিক এসিড আর স্পিরিট না পাওয়া গেলে টিংচার আয়োডিন দেয়া যেতে পারে।

★ লোকটির ধনুষ্টঙ্কারের টিকে না নেয়া থাকলে, টিটেনাস এনটিটকসিন ইনজেকশন দেয়া উচিত।

★ কামড়টা যাতে বিষিয়ে না যায়, তার জন্যে পেনিসিলিনের মত কোনো এনটিবায়োটিক দেয়া উচিত।

★ জানোয়ারটা যদি ১০ দিনের মধ্যে মরে যায় (অথবা তাকে যদি মেরে ফেলা হয়ে থাকে, বা ধরা না যায়) তবে যাকে কামড়েছে, তাকে এমন কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান, যেখানে তাকে এনটিরেবিস ইনজেকশনগুলো পর পর দেয়া যাবে।

কামড়াবার পর ১০ দিন থেকে ২ বছরের মধ্যে (সাধারণতঃ ৩ থেকে ৭ সপ্তাহের মধ্যে) জলাতঙ্কের প্রথম লক্ষণগুলি দেখা দেয়। রোগের প্রথম লক্ষণ দেখা দেবার আগেই চিকিৎসা শুরু করতে হবে। রোগ একবার শুরু হয়ে গেলে রোগীর জীবন রক্ষা করার মত চিকিৎসা ডাক্তারি শাস্ত্রের জানা নেই।

এড়ানো:

★ কোনো জানোয়ারকে পাগলা বলে সন্দেহ হলে তাকে মেরে পুঁতে ফেলুন (অথবা ১০ দিন খাঁচায় ভরে রাখুন)।

★ সম্ভব হলে, সমস্ত রাস্তার কুকুর মেরে ফেলুন।

★ পোষা কুকুরদের টিকে দেবার কাজে সাহায্য করুন।

★ যে কোনো জানোয়ারকে অসুস্থ বলে মনে হলে বা সে অস্বাভাবিক ব্যবহার করলে, ছেলেপিলেদের তার থেকে দূরে রাখুন।

কোনো জানোয়ারকে অসুস্থ বলে মনে হলে বা সে অস্বাভাবিক ব্যবহার করলে,
খুব সাবধানে তাকে নাড়াচাড়া করবেন।
কাউকে না কামড়ালেও, তার লালা যদি কারো পায়ের কাটাছেঁড়া জায়গায় ঢুকে যায়,
তা থেকে জলাতঙ্ক হতে পারে।

ধনুষ্টঙ্কার (চোয়াল আটকে যাওয়া)

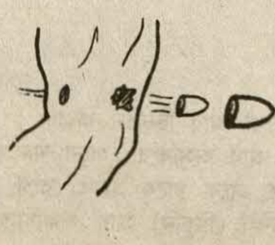
জন্তুজানোয়ার বা মানুষের মলে যে সব জীবাণু থাকে, সেগুলো কোনো ক্ষতের মধ্যে দিয়ে মানুষের শরীরে ঢুকে গেলে ধনুষ্টঙ্কার হয়। গভীর বা নোংরা ক্ষত বিশেষভাবে বিপজ্জনক।

যে সব ক্ষত থেকে ধনুষ্টঙ্কার হবার সম্ভাবনা খুব বেশি:

জানোয়ারের কামড় বিশেষ করে কুকুরের আর শুয়োরের



বন্দুকের গুলি আর ছুরির থেকে ক্ষত



কাঁটা, চোঁচ, পেরেক বা কাচের টুকরো ফুটে যাওয়ার ক্ষত



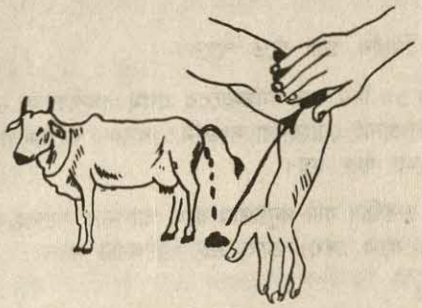
কাঁটা তার থেকে আঘাত



নোংরা ছুঁচ দিয়ে করা ফুটো



টিকে বা ক্ষতের ওপর গোবর লাগানো



কচি বাচ্চার ধনুষ্টঙ্কারের কারণ:

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবে বা অন্য সাধারণ সাবধানতা না নেয়ার দরুন ধনুষ্টঙ্কারের জীবাণু কচি বাচ্চার *নাড়ির* মধ্যে দিয়ে ঢোকে।

- যে যন্ত্রপাতি ফুটিয়ে পুরোপুরি জীবাণুমুক্ত করে রাখা হয়নি, তা দিয়ে যখন নাড়ি কাটা হয় বা
- যখন সদ্য কাটা নাড়ি শক্ত করে বেঁধে রাখা হয় বা শুকনো রাখা হয় না।
- যখন নাড়ির ওপর ছাই বা গোবর লেপে দেয়া হয়।

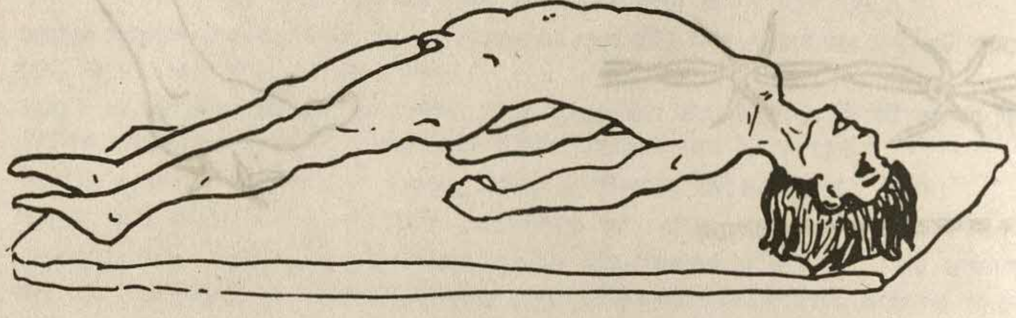
কোনো কাটারি বা ছুরি পুরোপুরি জীবাণুমুক্ত না করে তা দিয়ে নাড়ি কাটলে ধনুষ্টঙ্কারের ভয় বেড়ে যায়।



ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ:

- ক্ষতে সংক্রমণ (কখনো কখনো ক্ষত খুঁজে পাওয়া যায় না)।
- ঢোক গিলতে অসুবিধা আর কষ্ট।
- চোয়াল আড়ষ্ট হয়ে যায় (আটকানো চোয়াল)। পরে ঘাড়ের আর শরীরের অন্যান্য জায়গার পেশীও আড়ষ্ট হয়ে যায়।

● চোয়াল—আর শেষে সমস্ত শরীরে যন্ত্রণাদায়ক খিচুনি (হঠাৎ শক্ত হয়ে যাওয়া)। রোগীকে নড়ালে বা ছুঁলে হঠাৎ এইরকম শুরু হয়ে যেতে পারে।



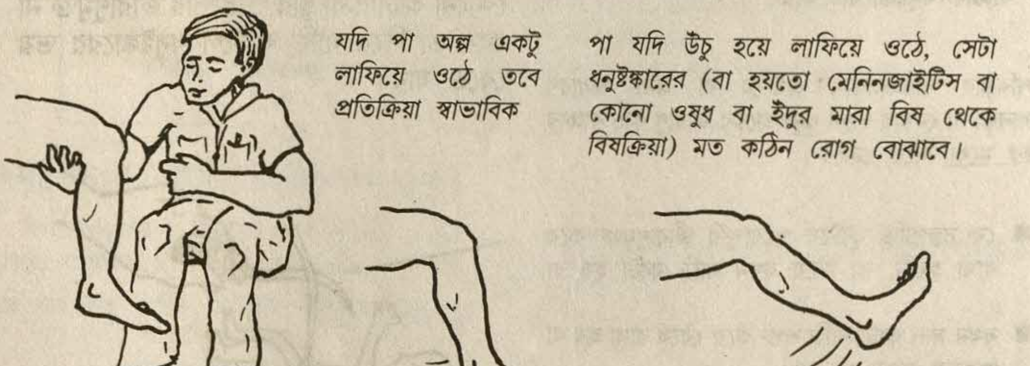
হঠাৎ শব্দ বা জোর আলো থেকেও এইরকম খিচুনি শুরু হতে পারে।

কচি বাচ্চাদের বেলায়, সাধারণতঃ জন্মের ৩ থেকে ১০ দিন পরে ধনুষ্টঙ্কারের প্রথম লক্ষণগুলো দেখা দেয়। শিশু একটানা কাঁদে, দুধ টানতে পারে না। নাড়ির চারপাশটা প্রায়ই নোংরা বা সংক্রমিত থাকে। কয়েক ঘণ্টা বা দিন পরে চোয়াল আটকানো এবং ধনুষ্টঙ্কারের অন্য লক্ষণগুলো শুরু হয়।

প্রথম লক্ষণে ধনুষ্টঙ্কারের চিকিৎসা শুরু করা খুব জরুরি। যদি ধনুষ্টঙ্কার বলে আপনার সন্দেহ হয় (অথবা যদি কোনো কচি বাচ্চা একটানা কাঁদে বা দুধটানা বন্ধ করে দেয়) তবে এই পরীক্ষাটা করুন:

হাঁটুর প্রতিবর্তী কাজের পরীক্ষা

পা ঝুলিয়ে রেখে মালাইচাকির ঠিক নিচে আপনার আঙুলের গাঁট দিয়ে টোকা দিন।



কচি বাচ্চার ধনুষ্টঙ্কার বলে সন্দেহ হলে এই পরীক্ষাটা বিশেষ কাজ দেয়।

ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ থাকলে কি করতে হয়:

ধনুষ্টঙ্কার একটি মারাত্মক রোগ। **সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারি সাহায্য নেবেন।** সাহায্য আসতে দেরি হলে নিচের কাজগুলি করুন:

● সারা শরীর পরীক্ষা করে সংক্রমিত ক্ষত বা ঘা খুঁজে দেখুন। ক্ষতে প্রায়ই পুঁজ থাকে। ক্ষতটা খুলে সাবান আর ফোটানো জল দিয়ে ধুয়ে দিন।

সমস্ত ময়লা, পুঁজ, কাঁটা, চোঁচ ইত্যাদি পরিষ্কার করে দেবেন। হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড থাকলে ক্ষতে ঢেলে দিন।

● সঙ্গে সঙ্গে প্রোকেন পেনিসিলিনের ১০ লাখ ইউনিট ইনজেকশন দিয়ে দিন (কচি বাচ্চাদের পক্ষে কৃস্টালিন পেনিসিলিন আরো ভালো)। পেনিসিলিন না থাকলে টেট্রাসাইক্লিনের মত অন্য একটা এনটিবায়োটিক ব্যবহার করুন।

● যোগাড় করতে পারলে ৪০,০০০ থেকে ৫০,০০০ ইউনিট **টিটেনাস এনটিটকসিন** বা ৬,০০০ ইউনিট **হিউম্যান ইমিউন গ্লোবিউলিন** ইনজেকশন করে দিন। সবরকম সাবধানতা (পৃঃ ৮৩) নিতে ভুলবেন না। হিউম্যান ইমিউন গ্লোবিউলিনে সাংঘাতিক এলার্জির প্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি অনেক কম থাকে, কিন্তু এটা খুব দামি, পাওয়াও বেশি শক্ত।

● রোগী যতক্ষণ গিলতে পারে, তাকে ছোট ছোট চুমুকে ঘনঘন পুষ্টিকর তরল খাবার দেবেন।

● খিচুনি কমাতে, ফেনোবারবিটালের (মাত্রার জন্যে পৃঃ ৪২২ দেখুন) বা ডায়াজিপামের (*ভেলিয়াম* পৃঃ ৪২৩) ইনজেকশন দিন।

● রোগীকে যতটা সম্ভব কম ছোঁবেন বা নড়াবেন। শব্দ আর জোর আলো এড়িয়ে চলবেন।

● দরকার হলে একটা সিরিঞ্জের সঙ্গে একটা *ক্যাথিটার* (রবারের নল) জুড়ে রোগীর নাক আর গলা থেকে শ্লেষ্মা টেনে বার করে দেবেন। এতে শ্বাসের রাস্তা পরিষ্কার রাখার সাহায্য হয়।

ধনুষ্টঙ্কার কি করে এড়াতে হয়:

সবথেকে ভালো হাসপাতালেও ধনুষ্টঙ্কারের রোগীদের মধ্যে অর্ধেক মারা যায়। ধনুষ্টঙ্কার সারানোর থেকে এড়ানো অনেক সহজ।

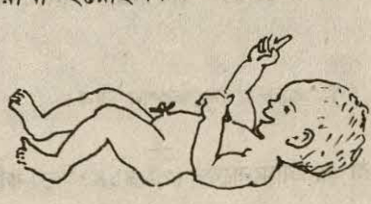
● **টিকে**: এটা ধনুষ্টঙ্কার থেকে রক্ষা পাবার সবথেকে নিশ্চিত উপায়। ছেলেপিলে আর বড় সকলেরই টিকে নেয়া উচিত। সবথেকে কাছের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আপনাদের বাড়ির সকলকে টিকে দেয়ান (পৃঃ ১৭৫)। **পোয়াতি মেয়েদের ধনুষ্টঙ্কারের টিকে দিলে কচি বাচ্চাদের ধনুষ্টঙ্কার রোগ এড়ানো যায়** (পৃঃ ২৯৬)।

● ক্ষত—বিশেষ করে নোংরা বা গভীর হলে, ১০২ পৃষ্ঠায় যেমন বলা হয়েছে সেইভাবে পরিষ্কার করে তার যত্ন নিন।

● ক্ষত খুব বড়, গভীর বা নোংরা হলে ডাক্তারি সাহায্য নিন। ধনুষ্টঙ্কারের টিকে নেয়া না থাকলে, পেনিসিলিন ব্যবহার করুন। টিটেনাস এনটিটকসিনের ইনজেকশন নেবার কথাও ভেবে দেখবেন।

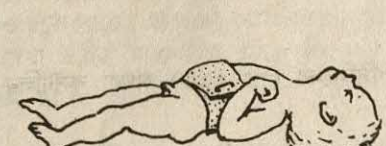
● কচি বাচ্চাদের বেলায়, ধনুষ্টঙ্কার এড়াতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা খুব জরুরি। নাড়ি কাটবার যন্ত্রটা জীবাণুমুক্ত করা উচিত (পৃঃ ৩০৮); নাড়িটা ছোট করে কেটে জায়গাটা পরিষ্কার আর শুকনো রাখা উচিত।

এই শিশুটির নাড়ি শুকনো করে বাতাসে খুলে রাখা হয়েছিল।



সে সুস্থ ছিল

এই শিশুটির নাড়ি গোবর লেপে শক্ত করে বাঁধা ছিল, শুকনো রাখা হয়নি।



সে ধনুষ্টঙ্কারে মারা যায়

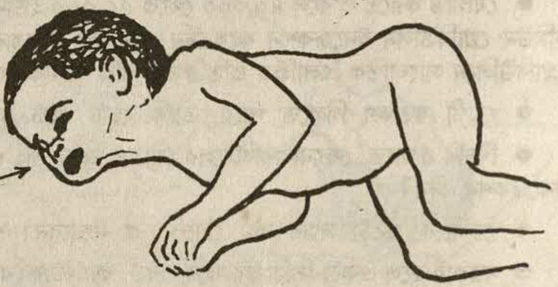
মেনিনজাইটিস

এটা মগজের একটা কঠিন সংক্রমণ, ছোটদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। অন্য কোনো রোগ—যেমন হাম, মামপস, ঘুংড়ি কাশি বা কানে সংক্রমণের জটিলতা থেকে এটা শুরু হতে পারে।

মায়ের যক্ষ্মা থাকলে তার ছেলেমেয়েদের, কয়েকমাস বয়সের মধ্যে, কখনো কখনো যক্ষ্মার মেনিনজাইটিস হয়।

লক্ষণ:

- জ্বর
- সাংঘাতিক মাথাধরা
- আড়ষ্ট ঘাড়। শিশুকে খুবই অসুস্থ দেখায়, সে মাথা আর ঘাড় এইভাবে পেছনদিকে বেঁকিয়ে শুয়ে থাকে।



- পিঠ এত আড়ষ্ট হয়ে যায় যে মাথাটা দু হাঁটুর মাঝে রাখা যায় না।
- এক বছরের কম বয়সের শিশুদের বেলায়: মাথার তালুর নরম জায়গাটা উঁচু হয়ে ফুলে ওঠে।
- সাধারণতঃ বমি হয়।
- শিশুর খুব ঘুমের ভাব বা বিরক্তি হয়।
- শিশু খেতে চায় না।
- কখনো কখনো ফিট (খিচুনি) হয় বা অস্বাভাবিক ভাবে হাত পা ছোঁড়ে।
- শিশু ক্রমশঃ বেশি অসুস্থ হয়ে শেষে অজ্ঞান হয়ে যায়।
- যক্ষ্মার মেনিনজাইটিস ধীরে ধীরে, অনেক দিন বা সপ্তাহ ধরে বাড়ে। অন্যান্য ধরনের মেনিনজাইটিস অনেক তাড়াতাড়ি কয়েক ঘণ্টা বা দিনের মধ্যে হয়।

চিকিৎসা:

তাড়াতাড়ি ডাক্তারি সাহায্য নিন—প্রত্যেকটি মিনিট দামি সম্ভব হলে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যান। ইতিমধ্যে:

- এমপিসিলিনের (পৃঃ ৩৯৯) অথবা কৃস্টালিন পেনিসিলিনের (পৃঃ ৩৯৮) ইনজেকশন দিন।
- বেশি জ্বর (৪০°-র বেশি) থাকলে ভিজে কাপড় আর এসপিরিন বা এসেটামিনোফেন (পৃঃ ৪১৪) দিয়ে কমিয়ে দিন।

এড়ানো:

যক্ষ্মার মেনিনজাইটিস এড়াবার জন্যে যে মায়ের যক্ষ্মা আছে তার কচি বাচ্চাদের জন্মের পরই বি সি জি-র টিকে দেয়া উচিত। যক্ষ্মা এড়াবার অন্যান্য পরামর্শের জন্যে পৃঃ ২১৯ থেকে ২২০ দেখুন।

ম্যালেরিয়া

ম্যালেরিয়া হল রক্তের একটা সংক্রমণ; এ থেকে শীত করে বেশি জ্বর আসে। মশা ম্যালেরিয়া ছড়ায়। মশা, সংক্রমিত লোকের রক্তের সঙ্গে ম্যালেরিয়ার পরজীবী শুষে নিয়ে পরে যে লোকটিকে কামড়ায়, তার শরীরে সেগুলো ঢুকিয়ে দেয় (পৃঃ ১৬৬)।

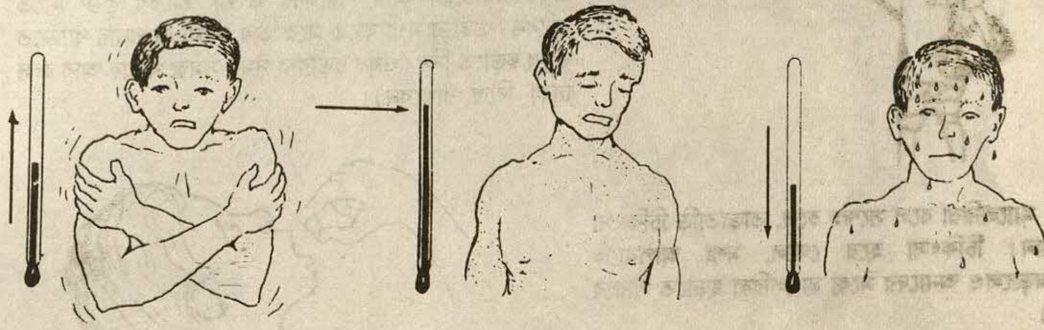
ম্যালেরিয়ার লক্ষণ:

● ম্যালেরিয়ার বিশেষত্ব হল যে সেটা দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে আক্রমণ করে ও কয়েকঘন্টা থাকে। তিনটি দশা আছে:

১. শীত করা আর প্রায়ই মাথাধরা দিয়ে শুরু হয়। রোগী ১৫ মিনিট থেকে ১ ঘন্টা পর্যন্ত ঠকঠক করে কাঁপে।

২. শীত করার পর জ্বর আসে—প্রায়ই ৪০° বা তার বেশি। রোগী দুর্বল হয়ে যায়, তার গা লালচে হয়ে যায়। কখনো কখনো বিকার (মাথার ঠিক থাকে না) হয়। জ্বর কয়েক ঘন্টা থাকে।

৩. শেষে, রোগীর ঘাম হতে শুরু হয়। জ্বর কমে যায়। একবার ম্যালেরিয়ার আক্রমণের পর রোগী দুর্বল বোধ করলেও মোটামুটি ঠিক থাকে।



● সাধারণতঃ ম্যালেরিয়ায় প্রত্যেক দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে জ্বর হয় (কি ধরনের ম্যালেরিয়া তার ওপর নির্ভর করে), তবে প্রথম দিকে রোজই জ্বর হতে পারে। তাছাড়া ছোট ছেলেপিলেদের বেলায় আর, আগে যাদের ম্যালেরিয়া হয়ে গেছে তাদের বেলায় জ্বরের ধারাটা নিয়মিত বা নমুনামত নাও হতে পারে। এইজন্যে কারো জ্বরের কারণ বোঝা না গেলে, বিশেষ করে বর্ষাকালে, তার রক্ত পরীক্ষা করে দেখা উচিত ম্যালেরিয়া আছে কি না।

● পুরোনো ম্যালেরিয়া থেকে প্রায়ই পিলে আর রক্তাল্পতা হয়।

বিশ্লেষণ আর চিকিৎসা:

● ম্যালেরিয়া বলে সন্দেহ হলে বা বারবার জ্বর হলে, রক্ত পরীক্ষা করাতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান।

● কাছে কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্র না থাকলে ক্লোরোকুইন খান। মাত্রার জন্যে পৃঃ ৪০৬ দেখুন।

● ক্লোরোকুইন খেয়ে ভালো হবার পর আবার কয়েকদিন পর জ্বর শুরু হলে, অন্য কোনো ওষুধ, যেমন প্রাইমাকুইন, দরকার হতে পারে। সবথেকে কাছের স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে পরামর্শ নিন।

● যার ম্যালেরিয়া হয়েছে বলে মনে হচ্ছে, তার যদি ফিট বা মেনিনজাইটিসের অন্য লক্ষণ (পৃঃ ২২৫) থাকে, তার হয়তো মগজের ম্যালেরিয়া হয়েছে। **তখনি ডাক্তারি সাহায্য নিন**। এটা বিপজ্জনক।

ম্যালেরিয়া কি ভাবে এড়াতে হয় :

পৃথিবীর অনেক গরম জায়গায় ম্যালেরিয়া একটা সমস্যা। সকলের সহযোগিতায় এটা কমানো যায়। কমাবার সব উপায়গুলো একসঙ্গে কাজে লাগাতে হয়।

১· মশা এড়িয়ে চলুন। যেখানে মশা নেই সেখানে কিংবা চাদরের নিচে শোবেন।

শিশুর দোলনা মশারি বা পাৎলা কাপড় দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখবেন।



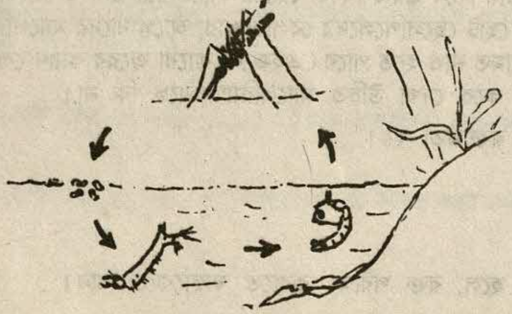


২· মশার কামড় এড়াতে গায়ে সরষের তেল মাখুন।

৩· আপনার গ্রামে ম্যালেরিয়া দপ্তরের কর্মীরা এলে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। যদি বাড়ির কারো জ্বর হয়ে থাকে, তাদের বলবেন আর পরীক্ষার জন্যে তাদের রক্ত নিতে দেবেন। এছাড়া মশা যাতে মরে তার জন্যে আপনার বাড়িতে ওষুধ ছড়াতে দিন (ওষুধ ছড়াবার সময় সমস্ত খাবার আর জল ঢাকা দিয়ে রাখবেন)।



৪· ম্যালেরিয়া বলে সন্দেহ হলে, তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করান। চিকিৎসা হয়ে গেলে, মশা আপনাকে কামড়ালেও অন্যদের মধ্যে ম্যালেরিয়া ছড়াতে পারবে না।



৫· মশা আর তাদের **শুককীট** (বাচ্চা) ধ্বংস করুন। মশা বদ্ধ জলে জন্মায়। আশেপাশের ডোবা, গর্ত, পুরোনো টিন বা ভাঙা পাত্র, যাতে জল জমে থাকে, সেগুলো পরিষ্কার করুন। যে সব পুকুর বা জলায় মশা জন্মায়, সেগুলি কেটে জল বার করে দিন বা ওপরে একটু তেল ছড়িয়ে দিন। এইসব কাজে ছোটদের লাগিয়ে দিন। খাবার জলের পাত্র ঢেকে রাখুন।

৬· ম্যালেরিয়ার ওষুধ বিভিন্ন মাত্রায় নিয়মিত খেলে ম্যালেরিয়া এড়ানো বা তার কুফল অনেকটা কমানো যেতে পারে। এ বিষয়ে আরো খবরের জন্যে পৃঃ ৪০৫ থেকে পৃঃ ৪০৭ দেখুন।

গোদ

একরকম পোকা থেকে এই সংক্রমণ হয়। এরা শরীরের লিম্ফের ব্যবস্থার ক্ষতি করে। একরকম মশা এটা ছড়ায়। মশা সংক্রমিত লোকের রক্তের সঙ্গে পোকাগুলো শুষে নিয়ে পরে যাকে কামড়ায় তার শরীরে সেগুলোকে ঢুকিয়ে দেয়।



লক্ষণ :

- ★ জ্বর, তার সঙ্গে শীত আর কাঁপুনি
- ★ চামড়ায় জায়গায় জায়গায়—বিশেষ করে হাতে আর পায়ে উঁচু হয়ে যন্ত্রণা
- ★ নিচের অঙ্গে ফোলা
- ★ লিম্ফের গুটিগুলো বড় হয়ে যাওয়া; লিম্ফের শিরাগুলো ফুলে, দুমড়ে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে যায়।
- ★ ক্ষতিগ্রস্ত জায়গা—যেমন পা, অণ্ডকোষ বা পুরুষাঙ্গ মোটা হয়ে যায়।

চিকিৎসা :

- ★ হেট্রাজানের বড়ি (মাত্রার জন্যে পৃঃ ৪১৩ দেখুন)।
- ★ এসপিরিনের বড়িতে ব্যথা আর জ্বর কমাবার সাহায্য হয়।
- ★ ফোলা কমাবার জন্যে পায়ে ইলাস্টিক ব্যাণ্ডেজ বাঁধুন। এতে স্থায়ী পা ফোলা এড়ানোরও সাহায্য হবে। রাত্রে ব্যাণ্ডেজটা খুলে ফেলতে ভুলবেন না।

এড়ানো :

ম্যালেরিয়ার মতই মশার বিরুদ্ধে সব সাবধানতাগুলো নিন (পৃঃ ২২৮)।

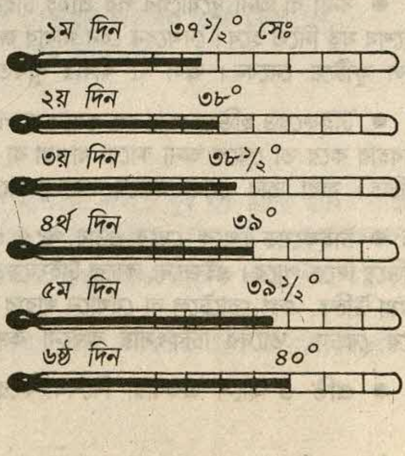
টাইফয়েডের জ্বর

টাইফয়েড হল অন্ত্রের একটা সংক্রমণ যা সমস্ত শরীরের ক্ষতি করে। দূষিত খাবার আর জল দিয়ে এটা মল থেকে মুখে ছড়ায় এবং প্রায়ই মহামারীর আকারে আসে (অনেক লোক একসঙ্গে অসুস্থ হয়)।

লক্ষণ :

প্রথম সপ্তাহ :

- সর্দি বা ইনফ্লুয়েঞ্জার মত শুরু হয়
- মাথা ধরা আর গলায় ব্যথা
- প্রতিদিন জ্বর একটু করে বেড়ে ৪০° বা তার ওপর অবধি ওঠে
- জ্বরের তুলনায় নাড়ি অনেক ধীরে চলে আধঘণ্টা অন্তর নাড়ি আর জ্বর দেখবেন। **যদি জ্বর বাড়ার সময় নাড়ি ধীর হয়ে যায়, তবে লোকটির হয়তো টাইফয়েড (পৃঃ ৩২) হয়েছে।**
- কখনো কখনো বমি, পাৎলা পায়খানা বা কোষ্ঠকাঠিন্য হয়।



দ্বিতীয় সপ্তাহ:

- বেশি জ্বর, নাড়ি তুলনায় ধীর
- গায়ে কয়েকটা গোলাপি ফুটকি দেখা দিতে পারে
- গা কাঁপা
- বিকার (রোগী পরিষ্কারভাবে চিন্তা করতে পারে না বা জ্ঞান বুদ্ধি থাকে না)
- দুর্বলতা, ওজন কমে যাওয়া, শরীরে জলের অভাব

তৃতীয় সপ্তাহ:

- অন্য কোনো জটিলতা না হলে জ্বর আর অন্যান্য লক্ষণগুলো ধীরে ধীরে চলে যায়।

চিকিৎসা:

- ডাক্তারি সাহায্য নিন
- ক্লোরামফেনিকল (পৃঃ ৪০০) দিন। ক্লোরামফেনিকল না থাকলে এমপিসিলিন দিন। এমপিসিলিনও না থাকলে ট্রাইমেথাপ্রিম ব্যবহার করুন।
- ঠাণ্ডা ভিজে কাপড় দিয়ে জ্বর কমান (পৃঃ ৮৮)।
- শরীরে জলের অভাব কমাতে প্রচুর তরল খাবার দিন: ঝোল, রস, চিনি নুনের সরবৎ (পৃঃ ১৮২)।
- পুষ্টিকর খাবার দিন—দরকার হলে তরল করে।
- জ্বর সম্পূর্ণ চলে যাওয়া পর্যন্ত রোগীর শুয়ে থাকা উচিত।
- যদি রোগীর মলের সঙ্গে রক্ত পড়ে বা পেরিটোনাইটিসের (পৃঃ ১০৮) বা নিউমোনিয়ার (পৃঃ ২০৮) লক্ষণ দেখা যায়, **সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারি সাহায্য নেবেন।**

টাইফয়েড এড়ানো:

- টাইফয়েড এড়াতে হলে মানুষের মল দিয়ে যাতে জল আর খাবার দূষিত না হয় সে বিষয়ে যত্ন নিতে হবে। পরিচ্ছেদ ১২-তে নিজের এবং সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে যে সব নির্দেশ দেয়া আছে সেগুলি মেনে চলুন। পায়খানা তৈরি করে ব্যবহার করুন। দেখবেন, লোকে যেখান থেকে খাবার জল নেয়, পায়খানাগুলি যেন সেখান থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকে।

- যে খাবারে মাছি বা অন্য পোকামাকড় বসেছে তা খাবেন না, বিশেষ করে মেলায় বা উৎসবের সময়।

- বন্যা বা অন্য দুর্যোগের পর প্রায়ই টাইফয়েড রোগ দেখা দেয়, এইসব সময়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে বিশেষ যত্ন নিতে হবে। দেখবেন যেন খাবার জলটা পরিষ্কার থাকে। আপনার গ্রামে টাইফয়েড দেখা দিলে, সব খাবার জল ফুটিয়ে নেবেন। জল বা খাবার দূষিত হবার কারণ খুঁজে বার করুন।

- টাইফয়েড ছড়িয়ে পড়া বন্ধ করতে হলে, যার রোগটা হয়েছে তার উচিত আলাদা ঘরে থাকা। সে যে বাসনপত্র ব্যবহার করে তা থেকে অন্য কারো খাওয়া বা জল খাওয়া উচিত নয়। তার মল পুড়িয়ে বা গভীর গর্তে পুঁতে ফেলা উচিত। যারা তার সেবা করছে তাদের সঙ্গে সঙ্গে হাত ধুয়ে ফেলা উচিত।

- টাইফয়েড থেকে সেরে ওঠার পরও কেউ কেউ রোগের জীবাণু বয়ে বেড়ায় এবং অন্যদের মধ্যে রোগটা ছড়িয়ে দিতে পারে। এইজন্যে, কারো টাইফয়েড হয়ে থাকলে, তার, নিজের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে বাড়তি যত্ন নেয়া উচিত, এবং হোটেলে বা যেখানে খাবার নাড়াচাড়া করতে হয়, সেখানে কাজ করা উচিত নয়। টাইফয়েড যারা বয়ে বেড়ায়, তাদের চিকিৎসায় কখনো কখনো এমপিসিলিন কাজ দেয়।

- প্রতি ৬ মাসে একবার, বিশেষ করে গরমকালে, টাইফয়েডের টিকে নেবেন (পৃঃ ১৭৫)।

কলেরা

এটা একটা অত্যন্ত সংক্রামক আর বিপজ্জনক রোগ—প্রায়ই মহামারী হয়ে আসে, বিশেষ করে যেখানে আঢাকা খাবার বিক্রি হয় এমন কোনো বড় মেলা বা উৎসবের পরে। এটা প্রধানতঃ মাছি দিয়ে মল থেকে মুখে ছড়ায় (পৃঃ ১৫৬)।

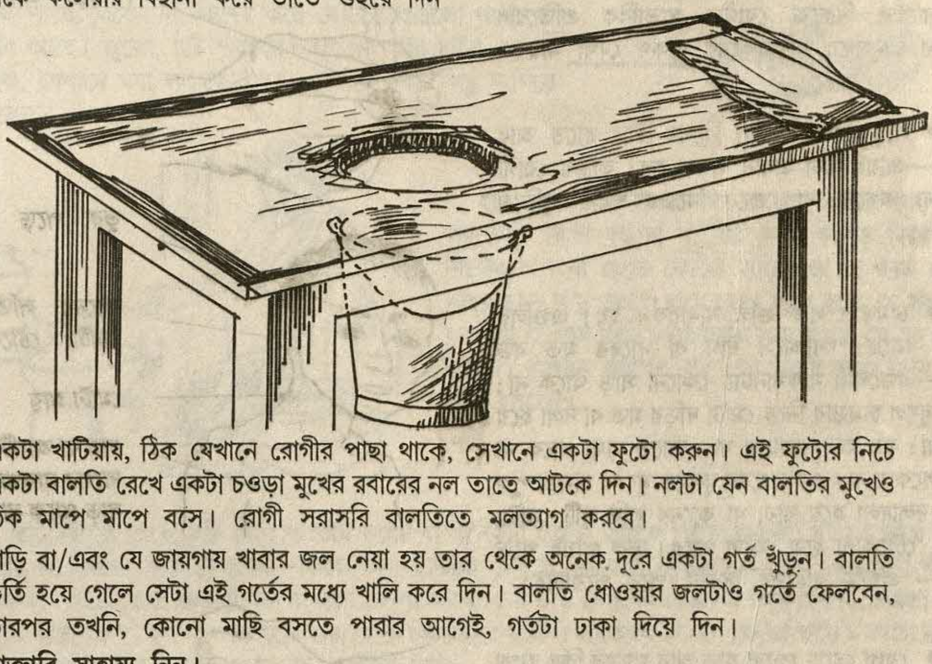
লক্ষণ:

★ রোগী অনবরত চাল ধোয়া জলের মত খুব পাৎলা মল ত্যাগ করে (পৃঃ ১৮৯)। মলের মধ্যে গুঁড়োগুলো হল অন্ত্রের ভেতরের দেয়ালের টুকরো।
★ এই রোগ থেকে শরীরে জলের অভাব হয়ে রোগী মারা যেতে পারে।
★ রোগীর অল্প জ্বরও হতে পারে।

চিকিৎসা:

কলেরা ভীষণ বিপজ্জনক। **ডাক্তারি সাহায্য না পেলে রোগী মারা যেতে পারে।** কলেরায় মৃত্যু হয় জলের অভাব থেকে। জলের অভাব দূর করতে আর রোগের চিকিৎসা করতে:

★ রোগীকে টেট্রাসাইক্লিন (পৃঃ ৪০০) দিন
★ দিনে অনেকবার তাকে চিনি নুনের সরবৎ (পৃঃ ১৮২) দিন
★ তাকে পুষ্টিকর খাবার—দরকার হলে তরল খাবার দিন
★ তাকে কলেরার বিছানা করে তাতে শুইয়ে দিন



একটা খাটিয়ায়, ঠিক যেখানে রোগীর পাছা থাকে, সেখানে একটা ফুটো করুন। এই ফুটোর নিচে একটা বালতি রেখে একটা চওড়া মুখের রবারের নল তাতে আটকে দিন। নলটা যেন বালতির মুখেও ঠিক মাপে মাপে বসে। রোগী সরাসরি বালতিতে মলত্যাগ করবে।

বাড়ি বা/এবং যে জায়গায় খাবার জল নেয়া হয় তার থেকে অনেক দূরে একটা গর্ত খুঁড়ুন। বালতি ভর্তি হয়ে গেলে সেটা এই গর্তের মধ্যে খালি করে দিন। বালতি ধোওয়ার জলটাও গর্তে ফেলবেন, তারপর তখনি, কোনো মাছি বসতে পারার আগেই, গর্তটা ঢাকা দিয়ে দিন।

ডাক্তারি সাহায্য নিন।

এড়ানো:

কলেরা খুব সহজে ছড়ায় (পৃঃ ১৫৮)। দূষিত জল বা খাবার না খাওয়ার বিষয়ে খুব যত্ন নিতে হবে। পরিচ্ছেদ ১২-তে নিজের আর সাধারণের স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে যে সব নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেগুলি মেনে চলবেন।

★ যদি আপনার বাড়িতে, গ্রামে বা এলাকায় কারো কলেরা হয়, **তখনি স্বাস্থ্য অধিকর্তাদের খবর দিন,** যাতে তাঁরা রোগটা ছড়িয়ে পড়া বন্ধ করতে পারেন।
★ আপনার বাড়ির, গ্রামের বা এলাকার সকলকে প্রতি ৬ মাসে একবার করে কলেরার টিকে দেয়ান, বিশেষ করে মহামারী হলে।

★ কলেরা রোগীকে আলাদা করে যেখানে মাছি নেই এমন একটা ঘরে রাখুন।
★ রোগীকে সেবা করার বা বালতিটা বইবার পর নিজের হাত ভালোভাবে ধুয়ে নিন।
★ রোগীর ব্যবহার করা থালাবাসন আলাদা রাখুন। অন্য কাউকে ওগুলো ব্যবহার করতে দেবেন না।
★ **সমস্ত খাবার জল ফুটিয়ে নিন,** বিশেষ করে গ্রামে কারো কলেরা হলে।
★ **সব খাবার আর খাবার জল ঢাকা দিয়ে রাখুন,** যাতে তাতে মাছি বসতে না পারে। রাস্তার ধারে বা দোকানে যে সব খাবার খুলে বিক্রি করা হয়, সেগুলো যেন খাবেন না। এসব খাবার সাধারণতঃ ঢাকা থাকে না, এগুলি থেকে কলেরা হতে পারে।

কুষ্ঠ (হ্যানসেনের রোগ)

যে অঞ্চলে কুষ্ঠ সাধারণতঃ দেখা যায়, সেখানে যাঁরা থাকেন তাঁদের অনেকের মধ্যে এই রোগের সংক্রমণ হয়, কিন্তু তাঁদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের মধ্যেই এ রোগের লক্ষণগুলো ফুটে ওঠে। গায়ে গায়ে ছোঁয়া, আর হাঁচি, কাশি, থুতু ফেলা (ছিটেফোঁটার সংক্রমণ) থেকে কুষ্ঠ ছড়ায়।

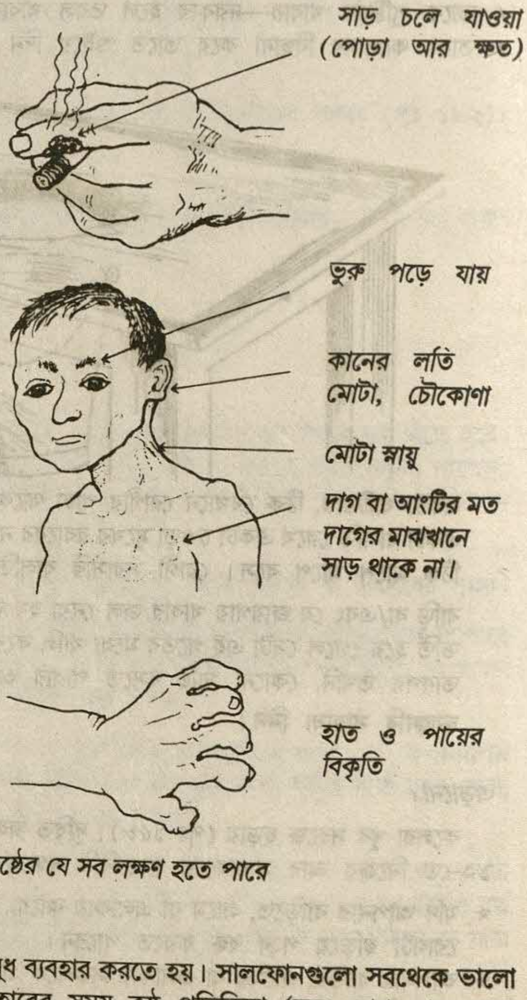
লক্ষণ:

রোগের বিরুদ্ধে রোগীর স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা অনুসারে নানারকমের লক্ষণ দেখা যায়।

● **সাড় চলে যাওয়া,** বিশেষ করে হাতে আর পায়ে—প্রায়ই এটা প্রধান লক্ষণ হয়। কুষ্ঠের রোগী কখনো কখনো না জেনে নিজের শরীর পুড়িয়ে ফেলে।

● চামড়ার লক্ষণগুলি নানারকম হয়। এগুলির মধ্যে আছে: ফ্যাকাসে দাগ বা দাদের মত বড় দাগ—এগুলোর মাঝখানটায় কোনো সাড় থাকে না; স্নায়ু ফুলে চামড়ার নিচে মোটা দড়ির মত বা দলা হয়ে যাওয়া; বড় বড় পুরোনো ঘা—তাতে ব্যথা থাকে না বা চুলকোয় না। এক ধরনের কুষ্ঠতে মুখের চামড়া পুরু আর দলাদলা হয়ে যায়, বা কানের লতি দুটি মোটা, ছোট, চৌকোণা হয়ে যেতে পারে। ভুরু প্রায়ই পড়ে যায়— প্রথমে বাইরের দিকটা, পরে পুরোটাই।

● রোগ বেড়ে গেলে হাত আর পায়ের কিছু অংশ পঙ্গু হয়ে থাবার মত হয়ে যেতে পারে। হাত আর পায়ের আঙুলগুলো বা পুরো হাত পা ক্রমশঃ ছোট হয়ে বোঁচা হয়ে যেতে পারে।



কুষ্ঠের যে সব লক্ষণ হতে পারে

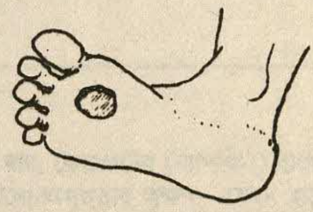
কুষ্ঠের চিকিৎসা:

কুষ্ঠ সাধারণতঃ সারানো যায়, তবে অনেক বছর ধরে ওষুধ ব্যবহার করতে হয়। সালফোনগুলো সবথেকে ভালো ওষুধ। মাত্রার জন্যে পৃঃ ৪০৫ দেখুন। যদি ওষুধ ব্যবহারের সময় কুষ্ঠ প্রতিক্রিয়া (জ্বর, র‍্যাশ, হাত পায়ে ব্যথা—হয়তো ফোলা, বা চোখের ক্ষতি) হয় বা বাড়ে, **ডাক্তারি সাহায্য নিন।**

হাত আর পায়ের ক্ষতি এড়ানো:

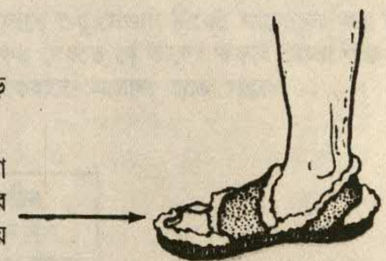
কুষ্ঠ রোগীদের (মধ্যে) প্রায়ই যে বড় বড় খোলা ঘা আর হাত পায়ের ক্রমশঃ ক্ষয় দেখা যায়, সেগুলো রোগটা থেকে হয় না, এড়ানোও যায়। সাড় চলে গেলে, মানুষ আঘাত থেকে আর নিজেকে রক্ষা করে না বলে ওগুলো হয়।

যেমন, যার স্বাভাবিক সাড় আছে, সে অনেকটা পথ হাঁটলে যদি তার পায়ে ফোস্কা পড়তে শুরু হয়, তবে তার ব্যথা লাগে; সে তখন হাঁটা বন্ধ করে বা খুঁড়িয়ে হাঁটে। এতে তার পা আরো ক্ষতি হওয়া থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু কুষ্ঠের রোগী ব্যথা পাবে না—হেঁটেই চলবে, আর তার ফোস্কাটা খোলা ঘা হয়ে যাবে। তাতে সংক্রমণ হবে আর তখনো ব্যথা হবে না বলে রোগী সেটাকে রক্ষা করবে না বা সেরে যাবার সুযোগ দেবে না। কাজেই সংক্রমণ ধীরে ধীরে হাড়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে সেগুলোকে ধ্বংস করতে শুরু করবে। ফলে যেমন দেখা যায় সেইরকম বিকৃতি হবে। কিন্তু যত্ন নিলে এসব এড়ানো যায়।



১· যে সব জিনিস থেকে কাটে, থেৎলায়, ফোস্কা পড়ে বা পুড়ে যায় সেগুলি থেকে হাত আর পা রক্ষা করুন:

খালি পায়ে ঘুরবেন না, বিশেষ করে যেখানে ধারালো পাথর বা কাঁটা আছে। জুতো, চটি পরবেন। জুতোর আর চটির ভেতর দিকে, যেখানে ঘষা লাগতে পারে, সেখানে নরম কিছু লাগিয়ে নেবেন।





হাত দিয়ে কাজ করার সময় বা রান্না করার সময় দস্তানা পরবেন। মোটা দস্তানা বা পাট করা কাপড় দিয়ে আগে নিজের হাত না ঢেকে কোনো হাঁড়ি কড়া বা গরম থাকতে পারে এমন কিছু তুলতে যাবেন না। সম্ভব হলে, যে সব কাজে ধারালো বা গরম জিনিস নাড়াচাড়া করতে হয়, সে সব এড়িয়ে যাবেন। ধূমপান করবেন না। রান্না করার সময় উনুন থেকে দূরে বসবেন।

২· প্রতি দিনের শেষে (যদি বেশি পরিশ্রম করেন বা অনেকটা হাঁটেন, তাহলে আরো ঘনঘন) খুব মন দিয়ে নিজের হাত আর পা পরীক্ষা করে দেখবেন—কিংবা অন্য কাউকে দেখতে বলবেন। দেখবেন—কাটা, থেৎলানো বা কাঁটা আছে কি না। হাতে পায়ে কোনো দাগ বা লাল ফোলা আছে কিনা তাও দেখবেন। এরকম কিছু দেখলে, চামড়া আবার পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সেই হাত বা পা বিশ্রামে রাখবেন। এইভাবে চামড়া, ফোস্কা পড়ে দগদগে না হয়ে, কড়া পড়ে শক্ত হয়ে যাবে। সব ঘাই এড়ানো যায়।

৩· যদি (আগে থেকেই) খোলা ঘা হয়েই থাকে বা হয়ে যায়, পুরোপুরি সেরে না যাওয়া পর্যন্ত ঘায়ের জায়গাটা খুব পরিষ্কার করে বিশ্রামে রাখুন। জায়গাটায় আবার যাতে আঘাত না লাগে, সে বিষয়ে খুব যত্ন নেবেন।

এই কাজগুলি করলে আর তাড়াতাড়ি চিকিৎসা শুরু করলে কুষ্ঠের বেশির ভাগ বিকৃতি এড়ানো যায়।

পরিচ্ছেদ

১৫ চামড়ার সমস্যা

শুধু চামড়ার রোগ বা জ্বালাযন্ত্রণা থেকে কিছু চামড়ার সমস্যা হয়—যেমন, দাদ, কোলোটের (ন্যাপকিন) র‍্যাশ বা আঁচিল। অন্য কয়েকটি চামড়ার সমস্যা আছে—সেগুলো সমস্ত শরীরের কোনো অসুস্থতার লক্ষণ—যেমন হামের র‍্যাশ বা পেলাগ্রা (অপুষ্টি) থেকে যন্ত্রণাদায়ক শুকনো দাগড়া। কয়েকধরনের ঘা বা চামড়ার বিকৃতি, যক্ষ্মা, সিফিলিস বা কুষ্ঠের মত কিছু কঠিন রোগের লক্ষণ হতে পারে।

চামড়ার যেসব সাধারণ সমস্যা গ্রামাঞ্চলে দেখা যায়, এই পরিচ্ছেদে শুধু সেগুলি নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। তবে চামড়ার রোগ কয়েকশ রকমের হয়। কতকগুলো এত একরকম দেখতে যে তাদের তফাৎ বোঝা শক্ত—অথচ তাদের কারণ আর যে বিশেষ চিকিৎসা দরকার, সেগুলো একেবারে আলাদা হতে পারে।

চামড়ার রোগ হলে কঠিন,
চিকিৎসাতেও বাড়ে দিন দিন,
নিজের হাতেতে রেখনাকো আর।
পারে সামলাতে শুধু ডাক্তার।

চামড়ার সমস্যার চিকিৎসার সাধারণ নিয়ম :

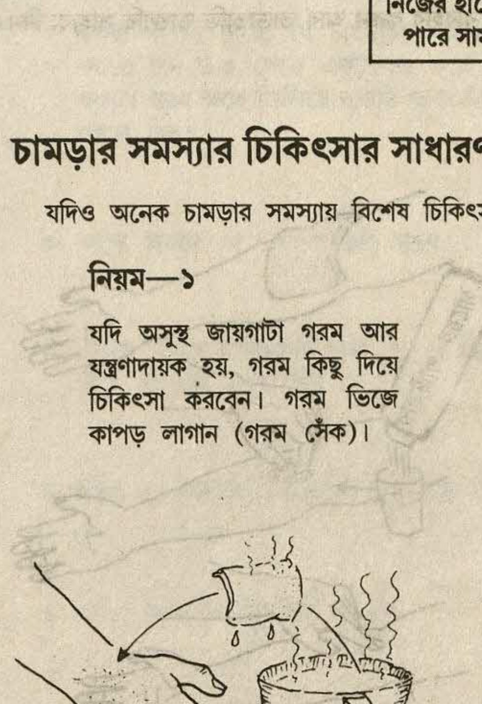
যদিও অনেক চামড়ার সমস্যায় বিশেষ চিকিৎসা লাগে, কয়েকটা সাধারণ ব্যবস্থা নিলে প্রায়ই সুবিধা হয়:

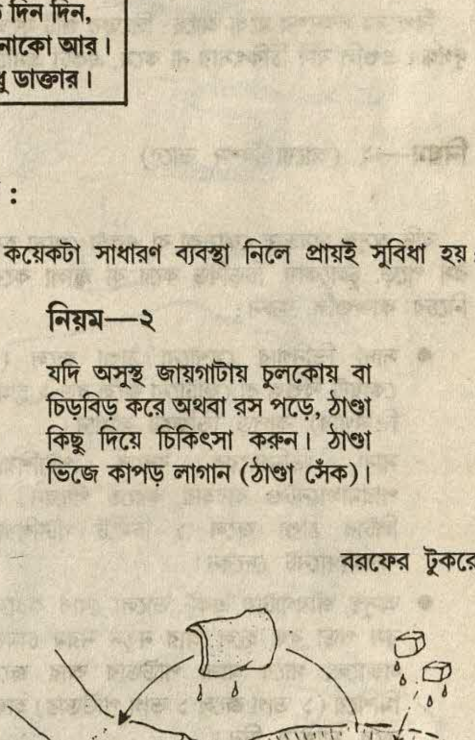
নিয়ম—১

যদি অসুস্থ জায়গাটা গরম আর যন্ত্রণাদায়ক হয়, গরম কিছু দিয়ে চিকিৎসা করবেন। গরম ভিজে কাপড় লাগান (গরম সেঁক)।

নিয়ম—২

যদি অসুস্থ জায়গাটায় চুলকোয় বা চিড়বিড় করে অথবা রস পড়ে, ঠাণ্ডা কিছু দিয়ে চিকিৎসা করুন। ঠাণ্ডা ভিজে কাপড় লাগান (ঠাণ্ডা সেঁক)।

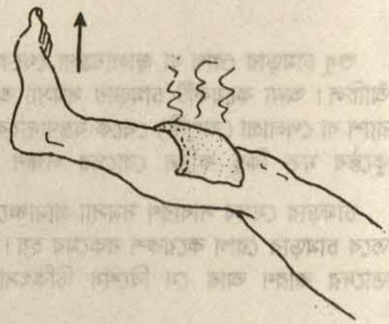




নিয়ম—১ (আরো বিশদ ভাবে)

যদি চামড়ায় কোনো কঠিন সংক্রমণের লক্ষণ দেখা যায়, যেমন:

- প্রদাহ (অসুস্থ জায়গাটা ঘিরে চামড়া লালচে)
- ফোলা
- ব্যথা
- গরম ভাব (ছুঁলে গরম লাগে)
- পুঁজ



নিচের কাজগুলি করুন:

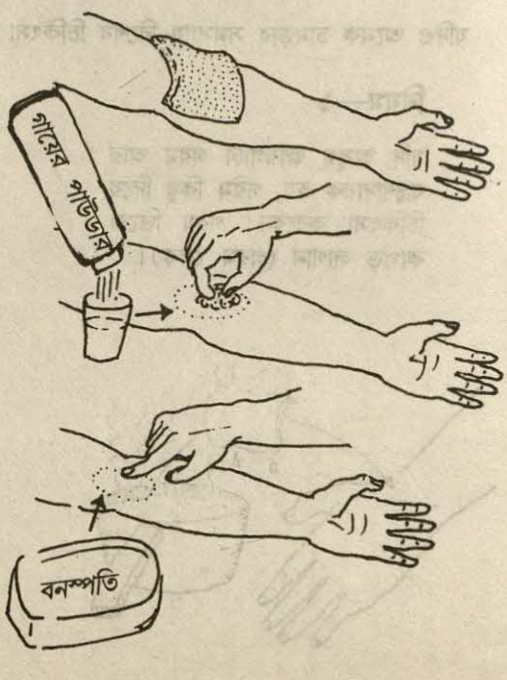
- অসুস্থ জায়গাটা স্থির আর উঁচু করে (শরীরের বাকি অংশ থেকে উঁচুতে) রাখুন
- গরম, ভিজে কাপড় লাগান
- সংক্রমণ সাংঘাতিক হলে অথবা রোগীর জ্বর হলে এনটিবায়োটিক (পেনিসিলিন বা যে কোনো সালফোনামাইড) দেবেন ।

বিপদের লক্ষণের মধ্যে আছে: লিম্ফের গুটি ফুলে যাওয়া, সংক্রমিত জায়গাটার ওপরদিকে একটা লাল দাগ অথবা দুর্গন্ধ। এগুলি যদি চিকিৎসায় না কমে, একটা এনটিবায়োটিক ব্যবহার করুন আর তাড়াতাড়ি ডাক্তারি সাহায্য নিন।

নিয়ম—২ (আরো বিশদ ভাবে)

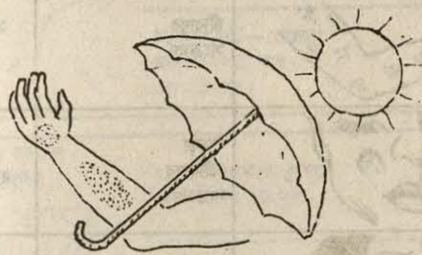
যদি অসুস্থ চামড়ায় ফোসকা বা একটা খোসা হয়, রস পড়ে, চুলকোয়, চিড়বিড় করে বা জ্বালা করে, নিচের কাজগুলি করুন:

- সাদা ভিনিগার মেশানো ঠাণ্ডা জলে (১ কোয়ার্ট বিশুদ্ধ বা ফোটানো জলে বড় ২ চামচ ভিনিগার) কাপড় ভিজিয়ে লাগান।
  সাদা ভিনিগারের বদলে পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেটও ব্যবহার করতে পারেন। ১ লিটার ঠাণ্ডা জলে ১ চিমটে পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট দেবেন।
- অসুস্থ জায়গাটায় একটু ভালো বোধ করলে, রস পড়া বন্ধ হলে আর নতুন নরম চামড়া গজালে, গায়ে মাখা পাউডার আর জলে মিশিয়ে (১ ভাগ জলে ১ ভাগ পাউডার) হাল্কা করে মাখিয়ে দিন।
- সেরে উঠলে, যখন নতুন চামড়া পুরু বা চাকলা চাকলা হয়ে উঠতে শুরু করবে, একটু বনস্পতি বা গায়ে মাখা তেল ঘষে, নরম করে দেবেন।



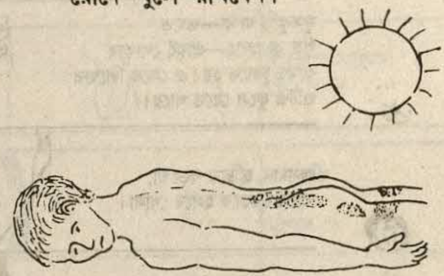
নিয়ম—৩

শরীরের যে সব অংশ প্রায়ই রোদ পায়, সেখানকার চামড়া অসুস্থ হলে, তাকে রোদ থেকে আড়ালে রাখুন।



নিয়ম—৪

যদি সবথেকে অসুস্থ চামড়ার জায়গাটা সাধারণতঃ কাপড়চোপড়ে ঢাকা থাকে, তবে দিনে ২ বা ৩ বার ২০ মিনিট ধরে সরাসরি রোদে খুলে রাখবেন।

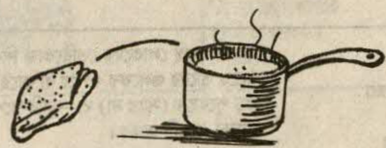


গরম সেঁক দেবার জন্যে নির্দেশ (গরমে ভেজানো):

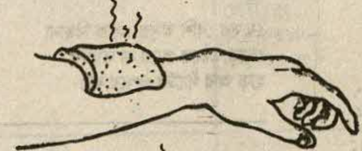
১· জল ফুটিয়ে হাত সওয়া মত ঠাণ্ডা করুন।



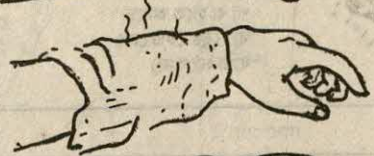
২· একটা কাপড় নিয়ে, যে চামড়াটুকুর চিকিৎসা করতে চান তার থেকে একটু বড় করে পাট করুন। গরম জলে ভিজিয়ে বাড়তি জ ল নিংড়ে ফেলে দিন।



৩· অসুস্থ চামড়ার ওপরে কাপড়টা রাখুন।



৪· একটা পাৎলা প্লাস্টিকের চাদর বা সেলোফেন দিয়ে কাপড়টা ঢেকে দিন।



৫· গরম ধরে রাখতে তোয়ালে দিয়ে মুড়ে দিন।

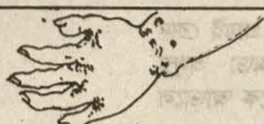
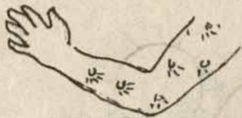


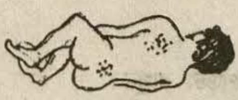
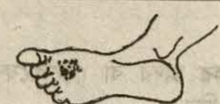
৬· অসুস্থ জায়গাটা উঁচু করে রাখুন।

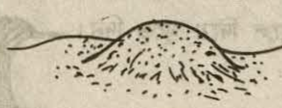
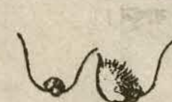
৭· কাপড়টা ঠাণ্ডা হয়ে এলে, গরম জলে দিয়ে আবার একইভাবে সেঁক দিন।



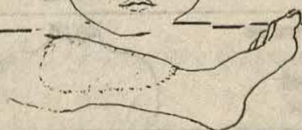
চামড়ার সমস্যা—চিনে নেবার জন্যে নির্দেশ

যদি চামড়ায় থাকে :	আর এইরকম দেখায় :		হয়তো হয়েছে :	পৃষ্ঠা দেখুন :
ছোট্ট বা ফুসকুড়ির মত ঘা 	ছোট্ট ফোলা বা ঘা সঙ্গে খুব চুলকুনি—প্রথমে আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে, কবজিতে বা কোমরে।		খোস	২৪১
	ফুসকুড়ি বা ঘা—তাতে পুঁজ বা প্রদাহ—প্রায়ই পোকার কামড় চুলকে হয়। এ থেকে লিম্ফের গুটিও ফুলে যেতে পারে।		জীবাণুর সংক্রমণ	২৪২
	অসমান, ছড়িয়ে পড়া ঘা, তাতে চকচকে হলদে খোসা।		পাঁচড়া (জীবাণুর সংক্রমণ)	২৪৩
	অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের মুখে, কখনো কখনো বুকে আর পিঠে ব্রণ, ওপরদিকে প্রায়ই পুঁজ থাকে।		নানা ধরনের ব্রণ	২৫২
	যোনিতে ঘা—চুলকুনি বা ব্যথা থাকে না		সিফিলিস যৌন লিমফোগ্র্যানুলোমা	২৮১ ২৮৩

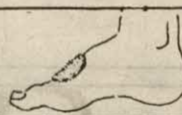
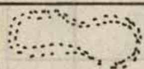
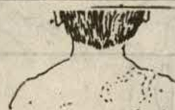
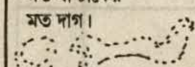
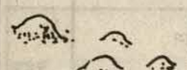
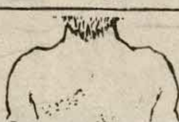
বড় খোলা ঘা বা চামড়ার আলসার 	যে সব বয়স্থ লোকদের ভেরিকোজ শিরা আছে তাদের গুলফের ওপরে বা কাছে বড় পুরোনো (সারে না) ঘা—চারিপাশের চামড়া বেগুনি রঙের।		রক্ত চলাচলের দোষের ফলে ঘা হয়তো ডায়াবেটিস (বহুমূত্র)	২৫৪ ১৪৯
	যে সব বেশি অসুস্থ লোক বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না তাদের হাড় আর গাঁটের ওপরে ঘা।		বিছানা ঘা	২৫৫
	পা বা হাতে অসাড় ঘা। (ছুঁচ ফোটালেও ব্যথা লাগে না)		কুষ্ঠ	২৩২

চামড়ার নিচে দলা	গরম, যন্ত্রণাদায়ক ফোলা—কখনো কখনো ফেটে যেতে পারে।		ফোড়া	
	যে মা বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে তার স্তনে গরম, যন্ত্রণাদায়ক ফোলা।		ম্যাসটাইটিস (জীবাণুর সংক্রমণ) হয়তো ক্যানসার	৩২৪ ৩২৫
	স্তনে যে ফোলা বেড়েই চলে—সাধারণতঃ প্রথম দিকে ব্যথা থাকে না।		ক্যানসার (লিম্ফের গুটিও দেখুন)	৩২৫ ১০১

চিনে নেবার জন্যে নির্দেশ

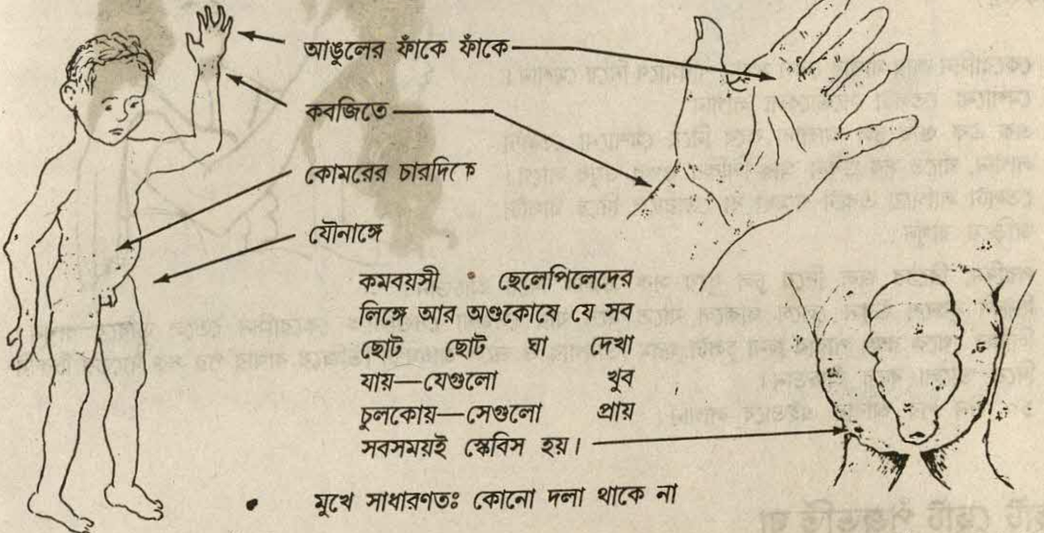
যদি চামড়ায় থাকে:	আর এইরকম দেখায়:		হয়তো হয়েছে:	পৃষ্ঠা দেখুন:
ফোলা লিম্ফের গুটি 	ঘাড়ের পাশে গুটি সেগুলো অনবরত ফেটে গিয়ে ক্ষত চিহ্ন সৃষ্টি করে।		এক ধরনের যক্ষ্মা	২৫৩
	কুঁচকিতে গুটি—সেগুলো অনবরত ফেটে ক্ষত চিহ্ন সৃষ্টি করে।		লিমফোগ্র্যানুলোমা ভেনেরিয়াম	২৮৩
বড় বড় দাগ বা দাগড়া 	পোয়াতি মেয়েদের কপালে আর গালে কালচে দাগ।		পোয়াতি অবস্থার মুখোস	২৪৮
কালচে	ওপর হাতে, পায়ে, ঘাড়ে বা মুখে খসখসে, ফাটাফাটা জায়গা—রোদে পোড়ার মত দেখায়।		পেলাগ্রা (এক ধরনের অপুষ্টি)	২৪৯ ২৫০
	যে শিশুদের পা ফুলে গেছে তাদের চামড়ায় বেগুনি রঙের দাগ বা খসা ঘা।		অপুষ্টি	২৪৯ ২৫০
	শরীরে গোল বা অসমান দাগ —বিশেষ করে অল্পবয়সীদের, ছোটদের হয়।		টিনিয়া ভার্সিকালার (ছুলি) (ছত্রাকের সংক্রমণ)	২৪৭
সাদা	সাদা সাদা দাগ, বিশেষ করে হাত, পা বা ঠোঁটে—অন্য কোনো লক্ষণ ছাড়াই শুরু হয়।		শ্বেতী (রং উঠে যাওয়া—অন্য কিছু নয়)	২৪৮
	ছোট ছেলেমেয়েদের গালে বা হাঁটুর আর কনুইয়ের পেছনে লালচে বা ফোসকা পড়া দাগড়া।		ছোটদের একজিমা	২৫৭
	তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়া লালচে, গরম, যন্ত্রণাদায়ক দাগড়া।		ইরিসিপেলাস (খুব কঠিন জীবাণুর সংক্রমণ)	২৫৩
লালচে	শিশুদের দু পায়ের মাঝে লালচে জায়গা।		পেচ্ছাপ বা গরম থেকে কোলোটের র‍্যাশ	২৫৬
	চামড়ার ভাঁজে টকটকে লাল দাগড়া—তাতে দইয়ের মত সাদা থকথকে রস।		মনিলিয়াসিস ইস্ট জাতীয় (ছত্রাকের সংক্রমণ)	২৮৬
লালচে বা ছাই রঙের	উঁচু, লালচে বা ছাই রঙের দাগড়া—তাতে রূপোলি চাকলা; বিশেষ করে কনুই আর হাঁটুতে (পুরোনো, অনেকদিনের)।		সোরিয়াসিস (বা কখনো কখনো যক্ষ্মা)	২৫৭ ২৫৩

চিনে নেবার নির্দেশ

যদি চামড়ায় থাকে :	আর এইরকম দেখায় :	হয়তো হয়েছে :	পৃষ্ঠা দেখুন :
আঁচিল 	সাদাসিধে আঁচিল, বেশি বড় নয়। 	সাধারণ আঁচিল (ভাইরাসের সংক্রমণ)	২৫১
	বড় আঁচিল—১ সেঃ মিঃ-এর থেকে বড় 	এক ধরনের চামড়ার যক্ষ্মা	২৫৩
 আংটির মত দাগ ধারগুলো উঁচু বা লাল মাঝখানটা সাধারণতঃ পরিষ্কার থাকে	ছোট ছোট আংটির মত দাগ। এগুলো বাড়তে বা ছড়িয়ে যেতে থাকে, চুলকোতেও পারে। 	দাদ (ছত্রাকের সংক্রমণ)	২৪৬
	আংটির মত বড় দাগ—মাঝখানটা অসাড়। (ছুঁচ ফোটালে লাগে না।) 	কুষ্ঠ	২৩২
	ছোট ছোট আংটির মত দাগ—কখনো কখনো মাঝে ছোট গর্ত থাকে—রগে, নাকে বা ঘাড়ে দেখা যায়। 	চামড়ার ক্যানসার হতে পারে	২৫২
চাবুক মারার মত বা চাকের মত দাগ। 	লালচে ফোলা, উঁচু হয়ে ওঠা দাগ—খুব চুলকোয় (তাড়াতাড়ি বেরোয়, আবার চট করে মিলিয়ে যায়। 	এলার্জির প্রতিক্রিয়া	২৪৪
 ফোসকা	উঁচু হয়ে ওঠা ফোসকা খুব চুলকোয় আর রস পড়ে। 	সরাসরি ছোঁয়া থেকে চামড়ার সংক্রমণ (যেমন বিষাক্ত গাছপালা থেকে)	২৪৫
	সমস্ত শরীরে ছোট ছোট ফোসকা সঙ্গে জ্বর থাকে। ফোসকাগুলো পরে মামড়ি হয়ে যায়। 	জলবসন্ত	৩৫৮
	শরীরের শুধু একটা জায়গায় এক ঝাঁক যন্ত্রণাদায়ক ফোসকা বেরোয়—সাধারণতঃ একটা লাইন ধরে বা এক গোছায়। 	হারপিস জোস্টার	২৪৫
	এক জায়গায় দুর্গন্ধযুক্ত অনেক ছাই বা কালো রঙের ফোসকা আর বুদবুদ থাকে—এটা ছড়িয়ে যায়। 	গ্যাস গ্যাংগ্রিন (খুব কঠিন জীবাণুর সংক্রমণ)	২৫৪
সমস্ত শরীরে ছোট ছোট দাগ বা র‍্যাশ	ছেলেপিলে খুব অসুস্থ হলে তাদের সারা গায়ে যে র‍্যাশ হয়। 	হাম	৩৫৮
	ওষুধ খেয়ে যে র‍্যাশ বার হয়।	ওষুধে এলার্জির প্রতিক্রিয়া	

স্কেবিস (চুলকুনি)

স্কেবিস—বিশেষ করে ছেলেপিলেদের মধ্যে—প্রায়ই দেখা যায়। এগুলো সারা শরীরেই বেরোতে পারে, তবে বেশি দেখা যায়:



ছোট্ট এঁটুলির মত ছোট ছোট প্রাণী চামড়ার নিচে সুড়ঙ্গ করে বলে চুলকুনি হয়। অসুস্থ চামড়ার ছোঁয়া, জামাকাপড় আর বিছানাপত্র থেকে এটা ছড়ায়। চুলকে দিলে সংক্রমণ হতে পারে, তা থেকে পুঁজভর্তি ঘা হয়; কখনো কখনো লিম্ফের গুটি ফুলে যায় বা জ্বর হয়।

চিকিৎসা:

★ কারো চুলকুনি হলে, বাড়ির সকলেরই চিকিৎসা করানো উচিত।

★ এই মলমটি তৈরি করুন: অল্প জলে কিছু নিমপাতা সেদ্ধ করুন। সেটা একটু হলুদগুঁড়োর সঙ্গে বেটে ঘন মলম তৈরি করুন।

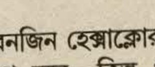
সাবান আর জল দিয়ে জোরে জোরে ভালো করে ঘষে সারা শরীর ধুয়ে ফেলুন। সমস্ত শরীরে, বিশেষ করে হাত পায়ের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে আর কুঁচকিতে নিমহলুদের মলম মাখুন। কিছুক্ষণ রোদে দাঁড়িয়ে থাকুন। পর পর ৩ দিন আরো মলম লাগান; **স্নান করবেন না**। এই ৩ দিন যত জামাকাপড়, তোয়ালে—গামছা, বিছানা চাদর ব্যবহার করা হবে, সব ফুটিয়ে রোদে শুকিয়ে নিন। চার দিনের দিন ভালো করে স্নান করে টাটকা শুকনো জামাকাপড় পরুন।

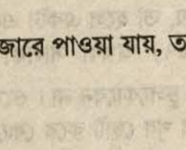
★ নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা প্রথমেই দরকার। রোজ স্নান করে জামাকাপড় বদলে ফেলবেন। সমস্ত জামাকাপড় আর বিছানা কেচে রোদে শুকিয়ে নিন।

★ নিমহলুদের মলমের বদলে খানিকটা সালফার সমান পরিমাণের গরম রান্নার তেলের সঙ্গে মিশিয়ে গায়ে লাগাতে পারেন।

দ্রষ্টব্য: গামা বেনজিন হেক্সাক্লোরাইড বা বেনজিল বেনজোয়েটের (পৃঃ ৪১১) যে মলম বাজারে পাওয়া যায়, তাতেও চুলকুনির পোকা মরে—কিন্তু খরচ বেশি হয়।

উকুন





মাথার আর গায়ের উকুন থেকে চুলকুনি, কখনো কখনো চামড়ার সংক্রমণ হয় বা লিম্ফের গুটি ফুলে যায়। উকুন সারাতে হলে নিজের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সম্বন্ধে খুব যত্ন নেবেন।

প্রতিদিন খাট, বালিশবিছানা রোদে দেবেন। ঘনঘন স্নান করে চুল ধুয়ে নেবেন। ছেলেপিলেদের চুল পরীক্ষা করে দেখবেন। উকুন থাকলে তখনি চিকিৎসা করবেন। যার উকুন হয়েছে তাকে অন্যদের সঙ্গে শুতে দেবেন না।



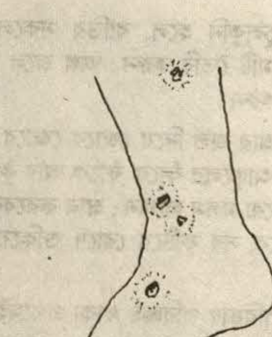
চিকিৎসা:

★ কেরোসিন আর মাথার তেল সমান পরিমাণে নিয়ে মেশান।
★ মেশানো তেলটা সন্ধ্যেবেলা লাগান।
★ এক এক গুছি চুল আলাদা করে নিয়ে মেশানো তেলটা লাগান, যাতে সব উকুন আর লিকির ওপর ওষুধ লাগে।
★ তেলটা লাগিয়ে একটা গামছা বা তোয়ালে দিয়ে মাথাটা জড়িয়ে রাখুন।
★ পরদিন, রিঠের জল দিয়ে চুল ধুয়ে সরু চিরুনি দিয়ে আঁচড়ান।
★ চিরুনি বুরুশে উকুন লেগে থাকলে যাতে মরে যায় সেজন্য সেগুলিকে কেরোসিন তেলে ডুবিয়ে রাখুন।
★ লিকির থেকে রক্ষা পাবার জন্য চুলটা গরম ভিনিগার ও জলে আধঘণ্টা ভিজিয়ে রাখার পর সরু দাঁতের চিরুনি দিয়ে ভালো করে আঁচড়ান।
★ ১০ দিন পর আবার এইভাবে লাগান।

ছোট ছোট পুঁজভর্তি ঘা

সাধারণতঃ পোকার কামড়, খোস বা অন্য কোনো ফুসকুড়ি নোংরা নখ দিয়ে চুলকোলে চামড়ার সংক্রমণ হয়ে ছোট ছোট পুঁজভর্তি ঘা হয়।

চিকিৎসা আর এড়ানো:



- সাবান আর ফোটানো জল দিয়ে ঘাগুলো ভালো করে ধুয়ে দিন, মামড়িগুলো সাবধানে ভিজিয়ে সরিয়ে দিন। যতদিন পুঁজ থাকবে, ততদিন রোজ এইরকম করবেন।
- ছোট ঘাগুলো বাতাসে খুলে রাখবেন। বড় ঘা হলে ব্যাণ্ডেজ করবেন। ব্যাণ্ডেজটা ঘনঘন বদলে দেবেন।
- যদি ঘায়ের চারপাশের চামড়া লাল আর গরম হয়, জ্বর থাকে, ঘাগুলো থেকে লাল দাগ বার হয়ে আসে অথবা লিম্ফের গুটি ফুলে যায়, তা হলে একটা এনটিবায়োটিক যেমন পেনিসিলিনের বড়ি (পৃঃ ৩৯৭) অথবা সালফা বড়ি (পৃঃ ৪০২) ব্যবহার করবেন।
- ঘা চুলকোবেন না। ওতে ঘা বেড়ে যায়, সংক্রমণও শরীরের অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে পারে। ছেলেপিলেদের নখ খুব ছোট করে কেটে দেবেন, অথবা তাদের হাতে দস্তানা বা মোজা পরিয়ে রাখবেন, যাতে তারা চুলকোতে না পারে।
- ছেলেপিলের ঘা বা কোনো চামড়ার সংক্রমণ হলে তাকে অন্য ছেলেপিলেদের সঙ্গে খেলতে বা শুতে দেবেন না। এই সংক্রমণগুলো সহজেই ছড়ায়।
- শিশুদের ঘা কঠিন কোনো সংক্রমণের লক্ষণ হতে পারে। শিশুকে স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে দেখান।

পাঁচড়া



এটা একটা জীবাণুর সংক্রমণ; এর থেকে যে ঘা হয় তা তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। ঘাগুলোয় চকচকে হলদে খোসা থাকে। এগুলি প্রায়ই ছেলেপিলেদের মুখে, বিশেষ করে ঠোঁটের পাশে হয়। ঘা বা দূষিত আঙুল থেকে পাঁচড়া সহজেই অন্য লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

চিকিৎসা:

- অসুস্থ জায়গাটা সাবান আর ফোটানো জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। খোসাগুলো সাবধানে ভিজিয়ে সরিয়ে দিন।
- ঘাগুলোয় জেনসিয়ান ভায়োলেট (পৃঃ ৪০৯) মাখিয়ে দিন বা পলিস্পোরিন (পৃঃ ৪০৯)-এর মত কোনো এনটিবায়োটিক মলম, বা টেট্রাসাইক্লিন ছাড়া আর কিছু না থাকলে তাইই লাগান।
- যদি সংক্রমণটা অনেকটা জায়গা ধরে ছড়ায় বা তার থেকে যদি জ্বর হয়, তবে পেনিসিলিনের বড়ি (পৃঃ ৩৯৭) দিন।

এড়ানো:

- নিজের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিধিগুলো (পৃঃ ১৬৭) মেনে চলুন। ছেলেপিলেদের রোজ স্নান করান আর ছারপোকা বা পোকার কামড় থেকে রক্ষা করুন। কোনো ছেলেপিলের চুলকুনি হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার চিকিৎসা করুন।
- কোনো ছেলেপিলের পাঁচড়া হলে তাকে অন্যদের সঙ্গে শুতে বা খেলতে দেবেন না। প্রথম লক্ষণ দেখা দিলেই চিকিৎসা শুরু করবেন।

ফোড়া বা এবসেস

সংক্রমণ থেকে চামড়ার নিচে পুঁজের থলি তৈরি হলে তাকে ফোড়া বলে। কখনো কখনো ফুটো করা ক্ষত বা নোংরা ছুঁচ দিয়ে দেয়া ইনজেকশন থেকে ফোড়া হয়। ফোড়ায় ব্যথা হয়, আর চারপাশের চামড়া লাল, গরম হয়ে যায়। এর থেকে লিম্ফের গুটি ফুলে যেতে আর জ্বর হতে পারে।

চিকিৎসা:

- ফোড়ার ওপর দিনে কয়েকবার গরম সেঁক দিন। (২৩৭ পৃষ্ঠার নির্দেশ দেখুন)।
- ফোড়াকে নিজে থেকে ফাটতে দেবেন। ফেটে যাবার পরেও গরম সেঁক চালিয়ে যাবেন। পুঁজ বেরিয়ে যেতে দেবেন, কিন্তু কখনো ফোড়া চেপে বা টিপে দেবেন না, কারণ তার থেকে শরীরের অন্য জায়গায় সংক্রমণ ছড়িয়ে যেতে পারে।
- ফোড়া থেকে লিম্ফের গুটি ফুলে গেলে বা জ্বর হলে, পেনিসিলিনের বড়ি (পৃঃ ৩৯৭) বা এরিথ্রোমাইসিন (পৃঃ ৪০০) দেবেন।

চুলকোনো র‍্যাশ, লম্বা দাগ বা চাক আমবাত (চামড়ায় এলার্জির প্রতিক্রিয়া)



যাদের এলার্জি আছে, তারা কয়েকটা জিনিস ছুঁলে, খেলে, ইনজেকশনে বা শ্বাসের সঙ্গে নিলে, তাদের চুলকুনি সমেত র‍্যাশ বা চাক হতে পারে। বিশদ বিবরণের জন্যে এলার্জির প্রতিক্রিয়া পৃঃ ২০৩ দেখুন।

চাক হল পুরু, উঁচু, ছোট বা বড় দাগড়া, এগুলো মৌমাছির কামড়ের মত দেখায় আর প্রচণ্ড চুলকোয়। চাক তাড়াতাড়ি আসে আর যায়, অথবা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়।

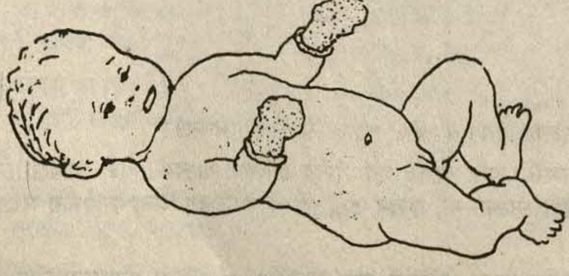
পেনিসিলিন, এমপিসিলিন, সালফা, ফেনোবারবিটাল, আর ঘোড়ার সিরাম থেকে তৈরি এনটিভেনিন বা এনটিটকসিন—এইসব ধরনের কয়েকটা ওষুধ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া হয় কি না লক্ষ্য রাখবেন। এগুলোর ইনজেকশন বিশেষ বিপজ্জনক হতে পারে। ইনজেকশন দেবার পর কয়েক মিনিট থেকে ১০ দিনের মধ্যে র‍্যাশ বা চাক বেরোতে পারে।

যদি কোনো ওষুধের ইনজেকশন নেবার পর আপনার গায়ে চুলকুনি সমেত র‍্যাশ বা চাক বেরোয়, বা অন্য কোনো এলার্জির প্রতিক্রিয়া হয়, সেই ওষুধ ব্যবহার করা বন্ধ করুন ; জীবনে আর কখনো ওটা ব্যবহার করবেন না !

এলার্জির শকের বিপদ (পৃ ৮৩) এড়াবার জন্যে এটা খুব জরুরি।

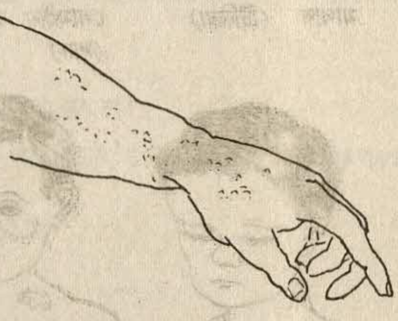
চুলকুনির চিকিৎসা :

- ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে দিন অথবা ঠাণ্ডা বা বরফের জলে কাপড় ভিজিয়ে ঠাণ্ডা সেঁক দিন।
- ঠাণ্ডা দালিয়ার (আধভাঙা গম) জলের সেঁকেও চুলকুনিতে আরাম হয়। দালিয়া জলে সেদ্ধ করে ছেঁকে, সেই জলটা ঠাণ্ডা করে ব্যবহার করবেন। (দালিয়ার বদলে মাড়ও ব্যবহার করা চলে।)
- চুলকুনি সাংঘাতিক হলে, ক্লোরফেনিরামাইন (পৃঃ ৪১৯)-এর মত কোনো এনটিহিসটামাইন ওষুধ খান।



- শিশু যাতে নিজের গা আঁচড়ে না ফেলে, তার জন্যে তার নখ খুব ছোট করে কেটে দেবেন অথবা তার হাতে দস্তানা বা মোজা পরিয়ে দেবেন।

যে সব গাছগাছড়া বা অন্যান্য জিনিস থেকে গায়ে চুলকুনি বা জ্বালা হয়—ছোঁয়া থেকে চামড়ায় সংক্রমণ



বিছুটি, 'জ্বালাধরানো গাছ', বিষাক্ত লতাপাতা আরো কয়েকরকম গাছগাছড়া গায়ে লাগলে সেগুলো থেকে চুলকুনি সমেত ফোসকা, পোড়া বা চাক হতে পারে। শুঁয়োপোকা বা অন্য পোকার রস বা লোম থেকেও একইরকম প্রতিক্রিয়া হয়।

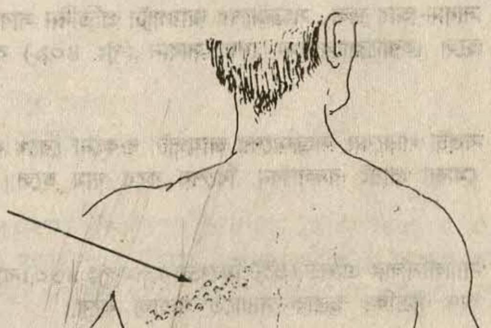
যাদের এলার্জি আছে, তারা কোনো কোনো জিনিস ছুঁলে বা গায়ে লাগালে, সেগুলো থেকে তাদের র‍্যাশ, রস পড়া ঘা বা দাগড়া হতে পারে। রবারের জুতো, হাত ঘড়ির ফিতে, কানের বা অন্য ওষুধ, মুখেমাখার ক্রীম, সুগন্ধি, বা সাবান থেকেও এইরকম সমস্যা হতে পারে।

চিকিৎসা :

যে সব জিনিস থেকে এইসব কষ্ট হয়, সেগুলোর ছোঁয়া আর না লাগলে কষ্টগুলো নিজে নিজেই চলে যায়। এসপিরিন বা এনটিহিসটামাইন ওষুধেও (পৃঃ ৪১৯) কাজ হতে পারে। সাংঘাতিক অবস্থা হলে, কর্টিসন বা কর্টিকো-স্টেরয়েড দেয়া ক্রীম (পৃঃ ৪০৯) ব্যবহার করতে পারেন।

হারপিস জোস্টার

লক্ষণ :



শরীরের একপাশে হঠাৎ এক লাইনে বা একঝাঁকে কতকগুলো যন্ত্রণাদায়ক ফোসকা হলে সেটা হারপিস হতে পারে। পিঠে, বুকে, ঘাড়ে বা মুখে সবথেকে বেশি দেখা যায়। ফোসকাগুলো সাধারণতঃ ২ বা ৩ সপ্তাহ থাকে, তারপর নিজে থেকে চলে যায়। কখনো কখনো ফোসকাগুলো চলে যাবার অনেকদিন পরেও ব্যথাটা থাকে বা ঘিরে আসে।

যে ভাইরাস থেকে জলবসন্ত হয়, তারাই হারপিসের কারণ ; যাদের আগে জলবসন্ত হয়ে গেছে, সাধারণতঃ তাদেরই হারপিস হয়। এটা বিপজ্জনক নয়। (তবে, বিশেষ করে বয়স্থ লোকদের বেলায়, কখনো কখনো এটা অন্য কোনো বেশি কঠিন রোগের—হয়তো ক্যানসারের—বিপদের কথা জানায়।)

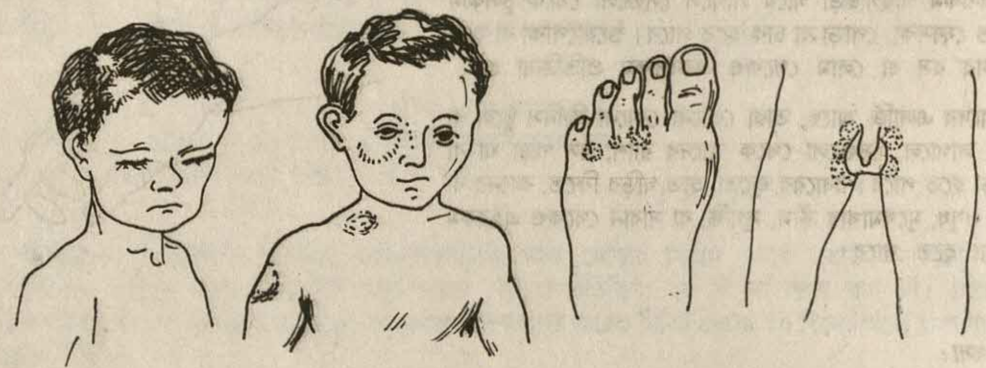
চিকিৎসা :

- র‍্যাশের ওপর হালকা ব্যাণ্ডেজ লাগান, যাতে জামাকাপড়ে ঘষা না লাগে।
- ব্যথার জন্যে এসপিরিন খান। (এনটিবায়োটিকে কাজ হয় না।)

দাদ, টিনিয়া, (ছত্রাকের সংক্রমণ)

শরীরের যে কোনো জায়গায় ছত্রাকের সংক্রমণ হতে পারে। তবে সবথেকে বেশি দেখা যায়:

মাথায় (টিনিয়া) *লোমহীন জায়গায় (দাদ)* *পায়ের বা হাতের আঙুলের ফাঁকে (হাজা)* *দুপায়ের ফাঁকে*



বেশির ভাগ ছত্রাকের সংক্রমণ আংটির আকারে বেড়ে ওঠে। এগুলো প্রায়ই চুলকোয়। মাথায় দাদ হলে গোল গোল খোসাসমেত দাগ হয়ে চুল পড়ে যেতে পারে। নখে ছত্রাকের সংক্রমণ হলে সেগুলো খসখসে আর পুরু হয়ে যায়।

চিকিৎসা:

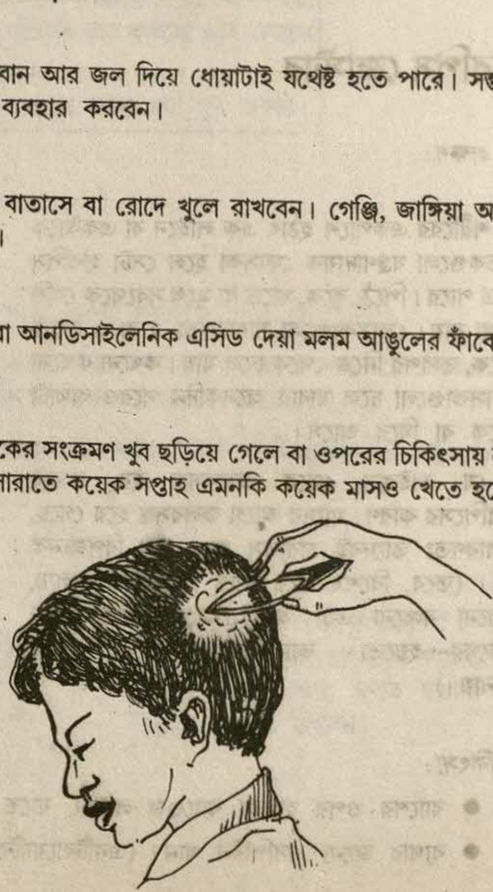
- সাবান আর জল: সংক্রমণের জায়গাটা প্রতিদিন সাবান আর জল দিয়ে ধোয়াটাই যথেষ্ট হতে পারে। সম্ভব হলে হেক্সাক্লোরোফিন দেয়া সাবান (পৃঃ ৪০৯) ব্যবহার করবেন।

- যতটা পারবেন, সংক্রমণের জায়গাটা শুকনো রেখে বাতাসে বা রোদে খুলে রাখবেন। গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া আর মোজা প্রায়ই বদলাবেন, বিশেষ করে ঘাম হলে।

- স্যালিসিলিক এসিড (হুইট ফিল্ডের মলম পৃঃ ৪১০) বা আনডিসাইলেনিক এসিড দেয়া মলম আঙুলের ফাঁকের আর কুঁচকির ছত্রাক সারাতে সাহায্য করে।

- মাথার টিনিয়া সাংঘাতিক হলে অথবা যে কোনো ছত্রাকের সংক্রমণ খুব ছড়িয়ে গেলে বা ওপরের চিকিৎসায় না কমলে গ্রিসিওফালভিন খাবেন। সংক্রমণ পুরোপুরি সারাতে কয়েক সপ্তাহ এমনকি কয়েক মাসও খেতে হতে পারে (পৃঃ ৪১০)।

- অনেক মাথার টিনিয়া ছেলেপিলের বয়ঃসন্ধির সময় (১১ থেকে ১৪ বছর) হলে পরিষ্কার হয়ে যায়। সাংঘাতিক সংক্রমণ হয়ে বড় বড় পুঁজভর্তি ফোলা দাগড়া হলে গরম জলের সেঁক দিয়ে চিকিৎসা করা উচিত (পৃঃ ২৩৭)। সংক্রমণের জায়গার সব চুল তুলে ফেলা দরকার।



কি ভাবে ছত্রাকের সংক্রমণ এড়াতে হয়:

দাদ এবং অন্যান্য ছত্রাকের সংক্রমণ ছোঁয়াচে (সহজে ছড়ায়)। ছেলেপিলেদের একজনের থেকে অন্যদের মধ্যে যাতে না ছড়ায় তার জন্যে:

- যার ছত্রাকের সংক্রমণ হয়েছে তাকে অন্যদের সঙ্গে শুতে দেবেন না।
- আগে ভালোভাবে না ধুয়ে, বা পরিষ্কার না করে, ছেলেপিলেকে এক চিরুনি, বা পরস্পরের জামাকাপড় ব্যবহার করতে দেবেন না।
- ছেলেপিলের সংক্রমণ হলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করাবেন।

মুখে আর গায়ে সাদা দাগ



ঘাড়ে, বুকে আর পিঠে, চারপাশের লাইনটা পরিষ্কার কিন্তু অসমান, গাঢ় বা হালকা রঙের যে সব ছোট ছোট দাগ দেখা যায়, সেগুলো টিনিয়া ভার্সিকালার (ছুলি) বলে একরকম ছত্রাকের সংক্রমণ হতে পারে। সাধারণতঃ এগুলো চুলকোয় না, ডাক্তারি মতে তেমন কিছু বিশেষ ব্যাপারও নয়।

চিকিৎসা:

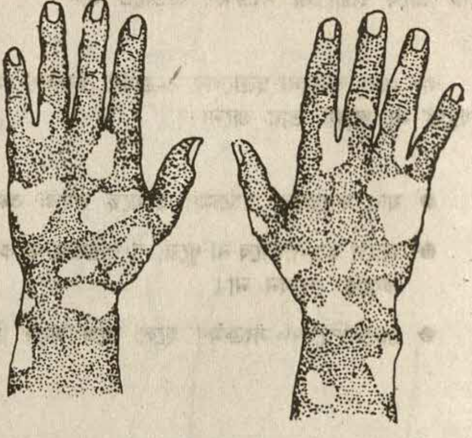
- সালফার তেল (১০ ভাগ তেলে ১ ভাগ সালফার দিয়ে একটা মলম তৈরি করে প্রতিদিন দাগগুলোতে লাগান, যতদিন না মিলিয়ে যায়।
- সোডিয়ামথিওসালফেট আরো ভালো কাজ করে। যারা ছবি তোলে তারা ছবি তৈরির সময় যে 'হাইপো' ব্যবহার করে, এটা সেই জিনিস। ১ গ্লাস জলে ১ বড় চামচ সোডিয়াম থিওসালফেট গুলে চামড়ায় লাগান। তারপর ভিনিগারে ভেজানো এক টুকরো তুলো দিয়ে জায়গাটা ঘষুন। এক মাস ধরে রোজ এইভাবে লাগান।
- দাগগুলো যাতে আবার না হয়, তার জন্যে সাধারণতঃ ২ সপ্তাহ অন্তর অন্তর চিকিৎসা করে যেতে হয়।



যে সব ছেলেপিলের রং কালো আর যারা রোদে বেশিক্ষণ থাকে, তাদের গালে আর এক ধরনের ছোট ছোট সাদাটে দাগ হয়। এগুলোর চারপাশের লাইনটা টিনিয়া ভার্সিকালারের মত অত পরিষ্কার নয়। এই দাগগুলো কোনো সংক্রমণ নয়,—তেমন কিছুই নয়। সাধারণতঃ ছেলেপিলেরা বড় হয়ে উঠলে এগুলো চলে যায়। কোনো চিকিৎসার দরকার হয় না।

লোকে অন্যরকম বিশ্বাস করলেও, এইসব সাদা দাগগুলোর কোনোটাই রক্তাল্পতার লক্ষণ নয়। টনিক বা ভিটামিন খেলে এগুলি যাবে না। যে দাগ শুধু গালে হয় তাদের জন্যে কোনো চিকিৎসাই লাগে না।

শ্বেতী (গায়ের কিছু কিছু জায়গা সাদা)



কোনো কোনো লোকের গায়ের কিছু কিছু জায়গা থেকে স্বাভাবিক রংটা চলে গেলে সাদা দাগ দেখা যায়। হাতে, পায়ে, মুখে আর শরীরের ওপর দিকে এগুলো সবথেকে বেশি দেখা যায়। এই স্বাভাবিক রঙের অভাবকে শ্বেতী বলে। এটা কোনো রোগ নয়। এটাকে বয়স্থ লোকদের পাকা চুলের সঙ্গে তুলনা করা চলে। কোনো চিকিৎসা কাজে লাগে না—দরকারও হয় না। তবে সাদা জায়গাগুলো জামাকাপড় বা জিঙ্ক অক্সাইডের মলম দিয়ে রোদ থেকে রক্ষা করা উচিত।

গায়ে সাদা দাগের অন্যান্য কারণ



কোনো কোনো রোগে শ্বেতীর মত দেখতে সাদা সাদা দাগ হয়।

কোনো সাদাটে দাগে আলপিন ফোটালে যদি সাড় না থাকে, তবে সেটা কুষ্ঠ হতে পারে (পৃঃ ২৩২)।

কয়েকটা ছত্রাকের সংক্রমণেও সাদাটে দাগ হয় (টিনিয়া ভার্সিকালার)।

পোয়াতি অবস্থার মুখোশ চিহ্ন



পোয়াতি অবস্থায় অনেক মেয়ের মুখে, স্তনে আর পেটের মাঝখানে নিচের দিক অবধি গাঢ় সবজে রঙের দাগ হয়। প্রসবের পর কখনো কখনো এগুলি চলে যায়, কখনো বা যায় না।

যে মেয়েরা জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি খায় তাদেরও কখনো কখনো এরকম দাগ হয়।

এগুলি একেবারে স্বাভাবিক ব্যাপার, কোনো দুর্বলতা বা অসুখ বোঝায় না। কোনো চিকিৎসার দরকার নেই।

পেলাগ্রা
এবং অপুষ্টির থেকে অন্যান্য চামড়ার সমস্যা

পেলাগ্রা একরকম অপুষ্টির রোগ যা চামড়ার আর কখনো কখনো হজমের ও স্নায়ুর ব্যবস্থারও—ক্ষতি করে।

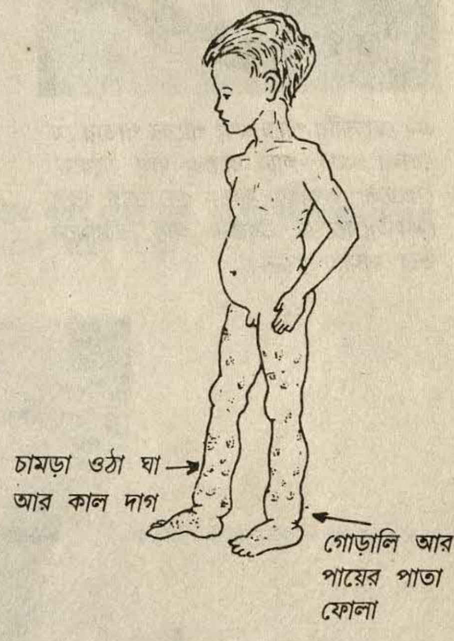
যে সব জায়গায় লোকে প্রচুর ভুট্টা এবং অন্য শর্করা জাতীয় খাবার খায়, অথচ যথেষ্ট বরবটি, মাংস, ডিম, তরিতরকারি এবং অন্য সব শরীর গড়বার বা রক্ষা করবার খাবার খায় না (পৃঃ ১২৮, ১২৯), সেখানে এ রোগ খুব বেশি দেখা যায়। শীতকালে, উত্তর ভারতের বেশির ভাগ লোক যবের, ভুট্টার আটার রুটি খায়। তাদের, রুটি তৈরি করার আগে কিছুটা গমের আটা মিশিয়ে নেয়া উচিত।

চামড়ায় অপুষ্টির লক্ষণ (পরের পৃষ্ঠায় ছবিগুলি দেখুন):

বড়দের পেলাগ্রা হলে চামড়া শুকিয়ে ফেটে যায়; যে সব জায়গায় রোদ লাগে, সেখানকার চামড়া রোদে পোড়ার মত হয়ে খসে যায়, বিশেষ করে:



ছেলেপিলেদের অপুষ্টি হলে পায়ের (কখনো কখনো হাতেরও) চামড়ায় কালসিটের মত কালচে দাগ—কখনো কখনো চামড়া ওঠা ঘাও—হতে পারে; পা দুটি ফুলে যেতে পারে (পৃঃ ১৩৩)।



এইসব অবস্থায়, সাধারণতঃ অপুষ্টির অন্য সব লক্ষণও থাকে: পেট ফোলা; ঠোঁটের কোণে ঘা; লাল, ব্যথা করা জিভ; দুর্বলতা; খিদে চলে যাওয়া; ওজন না বাড়া ইত্যাদি (পরিচ্ছেদ ১১ পৃঃ ১৩৩ দেখুন)।

চিকিৎসা:

- পুষ্টিকর খাবার খেলে পেলাগ্রা সারে। প্রতিদিন বরবটি, মুসুরি, চিনেবাদাম বা কিছু মুরগি, মাছ, ডিম, মাংস বা ছানা খাওয়া উচিত। উপায় থাকলে, ভুট্টার বদলে গম (খোসাসমেত হলে আরো ভালো) খাওয়া বেশি ভালো।

- সাংঘাতিক পেলাগ্রা বা অন্য ধরনের অপুষ্টির জন্যে ভিটামিন খেলে কাজ হতে পারে; কিন্তু **ভালো খাবারের দরকার অনেক বেশি**। যে ভিটামিনের ওষুধ ব্যবহার করবেন, দেখবেন তাতে যেন বেশি করে বি-ভিটামিনগুলো, বিশেষ করে নিয়াসিন, থাকে। মদ তৈরির খামি থেকে ভালো বি ভিটামিন পাওয়া যায়।



ছেলেটি ভালো খাওয়াদাওয়া শুরু করার আগে

এবং পরে



এই ছেলেটির পায়ে এবং পায়ের পাতায় যে ফোলা আর গাঢ় রঙের দাগ রয়েছে, সেগুলো অপুষ্টির ফল। সে বেশি ভুট্টা (মকাই)খেয়েছে, প্রোটিন আর ভিটামিনে ভরা খাবার খায়নি।

ভুট্টার সঙ্গে ডিম আর বরবটি খেতে শুরু করার এক সপ্তাহ পর ফোলা চলে গেছে, দাগগুলোও প্রায় নেই।



এই মেয়েটির পায়ের 'পোড়া' দাগগুলো পেলাগ্রার লক্ষণ—ভালো খাওয়াদাওয়া না করার ফলে এটা হয় (পৃঃ ২৪৯)।

আঁচিল

বেশির ভাগ আঁচিল, বিশেষ করে ছেলেপিলেদের বেলায়, ৩ থেকে ৫ বছর থাকে, আর নিজে থেকেই চলে যায়। পায়ের তলায় চ্যাপ্টা যন্ত্রণাদায়ক আঁচিলের মত দাগ সাধারণতঃ 'প্ল্যান্টার আঁচিল'। (কিংবা কড়াও হতে পারে। নিচে দেখুন।)



চিকিৎসা:

- সাধারণতঃ ঝাড়ফুঁক বা ঘরোয়া চিকিৎসায় আঁচিল দূর হয়। কিন্তু কড়া এসিড বা বিষাক্ত গাছগাছড়া ব্যবহার করবেন না, কারণ তা থেকে এমন পোড়া বা ঘা হতে পারে, যা আঁচিলের থেকে অনেক খারাপ।
- যন্ত্রণাদায়ক প্ল্যান্টার আঁচিল হলে, স্বাস্থ্যকর্মী কখনো কখনো তা কেটে দিতে পারেন।

কড়া

কড়া হল চামড়ার শক্ত পুরু অংশ। চটি বা জুতো যেখানে চামড়ার ওপর ঠেলা দেয়, বা পায়ের একটা আঙুল আরেকটাকে চাপ দেয়, সেখানে কড়া হয়। এগুলো খুব যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে।

চিকিৎসা:

- কড়ার ওপর চাপ দেয় না এমন চটি বা জুতো পরবেন।
- চাপের জায়গার নিচে একটা তুলো বা স্পঞ্জের গদি রাখবেন।
- কড়ার ব্যথা কমাতে এইরকম করুন:

১· অল্প গরম জলে ১৫ মিনিট পা ডুবিয়ে রাখুন।



২· উখো দিয়ে কড়াটা ঘষে পাৎলা করে দিন।



নানা ধরনের ব্রণ



অল্পবয়সীদের বিশেষ করে যাদের চামড়ায় বেশি তেল থাকে—কখনো কখনো মুখে, বুকে বা পিঠে ব্রণ হয়। কখনো কখনো সেগুলো বেশ টনটন করে, বড় হয়, সংক্রমিত হয়।

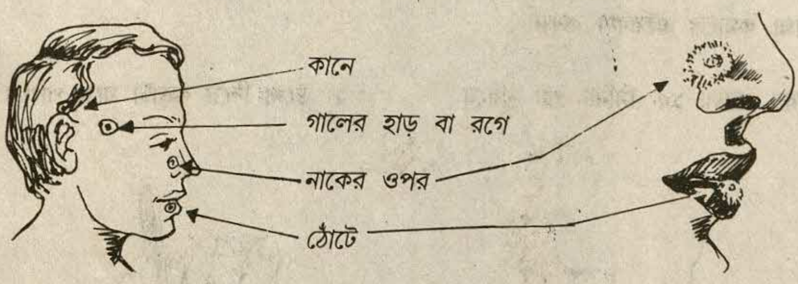
কোনো ব্রণ খুঁটবেন না বা ছোঁবেন না। নাকের ওপরের আর মুখের চারপাশের ব্রণ খোঁটা বা ছোঁয়া বিশেষ বিপজ্জনক।

চিকিৎসা:

- দিনে দুবার সাবান আর গরম জল দিয়ে মুখ ধোবেন।
- সূর্যের আলো ব্রণ সারাতে সাহায্য করে। শরীরে যে সব জায়গায় ব্রণ বেরিয়েছে, সেখানে রোদ লাগতে দেবেন।
- যতটা সম্ভব ভালো খাবেন, প্রচুর জল খাবেন, যথেষ্ট ঘুমোবেন।
- বাড়াবাড়ি অবস্থায়, পুঁজের দলা বা গর্ত হয়ে গেলে, এবং যে সব ব্যবস্থার কথা বলা হল তাতে না কমলে, টেট্রাসাইক্লিনে কাজ হতে পারে।

চামড়ার ক্যানসার

যে সব ফর্সা লোক রোদে অনেকক্ষণ থাকে, তাদের মধ্যে চামড়ার ক্যানসার সবথেকে বেশি দেখা যায়। সাধারণতঃ শরীরের যে সব জায়গায় সবথেকে বেশি রোদ লাগে, সেখানেই এটা হয়, বিশেষ করে:



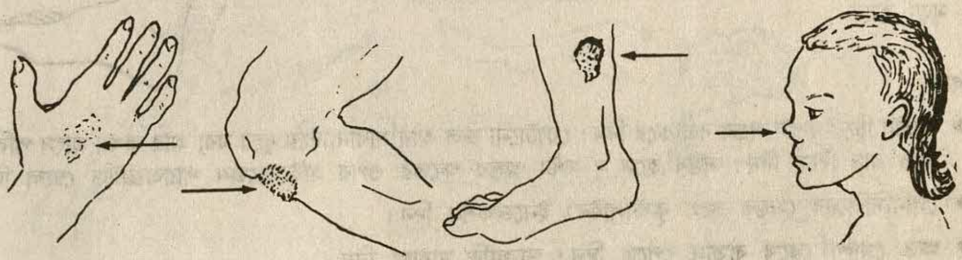
চামড়ার ক্যানসার নানা ধরনের হতে পারে। সাধারণতঃ মুক্তোর মত রঙের, মাঝে ফুটো দেয়া একটা ছোট্ট আংটির মত শুরু হয়। ধীরে ধীরে বাড়ে।

সময়ে চিকিৎসা করলে বেশির ভাগ চামড়ার ক্যানসার বিপজ্জনক হয় না। ওগুলো বাদ দিতে অপারেশনের দরকার হয়। যদি আপনার কোনো পুরোনো ঘা থাকে, যা ক্যানসার হতে পারে, তবে স্বাস্থ্যকর্মীকে দেখাবেন।

চামড়ার ক্যানসার এড়াতে হলে, ফর্সা লোকদের সবসময় টুপি পরে বা অন্যভাবে রোদ থেকে নিজেদের বাঁচানো উচিত। যাদের চামড়ার ক্যানসার হয়ে গেছে, অথচ রোদে কাজ করতে হয়, তারা নিজেদের বাঁচাবার জন্যে বিশেষ মলম কিনে নিতে পারেন। জিঙ্ক অক্সাইডের মলম সস্তা, কাজও করে ভালো।

চামড়ার বা লিম্ফের গুটির যক্ষ্মা

যে জীবাণু ফুসফুসের যক্ষ্মা ঘটায়, তারাই কখনো কখনো চামড়াকে আক্রমণ করে; তার থেকে কতকগুলো যন্ত্রণাহীন অবস্থার সৃষ্টি হয়। যেমন—



সাধারণতঃ চামড়ার যক্ষ্মা ধীরে ধীরে বাড়ে, অনেক দিন থাকে, অনেক মাস বা বছর ধরে ঘুরে ঘুরে হয়। প্রায়ই, রোগটা ধরা শক্ত হয়।

এছাড়া, যক্ষ্মা কখনো কখনো লিম্ফের গুটিগুলোকে আক্রমণ করে—বিশেষ করে ঘাড়ের বা কণ্ঠার হাড়ের পেছনে, অথবা ঘাড় আর কাঁধের মাঝে। গুটিগুলো বড় হয়ে ফেটে যায়, পুঁজ পড়ে, কিছুদিনের জন্যে বুজে যায়, তারপর আবার ফেটে পুঁজ পড়ে। সাধারণতঃ যন্ত্রণা থাকে না।



চিকিৎসা:

কোনো পুরোনো ঘা, আলসার বা ফোলা লিম্ফের গুটি থাকলে ডাক্তারি পরামর্শ নেয়া সবথেকে ভালো। কারণটা জানতে হলে কিছু পরীক্ষার দরকার হতে পারে। চামড়ার যক্ষ্মার চিকিৎসা ফুসফুসের যক্ষ্মার চিকিৎসার (পৃঃ ২২০) মতই হয়। সংক্রমণ যাতে আবার না হয় তার জন্যে, চামড়া সুস্থ দেখানোর পরেও অনেকদিন ধরে ওষুধ খেয়ে যেতে হবে।

ইরিসিপেলাস

এটা চামড়ার একটা খুব যন্ত্রণাদায়ক, তীব্র সংক্রমণ। এর থেকে একটা গরম, লাল, ফোলা দাগড়া তৈরি হয়, তার চারপাশের লাইনটা খুব পরিষ্কার দেখা যায়। ফোলা দাগড়াটা চামড়ার ওপর খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। প্রায়ই মুখের ওপর—নাকের ধারে শুরু হয়। এর থেকে প্রায়ই ফোলা লিম্ফের গুটি, জ্বর আর শীত করে কাঁপুনি হয়।



চিকিৎসা:

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসা শুরু করুন। এনটিবায়োটিক ব্যবহার করুন: পেনিসিলিনের বড়ি,—দিনে ৪০০ ইউনিট করে ৪ বার; কঠিন অবস্থায় প্রোকেন পেনিসিলিনের ইনজেকশন,—রোজ ৮০০,০০০ ইউনিট (পৃঃ ৩৯৯)। সংক্রমণের সমস্ত লক্ষণ চলে যাবার পরে আরো ২ দিন এনটিবায়োটিকটা ব্যবহার করবেন। এছাড়া গরম সেঁক নিন, আর ব্যথার জন্যে এসপিরিন খান।

গ্যাংগ্রিন বা পচা ঘা (গ্যাস গ্যাংগ্রিন)



এটা ক্ষতের একটা খুবই বিপজ্জনক সংক্রমণ। এতে দুর্গন্ধযুক্ত ছাই বা খয়েরি রঙের রস হয়। ক্ষতের কাছের চামড়াতে কালচে ফোসকা আর মাংসের মধ্যে বুদবুদ থাকতে পারে। আঘাত পাওয়ার পর ৬ ঘণ্টা থেকে ৩ দিনের মধ্যে সংক্রমণ শুরু হয়। এটা চট করে বেড়ে যায়, আর তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। চিকিৎসা না করলে এর থেকে কয়েকদিনের মধ্যে মৃত্যু হয়।

চিকিৎসা :

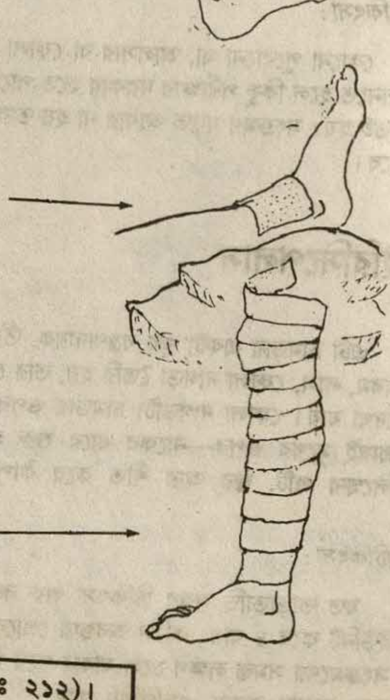
- ক্ষতটা চিরে যতটা সম্ভব বড় করে দিন। ফোটানো জল আর সাবান দিয়ে ধুয়ে মরা আর জখম মাংস পরিষ্কার করে বাদ দিয়ে দিন। সম্ভব হলে দু ঘণ্টা অন্তর ক্ষতের ওপর হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ঢেলে দিন।
- পেনিসিলিনের (সম্ভব হলে কৃস্টালাইন) ইনজেকশন দিন।
- **ক্ষত খোলা রেখে বাতাস পেতে দিন। ডাক্তারি সাহায্য নিন।**

রক্ত চলাচলের অসুবিধে থেকে চামড়ার আলসার



চামড়ার আলসার বা বড় খোলা ঘায়ের অনেক কারণ থাকে (পৃঃ ২৩৮)। তবে বয়স্থ লোকদের গুলফের পুরোনো ঘা, বিশেষ করে যে সব মেয়েদের ভেরিকোজ শিরা আছে তাদের বেলায়, সাধারণতঃ ঠিকমত রক্ত চলাচল না হওয়ার জন্যেই হয়। পায়ের মধ্যে দিয়ে রক্তটার যত তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার, তা যায় না। এইধরনের ঘা খুব বড় হয়ে যেতে পারে। ঘায়ের চারপাশের চামড়া গাঢ় নীল রঙের, চকচকে আর খুব পাৎলা হয়ে যায়। পায়ের পাতা প্রায়ই ফুলে যায়।

চিকিৎসা :

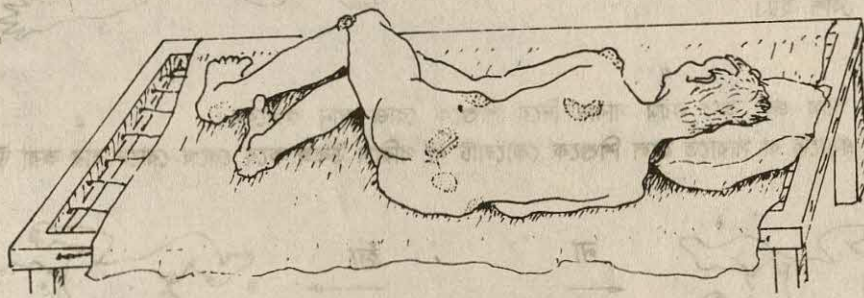


- এইসব ঘা খুব ধীরে ধীরে, খুব যত্ন নিলে তবেই, সারে। সবথেকে জরুরি : **পাটা উঁচু করে রাখুন—যতটা উঁচুতে, যতবার রাখা যায়, রাখবেন। বালিশে পা রেখে ঘুমোবেন। দিনের বেলা, ১৫ বা ২০ মিনিট পরে পরে পা উঁচু করে বিশ্রাম নিয়ে নেবেন। হাঁটলে রক্ত চলাচল বাড়ে, কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে বা পা ঝুলিয়ে বসে থাকলে ক্ষতি হয়।**
- ঘায়ের ওপর অল্প নুন দেয়া জলের গরম সেঁক নেবেন—১ লিটার ফোটানো জলে ১ চা চামচ নুন দেবেন। জীবাণুমুক্ত গজ বা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ঘাটা আলগা করে ঢেকে রাখবেন। **ঘা পরিষ্কার রাখবেন।**
- ইলাস্টিক মোজা বা ব্যাণ্ডেজ দিয়ে ভেরিকোজ শিরা ধরে রাখবেন। ঘা সেরে গেলেও এগুলো ব্যবহার করে যাবেন, পা উঁচু করে রাখাটাও চালিয়ে যাবেন। ঘায়ের নরম দাগে যাতে চুলকে বা লাগিয়ে না ফেলেন—সেদিকে খুব যত্ন নেবেন।

সময়ে ভেরিকোজ শিরার যত্ন নিয়ে চামড়ার আলসার এড়ান (পৃঃ ২১২)।

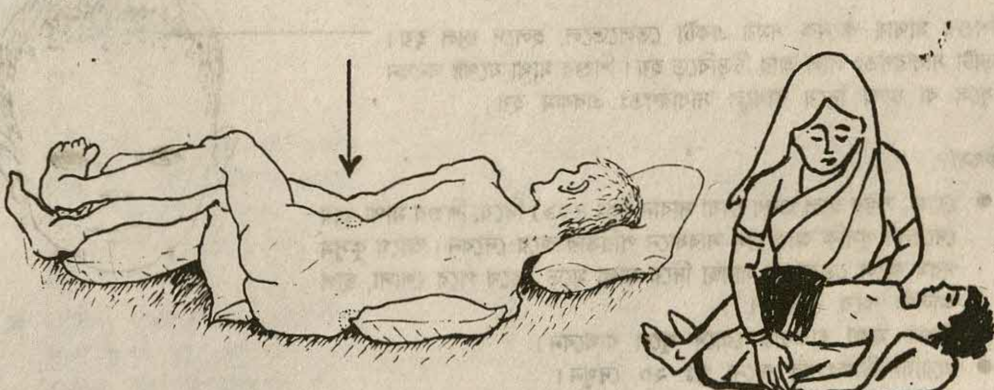
বিছানা ঘা

যে সব লোক এত অসুস্থ যে বিছানায় পাশ ফিরতেও পারে না, বিশেষতঃ যে সব অসুস্থ বুড়োমানুষ খুব রোগা আর দুর্বল হয়, তাদের গায়ে এই পুরোনো খোলা ঘাগুলো হয়। শরীরের যে সব জায়গায় হাড় বেশি উঁচু সেখানের চামড়ায় বিছানার চাপ পড়ে ঘাগুলো হয়। পাছায়, পিঠে, কনুইয়ে বা পায়ের পাতায় বেশি দেখা যায়।



বিছানার ঘা কি ভাবে এড়াতে হয়:

- ঘণ্টায় ঘণ্টায় রোগীকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিন: চিৎ, উপুড় বা এপাশ থেকে ওপাশ করে।
- প্রতিদিন স্নান করিয়ে মালিশের এলকোহল দিয়ে তার গা ঘষে দিন।
- নরম বিছানার চাদর আর গদি ব্যবহার করুন। সেগুলি প্রতিদিন, তাছাড়া পেচ্ছাপ, মল, বমি ইত্যাদিতে নোংরা হলেই বদলে দেবেন।
- রোগীর শরীরের নিচে এমনভাবে বালিশ রাখুন যাতে হাড়ের জায়গাগুলো কম ঘষা পায়।



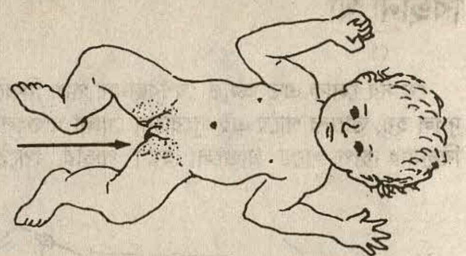
- রোগীকে যতটা সম্ভব ভালো খাওয়ান। ভালোভাবে খাওয়াদাওয়া না করলে, বাড়তি ভিটামিনে কাজ হতে পারে (পৃঃ ১৩৯)।
- শিশুর কোনো কঠিন পুরোনো রোগ হলে মায়ের তাকে ঘনঘন কোলে নেয়া উচিত।

চিকিৎসা:

- ওপরে যা যা বলা হয়েছে সবগুলি করুন।
- ফোটানো জল অল্প নুন বা হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড মিশিয়ে তা দিয়ে ঘাগুলো ধুয়ে দিন। জীবাণুমুক্ত গজের ব্যাণ্ডেজ দিয়ে ঘাগুলো রক্ষা করুন।

শিশুদের চামড়ার সমস্যা

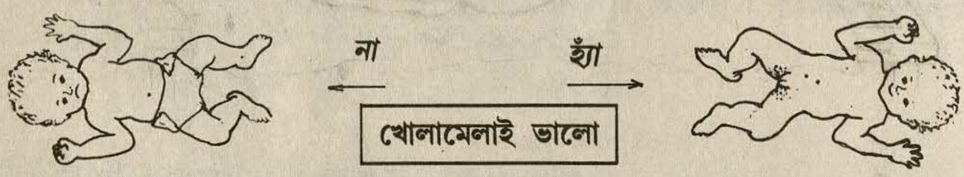
ন্যাপকিন র‍্যাশ



ন্যাপকিন (কোলোট) বা বিছানায় যে পেচ্ছাপ থাকে তার থেকে শিশুর দু পা বা পাছার ফাঁকে লালচে ফোলা ফোলা দাগড়া হতে পারে। প্লাস্টিকের কোলোট ব্যবহার করলে এটা বেশি হয়।

চিকিৎসা :

- কুসুম গরম জল আর নরম সাবান দিয়ে শিশুকে রোজ স্নান করাবেন।
- **র‍্যাশ এড়াতে বা সারাতে হলে শিশুকে কোলোট না পরিয়ে উলঙ্গ করে রেখে রোদে বার করা উচিত।**



- **কোলোট ব্যবহার করলে, ঘনঘন বদলে দেবেন। কোলোট কেচে একটু ভিনিগার দেয়া জল দিয়ে ধুয়ে দেবেন।**
- **র‍্যাশ চলে গেলে তবেই গায়ের পাউডার লাগাবেন।**
- **প্লাস্টিকের কোলোট ব্যবহার করবেন না।**

শিশুর মাথায় চাপ খুসকি

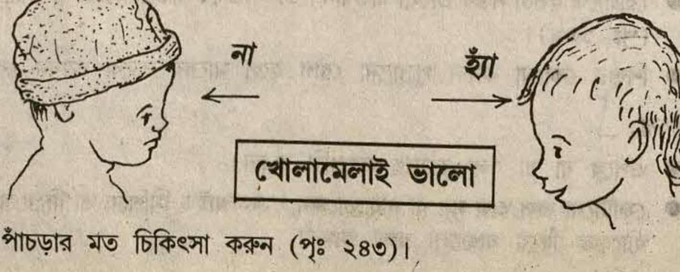


শিশুর মাথায় অনেক সময় একটা তেলতেলে, হলদে ছাল হয়। চামড়াটা সাধারণতঃ লাল আর চিড়বিড়ে হয়। শিশুর মাথা যথেষ্ট ঘনঘন না ধুলে বা ঢাকা দিয়ে রাখলে সাধারণতঃ এরকম হয়।

চিকিৎসা :

- রোজ, সম্ভব হলে ওষুধ দেয়া সাবান (পৃঃ ৪০৯) দিয়ে, শিশুর মাথা ধুয়ে দেবেন। খুসকি আর ছাল সাবধানে পরিষ্কার করে দেবেন। আগে কুসুম গরম জলে ভেজানো গামছা দিয়ে মাথা মুড়ে রেখে পরে খোসা, ছাল আলগা করে নেবেন।
- শিশুর মাথা হাওয়ায় রোদে খুলে রাখবেন।
- ঘরোয়া চিকিৎসার জন্যে পৃঃ ২০ দেখুন।

টুপি বা কাপড় দিয়ে শিশুর মাথা ঢাকা দেবেন না। মাথা খুলে রাখুন।



- সংক্রমণের লক্ষণ থাকলে, পাঁচড়ার মত চিকিৎসা করুন (পৃঃ ২৪৩)।

একজিমা (লাল দাগড়ার ওপর ছোট ছোট ফোসকা)



লক্ষণ:

- ছোট ছেলেপিলেদের বেলায়: গালে বা কখনো কখনো ওপর বা নিচের হাতে লাল দাগ বা র‍্যাশ হয়। র‍্যাশে ছোট ছোট ঘা বা ফোসকা থাকে, সেগুলো ফেটে রস পড়ে।
- বড় ছেলেপিলে আর বয়স্কদের বেলায় একজিমা সাধারণতঃ আরো শুকনো হয়, আর হাঁটুর পেছনে আর কনুইয়ের ভেতর বেশি দেখা যায়।
- এ রোগ সংক্রমণ হিসেবে শুরু হয় না, বরং অনেকটা এলার্জির প্রতিক্রিয়ার মত হয়।

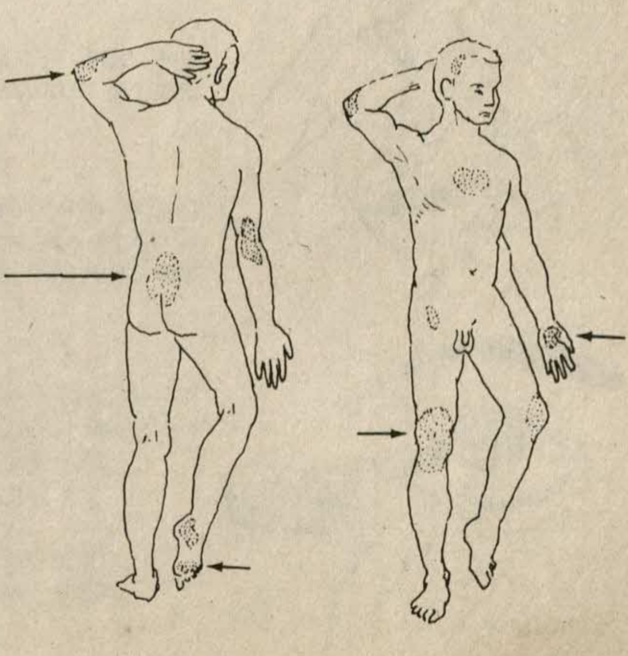
চিকিৎসা:

- র‍্যাশের ওপর ঠাণ্ডা সেঁক দিন।
- সংক্রমণের লক্ষণ দেখা দিলে (পৃঃ ১০১) পাঁচড়ার মত চিকিৎসা করুন (পৃঃ ২৪৩)।
- দাগগুলোর ওপর রোদ পড়তে দিন।
- কঠিন অবস্থায় কর্টিসন বা কর্টিকো-স্টেরয়েড মলম (পৃঃ ৪০৯) ব্যবহার করুন।
- একজিমার দাগড়াটা ভিজে হলে, তার ওপর তিসির তেল লাগান। এতে চামড়া শুকোতে দেয় না, চুলকুনিও কমে। সরষের তেল লাগাবেন না।

সোরিয়াসিস

লক্ষণ:

- সাদাটে বা রূপোলি রঙের খোসা দিয়ে ঢাকা মোটা খসখসে চামড়া, ছবিতে যেখানে যেখানে দেখানো হয়েছে সে সব জায়গায় বেশি দেখা যায়।
- রোগটা সাধারণতঃ অনেকদিন থাকে অথবা ঘুরে ঘুরে হয়। এটা সংক্রমণ নয়, বিপজ্জনকও নয়।

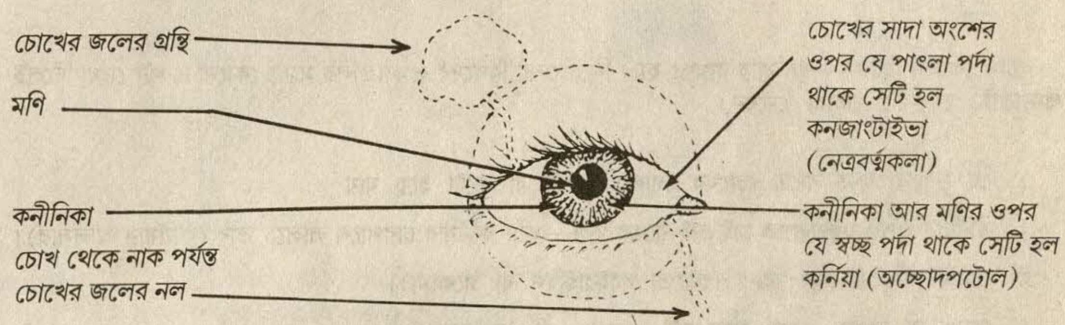


চিকিৎসা:

- অসুস্থ জায়গাটা রোদে খুলে রাখলে সাধারণতঃ কাজ হয়।
- কর্টিকো-স্টেরয়েড (পৃঃ ৪০৯) বা আলকাৎরা দেয়া মলমে কাজ হতে পারে।
- বাড়াবাড়ি অবস্থা হলে ডাক্তারি পরামর্শ নেবেন।

পরিচ্ছেদ

১৬ চোখ



চোখের ঠিকমত যত্ন নেয়া

চোখ কোমল জিনিস, খুব যত্নে রাখতে হয়। ঠিকমত যত্ন না নিলে চোখের সংক্রমণ খুব সহজে ছড়ায়।



১· পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে চোখ দুটি পরিষ্কার রাখুন। শোবার সময় চোখ ধোয়া খুব ভালো, তাতে সারাদিনের জমা ময়লা আর ধুলো চলে যায়।

২· চোখ মোছার জন্যে সর্বদা পরিষ্কার কাপড় ব্যবহার করবেন। শাড়ি, ধুতি বা জামার হাতা দিয়ে চোখ মুছবেন না, এতে চোখে কঠিন সংক্রমণ হতে পারে। এইভাবেই ট্র্যাকোমা (পৃঃ ২৬৪) আর কনজাংটিভাইটিস (পৃঃ ২৬০) ছড়ায়।

৩· চোখ মুছতে, প্রত্যেকের আলাদা আলাদা কাপড়, গামছা বা রুমাল ব্যবহার করা উচিত। এক চোখে আগেই সংক্রমণ হয়ে থাকলে অন্য চোখের জন্যে আলাদা পরিষ্কার কাপড় ব্যবহার করুন।



৪· কাজল বা সুর্মা পরবার সময় প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আঙুল বা কাঠি ব্যবহার করবেন। পরাবার পর কৌটোটা ঢাকা দিয়ে রাখবেন, যাতে ধুলো না পড়ে।

৫· চোখে কোনো সংক্রমণ হলে স্বাস্থ্যকর্মীকে দেখাবেন। রাস্তার ধারের বিক্রিওয়ালার কাছে ওষুধ নিয়ে লাগাবেন না। ওগুলোতে কাজ না হতেই পারে, এমনকি অন্ধও হয়ে যেতে পারেন।



৬· লাল নটে, পালং, সজনে আর অন্য সব ঘন সবুজ রঙের শাকসবজি আর পেঁপে আর আমের মত ফল খান। এগুলিতে 'এ' ভিটামিন থাকে—যেটা চোখের পক্ষে খুব ভালো। এগুলি খেলে রাতকানা হওয়া এড়ানো যায়।

বিপদের লক্ষণ

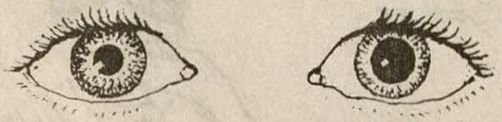
চোখ কোমল জিনিস—খুব যত্নে রাখতে হয়। নিচে দেয়া বিপদের লক্ষণগুলির মধ্যে কোনো একটা দেখা দিলেই তাড়াতাড়ি ডাক্তারি সাহায্য নেবেন।

১· যে কোনো ক্ষত যাতে চোখের গোলক কেটে বা ফুটো হয়ে যায়

২· কর্নিয়ার ওপর যন্ত্রণাদায়ক ছাই ছাই রঙের দাগ—সঙ্গে কর্নিয়ার চারপাশে লালচে ভাব (কর্নিয়ার আলসার)।

৩· চোখের ভেতরে খুব যন্ত্রণা (হয়তো আইরাইটিস বা গ্লকোমা)।

৪· চোখে বা মাথায় ব্যথার সঙ্গে দুটি চোখের মণি ছোটবড় হওয়া।



মগজের ক্ষতি, সন্ন্যাসরোগ, চোখে আঘাত, গ্লকোমা বা আইরাইটিস থেকে চোখের মণি দুটি ছোটবড় হতে পারে। (কয়েকজনের স্বাভাবিকভাবেই অল্প ছোটবড় থাকে।)

৫· এক বা দুটি চোখে দৃষ্টি কমে আসা।

৬· চোখের যে কোনো সংক্রমণ বা প্রদাহ যা এনটিবায়োটিক চোখের মলম দিয়ে ৫/৬ দিন চিকিৎসা করলেও কমে না।

চোখে আঘাত লাগা

চোখের গোলকের ওপর যে কোনো আঘাতকেই বিপজ্জনক বলে ধরা উচিত, কারণ তা থেকে লোকে অন্ধ হয়ে যেতে পারে।

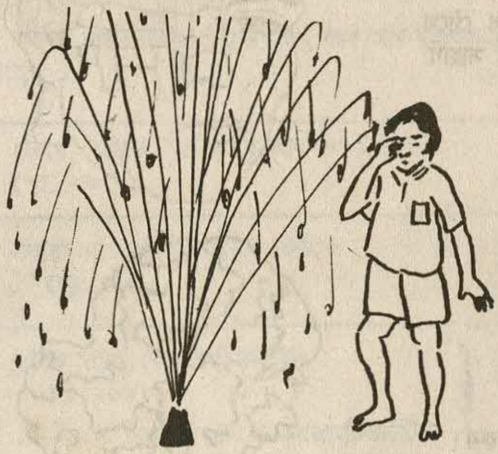
ঠিকমত যত্ন না নিলে **কর্নিয়ার** (মণি আর কনীনিকার ওপরের স্বচ্ছ পর্দা) ওপর ছোটখাট কাটাতেও সংক্রমণ হয়ে দৃষ্টির ক্ষতি করতে পারে।

চোখের গোলকের ক্ষত যদি গভীর হয়, সেটা বিশেষ বিপজ্জনক।

যদি কোনো ভোঁতা আঘাতে (যেমন মুঠির ঘা) চোখ রক্তে ভরে যায়, সেটা চোখের পক্ষে বিপজ্জনক (পৃঃ ২৭০)। যদি কয়েকদিন পর হঠাৎ ব্যথা বেশি বেড়ে যায়, তবে বিপদ খুব বেশি, কারণ সেটা হয়তো তীব্র গ্লকোমা (পৃঃ ২৬৭)।

এই সব থেকে আঘাত আসতে পারে :

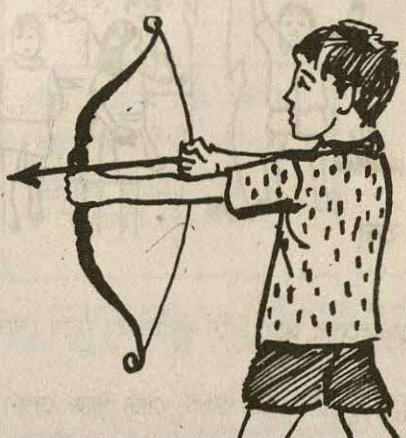
★ সাবধান না হয়ে বাজি পোড়ালে চোখে আঘাত লেগে চিরকালের মতো ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

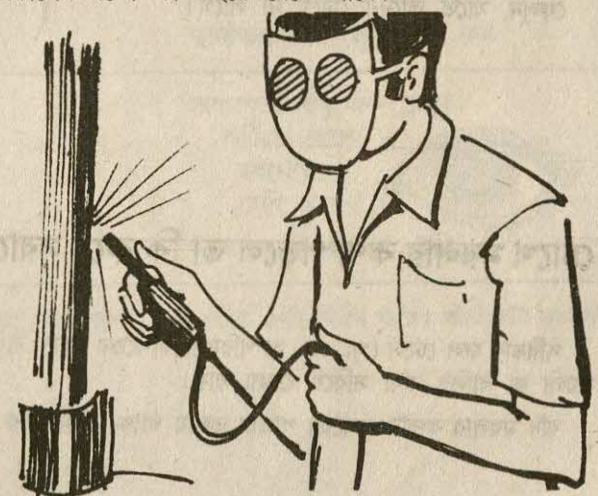




★ গুলি ডাণ্ডা সকলেই খেলে—এটা কিন্তু বিপজ্জনক হতে পারে। গুলির খোঁচা মুখ দুটি চোখের ক্ষতি করতে পারে।

★ অসাবধানে তীর ধনুক নাড়াচাড়া করলে চিরকালের মতো ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।





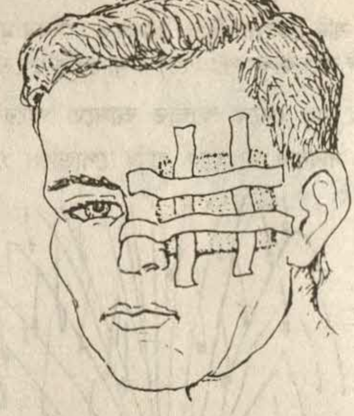
★ ওয়েলডিং (লোহা ইত্যাদি জোড়া) করার সময় বিশেষভাবে তৈরি কালো চশমা না পরলে ফুল্‌কি থেকে চোখের ক্ষতি হতে পারে।

★ এসিড ইত্যাদি অসাবধানে নাড়াচাড়া করলেও চোখের ক্ষতি হতে পারে।

★ মুঠির মতো কোনো ভোঁতা জিনিসের আঘাত থেকে চোখে জখম হতে পারে।

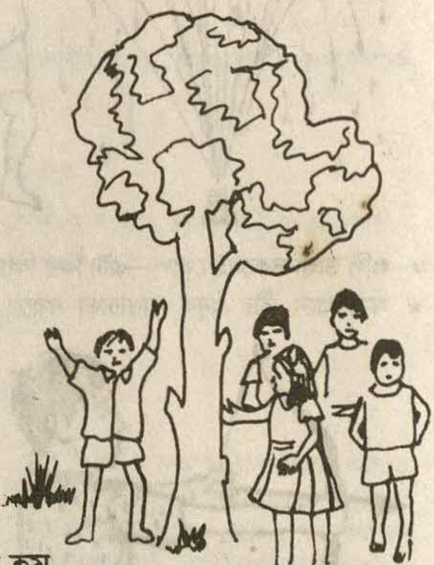
চিকিৎসা :

- আঘাত পাওয়া চোখ দিয়ে লোকটি যদি তখনো ভালোভাবে দেখতে পায়, তবে সেই চোখে একটা এনটিবায়োটিক মলম (পৃঃ ৪১৩) লাগিয়ে নরম, পুরু ব্যাণ্ডেজ দিয়ে চোখটা ঢেকে রাখুন। দু এক দিনের মধ্যে চোখ ভালো না হলে ডাক্তারি সাহায্য নিন।



● যদি লোকটি আঘাত পাওয়া চোখ দিয়ে ভালোভাবে দেখতে না পায়; যদি ক্ষতটা গভীর হয় বা যদি চোখের ভেতরে কর্নিয়ার পেছনে রক্ত থাকে (পৃঃ ২৭০), তবে পরিষ্কার ব্যাণ্ডেজ দিয়ে চোখটা ঢেকে তখনি ডাক্তারি সাহায্য নিন।

● চোখের গোলকের ওপর কাঁটা বা চোঁচ শক্তভাবে গেঁথে থাকলে তা তুলে ফেলতে চেষ্টা **না** করে ডাক্তারি সাহায্য নিন।



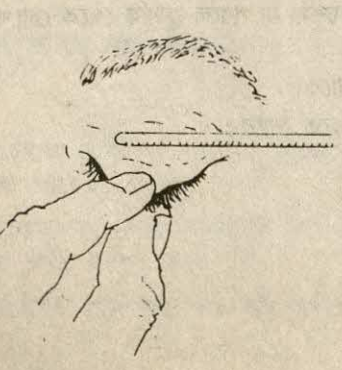
আঘাত এড়ানো:

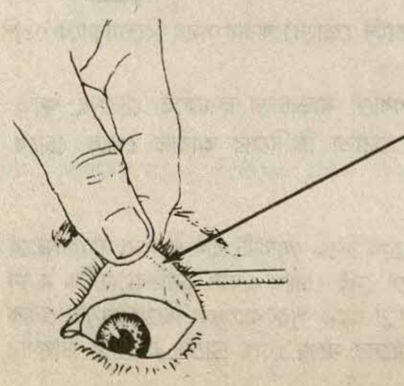
★ রান্না করার সময় আগুন থেকে দূরে বসুন।
★ ওয়েলডিং করার সময় বিশেষ ধরনের কালো চশমা পরুন।
★ এসিড ইত্যাদি নাড়াচাড়া করার পর যত্ন করে হাত ধুয়ে নিন।
★ ছেলেপিলের খেলার জায়গায় গাছের নিচু ডালগুলো কেটে ফেলুন, যাতে তাদের চোখে না লাগে।

চোখে ময়লার কণা পড়লে তা কি করে সরাতে হয়

পরিষ্কার জল ঢেলে (পৃঃ ৫৮) বা পরিষ্কার কাপড়ের কোণা বা ভিজে তুলোর আগা দিয়ে সাধারণতঃ চোখ থেকে ময়লা বা বালির কণা সরিয়ে ফেলা যায়।

যদি ময়লার কণাটা ওপরের পাতার তলায় থাকে, একটা সরু কাঠির ওপর পাতাটা উল্টে, সেটা খুঁজে দেখুন:





সাধারণতঃ চোখের পাতার কিনারার কাছে ছোট ভাঁজের মধ্যে কণাটা পাওয়া যায়। পরিষ্কার কাপড়ের কোণা দিয়ে ওটা সরিয়ে ফেলুন।

যদি সহজে কণাটা বার করতে না পারেন, তবে চোখে এনটিবায়োটিক মলম লাগিয়ে, ব্যাণ্ডেজ দিয়ে ঢেকে, ডাক্তারি সাহায্য নিতে যান।

লাল ও যন্ত্রণাদায়ক চোখ—বিভিন্ন কারণ

অনেক রকম সমস্যা থেকে চোখ লাল আর যন্ত্রণাদায়ক হয়। এই ছকটি থেকে কারণটা বার করায় সাহায্য হতে পারে:

চোখে বাইরের জিনিস (ময়লার কণা ইত্যাদি) (পৃঃ ২৬২)	সাধারণতঃ শুধু এক চোখে হয়: লাল রং ও যন্ত্রণা কমবেশি
পোড়া বা ক্ষতিকর তরল জিনিস (পৃঃ ৫৮)	এক বা দু চোখে হয়: লাল রং ও যন্ত্রণা কমবেশি
'চোখ ওঠা' (কনজাংটিভাইটিস, পৃঃ ২৬৩) হে ফিভার (এলার্জি থেকে কনজাংটিভাইটিস পৃঃ ২০২) ট্র্যাকোমা (পৃঃ ২৬৪) হাম (পৃঃ ৩৫৮)	সাধারণতঃ দু চোখেই হয় (এক চোখে শুরু হতে বা বেশি হতে পারে) সাধারণত: বাইরের কিনারায় সবথেকে বেশি লাল হয়  জ্বালাকরা ব্যথা, সাধারণতঃ কম
তীব্র গ্লকোমা (পৃঃ ২৬৭) আইরাইটিস (পৃঃ ২৬৬) কর্নিয়ার ওপরে আঁচড় বা আলসার (পৃঃ ২৬৯)	সাধারণতঃ শুধু এক চোখে: কর্নিয়ার পাশে সবথেকে বেশি লাল  যন্ত্রণা সাধারণতঃ খুব বেশি

লাল যন্ত্রানাদায়ক চোখের চিকিৎসা, সাধারণতঃ তার কারণটা বার করার ওপর নির্ভর করে। প্রত্যেকটা সমস্যার লক্ষণ আছে কি না দেখে নিতে ভুলবেন না।

চোখ ওঠা (কনজাংটিভাইটিস)

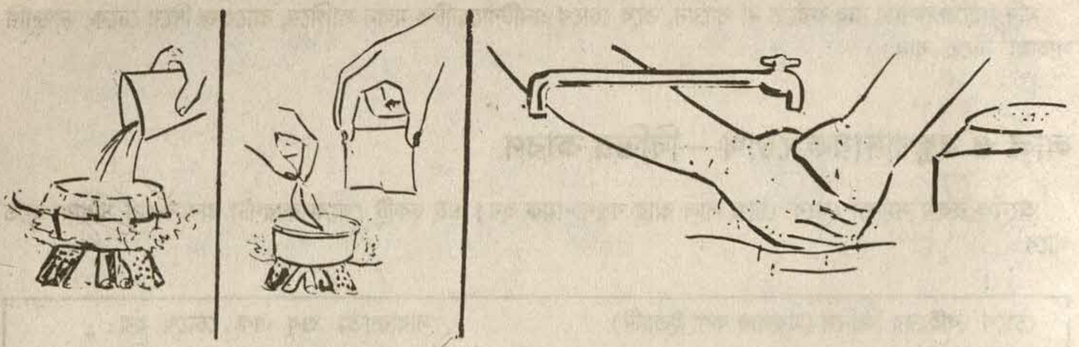
এই সংক্রমণ থেকে চোখ লাল হয়; এক বা দু চোখে পুঁজ আর অল্পস্বল্প জ্বালা হয়। চোখের বাইরের কিনারায় সবথেকে বেশি লাল হয়। চোখ দিয়ে জল পড়ে। ঘুম থেকে উঠলে পাতাগুলি প্রায়ই জুড়ে যায়।

চিকিৎসা:

চোখের পুঁজ পরিষ্কার করতে:

এক গ্লাস জলে এক চিমটে নুন দিয়ে ফুটিয়ে ঠাণ্ডা হতে দিন। কয়েক টুকরো পরিষ্কার কাপড় একটা ছোট বাটি বা কটরায় আলাদা করে ফুটিয়ে ঠাণ্ডা হতে দিন।

রোগীকে সুস্থ চোখটা মাটির দিকে করে কাৎ হয়ে শুতে বলুন। আপনার হাত দুটি সাবান আর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ফোটানো জলটা বাটি করে নিয়ে, সুস্থ চোখের নাকের দিকের কোণে ধীরে ধীরে ঢালুন। চোখের তলায় একটা পাত্র রেখে ময়লা জলটা ধরুন।



রোগীর চোখ বন্ধ করান। এক টুকরো ফোটানো কাপড় দিয়ে নাকের দিক থেকে শুরু করে কানের দিকে সাবধানে এক পোঁছে চোখটা মুছে দিন। অন্য চোখের জন্যে একই কাপড় ব্যবহার করবেন না। ময়লা জলটা ফেলে দিন।

এবারে মাথাটা ঘুরিয়ে অসুস্থ চোখটা মাটির কাছে রাখুন। চোখের পাতা দুটি একসঙ্গে জুড়ে থাকলে বড় করে খুলে দিন—জোর করবেন না। ফোটানো নুন জল দিয়ে চোখটা ভিজিয়ে দিন। পুঁজটা আলগা হয়ে সহজেই সরানো যাবে। তারপর সুস্থ চোখটার মতো একই ভাবে চোখটা ধুয়ে দিন। আলাদা এক টুকরো ফোটানো কাপড় দিয়ে মুছুন।



চোখের নিচের পাতা টেনে নামিয়ে ২/৩ ফোঁটা ২০% সালফাসিটামাইড চোখের ওষুধ দিয়ে দিন। ওপরের ছবির মত করে নিচের পাতার ভেতরে ওষুধটা দেবেন। চোখের বাইরে দিলে কোনো কাজ হয় না। ১০ মিনিট অন্তর অন্তর এই ওষুধ দিয়ে যাবেন—যতক্ষণ না চোখটা স্বাভাবিক হয়। সুস্থ চোখেও দিনে ২/১ বার ওষুধ দেবেন।

এড়ানো :

ঠিকমত যত্ন না নিলে, চোখ ওঠা একজনের থেকে অন্যদের মধ্যে সহজেই ছড়িয়ে যায়। চোখ ওঠা ছড়ানো বন্ধ করতে :

★ চোখ উঠলে ছেলেপিলেকে অন্যদের সঙ্গে খেলতে বা শুতে দেবেন না
★ প্রত্যেকের জন্যে আলাদা রুমাল বা গামছা ব্যবহার করবেন ; রোগীর রুমাল বা গামছা অন্যদের ব্যবহার না করা খুবই জরুরি
★ চোখে হাত দেবার পর হাত ধোবেন

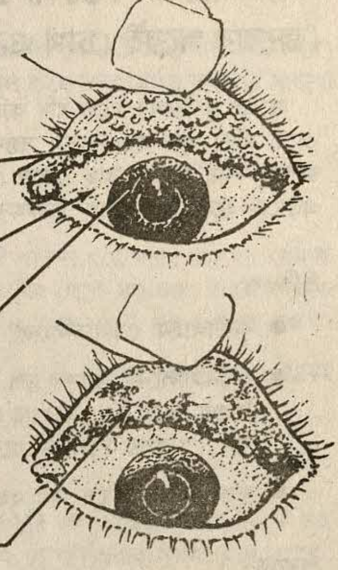
চোখ উঠলে :

★ নদীনালায় বা পুকুরে স্নান বাদ দিন
★ ভিড়ের জায়গায় লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ বাদ দিন
★ সম্ভব হলে, কালো চশমা পরতে চেষ্টা করবেন

ট্র্যাকোমা

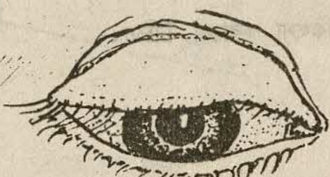
ট্র্যাকোমা একটা পুরোনো চোখ ওঠার রোগ ; এটা ক্রমশঃ বাড়ে। এটা কয়েক মাস বা বছর ধরে থাকতে পারে। সময়ে চিকিৎসা না করালে এই রোগ থেকে কখনো কখনো লোকে অন্ধ হয়ে যায়। এটা ছোঁয়া বা মাছি দিয়ে ছড়ায় ; যেখানে অনেক গরিব লোক গাদাগাদি করে থাকে, সেখানে এ রোগ সবথেকে বেশি দেখা যায়।

লক্ষণ:

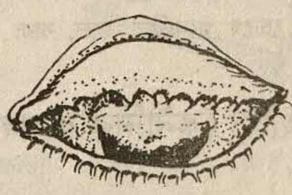


- ট্র্যাকোমা—সাধারণ চোখ ওঠার মতোই—লাল, জল পড়া চোখ দিয়ে শুরু হয়।
- এক মাস বা তার বেশি সময়ের পর ওপরের পাতার নিচে ফলিক্‌ল্ বলে একরকম ছোট ছোট গোলাপি/ছাই রঙের ডেলা দেখা দেয়। এগুলো দেখার জন্যে পৃঃ ২৬২-তে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে পাতা উল্টে দেবেন।
- চোখের সাদা অংশে অল্প প্রদাহ থাকে।
- খুব নজর করে বা আতস কাচ দিয়ে দেখলে হয়তো দেখবেন যে কর্নিয়ার ওপরের কিনারাটা ছাই ছাই রঙের দেখাচ্ছে—কারণ তার মধ্যে অনেক ছোট্ট ছোট্ট নতুন রক্তনালি (প্যানাস) হয়েছে।
- ফলিক্‌ল্ আর প্যানাস দুইই থাকলে ট্র্যাকোমা হওয়া প্রায় নিশ্চিত।
- কয়েক বছর পর, ফলিক্‌ল্‌গুলো মিলিয়ে যেতে শুরু করে; সাদাটে দাগ রয়ে যায়।

ক্ষতের এই দাগগুলো থেকে চোখের পাতা পুরু হয়ে যায় বলে পুরো বন্ধ করার অসুবিধে হতে পারে।



অথবা, ওগুলির জন্যে চোখের পাতার চুলগুলি ভেতরে ঢুকে কর্নিয়ার ওপর আঁচড় দিয়ে অন্ধতা ঘটাতে পারে।



ট্র্যাকোমার চিকিৎসা:

এক মাস ধরে দিনে তিনবার করে ২০% সালফাসিটামাইড চোখের তরল ওষুধ দিন। এতে না কমলে, এক মাস ধরে দিনে তিনবার চোখের ভেতরে টেট্রাসাইক্লিন চোখের মলম লাগান। পুরোপুরি সারার জন্যে ১০ দিন থেকে ৩ সপ্তাহ ধরে একটা সালফোনামাইড বা টেট্রাসাইক্লিন খান (পৃঃ ৪০০, ৪০২)।

এড়ানো:

সময়ে পুরোপুরি চিকিৎসা করালে ট্র্যাকোমা অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে যাওয়া এড়ানো যায়। ট্র্যাকোমার রোগীর সঙ্গে যারা থাকে, তাদের—বিশেষ করে ছেলেপিলেদের উচিত ঘনঘন চোখ দেখানো আর লক্ষণ দেখা দিলে সময়ে চিকিৎসা করানো। এছাড়া, এই পরিচ্ছেদের গোড়ায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার যে বিধিগুলি দেয়া হয়েছে, সেগুলো মেনে চলাটাও খুব জরুরি।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকলে তবে,
ট্র্যাকোমা রোগ এড়ানো সম্ভব হবে।

সদ্যজন্মানো শিশুদের চোখে সংক্রমণ (জন্মের পরেই চোখ ওঠা)



জন্মের দু দিনের মধ্যে যদি কচি বাচ্চার চোখ লাল হয়ে ফুলে যায়, আর তাতে প্রচুর পুঁজ হয়—সেটা সম্ভবতঃ গনোরিয়া (পৃঃ ২৮০)। শিশু হয়তো জন্মের সময় মায়ের কাছ থেকে রোগটা পেয়েছে। শিশুর অন্ধ হয়ে যাওয়া এড়াতে হলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করা দরকার।

চিকিৎসা:

- কৃস্টালাইন পেনিসিলিনের (পৃঃ ৩৯৮) ইনজেকশন দিন।
- পেনিসিলিনের চোখের ড্রপ তৈরি করুন। এক ঘণ্টা ধরে, ১০ মিনিট বাদে বাদে এই মেশানো ড্রপের ১ ফোঁটা শিশুর চোখে দিন; তারপর ৬ ঘণ্টা ধরে ঘণ্টায় একবার শিশুর চোখে দিন; তারপর ৬ ঘণ্টা ধরে ঘণ্টায় একবার দিন; তারপর তিনদিন ধরে ২/৩ ঘণ্টা অন্তর অন্তর দিন।
- ড্রপ দেবার আগে পৃঃ ২৬৩-তে যেমন বলা হয়েছে সেইভাবে পুঁজ পরিষ্কার করে দেবেন।

এড়ানো:

সব শিশুর চোখ গনোরিয়া থেকে রক্ষা করা উচিত, বিশেষ করে যে শিশুদের মায়েদের গনোরিয়া থাকার সম্ভাবনা থাকে, বা যাদের বাবাদের পেচ্ছাপ করার সময় যন্ত্রণা হয়। (মায়েদের গনোরিয়া থাকলেও তাঁরা তা নাও জানতে পারেন!)

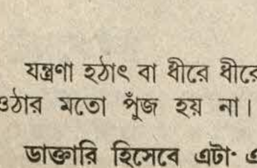
শিশুর জন্মের পরেই **শুধু একবার** তার প্রত্যেক চোখে ১% সিলভার নাইট্রেটের ১ ফোঁটা দিয়ে দেবেন। সিলভার নাইট্রেট ড্রপ না থাকলে তিনদিন ধরে দিনে তিনবার টেট্রাসাইক্লিন চোখের মলম লাগাবেন।

শিশুর চোখে গনোরিয়া হলে, বাবা মা **দুজনেরই** গনোরিয়ার চিকিৎসা করানো উচিত।

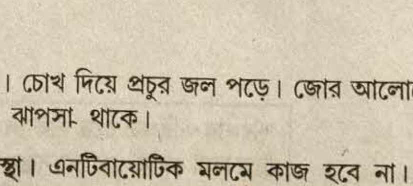
আইরাইটিস (কনীনিকার প্রদাহ)

লক্ষণ:

স্বাভাবিক চোখ



আইরাইটিস যুক্ত চোখ



যন্ত্রণা হঠাৎ বা ধীরে ধীরে শুরু হতে পারে। চোখ দিয়ে প্রচুর জল পড়ে। জোর আলোতে বেশি কষ্ট হয়। চোখ ওঠার মতো পুঁজ হয় না। দৃষ্টি সাধারণতঃ ঝাপসা থাকে।

ডাক্তারি হিসেবে এটা একটা জরুরি অবস্থা। এনটিবায়োটিক মলমে কাজ হবে না। **ডাক্তারি সাহায্য নিন।**

গ্লকোমা

চোখে খুব বেশি চাপ পড়ার ফলে এই বিপজ্জনক রোগটি হয়। ৪০ বছর বয়সের পর এটি সাধারণতঃ শুরু হয়। অনেকক্ষেত্রেই এই রোগ অন্ধতা ঘটায়। **অন্ধতা এড়াতে হলে, গ্লকোমার লক্ষণগুলি চিনে তাড়াতাড়ি ডাক্তারি সাহায্য নেয়াটা জরুরি।**

গ্লকোমা দুধরনের হয়।

তীব্র গ্লকোমা :

মাথায় বা চোখে প্রচণ্ড যন্ত্রণা দিয়ে এটা হঠাৎ শুরু হয়। চোখ লাল হয়ে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। চোখের গোলক ছুঁলে গুলির মত শক্ত লাগে। বমি হতে পারে। অসুস্থ চোখের মণি সুস্থ চোখের মনির থেকে বড় হয়। আলোর দিকে তাকালে গ্লকোমার রোগী আলোর চারপাশে অনেক রঙিন আংটি দেখতে পেতে পারে। এটা খুব গুরুতর লক্ষণ।

খুব তাড়াতাড়ি চিকিৎসা না করলে তীব্র গ্লকোমা থেকে কয়েকদিনের মধ্যেই অন্ধতা এসে যায়। প্রায়ই অপারেশনের দরকার হয়। **তাড়াতাড়ি ডাক্তারি সাহায্য নিন।**

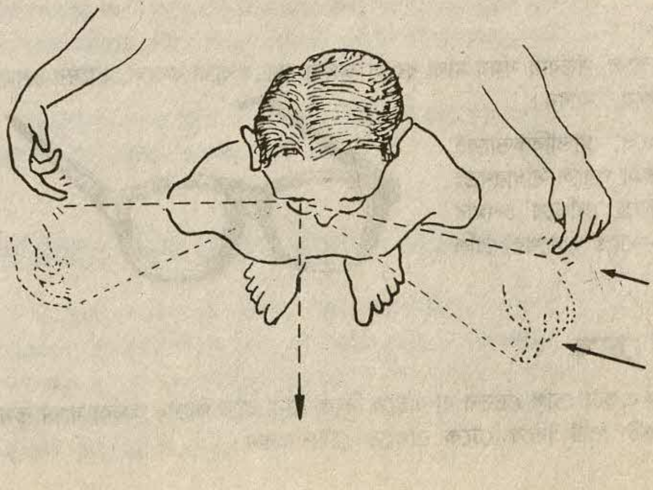
পুরোনো গ্লকোমা :

চোখের ভেতরে চাপ ধীরে ধীরে বাড়ে। সাধারণতঃ কোনো যন্ত্রণা থাকে না। দৃষ্টি চলে যাওয়াটা পাশ থেকে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে বাড়ে, প্রায়ই রোগী তা বুঝতে পারে না। দৃষ্টি পরীক্ষা করলে রোগটা ধরার সুবিধা হতে পারে।



স্বাভাবিক চোখ *গ্লকোমার প্রথম দিকের অবস্থা* *গ্লকোমার শেষ দিকের অবস্থা*

গ্লকোমার জন্যে পরীক্ষা

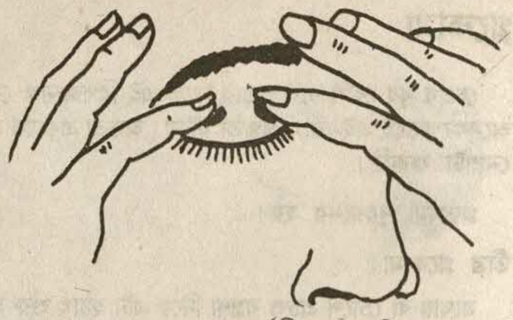


রোগীকে এক চোখ ঢেকে অন্য চোখ দিয়ে সোজা সামনে কোনো জিনিসের দিকে তাকাতে বলুন। তার পেছন থেকে আপনার আঙুল নিয়ে এসে দেখুন সে ঠিক কখন তার মাথার প্রতিপাশে আঙুল দেখতে পাচ্ছে।

স্বাভাবিক অবস্থায় এইখানে আঙুলগুলি দেখা যায়।

গ্লকোমা হলে, আরো সামনের দিকে আঙুল নড়াটা প্রথম দেখা যায়।

চোখের ভেতরের চাপ পরীক্ষা করেও গ্লকোমা ধরা যায়।



রোগীকে তার পায়ের দিকে তাকাতে বলুন। তার চোখের ওপর আপনার দুহাতের তর্জনী পাশাপাশি রাখুন। ছবি দেখুন। একটা আঙুল স্থির রেখে অন্যটা দিয়ে চোখের পাতার ওপর থেকে চোখের ওপর চাপ দিন। চাপ বেশি থাকলে চোখটা গুলির মত শক্ত ঠেকবে। (নিশ্চিত হতে, আপনার নিজের চোখের চাপের সঙ্গে তুলনা করুন।)

সময়ে ধরা পড়লে, বিশেষ চোখের ড্রপ (পাইলোকারপিন) দিয়ে চিকিৎসা করলে অন্ধ হওয়া এড়ানো যেতে পারে। যে ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মী মাঝে মাঝে চোখের চাপ মাপতে পারবে, তারই ওষুধের মাত্রাটা ঠিক করা উচিত। রোগীকে বাকি জীবনটা ড্রপ ব্যবহার করে যেতে হবে।

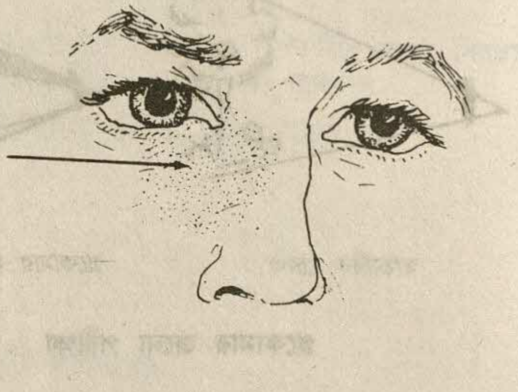
এড়ানো :

৪০ বছরের বেশি বয়সের লোকদের, বা যাদের আত্মীয়দের মধ্যে কারো গ্লকোমা আছে, তাদের, বছরে একবার চোখের চাপ পরীক্ষা করানো উচিত।

চোখের জলের থলিতে সংক্রমণ (ড্যাক্রিওসিস্টাইটিস)

লক্ষণ :

চোখ লাল হওয়া, যন্ত্রণা, চোখের নিচে, নাকের ঠিক পাশে ফোলা। চোখ দিয়ে প্রচুর জল পড়ে। ফোলার ওপর আস্তে চাপ দিলে চোখের কোণে এক ফোঁটা পুঁজ দেখা দিতে পারে।



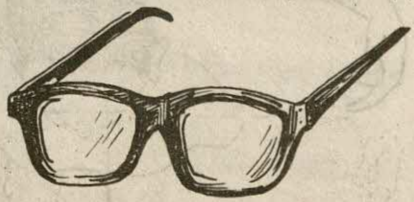
চিকিৎসা :

- গরম সেঁক লাগান।
- চোখে এনটিবায়োটিক ড্রপ বা মলম লাগান।
- পেনিসিলিন (পৃঃ ৩৯৭) খান।

পরিষ্কার দেখায় অসুবিধে

ছেলেপিলের পরিষ্কার দেখায় অসুবিধে হলে, পড়বার সময় মাথা ধরলে অথবা চোখে ব্যথা করলে, তাদের চশমার দরকার হতে পারে। তাদের চোখ দেখিয়ে নেবেন।

বড়দের বেলায়, বয়স বাড়তে থাকলে, স্বাভাবিকভাবেই কাছের জিনিস দেখতে কষ্ট হয়। পড়ার চশমা পরলে সাধারণতঃ সুবিধে হয়। সম্ভব হলে, বিশেষজ্ঞের কাছে দেখিয়ে চশমার পাওয়ার ঠিক করে জেনে নেয়া উচিত—যাতে চোখের বেশি পরিশ্রম না হয়, আর মাথা না ধরে।



টেরা চোখ আর নড়ে যাওয়া চোখ

যদি কোনো শিশু বা ছোট ছেলেপিলের একটা চোখ ভেতর বা বাইরে দিকে টেরা হয়ে থাকে, অথবা যখন তখন অন্যদিকে ঘুরে যায়, **ভালো** চোখটা একটা পটি দিয়ে ঢেকে রাখতে চেষ্টা করুন।

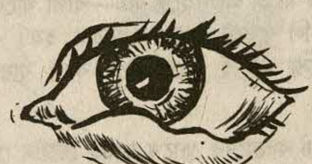


সম্ভব হলে, শিশুর ৬ মাস বয়সের সময় এটা করবেন। যতদিন না অন্য চোখটা সোজা হয়ে যায়, ভালো চোখটা ঢেকে রাখবেন। ৬ মাস বয়সের শিশুর বেলায়, এর জন্যে শুধু ১ বা ২ সপ্তাহ লাগতে পারে। বড় ছেলেপিলেদের বেলায় বেশিদিন লাগে—৭ বছর বয়সের ছেলেপিলের ১ বছর পর্যন্ত লাগে। কোনো অভিজ্ঞ স্বাস্থ্যকর্মীর সঙ্গে ব্যাপারটা আলোচনা করে নেবেন।

সময় থাকতে ভালো চোখটা ঢেকে রাখলে, সাধারণতঃ সারাজীবনের জন্যে টেরা হয়ে যাওয়া এড়ানো যায়।

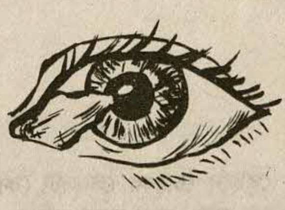
যদি একটা চোখ সবসময় ভুল দিকে ঘোরানো থাকে, তবে ভালো চোখটা ঢেকে রাখলে সুবিধা হবার সম্ভাবনা কম। বিশেষ চশমায় কখনো কখনো কাজ হয়। অপারেশন করলে হয়তো চোখটা সোজা হতে পারে, কিন্তু তাতে সাধারণতঃ দৃষ্টির উন্নতি হয় না।

অঞ্জনি



এটা চোখের পাতার ওপরে, সাধারণতঃ কিনারার কাছে, একটা লাল, ফোলা ডেলা। চিকিৎসার জন্যে গরম জলে একটু নুন দিয়ে সেঁক দিন। দিনে তিনবার করে একটা এনটিবায়োটিক চোখের মলম লাগালে বারবার অঞ্জনি হওয়া বন্ধ হবার সাহায্য হবে।

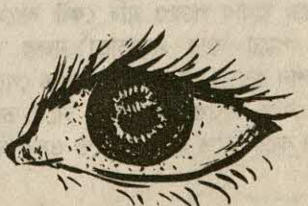
টেরিজিয়াম



চোখের ওপরের পুরু হয়ে যাওয়া মাংস চোখের কোণে আরম্ভ হয়ে বেড়ে কর্নিয়ার ওপরে চলে যায়। রোদ, বাতাস আর ধুলো লাগা এর কতকটা কারণ। কালো চশমা পরলে চিড়বিড়ানি কমে আর টেরিজিয়ামটা অত তাড়াতাড়ি বাড়ে না। চোখের মণিতে পৌঁছে যাবার আগেই এটা অপারেশন করে বাদ দেয়া উচিত।

ঝিনুকের গুঁড়ো দিয়ে যে ঘরোয়া চিকিৎসা করা হয়, তাতে উপকারের থেকে ক্ষতিই বেশি হয়।

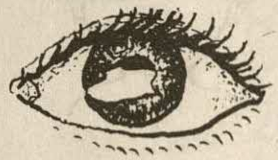
কর্নিয়ার ওপর কাটা ছেঁড়া বা আলসার



কর্নিয়ার ওপরের খুব পাৎলা, নরম পর্দাটা ছিড়ে গেলে বা সংক্রমণ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হলে, তার ফলে কর্নিয়ায় যন্ত্রণাদায়ক আলসার হতে পারে। জোরালো আলোয় ভালো করে দেখলে হয়তো কর্নিয়ার ওপরে একটা ছাইছাই রঙের বা কম চকচকে জায়গা দেখতে পাবেন।

ভালোভাবে যত্ন না নিলে, কর্নিয়ার আলসার থেকে লোকে অন্ধ হয়ে যেতে পারে। এনটিবায়োটিক চোখের মলম লাগান, পেনিসিলিন খান আর চোখটা পটি দিয়ে ঢেকে রাখুন। **ডাক্তারি সাহায্য নিন।**

কর্নিয়ার ওপরে যন্ত্রণাহীন সাদা দাগ হল **কর্নিয়ার ক্ষতচিহ্ন**। কর্নিয়ায় আলসার, পোড়া বা চোখের অন্য আঘাতের ফলে এটা হতে পারে। এর একমাত্র চিকিৎসা হল অপারেশন (কর্নিয়ার ট্রান্সপ্ল্যান্ট)। এর খরচ অনেক, সবসময় ভালো ফলও হয় না। রোগী অন্ধ হলেও যদি তখনো আলো দেখতে পায়, শুধু তবেই অপারেশন করা উচিত।



চোখের সাদা অংশে রক্তপাত

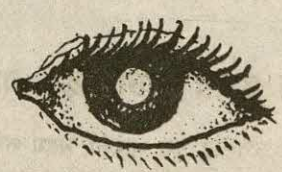
কোনো ভারী জিনিস তুললে, জোরে কাশলে (যেমন ঘুংড়ি কাশিতে) বা ধাক্কা লাগলে চোখের সাদা অংশের খানিকটা রক্তের মতো লাল হয়ে যায়—ব্যথা থাকে না। কোনো ছোটো রক্তনালি ফেটে গেলে এরকম হয়। এতে ক্ষতি হয় না, চিকিৎসা ছাড়াই ধীরে ধীরে কমে যায়।



কচি বাচ্চাদের চোখে প্রায়ই ছোটো ছোটো লাল দাগ দেখা যায়। কোনো চিকিৎসার দরকার হয় না।

ছানি

মণির পেছনে চোখের লেন্স্টা (কাচের মতো জিনিসটা) ধোঁয়াটে হয়ে যায়—তার জন্যে মণির ওপরে আলো ফেললে মণিটা ছাই বা সাদা রঙের দেখায়। বয়স্ক লোকদের মধ্যে ছানি প্রায়ই দেখা যায়; ক্বচিৎ কখনো শিশুদেরও হয়। ছানি পড়ে অন্ধ হয়ে যাবার পরেও যদি কেউ আলো অন্ধকারের তফাৎ করতে পারে আর নড়াচাড়া নজর করতে পারে, তবে অপারেশন করলে সে আবার দেখতে পেতে পারে। তবে, পরে তাকে বেশি পাওয়ারের চশমা নিয়ে তার মধ্যে দিয়ে দেখা অভ্যেস করে নিতে হয়। ছানিতে ওষুধ দিলে কোনো কাজ হয় না।



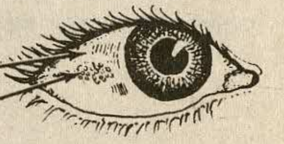
রাতকানা আর জেরোসিস (ভিটামিন 'এ'র অভাব)



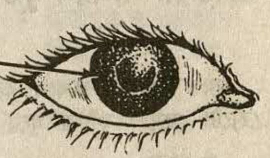
২ থেকে ৫ বছর বয়সের ছেলেপিলের মধ্যে এ রোগ সব থেকে বেশি দেখা যায়। ভিটামিন 'এ' ভরা খাবার যথেষ্ট না খেলে এটা হয়। সময়ে ধরা পড়ে চিকিৎসা না হলে, এ রোগ থেকে ছেলেপিলে অন্ধ হয়ে যায়।

লক্ষণ:

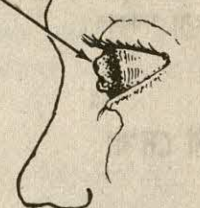
- অসুস্থ শিশু প্রথমে **রাতকানা** হয়ে যেতে পারে। সে অন্ধকারে অন্য পাঁচজনের থেকে কম দেখে।
- পরে তার **চোখ শুকিয়ে যায়** (জেরোসিস)। চোখের সাদা অংশের চকচকে ভাবটা চলে গিয়ে সেটা কুঁচকে যেতে শুরু করে।



- চোখে ছোটো ছোটো ছাইরঙের বুদবুদ ভর্তি দাগ (বিটট্‌স্ স্পট) তৈরি হয়।
- এর কিছুদিন পরেই কর্নিয়া নরম হয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসতে বা ফেটেও যেতে পারে। সাধারণতঃ কোনো যন্ত্রণা থাকে না। সংক্রমণ, ক্ষতচিহ্ন বা অন্য জখম থেকে ছেলেপিলে অন্ধও হয়ে যেতে পারে।



- রোগটা বেড়ে গেলে কর্নিয়া ঘোলাটে হয়ে যায়, আর তাতে ছোটো ছোটো গর্ত হয়ে যেতে পারে।
- ছেলেপিলে অন্য কোনো রোগে—যেমন পাৎলা পায়খানা, ঘুংড়ি কাশি বা যক্ষ্মায়—অসুস্থ হয়ে পড়লে অনেক সময় জেরোসিস শুরু হয় বা বাড়ে। **অসুস্থ আর রোগা ছেলেপিলেদের সকলেরই চোখ পরীক্ষা করান।**



এড়ানো আর সারানো:

ভিটামিন 'এ' ভরা খাবার খেলে জেরোসিস সহজেই এড়ানো যায়। এই কাজগুলি করবেন:

- শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ান—সম্ভব হলে দু বছর বয়স অবধি।
- প্রথম ৬ মাসের পর শিশুকে ভিটামিন 'এ' ভরা খাবার—যেমন গাঢ় সবুজ রঙের শাকসবজি আর হলুদ বা লাল রঙের ফল আর তরকারি—দিতে শুরু করুন। মাখনসমেত দুধ, ডিম, মেটে আর গুর্দাতেও প্রচুর ভিটামিন 'এ' আছে।
- শিশুকে এসব খাবার দেয়া সম্ভব না হলে বা তার রাতকানা বা জেরোসিসের লক্ষণ দেখা দিতে শুরু হয়ে গেলে তাকে প্রতি ৬ মাসে একবার ভিটামিন 'এ' খাওয়াবেন। ৩ মাসের কম বয়সের শিশুদের এটা দেবেন না।



- যদি শিশুর অবস্থা ইতিমধ্যেই বেশ গুরুতর হয়ে গিয়ে থাকে, তবে তাকে একটা ভিটামিন 'এ'র ২০০,০০০ ইউনিটের ক্যাপসুল দিন (পৃঃ ৪২৪)। এক সপ্তাহের মধ্যে চোখ ভালো না হলে আরো একটা ক্যাপসুল দেবেন।

সাবধান: অতিরিক্ত ভিটামিন 'এ' বিষাক্ত।

যদি শিশুর চোখের অবস্থা সাংঘাতিক হয়—কর্নিয়া যদি ম্যাটমেটে বা গর্তে ভরা হয়, অথবা ঠেলে বেরিয়ে আসে, তবে ডাক্তারি সাহায্য নেবেন। শিশুর চোখ ব্যাণ্ডেজ দিয়ে ঢেকে দিয়ে তখনি তাকে ভিটামিন 'এ' দেয়া উচিত; ১০০,০০০ ইউনিটের ইনজেকশন দিলে সব থেকে ভালো হয়।

ছেলেপিলে অন্ধ না হয়—
এই যদি সত্যিই চান,
হলুদ আর সবুজ রঙের
শাকসবজি খাইয়েই যান।

চোখের সামনে ফুটকি বা মাছি দেখা

বয়স্থ লোকেরা কখনো কখনো বলে যে কোনো উজ্জ্বল জায়গার (দেয়াল, আকাশ ইত্যাদি) দিকে তাকালে তারা ছোটো ছোটো ফুটকি ঘুরে বেড়াতে দেখে।

এই ফুটকি দেখায় সাধারণতঃ কোনো ক্ষতি হয় না, চিকিৎসাও লাগে না। তবে হঠাৎ অনেকগুলি দেখা গেলে, আর এক পাশের দৃষ্টি চলে গেলে, সেটা ডাক্তারি মতে জরুরি অবস্থা (রেটিনা খসে যাওয়া) হতে পারে। তখনি ডাক্তারি চিকিৎসা দরকার।

দুটো দেখা



নানা কারণে দুটো দেখা যায়:

যদি দুটো দেখা হঠাৎ শুরু হয়, অনেকদিন ধরে হয়ে চলে বা ক্রমশঃ বাড়ে, হয়তো কোনো গুরুতর সমস্যার লক্ষণ। ডাক্তারি সাহায্য নিন।

যদি দুটো দেখা শুধু মাঝে মাঝে হয়, সেটা অপুষ্টি থেকে দুর্বলতা বা দারুণ শ্রান্তির লক্ষণ হতে পারে।

ঠিকমতো পুষ্টির সম্বন্ধে ১১ পরিচ্ছেদে পড়ে নিয়ে যতটা সম্ভব ভালো খাওয়াদাওয়া করুন। দৃষ্টির উন্নতি না হলে ডাক্তারি সাহায্য নিন।

পরিচ্ছেদ

১৭ দাঁত, মাড়ি আর মুখ

দাঁত ও মাড়ির যত্ন

দাঁত আর মাড়ির ভালো করে যত্ন নেয়া উচিত:

- খাবার ভালোভাবে চিবিয়ে হজম করার জন্যে মজবুত, সুস্থ দাঁত দরকার।
- ভালোভাবে দাঁতের যত্ন নিলে যন্ত্রণাদায়ক গর্ত (দাঁতে ক্ষয় থেকে ফুটো) আর মাড়ির ব্যথা এড়ানো যায়।
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবে ক্ষয়ে যাওয়া বা পচা দাঁত থেকে যে সব সাংঘাতিক সংক্রমণ হয়, সেগুলো শরীরের অন্য অংশের ক্ষতি করে।

দাঁত আর মাড়ি সুস্থ রাখতে হলে:

১· **মিষ্টি খাওয়া বাদ দিন।** বেশি মিষ্টি জিনিস (আখ, লজেঞ্চুস, কেক, বিস্কুট, চিনি দেয়া চা বা কফি, সোডা লেমনেড, কোলা) খেলে দাঁত তাড়াতাড়ি পচে যায়।

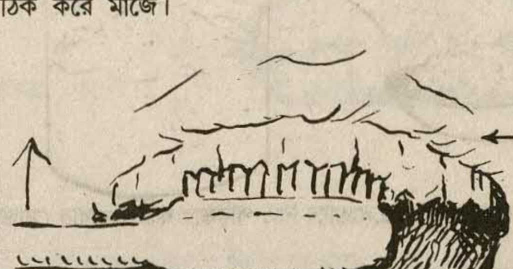
যদি চান ছেলেপিলেদের ভালো দাঁত হোক তাহলে তাদের মিষ্টি বা সরবৎ খাওয়ার অভ্যাস করাবেন না।



"এই ছেলেটি মিষ্টি চিবোতে ভালোবাসে কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে চিবোবার জন্যে এর দাঁতই থাকবে না।

২· **রোজ ভালো করে দাঁত মাজবেন**—এছাড়া মিষ্টি খাবার পরেই সবসময় দাঁত মাজবেন। আপনার ছেলেপিলেদের দাঁত বেরোতে আরম্ভ হলেই সেগুলো মেজে দিতে শুরু করবেন। পরে তাদের নিজে নিজে দাঁত মাজতে শেখাবেন, দেখবেন যেন ঠিক করে মাজে।





দাঁতগুলো ওপর থেকে নিচে এইভাবে মাজুন,

কখনো একপাশ থেকে অন্য পাশে নয়।

সব দাঁতের সামনে, পেছনে, ওপরে, নিচে মাজবেন।

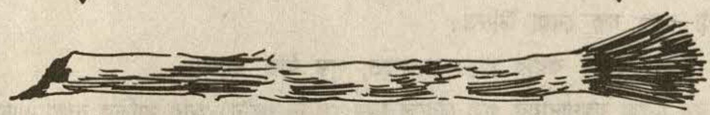
৩· খাবার জলে বা সরাসরি দাঁতের ওপরে **ফ্লোরাইড** দিলে গর্ত হওয়া এড়ানো যায়। কোনো কোনো স্বাস্থ্য-ব্যবস্থায় ছেলেপিলেদের দাঁতে বছর এক বা দু'বার ফ্লোরাইড দেয়া হয়। সুযোগ পেলে আপনার ছেলেমেয়েদেরও এটা করিয়ে দিতে ভুলবেন না।

সাবধান: একটু খানির বেশি ফ্লোরাইডে বিষ থাকে। সাবধানে ব্যবহার করবেন আর ছেলেপিলেদের নাগালের বাইরে রাখবেন।

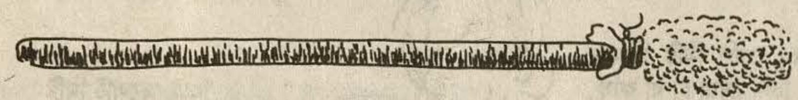
৪· আমলকি, কমলালেবু, পাতিলেবু, পেয়ারা, অঙ্কুর বেরোনো ছোলা, টম্যাটো ইত্যাদি খাবেন। মাড়ি সুস্থ রাখার জন্যে যে সব ভিটামিন দরকার সেগুলি এইসব খাবারে থাকে। রাগি আর বাজরাতে যে ক্যালসিয়াম থাকে তা দাঁত শক্ত করে। সম্ভব হলে একটু দুধও খাবেন।

টুথব্রাশ না থাকলে :

এইভাবে একটা নিমের ডাল ব্যবহার করুন :

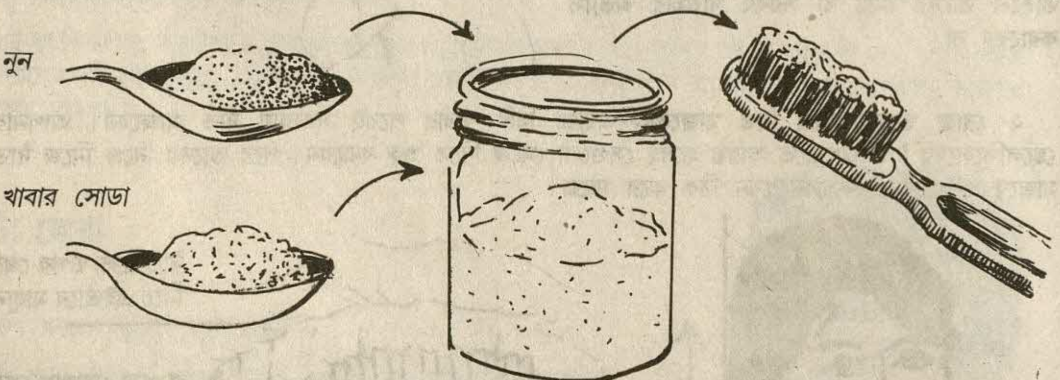


অথবা একটা কাঠির একদিকে এক টুকরো খসখসে তোয়ালে বেঁধে, টুথব্রাশি হিসেবে ব্যবহার করুন



টুথপেস্ট বা মাজন না থাকলে :

সমান পরিমাণ নুন আর খাবার সোডা মিশিয়ে দাঁতের গুঁড়ো মাজন তৈরি করুন। গুঁড়োর ভেতরে ডোবাবার আগে ব্রাশটা ভিজিয়ে নিন, তাহলে ঝরে পড়বে না।



নুন আর সোডা টুথপেস্টের মতন ভালোভাবে দাঁত পরিষ্কার করে। খাবার সোডা না থাকলে শুধু নুন ব্যবহার করুন।

যদি দাঁতে আগে থেকেই গর্ত হয়ে থাকে :



মিষ্টি খাবার বাদ দিন আর প্রতিবার খাওয়ার পর দাঁত মাজুন, যাতে ব্যথা কমে যায় বা ঘা না হয়ে যায়।

সম্ভব হলে, তাড়াতাড়ি দাঁতের ডাক্তার দেখান। সময়মত গেলে তিনি সাধারণতঃ দাঁতটা পরিষ্কার করে গর্ত ভরাট করে দিতে পারেন যাতে সেটা অনেক বছর থাকে।

দাঁতে যদি হয় গহ্বর,
ব্যথা হবে বলে থেকো নাকো বসে
ভরিয়ে নিও তা সত্বর

দাঁতে ব্যথা আর ঘা



গহ্বরটা সংক্রমিত হলে দাঁতে ব্যথা হয়।
সংক্রমণ দাঁতের মূলের ডগায় পৌঁছে পুঁজ হলে ঘা হয়।

যন্ত্রণা কমাতে:

- দাঁতের দেয়ালের-ফুটো থেকে পরিষ্কার করে সব খাবারের টুকরো বার করে দিন। তারপর অল্প গরম নুন জল দিয়ে কুলকুচো করুন।
- এসপিরিনের মত কোনো ব্যথা কমবার ওষুধ খান।
- লবঙ্গ চিবোলে সুবিধা হতে পারে।
- দাঁতের সংক্রমণ যদি সাংঘাতিক (ফোলা, পুঁজ, বড় বড় ব্যথা করা লিম্ফের গুটি) হয়, একটা এনটিবায়োটিক ব্যবহার করুন: পেনিসিলিন বড়ি (পৃঃ ৩৯৭) বা সালফোনামাইড (পৃঃ ৪০২) বা টেট্রাসাইক্লিন ক্যাপসুল (পৃঃ ৪০০)।

যন্ত্রণা না গেলে বা বার বার হলে দাঁতটা হয়তো তুলে ফেলা উচিত।

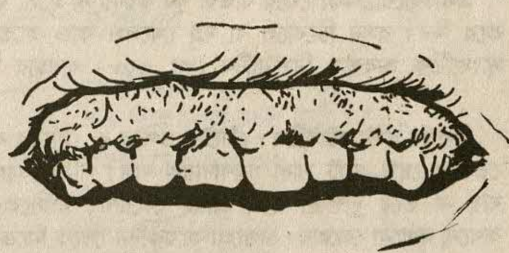
ঘা হলে শরীরের অন্যান্য অংশে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আগেই চিকিৎসা করুন।

পায়োরিয়া—মাড়ির একটা রোগ

মাড়িতে প্রদাহ (লাল আর ফোলা) আর যন্ত্রণা হয়; সহজেই রক্ত পড়ে। এর কারণ হল:

১· দাঁত আর মাড়ি ভালোভাবে বা যথেষ্ট ঘনঘন পরিষ্কার না করা।

২· যথেষ্ট পুষ্টিকর খাবার না খাওয়া (অপুষ্টি)।

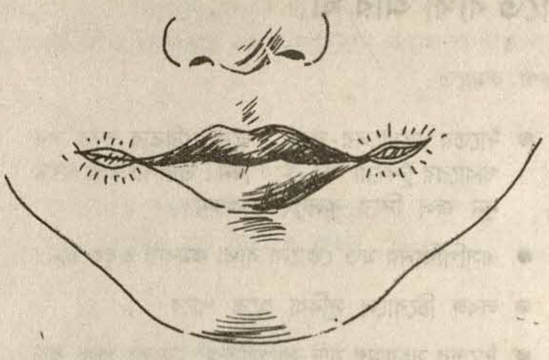


এড়ানো আর চিকিৎসা:

- প্রতিবার খাওয়ার পর ভালো করে দাঁত মেজে দাঁতের ফাঁকে যে খাবার আটকে থাকে সেগুলি বার করে দিন। এছাড়া, সম্ভব হলে, দাঁত আর মাড়ির মাঝে যে গাঢ় হলদে রঙের পর্দা (টার্টার) হয় সেগুলি চেঁছে ফেলবেন। তারপর অল্প গরম নুনজল দিয়ে কুলকুচো করবেন।
- ভিটামিনে ভরা শরীর রক্ষার খাবার, বিশেষ করে ডিম, মাংস, বরবটি, ঘন রঙের শাক সবজি, আর কমলালেবু, পাতিলেবু, টম্যাটো ইত্যাদি ফল খান (পরিচ্ছেদ ১১ দেখুন)। মিষ্টি, চটচটে আর আঁশ দেয়া খাবার, যা দাঁতের ফাঁকে আটকে যায়, বাদ দিন।

দ্রষ্টব্য: কখনো কখনো ফিটের (মৃগী) ওষুধ থেকে মাড়িতে ফোলা বা কোনো অস্বাভাবিক ফুসকুড়ি হয় (পৃঃ ৪২২)। এরকম হলে, কোনো স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ নিয়ে অন্য কোনো ওষুধ ব্যবহার করার কথা ভেবে দেখবেন।

ঠোঁটের কোণে ঘা বা ফাটা



ছেলেপিলের ঠোঁটের কোণায় সরু সরু ঘা সাধারণতঃ অপুষ্টির লক্ষণ।

এইরকম ঘা হলে ছেলেপিলের ভিটামিন আর প্রোটিনে ভরা খাবার যেমন: দুধ, মাংস, মাছ, বাদাম, ডিম, ফল আর সবুজ শাকসবজি খাওয়া উচিত।

মুখের ভিতরে সাদা দাগ:

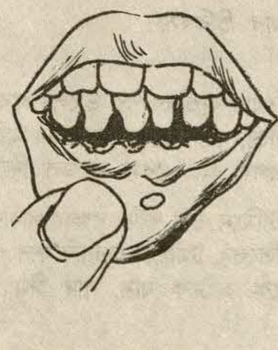


জিভ সাদা রঙের লোমের মত জিনিস দিয়ে ঢাকা থাকে। অনেক রোগ থেকে জিভের ওপর আর টাকরায় সাদা বা হলদে পর্দা পড়ে। জ্বর হলে সাধারণতঃ এটা হয়। এই পর্দাটা গুরুতর কিছু নয়। দিনে কয়েকবার অল্প জলে নুন আর খাবার সোডা মিশিয়ে তা দিয়ে কুলকুচো করলে সাহায্য হয়।



থ্রাশঃ মুখের ভেতরে আর জিভের ওপরে কাঁচা মাংসের ওপরে লেগে থাকা দইয়ের মত দেখতে ছোট ছোট সাদা দাগ। এগুলোকে মনিলিয়াসিস (পৃঃ ২৮৬) বলে। একরকম ছত্রাক বা ইষ্টের সংক্রমণ থেকে হয়। কচি বাচ্চাদের মধ্যে আর যারা কয়েকটা এনটিবায়োটিক, বিশেষ করে টেট্রাসাইক্লিন বা এমপিসিলিন খাচ্ছে, তাদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

এনটিবায়োটিকটা খেয়ে যাওয়া খুব জরুরি না হলে, সেটা বন্ধ করে দিন। রসুন চিবোলে বা দই খেলেও কাজ হতে পারে। সাংঘাতিক অবস্থায় নিস্ট্যাটিন (পৃঃ ৪০৮) ব্যবহার করুন।



এপথুস স্টোমাটাইটিস: ঠোঁটের ওপরে বা ঠোঁটের বা মুখের ভেতরে ছোট ছোট সাদা যন্ত্রণাদায়ক দাগ। সঠিক কারণ জানা যায় না তবে দুশ্চিন্তা হলে প্রায়ই বেরোয়। মাসিকের আগে কখনো কখনো বেরোয়। এগুলো কয়েকদিন থেকে নিজে থেকেই চলে যায়।

নুন জল দিয়ে কুলকুচো করুন অথবা ঘাগুলোর ওপর একটু হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড বা কর্টিকো-স্টেরয়েড মলম (পৃঃ ৪০৯) লাগান। এনটিবায়োটিকে কাজ হয় না।

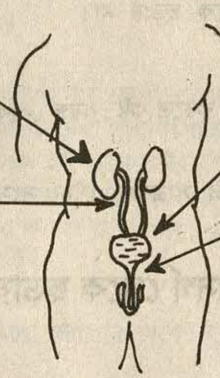
ঠাণ্ডার ঘা (জ্বর ঠুঁটো): মুখ বা ঠোঁটের বাইরের দিকে এই ছোট ছোট সাদা দাগগুলো বেরোয়। কারো জ্বর বা সর্দি হলে সাধারণতঃ এগুলো দেখা যায়। এগুলো কয়েকদিন থেকে চলে যায়।

ক্যানসার: জিভের ওপরের বা মুখের ভিতরের যে সব পুরোনো ঘা সাধারণ চিকিৎসায় বা পুষ্টিকর খাবারে সারে না, সেগুলি ক্যানসারের লক্ষণ হতে পারে। যারা পানের সঙ্গে তামাক চিবোয় তাদের মধ্যে এগুলি প্রায়ই দেখা যায়। এরকম অবস্থায় স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ নেবেন।

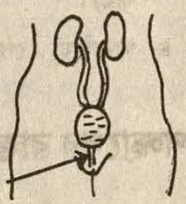
পরিচ্ছেদ

১৮ মূত্র তন্ত্র (পেচ্ছাপের ব্যবস্থা) এবং জননেন্দ্রিয়

মূত্রতন্ত্র এবং তার বিভিন্ন অংশগুলি রক্ত থেকে আবর্জনা সরিয়ে **পেচ্ছাপের** আকারে সেগুলিকে বার করে দিয়ে শরীরের কাজ করে।

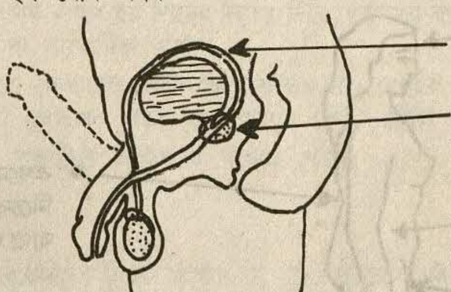


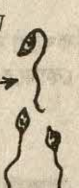
পেচ্ছাপটা—ছেলেদের বেলায় লিঙ্গের মধ্যে দিয়ে আর মেয়েদের বেলায় ভ্যাজাইনার দুটি ঠোঁটের মাঝে একটা ছোট ফুটো দিয়ে বয়ে নিয়ে যায়।



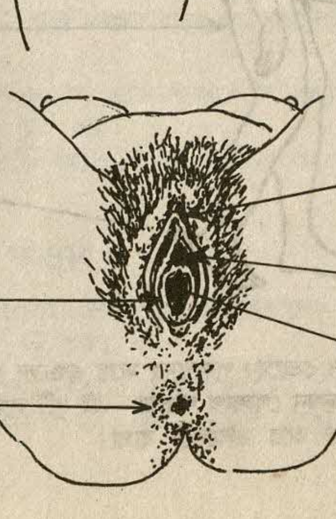
জননেন্দ্রিয়গুলি হল যৌন অঙ্গ।

পুরুষ :





মেয়ে :



পেচ্ছাপের ব্যবস্থার সমস্যা :

পেচ্ছাপের রাস্তায় অনেক রকম গণ্ডগোল হয়। সেগুলিকে তফাৎ করা সবসময় সহজ হয় না। কয়েকটা গুরুতর কিছু নয়। আবার অন্য কয়েকটা খুব বিপজ্জনক হতে পারে। কোনো বিপজ্জনক রোগ শুধু ছোটখাট লক্ষণ দিয়ে শুরু হতে পারে। শুধু এইরকম একটা বই পড়ে এইসব গোলমাল ধরা সাধারণতঃ কঠিন হয়। বিশেষ জ্ঞান আর নানা পরীক্ষার দরকার হতে পারে। যখনি সম্ভব স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ নেবেন।

পেচ্ছাপের **সাধারণ সমস্যাগুলির** মধ্যে আছে:

১· পেচ্ছাপের রাস্তার যে সব সংক্রমণ যৌন সংসর্গ থেকে ছড়ায় না।

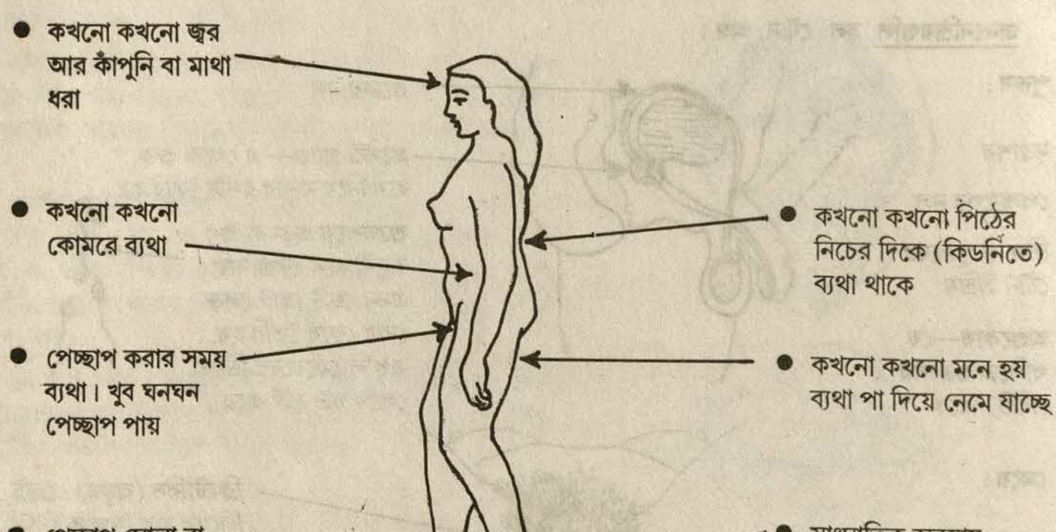
২· কিডনিতে (বৃক্ক) পাথর।

৩· প্রস্টেটের গণ্ডগোল (গ্ল্যাণ্ডটা বড় হয়ে যাওয়াতে পেচ্ছাপ করতে কষ্ট; বয়স্থ লোকদের মধ্যে খুব বেশি দেখা যায়)।

৪· গনোরিয়া (পেচ্ছাপ করতে কষ্ট বা যন্ত্রণা; এটা একটা সংক্রমণ, যৌন সংসর্গ থেকে ছড়ায়)।

পেচ্ছাপের রাস্তার যে সব সংক্রমণ যৌন সংসর্গ থেকে ছড়ায় না

লক্ষণ :



অনেক মেয়ে পেচ্ছাপের ছোটখাট সংক্রমণে ভোগে। পুরুষদের মধ্যে এগুলো অনেক কম দেখা যায়। কখনো কখনো **শুধু পেচ্ছাপ করার সময় ব্যথা** আর **ঘনঘন পেচ্ছাপ পাওয়া**—এই দুটি লক্ষণ দেখা যায়। অন্য যে লক্ষণ সাধারণতঃ দেখা যায় তা হল **পেচ্ছাপে রক্ত** আর **তলপেটে ব্যথা**।

পিঠের মাঝে বা নিচের দিকে ব্যথা যদি শরীরের পাশে পাঁজরের নিচে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আর সঙ্গে জ্বর থাকে, তাহলে আরো কঠিন সমস্যা বোঝায়।

চিকিৎসা :



- **প্রচুর জল খান।** অনেক ছোটখাট পেচ্ছাপের সংক্রমণ শুধু প্রচুর জল খেয়েই সারানো যায়, কোনো ওষুধের দরকার হয় না।

  (তবে রোগী যদি পেচ্ছাপ করতে না পারে বা তার হাত আর মুখ ফুলে যায়, তবে তার বেশি জল খাওয়া উচিত নয়।)

- প্রচুর জল খাওয়ার পরেও যদি রোগী ভালো না হয় বা তার জ্বর হয়, তবে তার উচিত সালফোনামাইড (পৃঃ ৪০২), পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড দেয়া সালফিসোক্সাজোল (পৃঃ ৪০২) বা মেথেনামাইন মেনডেনেটের (পৃঃ ৪০৩) বড়ি অথবা ফেনাজোপাইরিডিন হাইড্রোক্লোরাইড (পৃঃ ৪০৩) দেয়া ট্রাইমেথাপ্রিম খাওয়া। এগুলোতে কাজ না হলে টেট্রাসাইক্লিন দেবেন। মাত্রা এবং সাবধানতার দিকে নজর রাখবেন। সংক্রমণ পুরোপুরি সারাতে ১০ দিন বা তারো বেশি দিন ধরে ওষুধ খাওয়ার দরকার হতে পারে। এইসব ওষুধ, বিশেষ করে সালফোনামাইড খাবার সময় **প্রচুর জল খেয়ে যাওয়াটা** খুবই জরুরি।

- রোগী অল্পদিনের মধ্যে ভালোর দিকে না গেলে, ডাক্তারি সাহায্য নেবেন।

বৃক্কের বা মূত্রের থলিতে পাথর :

লক্ষণ :

- সাধারণতঃ প্রথম লক্ষণ হয় পিঠের নিচের দিকে, কোমরে বা তলপেটে বা পুরুষের লিঙ্গের গোড়ায় খোঁচা লাগার মত বা সাংঘাতিক ব্যথা।
- কখনো কখনো পেচ্ছাপের নলটা বন্ধ হয়ে যায় বলে রোগীর পেচ্ছাপ করতে কষ্ট হয় বা পেচ্ছাপ হয়ই না। অথবা রোগী পেচ্ছাপ করতে শুরু করলে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ে।
- এরই সঙ্গে পেচ্ছাপের সংক্রমণও থাকতে পারে।

চিকিৎসা :

- পেচ্ছাপের সংক্রমণের জন্যে ওপরে যা বলা হয়েছে সেই একই চিকিৎসা।
- এছাড়া, এসপিরিন বা অন্য ব্যথা কমাবার ওষুধ আর ব্যারালগানের (পৃঃ ৪১৬) মত কোনো যন্ত্রণার ওষুধ নেবেন।
- শুয়ে পেচ্ছাপ করবার চেষ্টা করবেন। এতে অনেক সময় পেচ্ছাপের থলির পাথরটা পেছন দিকে গড়িয়ে গিয়ে পেচ্ছাপের নলের মুখটা খুলে দেয়।
- সাংঘাতিক অবস্থায় ডাক্তারি সাহায্য নেবেন। কখনো কখনো অপারেশনের দরকার হয়।

প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ড বড় হয়ে যাওয়া :

এটা বয়স্ক লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। পেচ্ছাপের থলি আর পেচ্ছাপের নলের মধ্যে যে প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ড থাকে সেটা ফুলে গেলে এই অবস্থা হয়।

- রোগীর পেচ্ছাপ করতে, কখনো কখনো মলত্যাগ করতেও কষ্ট হয়। পেচ্ছাপ গড়িয়ে গড়িয়ে, বা টপটপ করে পড়ে অথবা একেবারে আটকে যায়। কখনো কখনো রোগী কয়েকদিন ধরে পেচ্ছাপ করতে পারে না।

- রোগীর জ্বর হলে বুঝতে হবে সংক্রমণও আছে।
- রোগী আরো ঘনঘন পেচ্ছাপ করে, বিশেষ করে রাত্রে।
- তলপেটে ব্যথা।

প্রস্টেট বড় হওয়ার চিকিৎসা:



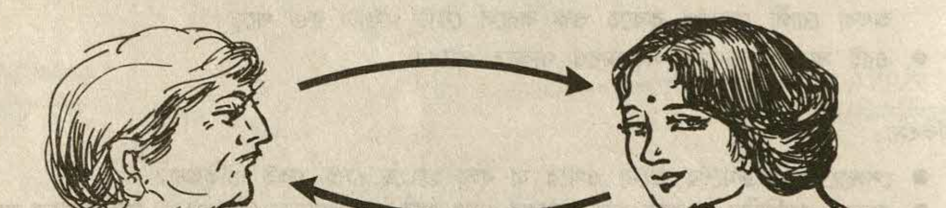
- রোগী যদি পেচ্ছাপ করতে না পারে, তবে তার এইভাবে এক গামলা গরম জলে বসা উচিত:
  এতে কাজ না হলে একটা ক্যাথিটার দরকার হতে পারে (পৃঃ ২৮৪)।
- তার জ্বর হলে এমপিসিলিন (পৃঃ ৩৯৯) বা টেট্রাসাইক্লিনের (পৃঃ ৪০০) মত একটা এনটিবায়োটিক ব্যবহার করুন।
- ডাক্তারি সাহায্য নিন। কঠিন বা পুরোনো রোগে অপারেশনের দরকার হতে পারে।

দ্রষ্টব্য : প্রস্টেটের সমস্যা আর গনোরিয়ার মধ্যে তফাৎ বোঝা দরকার; গনোরিয়াতেও পেচ্ছাপ করায় কষ্ট হতে পারে। বয়স্থ লোকদের বেলায় প্রস্টেট বড় হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তাছাড়া **গনোরিয়ার রোগী জোর দিলে পেচ্ছাপ করতে পারে। কিন্তু প্রস্টেট বড় হলে রোগী জোর দিলেও পেচ্ছাপ করতে পারে না।** তবে বয়স কম হলে, বিশেষ করে তার যদি সংক্রমিত লোকের সঙ্গে যৌন সংসর্গ হয়ে থাকে (গত কয়েকদিন বা সপ্তাহের মধ্যে) তার হয়তো গনোরিয়াই হয়েছে।

যে সব রোগ যৌন সংসর্গ থেকে ছড়ায় (যৌন রোগ)

গনোরিয়া (ভি ডি)

এই রোগ সাধারণতঃ যৌন সংসর্গ থেকে ছড়ায় (যৌন রোগ)।



লক্ষণ:

পুরুষের মধ্যে:

- পেচ্ছাপ করার সময় ব্যথা।
- লিঙ্গ থেকে ফোঁটা ফোঁটা পুঁজ পড়া।
- পেচ্ছাপ করতে কষ্ট (কখনো কখনো একটুও পেচ্ছাপ করতে পারে না)।

কয়েক মাস বা বছর পরে:

- একটা হাঁটুতে বা অন্য গাঁটে শক্ত যন্ত্রণাদায়ক ফোলা বা অন্য অনেক সমস্যা।

মেয়েদের মধ্যে:

- প্রথম দিকে সাধারণতঃ কোনো লক্ষণ থাকে না (রোগীর হয়তো পেচ্ছাপ করার সময় অল্প ব্যথা বা যোনি থেকে অল্প স্রাব হতে পারে)।
- গর্ভবতী মেয়ের গনোরিয়া হলে প্রসবের আগে যদি চিকিৎসা করা না হয় তবে শিশুর চোখে সংক্রমণ হয়ে সে অন্ধ হয়ে যেতে পারে (পৃঃ ২৬৬)।

কয়েক মাস বা বছর পরে:

- তলপেটে ব্যথা (কোমরে প্রদাহের রোগ পৃঃ ২৮৭)।

- মাসিকের গণ্ডগোল।
- মেয়েটি *বন্ধ্যা* হয়ে যেতে পারে।
- অন্যান্য সমস্যা।

পুরুষের বেলায়, সংক্রমিত রোগীর সঙ্গে যৌন সংসর্গের পর ২ থেকে ৫ দিন (বা ৩ সপ্তাহ বা তারো বেশিদিন) পর প্রথম লক্ষণগুলি শুরু হয়। মেয়েদের বেলায় কোনো লক্ষণ দেখা দেবার আগে কয়েক বছর কেটে যেতে পারে। কিন্তু তার নিজের কোনো লক্ষণ দেখা না গেলেও সংক্রমণের কয়েকদিন পর থেকে সে **অন্যদের মধ্যে রোগটা ছড়িয়ে দিতে পারে**।

গনোরিয়ার চিকিৎসা:

- প্রোকেন পেনিসিলিনের ইনজেকশন দিন, প্রতি পাছায় আধ মাত্রা করে দিন (পৃঃ ৩৯৯)। প্রোকেন পেনিসিলিন ব্যবহার করাটা জরুরি। ক্রিস্টালাইন বা বেনজাথাইন পেনিসিলিন ব্যবহার করবেন না। যদি প্রোবেনেসিড পান, তবে পেনিসিলিনের ইনজেকশন দেবার আধ ঘণ্টা আগে ১ গ্রাঃ দেবেন। পেনিসিলিন না থাকলে অথবা কাজ করছে না মনে করলে টেট্রাসাইক্লিন দিন (পৃঃ ৪০০)।
- রোগী পেচ্ছাপ করতে না পারলে তার গরম জলের গামলায় বসে পেচ্ছাপ করতে চেষ্টা করা উচিত (পৃঃ ২৮০)। তাতেও না পারলে একটা ক্যাথিটার লাগিয়ে তার পেচ্ছাপের থলিটা খালি করে ফেলা উচিত (পৃঃ ২৮৪)। ডাক্তারি সাহায্য নিন।
- গনোরিয়ার সংক্রমণ হওয়ার পরে কোনো পুরুষ যদি তার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে তবে স্ত্রীকেও চিকিৎসা করা উচিত। স্ত্রীর কোনো লক্ষণ দেখা না গেলেও তার হয়তো রোগটা হয়ে গেছে। একই সঙ্গে তারো চিকিৎসা না করলে তার থেকে তার স্বামীর আবার এই রোগ হবে।
- সমস্ত শিশুর চোখ গনোরিয়া এবং অন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করার জন্যে জন্মের সময় তাদের চোখে ১% সিলভার নাইট্রেটের ড্রপ দেয়া উচিত (পৃঃ ৪১৪)।
- গনোরিয়া হয়েছে এমন কারো সঙ্গে যৌন সংসর্গ হলে সকলেরই চিকিৎসা করানো উচিত, বিশেষ করে যে সব পুরুষের সংক্রমণ হয়েছে তাদের স্ত্রীদের।

সাবধান: গনোরিয়ার রোগীর তার নিজের অজান্তে সিফিলিসও হয়ে থাকতে পারে। অনেক সময় সিফিলিসেরও পুরো চিকিৎসা করলে সবথেকে ভালো হয়। কারণ, গনোরিয়ার চিকিৎসায় সিফিলিসের প্রথম লক্ষণগুলো বন্ধ হয়ে যেতে পারে—কিন্তু **রোগটা নাও সারতে পারে**।

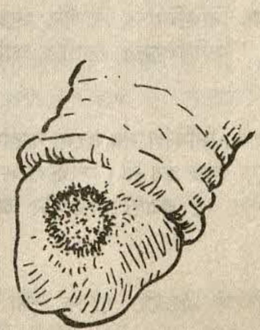
গনোরিয়া এবং অন্যান্য যৌন রোগের চিকিৎসার জন্যে পৃষ্ঠা ২৮৩ দেখুন।

সিফিলিস:

সিফিলিস একটা বিপজ্জনক যৌন রোগ—এটা প্রায়ই দেখা যায়, আর যৌন সংসর্গের মধ্যে দিয়ে একজনের থেকে অন্যের মধ্যে ছড়ায়।

লক্ষণ:

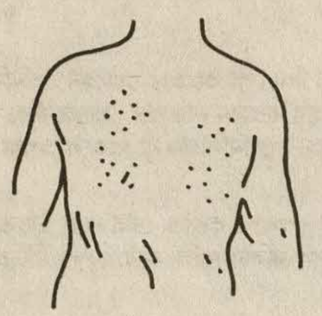
- সাধারণতঃ প্রথম লক্ষণ হল *চ্যাঙ্কার* বলে একটা ঘা। সিফিলিসের রোগীর সঙ্গে যৌন সংসর্গের পর ২ থেকে ৫ সপ্তাহের মধ্যে এটা দেখা যায়। চ্যাঙ্কারটা একটা ফুসকুড়ি, ফোসকা বা একটা খোলা ঘায়ের মত দেখাতে পারে। পুরুষ বা মেয়ের লিঙ্গ বা যোনির জায়গায় এটা সাধারণতঃ দেখা যায় (দু এক সময় ঠোঁটে, আঙ্গুলে, মলদ্বারে বা মুখের ভেতরেও দেখা যায়)। এই ঘায়ে জীবাণু ভর্তি থাকে, সেগুলো সহজেই আরেকজনের মধ্যে ছড়িয়ে যায়।



ঘাতে সাধারণতঃ ব্যথা থাকে না। যোনির ভেতরে থাকলে মেয়েটি জানতেও পারে না অথচ অন্যদের মধ্যে সহজেই সংক্রমণ ছড়িয়ে দিতে পারে।

- ঘাটা কয়েকদিন থেকে, চিকিৎসা ছাড়াই নিজে থেকে সেরে যায়। কিন্তু **রোগটা সারা শরীরে ছড়িয়ে যেতে থাকে।**
- কয়েক সপ্তাহ বা মাস পরে গলা ব্যথা, অল্প জ্বর, মুখে ঘা বা গাঁটে ফোলা হতে পারে। অথবা চামড়ার ওপরে নিচের লক্ষণগুলির যে কোনোটা দেখা দিতে পারে:

সারা শরীরে যন্ত্রণাদায়ক র‍্যাশ বা ফুসকুড়ি



হাত বা পায়ে র‍্যাশ আর চুলকুনি



এইসব লক্ষণগুলো সাধারণতঃ নিজে থেকে চলে যায়, তারপর রোগী ভাবে যে সে ভালো হয়ে গেছে—কিন্তু রোগটা বেড়ে চলে। **যথেষ্ট চিকিৎসা না হলে সিফিলিস শরীরের যে কোনো অংশ আক্রমণ করে হার্টের রোগ, পক্ষাঘাত, পাগলামি এবং আরো অনেক সমস্যা ঘটায়।**

সাবধান: লিঙ্গে বা যোনিতে কোনো ফুসকুড়ি বা ঘা দেখা দেবার কয়েকদিন বা সপ্তাহের মধ্যে যদি কোনো অস্বাভাবিক র‍্যাশ বা চামড়ার সমস্যা দেখা দেয়, সেটা সিফিলিস হতে পারে। সন্দেহ হলে ডাক্তারি সাহায্য নিন।

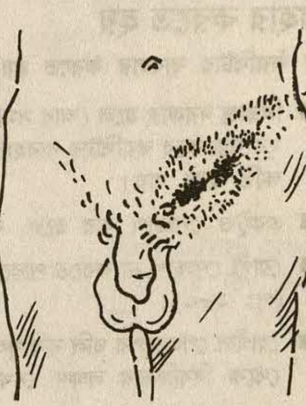
সিফিলিসের চিকিৎসা:

- প্রোকেন পেনিসিলিনের ইনজেকশন দিন (পৃঃ ৩৯৯)। **সিফিলিস পুরোপুরি সারাতে, পুরো চিকিৎসা করা খুব জরুরি।** রোগীর পেনিসিলিনে এলার্জি থাকলে বা ওতে কাজ না হলে টেট্রাসাইক্লিন ব্যবহার করতে পারে।
- রোগীর সিফিলিস আর গনোরিয়া দুইই হলে পি এ এম ইনজেকশন (পৃঃ ৩৯৮) কাজ দেয়।
- যদি কারো সিফিলিস হবার সম্ভাবনা থাকে, তার তখনি স্বাস্থ্যকর্মীকে দেখানো উচিত। বিশেষ রক্ত পরীক্ষার দরকার হতে পারে। পরীক্ষা করার সুবিধা না থাকলে লোকটির এমনিতেই সিফিলিসের চিকিৎসা করানো উচিত।
- সিফিলিসের রোগীর সঙ্গে যারা সহবাস করেছে তাদের সকলেরই চিকিৎসা করানো উচিত বিশেষ করে সিফিলিসের রোগীর স্বামী বা স্ত্রীর।

সাবধান: সিফিলিসের জন্যে ঘরোয়া ওষুধ বা স্থানীয় বা অশিক্ষিত হাতুড়েদের ওষুধ ব্যবহার করবেন না। এইসব ওষুধে কোনো কাজ হয় না। সিফিলিসের লক্ষণগুলো প্রায়ই নিজে থেকেই চলে যায়। কিন্তু জীবাণুগুলি মরে না। ঠিকমত চিকিৎসা না করালে রোগটা অনেক কঠিন হয়ে ফিরে আসে।

সিফিলিস এড়াতে পরের পৃষ্ঠা দেখুন।

বিউবো : কুঁচকিতে ফেটে যাওয়া লিম্ফের গুটি (লিমফোগ্র্যানুলোমা ভেনেরিয়াম)



লক্ষণ :

- **পুরুষের বেলায় :** কুঁচকিতে বড় বড় কালচে দলা, সেগুলো ফেটে পুঁজ পড়ে, বুজে যায়, আবার ফাটে।
- **মেয়েদের বেলায় :** পুরুষের মতোই লিম্ফের গুটি বা মলদ্বারে যন্ত্রণাদায়ক রস বার হওয়া ঘা।

চিকিৎসা :

- স্বাস্থ্যকর্মীকে দেখান।
- বড়দের টেট্রাসাইক্লিন (পৃঃ ৪০০) দিন।
- ঘাগুলি পুরোপুরি না সারা অবধি সমস্ত যৌন সংসর্গ বাদ দিন।

অন্য লোকের মধ্যে যৌন রোগ ছড়ানো কি ভাবে এড়ানো যায় :

১· **সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করান :** এইসব রোগ হলে সকলেরই সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করানো খুব দরকার। যাতে তারা অন্যদের সংক্রমিত না করে। চিকিৎসা শেষ হবার পর ৩ দিন পর্যন্ত কারো সঙ্গে সহবাস করবেন না।

দ্রষ্টব্য : সিফিলিসের বেলায়, রোগের সমস্ত লক্ষণ চলে যাবার পর অন্ততঃ দু বছর ধরে স্বাস্থ্যকর্মীকে দিয়ে নিয়মিত পরীক্ষা করিয়ে নেয়া দরকার।

২· **অন্যদের বলুন যে তাদেরও চিকিৎসা দরকার :** কেউ যদি জানতে পারে যে তার কোনো রকম যৌন রোগ (ভি ডি) হয়েছে, তার উচিত অন্য যাদেরই সঙ্গে সে সহবাস করেছে তাদের তা জানানো, যাতে তারাও চিকিৎসা করাতে পারে। কোনো মহিলার সঙ্গে সহবাস করলে, তাকে জানানো উচিত। এটা পুরুষের বিশেষ দায়িত্ব। কারণ নিজের রোগ আছে না জেনে একজন মেয়ে অন্যদের মধ্যে রোগটা ছড়িয়ে দিতে পারে ; তার শিশুরা অন্ধ হয়ে যেতে পারে ; শেষে সে নিজে বন্ধ্যা বা খুব অসুস্থ হয়ে যেতে পারে।

৩· পুরুষ এবং যার সঙ্গে সে সহবাস করছে সেই মেয়ে দুজনের **একসঙ্গে চিকিৎসা করানো উচিত**। একসঙ্গে চিকিৎসা না করালে একে অন্যজনকে আবার রোগটা দিয়ে দিতে পারে।

৪· **কার সঙ্গে সহবাস করছেন সে বিষয়ে সতর্ক হবেন :** অনেকের সঙ্গে যারা সহবাস করে তাদের এইসব রোগ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। বেশ্যাবাড়ি বা পতিতালয় বিশেষভাবে বিপজ্জনক। সেখানে যাবেন না। শহরে গিয়ে লোভে পড়বেন না।

৫· সহবাসের পর সবসময় যৌন অঙ্গ ধুয়ে নেবেন। পুরুষের উচিত সহবাসের সময় নিরোধ পরা। এতে ভি ডি এড়ানো যায় (সবসময় নয়)।

৬· **অন্যদের সাহায্য করুন :** বন্ধুদের মধ্যে যাদের ভি ডি হবার সম্ভাবনা আছে তাদের তখনি চিকিৎসা করানোর ওপর আর সেরে না যাওয়া পর্যন্ত সমস্ত যৌন সংসর্গ বন্ধ করে দেবার ওপর জোর দিন।



কি ভাবে আর কখন ক্যাথিটার (রবারের নল যা দিয়ে পেচ্ছাপের থলি থেকে পেচ্ছাপ বার করে দেয়া হয়) ব্যবহার করতে হয়

কখন ক্যাথিটার ব্যবহার করতে হয় আর কখন হয় না:

- **নিতান্ত দরকার হলে** (আর সময়ে ডাক্তারি সাহায্য পাওয়া সম্ভব না হলে) **তবেই ক্যাথিটার ব্যবহার করবেন।** খুব যত্ন করে ক্যাথিটার ব্যবহার করলেও অনেক সময় তা থেকে বিপজ্জনক সংক্রমণ বা পেচ্ছাপের রাস্তার ক্ষতি হয়ে যায়।
- একটুও পেচ্ছাপ বার হলে, ক্যাথিটার ব্যবহার করবেন না।
- রোগী পেচ্ছাপ না করতে পারলে প্রথমে তাকে গরম জলের গামলায় বসে পেচ্ছাপ করতে চেষ্টা করতে দিন (পৃঃ ২৮০)।
- রোগীর পেচ্ছাপের থলি যদি খুব ভর্তি হয়ে যন্ত্রণা দেয় অথচ তার পেচ্ছাপ বার না হয় অথবা তার যদি পেচ্ছাপ থেকে বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দিতে শুরু হয়, শুধু তবেই ক্যাথিটার ব্যবহার করবেন।



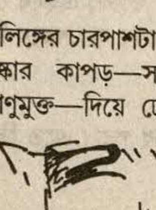
পেচ্ছাপের বিষক্রিয়ার (ইউরিমিয়া) লক্ষণ:

- শ্বাসে পেচ্ছাপের মত গন্ধ হয়।
- পা আর মুখ ফুলে যায়।
- বমি, কষ্ট আর মাথার গোলমাল হয়।

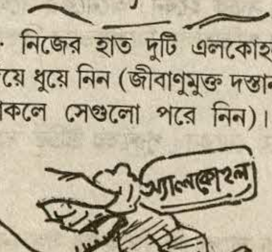
দ্রষ্টব্য: যে সব লোক পেচ্ছাপের কষ্ট, বড় হয়ে যাওয়া প্রস্টেট বা কিডনিতে পাথর থেকে ভুগছেন তাঁদের জরুরি অবস্থায় ব্যবহারের জন্য একটা ক্যাথিটার কিনে হাতের কাছে রাখা উচিত।

ক্যাথিটার কি ভাবে ব্যবহার করতে হয়

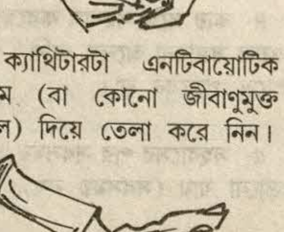
১· ক্যাথিটারটি ১৫ মিনিট ধরে ফোটান।



২· সাবান আর গরমজল দিয়ে ভালো করে লিঙ্গ এবং তার চারপাশের পুরো জায়গাটা ধুয়ে নিন।



৩· নিজের হাত দুটি ফোটানো জল আর সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।



৪· লিঙ্গের চারপাশটা একটা খুব পরিষ্কার কাপড়—সম্ভব হলে জীবাণুমুক্ত—দিয়ে ঢেকে দিন।



৫· নিজের হাত দুটি এলকোহল দিয়ে ধুয়ে নিন (জীবাণুমুক্ত দস্তানা থাকলে সেগুলো পরে নিন)।

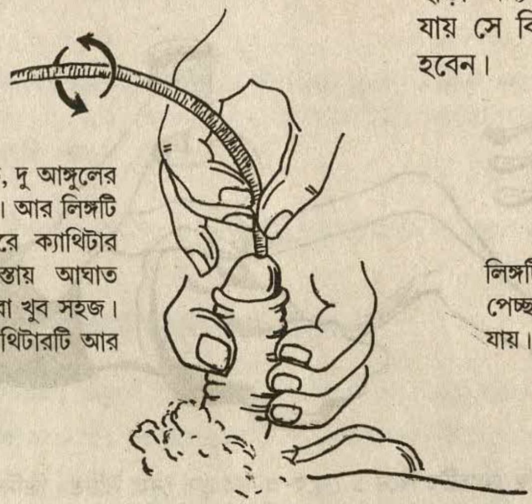


৬· ক্যাথিটারটা এনটিবায়োটিক মলম (বা কোনো জীবাণুমুক্ত তেল) দিয়ে তেলা করে নিন।



৭· একটু একটু করে খুব সাবধানে ক্যাথিটারটি ঢোকান।

ক্যাথিটারটি যাতে লিঙ্গের ফুটো আর আপনার হাত ছাড়া অন্য কিছুতে না ছোঁয়া যায় সে বিষয়ে খুব সাবধান হবেন।



ক্যাথিটারটি যদি সহজে না ঢোকে, দু আঙ্গুলের মাঝে সেটা আস্তে আস্তে ঘোরান। আর লিঙ্গটি নাড়ান, কিন্তু কখনো জোর করে ক্যাথিটার ঢোকাবেন না। পেচ্ছাপের রাস্তায় আঘাত লাগিয়ে গুরুতর সমস্যা তৈরি করা খুব সহজ। পেচ্ছাপ বার হতে শুরু হলে ক্যাথিটারটি আর ঢোকাবার চেষ্টা করবেন না।

লিঙ্গটি এইভাবে রাখুন যাতে পেচ্ছাপের নল বেঁকে না যায়।

জরুরি :

রোগীর পেচ্ছাপের বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা গেলে সমস্ত পেচ্ছাপটা একসঙ্গে বার হতে দেবেন না। বরং খুব ধীরে ধীরে ১ বা ২ ঘন্টা ধরে একটু একটু করে বার হতে দেবেন।

প্রসবের পর মেয়েদের অনেক সময় পেচ্ছাপ করতে কষ্ট হয়। ক্যাথিটার পরানোও দরকার হয়। পদ্ধতিটা একই কিন্তু মেয়েদের পেচ্ছাপের নলটা অনেক ছোট।

মেয়েদের সমস্যা :

যোনির স্রাব
(যোনি থেকে যে শ্লেষ্মা বা পুঁজের মত জিনিস বেরিয়ে আসে) :

সব মেয়েরেই স্বাভাবিক ভাবে যোনি থেকে একটা পরিষ্কার দুধের মত বা সামান্য হলদে স্রাব হয়। যদি কোনো চুলকানি বা দুর্গন্ধ না থাকে, তবে হয়তো কোনো সমস্যা নেই।

কিন্তু অনেক মেয়ে বিশেষ করে গর্ভবতী অবস্থায়, একরকম স্রাব থেকে ভোগে, তাতে প্রায়ই যোনিতে চুলকোয়। এই স্রাব নানারকম সংক্রমণ থেকে হতে পারে। এগুলোর বেশির ভাগই বিরক্তিকর কিন্তু বিপজ্জনক নয়।

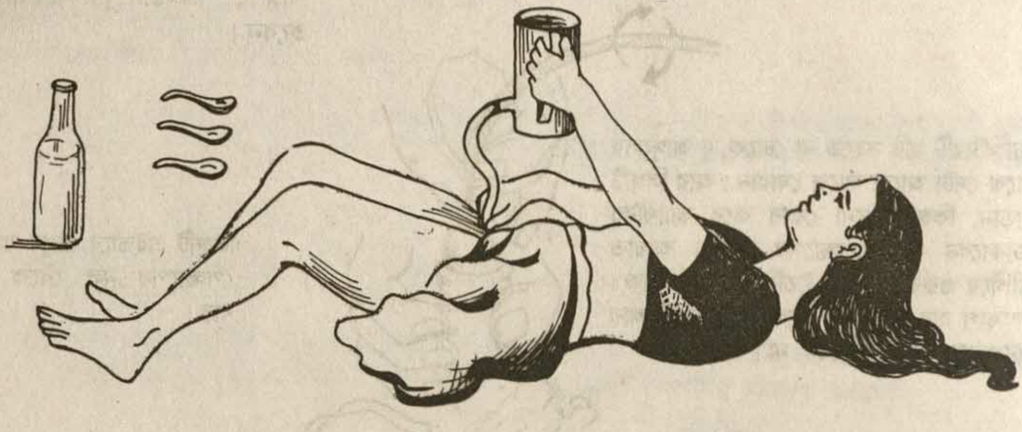
১· **প্যাৎলা, ফেনা ফেনা, সবজে হলুদ বা সাদাটে দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব সঙ্গে চুলকুনি**। এটা হয়তো **ট্রাইকোমোনাসের** সংক্রমণ। পেচ্ছাপ করতে জ্বালা করে, কখনো কখনো যৌন অঙ্গগুলিতে ব্যথা করে বা ফুলে যায়।

চিকিৎসা :

- যৌন অঙ্গগুলি পরিষ্কার রাখাটা খুবই জরুরি।

● ভিনিগার দেয়া (অল্প গরম জল দিয়ে) যোনি ধুলে বা ডুস নিলে সাহায্য হয়।

১ লিটার ফোটানো জলে
৩ চামচ ভিনিগার দিন।



ভালো না হওয়া পর্যন্ত মেয়েটির দিনে ১ থেকে ৩ বার ডুস নেয়া উচিত। ভিনিগার না থাকলে জলে পাতিলেবুর রস মেশাবেন।

● গুরুতর অবস্থায় মেট্রোনিডাজোল বা ট্রাইকোমোনাসের অন্য ওষুধ দেয়া যোনির ভেতরে দেবার ওষুধ (**এস ভি ডি পেসারি**) (পৃঃ ৪০৯) ব্যবহার করুন। খুব গুরুতর অবস্থায় মেট্রোনিডাজোল খাবেন। ১০ দিন ধরে দিনে ৩ বার করে ২০০ মিঃ গ্রাঃ খাবেন। সাবধানতা এবং নির্দেশের জন্যে পৃঃ ৪০৭ দেখুন।

জরুরি :

কোনো মেয়ের ট্রাইকোমোনাস হলে তার স্বামীরও ওই সংক্রমণ হওয়া সম্ভব। কিন্তু সে কিছু বুঝতে নাও পারে (ট্রাইকোমোনাস হলে কিছু পুরুষের পেচ্ছাপ করার সময় জ্বালার ভাব হয়)। চিকিৎসার পরেও যদি কোনো মেয়ের আবার গুরুতর সংক্রমণ হয় তবে সে আর তার স্বামী দুজনেরই একই দিনে শুরু করে একই চিকিৎসা করানো উচিত। সংক্রমণ কঠিন হলে মেট্রোনিডাজোল খান। সহবাসের সময় স্বামীর নিরোধ পরা উচিত।

২· ছানা বা ঘোলের মত দেখতে সাদা স্রাব তাতে ছাতা, মসনে বা পাঁউরুটি সেঁকার মত গন্ধ থাকে, এটা ছত্রাকের সংক্রমণ হতে পারে (মনিলিয়াসিস, থ্রাশ)। সাংঘাতিক চুলকানি হতে পারে। যোনির ঠোঁট দুটি টকটকে লাল দেখায়, ব্যথা করে, পেচ্ছাপ করার সময় জ্বালা করে। গর্ভবতী মেয়েদের বেলায় অথবা অসুস্থ, বহুমূত্রের রোগী (পৃঃ ১৪৯) বা যারা এনটিবায়োটিক বা জন্ম নিয়ন্ত্রণের বড়ি খেয়েছে তাদের বেলায় থ্রাশ বেশি দেখা যায়।

চিকিৎসা :

বহুমূত্র আছে কিনা দেখতে পেচ্ছাপ পরীক্ষা করান (পৃঃ ১৪৯)।

ভিনিগার মেশানো জল বা ১০০ ভাগ জলে ২ ভাগ জেনসিয়ান ভায়োলেট (আধ লিটারে ২ চামচ) মিশিয়ে ডুস নিন। অথবা নিসট্যাটিন যোনির বড়ি বা অন্য কোনে যোনিতে ঢোকাবার মনিলিয়াসিসের ওষুধ ব্যবহার করুন। মাত্রা আর নির্দেশের জন্যে পৃঃ ৪০৮ দেখুন। যোনির মধ্যে দই লাগানোকে ছত্রাকের সংক্রমণের একটা ঘরোয়া ওষুধ বলা হয়।

সাবধান : এই ধরনের সংক্রমণে কখনো এনটিবায়োটিক ব্যবহার করবেন না।এনটিবায়োটিকে ছত্রাকের সংক্রমণ বেড়ে যায়।

৩· **পুরু দুধের মত স্রাব তাতে পচা তেলের গন্ধ।** এটা **হিমোফাইলাস** বলে একটা জীবাণুর সংক্রমণ হতে পারে। ট্রাইকোমোনাস সংক্রমণের থেকে এটার তফাৎ বুঝতে বিশেষ পরীক্ষা দরকার হতে পারে। ভিনিগার মেশানো জল দিয়ে ডুস নিন। এছাড়া ২ সপ্তাহ ধরে দিনে দুবার করে যোনির ভেতরে দেবার সালফাথিয়াজোলের বড়ি (পৃঃ ৪০৮) ব্যবহার করুন।

৪· **জলের মত, খয়েরি বা ছাইরঙের স্রাব, তাতে রক্তের ছিটে আর দুর্গন্ধ।** এগুলো আরো কঠিন সংক্রমণের বা সম্ভবতঃ ক্যানসারের (পৃঃ ৩২৬) লক্ষণ। জ্বর থাকলে একটা এনটিবায়োটিক (সম্ভব হলে এমপিসিলিন পৃঃ ৩৯৯) ব্যবহার করুন। **সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারি সাহায্য নেবেন।**

জরুরি : যে কোনো স্রাব অনেক দিন ধরে থাকলে বা চিকিৎসায় ভালোর দিকে না গেলে স্বাস্থ্যকর্মীকে দেখাবেন।

মেয়েরা কি ভাবে অনেক সংক্রমণ এড়াতে পারে :

১· যৌন অঙ্গের জায়গাটা পরিষ্কার রাখুন। স্নানের সময় নরম সাবান দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেলুন।

২· সহবাসের পর পেচ্ছাপ করবেন। এতে পেচ্ছাপের সংক্রমণ এড়ানো যায় (কিন্তু পোয়াতি হওয়া এড়ানো যায় না)।

৩· প্রত্যেকবার মলত্যাগের পর যত্ন করে নিজেকে পরিষ্কার করে নিতে ভুলবেন না।

মেয়েদের তলপেটের মাঝখানে ব্যথা বা অস্বস্তি



এটা নানা রকম কারণে ঘটতে পারে, সেগুলো এই বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা করা হয়েছে। নিচের তালিকায় কয়েকটি প্রধান প্রশ্ন দেয়া হল ; কোথায় কোথায় খুঁজতে হবে তা জানতে এগুলো আপনাকে সাহায্য করবে।

তলপেটে ব্যথার যে সব কারণ হতে পারে :

১· **মাসিকের কষ্ট** (পৃঃ ২৯১)। ব্যথাটা কি মাসিকের ঠিক আগে বা মাসিকের সময়ে সবথেকে বেশি হয়?

২· **পেচ্ছাপের থলিতে সংক্রমণ** (পৃঃ ২৭৯) এই কারণে তলপেটের মাঝে ব্যথা সবথেকে বেশি দেখা যায়। পেচ্ছাপ কি খুব ঘনঘন হচ্ছে বা যন্ত্রণাদায়ক হচ্ছে?

৩· **ছত্রাকের সংক্রমণ** (পৃঃ ২৮৬) বা **ট্রাইকোমোনাস** (পৃঃ ২৮৬)। এগুলো কখনো কখনো জরায়ুতে বা ডিম্বাশয়ে যাবার নলে ঢুকে পড়ে। যোনিতে কি স্রাব রয়েছে? স্রাবটা কি রকম?

৪· **তলপেটের ভেতরে প্রদাহ ঘটানো রোগ।** এটা সাধারণতঃ গনোরিয়ার (পৃঃ ২৮০) শেষের দিকের অবস্থা। রোগটা তীব্র হয়ে পেরিটোনাইটিস বা

এপেনডিসাইটিসের মত লক্ষণ দেখা দিতে পারে। আবার পুরোনোও হতে পারে। তাতে তলপেটে একটানা বা থেকে থেকে ব্যথা বা অস্বস্তি থাকে; মাঝে মাঝে কাঁপুনি আর জ্বর হয়।

৫· **তলপেটে কোনো ঢিপি বা দলার সঙ্গে যে সব সমস্যার যোগ আছে।** এগুলো সম্বন্ধে পৃঃ ৩২৬-এ অল্প করে আলোচনা করা হয়েছে। এদের মধ্যে আছে **ওভারি বা ডিম্বাশয়ে সিস্ট, একটোপিক গর্ভ** (যখন শিশু জরায়ুর বাইরে বাড়তে থাকে), আর **ক্যানসার।**

৬· **অন্ত্র বা মলনালিতে সংক্রমণ বা অন্য সমস্যা** (পৃঃ ১৯৮) ব্যথাটার সঙ্গে কি খাওয়া বা মলত্যাগের সম্পর্ক আছে?

এইসব সমস্যার মধ্যে কয়েকটা মারাত্মক কিছু নয়। আবার অন্য কয়েকটা বিপজ্জনক। এগুলোর তফাৎ ধরা সব সময় সহজ নয়। বিশেষ পরীক্ষার দরকার হতে পারে।

যন্ত্রণাটা চলছে হয়ে,
সন্দেহ রয় কারণ নিয়ে;
সারছেও না কম সময়ে—
ডাক্তারকে নাও দেখিয়ে।

যে সব পুরুষ আর মেয়ের সন্তান হয় না (নিষ্ফলা)

কখনো কখনো একজন পুরুষ ও একজন মেয়ে চেষ্টা করলেও মেয়েটি গর্ভবতী হয় না। হয় পুরুষ নয় মেয়েটি নিষ্ফলা বা বন্ধ্যা (গর্ভবতী অবস্থা ঘটাতে পারে না) হতে পারে। এটা সারাতে, অনেক সময় কিছুই করা যায় না, আবার অনেক সময় চিকিৎসায় ফল হয়—কারণটার ওপর নির্ভর করে।

নিষ্ফলতার সাধারণ কারণ:

১· **বন্ধ্যাত্ব।** পুরুষ বা মেয়ের শরীরের গঠন এমন যে তার কখনো সন্তান হতে পারে না। কয়েকজন পুরুষ এবং মেয়ে বন্ধ্যা হয়েই জন্মায়।

২· **দুর্বলতা বা কোনো পুষ্টির অভাব।** কিছু মেয়ের বেলায় সাংঘাতিক রক্তাল্পতা, অপুষ্টি বা আয়োডিনের অভাব গর্ভবতী হবার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়, অথবা এ থেকে পেটের অগঠিত ভ্রূণটি মরে যায়—হয়তো, গর্ভবতী হয়েছে সেকথা মা জানবার আগেই (গর্ভপাত পৃঃ ৩২৭)।

যে মেয়ে গর্ভবতী হতে পারছে না বা যার শিশু শুধু নষ্টই হয়ে যাচ্ছে তার যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার আর আয়োডিন দেয়া নুন খাওয়া উচিত; তার যদি সাংঘাতিক রক্তাল্পতা থাকে তবে তার আয়রনের বড়ি (পৃঃ ৪২৪) খাওয়া উচিত। এগুলো থেকে তার গর্ভবতী হয়ে একটি সুস্থ সন্তান হবার সম্ভাবনা বাড়বে।

৩· **পুরোনো সংক্রমণ** বিশেষ করে শ্রোণীর বা তলপেটের প্রদাহ ঘটানো রোগ (গনোরিয়া পৃঃ ২৮৭) মেয়েদের নিষ্ফলা হবার একটা প্রধান কারণ। রোগটা বেড়ে না গিয়ে থাকলে চিকিৎসায় কাজ হতে পারে। গনোরিয়া এড়ানো আর সময়ে চিকিৎসা করানো হলে বন্ধ্যা মেয়ের সংখ্যা কমবে।

৪· **পুরুষেরা** কখনো কখনো মেয়েদের গর্ভবতী করতে পারে না। কারণ তাদের স্বাভাবিকের থেকে কম শুক্রাণু থাকে। সহবাস না করে মেয়েটির "উর্বর দিনগুলি"—অর্থাৎ প্রতিমাসে আগের এবং পরের মাসিকের

মাঝামাঝি সময় (রীদম পদ্ধতি এবং শ্লেষ্মা পদ্ধতি পৃঃ ৩৩৯ এবং ৩৪০ দেখুন) পর্যন্ত কয়েকদিন অপেক্ষা করলে সাহায্য হতে পারে। এইভাবে মেয়েটি যে দিনগুলিতে গর্ভবতী হতে পারে সেই সময় সহবাস করে পুরুষ তার পুরো শুক্রাণু মেয়েটিকে দিতে পারবে।

সাবধান : যে সব পুরুষ ও মেয়ের সন্তান হয় না তাদের যে সব হরমোন বা অন্য ওষুধ সাধারণতঃ দেয়া হয় সেগুলোতে প্রায় কখনোই কোনো কাজ হয় না, বিশেষ করে পুরুষের বেলায়। ঘরোয়া ওষুধ আর ঝাড় ফুঁকেও কোনো কাজ হওয়া সম্ভব নয়। দেখবেন, যাতে কাজ হবে না সেসব জিনিসে যেন পয়সা নষ্ট করবেন না।

আপনি যদি একজন মেয়ে হন, আর আপনার সন্তান না হয়, তবুও অনেকভাবে আপনার জীবন সুখী আর সার্থক হতে পারে :



- যে সব সন্তানের বাপ মা নেই, যারা একটা পরিবারে আশ্রয় চায়, আপনি হয়তো তাদের দেখাশুনা বা পালন করতে পারেন।
- আপনি হয়তো একজন স্বাস্থ্যকর্মী হতে বা আপনার সমাজকে অন্য ভাবে সাহায্য করতে পারেন। যে ভালোবাসা আপনি নিজের সন্তানদের দিতেন সেটা অন্যদের দিলে সকলেরই ভালো হবে।
- আপনি হয়তো এমন একটা গ্রামে থাকেন যেখানে সন্তান না হলে মেয়েদের পক্ষে সেটা লজ্জার বলে মনে করা হয়। আপনি অন্য কয়েকজনকে নিয়ে একটা দল গড়ে যাদের বিশেষ দরকার তাদের সাহায্য করে দেখাতে পারেন যে সন্তান হওয়াটাই মেয়েদের একমাত্র সার্থকতা নয়।

পরিচ্ছেদ

১৯ মায়েদের আর ধাইদের জন্যে খবরাখবর

মাসিক :
(মেয়েদের মাসে মাসে রক্তস্রাব)

বেশির ভাগ মেয়ের ১১ থেকে ১৬ বছর বয়সের মধ্যে প্রথম 'মাসিক' বা মাসের রক্তস্রাব হয়। এর মানে হল এখন তাদের গর্ভবতী হবার মত যথেষ্ট বয়স হয়েছে।

স্বাভাবিক মাসিক ২৮ দিনের মত সময়ের অন্তর অন্তর হয়ে ৩ থেকে ৬ দিন থাকে। তবে বিভিন্ন মেয়েদের বেলায় এটার অনেক তফাৎ হয়।

অন্য সব সময়ের মতোই মাসিকের সময়ও মেয়েদের পরিষ্কার থাকতে, যথেষ্ট ঘুমোতে, আর সুষম খাবার খেতে যত্ন নেয়া উচিত। সে যা যা স্বাভাবিকভাবে খায় তাই খেতে পারে, আর সাধারণ কাজকর্ম করে যেতে পারে। মাসিকের সময় সহবাস করলে ক্ষতি হয় না।

অল্প বয়সী (কিশোরী) মেয়েদের বেলায় মাসিক প্রায়ই অনিয়মিত বা যন্ত্রণাদায়ক হয়। সাধারণতঃ এতে কোনো গোলমাল বোঝায় না।

আপনার মাসিক যন্ত্রণাদায়ক হলে :

বিছানায় শুয়ে থাকার কোনো দরকার নেই। সত্যি বলতে কি চুপচাপ শুয়ে থাকলে ব্যথা বাড়তে পারে।



হেঁটে বেড়ালে বা হালকা কাজ বা ব্যায়াম করলে সাধারণতঃ উপকার হয়।



অথবা গরম তরল খাবার খেলে বা গরম জলে পা ডুবিয়ে রাখলেও লাভ হয়।



এছাড়া, ব্যারালগান (পৃঃ ৪১৬) খেলে বা পেটের ওপর গরম সেঁক দিলে উপকার হতে পারে। মেয়েদের প্রতিদিন মাসিকের প্যাড বদলানো উচিত। কাপড় ব্যবহার করলে প্রতিদিন তা ধুয়ে বদলে ফেলা উচিত।

মাসিকের সমস্যার লক্ষণ:

● কয়েকজন মেয়ের বেলায় দুটি মাসিকের মধ্যে সময়ের তফাৎ কমবেশি হওয়াটা স্বাভাবিক, কিন্তু অন্য কয়েকজনের বেলায় এটা পুরোনো কোনো রোগ, রক্তাল্পতা, অপুষ্টি বা হয়তো জরায়ুতে কোনো সংক্রমণ বা টিউমারের লক্ষণ হতে পারে।

● যে সময়ে হওয়া উচিত তখন মাসিক না হলে সেটা পোয়াতি অবস্থার লক্ষণ হতে পারে। তবে যে সব মেয়েদের কিছুদিন আগে মাসিক হতে শুরু হয়েছে বা ৪০ বছরের বেশি বয়সের মেয়েদের বেলায় দু একবার মাসিক না হওয়া বা অনিয়মিত মাসিক হওয়াটা সাধারণতঃ স্বাভাবিক। দুশ্চিন্তা বা মানসিক চাঞ্চল্য থেকেও মাসিক বন্ধ হতে পারে।

● পোয়াতি অবস্থায় রক্তস্রাব শুরু হলে সেটা প্রায় সব সময়ই গর্ভপাত হওয়ার প্রথম অবস্থা (পেটে বড় হতে থাকা শিশুর মৃত্যু পৃঃ ৩২৭) বোঝায়।

● **মাসিক ৬ দিনের বেশি চললে, অস্বাভাবিক রকম বেশি রক্তস্রাব হলে বা মাসে একবারের বেশি হলে, ডাক্তারি সাহায্য নেবেন।**

ঋতুবন্ধ :
(মেয়েদের মাসিক বন্ধ হওয়া)

ঋতুবন্ধ হল মেয়েদের জীবনে এমন একটা সময় যখন মাসিক হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। ঋতুবন্ধের পর মেয়েদের আর সন্তান জন্মায় না। সাধারণতঃ ৪০ থেকে ৫০ বছর বয়সের মধ্যে এই 'জীবনের পরিবর্তন' ঘটে। পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবার আগের কয়েক মাস মাসিক প্রায়ই অনিয়মিত হয়ে যায়।



ঋতুবন্ধের সময় একজন মেয়ের নানারকম অসুবিধা—দুশ্চিন্তা, কষ্ট, হঠাৎ গরম লেগে অস্বস্তি হওয়া, সারা শরীরে ঘুরে বেড়ানো যন্ত্রণা, মনখারাপ ইত্যাদি—হওয়াটা স্বাভাবিক। ঋতুবন্ধের সময়টা পার হয়ে গেলে, বেশির ভাগ মেয়ে আবার সুস্থ বোধ করে।

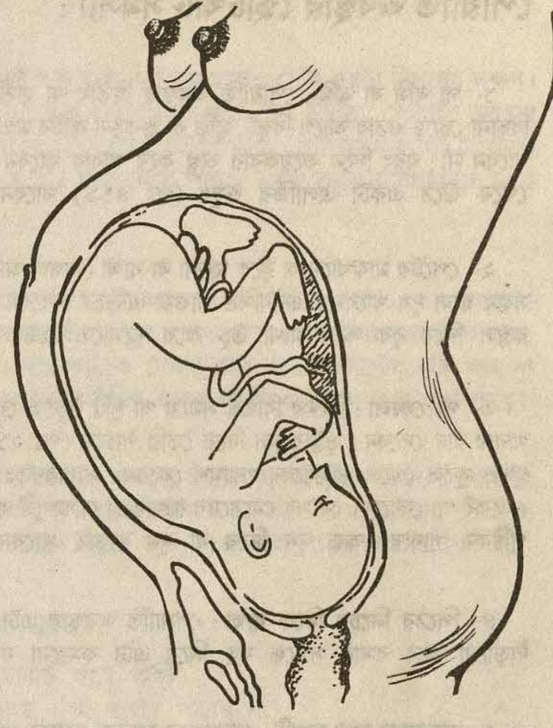
ঋতু বন্ধের সময় সাংঘাতিক রক্তস্রাব বা পেটে খুব যন্ত্রণা হলে, অথবা রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যাবার কয়েক মাস বা বছর পরে আবার শুরু হলে ডাক্তারি সাহায্য নেয়া উচিত। ক্যানসার বা অন্য কঠিন রোগ (পৃঃ ৩২৬) হয়েছে কিনা দেখার জন্যে একটা পরীক্ষা দরকার হবে।

পোয়াতি অবস্থা :

পোয়াতি অবস্থার লক্ষণ :

এইগুলি স্বাভাবিক লক্ষণ :

- মেয়েটির মাসিক হয় না (এটাই সাধারণতঃ প্রথম লক্ষণ)।
- সকালের বমি (বমি পাওয়া বা বমি হবে এই রকম ভাব—বিশেষ করে সকালে)। এটা পোয়াতি অবস্থার দ্বিতীয় আর তৃতীয় মাসে বাড়ে।
- ঘনঘন পেচ্ছাপ হতে পারে।
- পেটটা ক্রমশঃ বড় হতে থাকে।
- স্তন দুটি বড় হতে থাকে।
- পোয়াতি অবস্থার মুখোস (মুখে, স্তনে, পেটে কালচে দাগ)।
- সবশেষে, পাঁচ মাসের মত সময়ে, শিশু জরায়ুর মধ্যে নড়াচড়া শুরু করে।



এটা ৯ মাসে মায়ের পেটে শিশুর স্বাভাবিক অবস্থান

পোয়াতি অবস্থায় কি ভাবে সুস্থ থাকতে হয় :

- **ভালো খাওয়াদাওয়া** করাটা খুবই জরুরি। প্রোটিন, ভিটামিন আর খনিজ পদার্থ, বিশেষ করে লোহায় ভরা খাবার শরীরের দরকার হয় (এই বইয়ের পরিচ্ছেদ ১১ পড়ুন)।
- শিশু মরা অবস্থায় জন্মানোর বা জড়বুদ্ধি হবার বিপদ কম করার জন্যে **আয়োডিন দেয়া নুন** খান, (তবে পা ফোলা আর অন্যান্য সমস্যা এড়ানোর জন্যে বেশি নুন খাবেন না)।
- **পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবেন**। নিয়মিত স্নান করবেন বা গা ধোবেন; প্রতিদিন দাঁত মাজুন।
- পোয়াতি অবস্থার শেষ মাসে জলের থলি ভেঙে যাতে সংক্রমণ না হয় তার জন্যে **সহবাস না করাই** হয়তো ভালো।
- সম্ভব হলে **ওষুধ খাওয়া বাদ দেবেন**। কোনো কোনো ওষুধে পেটের বাড়ন্ত শিশুর ক্ষতি হয়। নিয়ম হল, শুধু কোনো স্বাস্থ্যকর্মী বা ডাক্তারের দেয়া ওষুধ খাবেন। যদি আপনার মনে হয় আপনি পোয়াতি হয়েছেন, কোনো স্বাস্থ্যকর্মী আপনাকে কোনো ওষুধ দেবার সময় সে কথা তাকে বলবেন। কখনো কখনো দরকার হলে এসপিরিন বা এনটাসিড খেতে পারেন। ঠিক মাত্রায় খেলে ভিটামিন আর আয়রনের বড়ি সাধারণতঃ উপকারে লাগে; ক্ষতি করে না।
- পোয়াতি অবস্থায় **ধূমপান বা মদ্যপান করবেন না**। ধূমপান আর মদ্যপান মায়ের পক্ষে খারাপ আর পেটের শিশুর ক্ষতি করে।
- ছেলেপিলের হাম বিশেষ করে **জার্মান হাম** (রুবেলা পৃঃ ৩৫৯) হলে তাদের থেকে দূরে থাকবেন।
- কাজ আর **ব্যায়াম** করে যাবেন, কিন্তু যাতে খুব ক্লান্ত না হয়ে পড়েন সেই চেষ্টা করবেন।

পোয়াতি অবস্থার ছোটখাট সমস্যা :

১· **গা বমি বা বমি** : পোয়াতি অবস্থার দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে সকালের দিকে এটা সাধারণতঃ বাড়ে। সকালে বিছানা ছেড়ে ওঠার আগে বিস্কুট, মুড়ি বা শুকনো রুটির মত কোনো শুকনো খাবার খেলে সুবিধে হয়। এক সঙ্গে বেশি খাবেন না ; বরং দিনে কয়েকবার অল্প করে খাবার খাবেন। অবস্থা সাংঘাতিক হলে শোবার সময় আর সকালে ঘুম থেকে উঠে একটা এলার্জির ওষুধ (পৃঃ ৪১৯) খাবেন। তেলা খাবার বাদ দেবেন।

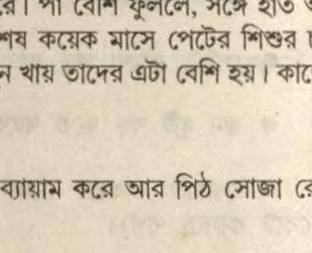
২· পেটের মাঝখানে বা বুকে **জ্বালা বা ব্যথা** (অম্বল আর বুকজ্বালা পৃঃ ১৪৯)। একবারে শুধু অল্প খাবার খাবেন। সম্ভব হলে দুধ খাবেন। এনটাসিড খাওয়া এড়িয়ে চলবেন। শক্ত লজেন্সের মত কিছু খেলে সাহায্য হয়। বালিশ বা কম্বল দিয়ে বুক আর মাথা উঁচু করে ঘুমোতে চেষ্টা করবেন।

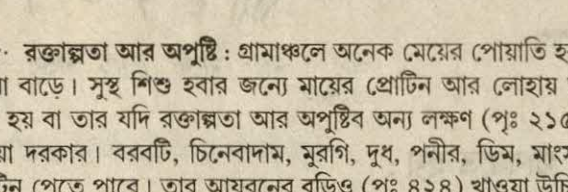
৩· **পা ফোলা** : দিনের বিভিন্ন সময়ে পা দুটি উঁচুতে রেখে (পৃঃ ২১৫) বিশ্রাম নেবেন। নুন কম খাবেন, নোনতা খাবার বাদ দেবেন। ভুট্টার চুল দিয়ে তৈরি পাঁচনে (পৃঃ ২১) উপকার হতে পারে। পা বেশি ফুললে, সঙ্গে হাত আর মুখও ফুলে গেলে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। সাধারণতঃ পোয়াতি অবস্থার শেষ কয়েক মাসে পেটের শিশুর চাপ থেকেই পা ফোলে। যে সব মেয়েদের রক্তাল্পতা বা অপুষ্টি আছে বা যারা প্রচুর নুন খায় তাদের এটা বেশি হয়। কাজেই **পুষ্টিকর খাবার—অল্প নুন দিয়ে বা নুন ছাড়াই খাবেন।**

৪· **পিঠের নিচের দিকে ব্যথা** : পোয়াতি অবস্থায় এটা প্রায়ই দেখা যায়। ব্যায়াম করে আর পিঠ সোজা রেখে দাঁড়ানো আর বসার সম্বন্ধে যত্ন নিয়ে এটা কমানো যায় (পৃঃ ২১২)।

৫· **রক্তাল্পতা আর অপুষ্টি** : গ্রামাঞ্চলে অনেক মেয়ের পোয়াতি হবার আগেই রক্তাল্পতা থাকে। পোয়াতি হলে সেটা আরো বাড়ে। সুস্থ শিশু হবার জন্যে মায়ের প্রোটিন আর লোহায় ভরা খাবার দরকার। সে যদি খুব ফ্যাকাসে আর দুর্বল হয় বা তার যদি রক্তাল্পতা আর অপুষ্টিব অন্য লক্ষণ (পৃঃ ২১৫ আর পৃঃ ১৪৬) থাকে, তবে তার বেশি প্রোটিন খাওয়া দরকার। বরবটি, চিনেবাদাম, মুরগি, দুধ, পনীর, ডিম, মাংস, মাছ, গাঢ় সবুজ রঙের শাক খেলে সে বেশি প্রোটিন পেতে পারে। তার আয়রনের বড়িও (পৃঃ ৪২৪) খাওয়া উচিত, বিশেষ করে যদি যথেষ্ট পুষ্টিকর খাবার পাওয়া কঠিন হয়। এইভাবে সে তার রক্তে শক্তি এনে প্রসবের পরের বিপজ্জনক রক্তপাত বন্ধ করতে পারে। সম্ভব হলে আয়রনের বড়ির মধ্যে কিছুটা ফলিক এসিড আর সি ভিটামিন থাকা উচিত।

৬· **শিরা ফুলে যাওয়া (ভেরিকোজ শিরা)** : পায়ের থেকে যে শিরাগুলি বার হয় তার ওপর শিশুর ওজন চাপ দেয় বলে পোয়াতি অবস্থায় এই সমস্যা প্রায়ই দেখা যায়। পা দুটি ঘনঘন উঁচু করে রাখবেন, যতটা উঁচু করে রাখা যায় (পৃঃ ২১৩)। শিরাগুলি খুব বড় হয়ে গেলে বা ব্যথা হলে, ইলাস্টিক ব্যাণ্ডেজ দিয়ে এইভাবে মুড়ে রাখুন। রাত্রে ব্যাণ্ডেজগুলি খুলে ফেলবেন।





৭· **অর্শ** : এগুলো মলদ্বারে ভেরিকোজ শিরা। পেটের শিশুর ওজনের ফলে এগুলি হয়।

ব্যথা কমাবার জন্যে, এইভাবে পাছা উঁচু করে হাঁটু মুড়ে থাকুন।

এছাড়া, পৃঃ ২১৩ দেখুন।

৮· **কোষ্ঠকাঠিন্য** : প্রচুর জল খাবেন। ফল আর স্বাভাবিক ছিবড়ে দেয়া খাবার, যেমন—ফল, সাবু, ভুষি এসব খান। প্রচুর ব্যায়াম করুন। কড়া জোলাপ খাবেন না।

পোয়াতি অবস্থায় বিপদের লক্ষণ :

১· **রক্তপাত :** পোয়াতি অবস্থায় কোনো মেয়ের রক্তপাত শুরু হলে, খুব কম হলেও সেটা একটা বিপদের লক্ষণ। তার হয়তো গর্ভপাত হতে চলেছে। মেয়েটির চুপচাপ শুয়ে থেকে স্বাস্থ্যকর্মীকে খবর দেয়া উচিত। পোয়াতি অবস্থার শেষের দিকে (৬ মাসের পর) রক্তপাত হলে *প্ল্যাসেন্টা (ফুল)* প্রসবের দ্বারে আটকে থাকা *(ফুল আগে থাকা)* বোঝাতে পারে। অভিজ্ঞ লোকের সাহায্য না পেলে রক্তপাত হয়ে মেয়েটি মারা যেতে পারে। তখনি তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার চেষ্টা করুন।

২· **সাংঘাতিক রক্তাল্পতা :** মেয়েটি দুর্বল, ক্লান্ত হয়ে যায়, তার গা ফ্যাকাসে বা স্বচ্ছ দেখায় (পৃঃ ১৪৬ রক্তাল্পতার লক্ষণ দেখুন)। চিকিৎসা না করালে প্রসবের সময় রক্তপাত থেকে সে মারা যেতে পারে। রক্তাল্পতা সাংঘাতিক হলে, সময়ে অবস্থার উন্নতির জন্যে ভালো খাবার যথেষ্ট নয়। স্বাস্থ্যকর্মীকে দেখান আর আয়রন সল্টের বড়ি খান বা ইনজেকশন নিন (পৃঃ ৪২৪)। সম্ভব হলে হাসপাতালে প্রসব হওয়া উচিত, কারণ বাড়তি রক্তের দরকার হতে পারে।

৩· পা, হাত আর মুখ **ফোলার** সঙ্গে মাথাধরা, মাথা ঝিমঝিম করা, কখনো কখনো ঝাপসা দৃষ্টি—এগুলো পোয়াতি অবস্থায় **টকসিমিয়া বা বিষক্রিয়ার লক্ষণ**। অন্য জরুরি লক্ষণ হল, হঠাৎ ওজন বাড়া, রক্তচাপ বাড়া, আর পেচ্ছাপে বেশি প্রোটিন। কাজেই যদি পারেন, এমন একজন ধাইয়ের কাছে যান, যারা এগুলো মাপতে পারেন।

পোয়াতি অবস্থায় টকসিমিয়ার চিকিৎসার জন্যে মায়ের উচিত:

- চুপচাপ থেকে অন্ততঃ দুপুরে কয়েক ঘন্টা বিছানায় শুয়ে থাকা।
- নুন বাদ দেয়া (নুন দেবেন না, নুন যাতে আছে সেই খাবার খাবেন না)।
- যদি তাড়াতাড়ি ভালোর দিকে না যায়, আর তার দেখার অসুবিধা হয়, মুখ বেশি ফুলে যায় বা ফিট হয়, তাড়াতাড়ি ডাক্তারি সাহায্য নিন। মেয়েটির প্রাণ যাবার ভয় আছে।

পোয়াতি অবস্থার শেষের ৩ মাসের সময় :



যদি আপনার মাথাধরা বা দেখার অসুবিধা হয়।

এবং

যদি আপনার মুখ আর হাত দুটি ফুলে যেতে শুরু হয়, আপনার হয়তো **গর্ভাবস্থার টকসিমিয়া** হয়েছে।

ডাক্তারি সাহায্য নিন !

যদি শুধু পা দুটি ফোলে, তবে এটা হয়তো গুরুতর কিছু নয়। কিন্তু টকসিমিয়ার অন্যান্য লক্ষণ দেখা দিচ্ছে কিনা সেদিকে নজর রাখুন। অল্প নুন খান বা একেবারে খাবেন না।

গর্ভাবস্থার টকসিমিয়া এড়ানোর সাহায্য করতে : পুষ্টিকর খাবার খান ; যথেষ্ট প্রোটিন পাচ্ছেন কিনা দেখুন (পৃঃ ১২৮), নুন খুব কম খাবেন।

পোয়াতি অবস্থায় চেক আপ বা সবকিছু দেখে নেয়া, (প্রসবের আগের যত্ন)

অনেক স্বাস্থ্যকর্মী আর ধাই প্রসবের আগে নিয়মিত দেখিয়ে নেয়ার জন্যে পোয়াতি মেয়েদের তাঁদের কাছে এসে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে দরকারি কথাবার্তা বলার ব্যাপারে উৎসাহ দেন। আপনি পোয়াতি হলে, যদি এই দেখিয়ে নেবার সুযোগগুলি পান তবে নানারকম সমস্যা এড়ানোর আর সুস্থ শিশু হবার ব্যাপারে অনেক কিছু জানতে পারবেন।

আপনি যদি একজন ধাই হন তবে প্রসবের আগে দেখিয়ে নেবার জন্যে মেয়েদের ডাকবেন বা তাদের দেখতে যাবেন। এতে আপনি ভবিষ্যৎ মায়েদের (আর ভবিষ্যৎ শিশুদের) জন্যে একটা খুব জরুরি কাজ করে দিতে পারবেন। পোয়াতি অবস্থায় **প্রথম ৮ মাসে, প্রতি মাসে একবার করে** আর **শেষের মাসে সপ্তাহে একবার করে** মায়েদের দেখালে ভালো হয়।

প্রসবের আগের যত্নের মধ্যে থাকা উচিত এমন কয়েকটি জরুরি জিনিস:

১· খবরাখবর ভাগাভাগি করে নেয়া:

মাকে তার সমস্যার কথা আর দরকারের কথা জিজ্ঞেস করুন। সে কবার পোয়াতি হয়েছে, শেষ কবে তার সন্তান হয়েছে, পোয়াতি অবস্থায় বা প্রসবের সময় তার কোনো সমস্যা হয়েছিল কিনা—এগুলি জেনে নিন। কি কি উপায়ে সে নিজেকে আর শিশুকে সুস্থ রাখতে পারে সে বিষয়ে তার সঙ্গে কথা বলুন। তার মধ্যে থাকবে

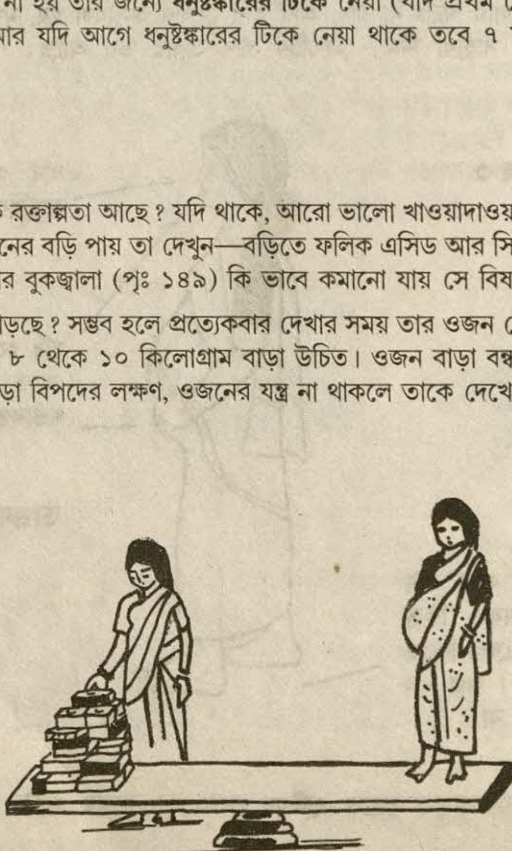
- **ঠিকমতো খাওয়া।** তাকে প্রোটিন, ভিটামিন, লোহা আর ক্যালসিয়াম ভরা খাবার (পরিচ্ছেদ ১১) খেতে উৎসাহ দিন।
- **সুস্বাস্থ্যের বিধি** (পরিচ্ছেদ ১২)।
- **কম ওষুধ খাওয়া বা একেবারেই না খাওয়ার** প্রয়োজনীয়তা (পৃঃ ৬৬)।
- **ধূমপান** (পৃঃ ১৭৮) আর **মদ্যপান** (পৃঃ ১৭৭) **না করার** প্রয়োজনীয়তা।
- যথেষ্ট **পরিশ্রম** আর **বিশ্রাম** নেয়া।
- কচি বাচ্চার যাতে ধনুষ্টঙ্কার না হয় তার জন্যে **ধনুষ্টঙ্কারের টিকে** নেয়া (যদি প্রথম দেয়া হয় তবে ৬ মাসে, ৭ মাসে, ৮ মাসে দেবেন। আর যদি আগে ধনুষ্টঙ্কারের টিকে নেয়া থাকে তবে ৭ মাসে একটা বুস্টার মাত্রা দেবেন)।

২· পুষ্টি

মাকে কি পুষ্ট দেখাচ্ছে? তার কি রক্তাল্পতা আছে? যদি থাকে, আরো ভালো খাওয়াদাওয়া করার উপায় আলোচনা করুন। সম্ভব হলে, সে যাতে আয়রনের বড়ি পায় তা দেখুন—বড়িতে ফলিক এসিড আর সি ভিটামিন থাকলে ভালো হয়। সকালের বমি (পৃঃ ২৯৪) আর বুকজ্বালা (পৃঃ ১৪৯) কি ভাবে কমানো যায় সে বিষয়ে তাকে পরামর্শ দিন।

তার ওজন কি স্বাভাবিকভাবে বাড়ছে? সম্ভব হলে প্রত্যেকবার দেখার সময় তার ওজন নেবেন। পোয়াতি অবস্থায় ৯ মাসে স্বাভাবিকভাবে তার ওজন ৮ থেকে ১০ কিলোগ্রাম বাড়া উচিত। ওজন বাড়া বন্ধ হওয়াটা খারাপ লক্ষণ। শেষের মাসগুলিতে হঠাৎ ওজন বাড়া বিপদের লক্ষণ, ওজনের যন্ত্র না থাকলে তাকে দেখে তার ওজন বাড়ছে কিনা বুঝতে চেষ্টা করুন।

অথবা একটা সাধারণ ওজনের যন্ত্র তৈরি করুন।



৩· ছোটখাট সমস্যা :

মাকে জিজ্ঞেস করুন তার পোয়াতি অবস্থার সাধারণ সমস্যাগুলির মধ্যে কোনোটা আছে কিনা। সেগুলি যে গুরুতর নয় সে কথা তাকে বুঝিয়ে যে পরামর্শ দিতে পারেন তাকে তাই দিন (পৃঃ ২৯৪)।

৪· বিপদের লক্ষণ :

পৃষ্ঠা ২৯৫-এ যে সব বিপদের লক্ষণ আছে তার কোনোটি আছে কিনা দেখে নিন। প্রতিবার দেখার সময় মায়ের **নাড়ি** দেখবেন। এতে পরে কোনো সমস্যা (যেমন—টকসিমিয়া বা সাংঘাতিক রক্তপাত থেকে আঘাত) হলে মায়ের স্বাভাবিক নাড়ির গতির সঙ্গে মেলাতে পারবেন। রক্তচাপ মাপার যন্ত্র থাকলে (পৃঃ ১৪৭) তা দিয়ে মায়ের **রক্তের চাপ** মাপবেন। তার **ওজন** নেবেন। নিচের বিপদের লক্ষণগুলি আছে কিনা বিশেষভাবে লক্ষ্য করে দেখবেন :

- হঠাৎ ওজন বাড়া
- হাত আর মুখ ফোলা
- রক্তের চাপ বাড়া

} পোয়াতি অবস্থায় টকসিমিয়ার লক্ষণ (পৃঃ ২৯৫)

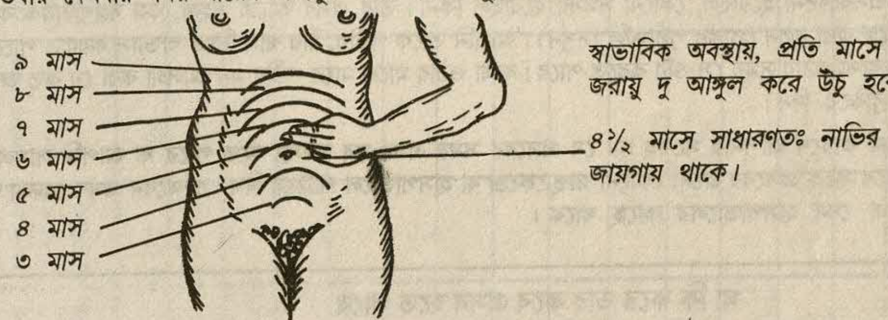
- সাংঘাতিক রক্তাল্পতা (পৃঃ ১৪৬)
- যে কোনো রকম রক্তপাত (পৃঃ ২৯৫)

পেচ্ছাপে প্রোটিন আর চিনি মাপার জন্যে অনেক ধাইয়ের কাছে "ডোবানোর কাঠি" বা অন্য উপায় থাকতে পারে। বেশি প্রোটিন টকসিমিয়ার একটা লক্ষণ হতে পারে। বেশি চিনি বহুমূত্রের লক্ষণ (পৃঃ ১৪৯)।

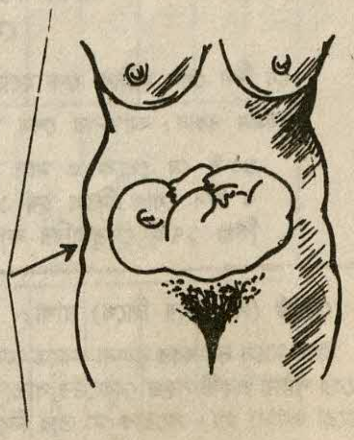
যদি বিপদের লক্ষণগুলির মধ্যে একটাও দেখা দেয়, দেখবেন মেয়েটি যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তারি সাহায্য পায়।

৫· জরায়ুর মধ্যে শিশুর বেড়ে ওঠা আর অবস্থান (ঠিক কোন জায়গায় থাকে)

প্রতিবার দেখবার সময় মায়ের জরায়ুর ওপর থেকে ছুঁয়ে দেখবেন, বা মাকে নিজেকে দেখতে শেখাবেন।



প্রতি মাসে জরায়ু নাভির ক' আঙ্গুল ওপরে বা নিচে আছে তা লিখে রাখবেন। যদি জরায়ু বেশি বড় বা অতিরিক্ত বাড়ছে বলে মনে হয় তবে তাতে স্বাভাবিকের থেকে বেশি জল থাকতে পারে। সেরকম হলে ভেতরে শিশুকে টের পেতে আপনার আরো বেশি অসুবিধে হতে পারে। জরায়ুতে অতিরিক্ত জল থাকলে প্রসবের সময় সাংঘাতিক রক্তপাতের ঝুঁকি বেশি হয়। আর শিশুর বিকৃতিও বোঝাতে পারে।



জরায়ুতে শিশু কি ভাবে আছে বলে মনে হয় তা বোঝার চেষ্টা করুন। যদি পাশ ফিরে আছে বলে মনে হয় তবে ব্যথা শুরু হবার **আগেই** মায়ের ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত, কারণ অপারেশনের দরকার হতে পারে। প্রসবের সময় কাছে এলে কি ভাবে থাকে তা দেখার জন্যে পৃঃ ৩০৩ দেখুন।

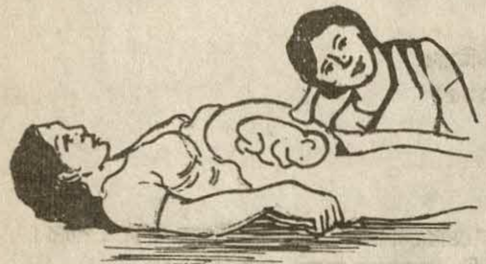
৬· শিশুর হার্টের স্পন্দন (ভ্রূণের হার্টের ধুকধুক):



ফিটোস্কোপ

৫ মাসের পর শিশুর হার্টের স্পন্দন শোনার চেষ্টা করুন আর সে নড়াচড়া করছে কিনা দেখে নিন। পেটের ওপর কান রেখে দেখতে পারেন। কিন্তু শোনাটা কঠিন হতে পারে। একটা *ফিটোস্কোপ* পেলে অনেক সহজ হবে। (কিংবা একটা তৈরি করে নিন। পোড়ামাটি বা শক্ত কাঠে ভালো কাজ হয়।)

শেষ মাসে যদি শিশুর হার্টের স্পন্দন নাভির নিচে সবথেকে জোরে শোনা যায়, শিশুর মাথা নিচের দিকে আছে আর হয়তো মাথা আগে জন্মাবে।



যদি নাভির ওপর দিকে সবথেকে জোরে হার্টের স্পন্দন শোনা যায়, তার মাথা হয়তো ওপরে আছে। এটা একটা ব্রীচ প্রসব (পাছা প্রথমে বার হয়) হতে পারে।



সেকেণ্ডের কাঁটা দেয়া ঘড়ি থাকলে শিশুর হার্টের স্পন্দন গুনে নিন। ১ মিনিটে ১২০ থেকে ১৬০ বার স্বাভাবিক। ১২০-র থেকে কম হলে, কিছু গোলমাল হয়েছে। অথবা আপনি হয়তো ভুল গুনছেন বা মায়ের হার্টের স্পন্দন শুনছেন। মায়ের নাড়ি দেখে নিন। শিশুর হার্টের স্পন্দন শোনা সাধারণতঃ শক্ত। অভ্যেস করতে হবে।

৭· মাকে প্রসবের জন্যে তৈরি করা:

জন্মের সময় এগিয়ে এলে মাকে আরো ঘনঘন দেখবেন। তার অন্য ছেলেমেয়ে থাকলে তাকে জিজ্ঞেস করুন কতক্ষণ তার প্রসববেদনা হয়েছিল, কোনো সমস্যা হয়েছিল কিনা। তার প্রসব আরো সহজ, কম যন্ত্রণাদায়ক করার বিষয়ে তার সঙ্গে কথা বলুন (পরের পৃষ্ঠাগুলি দেখুন)। আপনি তাকে গভীর, ধীর শ্বাস নিতে অভ্যাস করাতে পারেন। যাতে প্রসবের ব্যথা ওঠার সময় সে ওটা করতে পারে। ব্যথা ওঠার মাঝে মাঝে শরীর মন আলগা করা যে কত জরুরি সেটা তাকে বুঝিয়ে দিন।

যদি কোনো কারণে আপনার সন্দেহ হয় যে প্রসবের সময় এমন সব সমস্যা হতে পারে যা আপনি সামলাতে পারবেন না তবে মাকে প্রসবের জন্যে কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন। দেখবেন প্রসব বেদনা শুরু হবার সময় মা যেন হাসপাতালের কাছে থাকে।

মা কি করে তার কবে প্রসব হতে পারে সেই তারিখটা জানবে:

যে দিন শেষ মাসিক শুরু হয়েছিল সেই দিন থেকে ৩ মাস বাদ দিয়ে ৭ দিন যোগ দিন।

যেমন ধরুন: আপনার শেষ মাসিক ১০ই মে শুরু হয়েছিল।

১০ই মে থেকে ৩ মাস বাদ দিলে হয় ১০ই ফেব্রুয়ারি,
৭ দিন যোগ দিলে হয় ১৭ই ফেব্রুয়ারি।
শিশু ১৭ই ফেব্রুয়ারির কাছাকাছি দিনে জন্মাবে।

৮· রেকর্ড (সব খবর লিখে) রাখা:

মাসে মাসে সব খবর তুলনা করতে আর মা কেমন থাকছে দেখতে গেলে সহজভাবে সব লিখে রাখলে সুবিধা হয়। পরের পৃষ্ঠায় একটি সহজ রেকর্ডের পাতা রয়েছে। যেমন দরকার বুঝবেন ওটা বদলে নেবেন। আরো বড় কাগজ হলে আরো ভালো হয়। প্রত্যেক মা তার নিজের রেকর্ডের কাগজ রেখে, দেখাবার সময় সেটা নিয়ে আসতে পারে।

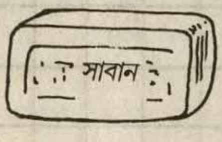
প্রসবের আগে মায়ের যে সব জিনিস তৈরি রাখা দরকার

পোয়াতি অবস্থায় সাত মাসের মধ্যে প্রত্যেক মায়ের নিচের জিনিসগুলি তৈরি রাখা দরকার:

অনেকগুলি খুব পরিষ্কার কাপড় বা কাঁথা



একটা এনটিসেপ্‌টিক সাবান (বা যে কোনো সাবান)।



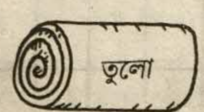
হাত আর নখ পরিষ্কার করার জন্যে একটা পরিষ্কার শক্ত ব্রাশ।



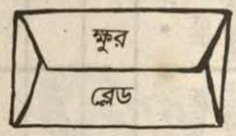
হাত ধোবার পর ঘষে নেবার জন্যে এলকোহল।



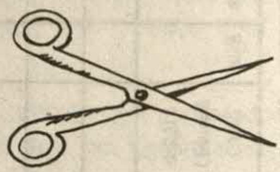
পরিষ্কার তুলো



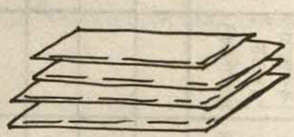
একটা নতুন ক্ষুর (নাড়ি কাটার ঠিক আগে অবধি মোড়ক খুলবেন না)।



(যদি নতুন ক্ষুর না থাকে, তবে একটা পরিষ্কার, মরচে না পড়া কাঁচি ঠিক করে রাখুন। নাড়ি কাটার ঠিক আগে সেটা ফুটিয়ে নিন।)



নাড়ি চাপা দেবার জন্যে জীবাণুমুক্ত গজ বা একদম পরিষ্কার কাপড়ের কয়েকটা টুকরো।



নাড়ি বাঁধার জন্যে দুটি পরিষ্কার ফিতে বা কাপড়ের ফালি।

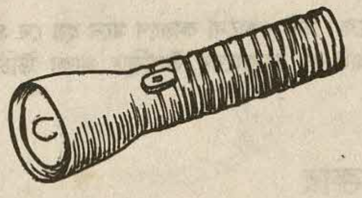




কাপড়ের টুকরোগুলি আর ফিতে দুটি কাগজে মুড়ে বন্ধ করে উনুনে সেঁকে বা ইস্ত্রি করে নেয়া উচিত।

ধাই বা প্রসবে সাহায্যকারীর ঠিকমতো তৈরি থাকার জন্যে আরো কয়েকটা জিনিস :

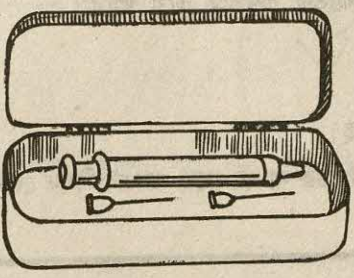
টর্চ



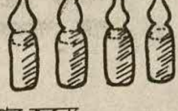
শিশুর নাক আর মুখের শ্লেষ্মা টেনে নেবার জন্যে সাকশন বালব বা ড্রপার।



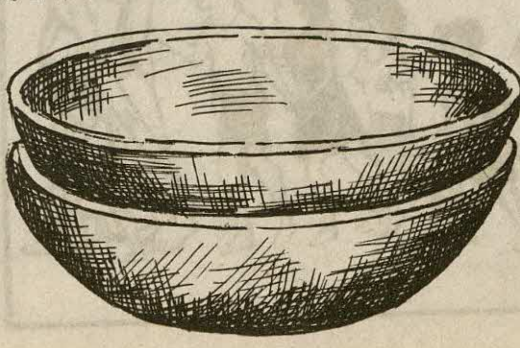
জীবাণুমুক্ত সিরিঞ্জ আর ছুঁচ।

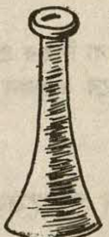


এরগোনোভিনের (বা এরগোমেট্রিন) কয়েকটি ইনজেকশন।



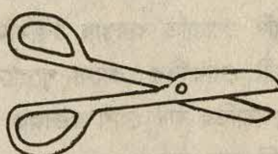
২ টি গামলা—হাত ধোবার জন্যে একটি, আর ফুলটা রেখে পরীক্ষা করার জন্যে একটি।



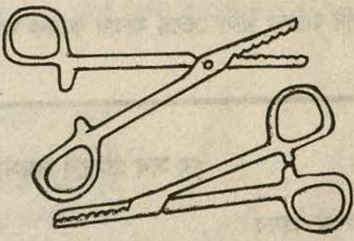


ফিটোস্কোপ—অথবা ভ্রূণের জন্যে স্টেথোস্কোপ : মায়ের পেটের মধ্যে দিয়ে শিশুর হার্টের স্পন্দন শোনার জন্যে।

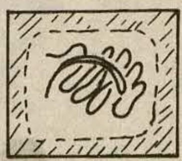
শিশু পুরো জন্মাবার আগেই তার নাড়ি কাটার জন্যে (শুধু খুব জরুরি অবস্থায়) ভোঁতা মুখের কাঁচি।



নাড়ি চেপে ধরার জন্যে বা প্রসবের দ্বার ছিঁড়ে শিরা দিয়ে রক্তপাত হলে সেগুলি চেপে ধরার জন্যে ২ টি চাপবার যন্ত্র।



প্রসবের দ্বার ছিঁড়ে গেলে তা সেলাই করার জন্যে জীবাণুমুক্ত ছুঁচ আর নাড়ির তৈরি সুতো।





শিশুর চোখে দেবার সিলভার নাইট্রেট ড্রপ।

প্রসবের জন্যে তৈরি হওয়া

শিশুর জন্ম একটা স্বাভাবিক ঘটনা। মা সুস্থ থাকলে আর সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে, কারো সাহায্য ছাড়াই শিশু জন্মাতে পারে। স্বাভাবিক প্রসবের বেলায় **ধাই বা প্রসবে সাহায্যকারী যত কম কাজ করে ততই সব কিছু ভালোভাবে হয়ে যায়।**

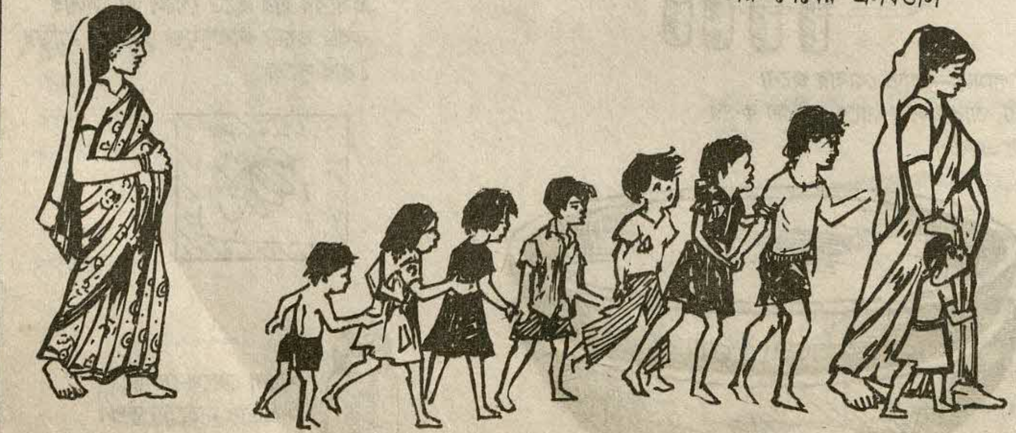
প্রসবে গোলমাল হয়, কখনো কখনো মা বা শিশুর প্রাণেরও ভয় থাকে। **যদি কোনো কারণে মনে হয় যে প্রসব গোলমেলে বা বিপজ্জনক হতে পারে, তবে একজন কাজ জানা ধাই বা ডাক্তারের উপস্থিত থাকা উচিত।**

যে সব বিপদের লক্ষণ থাকলে প্রসবের সময় ডাক্তার বা কাজ জানা ধাত্রী থাকার দরকার হয় :

- যদি প্রসববেদনার আগেই মায়ের রক্তস্রাব শুরু হয়।
- যদি পোয়াতি অবস্থায় টক্‌সিমিয়ার লক্ষণ থাকে (পৃঃ ২৯৫)।
- যদি পোয়াতির কোনো পুরোনো বা তীব্র রোগ হয়ে থাকে।
- পোয়াতির যদি বেশি রক্তাল্পতা থাকে বা কাটাকুটি হলে যদি তার স্বাভাবিকভাবে রক্তটা না জমে যায়।
- যদি তার আগের প্রসবের সময় বেশি গোলমাল বা সাংঘাতিক রক্তপাত হয়ে থাকে।
- তার যদি হার্নিয়া হয়ে থাকে।
- যদি মনে হয় যমজ হবে (পৃঃ ৩১৫)।
- যদি মনে হয় শিশু জরায়ুর মধ্যে স্বাভাবিক জায়গায় নেই।
- যদি জলের থলি ভেঙে যাবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রসববেদনা শুরু না হয় (জ্বর থাকলে বিপদ বেশি হয়)।

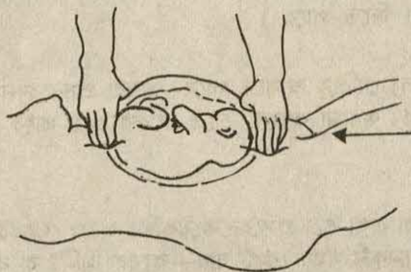
যে সব প্রসবে সমস্যা হবার ভয় সব থেকে বেশি থাকে :

প্রথম প্রসব *এবং* *অনেক ছেলেপিলে হবার পর শেষের প্রসবগুলি*



শিশু ঠিক জায়গায় আছে কিনা দেখা

শিশুর জন্মের পক্ষে স্বাভাবিক জায়গায়—মাথা নিচের দিকে করে আছে কিনা জানতে এইভাবে টিপে মাথাটা দেখে নিন :



১· মাকে পুরো শ্বাস ছেড়ে দিতে বলুন।

বুড়ো আঙুল আর অন্য দুটো আঙুল দিয়ে কোমরের হাড়ের ঠিক ওপরে এইভাবে ভেতর দিকে ঠেলা দিন।

অন্য হাত দিয়ে জরায়ুর ওপর দিকটা ছুঁয়ে দেখুন।

শিশুর পাছা বড় আর চওড়া

তার মাথা শক্ত ও গোল

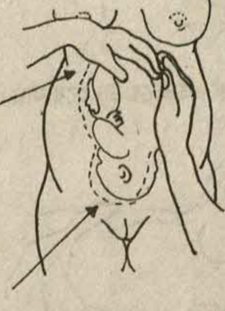


পাছা ওপরে ওপর দিকটা বড় লাগে

পাছা নিচে নিচের দিকটা বড় লাগে

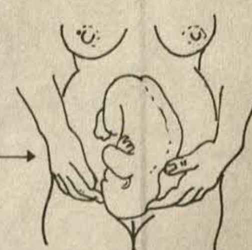
২· প্রথমে একহাত, পরে অন্য হাত দিয়ে আস্তে করে একপাশ থেকে অন্য পাশে নাড়ান।

শিশুর পাছাটা পাশের দিকে আস্তে করে নাড়ালে শিশুর পুরো শরীরটাও নড়বে।



কিন্তু মাথাটা আস্তে করে পাশের দিকে নাড়ালে ঘাড়ের কাছে বেঁকে যাবে—পিঠটা নড়বে না।

শিশু যদি তখনো জরায়ুর ওপর দিকে থাকে, আপনি তার মাথাটা একটু নাড়াতে পারেন। কিন্তু প্রসবের জন্য তৈরি হয়ে মাথা নেমে গেলে আর নড়াতে পারবেন না।



প্রথম পোয়াতির শিশু কখনো কখনো প্রসব বেদনা শুরু হবার ২ সপ্তাহ আগেই নেমে যায়। পরের শিশুরা প্রসব বেদনা শুরু হবার আগে নাও নামতে পারে।

শিশুর মাথা থাকলে <u>নিচে</u>, ভয় কোরো না যেন মিছে। প্রসব হবে নিজে নিজে যেমন হতে হয়।	থাকলে মাথা ওপর <u>ধারে</u> বিপদ কিছু ঘটতে পারে; হাসপাতালের পাশে ধারে থাকলে ভালো হয়।	থাকলে শিশু <u>আড়াআড়ি</u>, হাসপাতালে তাড়াতাড়ি পাঠাও মাকে, দুজনারই প্রাণের আছে ভয়।

যে সব লক্ষণ দেখে বোঝা যায় যে প্রসবের সময় এগিয়ে এসেছে

● প্রসবের কয়েকদিন আগে শিশু গর্ভের মধ্যে **নিচের দিকে নেমে আসে**। এতে মায়ের শ্বাস নেয়া সহজ হয়, তবে পেচ্ছাপের থলির ওপর চাপ পড়ার জন্যে আরো ঘনঘন পেচ্ছাপ করবার দরকার হতে পারে। (প্রথম পোয়াতির বেলায় এই লক্ষণগুলি প্রসবের দু'সপ্তাহ আগে থেকে দেখা দিতে পারে।)

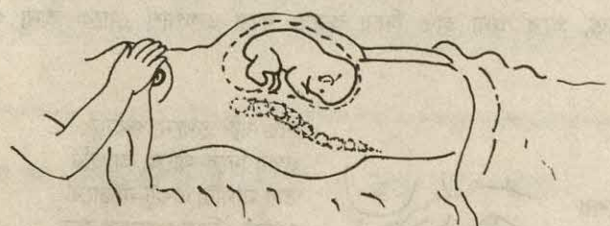
● প্রসবের একটু আগে একটা **ছোটো শ্লেষ্মার দলা** (জেলি) বেরিয়ে আসতে পারে। অথবা প্রসববেদনা শুরু হবার ২/৩ দিন আগে থেকে একটু করে শ্লেষ্মা বেরোতে পারে। কখনো কখনো তাতে রক্তের ছিটে থাকে। এটা স্বাভাবিক।

● প্রসবের **মোচড়ানো ব্যথা** (জরায়ু হঠাৎ কুঁচকে যাওয়া) বা ব্যথা ওঠা প্রসবের কয়েকদিন আগে থেকেই শুরু হতে পারে। প্রথম দিকে দুবার ব্যথা ওঠার মধ্যে সাধারণতঃ অনেকটা সময় কেটে যায়—কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘণ্টাও। ব্যথাগুলো আরো জোর, নিয়মিত আর ঘনঘন হলে প্রসব শুরু হয়।

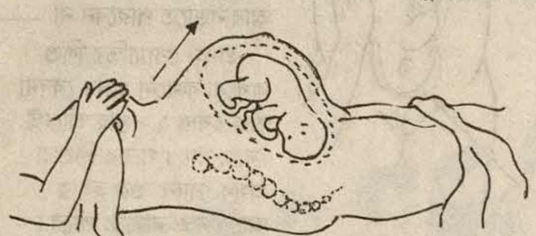
● কয়েকজন মেয়ের প্রসবের কয়েক সপ্তাহ আগে কয়েকবার **'অভ্যাসের ব্যথা'** ওঠে। এটা স্বাভাবিক। দু এক সময় পোয়াতির মিছি মিছি ব্যথা উঠতে পারে। যখন ব্যথাগুলো জোরে জোরে ঘনঘন হয়, সত্যি সত্যি প্রসব শুরু হবার আগে কয়েক ঘণ্টা বা দিন বন্ধ হয়ে যায়, তখন এটা হয়। কখনো কখনো হাঁটা চলা করলে বা ডুস নিলে, মিছিমিছি ব্যথা উঠলে সেটা কমে যায়, আবার সত্যি প্রসব ব্যথা উঠলে প্রসব হয়ে যায়।

জরায়ু কুঁচকে গেলে বা শক্ত হয়ে গেলে প্রসব বেদনা ওঠে।

ব্যথা ওঠার ফাঁকে ফাঁকে জরায়ু এইরকম আলগা হয়ে যায় :



ব্যথা ওঠার সময় জরায়ু শক্ত হয়ে এইভাবে উঁচু হয়ে যায় :



ব্যথা উঠলে জরায়ুর মুখ বা দ্বার খুলে যায়—প্রতিবারে একটু করে।

● প্রসব শুরু হবার কিছু পরে যে **জলের থলিতে** শিশু থাকে সেটা ভেঙে হুড়হুড় করে জল বেরিয়ে যায়। ব্যথা উঠবার আগেই জল ভেঙে গেলে সাধারণতঃ প্রসবের শুরু বোঝায়। জল ভেঙে গেলে মায়ের উচিত খুব পরিষ্কার হয়ে থাকা। পায়চারি করলে তাড়াতাড়ি প্রসব হয়ে যাবার সাহায্য হতে পারে।

প্রসবের বিভিন্ন অবস্থা

প্রসবের ৩টি ভাগ বা অবস্থা আছে:

- জোর ব্যথা হওয়ার শুরু থেকে জন্মের রাস্তায় শিশুর নেমে আসা পর্যন্ত হল প্রথম অবস্থা।
- দ্বিতীয় অবস্থা হল জন্মের রাস্তায় শিশুর আসা থেকে তার জন্ম পর্যন্ত।
- শিশুর জন্মের পর থেকে ফুলটা বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত হল তৃতীয় অবস্থা।

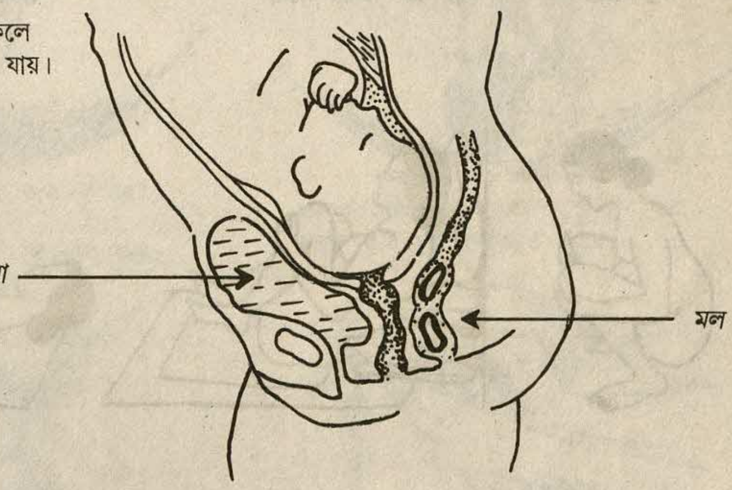
প্রসবের প্রথম অবস্থা—প্রথম পোয়াতির বেলায় ১৫ থেকে ২০ ঘন্টা বা আরো বেশি সময় থাকে। পরের প্রসবগুলিতে ৭ থেকে ১০ ঘন্টা থাকে। এর মধ্যে অনেক তফাৎ হয়।

প্রসবের প্রথম অবস্থায়, মায়ের প্রসবের জন্য তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়। এই অবস্থায় দেরি হওয়াটা স্বাভাবিক। প্রসবটা যে এগোচ্ছে মা হয়তো তা বুঝতে না পেরে দুশ্চিন্তা করতে পারে। তাকে আশ্বাস দিতে চেষ্টা করুন। বলুন যে বেশির ভাগ পোয়াতিরই একই চিন্তা হয়।

যতক্ষণ না শিশু জন্মের রাস্তায় নেমে যেতে শুরু করে আর মা ঠেলা দেবার তাগিদ অনুভব করে ততক্ষণ মায়ের ঠেলা দেয়া বা নিচের দিকে কোঁৎ দেয়া উচিত নয়।

মায়ের পেট আর পেচ্ছাপ পরিষ্কার রাখা উচিত।

মূত্রাশয় আর অন্ত্র ভর্তি থাকলে শিশুর জন্মের রাস্তা আটকে যায়।



প্রসববেদনার সময় মায়ের ঘনঘন পেচ্ছাপ করা উচিত। কয়েক ঘন্টা মলত্যাগ না করে থাকলে তাকে ডুস দিলে প্রসব সহজ হতে পারে। প্রসব বেদনার সময় মায়ের প্রায়ই জল বা অন্য তরল খাবার খাওয়া উচিত। শরীরে জল খুব কম থাকলে প্রসববেদনা ধীরে বা বন্ধ হয়ে যায়। প্রসববেদনা অনেকক্ষণ ধরে হলে, মায়ের হালকা কিছু খাওয়াও উচিত। বমি হতে থাকলে, ব্যথা ওঠার ফাঁকে ফাঁকে তার একটু করে চিনি নুনের সরবৎ, গাছগাছড়ার পাঁচন বা ফলের রস ছোটো ছোটো চুমুকে খাওয়া উচিত।

প্রসববেদনার সময় মায়ের ঘনঘন এপাশ ওপাশ করা বা এমন কি মাঝে মাঝে উঠে হেঁটে বেড়ানোও উচিত।

প্রসবের প্রথম অবস্থায় ধাই বা সহায়িকার উচিত:

- মায়ের পেট, যৌনাঙ্গ, পাছা আর পা সাবান আর গরম জল দিয়ে ধুয়ে দেয়া। একটা পরিষ্কার জায়গায়, যেখানে ভালোভাবে দেখার মত যথেষ্ট আলো আছে, সেখানে বিছানাটা রাখা।
- বিছানায় পরিষ্কার চাদর, তোয়ালে বা খবরের কাগজ পেতে ভিজে বা নোংরা হয়ে গেলেই সেগুলি পালটে দেয়া।
- নাড়ি কাটার জন্যে একটা নতুন ক্ষুর বা ১ টা কাঁচি ১৫ মিনিট ধরে ফুটিয়ে রাখা। যতক্ষণ না দরকার হয় কাঁচিটা একটা ঢাকা দেয়া পাত্রে ফোটানো জলে রাখা।

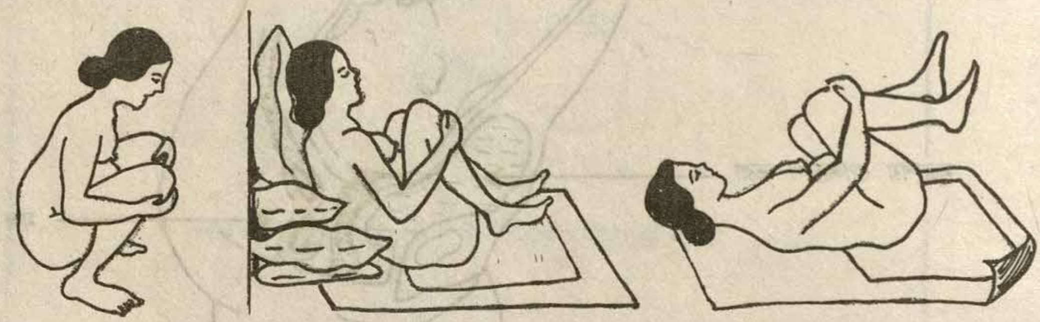
মায়ের পেটে মালিশ করা বা চাপ দেয়া ধাইয়ের উচিত নয়। এই সময় মাকে ঠেলা দিতে বা কোঁৎ পাড়তে বলা তার উচিত নয়।

মা যদি ভয় পায় বা খুব ব্যথা পায়, তাকে প্রতিবার ব্যথা ওঠার সময় গভীর লম্বা নিয়মিত শ্বাস নিতে আর ব্যথা ওঠার ফাঁকে ফাঁকে স্বাভাবিক শ্বাস নিতে বলুন। এতে ব্যথা কমবে আর মায়ের শান্ত থাকার সাহায্য হবে।

প্রসবের দ্বিতীয় অবস্থা—শিশুর জন্ম: কখনো কখনো জল ভাঙার সঙ্গে এটি শুরু হয়। এটায় সাধারণতঃ প্রথম অবস্থার থেকে কম কষ্ট হয়, সময়ও কম লাগে। ব্যথা ওঠার সঙ্গে মা সমস্ত শক্তি দিয়ে কোঁৎ (ঠেলা) দেন। দুবার ব্যথা ওঠার ফাঁকে মাকে শ্রান্ত আর আধো ঘুমন্ত দেখায়। এটা স্বাভাবিক।

কোঁৎ দেবার জন্যে, মায়ের, একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে তারপর পেটের পেশীগুলো দিয়ে যেন মলত্যাগ করছে তেমনিভাবে, জোরে ঠেলা দেয়া উচিত। জল ভাঙার পর প্রসবে দেরি হলে মা এইভাবে হাঁটু মুড়ে নিতে পারেন।

উবু হয়ে, *ঠেস দিয়ে বসে,* *বা শুয়ে*



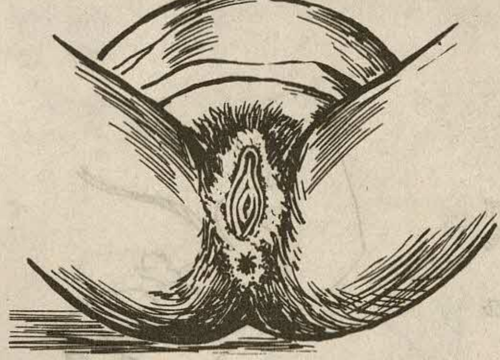
যখন মায়ের জন্মের দ্বার ফাঁক হয়ে শিশুর মাথা দেখা যেতে শুরু করে, ধাই-এর বা সহায়িকার তখন প্রসবের জন্যে সবকিছু তৈরি করে ফেলা উচিত। এই সময় মায়ের ঠেলা না দিতে চেষ্টা করা উচিত যাতে মাথাটা আরো ধীরে বার হয়। এতে প্রসবদ্বার ছিঁড়ে যাওয়া এড়াতে সাহায্য হয় (আরো বিশদ বিবরণের জন্যে পৃঃ ৩১৫ দেখুন)।

স্বাভাবিক প্রসবে, ধাইয়ের *কখনোই* মায়ের শরীরের ভেতরে হাত বা আঙুল ঢোকাবার দরকার হয় না। এর থেকেই জন্মের পরে মায়ের বিপজ্জনক সংক্রমণ সবথেকে বেশি হয়।

মাথা বেরিয়ে এলে, ধাই সেটা ধরে থাকতে পারে, কিন্তু *কখনো* টানাটানি *করবে না*।

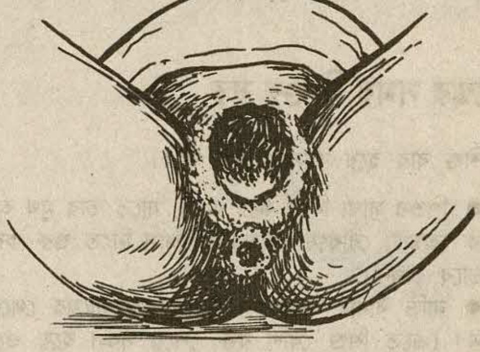
স্বাভাবিক অবস্থায় শিশু মাথা আগে করে এইভাবে জন্মায়:

১.



এখন জোরে ঠেলা দিন।

২.



এখন জোরে ঠেলা না দেবার চেষ্টা করুন। ঘনঘন ছোটো শ্বাস নিন। এতে জন্মদ্বার ছিড়ে যাওয়া এড়ানোয় সাহায্য হয়।

৩.



মাথাটা সাধারণতঃ মুখ নিচে করে বেরোয়।

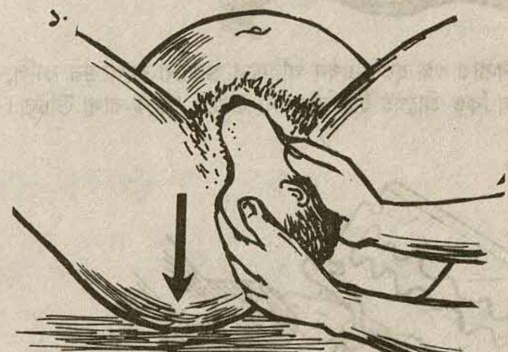
৪.



তারপর শিশুর মাথা একপাশে ঘুরে যায়, যাতে কাঁধ দুটি বেরোতে পারে।

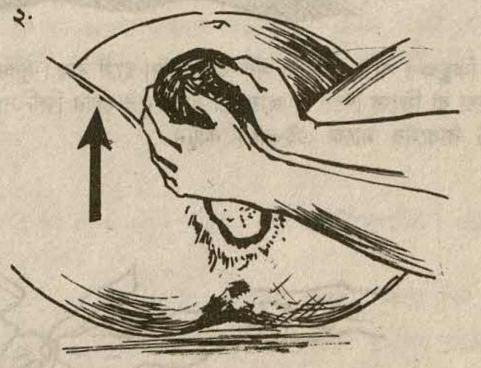
মাথা বার হবার পর যদি কাঁধ আটকে যায়:

১.



ধাই শিশুর মাথা দুহাতে ধরে সাবধানে সেটি নামিয়ে নিতে পারে, যাতে একটা কাঁধ বেরিয়ে আসতে পারে।

২.



তারপর সে মাথাটা একটু তুলে দিতে পারে—যাতে অন্য কাঁধটা বেরিয়ে আসে।

সমস্ত জোরটা মায়ের কাছ থেকে আসা চাই। ধাইয়ের **কখনোই মাথা টানা উচিত নয়**—কারণ টানাটানিতে শিশুর ক্ষতি হয়।

প্রসবের তৃতীয় অবস্থা—শিশুর জন্ম হয়ে যাবার সময় থেকে শুরু হয়ে ফুলটা বার হয়ে আসা পর্যন্ত থাকে। সাধারণতঃ শিশু বার হবার পর ৫ মিনিট থেকে এক ঘন্টার মধ্যে ফুলটা আপনিই বেরিয়ে আসে। ইতিমধ্যে, **শিশুর যত্ন নিন**।

জন্মের সময় শিশুর যত্ন

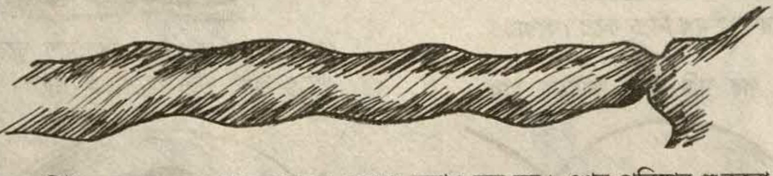


শিশু বার হয়ে আসার ঠিক পরে:

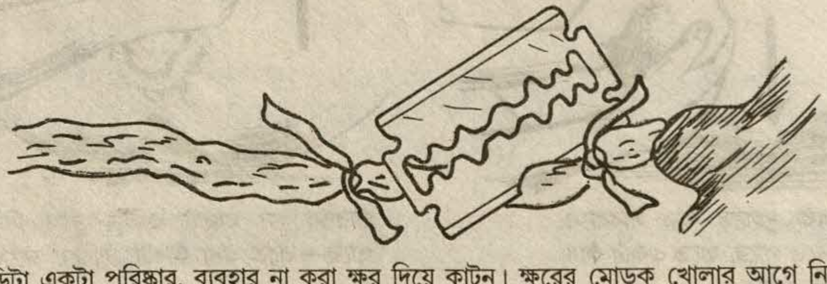
- শিশুর মাথা নিচে করে রাখুন, যাতে তার মুখ আর গলা থেকে শ্লেষ্মাটা বেরিয়ে আসে। সে শ্বাস নিতে শুরু করা পর্যন্ত এইভাবে রাখুন।
- নাড়ি বাঁধার আগে পর্যন্ত শিশুকে মায়ের থেকে *নিচে* রাখুন। (এতে শিশু বেশি রক্ত পেয়ে সবল হয়ে ওঠে।)
- যদি শিশু সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস নিতে শুরু না করে, একটা গামছা বা কাপড় দিয়ে তার পিঠটা ঘষে দিন।
- তাতেও শ্বাস না নিলে, একটা সাকশন বালব বা শোষার ড্রপার দিয়ে বা আপনার আঙুল একটা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে জড়িয়ে তাই দিয়ে শিশুর নাক আর মুখ থেকে শ্লেষ্মা পরিষ্কার করে দিন।
- জন্মের এক মিনিটের মধ্যে যদি শিশু শ্বাস নিতে শুরু না করে, **তখনি মুখে মুখ দিয়ে শ্বাস দিতে শুরু করুন** (পৃঃ ৯২-৯৩)।
- একটা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে শিশুকে মুড়ে রাখুন। তাকে ঠাণ্ডা হতে না দেয়াটা জরুরি—বিশেষ করে সে যদি অকালে (সময়ের আগেই) জন্মায়।

নাড়ি কি ভাবে কাটতে হয়:

শিশু জন্মাবার সময় নাড়ি ধুকধুক করে আর সেটা মোটা আর নীল হয়ে থাকে। **অপেক্ষা করুন।**



কিছুক্ষণ পরে, নাড়িটা সরু আর সাদা হয়ে যায়। ধুকধুক করাও বন্ধ হয়। এখন পরিষ্কার শুকনো কাপড়ের ফালি, সুতো বা ফিতে দিয়ে ২ জায়গায় বাঁধুন। বাঁধবার জিনিসগুলো কিছু আগেই ইস্ত্রী করে বা উনুনে সেঁকে রাখা উচিত। দুটি বাঁধনের মাঝে এইভাবে কাটুন:

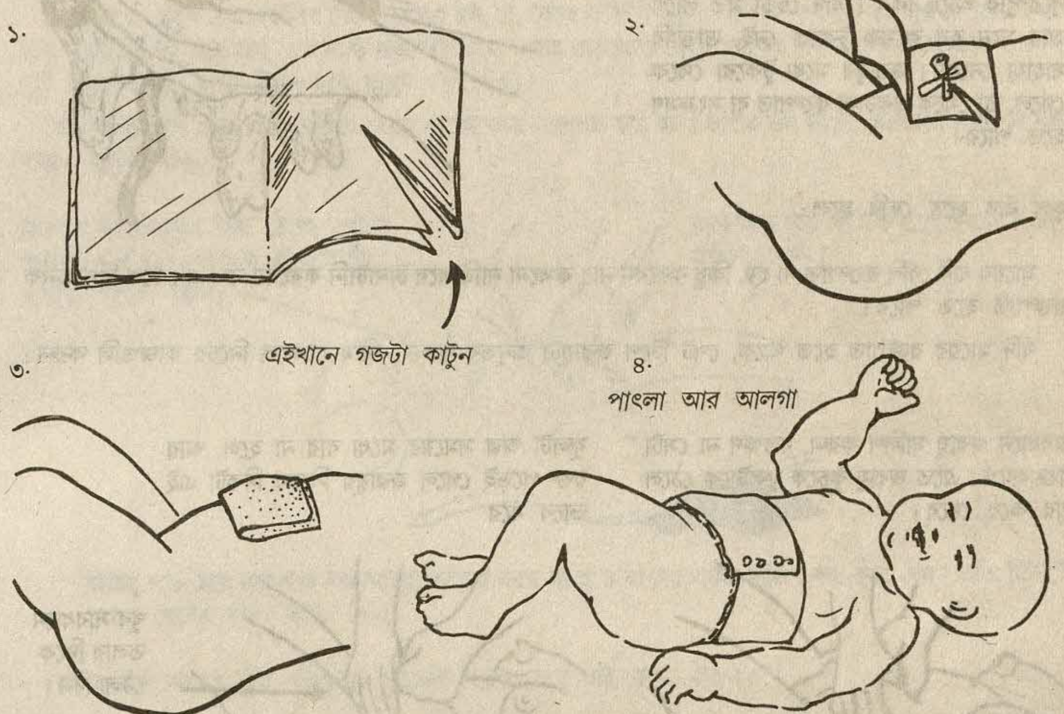


জরুরি: নাড়িটা একটা পরিষ্কার, ব্যবহার না করা ক্ষুর দিয়ে কাটুন। ক্ষুরের মোড়ক খোলার আগে নিজের হাতদুটি ভালো করে ধুয়ে নিন। নতুন ক্ষুর না থাকলে সদ্য ফোটানো কাঁচি ব্যবহার করুন। **সবসময় কচি বাচ্চার শরীরের খুব কাছে নাড়ি কাটবেন**। শিশুর গায়ে শুধু ২ সেঃ মিঃ-এর মত লাগিয়ে রাখবেন। এই সব সাবধানতা নিলে ধনুষ্টঙ্কার এড়ানো সহজ হয় (পৃঃ ২২৫)।

কাটা নাড়ির যত্ন :

সদ্য কাটা নাড়িটা সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে সেটা **শুকনো রাখাটা** সবথেকে জরুরি। শুকোবার জন্যে **তাতে বাতাস লাগা দরকার**। ঘরদোর যদি খুব পরিষ্কার হয় আর মাছি না থাকে, কাটা নাড়িটা আঢাকা অবস্থায় বাতাসে খুলে রাখবেন।

যদি ধুলো আর মাছি থাকে, নাড়িটা হালকা ভাবে ঢেকে দিন। জীবাণুমুক্ত গজ ব্যবহার করা সবচেয়ে ভালো। ফোটানো কাঁচি দিয়ে সেটা কাটবেন। এইভাবে লাগান:



জীবাণুমুক্ত গজ না থাকলে একটা খুব পরিষ্কার কাপড় তখনি ইস্ত্রী করে তাই দিয়ে নাড়ি ঢাকা দিতে পারেন। পেটে বাঁধন ব্যবহার না করাই ভালো, করতে চাইলে একটা পাৎলা হালকা কাপড় ব্যবহার করবেন, দেখবেন, সেটা যেন তলায় বাতাস যাবার মত যথেষ্ট আলগা থাকে—তবেই নাড়িটা শুকনো থাকবে। শক্ত করে বাঁধবেন না।

দেখবেন শিশুর কোলোট যেন নাড়ির ওপরে না থাকে, না হলে নাড়ি পেচ্ছাপে ভিজে যাবে।

কচি বাচ্চাকে পরিষ্কার করা :

কচি বাচ্চার গা ভারমিক্স বলে একটা সাদা মোমের মত জিনিস দিয়ে ঢাকা থাকে। এটা এনটিসেপটিক। এটা সরাবেন না। ২/৩ দিনের মধ্যে নিজে থেকেই ওটা পড়ে যাবে।

একটা অল্প গরম, নরম, ভিজে কাপড় দিয়ে সাবধানে রক্ত বা অন্য জলীয় জিনিস পরিষ্কার করে দিন।

নাড়ি পড়ে যাবার আগে পর্যন্ত (সাধারণতঃ ৫ থেকে ৮ দিন) শিশুকে স্নান না করানোই ভালো। তারপর তাকে রোজ, গরম জলে, নরম সাবান দিয়ে স্নান করাবেন।

শিশু জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাকে মায়ের দুধ খেতে দিন :

নাড়ি কাটা হয়ে গেলেই শিশুকে মায়ের বুকে দিয়ে দিন। শিশু দুধ টানলে ফুলটা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসার আর বেশি রক্তপাত বন্ধ করার বা কমাবার সাহায্য হবে।

ফুল বার হওয়া (প্রসবের তৃতীয় অবস্থা)

স্বাভাবিকভাবে শিশু জন্মাবার পর ৫ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টার মধ্যে ফুলটা বেরিয়ে আসে, কিন্তু কখনো কখনো অনেক ঘণ্টা দেরি হয়ে যায় (নিচে দেখুন)।

ফুলটা দেখে নেয়া:



ফুলটা বেরিয়ে এলে তুলে দেখবেন সেটা পুরোপুরি আছে কিনা। যদি ছেঁড়া মত লাগে আর মনে হয় কয়েক টুকরো নেই, ডাক্তারি সাহায্য নেবেন। জরায়ুর মধ্যে টুকরো থেকে গেলে, তা থেকে একটানা রক্তপাত বা সংক্রমণ হতে পারে।

ফুল বার হতে দেরি হলে:

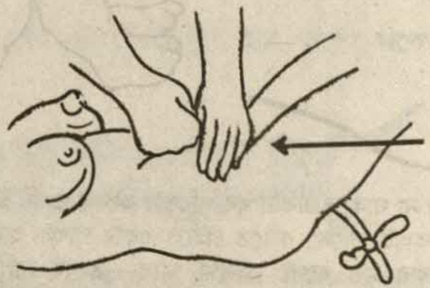
মায়ের যদি বেশি রক্তপাত না হয়, কিছু করবেন না। **কখনো নাড়ি ধরে টানাটানি করবেন না।** এ থেকে বিপজ্জনক রক্তপাত হতে পারে।

যদি মায়ের রক্তপাত হতে থাকে, পেট টিপে জরায়ুটা অনুভব করুন। নরম ঠেকলে নিচের কাজগুলি করুন:

সাবধানে জরায়ু মালিশ করুন, যতক্ষণ না সেটা শক্ত লাগে। এতে জরায়ু কুঁচকে ফুলটাকে ঠেলে বার করে দেবে।



ফুলটা অল্প সময়ের মধ্যে বার না হলে, আর রক্ত পড়েই গেলে জরায়ুর নিচের দিকটা এই ভাবে ধরে



ফুলটা তখনো বার না হলে আর জোরে রক্তপাত চলতে থাকলে, নিচে যেমন বলা হয়েছে সেই ভাবে কমাতে চেষ্টা করুন আর তাড়াতাড়ি ডাক্তারি সাহায্য নিন।

হেমারেজ (জোর রক্তপাত)

ফুল বার হবার সময়, অল্পক্ষণ রক্ত পড়বেই। স্বাভাবিকভাবে এটা কয়েক মিনিট মাত্র হয় আর ১/৪ লিটারের (১ কাপ) বেশি রক্ত পড়ে না। (কয়েকদিন ধরে অল্প অল্প রক্ত পড়ে যেতে পারে—সেটা সাধারণতঃ গুরুতর কিছু নয়)। শিশুকে বুকের দুধ টানতে দিয়ে রক্তপাত প্রায়ই কমিয়ে ফেলা যায়। শিশু যদি না টানে, মায়ের বোঁটা দুটি কেউ মালিশ করে দিতে পারে।

সাবধান: কখনো কখনো বেশি রক্ত বার না হলেও, মায়ের ভেতরে ভেতরে সাংঘাতিক রক্তপাত হতে পারে। মাঝে মাঝে তার পেটে হাত দিয়ে দেখবেন। ফুলে যাচ্ছে মনে হলে হয়তো রক্ত ভরে যাচ্ছে। ঘনঘন তার নাড়ি দেখুন আর শকের লক্ষণ আছে কি না দেখুন (পৃঃ ৮৯)।

যদি বেশি রক্তপাত হয়ে চলে, অথবা একটানা রক্ত গড়িয়ে পড়ে মায়ের অনেক রক্ত বেরিয়ে যায়, নিচের কাজগুলি করবেন:

● তাড়াতাড়ি ডাক্তারি সাহায্য নেবেন। যদি তাড়াতাড়ি রক্তপাত বন্ধ না হয়, মাকে শিরা দিয়ে সিরামের রক্ত দেয়ার দরকার হতে পারে।

● আপনার কাছে **এরগোনোভিন** বা **অকসিটসিন** থাকলে পরের পাতায় দেয়া নির্দেশ মেনে তা ব্যবহার করবেন (ফুলটা তখনো ভেতরে থাকলে এরগোনোভিনের বদলে অকসিটসিন ব্যবহার করবেন)।

● মায়ের প্রচুর তরল জিনিস (জল, ফলের রস, চা, ঝোল বা চিনি নুনের সরবৎ—পৃঃ ১৮২) খাওয়া উচিত। সে যদি অজ্ঞানের মত হয়ে যায়, তার নাড়ি দ্রুত ক্ষীণ চলে অথবা তার অন্য কোনো শকের লক্ষণ দেখা যায়, তবে তার পা দুটি উঁচুতে আর মাথা নিচে করে রাখুন (পৃঃ ৮৯)।

● মায়ের যদি প্রচুর রক্ত বেরিয়ে যেতে থাকে, আর রক্তপাত হয়ে মারা যাবার ভয় থাকে, এইভাবে রক্তপাত বন্ধ করার চেষ্টা করুন:

যতক্ষণ না জরায়ুটা শক্ত ঠেকে, পেটটা মালিশ করে যান। তারপর একহাত দিয়ে জরায়ুটা তুলে ধরুন।

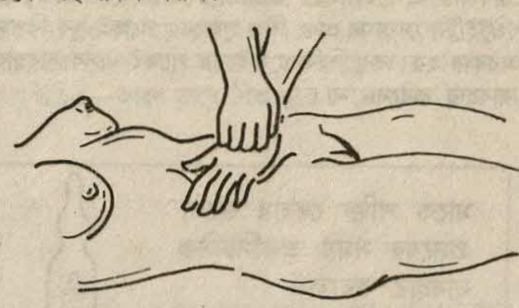


আর অন্য হাত দিয়ে জরায়ুর নিচের দিকে মালিশ করুন।

জরায়ু শক্ত হয়ে রক্তপাত বন্ধ হলেই, আবার নরম না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত মালিশ বন্ধ করে দিন। প্রতি মিনিটে দেখে নেবেন নরম হচ্ছে কিনা।

● মালিশ করেও যদি রক্তপাত চলতেই থাকে তবে এই রকম করুন:

রোগীর পেটের ওপর নাভির ঠিক নিচে, আপনার একটা হাতের ওপর অন্য হাতটা রেখে, নিজের সব শক্তি দিয়ে চাপ দিন। রক্তপাত বন্ধ হবার পরেও অনেকক্ষণ চাপ দিয়ে যাওয়া উচিত।



● যদি তখনো রক্তপাত না কমে:

আপনার দু হাতের মাঝে জরায়ুটা ধরে জোরে টিপুন। রক্ত বন্ধ হবার পরে কয়েক মিনিট ধরে, অথবা ডাক্তারি সাহায্য আসা পর্যন্ত শক্ত করে টিপে যান।



অকসিটসিনের—(এরগোনোভিন, অকসিটসিন, পিটোসিন ইত্যাদির) সঠিক ব্যবহার :

অকসিটসিকগুলি হল এমন ওষুধ যাতে এরগোনোভিন, এরগোমেট্রিন বা অকসিটসিন থাকে। এইসব ওষুধে জরায়ু আর তার রক্তবাহী শিরাগুলি কুঁচকে যায়। এগুলি দরকারি কিন্তু বিপজ্জনক ওষুধ। ভুলভাবে ব্যবহার করলে, এগুলি থেকে মায়ের বা পেটের শিশুর মৃত্যু ঘটতে পারে। ঠিক ভাবে ব্যবহার করলে, এগুলি কখনো কখনো প্রাণ রক্ষা করতে পারে। ঠিক ব্যবহার হল এইগুলি :

১· **প্রসবের পর রক্তপাত কমানো :** এটাই হল এইসব ওষুধের সবথেকে জরুরি ব্যবহার। ফুল বার হয়ে যাবার পর যদি বেশি রক্তপাত হয়, তবে রোগীর পেশীতে একটা এরগোনোভিন বা এরগোমেট্রিন ম্যালিয়েট (মেথারজিন ইত্যাদি পৃঃ ৪২৩) ০·৫ মি· গ্রা·-র এমপুল ইনজেকশন করে দেবেন। এর আধঘন্টা পরেও যদি রক্তপাত হয়ে চলে, আরো ১/২ এমপুলের ইনজেকশন দিয়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাবেন। এরগোনোভিন না থাকলে অথবা ফুল বার হবার আগেই রক্তপাত শুরু হলে, ওটার বদলে অকসিটসিনের ইনজেকশন (পিটোসিন পৃঃ ৪২৩) দেবেন।

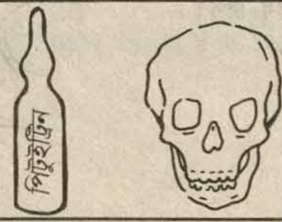
জরুরি : বেশি রক্তপাত হলে সেটা বন্ধ করার মত যথেষ্ট এরগোনোভিনের এমপুল পোয়াতি আর ধাইয়ের হাতের কাছে থাকা দরকার। কিন্তু গুরুতর অবস্থা ছাড়া এগুলি ব্যবহার করা উচিত নয়।

২· **প্রসবের পরে বেশি রক্তপাত এড়াবার জন্যে :** যে মায়ের আগে অন্য প্রসবের পরে বেশি রক্তপাত হয়েছিল, তাকে, ফুল বার হবার পরেই, ১ এমপুল (বা ২ টি বড়ি) এরগোনোভিন দেয়া যেতে পারে। আধঘন্টা পরেও বেশি রক্তপাত হতে থাকলে আর এক মাত্রা দিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাবেন।

৩· **পেটের শিশু নষ্ট হয়ে যাবার সময় রক্তপাত কমাতে** (পৃঃ ৩২৭) : অকসিটসিকের ব্যবহার বিপজ্জনক হতে পারে। শুধু একজন কাজ জানা স্বাস্থ্যকর্মীরই এগুলি ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু যদি মেয়েটির খুব তাড়াতাড়ি রক্তপাত হতে থাকে আর ডাক্তারি সাহায্য দূরে থাকে, উপরে যেমন বলা হয়েছে সেইভাবে একটা অকসিটসিক ব্যবহার করুন। অকসিটসিন *(পিটোসিন)* বোধ হয় সব থেকে ভালো।

সাবধান : প্রসবের সময় তাড়াতাড়ি প্রসব হওয়ার জন্যে বা মাকে "শক্তি দেবার" জন্যে *এরগোট্রেট, পিটোসিন* বা *পিটুইট্রিন* দেয়া মা এবং শিশু দুজনের পক্ষেই খুব বিপজ্জনক। শিশুর জন্মের আগে অকসিটসিক খুব কম সময়েই দরকার হয়। শুধু শিক্ষিত ধাইয়ের পক্ষেই এসব ব্যবহার করা ভালো। **শিশু জন্মাবার আগে কখনো অকসিটসিক ব্যবহার করবেন না।**

মাকে শক্তি দেবার জন্যে প্রসবের সময় অকসিটসিক ব্যবহার করলে····



মা, শিশু বা দুজনেই মারা যেতে পারে

মাকে শক্তি দেবার জন্য বা প্রসব তাড়াতাড়ি বা সহজ করার জন্যে এমন কোনো ওষুধ **নেই** যাতে বিপদ নেই।

যদি প্রসবের জন্যে মায়ের শক্তি থাকে এটা চান, তবে তাকে পোয়াতি অবস্থার পুরো ৯ মাস ধরে শরীর গড়ার আর রক্ষা করার খাবারগুলি খেতে দিন। এছাড়া যাতে তার কম ছেলেপিলে হয়, সে বিষয়ে তাকে উৎসাহ দিন ; তার শরীরে পুরো শক্তি ফিরে আসার আগে তার যেন আর ছেলেপিলে না হয় সেটা বলুন (পরিবার পরিকল্পনা পৃঃ ৩২৯)।

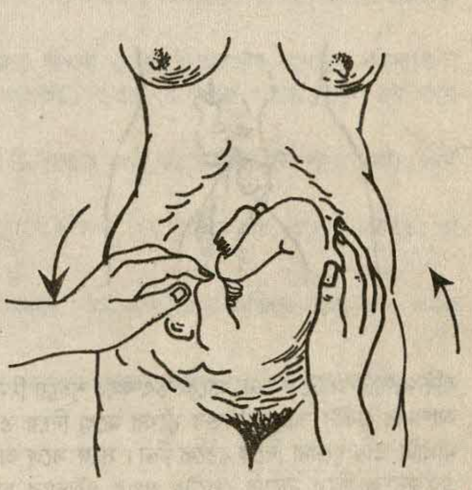
কঠিন প্রসব

প্রসবের সময় কোনো কঠিন সমস্যা হলে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ডাক্তারের সাহায্য নেয়া দরকার। অনেক রকম সমস্যা বা গোলমাল হতে পারে, কয়েকটা অন্যগুলোর থেকে বেশি কঠিন। যেগুলো বেশি দেখা যায় এমন কতকগুলি সমস্যার কথা এখানে বলা হচ্ছে:

১. **প্রসববেদনা বন্ধ বা ধীরে হয়ে যায়** অথবা খুব জোরে ওঠার বা জল ভেঙে যাবার পরেও অনেকক্ষণ ধরে চলে। এটা কয়েকটি কারণে হতে পারে:

■ **পোয়াতি ভয় পায় বা বিচলিত হয়।** এতে ব্যথা ওঠা কমে যেতে এমন কি বন্ধ হয়ে যেতেও পারে। তার সঙ্গে কথা বলুন। তাকে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করুন। তাকে বুঝিয়ে বলুন যে প্রসব আস্তে আস্তে হলেও কোনো কঠিন সমস্যা নেই। তাকে এপাশ ওপাশ করতে, জল আর খাবার খেতে আর পেচ্ছাপ করতে বলুন।

■ **শিশু পেটে অস্বাভাবিকভাবে থাকতে পারে।** ব্যথা ওঠার ফাঁকে পেটে হাত দিয়ে দেখুন শিশু **পাশের দিকে** আছে কিনা। কখনো কখনো ধাই পোয়াতির পেটটা **সাবধানে** নাড়াচাড়া করে শিশুকে ঘুরিয়ে দিতে পারেন। ব্যথা ওঠার মাঝে মাঝে একটু একটু করে শিশুকে ঘোরাতে চেষ্টা করুন—যতক্ষণ না মাথাটা নিচের দিকে আসে। **জোর দেবেন না,** তাতে জরায়ু ছিঁড়ে যেতে পারে। শিশুকে ঘোরানো না গেলে মাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার চেষ্টা করুন।





■ **যদি শিশু** পেছন ফিরে না থেকে **সামনে ফিরে থাকে,** আপনি ছুঁয়ে তার গোল পিঠটা না পেয়ে ডেলা ডেলা হাত পাগুলি পাবেন। এটা সাধারণতঃ কোনো বড় সমস্যা নয়। তবে প্রসবে দেরি হতে পারে আর পোয়াতিব বেশি পিঠে ব্যথা হতে পারে। তার ঘনঘন এপাশ ওপাশ করা উচিত—কারণ তাতে শিশু ঘুরে যেতে সুবিধা হতে পারে।

■ **মায়ের পাছার হাড়ের মধ্যে ঢোকবার পক্ষে শিশুর মাথা বেশি বড় হতে পারে।** মায়ের পাছা খুব সরু হলে এটা বেশি হয় (আগে যার স্বাভাবিক প্রসব হয়েছে—তার এরকম না হওয়াই সম্ভব)। আপনার মনে হতে পারে যে শিশু নিচের দিকে নামছে না। এরকম সন্দেহ হলে মাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার চেষ্টা করুন। কারণ তার অপারেশনের (সিজারিয়ান) দরকার হতে পারে। **যে সব মেয়ের পাছা খুব সরু, তাদের অন্ততঃ প্রথম প্রসব হাসপাতালে বা তার কাছাকাছি হওয়া উচিত।**

■ **মা যদি বমি করতে থাকে, আর জল বেশি না খেয়ে থাকে,** তার শরীরে জলের অভাব হতে পারে। এর থেকে ব্যথা ওঠা কমে বা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ব্যথা ওঠার মাঝে মাঝে তাকে চিনি নুনের সরবৎ বা অন্য তরল খাবার খেতে দিন।



২· **পাছা আগে করে প্রসব।** কখনো কখনো মায়ের পেটে হাত দিয়ে (পৃঃ ৩০৩), আর শিশুর হার্টের স্পন্দন শুনে (পৃঃ ২৯৮) ধাত্রী বলে দিতে পারে যে, শিশুর পাছা আগে আছে।

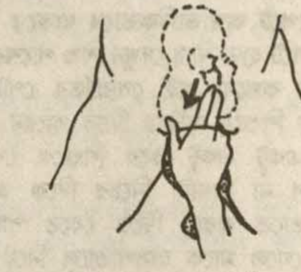
পাছা আগে থাকলে এইভাবে প্রসব হলে অনেকটা সহজ হতে পারে:

যদি শিশুর হাত দুটি আগে না বেরিয়ে পাছাটি বেরিয়ে আসে, আপনার হাত দুটি ভালো করে ধুয়ে, এলকোহল ঘষে (বা জীবাণুমুক্ত দস্তানা পরে) তারপর....

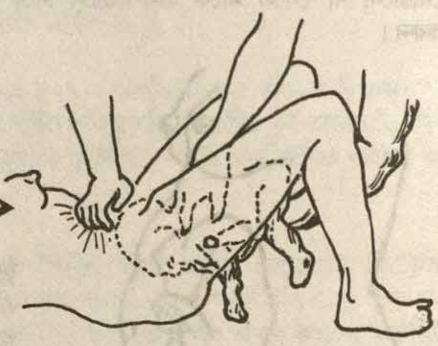
আপনার আঙুলগুলি ভিতরে ঢুকিয়ে শিশুর কাঁধটা এইভাবে পেছনদিকে ঠেলে দিন:



অথবা, এইভাবে তার হাতদুটি তার শরীরের ওপর চেপে দিন:



যদি মাথাটা আটকে যায়, মাকে চিৎ করে শুইয়ে দিন। আপনার একটা আঙুল শিশুর মুখের মধ্যে দিয়ে তার মাথাটা তার বুকের দিকে ঠেলে দিন। সঙ্গে সঙ্গে আর একজনকে দিয়ে মায়ের পেটের ওপর এইভাবে চাপ দিয়ে শিশুর মাথাটা নিচের দিকে ঠেলে দিন:



মাকে জোরে ঠেলা দিতে বলুন। কিন্তু কখনো শিশুর শরীর ধরে টানবেন না।

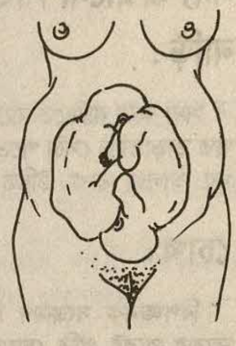
৩· **একটা হাত বেরিয়ে আসা** (হাত আগে)। শিশুর হাত আগে বেরিয়ে এলে তখনি ডাক্তারি সাহায্য নিন। শিশুকে বার করতে অপারেশনের দরকার হতে পারে।



৪· কখনো কখনো **নাড়িটা শিশুর গলার চারপাশে এত শক্তভাবে জড়িয়ে যায়** যে সে পুরোপুরি বার হতে পারে না। শিশুর গলার চারপাশ থেকে নাড়ির ফাঁসটা খুলে দেবার চেষ্টা করুন। এটা না পারলে, আপনাকে নাড়িটা চেপে বা বেঁধে দিয়ে কেটে ফেলতে হতে পারে। ফোটানো ভোঁতাডগার কাঁচি ব্যবহার করুন।

৫· **শিশুর মুখে আর নাকে মল।** জল ভাঙার সময়, যদি দেখেন যে তাতে শিশুর প্রথম কালো মল (মেকোনিয়াম) রয়েছে, তবে শিশুর বিপদ থাকতে পারে। শিশু যদি একটুও মল শ্বাসের সঙ্গে টেনে ফুসফুসের ভেতর ঢুকিয়ে ফেলে, সে মারা যেতে পারে। মাথাটা বার হলেই মাকে বলুন ঠেলা না দিয়ে ঘনঘন ছোট শ্বাস নিতে। শিশু শ্বাস নিতে শুরু করার আগে, সময় নিয়ে, শোষার ড্রপার দিয়ে তার নাক আর মুখ থেকে মলটা শুষে বার করে দেবেন। সে যদি সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস নিতে শুরু করে, তবুও যতক্ষণ না সব মল বেরিয়ে যায়, শুষতে থাকুন।

৬· **যমজ।** একটি শিশুর জন্মের থেকে, যমজের জন্ম সাধারণতঃ মা আর শিশু দুজনের পক্ষেই আরো বিপজ্জনক হয়।



**মায়ের পেটে ছেলেপিলে
যমজ যদি হয়,
হাসপাতালে প্রসব হলে
নিরাপদে রয়।**

যমজ হলে সাধারণতঃ অনেক আগে প্রসব ব্যথা ওঠে, **এই কারণে পোয়াতি অবস্থার সাত মাসের পর থেকে মায়ের হাসপাতালের কাছাকাছি থাকা উচিত।**

পোয়াতির যমজ হবার সম্ভাবনার লক্ষণ:

- পেট অনেক তাড়াতাড়ি বাড়ে আর জরায়ু স্বাভাবিকের থেকে বড় হয়, বিশেষ করে শেষের মাসগুলিতে (পৃঃ ২৯৭)।
- পোয়াতির যদি স্বাভাবিকের থেকে তাড়াতাড়ি ওজন বাড়ে অথবা পোয়াতি অবস্থায় সাধারণ সমস্যাগুলি (সকালের বমি, পিঠে ব্যথা, ভেরিকোজ শিরা, অর্শ, ফোলা আর শ্বাসকষ্ট) সাধারণের থেকে আরো খারাপ হয়, তবে যমজ আছে কিনা দেখে নেবেন।
- যদি পেট অস্বাভাবিক বড় হয় আর তার ওপর হাত দিয়ে ৩ টি বা তার বেশি বড় জিনিস টের পাওয়া যায়, তবে যমজ হতে পারে।
- কখনো কখনো মায়ের হার্টের স্পন্দন ছাড়াও আরো দুটি হার্টের স্পন্দন টের পাওয়া যায়, তবে সাধারণতঃ তা পাওয়া মুস্কিল।

শেষের মাসগুলিতে পোয়াতি যদি প্রচুর বিশ্রাম নেয় আর সাবধানে কঠিন পরিশ্রম এড়িয়ে চলে, তবে যমজ ছেলেপিলে বেশি তাড়াতাড়ি জন্মাবার সম্ভাবনা কম থাকে।

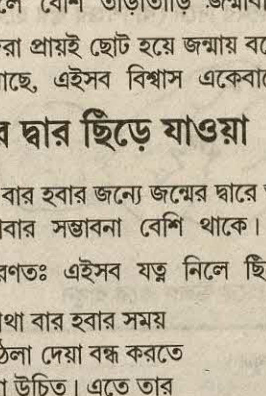
যমজরা প্রায়ই ছোট হয়ে জন্মায় বলে তাদের বিশেষ যত্ন লাগে। তবে যমজদের অদ্ভুত কোন ক্ষমতা বা যাদু করার শক্তি আছে, এইসব বিশ্বাস একেবারেই সত্যি নয়।

জন্মের দ্বার ছিঁড়ে যাওয়া

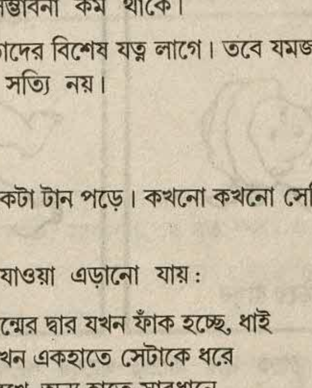
শিশু বার হবার জন্যে জন্মের দ্বারে অনেকটা টান পড়ে। কখনো কখনো সেটি ছিঁড়ে যায়। মায়ের প্রথম সন্তান হলে ছিঁড়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

সাধারণতঃ এইসব যত্ন নিলে ছিঁড়ে যাওয়া এড়ানো যায়:

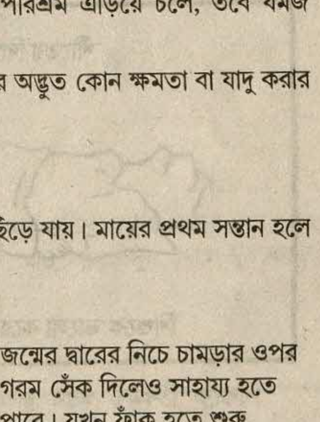
শিশুর মাথা বার হবার সময় মায়ের ঠেলা দেয়া বন্ধ করতে চেষ্টা করা উচিত। এতে তার জন্মের দ্বার ফাঁক হবার সময় পায়। ঠেলা দেয়া বন্ধ রাখতে তার হাঁপানো (ঘনঘন ছোট নিশ্বাস নেয়া) উচিত।



জন্মের দ্বার যখন ফাঁক হচ্ছে, ধাই তখন একহাতে সেটাকে ধরে রেখে, অন্য হাতে সাবধানে মাথাটা ধরবে, যাতে সেটা বেশি তাড়াতাড়ি বার না হয়, এইভাবে:



জন্মের দ্বারের নিচে চামড়ার ওপর গরম সেঁক দিলেও সাহায্য হতে পারে। যখন ফাঁক হতে শুরু করবে, তখন শুরু করবেন।



যদি ছিঁড়ে যায়, তবে ফুলটা বার হয়ে যাবার পর, কাজ জানে এমন একজনের, ছেঁড়াটা সাবধানে সেলাই করে বন্ধ করে দেয়া উচিত (পৃঃ ৯৯ আর ৪১৫)।

সদ্য জন্মানো শিশুর যত্ন

নাড়ি :

সদ্য কাটা নাড়িতে যাতে সংক্রমণ না হয়; তার জন্যে সেটা পরিষ্কার আর শুকনো রাখা উচিত। যত শুকনো থাকে, তত তাড়াতাড়ি সেটা পড়ে যায় আর নাভিটা শুকিয়ে যায়। এই কারণে পেটটা না বাঁধা ভালো, অথবা বাঁধা হলে, বাঁধন খুব আলগা রাখা উচিত (পৃঃ ২২৫ আর ৩০৯)।

চোখ :

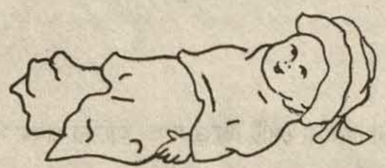


বিপজ্জনক সংক্রমণ থেকে কচি শিশুর চোখ রক্ষা করার জন্যে জন্মের পরেই প্রতি চোখে ১% সিলভার নাইট্রেটের এক ফোঁটা করে, অথবা একটু করে টেট্রাসাইক্লিন মলম লাগাবেন (পৃঃ ২২৬)। যদি তার বাবা কিংবা মায়ের কখনো গনোরিয়ার লক্ষণ দেখা দিয়ে থাকে (পৃঃ ২৮০), তবে এটা বিশেষ জরুরি।

শিশুকে গরম রাখা—কিন্তু খুব গরম নয় :

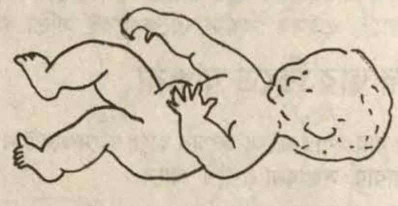
শিশুকে ঠাণ্ডা থেকে যেমন, তেমনি খুব গরম থেকে রক্ষা করবেন। নিজে যতটা গরম জামাকাপড় পরতে চান, ততটাই তাকে পরাবেন।

শীতের দিনে



শিশুকে ভালো করে জড়িয়ে রাখুন

.কিন্তু গরমের দিনে (বা শিশুর জ্বর হলে)



তাকে উলঙ্গ করে রাখুন

শিশুকে ঠিকমত গরম রাখতে তাকে তার মায়ের গায়ের পাশে রাখুন।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা :

পরিচ্ছেদ ১২-তে যে সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিধি দেয়া হয়েছে সেগুলি মেনে চলাটা জরুরি। নিচের জিনিসগুলির সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন নেবেন:

- শিশু কোলোট বা বিছানা ভেজালে বা নোংরা করলেই বদলে দেবেন। গা যদি লাল হয়ে যায় কোলোট আরো ঘনঘন বদলাবেন—না পরালে আরো ভালো হয় (পৃঃ ২৫৬)।
- নাড়ি পড়ে যাবার পর শিশুকে প্রতিদিন নরম সাবান আর অল্পগরম জল দিয়ে স্নান করাবেন।
- মাছি বা মশা থাকলে, শিশুর খাট বা বিছানা, মশারি বা পাৎলা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেবেন।
- যাদের খোলা ঘা, সর্দিকাশি, গলাব্যথা, যক্ষ্মা বা অন্য সংক্রামক রোগ হয়েছে, তাদের শিশুকে ছোঁয়া বা তার কাছে যাওয়া উচিত নয়।
- শিশুকে ধোঁয়া আর ধুলো থেকে দূরে কোন পরিষ্কার জায়গায় রাখবেন।

খাওয়ানো :

("ছোট ছেলেপিলেদের পক্ষে সবথেকে ভালো খাবার" পৃঃ ১৪১-ও দেখুন)

শিশুর পক্ষে বুকের দুধই সবথেকে ভালো খাবার। যে সব শিশু বুকের দুধ খায় তারা আরো সুস্থ সবল হয়ে বাড়ে, তাদের মারা যাবার সম্ভাবনা কম থাকে। এর কারণ হল:

- টাটকা, টিনের বা গুঁড়ো—অন্য যে কোনো দুধের থেকে বুকের দুধেই শিশুর পক্ষে দরকারি সব জিনিসগুলি অনেক ভালোভাবে থাকে।
- বুকের দুধ পরিষ্কার। অন্য খাবার দিলে, বিশেষ করে বোতলে খাওয়ালে, সেগুলি, পাৎলা পায়খানা এবং অন্যান্য রোগ থেকে শিশুকে বাঁচাবার মত যথেষ্ট পরিষ্কার রাখা খুব কঠিন হয়ে যায়।
- বুকের দুধ সবসময় ঠিকমত গরম থাকে।
- বুকের দুধে এমন কয়েকটি জিনিস (এনটিবডি) আছে, যেগুলি শিশুকে হাম আর পোলিওর মত কয়েকটা রোগ থেকে বাঁচায়।

শিশু জন্মানো মাত্রই তাকে মায়ের বুকে দেয়া উচিত। প্রথম কয়েক দিন সাধারণতঃ মায়ের বুকে খুব অল্পই দুধ হয়। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু শিশুকে বোতলে খাওয়ানো শুরু করা উচিত নয়, বরং ঘনঘন বুকের দুধ দেয়া উচিত। শিশু টানলেই মায়ের দুধ বাড়ার সাহায্য হবে।

মায়ের বুকে যথেষ্ট দুধ থাকলে শিশুকে প্রথম ৪ থেকে ৬ মাস শুধু বুকের দুধ দেয়া উচিত। তারপর শিশুকে বুকের দুধ দিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পুষ্টিকর খাবারও দিতে শুরু করা উচিত (পৃঃ ১৪২)।

কি ভাবে বুকের দুধ বাড়ানো যেতে পারে

মায়ের উচিত:

- প্রচুর তরল জিনিস খাওয়া,
- যতটা সম্ভব ভালো খাওয়া, বিশেষ করে দুধ, দুধ থেকে তৈরি খাবার, আর শরীর গড়ার খাবার (পৃঃ ১২৮) যেমন বরবটি, ডাল, সবুজ শাকসবজি, আর পেঁপের মত ফল। শুকনো মাছ আর রসুন খেলে দুধ বাড়ে।
- যথেষ্ট ঘুমোনো আর বেশি ক্লান্ত বা বিচলিত হওয়া এড়িয়ে চলা।
- আরো ঘনঘন শিশুকে বুকের দুধ দেয়া।

বোতলে যারা খায় সেই শিশুদের অসুস্থ হবার আর মারা যাবার সম্ভাবনা বেশি



বুকের দুধ যারা খায় সেই শিশুরা অনেক সুস্থ হয়



সদ্য জন্মানো শিশুকে ওষুধ দেয়ার বিষয়ে যত্ন :

অনেক ওষুধ কচি বাচ্চার পক্ষে বিপজ্জনক। যে সব ওষুধ সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিতভাবে জানেন যে সেগুলি কচি বাচ্চাদের জন্যে দেয়া হয়, শুধু সেগুলি দেবেন, তাও সত্যিসত্যিই দরকার না হলে দেবেন না। ঠিক মাত্রা জানেন কিনা দেখুন, বেশি দেবেন না। কচি বাচ্চার পক্ষে ক্লোরামফেনিকল বিশেষ বিপজ্জনক··· শিশু সময়ের আগে জন্মালে বা ওজন কম থাকলে (২ কিলোগ্রামের থেকে কম) আরো বিপজ্জনক হয়।

সদ্য জন্মানো শিশুর রোগ

শিশুর কোনো রোগ হলে সেটা লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেয়াটা খুব জরুরি।

যে সব রোগে বড়দের মৃত্যু হতে কয়েকদিন বা সপ্তাহ সময় নেয়, সেগুলি থেকে শিশুরা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা যেতে পারে।

যে সব সমস্যা নিয়ে শিশুরা জন্মায় : (পৃঃ ৩৬৩-ও দেখুন)

পেটের মধ্যে শিশু বাড়বার সময় কিছু গোলমাল হলে অথবা জন্মাবার সময় শিশুর কোনো ক্ষতি হলে এইসব সমস্যা হতে পারে। শিশুর জন্মের পরেই তাকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখুন। তার যদি নিচের লক্ষণগুলির মধ্যে কোনো একটি থাকে, তবে তার কোনো কঠিন গোলমাল হয়ে থাকতে পারে:

- সে যদি জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই শ্বাস না নেয়।
- যদি তার নাড়ি পাওয়া বা শোনা না যায়, বা মিনিটে ১০০ বারের থেকে কম চলে।
- সে শ্বাস নিতে শুরু করার পর যদি তার মুখ আর শরীর সাদা, নীল বা হলদে থাকে।
- যদি তার হাত পা নেতিয়ে থাকে—সে নিজে নিজে বা চিমটি কাটলেও নাড়ায় না।
- প্রথম ১৫ মিনিটের পর সে যদি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বা তার শ্বাস নিতে অসুবিধে হয়।

এগুলির মধ্যে কয়েকটি সমস্যা জন্মের সময় মগজের ক্ষতি থেকে হতে পারে। প্রায় কখনোই এগুলি সংক্রমণ থেকে হয় না (যদি না জন্মের ২৪ ঘণ্টা আগে জল ভেঙ্গে থাকে)। সাধারণ ওষুধে হয়তো কাজ হবে না। ডাক্তারি সাহায্য নিতে চেষ্টা করুন।

যদি প্রথম ২ দিন শিশু পেচ্ছাপ বা মলত্যাগ না করে, তাহলেও ডাক্তারি সাহায্য নেবেন।

শিশু জন্মাবার পর যে সব সমস্যা হয় (প্রথম কয়েক দিনে বা সপ্তাহে) :

১· **নাভি (নাড়ি) থেকে পুঁজ বা দুর্গন্ধ বার হওয়া** একটা বিপজ্জনক লক্ষণ। ধনুষ্টঙ্কারের (পৃঃ ২২৩) প্রথমদিকের বা রক্তের কোনো সংক্রমণের (পৃঃ ৩২১) লক্ষণ আছে কিনা দেখুন। নাড়িটা হাইড্রোজেন পেরকসাইডে ভিজিয়ে, তাতে জেনসিয়ান ভায়োলেট (পৃঃ ৪০৯) লাগিয়ে সেটা খোলা বাতাসে রাখুন। নাড়ির চারপাশের চামড়া গরম আর লাল হয়ে গেলে এমপিসিলিন (পৃঃ ৩৯৯) বা পেনিসিলিন আর স্ট্রেপটোমাইসিন (পৃঃ ৪০০) দিয়ে চিকিৎসা করুন।

২· **গায়ের তাপ কমে যাওয়া** (৩৫° সেঃ-এর নিচে) আর বেশি জ্বর, এ দুটোর যে কোনো একটা সংক্রমণের লক্ষণ হতে পারে। বেশি জ্বর কচিবাচ্চার পক্ষে বিপজ্জনক। শিশুর সমস্ত জামাকাপড় খুলে তাকে পৃঃ ৮৮-তে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে ঠাণ্ডা জল দিয়ে স্নান করান। এছাড়া শরীরে জল কমে যাওয়ার লক্ষণ (পৃঃ ১৮১) আছে কিনা দেখে নিন। থাকলে, শিশুকে বুকের দুধ আর চিনি নুনের সরবৎ (পৃঃ ১৮২) দিন।

৩· **ফিট** (তড়কা, পৃঃ ২১৭)। এর সঙ্গে শিশুর জ্বরও থাকলে, একটু আগে যেমন বলা হল সেইভাবে চিকিৎসা করুন। জলের অভাব আছে কিনা দেখে নিতে ভুলবেন না। জন্মের দিন যে সব ফিট হয় সেগুলি সম্ভবতঃ জন্মের সময় মগজের ক্ষতির থেকে হয়। কয়েকদিন পরে ফিট শুরু হলে, ধনুষ্টঙ্কার (পৃঃ ২২৩) বা মেনিনজাইটিস (পৃঃ ২২৫)-এর লক্ষণ আছে কি না মন দিয়ে দেখুন।

৪· **শিশুর ওজন বাড়ে না**। প্রথম কয়েকদিন, বেশির ভাগ শিশুর ওজন কমে যায়। এটা স্বাভাবিক। প্রথম সপ্তাহের পর, সুস্থ শিশুর প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ ২০০ গ্রাম করে বাড়া উচিত। ২ সপ্তাহের মধ্যে সুস্থ শিশুর ওজন জন্মের সময়ের ওজনের সমান হওয়া উচিত। ওজন না বাড়লে বা কমে গেলে, কিছু গোলমাল হয়েছে। জন্মের সময় কি শিশুকে সুস্থ মনে হয়েছিল? সে কি ভালোভাবে খাচ্ছে? শিশুকে যত্ন নিয়ে পরীক্ষা করে দেখুন সংক্রমণ বা অন্য সমস্যার লক্ষণ আছে কি না। যদি সমস্যাটা বার করে সেটাকে সারাতে না পারেন, ডাক্তারি সাহায্য নিন।

৫· **বমি**। সুস্থ শিশুরা ঢেকুর তোলার সময় (খাবার সময় গেলা বাতাসটা বার করার সময়) কখনো কখনো একটু দুধও বেরিয়ে আসে। এটা স্বাভাবিক। শিশুর খাওয়ার পর তাকে আপনার কাঁধের ওপর এইভাবে ধরে তার পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় দিয়ে তাকে বাতাস বার করতে সাহায্য করুন। →



খাওয়ানোর পর শিশুকে ঢেকুর তোলান

বুকের দুধ খাইয়ে শুইয়ে দিলে যদি শিশু বমি করে, প্রতিবার খাওয়ানোর পর একটুক্ষণ তাকে সোজাভাবে বসিয়ে রেখে দেখুন।

যে শিশু খুব জোরে বমি করে বা ঘনঘন এত বেশি বমি করে যে তার ওজন কমে যায় বা শরীরে জলের অভাব ঘটে, সে অসুস্থ। শিশুর যদি পাৎলা পায়খানাও হয়, তবে হয়তো তার অন্ত্রে কোনো সংক্রমণ হয়েছে (পৃঃ ১৮৮)। রক্তে জীবাণুর সংক্রমণ (পরের পৃষ্ঠা দেখুন), মেনিনজাইটিস (পৃঃ ২২৫) এবং অন্যান্য সংক্রমণেও বমি হয়।

বমি যদি হলদে বা সবুজ হয়, অন্ত্রে আটকে যাওয়া (পৃঃ ১০৭) হতে পারে, বিশেষ করে যদি পেটটা খুব ফুলে যায় বা শিশু তার আগে যদি মলত্যাগ না করে থাকে। তখনি শিশুকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান।

৬· **শিশু ভালো করে দুধ টানা বন্ধ করে**। ৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও যদি শিশু তখনো দুধ না টানে, সেটা বিপদের লক্ষণ—বিশেষ করে যদি শিশুকে খুব ঘুমঘুম বা অসুস্থ মনে হয়, অথবা সে যদি অস্বাভাবিক ভাবে কাঁদে বা নড়াচড়া করে। নানা রোগ থেকে এই লক্ষণগুলি হয়, তবে প্রথম ২ সপ্তাহে যে দুটি রোগ থেকে বেশি হয় আর বিপদ ঘটে তা হল রক্তে **জীবাণুর সংক্রমণ** (পরের ২ পৃষ্ঠা দেখুন) আর **ধনুষ্টঙ্কার** (পৃঃ ২২৩)।

যে শিশু জন্মের পর ২ থেকে ৫ দিনের মধ্যে দুধ টানা বন্ধ করে, তার হয়তো রক্তে জীবাণুর সংক্রমণ হয়েছে।

যে শিশু জন্মের পর ৫ থেকে ২৫ দিনের মধ্যে দুধ টানা বন্ধ করে, তার হয়তো ধনুষ্টঙ্কার হয়েছে।

শিশু ভালোভাবে দুধ খাওয়া বন্ধ করলে বা তাকে অসুস্থ মনে হলে :

পরিচ্ছেদ ৩-এ যা বলা হয়েছে সেইভাবে তাকে যত্ন করে পুরোপুরি পরীক্ষা করুন। নিচের জিনিসগুলি দেখে নিতে ভুলবেন না:

■ শিশুর শ্বাসকষ্ট আছে কিনা লক্ষ্য করুন। নাক শ্লেষ্মায় বন্ধ থাকলে পৃঃ ২০১-এ যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে টেনে বার করে দিন। দ্রুত শ্বাস (মিনিটে ৫০ বা তার বেশি বার শ্বাস), গায়ের রং নীল, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করা, প্রতি শ্বাসের সঙ্গে পাঁজরের মাঝের চামড়া ঢুকে যাওয়া—এগুলি নিউমোনিয়ার লক্ষণ। কচি বাচ্চাদের নিউমোনিয়া হলে তাদের প্রায়ই কাশি হয় না। কখনো কখনো সাধারণ লক্ষণগুলোর কোনোটাই থাকে না। নিউমোনিয়া বলে সন্দেহ হলে রক্তে জীবাণুর সংক্রমণে যা করা হয় সেই চিকিৎসা করুন (পরের পৃষ্ঠা দেখুন)।

■ শিশুর গায়ের রংটা দেখুন।

যদি ঠোঁট আর মুখ নীল হয়, নিউমোনিয়া (অথবা হার্টের দোষ বা অন্য কোনো জন্মগত সমস্যা) কি না ভাবুন।

যদি মুখ আর চোখের সাদা অংশ হলদে (ন্যাবা) হতে শুরু করে (জন্মের পর প্রথম দিন বা পাঁচ দিনের পরে), এটা গুরুতর ব্যাপার। ডাক্তারি সাহায্য নিন। দ্বিতীয় আর পাঁচ দিনের মধ্যে একটু হলদে রং সাধারণতঃ গুরুতর কিছু নয়। শিশুকে প্রচুর তরল খাবার দিন—বুকের দুধের সঙ্গে সবথেকে ভালো হল চিনি নুনের সরবৎ (পৃঃ ১৮২)। শিশুর সব জামাকাপড় খুলে নিয়ে তাকে জানলার কাছে পরিষ্কার আলোয় রাখুন (তবে সোজাসুজি রোদে নয়)।

■ **মাথার ওপরের নরম জায়গাটা** (ফনটানেল) ছুঁয়ে দেখুন। পৃঃ ৬ দেখুন।

যদি নরম জায়গাটা ভেতরে ঢুকে গিয়ে থাকে, শিশুর শরীরে জলের অভাব হয়ে থাকতে পারে।



যদি নরম জায়গাটা ফুলে গিয়ে থাকে, শিশুর মেনিনজাইটিস হয়ে থাকতে পারে।



জরুরি: যদি শিশুর একই সঙ্গে মেনিনজাইটিস আর শরীরে জলের অভাব হয়ে থাকে, নরম জায়গাটা স্বাভাবিক মনে হতে পারে। শরীরে জলের অভাব (পৃঃ ১৮১), আর মেনিনজাইটিস (পৃঃ ২২৫), দুটোরই অন্য লক্ষণগুলো দেখে নিতে ভুলবেন না।

■ **শিশুর নড়াচড়া আর মুখের ভাব লক্ষ্য করুন:**



শরীর আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া আর/কিংবা অদ্ভুত নড়াচড়া ধনুষ্টঙ্কার, মেনিনজাইটিস, বা জন্মের সময় থেকে মগজের ক্ষতি বা জ্বরের লক্ষণ হতে পারে। যদি শিশুকে ছুঁলে বা নাড়ালে তার মুখের আর শরীরের পেশী হঠাৎ শক্ত হয়ে যায়, সেটা ধনুষ্টঙ্কার হতে পারে। তার চোয়াল খুলছে কিনা আর তার হাঁটুর প্রতিবর্তী কাজ দেখে নিন (পৃঃ ২২৪)।

শিশুর চোখ যদি উল্টে যায় অথবা সে হঠাৎ বা জোরে নড়াচড়া করলে যদি দ্রুত ওপরনিচ করে তার সম্ভবতঃ ধনুষ্টঙ্কার হয়নি। এই ধরনের ফিট মেনিনজাইটিস থেকে হতে পারে, তবে শরীরে জলের অভাব আর খুব জ্বর, এ দুটো থেকে বেশি হয়। শিশুর মাথা তার দুটি হাঁটুর মধ্যে রাখা যাচ্ছে কি ? শিশু যদি এত শক্ত হয়ে থাকে যে এরকম করা যায় না, অথবা করলে ব্যথায় কেঁদে ওঠে, তার সম্ভবতঃ মেনিনজাইটিস হয়েছে।

■ রক্তে জীবাণুর সংক্রমণের লক্ষণ আছে কিনা দেখুন।

রক্তে জীবাণুর সংক্রমণ (সেপটিসিমিয়া)

কচি বাচ্চারা সংক্রমণের সঙ্গে ভালো করে যুঝতে পারে না। তাই জন্মের সময় যে সব জীবাণু শিশুর চামড়া বা নাড়িতে ঢুকে যায়, সেগুলো প্রায়ই রক্তে ঢুকে পড়ে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে যায়। এতে দু-এক দিন লাগে বলে দ্বিতীয় দিনের পর থেকে সেপটিসিমিয়া সবথেকে বেশি দেখা যায়।

লক্ষণ:

কচি বাচ্চাদের শরীরে সংক্রমণের লক্ষণ বড় ছেলেপিলেদের লক্ষণের থেকে আলাদা হয়। কচি বাচ্চাদের বেলায়, রক্তে কঠিন সংক্রমণ থেকে প্রায় যে কোনো লক্ষণই দেখা যেতে পারে। এই সব লক্ষণগুলো দেখা যেতে পারে:

- শিশু ভালোভাবে দুধ টানে না
- তাকে ঘুমন্ত দেখায়
- খুব ফ্যাকাসে (রক্তহীন)
- বমি বা পাৎলা পায়খানা
- জ্বর বা তাপ কমে যাওয়া (৩৫°-এর নিচে)
- ফোলা পেট
- হলদে চামড়া (ন্যাবা)
- ফিট (তড়কা)
- যখন তখন শিশু নীল হয়ে যায়

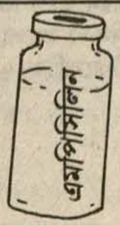
এর প্রত্যেকটি লক্ষণই সেপটিসিমিয়া ছাড়াও অন্য কিছু থেকে হতে পারে, **কিন্তু যদি শিশুর এর মধ্যে কয়েকটি লক্ষণ একই সঙ্গে হয়, তবে সেপটিসিমিয়া হওয়া সম্ভব।**

গুরুতর সংক্রমণ হলে, কচি বাচ্চাদের সব সময় জ্বর হয় না। শরীরের তাপ বেশি, কম বা স্বাভাবিক হতে পারে।

কচি বাচ্চার সেপটিসিমিয়া বলে সন্দেহ হলে চিকিৎসা:

- এমপিসিলিনের ইনজেকশন দিন (পৃঃ ৩৯৯)
- অথবা পেনিসিলিনের ইনজেকশন দিন
- দেখবেন, শিশু যেন যথেষ্ট তরল খাবার পায়। দরকার হলে চামচ দিয়ে বুকের দুধ আর চিনি নুনের সরবৎ খাওয়াবেন (পৃঃ ১৮২)
- ডাক্তারি সাহায্য পেতে চেষ্টা করুন

কচি বাচ্চাদের সংক্রমণ কখনো কখনো বোঝা শক্ত হয়। প্রায়ই জ্বর থাকে না। সম্ভব হলে ডাক্তারি সাহায্য নেবেন। সম্ভব না হলে, আগে যেভাবে বলা হয়েছে সেইভাবে এমপিসিলিন দিয়ে চিকিৎসা করুন। শিশুদের পক্ষে এমপিসিলিন একটা সবথেকে নিরাপদ এনটিবায়োটিক আর সবথেকে উপকারি।



প্রসবের পর মায়ের স্বাস্থ্য

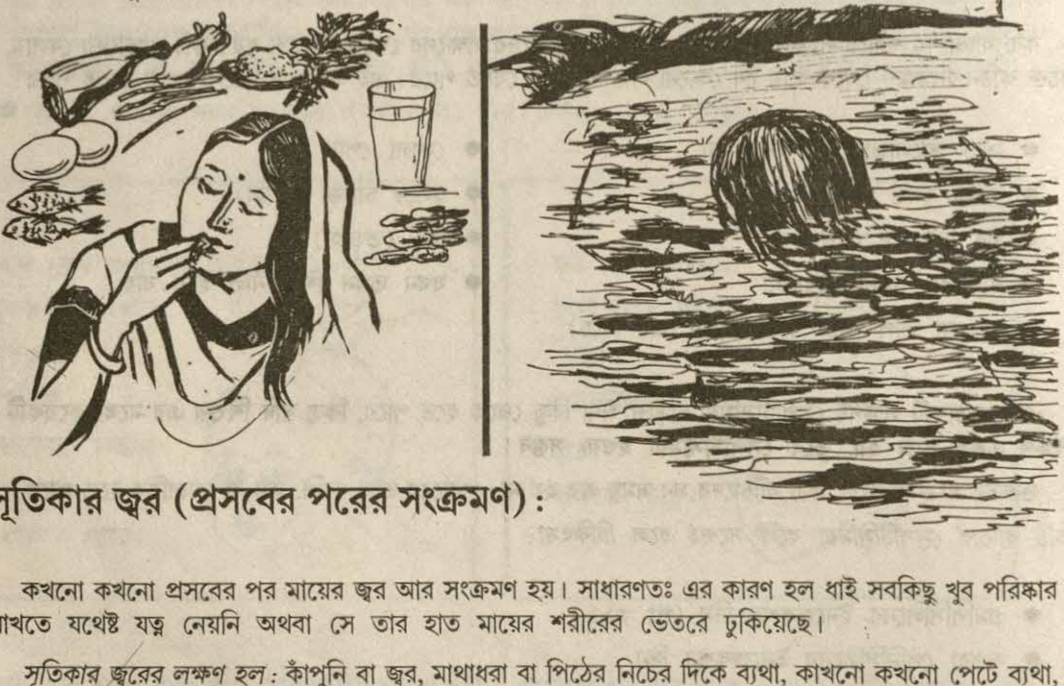
খাওয়াদাওয়া এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা :

পরিচ্ছেদ ১১-তে যেমন বোঝানো হয়েছে, সন্তান প্রসবের পর মা, **সব রকম পুষ্টিকর খাবার—যা পাওয়া যায়—তাই খেতে পারে, আর তাই তার খাওয়া উচিত**। তার কোনো ধরনের খাবার বাদ দেয়ার দরকার নেই। তার পক্ষে বিশেষ উপকারি খাবার হল দুধ, পনীর, মুরগি, ডিম, মাংস, মাছ, ফল, তরিতরকারি, দানাশস্য, বরবটি, চিনেবাদাম ইত্যাদি। যদি সে শুধু রুটি, ভাত আর ডাল খায়, তার উচিত প্রতিবার খাওয়ার সময় এগুলো একসঙ্গে খাওয়া। দুধ আর অন্য দুধ থেকে পাওয়া খাবার শিশুর জন্যে বেশি করে মায়ের দুধ তৈরি করতে সাহায্য করে।

প্রসবের পর প্রথম কয়েকদিন মা স্নান করতে পারে—করা উচিত। প্রথম সপ্তাহে তার জলে না নেমে ভিজে গামছা দিয়ে স্নান করাই ভালো। **প্রসবের পর স্নান করলে ক্ষতি হয় না**। সত্যি বলতে, যে সব মেয়েরা অনেক দিন স্নান করে না, তাদের সংক্রমণ হয়ে চামড়ার রোগ হতে পারে, তাদের শিশুরাও অসুস্থ হয়ে যেতে পারে।

প্রসবের পরের দিন আর সপ্তাহগুলিতে মায়ের উচিত:

পুষ্টিকর খাবার খাওয়া আর *নিয়মিত স্নান করা*



সূতিকার জ্বর (প্রসবের পরের সংক্রমণ) :

কখনো কখনো প্রসবের পর মায়ের জ্বর আর সংক্রমণ হয়। সাধারণতঃ এর কারণ হল ধাই সবকিছু খুব পরিষ্কার রাখতে যথেষ্ট যত্ন নেয়নি অথবা সে তার হাত মায়ের শরীরের ভেতরে ঢুকিয়েছে।

সূতিকার জ্বরের লক্ষণ হল: কাঁপুনি বা জ্বর, মাথাধরা বা পিঠের নিচের দিকে ব্যথা, কাখনো কখনো পেটে ব্যথা, আর যোনি থেকে দুর্গন্ধযুক্ত বা রক্তমেশা স্রাব।

চিকিৎসা:

গরম জলে ভিনিগার বা পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট দিয়ে তাই দিয়ে যোনি ধুলে (পৃঃ ২৮৬) কাজ হয়। মেয়েটি যতদিন না ভালো হয়, তার এটা দিনে ৩ বার করে করা উচিত। পেনিসিলিন ব্যরহার করুন। না পেলে বদলে অন্য এনটিবায়োটিক (এমপিসিলিন বা সালফাডায়াজিন) ব্যবহার করা যেতে পারে।

ভীষণ বিপদ ঘটতে পারে **চট করে না যদি সারে**	**সূতিকার এ জ্বরের থেকে** **ডাক্তারকে আনুন ডেকে**

স্তনের যত্ন

ঠিকমত স্তনের যত্ন নেয়া মা আর শিশু দুজনের স্বাস্থ্যের পক্ষেই জরুরি। জন্মাবার দিন থেকেই শিশুকে বুকের দুধ দিতে শুরু করা উচিত। প্রথমে শিশু বেশি টানতে নাও পারে, কিন্তু এতে মায়ের শরীর দুধ দিতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, বোঁটায় ব্যথাও হয় না। এইজন্যে…

শিশুকে জন্মের দিন থেকেই বুকের দুধ দিতে শুরু করুন

প্রথম দুদিন স্তন থেকে যে দুধ বার হয় তাকে কলোস্ট্রাম বলে। এটা পাৎলা আর জলো। মায়েরা প্রায়ই ভাবে যে এটা পচা দুধ। তাই তারা এই দুধটা শিশুকে খাওয়ায় না। এটা ঠিক নয়। কলোস্ট্রামে অনেক এনটিবডি (জীবাণুর সঙ্গে যারা যুদ্ধ করে) আছে, সেগুলি শিশুকে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে। এতে অনেক প্রোটিনও আছে। শিশু প্রথম দিন থেকে টানতে শুরু করলে, বুকে আরো দুধও আসবে।

স্বাভাবিকভাবে শিশুর যতটা দরকার বুকে ততটাই দুধ আসে। শিশু স্তন খালি করে খেলে আরো দুধ আসতে শুরু করে। শিশু খালি করে না খেলে, কিছুদিনের মধ্যেই দুধ কমে যায়। শিশু যখন অসুস্থ হয়ে দুধ টানা বন্ধ করে দেয়, কয়েকদিন পর মায়ের বুকের দুধও বন্ধ হয়ে যায়। তারপর যখন শিশু আবার টানতে পারে আর তার পুরো দুধ দরকার হয়, তখন বুকে যথেষ্ট দুধ নাও থাকতে পারে। এই কারণে,

**শিশু যদি অসুস্থ হয়ে বেশি দুধ না টানতে পারে,
তবে মায়ের উচিত হাত দিয়ে স্তন থেকে দুধ বার করে দেয়া,
যাতে বুকে আবার প্রচুর দুধ আসতে থাকে।**

স্তন থেকে দুধ টিপে বার করা :

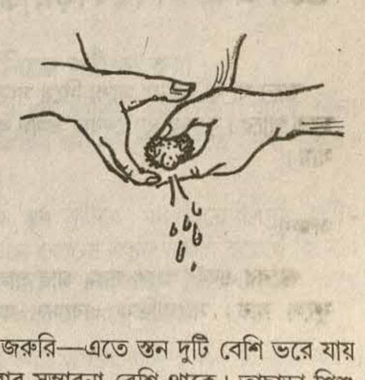
স্তনের একেবারে গোড়া থেকে এইভাবে ধরুন,

তারপর আপনার হাত দুটি সামনের দিকে নিয়ে যেতে যেতে টিপুন,

শেষে, বোঁটা থেকে টিপে দুধটা বার করে দিন।







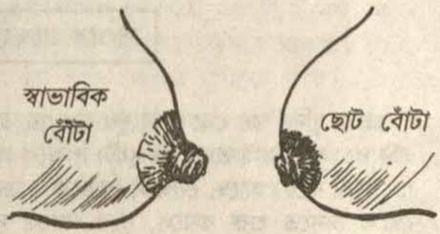
আরো একটা কারণে শিশু দুধ টানা বন্ধ করলে স্তন থেকে দুধ বার করাটা জরুরি—এতে স্তন দুটি বেশি ভরে যায় না। বেশি ভরে গেলে স্তনে ব্যথা হয়। ভরা স্তনে ব্যথা হলে তাতে ফোড়া হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাছাড়া শিশু চাইলেও দুধ টানতে তার অসুবিধা হতে পারে।

শিশু যদি এত দুর্বল হয় যে সে টানতে পারে না, আপনার স্তন থেকে হাত দিয়ে দুধ টিপে বার করে তাকে চামচ বা ড্রপার দিয়ে খাওয়ান।

স্তন দুটি সব সময় পরিষ্কার রাখবেন। শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর আগে বোঁটা দুটি পরিষ্কার ভিজে কাপড় দিয়ে মুছে নেবেন। কিন্তু প্রত্যেকবার বোঁটা পরিষ্কার করার সময় সাবান ব্যবহার করবেন না, কারণ এতে চামড়া ফেটে বোঁটায় ব্যথা আর সংক্রমণ হতে পারে।

বোঁটায় ব্যথা :

শিশু পুরো জিনিসটা মুখের মধ্যে না নিয়ে যদি বোঁটাটা কামড়ায়, তাহলে, বোঁটায় ব্যথা হতে পারে। যে সব মায়ের বোঁটা ছোট তাদের বেলায় এটা বেশি হতে পারে।





এড়ানো :

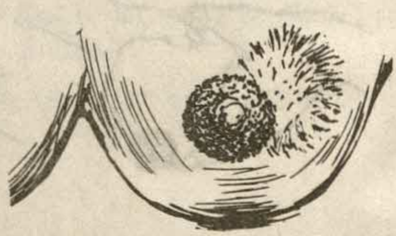
যে মেয়ের বোঁটা ছোট, সে যদি পোয়াতি অবস্থায় দিনে কয়েকবার এইভাবে বোঁটা দুটি টেপে, তাহলে শিশুর পক্ষে দুধ টানা সহজ হবে, মায়েরও বোঁটায় ব্যথা হবার সম্ভাবনা কম থাকবে।

চিকিৎসা :

ব্যথা হলেও, শিশুকে বুকের দুধ দিয়ে যাওয়াটা জরুরি। প্রথমে, যে দিকটায় কম ব্যথা, সেটা তাকে টানতে দিন। যদি বোঁটা থেকে বেশি রক্ত বা পুঁজ বার হয়, শুধু তবেই বুকের দুধ দেয়া বন্ধ করবেন। এরকম হলে, যতক্ষণ না বোঁটাগুলো সেরে যায়, হাত দিয়ে দুধ বার করে দেবেন। শিশু যখন আবার দুধ টানবে, দেখবেন যেন পুরো বোঁটাটা তার মুখের মধ্যে ঢোকে।

স্তনে এবসেস (ফোড়া, স্তনের মধ্যে সংক্রমণ, ম্যাসটাইটিস) :

স্তনে ঘা বা ফাটার মধ্যে দিয়ে সংক্রমণ ঢুকলে তা থেকে স্তনে এবসেস হতে পারে। বুকের দুধ দেবার প্রথম কয়েক সপ্তাহ বা মাস এটা বেশি দেখা যায়।



লক্ষণ :

স্তনের একটা অংশ গরম আর লাল হয়ে ফুলে ওঠে আর খুব যন্ত্রণা হয়। লিমফের গুটিগুলো প্রায়ই ব্যথা করে আর ফুলে যায়। সাংঘাতিক এবসেস কখনো কখনো ফেটে গিয়ে তা থেকে পুঁজ বেরোয়।

এড়ানো :

- স্তন পরিষ্কার রাখুন। স্তনে ব্যথা বা ফাটা হলে, শিশুকে কম সময় ধরে কিন্তু আরো ঘনঘন বুকের দুধ দিন।
- এছাড়া, প্রতিবার দুধ দেবার পর বোঁটায় একটু নারকেল তেল বা তিসির তেল লাগিয়ে দেবেন।

চিকিৎসা :

- যে স্তনে এবসেস হয়েছে তা থেকে হয় শিশুকে দুধ খাওয়ান, নয়তো হাত দিয়ে দুধ বার করে দিন—যাতে ব্যথা কম হয় সেটাই করবেন।
- ব্যথা কমাতে গরম সেঁক দেবেন। এছাড়া এসপিরিন খাবেন।
- সূতিকার জ্বরে যেমন লাগে (পৃঃ ৩২২) সেই রকম একটা এনটিবায়োটিক খান।

স্তনে নানা ধরনের দলা :

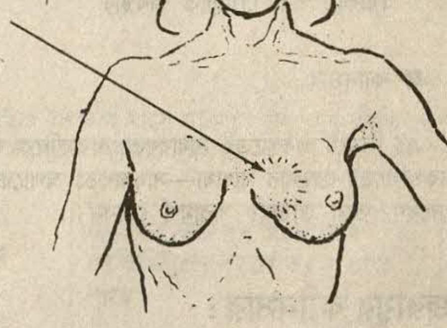
যে মা বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে তার বুকে যন্ত্রণাদায়ক, গরম দলা সম্ভবতঃ স্তনের এবসেস (সংক্রমণ)। স্তনে দলায় ব্যথা না থাকলে ক্যানসার হতে পারে।

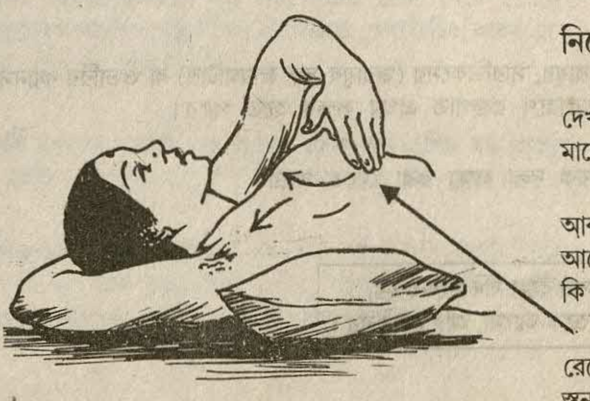
স্তনের ক্যানসার :

স্তনের ক্যানসার মেয়েদের মধ্যে বেশি দেখা যায়; এটা সব সময়েই বিপজ্জনক। ক্যানসারের প্রথম লক্ষণগুলি ধরে ফেলে তাড়াতাড়ি ডাক্তারি চিকিৎসা করানোর ওপর চিকিৎসায় কাজ হওয়া নির্ভর করে। সাধারণতঃ অপারেশন দরকার হয়।

স্তনের ক্যানসারের লক্ষণ :

- প্রায়ই স্তনের এই অংশে মেয়েটি একটা দলা লক্ষ্য করে।
- অথবা স্তনে একটা অস্বাভাবিক গর্ত বা টোল—অথবা কমলালেবুর খোসার মত অনেক ছোট গর্ত—থাকতে পারে।
- প্রায়ই বগলে বড় বড় কিছু যন্ত্রণাহীন লিমফের গুটি থাকে।
- দলাটা ধীরে ধীরে বাড়ে।
- প্রথমদিকে সাধারণতঃ ব্যথা করে না বা গরমও হয় না। পরে ব্যথা হতে পারে।

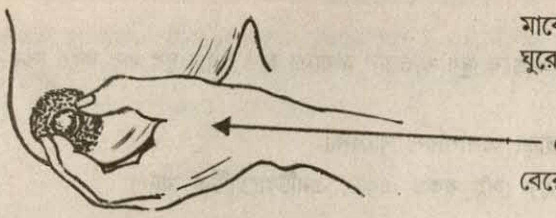




নিজের স্তন নিজে পরীক্ষা করা :

প্রত্যেক মেয়ের ক্যানসারের লক্ষণ আছে কিনা দেখার জন্য নিজের স্তন পরীক্ষা করতে শেখা উচিত। মাসে একবার :

- নিজের স্তন দুটিকে মন দিয়ে দেখুন, দুটির আকার বা গড়নে কোনো নতুন তফাৎ হয়েছে কি না। আগে যে লক্ষণগুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলি আছে কি না লক্ষ্য করতে চেষ্টা করুন।
- পিঠের নিচে একটা বালিশ বা পাট করা কম্বল রেখে শুয়ে, আপনার চার আঙুলের তলা দিয়ে বুলিয়ে স্তনটা দেখুন। স্তনটা টিপুন আর আঙুলের ডগাগুলির



মাঝে ঘোরান। বোঁটা থেকে শুরু করে স্তনের চারপাশ ঘুরে বগল অবধি চলে যান।

- তারপর বোঁটা টিপে দেখুন রক্ত বা কোনো রস বেরোয় কিনা।

দলা বা অন্য কোনো অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখলে, ডাক্তারি পরামর্শ নেবেন। অনেক দলা ক্যানসার হয় না, কিন্তু সময়ে জেনে নেয়াটা জরুরি।

তলপেটে দলা বা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি



সবথেকে বেশি যে ফোলা দেখা যায় সেটা অবশ্য পেটে শিশুর স্বাভাবিক বেড়ে ওঠা থেকেই হয়। অস্বাভাবিক দলা বা বৃদ্ধি নিচের কারণগুলি থেকে হতে পারে:

- একটা ওভারিতে (ডিম্বাশয়) সিস্ট বা জলভরা ফোলা হলে
- শিশু হঠাৎ জরায়ুর বাইরে বাড়তে শুরু করলে (একটোপিক পোয়াতি অবস্থা)
- ক্যানসার

এই তিনটে অবস্থাতেই সাধারণতঃ প্রথমদিকে যন্ত্রণা থাকে না—অথবা অল্প একটু অস্বস্তি হয়; পরে যন্ত্রণা হয়। সবগুলিতেই ডাক্তারি সাহায্য—সাধারণতঃ অপারেশন লাগে। যদি কোনো অস্বাভাবিক দলাকে ক্রমশঃ বেড়ে যেতে দেখেন, তবে ডাক্তারি পরামর্শ নেবেন।

জরায়ুর ক্যানসার :

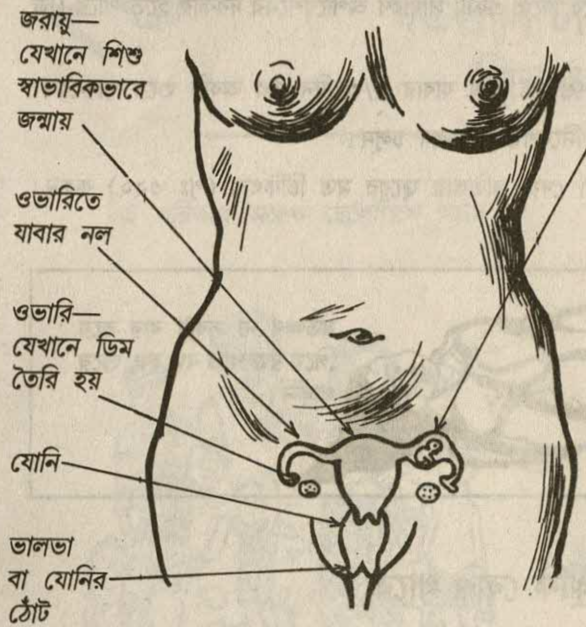
৪০ বছরের বেশি বয়সের মেয়েদের মধ্যে জরায়ুর, সারভিকসের (জরায়ুর সরু জায়গাটার) বা ওভারির ক্যানসার সবথেকে বেশি দেখা যায়। রক্তহীনতা বা অকারণে রক্তপাত প্রথম লক্ষণ হতে পারে।

পরে, পেটে একটা অস্বস্তিকর বা যন্ত্রণাদায়ক দলা লক্ষ্য করা যেতে পারে।

ক্যানসার বলে যদি সন্দেহ হয়,
ডাক্তার ডেকে আনো, আর দেরি নয়।

ঘরোয়া ওষুধে কাজ হওয়া সম্ভব নয়।

ভুল জায়গায় বা একটোপিক গর্ভ :



কখনো কখনো জরায়ুর বাইরে, ওভারি থেকে আসা নল দুটির একটির মধ্যে শিশু বেড়ে উঠতে শুরু করে।

পোয়াতি অবস্থার লক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে অস্বাভাবিক মাসিক হতে পারে—তলপেটে টান পড়া আর জরায়ুর বাইরে একটা দলা—যা টিপলে ব্যথা হয়—তাও হতে পারে।

ভুল জায়গায় বাড়তে শুরু করলে শিশু সাধারণতঃ বাঁচে না। একটোপিক গর্ভের জন্যে সাধারণতঃ হাসপাতালে অপারেশনের দরকার হয়। **এই রকম সমস্যা বলে যদি সন্দেহ হয়, তবে তাড়াতাড়ি ডাক্তারি পরামর্শ নেবেন, কারণ যে কোনো সময়ে বিপজ্জনক রক্তপাত শুরু হতে পারে।**

শিশু নষ্ট হওয়া (আপনা থেকে গর্ভপাত)

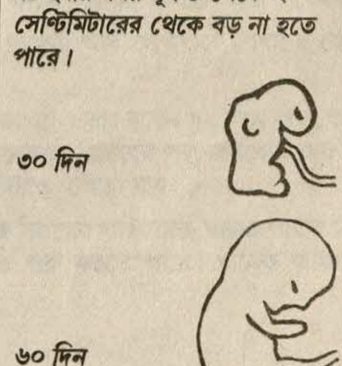
শিশু জন্মাবার আগে মারা গেলে নষ্ট হওয়া বলে। পোয়াতি অবস্থার প্রথম ৩ মাসে গর্ভপাত সবথেকে বেশি হয়। সাধারণতঃ শিশুর গড়ন ঠিক হয় না, তখন প্রকৃতি এইভাবে সমস্যাটা মিটিয়ে দেয়।

বেশির ভাগ মেয়ের জীবনে এক বা তার বেশিবার শিশু নষ্ট হয়। অনেক সময় তারা বুঝতে পারে না যে তাদের শিশু নষ্ট হচ্ছে। তাদের মনে হতে পারে যে তাদের মাসিক একবার হয়নি বা দেরি হয়েছে, তারপর অস্বাভাবিকভাবে বড় বড় রক্তের ডেলা নিয়ে হয়েছে। মেয়েদের কখন শিশু নষ্ট হচ্ছে সেটা বুঝতে শেখা উচিৎ, কারণ এতে বিপদ থাকতে পারে।

যদি কোনো মেয়ের এক বা তার বেশি বার মাসিক বন্ধ থাকার পর বেশি রক্তপাত হয়, তার সম্ভবতঃ শিশু নষ্ট হচ্ছে।

শিশু নষ্ট হওয়া শিশুর প্রসবের মত—কারণ ভ্রূণ (পেটে শিশুর প্রথম অবস্থা) আর ফুল দুটোই বেরিয়ে আসে। যতক্ষণ না দুটোই পুরোপুরি বার হয়, সাধারণতঃ রক্তপাত হয়ে চলে।

নষ্ট হবার সময় ভ্রূণ ১ থেকে ২ সেন্টিমিটারের থেকে বড় না হতে পারে।



চিকিৎসা:

বেশি রক্তপাত না হলে, কোনো সমস্যা নেই। মেয়েটির শুয়ে থাকা উচিত। প্রসবের সময় যে ভাবে যত্ন আর সাবধানতা নেয়া হয়, নষ্ট হবার সময় সেই ভাবেই যত্ন আর সাবধানতা নেয়া উচিত।

বেশি রক্তপাত হলে, অথবা অনেকদিন ধরে রক্তপাত চললে:

- ডাক্তারি সাহায্য নেবেন। জরায়ুটা পরিষ্কার করে দিতে একটা সাধারণ অপারেশনের দরকার হতে পারে (ডি এবং সি)।
- বেশি রক্তপাত বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত আর শিশু নষ্ট হয়ে যাবার ২/৩ দিন পর অবধি শুয়ে থাকবেন।
- অত্যন্ত রক্তপাত হলে পৃঃ ৩১৩-তে দেয়া নির্দেশগুলি মেনে চলুন।
- যদি জ্বর বা সংক্রমণের অন্যান্য লক্ষণ দেখা দেয়, সূতিকার জ্বরের মত চিকিৎসা (পৃঃ ৩২২) করুন।

যদি রক্তপাত হয় আর শিশু নষ্ট হচ্ছে বলে সন্দেহ হয়,



যতক্ষণ না সবটা বার হয়ে গিয়ে রক্তপাত বন্ধ হয়, শুয়ে থাকুন।

যে সব মায়ের আর শিশুর বিপদের ঝুঁকি বেশি থাকে

ধাই বা স্বাস্থ্যকর্মী আর যার এ বিষয়ে চিন্তা আছে তাদের জন্যে তথ্য:

কয়েকজন মায়ের প্রসব কঠিন হওয়ার আর প্রসবের পর সমস্যা হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে; তাদের শিশুদের রোগা আর অসুস্থ হবার সম্ভাবনা আরো বেশি থাকে। এই মায়েদের সাধারণতঃ স্বামী বা ঘরবাড়ি থাকে না; অথবা এরা অপুষ্ট, খুব অল্পবয়সের বা অল্পবুদ্ধি হয়; অথবা এদের এর আগের ছেলেপিলেরা অপুষ্ট বা অসুস্থ।





পরিচ্ছেদ

২০ পরিবার পরিকল্পনা যতগুলি চান শুধু ততগুলি শিশুর জন্ম দেয়া

এই পরিবারে অনেক ছেলেপিলে আছে

এই পরিবারে কম ছেলেপিলে আছে





কয়েকজন বাবা মা অনেক সন্তান চান। যেখানে অনেক ছেলেপিলে অল্পবয়সে মারা যায়, বাবা মার মনে হয় যে তাদের অনেকগুলি সন্তান দরকার, যাতে কাজের সাহায্য হয় আর বুড়ো বয়সে তাদের দেখাশোনা করার জন্যে অন্তঃত কয়েকজন বেঁচে থাকে।

আবার, অনেক মা আর বাবা বুঝতে পেরেছে যে বড় পরিবার অনেক কঠিন সমস্যা আনতে পারে। যেমন:

- বেশি ছেলেপিলে থাকলে তাদের সকলকে ভালোভাবে খাওয়ানো, পরানো আর লেখাপড়া শেখানো বেশি কঠিন হয়।
- কম সময়ের মধ্যে পরপর ছেলেপিলে হয়ে চললে মা প্রায়ই দুর্বল হয়ে পড়ে। তার বুকের দুধ কমে যায়; তার সন্তানদের মারা যাবার সম্ভাবনা বেড়ে যায় (পৃঃ ৩১৭)। এছাড়া, অনেকবার প্রসবের পর, প্রসবের সময় মা মারা গিয়ে অনেকগুলি মা-হারা ছেলেমেয়ে রেখে যাওয়ার বিপদটাও বেড়ে যায়।
- যদি বাবামায়ের অনেকগুলি ছেলেপিলে হয়, তারা বড় হলে, তাদের সকলের পরিবারের খাবার পাবার মত যথেষ্ট জমি নাও থাকতে পারে। ছেলেপিলেরা খিদেয় মারা যেতে শুরু করতে পারে। অনেক জায়গায় ইতিমধ্যেই এটা ঘটছে।

যদিও, জমি আর টাকাকড়ির ন্যায্য বিলিব্যবস্থা হলে, আজকের পৃথিবীর বেশির ভাগ খাবারের অভাব এড়ানো যেতো,—তবুও জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়াটাও সমস্যার একটা অংশ। যদি, লোকের বড় বড় পরিবার হয়েই চলে, তবে এমন দিন আসবেই, যখন, লোকে সবকিছু ভাগ করে নিতে শিখলেও, সকলের ভাগে পড়ার মত যথেষ্ট জমি বা খাবার থাকবে না।

লোকে—নিজের, বাড়ির বা সমাজের কথা ভেবে,—নিজেদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে দরকারি জিনিসগুলি বুঝে ছেলেমেয়েদের বা ভবিষ্যৎ বংশধরদের ভালোর জন্যে কাজ করলে তবেই অবস্থার উন্নতি হবে।

পরিবার পরিকল্পনা আর জন্মনিয়ন্ত্রণ



বিভিন্ন বাবা মা বিভিন্ন কারণে তাদের পরিবার ছোট রাখতে চায়। কয়েকজন অল্পবয়সী বাবা মা, যতদিন না কাজ করে টাকা জমিয়ে ছেলেপিলেদের ভালোভাবে মানুষ করতে পারে, ততদিন সন্তান না হওয়াটাই ঠিক করে। কয়েকজন বাপ মা দু একটি ছেলেপিলেই যথেষ্ট ভেবে, আর কখনোই বেশি চায় না। অনেকে আবার ছেলেপিলেদের জন্মের মধ্যে অনেকটা করে সময় রাখতে চায়, যাতে ছেলেপিলেরা আর তাদের মা বেশি সুস্থ থাকে।

যতগুলি আর যখন চাওয়া যায়, সেইমত সন্তানের জন্ম দেয়াকে পরিবার পরিকল্পনা বলে।

একজন পুরুষ আর একজন মেয়ে যদি ঠিক কখন ছেলেপিলে চায় বা না চায় সেটা ঠিক করে ফেলে, তবে মেয়েটির পোয়াতি হওয়া ইচ্ছেমত বন্ধ রাখতে তারা কয়েকটি উপায়ের মধ্যে একটি বেছে নিতে পারে। এগুলি হল *জন্মনিয়ন্ত্রণ* বা *গর্ভনিরোধের* উপায়।

যে সব স্বামী-স্ত্রী ছেলেপিলে চায়, কিন্তু তাদের জন্ম দিতে পারে না তাদের পৃঃ ২৮৮ দেখা উচিত।

জন্মনিয়ন্ত্রণ কি ভালো—এটা কি নিরাপদ ?

১· এটা কি ভালো ?

জন্মনিয়ন্ত্রণের নানা উপায় ভালো বা নিরাপদ কি না এ নিয়ে পৃথিবীর অনেক জায়গায় প্রচুর আলোচনা হয়ে গেছে। কয়েকটা ধর্ম যৌনসম্পর্ক বাদ দেয়া ছাড়া অন্য কোনোরকম জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধী। কিন্তু, লোকে জন্মনিয়ন্ত্রণের সহজ আর নিশ্চিত উপায় ব্যবহার করতে পারলে সেটা যে পরিবার আর সমাজকে সুস্থ আর সুখী রাখতে কতটা জরুরি,—একথাটা অনেক ধর্মীয় নেতা ক্রমশঃ বুঝতে পারছেন।

তাছাড়া, অনেক জায়গায়, মেয়েরা না চাইতেই পোয়াতি হলে, পেটের শিশুকে নষ্ট করতে বা ফেলে দিতে *গর্ভপাত* করায়। যেখানে এইরকম **ইচ্ছে করে গর্ভপাত** করানো আইনসঙ্গত, সেখানে এটা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে করা যায়, এবং তিন মাসের মধ্যে করা হলে সাধারণতঃ মেয়েটির কোনো বিপদের ভয় থাকে না। কিন্তু অনেক মেয়ে প্রায়ই লুকিয়ে, নোংরা পরিবেশে হাতুড়েদের দিয়ে গর্ভপাত করায়। এই ধরনের গর্ভপাত থেকে হাজার হাজার মেয়ে মারা যায়। মেয়েদের যদি জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করার সুযোগ আর সেগুলি বুদ্ধি করে ব্যবহার করার জন্যে পরামর্শ দেয়া হয়, তবে বেশির ভাগ গর্ভপাতের দরকারই হবে না। অনেক অকারণ কষ্ট আর মৃত্যু এড়াতে পারা যাবে।

অনেকে মনে করে যে, গরীবদের সংখ্যা কমিয়ে তাদের বশে রাখার জন্যে ধনী দেশগুলি বা লোকেরাই পরিবার পরিকল্পনার ওপর বেশি জোর দেয়। ধনী আর ক্ষমতাবান লোকদের পক্ষে এটা মানা কঠিন যে তারা যেরকম কড়াভাবে পৃথিবীর জমি আর ধনসম্পদ বাগিয়ে রাখে তার থেকেই পৃথিবীতে খাবারের অভাব হয়। তারা খালি জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়াটাই দেখে। কোনো কোনো দেশে পেশাদার লোকে গরিব মেয়েদের জোর করে বন্ধ্যা করে দেয় বা নতুন বা বিপজ্জনক পদ্ধতি দিয়ে তাদের ওপর পরীক্ষা চালায়। এইসব কারণে সমাজ সংস্কারকরা আর গরিবের হয়ে যারা কথা বলে তারা প্রায়ই জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে কথা বলে থাকে।

এটা দুঃখের কথা। জন্মনিয়ন্ত্রণ নয়, তার অপব্যবহারকেই আক্রমণ করা উচিত। সামাজিক অন্যায় আর জমি আর টাকাকড়ির অন্যান্য বিলিব্যবস্থার ওপরেই আক্রমণ চালানো উচিত। এমনকি জন্মনিয়ন্ত্রণ ঠিকমত ব্যবহার করলে, তাতে, মানুষের মূল অধিকার পাওয়ার জন্যে কাজ করতে গরিবদের সাহায্য হতে পারে। কিন্তু পরিবার পরিকল্পনা করার সিদ্ধান্ত আর দায়িত্ব মানুষের নিজের হাতেই থাকা দরকার।

পরিবার পরিকল্পনা করতে চান কিনা—বা কি ভাবে চান, তা নিজে ঠিক করুন, অন্য কাউকে আপনার হয়ে ঠিক করে নিতে দেবেন না।

২· এটা কি নিরাপদ?

বিভিন্ন ধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণ নিরাপদ কি না সে বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে। যারা ধর্মীয় বা রাজনৈতিক কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধী, তার প্রায়ই ঝুঁকিগুলির কথা বলে মেয়েদের ভয় দেখাতে চেষ্টা করে। কয়েকটা পদ্ধতিতে কিছু ঝুঁকি আছে। তবে সব মেয়ের যে জরুরি কথাটা বোঝা উচিত, তা হল—**জন্মনিয়ন্ত্রণ পোয়াতি হওয়ার থেকে নিরাপদ,** বিশেষ করে অনেকগুলি ছেলেপিলে হবার পরে।

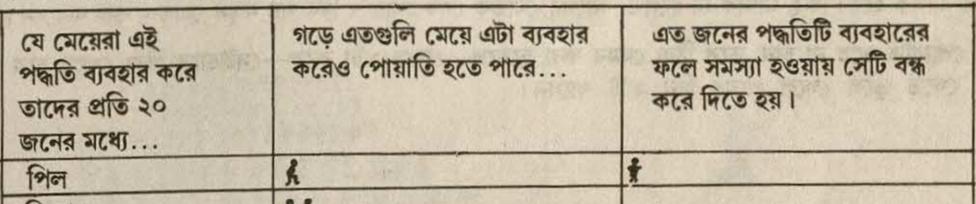
জন্মনিয়ন্ত্রণের যে কোনো সাধারণ পদ্ধতি ব্যবহার করার থেকে পোয়াতি হওয়ার ফলে কঠিন রোগ বা মৃত্যু হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি।

জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি বা পিল খাওয়ার ঝুঁকির বিষয়ে অনেক কথা বলা হয়। কিন্তু পোয়াতি হওয়ার ঝুঁকি অনেক গুণ বেশি। পিল গর্ভ এড়াতে এত ভালো কাজ করে যে সেটা—বেশির ভাগ মেয়ের জীবন রক্ষা করার ব্যাপারে—অন্য যে কোনো কম ঝুঁকির কিন্তু কম কাজের পদ্ধতির থেকে নিরাপদ।

জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি বেছে নেয়া

পরের পৃষ্ঠাগুলিতে জন্মনিয়ন্ত্রণের কয়েকটি পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। কারো কারো বেলায় কয়েকটা অন্যগুলির থেকে বেশি ভালো কাজ করে। এই পৃষ্ঠাগুলি পড়ে, কোন পদ্ধতি পাওয়া যায় আর আপনার বেলায় সবথেকে ভালো কাজ করতে পারে সে বিষয়ে আপনাদের ধাই, স্বাস্থ্যকর্মী বা ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলুন। **কাজের ক্ষমতা কতটা, কতটা নিরাপদ, ব্যবহারের** আর **পাওয়ার সুবিধে, দাম**—এইসবের তফাৎগুলোই ভেবে দেখা উচিত। স্বামীস্ত্রীর একসঙ্গে ঠিক করে একসঙ্গে দায়িত্ব নেয়া উচিত।

বিভিন্ন রকমের জন্মনিয়ন্ত্রণের কাজের গড় ক্ষমতা



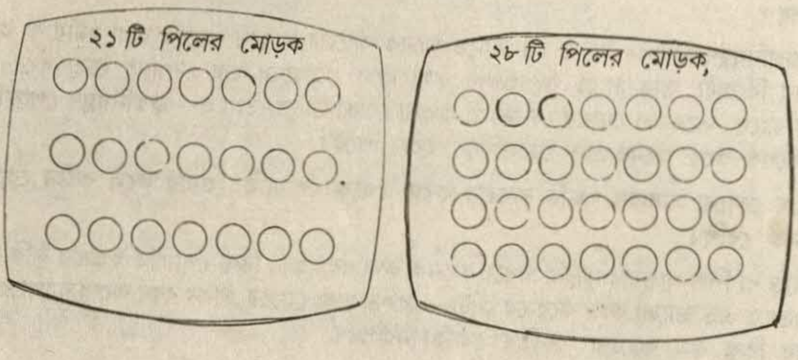
যে মেয়েরা এই পদ্ধতি ব্যবহার করে তাদের প্রতি ২০ জনের মধ্যে...	গড়ে এতগুলি মেয়ে এটা ব্যবহার করেও পোয়াতি হতে পারে...		এত জনের পদ্ধতিটি ব্যবহারের ফলে সমস্যা হওয়ায় সেটি বন্ধ করে দিতে হয়।
পিল			
নিরোধ			
ডায়াফ্রাম			
ফেনা			
লুপ			
বার করে নেয়া			
বন্ধ্যা করার অপারেশন			*
স্পঞ্জ			
দিন গোনা		মিলিতভাবে	
শ্লেষ্মা			

★ বন্ধ্যা করে দেয়ার অপরাশেনটার ফলে দু এক সময় সমস্যা হয়, কিন্তু পদ্ধতিটা পোয়াতি হওয়া বরাবরের মত বন্ধ করে দেয়।

জন্মনিয়ন্ত্রণের পিল (গর্ভ নিরোধের জন্যে খাওয়ার বড়ি)

ঠিকমত ব্যবহার করলে "পিল" গর্ভ বন্ধ রাখার সবথেকে ভালো একটি উপায়। তবে, কোনো কোনো মেয়ের—অন্য পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারলে—পিল খাওয়া উচিত নয় (পৃঃ ৩৩৪)। সম্ভব হলে, স্বাস্থ্যকর্মী, ধাই বা অন্য যারা পিলের ব্যবহার শিখেছেন, তাদেরই উচিত মেয়েদের এগুলি দেয়া।

পিল, সাধারণতঃ, ২১ বা ২৮ টির মোড়কে পাওয়া যায়। ২১ টির মোড়কগুলি প্রায়ই সস্তা হয়, এর মধ্যে আবার কয়েকটি কোম্পানির পিল অন্যগুলির থেকে আরো সস্তা। নানা কোম্পানির পিলে নানা মাত্রায় ওষুধ দেয়া থাকে। আপনার পক্ষে কোনটা ঠিক তা বেছে নেয়ার জন্যে সবুজ পৃষ্ঠায় পৃঃ ৪২৪—৪২৫ দেখুন।



কি ভাবে পিল খেতে হয়—২১ টির মোড়কে:

মাসিকের প্রথম দিনকে ১ দিন হিসেবে গুনে পাঁচ দিনের দিন প্রথম পিলটি খাবেন। তারপর প্রতিদিন একটি করে পিল খান—যতদিন না মোড়ক শেষ হয় (২১ দিন)।

মোড়ক শেষ হলে, আবার পিল খাওয়া শুরু করার আগে ৭ দিন অপেক্ষা করবেন। তারপর, আর একটা মোড়ক থেকে প্রতিদিন একটি করে পিল খেতে শুরু করবেন।

এইভাবে, প্রতিমাসে ৩ সপ্তাহ পিল খাবেন, তারপর ১ সপ্তাহ খাবেন না। স্বাভাবিকভাবে, যে সপ্তাহে পিল খাবেন না, তখন মাসিক হবে। কিন্তু মাসিক না হলেও, আগের মোড়ক শেষ হবার ৭ দিন পর নতুন মোড়ক শুরু করবেন।

যদি পোয়াতি হতে না চান, তবে ঠিক যেমন বলা হয়েছে—রোজ ১ টা করে—সেইভাবে পিল খেতে হবে। একদিন খেতে ভুলে গেলে পরের দিন ২ টি খাবেন।

২৮ টি পিলের মোড়ক:

২১ টির মোড়কের মতই মাসিকের পঞ্চম দিনে প্রথম পিলটি খাবেন। রোজ ১ টি করে খাবেন। পিলগুলির মধ্যে ৭ টির মাপ আর রং আলাদা হতে পারে। অন্যগুলো সব খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর শেষে এগুলো রোজ ১ টি করে খাবেন। ২৮ টির মোড়ক শেষ হয়ে যাওয়ার পরদিন আর একটি মোড়ক শুরু করবেন। যতদিন না পোয়াতি হতে চান, ততদিন, একদিনও বাদ না দিয়ে রোজ ১ টি করে, মোড়কের পর মোড়ক পিল খেয়ে যান।

পিল খাওয়ার সময় কোনো বিশেষ পথ্যের দরকার হয় না। জন্মনিয়ন্ত্রণের পিল খাওয়ার সময় সর্দি বা অন্য কোনো রোগ হলেও পিল খেয়েই যাবেন। মোড়ক শেষ হবার আগে পিল খাওয়া বন্ধ করলে আপনি পোয়াতি হয়ে যেতে পারেন।

কুফল :

পিল খেতে শুরু করলে প্রথম প্রথম কোনো কোনো মেয়ের একটু সকালের বমি, স্তন বেড়ে যাওয়া বা পোয়াতি অবস্থার অন্যান্য লক্ষণ দেখা দিতে পারে। এর কারণ পোয়াতি হলে একটি মেয়ের শরীর থেকে যে সব রাসায়নিক জিনিস (হরমোন) তার রক্তে আসে, পিলে সেইগুলি থাকে। এই লক্ষণগুলির মানে এই নয় যে মেয়েটি অসুস্থ বা তার পিল খাওয়া বন্ধ করা উচিত। প্রথম ২/৩ মাসের পর এগুলি সাধারণতঃ চলে যায়। সকালের বমি কমাতে পৃঃ ২৯৪ দেখুন।

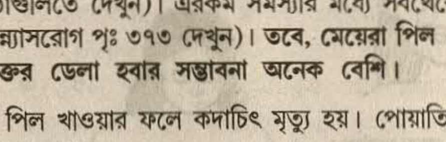
পিল খাওয়ার সময় কোনো কোনো মেয়ের মাসিক রক্তপাতের পরিমাণ সাধারণ অবস্থার থেকে অন্যরকম হতে পারে। এইসব পরিবর্তনগুলো সাধারণতঃ গুরুতর কিছু নয়। হরমোনের পরিমাণ যাতে আলাদা সেইরকম অন্য কোমপানির পিল খেলে কখনো কখনো এগুলি সামলানো যায়। সবুজ পৃষ্ঠায় (৪২৫) এটা আলোচনা করা হয়েছে।

"জন্মনিয়ন্ত্রণের ওষুধ খাওয়া কি বিপজ্জনক?"

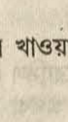
সব ওষুধের মতই জন্মনিয়ন্ত্রণের পিল থেকেও কয়েকজনের কখনো কখনো গুরুতর সমস্যা হয় (পরের পৃষ্ঠাগুলিতে দেখুন)। এরকম সমস্যার মধ্যে সবথেকে গুরুতর হল হার্টে, ফুসফুসে বা মগজে রক্তের ডেলা হওয়া (সন্ন্যাসরোগ পৃঃ ৩৭৩ দেখুন)। **তবে, মেয়েরা পিল খেলে যতটা হয়, তার থেকে পোয়াতি হলে তাদের বিপজ্জনক রক্তের ডেলা হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি।**

পিল খাওয়ার ফলে কদাচিৎ মৃত্যু হয়। পোয়াতি হওয়া আর প্রসব, পিল খাওয়ার থেকে গড়ে ৫০ গুন বেশি বিপজ্জনক।

১৫,০০০ পোয়াতি মেয়ের মধ্যে ৭৫ জন—পোয়াতি অবস্থা বা প্রসবের নানা সমস্যা থেকে—মারা যেতে পারে।



যে মেয়েরা পিল খায় তাদের ১৫,০০০ এর মধ্যে মাত্র ১ জন পিল খাওয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন সব সমস্যা থেকে মারা যেতে পারে।



অতএব:

পোয়াতি হওয়ার থেকে পিল খাওয়া অনেক নিরাপদ।

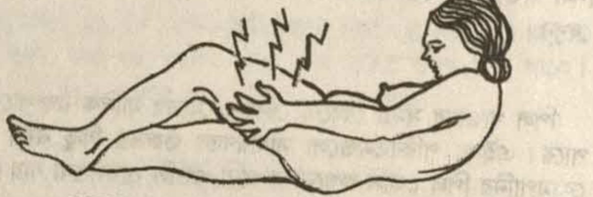
বেশির ভাগ মেয়ের পক্ষে জন্মনিয়ন্ত্রণের পিল মোটামুটি নিরাপদ। পোয়াতি হওয়ার থেকে এগুলি নিশ্চয়ই বেশি নিরাপদ। **তবে কয়েকজন মেয়ের পক্ষে পোয়াতি হওয়া আর জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি খাওয়া দুটোতেই বেশি ঝুঁকি আছে। এই মেয়েদের জন্মনিয়ন্ত্রণের অন্য পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত।**

কাদের জন্মনিয়ন্ত্রণের পিল খাওয়া উচিত নয়?

নিচের লক্ষণগুলির কোনোটি থাকলে মেয়েটির জন্মনিয়ন্ত্রণের পিল বা ইনজেকশন ব্যবহার করা উচিত নয়:

- **এক পায়ে বা পাছায় গভীর বা একটানা ব্যথা।** একটা শিরার প্রদাহ (ফ্লেবাইটিস বা রক্তের ডেলা) থেকে এই ব্যথা হতে পারে। জন্মনিয়ন্ত্রণের পিল খাবেন না। (প্রদাহ ছাড়া **ভেরিকোজ শিরা** হলে পিল খেলে সাধারণতঃ কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু শিরার প্রদাহ হলে পিল খাওয়া বন্ধ করা উচিত।)





- **সন্ন্যাস।** সন্ন্যাসের কোনো লক্ষণ (পৃঃ ৩৭৩) থাকলে মেয়েদের পিল খাওয়া উচিত নয়।



- **হেপাটাইটিস (পৃঃ ২০৯) সিরোসিস (পৃঃ ৩৭৪) বা লিভারের অন্য অসুখ।** যে মেয়েদের এইসব আছে, অথবা পোয়াতি অবস্থায় যাদের চোখ হলদে হয়েছিল তাদের পিল খাওয়া উচিত নয়। হেপাটাইটিস হওয়ার পর এক বছর পিল না খাওয়াটাই ভাল।



- **ক্যানসার।** আপনার স্তনের বা জরায়ুর ক্যানসার হয়ে থাকলে—বা হয়েছে বলে সন্দেহ হলে—পিল খাবেন না। জন্মনিয়ন্ত্রণের ওষুধ খাওয়ার আগে নিজের স্তন দুটি মন দিয়ে পরীক্ষা করুন (পৃঃ ৩২৫)। কয়েকটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সারভিকস বা জরায়ুর মুখের ক্যানসার আছে কি না দেখার জন্যে একটা সহজ পরীক্ষা (প্যাপস স্মিয়ার) করানো যায়। জন্মনিয়ন্ত্রণের পিল থেকে ক্যানসার হয় না। কিন্তু, আগে থেকে স্তনের বা জরায়ুর ক্যানসার হয়ে থাকলে পিল খেলে সেটা বেড়ে যেতে পারে।



- যে মা শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে তার জন্মনিয়ন্ত্রণের পিল খাওয়া উচিত নয়।

স্বাস্থ্যের কোনো কোনো সমস্যা জন্মনিয়ন্ত্রণের ওষুধ খেলে বেড়ে যেতে পারে। নিচের সমস্যাগুলির মধ্যে কোনোটি থাকলে,—পারলে, অন্য একটা পদ্ধতি ব্যবহার করাই ভালো।

- **মাইগ্রেন** (পৃঃ ১৯৯) সত্যিকারের মাইগ্রেন থাকলে মেয়েদের পিল খাওয়া উচিত নয়। কিন্তু যে সাধারণ মাথাধরা এসপিরিন খেলে চলে যায়, তার জন্যে পিল বন্ধ করার কোনো কারণ নেই।
- **পেচ্ছাপের সংক্রমণ, সঙ্গে পা ফোলা** (পৃঃ ২৭৮)।
- **হার্টের রোগ** (পৃঃ ৩৭১)।
- **মাসিকের সময় বেশি রক্তপাত।**

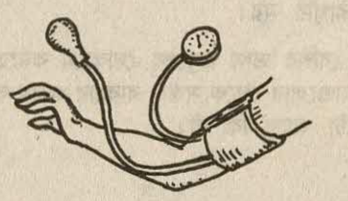
হাঁপানি, যক্ষ্মা, বহুমূত্র বা মৃগী থাকলে পিল খাওয়ার আগে ডাক্তারদের পরামর্শ নিলে সবথেকে ভালো হয়। তবে, যে মেয়েদের এসব রোগ আছে, তাদের বেশির ভাগেরই পিল খেলে কোনো ক্ষতি হয় না।

পিল খাওয়ার সময় মেয়েদের যে সব সাবধানতা নেয়া উচিত

১· প্রতি মাসে স্তনদুটি মন দিয়ে পরীক্ষা করে দেখবেন দলা বা ক্যানসারের অন্য লক্ষণ আছে কি না।



২· ৬ মাস অন্তর অন্তর রক্তের চাপ মাপিয়ে নেবেন।

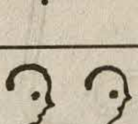


৩· পৃঃ ৩৩৪-এ দেয়া সমস্যাগুলির মধ্যে কোনোটি আছে কি না সে দিকে নজর রাখবেন, বিশেষ করে:

- কঠিন আর ঘনঘন মাইগ্রেনের মাথাধরা (পৃঃ ১৯৯)।
- মাথাঘোরা, মাথাধরা বা জ্ঞান হারানো—যার ফলে, দেখার, কথা বলার অথবা মুখের বা শরীরের কোনো অংশ নড়ানোর অসুবিধে হয় (সন্ন্যাস পৃঃ ৩৭৩)।
- একটা পায়ে বা পাছায় ব্যথা আর প্রদাহ (রক্তের ডেলা হবার সম্ভাবনা)।
- বুকে কঠিন বা বারবার ব্যথা (হার্টের সমস্যা পৃঃ ৩৭১)।

এই সমস্যাগুলির মধ্যে কোনোটি দেখা দিলে পিল খাওয়া বন্ধ করে ডাক্তারি পরামর্শ নেবেন। পোয়াতি হওয়া বন্ধ রাখতে অন্য কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করুন, কারণ এইসব সমস্যা হলে পোয়াতি হওয়াও বিশেষ বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়।

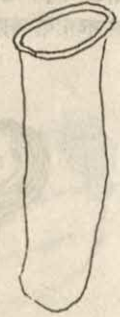
জন্মনিয়ন্ত্রণের পিলের সম্বন্ধে প্রশ্ন এবং উত্তর

	কেউ কেউ দাবি করে যে জন্মনিয়ন্ত্রণের পিল থেকে ক্যানসার হয়। এ কথা কি সত্যি?	না! তবে আগে থেকেই স্তনের বা জরায়ুর ক্যানসার হয়ে থাকলে, পিল খেলে টিউমারটা আরো তাড়াতাড়ি বেড়ে যেতে পারে।
?	পিল খাওয়া বন্ধ করলে মেয়েটির আবার ছেলেপিলে হতে পারে কি?	হ্যাঁ। (কখনো কখনো পোয়াতি হতে দু এক মাস দেরি হয়।)
	জন্মনিয়ন্ত্রণের ওষুধ খেলে যমজ বা বিকৃত ছেলেপিলে হবার সম্ভাবনা কি বাড়ে?	না। এই সম্ভাবনা—যারা পিল খায়নি তাদের বেলায় যা তাইই থাকে।
? 	জন্মনিয়ন্ত্রণের পিল খেলে মায়ের বুকের দুধ শুকিয়ে যায়, একথা কি সত্যি?	বেশির ভাগ মেয়ের বেলায় কোনো তফাৎ হয় না। কিন্তু পিল খেতে শুরু করলে কোনো কোনো মায়ের দুধ কমে বা বন্ধ হয়ে যায়।
	এই কারণে, যারা বুকের দুধ দিচ্ছে, তাদের পক্ষে প্রথম ৬ মাসের জন্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের অন্য পদ্ধতি ব্যবহার করে, তারপর আবার পিল শুরু করাই ভালো।	

জন্মনিয়ন্ত্রণের পিল সম্বন্ধে জানতে সবুজ পৃষ্ঠায় পৃঃ ৪২৫ দেখুন।

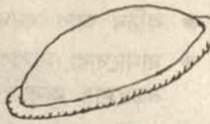
জন্মনিয়ন্ত্রণের অন্যান্য পদ্ধতি

কনডোম (নিরোধ বা রবার বা খাপ)—এটা রবারের একটি সরু থলি; সহবাসের সময় পুরুষেরা এটি তাদের লিঙ্গের ওপর পরে। সাধারণতঃ গর্ভ বন্ধ রাখতে এটি ভালোই কাজ করে। এটি যৌন রোগ এড়াতেও সাহায্য করে, তবে পুরোপুরি নয়।



বেশির ভাগ ওষুধের দোকানে কনডোম কিনতে পাওয়া যায়—কয়েকটা অন্যগুলোর থেকে সস্তা। ব্যবহার করার আগে জল ভরে দেখে নেবেন কোনো ফুটো আছে কি না।

ডায়াফ্রাম—এটি নরম রবারের তৈরি একটা চ্যাপ্টা বাটির মত জিনিস। সহবাসের সময় মেয়েরা এটি যোনির ভেতরে পরে নেয়। পরের অন্ততঃ ৬ ঘণ্টা এটি ভেতরে রেখে দেয়া উচিত। এটি একটি মোটামুটি নিরাপদ পদ্ধতি—বিশেষ করে জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্রীম বা জেলির সঙ্গে ব্যবহার করলে। বিভিন্ন মেয়ের বিভিন্ন মাপের লাগে বলে, এটা পরানোর সময় ধাই বা স্বাস্থ্যকর্মীর সাহায্য করা উচিত। ডায়াফ্রামে ফুটো আছে কি না নিয়মিত দেখে নেয়া, আর বছরে একটা করে নতুন ডায়াফ্রাম নেয়া উচিত। দাম বেশি নয়।



জন্মনিয়ন্ত্রণের ফোম (ফেনা)—টিউব বা টিনে পাওয়া যায়। একটা বিশেষ যন্ত্র দিয়ে মেয়েটি এটা নিজের যোনিতে লাগিয়ে নেয়। সহবাসের আগের ১ ঘণ্টার মধ্যে এটা লাগিয়ে, পরে অন্ততঃ ৬ ঘণ্টা রেখে দেয়া উচিত। প্রতিবার সহবাসের আগে লাগাতে হয়—একরাতে অনেকবার হলেও। ঠিকমত ব্যবহার করলে এটি মোটামুটি নিশ্চিত পদ্ধতি—তবে খুব ঝামেলার ব্যাপার।



জরায়ুর ভেতরে ঢোকানোর জিনিস (আই'ইউ ডি)—এটি একটি প্লাস্টিকের (বা ধাতুর) তৈরি জিনিস—বিশেষভাবে শিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী বা ধাই এটি জরায়ুর মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। জরায়ুতে থেকে এটি গর্ভ বন্ধ করে রাখে। কোনো কোনো মেয়ের জরায়ু থেকে আই ইউ ডি খসে পড়ে। প্রতিবার মাসিকের পর আই ইউ ডি-টা ঠিক জায়গায় আছে কি না দেখে নেবেন। কয়েকজন মেয়ের বেলায় আবার, আই ইউ ডি থেকে ব্যথা, অস্বস্তি, কখনো কখনো কঠিন সমস্যাও হয়। কিন্তু কয়েকজনের কোনো অসুবিধেই হয় না—তাদের পক্ষে আই ইউ ডি হল সবথেকে সহজ আর সস্তা পদ্ধতি।

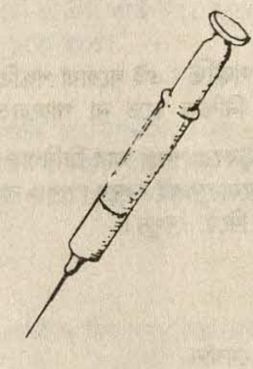


বার করে নেয়া (সহবাস শেষ না করা)—এই পদ্ধতিতে শুক্র বার হবার আগেই, পুরুষ তার লিঙ্গ মেয়েটির শরীর থেকে বার করে নেয়। কিছুই না করার থেকে এটা হয়তো ভালো; কিন্তু এতে পুরুষ মেয়ে দুজনেরই অসুবিধে হয়; সবসময় কাজও হয় না, কারণ কিছু শুক্র আগেই বেরিয়ে গিয়ে গর্ভ তৈরি করতে পারে।

মাসিক চালু করে নেয়া: কোনো মেয়ের যদি মনে হয় যে সে পোয়াতি হয়েছে, তবে **মাসিক যেদিন হওয়ার কথা ছিল তার ১০ দিনের মধ্যে** কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে সে আবার মাসিক চালু করিয়ে নিতে পারে। এটা জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করবেন না। গর্ভ বন্ধ রাখতে অন্য পদ্ধতি ব্যবহার করুন।

যারা আর কখনোই ছেলেমেয়ে চায় না তাদের জন্যে কয়েকটি পদ্ধতি

ইনজেকশন—কয়েকটি বিশেষ ইনজেকশনে গর্ভ বন্ধ হয়। একটা হল *ডেপো প্রোভেরা*। সাধারণতঃ প্রতি ৩ মাসে একটি ইনজেকশন দেয়া হয়। এই ইনজেকশনগুলি নিলে কখনো কখনো মেয়েটি আর কোনোদিনই পোয়াতি হতে পারে না। তাই, যে সব মেয়ে আর ছেলেপিলে চায় না, শুধু তাদেরই এই পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত। কুফল আর সাবধানতা জন্মনিয়ন্ত্রণের পিলের মতই।



যে সব মেয়ে ঠিক করেছে যে তারা আর ছেলেপিলে চায় না, বিশেষ করে যাদের পিল খেতে মনে থাকে না বা অন্য কোনো কারণে খাওয়ার অসুবিধে হয়—তাদের পক্ষে ইনজেকশন ভালো।

বন্ধ্যা করে দেয়া—যারা আর কখনই ছেলেপিলে চায় না তাদের—পুরুষ মেয়ে দুজনেরই—জন্যে বেশ নিরাপদ আর সহজ অপারেশন আছে। আমাদের দেশে এইসব অপারেশন বিনি পয়সায় করানো যায়। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে খোঁজ নিন।

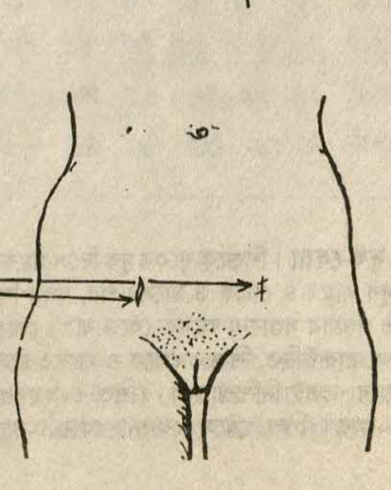
- ছেলেদের অপারেশনকে ভ্যাসেকটমি বলে। ডাক্তারের চেম্বারে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এটি করানো যায়। এইখানে ছোট করে কেটে অণ্ডকোষ থেকে আসা নল দুটি কেটে বেঁধে দেয়া হয়।

  এই অপারেশনের ফলে পুরুষের যৌন ক্ষমতার বা আনন্দের কোনো তফাৎ হয় না। তার শরীরের রসটাও একইভাবে আসে, তবে তাতে কোনো শুক্র থাকে না।



- মেয়েদের অপারেশনটাকে টিউবাল লাইগেশন বলে—অর্থাৎ টিউব বা নল দুটি বেঁধে দেয়া। এটা খুব সহজে আর তাড়াতাড়ি করা যায়—সাধারণতঃ মেয়েটিকে অজ্ঞান করতে হয় না। একটা পদ্ধতিতে তলপেটে খুব ছোট করে কেটে ওভারি বা ডিম্বাশয় থেকে আসা নল দুটি কেটে বেঁধে দেয়া হয়।

  এই অপারেশনের ফলে মেয়েটির মাসিকের বা যৌন ক্ষমতার কোনো তফাৎ হয় না। এতে যৌন সহবাস আরো আনন্দের হতে পারে—কারণ মেয়েটির পোয়াতি হয়ে যাবার চিন্তা থাকে না।



পোয়াতি হওয়া বন্ধ করার ঘরোয়া পদ্ধতি

প্রত্যেক দেশেই পোয়াতি হওয়া বন্ধ করা বা কমিয়ে দেয়ার জন্যে ঘরোয়া ওষুধ আছে। দুঃখের বিষয়, বেশির ভাগই হয় কাজ করে না, না হয় বিপজ্জনক, যেমন, কোনো কোনো মেয়ের ধারণা আছে যে সহবাসের পর যোনি ধুয়ে ফেললে বা পেচ্ছাপ করলে পোয়াতি হওয়া এড়ানো যায়। কিন্তু **এটা সত্যি নয়।**

স্পঞ্জ পদ্ধতি। এই ঘরোয়া পদ্ধতিটি ক্ষতিকর নয়, কখনো কখনো কাজেও লাগে। প্রত্যেকবারেই গর্ভ ঠেকাবে—এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে না পারলেও, অন্য কিছু না থাকলে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

একটুকরো **স্পঞ্জ** আর **ভিনিগার** বা **নুন** দরকার। সমুদ্রের বা নকল যে কোনো স্পঞ্জই চলবে। স্পঞ্জ না থাকলে তুলো বা নরম কাপড়ের গোলা দিয়ে দেখুন।



- মেশান:

  ১ কাপ জলে ২ বড় চামচ ভিনিগার

  বা

  ১ কাপ জলে ১ চা চামচ পাতিলেবুর রস

  বা

  ৪ চামচ জলে ১ চামচ নুন
- এর একটা দিয়ে স্পঞ্জটা ভিজিয়ে নিন।
- সহবাসের আগে আপনার যোনির অনেক ভেতরে স্পঞ্জটা ঢুকিয়ে দিন। আগের ১ ঘণ্টার মধ্যে ঢোকানো যেতে পারে।
- সহবাসের পর অন্ততঃ ৩ ঘণ্টা স্পঞ্জটা রেখে তারপর বার করে নেবেন। বার করতে অসুবিধে হলে, পরের বার, ধরে টানবার জন্যে তাতে একটা ফিতে বা সুতো বেঁধে দেবেন।

স্পঞ্জটা ধুয়ে আরো অনেকবার ব্যবহার করা যাবে।

মেশানো জলটা আগে থেকে তৈরি করে বোতলে ভরে রাখতে পারেন।

বুকের দুধ দেয়া। শিশুকে বুকের দুধ দিলে মায়ের পোয়াতি হবার সম্ভাবনা কম থাকে—বিশেষ করে যখন শিশু শুধু বুকের দুধ খায়। ৪ থেকে ৬ মাসের পর, যখন শিশু বুকের দুধ ছাড়াও অন্য খাবার খেতে শুরু করে, তখন মায়ের পোয়াতি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। পোয়াতি হবে না এ বিষয়ে আরো নিশ্চিন্ত হতে হলে, যে মা বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে তার উচিত, শিশু ৩ থেকে ৪ মাসের হলেই জন্মনিয়ন্ত্রণের কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করা। যত তাড়াতাড়ি এটা শুরু করবে, ততই নিশ্চিন্ত হবে। (শিশু ৬ মাসের হওয়ার আগে জন্মনিয়ন্ত্রণের পিলের বদলে অন্য পদ্ধতি নেয়াই ভালো—কারণ পিল খেলে কোনো কোনো মায়ের দুধ কমে যায়।)

যে সব পদ্ধতি খুব ভালো কাজ করে না

রীদম পদ্ধতি

এটি পোয়াতি হওয়া বন্ধ করার খুব নিশ্চিত উপায় নয়। তবে এর সুবিধে হল যে এতে কোনো খরচ হয় না। যে মেয়ের খুব নিয়মিত—মোটামুটি প্রত্যেক ২৮ দিনে একবার—মাসিক হয়, তার বেলায় এটা কাজ দিতে পারে। তাছাড়া স্বামীস্ত্রীকে প্রতিমাসে এক সপ্তাহ সাধারণভাবে সহবাস বন্ধ রাখতে রাজি হতে হবে।

সাধারণতঃ একজন মেয়ের মাসে ৮ দিন পোয়াতি হবার সম্ভাবনা থাকে—এগুলি তার উর্বর দিন। এই ৮ দিন দুটি মাসিকের মাঝামাঝি পড়ে—মাসিকের প্রথম দিনের পর ১০ দিনের দিন শুরু হয়। পোয়াতি হওয়া বন্ধ রাখতে হলে, এই ৮ দিন মেয়েটির পুরুষের সঙ্গে সহবাস করা উচিত নয়। মাসের বাকি সময়টা মেয়েটির পোয়াতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

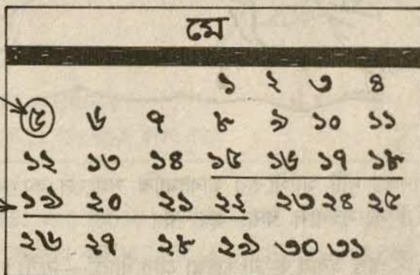
গোলমাল এড়াতে মেয়েটির একটা ক্যালেণ্ডারে—যখন সহবাস চলবে না—সেই ৮ দিন দাগ দিয়ে রাখা উচিত।

উদাহরণ: ধরুন আপনার মাসিক মে মাসের ৫ তারিখে শুরু হয়েছে।

এই ভাবে দাগ দিন:

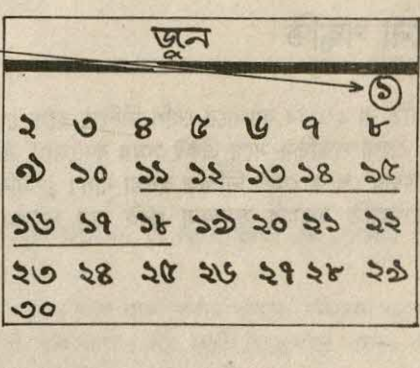
তারপর ১০ দিন গুনুন। ১০ দিনের দিন থেকে শুরু করে পরের ৮ দিনের নিচে এইভাবে একটা লাইন টানুন:

এই ৮টি 'উর্বর দিন' সহবাস করবেন না।



এখন ধরুন আপনার পরের মাসিক জুন মাসের পয়লা শুরু হল। একই ভাবে দাগ দিন।

আবার ১০ দিন বাদ দিয়ে পরের ৮ দিনের নিচে দাগ দিন। সেই দিনগুলিতে সহবাস করবেন না।



যদি মেয়েটি আর তার স্বামী প্রতি মাসে এই ৮ দিন সাবধানে যৌন সহবাস বাদ দিয়ে চলে, তাহলে হয়তো বছরের পর বছর তাদের আর ছেলেপিলে না হতে পারে। তবে, খুব কম স্বামীস্ত্রীই এটা বেশি দিন চালাতে পারে। এটা খুব নিশ্চিত পদ্ধতি নয়, যদি না ডায়াফ্রাম বা কনডোমের মত অন্য কোনো পদ্ধতির সঙ্গে মিলিয়ে ব্যবহার করা হয়।

শ্লেষ্মা পদ্ধতি

এটি আর এক ধরনের রীদম পদ্ধতি—কয়েকটি ধর্মীয় দল এটিতে উৎসাহ দেন। এটা কয়েকজনের বেলায় ভালোই কাজ করে—আবার কয়েকজনের বেলায় করে না। সাধারণভাবে এটাকে গর্ভ বন্ধ রাখার খুব নিশ্চিত উপায় হিসেবে ধরা যায় না। তবে, এতে কোনো খরচ নেই, আর, পোয়াতি হওয়ার যা কিছু—তাছাড়া অন্য কোনো ঝুঁকি নেই।

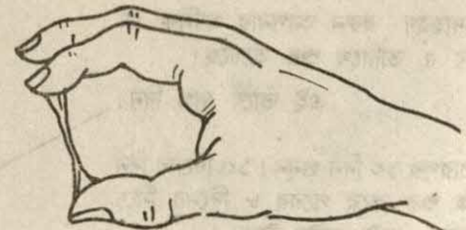
মাসিকের সময় ছাড়া অন্য প্রতিদিন মেয়েটিকে নিজের যোনির শ্লেষ্মা পরীক্ষা করতে হয়।

পরিষ্কার আঙুল দিয়ে নিজের যোনির একটু শ্লেষ্মা নিয়ে সেটা দুটি আঙুলের মাঝে এইভাবে টানতে চেষ্টা করুন:

যতদিন শ্লেষ্মাটা পেছলানো বা হড়হড়ে না হয়ে—আঠার মত চটচটে থাকবে—আপনি সম্ভবতঃ পোয়াতি হতে পারবেন না, সহবাসও করতে পারবেন।



শ্লেষ্মাটা যখন কাঁচা ডিমের মত পেছল বা হড়হড়ে হয়ে যাবে—অথবা আপনার দু আঙুলের মধ্যে টান হয়ে থাকবে—তখন সহবাস করলে আপনি পোয়াতি হয়ে যেতে পারেন। কাজেই, **শ্লেষ্মা হড়হড়ে বা টানটান হলে সহবাস করবেন না।**



সাধারণতঃ দুটি মাসিকের মাঝামাঝি সময়ের কয়েকটা দিন শ্লেষ্মাটা পেছল হয়ে যায়। রীদম পদ্ধতিতেও এই কয়েকটা দিন সহবাস করা হয় না।

বেশি নিশ্চিন্ত হবার জন্যে শ্লেষ্মা আর রীদম—দুটো পদ্ধতি একসঙ্গে ব্যবহার করুন। আরো বেশি নিশ্চিন্ত হতে হলে নিচে দেখুন।

মেশানো পদ্ধতি

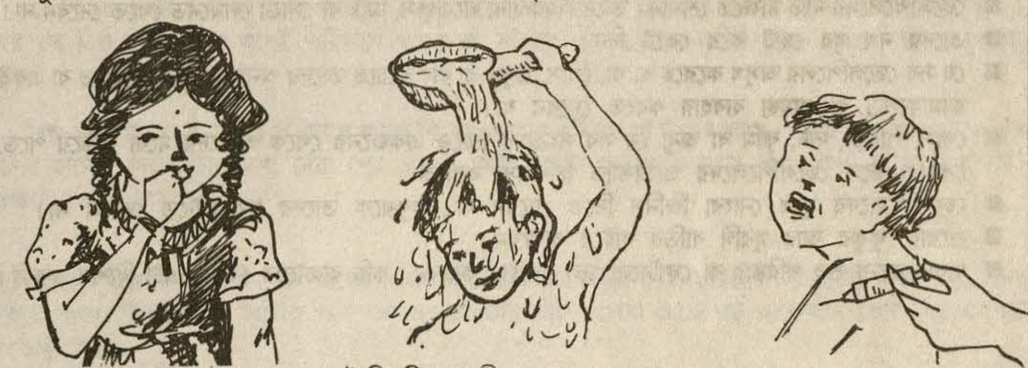
পোয়াতি না হওয়ার ব্যাপারে বেশি নিশ্চিন্ত হতে গেলে, দুটি পদ্ধতি একসঙ্গে ব্যবহার করলে প্রায়ই সুবিধে হয়। রীদম বা শ্লেষ্মা পদ্ধতির সঙ্গে একই সময় কনডোম, ডায়াফ্রাম, ফোম বা স্পঞ্জ ব্যবহার করলে—যে কোনো একটা পদ্ধতি নেয়ার থেকে বেশি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তেমনি, একই সঙ্গে পুরুষ কনডোম আর মেয়েটি ডায়াফ্রাম ব্যবহার করলে পোয়াতি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে।

> লোক বেশি হলে বল বাড়ে নাকো—
> খাওয়াদাওয়া ঠিক চাই
> পরিবারটাকে ছোট করে রাখো,
> সুখে থাকো সব্বাই ॥

পরিচ্ছেদ

২১ ছোটদের স্বাস্থ্য আর রোগ

ছেলেপিলের স্বাস্থ্য কি ভাবে রক্ষা করতে হয়



এই তিনটি হল শরীরের প্রধান পাহারাদার
এরা ছেলেপিলেকে সুস্থ রাখে আর অনেক রোগ থেকে রক্ষা করে

পরিচ্ছেদ ১১ আর ১২-তে পুষ্টিকর খাবার, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আর টিকের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আরো বলা হয়েছে। বাবামাদের উচিত এই পরিচ্ছেদগুলি মন দিয়ে পড়া এবং ওগুলির সাহায্য নিয়ে ছেলেপিলেদের যত্ন করা আর শিক্ষা দেয়া। প্রধান বিষয়গুলি এখানে আবার ছোট করে বলা হচ্ছে:

পুষ্টিকর খাবার :

ছেলেপিলেরা যাতে ভালোভাবে বাড়ে আর অসুস্থ না হয়ে পড়ে, তার জন্যে তাদের সব থেকে পুষ্টিকর খাবার যা পাওয়া যায়, তাই খাওয়াটা জরুরি।

নানা বয়সের ছেলেপিলের পক্ষে সব থেকে ভালো খাবার:

- প্রথম দু মাসে বুকের দুধ, আর অন্য কিছু নয়।
- ৪ মাস থেকে ১ বছর: বুকের দুধ; তাছাড়া অন্য পুষ্টিকর খাবার যেমন, চটকানো ভাত, রুটি, বরবটি সেদ্ধ, সবজি, ডিম, আর ফল সেদ্ধ।
- এক বছরের পর থেকে: প্রতিবারের খাবারের মধ্যে শরীর গড়ার আর রক্ষা করার খাবার—বিশেষ করে দুধ আর দুধ থেকে তৈরি খাবার, বরবটি, ডাল, বাদাম, ফল, সবুজ শাকসবজি, ডিম, মুরগি, মাছ আর মাংস—থাকা দরকার। এগুলোর সঙ্গে পরিমাণ মত প্রচুর শক্তি যোগাবার খাবার যেমন, ভাত, ভুট্টা, গম, আলু বা খামআলু থাকা উচিত।
- সব থেকে বড় কথা হল—ছেলেপিলে যেন **যথেষ্ট পরিমাণে** খেতে পায়।
- সব বাপমায়ের উচিত তাদের ছেলেপিলের অপুষ্টির কোনো লক্ষণ আছে কি না সেদিকে নজর রাখা, আর সব থেকে ভালো খাবার যা পাওয়া যায় সেগুলি তাদের দেয়া।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা :

ছেলেপিলের গ্রাম, ঘরবাড়ি আর তাদের নিজেদের শরীর পরিষ্কার রাখলে তাদের সুস্থ থাকার সম্ভাবনা বাড়ে। পরিচ্ছেদ ১২-তে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার যে সব বিধি বুঝিয়ে বলা হয়েছে সেগুলি মেনে চলুন। ছেলেপিলেদের সেগুলি মেনে চলতে আর সেগুলি কেন মানা দরকার তা বুঝতে শেখান। প্রধান বিধিগুলি আবার বলা হচ্ছে:

- ছেলেপিলেকে ঘনঘন স্নান করিয়ে জামাকাপড় বদলে দেবেন।
- ছেলেপিলেকে সকালে ঘুম থেকে উঠে, মলত্যাগ করার পরে আর খাওয়ার বা খাবার নাড়াচাড়া করার আগে সবসময় হাত ধুতে শেখান।
- পায়খানা বা 'বাইরের ঘর' তৈরি করে ছেলেপিলেদের সেগুলি ব্যবহার করতে শেখান।
- ছেলেপিলেদের খালি পায়ে ঘুরতে দেবেন না—তাদের চটি বা জুতো পরিয়ে রাখুন।
- ছেলেপিলেদের দাঁত মাজতে শেখান। তাদের একগাদা লজেঞ্চুস, মিষ্টি বা সোডা লেমনেড খেতে দেবেন না।
- তাদের নখ খুব ছোট করে কেটে দিন।
- যে সব ছেলেপিলের অসুখ করেছে বা ঘা, খোস, উকুন বা দাদ হয়েছে তাদের অন্যদের সঙ্গে ঘুমোতে বা একই জামাকাপড় বা গামছা ব্যবহার করতে দেবেন না।
- খোস, পাঁচড়া, দাদ, কৃমি বা অন্য যে সব সংক্রমণ সহজে একজনের থেকে অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, সেগুলি হলে ছেলেপিলেদের তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করাবেন।
- ছেলেপিলেদের মুখে নোংরা জিনিস দিতে দেবেন না; কুকুরকে তাদের মুখ চাটতে দেবেন না।
- শুয়োর, কুকুর আর মুরগি বাড়ির বাইরে রাখবেন।
- খাবার জন্যে শুধু পরিষ্কার বা ফোটানো জল ব্যবহার করবেন। কচি বাচ্চাদের বেলায় এটা বিশেষ জরুরি।

টিকে :



নানা ধরনের টিকে ছেলেপিলেকে ছেলেবেলার অনেকগুলো খুব বিপজ্জনক রোগ—ঘুংরি কাশি, ডিপথিরিয়া, ধনুষ্টঙ্কার, আসল বসন্ত, পোলিও, হাম আর যক্ষ্মা—থেকে রক্ষা করে।

পৃঃ ১৭৫-এ যেমন বলা হয়েছে সেইভাবে, ছেলেপিলের জীবনের প্রথম কয়েক মাসের মধ্যে বিভিন্ন টিকেগুলি দেয়া উচিত। পোলিওর খাওয়ার ওষুধের প্রথম মাত্রা ২ মাস বয়সের মধ্যেই দেয়া উচিত। কারণ ১ বছরের কম বয়সের শিশুদের মধ্যে ছেলেবেলার পক্ষাঘাত (পোলিও) সব থেকে বেশি দেখা যায়।

জরুরি : পুরোপুরি রক্ষা করার জন্যে, ডি পি টি (ডিপথিরিয়া, ঘুংরি কাশি, ধনুষ্টঙ্কার) আর পোলিওর টিকে ৩ মাস ধরে মাসে একবার করে আর তারপর এক বছর পর আবার একবার দেয়া উচিত।

পোয়াতি মায়েদের ধনুষ্টঙ্কারের টিকে দিয়ে সদ্যজন্মানো শিশুদের ধনুষ্টঙ্কার এড়ানো যায় (পৃঃ ২৯৬)।

**ছেলেপিলে যেন সব টিকেগুলি পায়,
সে দিকে তোমার নজরটা রাখা চাই।**

শিশুর বেড়ে ওঠা আর পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশুর কার্ড



সুস্থ শিশু সমানে বেড়ে চলে। শিশু যদি যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার খায় আর তার কোনো কঠিন রোগ না হয়, তবে প্রতি মাসেই তার ওজন বাড়বে।

যে শিশুটি ভালোভাবে ঠিক বেড়ে ওঠে,
সুস্থ সে, সন্দেহ নেই তাতে মোটে।

যে শিশুর ওজন, অন্য শিশুদের ওজনের থেকে ধীরে বাড়ে বা বাড়া বন্ধ হয়ে যায় অথবা কমে যায়, সে সুস্থ নয়। হয় সে ঠিক ঠিক খাবার যথেষ্ট পরিমাণে খাচ্ছে না, না হয় তার কোনো কঠিন রোগ হয়েছে, কিংবা দুটোই।

শিশু সুস্থ আছে আর যথেষ্ট পরিমাণে খাচ্ছে কি না জানবার দুটি ভালো উপায় আছে। একটা হল প্রতি মাসে তার ওপর হাতের মাঝখানটার মাপ নেয়া (পৃঃ ১৩২); আর অন্যটা হল প্রতি মাসে তার ওজন নিয়ে দেখা সেটা স্বাভাবিকভাবে বাড়ছে কি না।

পরের পৃষ্ঠায় পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশুর কার্ডের একটা নমুনা দেয়া হয়েছে। এটা কেটে নকল করে নেয়া যেতে পারে। কিংবা হিন্দি, ইংরিজি আর অন্য সব ভারতীয় ভাষায় লেখা আরো বড়, একেবারে তৈরি কার্ড এইখানে পাওয়া যায়:

ওয়েষ্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ এসোসিয়েশন
৮, রডন স্ট্রীট
কলিকাতা-১৬

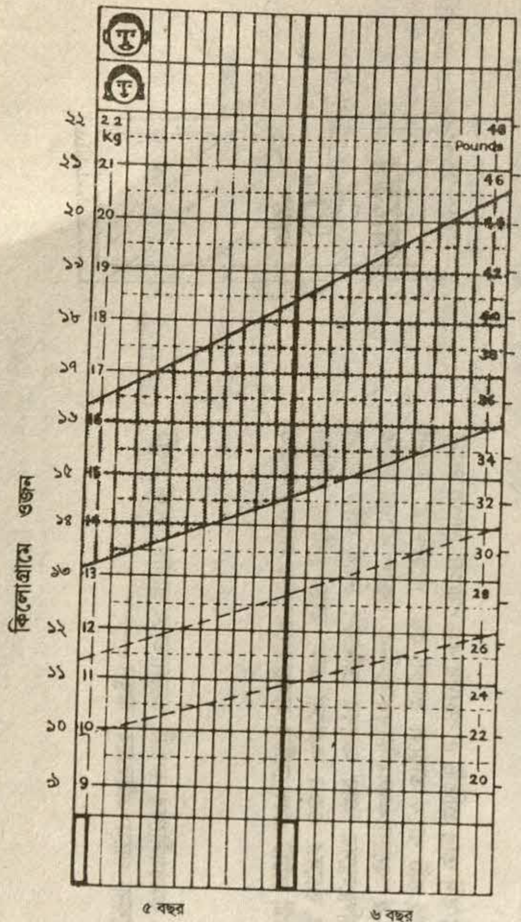
অনেক দেশের স্বাস্থ্যদপ্তর থেকে স্থানীয় ভাষায় এই ধরনের চার্ট বার করা হয়।

প্রত্যেক মা যদি তার প্রতিটি ৫ বছরের কম বয়সের শিশুর জন্যে একটা করে এই চার্ট রাখে তাহলে ভালো হয়। কাছাকাছি কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা ৫ বছরের কমবয়সীদের ক্লিনিক থাকলে মায়ের উচিত নিজের ছেলেপিলেদের আর তাদের চার্টগুলি নিয়ে প্রতি মাসে সেখানে গিয়ে তাদের ওজন করানো এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে নেয়া। স্বাস্থ্যকর্মী চার্টটি এবং সেটির ব্যবহার বোঝাতে সাহায্য করতে পারে।

৫ বছরের কমবয়সীদের কার্ডটি ভালোভাবে রাখার জন্যে সেটি একটি প্লাস্টিকের খামে এইভাবে রাখুন →



এক পিঠ



মা এই কার্ডটি একটি শক্ত প্লাস্টিকের খামে রাখবে।

CHILD HEALTH RECORD O - 6 YEARS

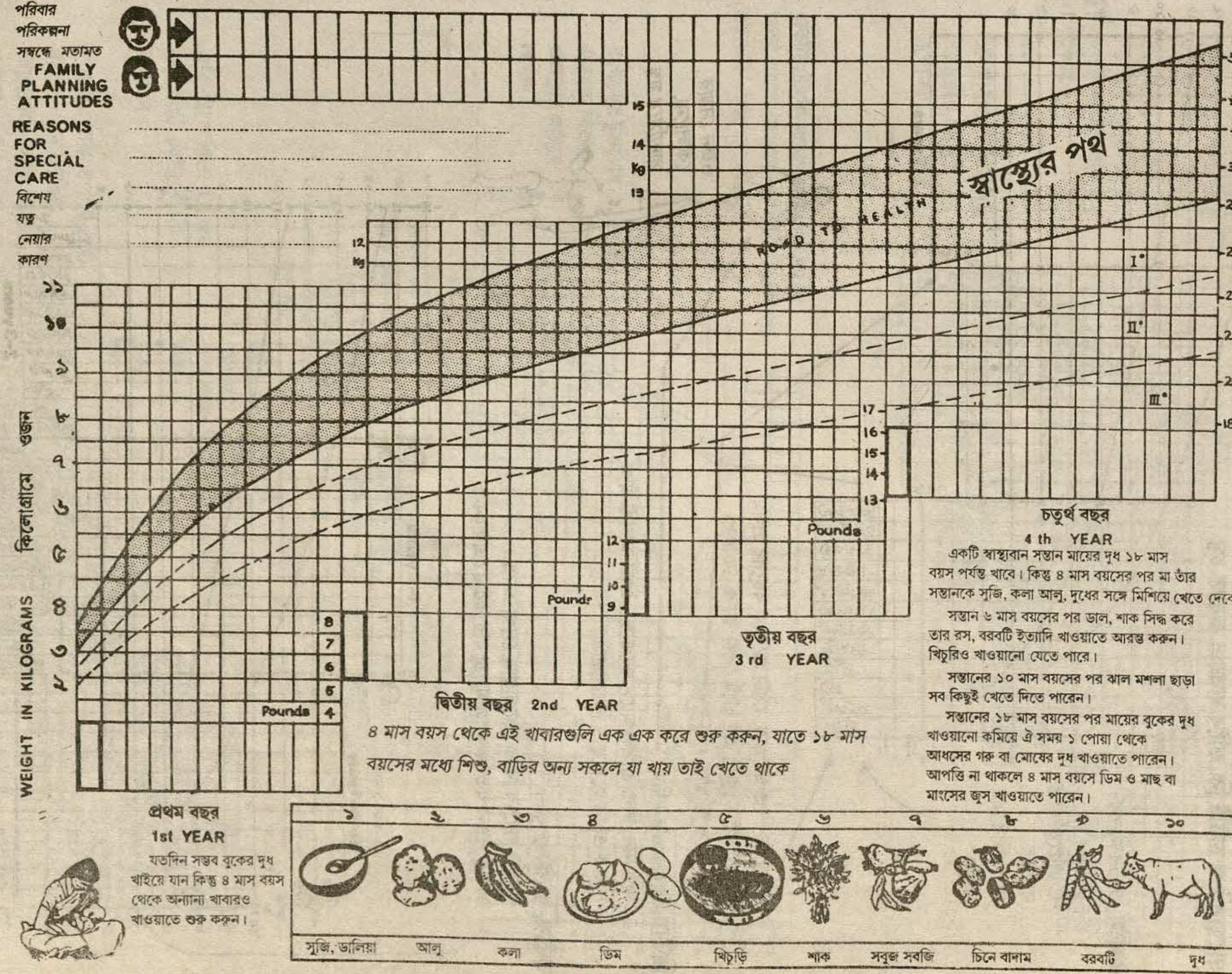
শিশুর স্বাস্থ্য রেকর্ড
০-৬ বছর

ক্লিনিক CLINIC		শিশুর ক্রমিক সংখ্যা CHILDS No
শিশুর নাম CHILD'S NAME	ছেলে	মেয়ে
মায়ের নাম MOTHER'S NAME	পেশা OCCUPATION	
বাবার নাম FATHER'S NAME	পেশা OCCUPATION	
জন্ম তারিখ — মাস MONTH / বছর YEAR	CASTE OR COMMUNITY জাতি বা সম্প্রদায়	
বাড়ির নম্বর HOUSE NO	রাস্তা	গ্রাম STREET VILLAGE
TOWN P.O. পোঃ অফিস	তালুক TEHSIL TALUK	জেলা DIST.

BIRTH ORDER জন্ম ক্রম	NAMES OF BROTHERS & SISTERS ভাইবোনদের নাম	AGE বয়স (ছেলে)	(মেয়ে)	দেখানো হয়েছে কিনা	স্বাস্থ্যের অবস্থা STATE OF HEALTH
১					
২					
৩					
৪					
৫					
৬					
৭					
৮					

বিভিন্ন টিকের তারিখ	১	২	৩	৪	৫
বি সি জি যক্ষ্মার জন্যে BCG against TB		মাণ্টু পরীক্ষা			ফল result
Smallpox গুটি বসন্তের টিকে					
পোলিও Polio					
(DPT) ডি পি টি					
টি এ বি TAB					
Other অন্যান্য					
Other অন্যান্য					

তারিখ Hb.	সমস্যা PROBLEMS	চিকিৎসা



যতদিন সম্ভব বুকের দুধ খাইয়ে যান কিন্তু ৪ মাস বয়স থেকে অন্যান্য খাবারও খাওয়াতে শুরু করুন।

৪ মাস বয়স থেকে এই খাবারগুলি এক এক করে শুরু করুন, যাতে ১৮ মাস বয়সের মধ্যে শিশু, বাড়ির অন্য সকলে যা খায় তাই খেতে থাকে

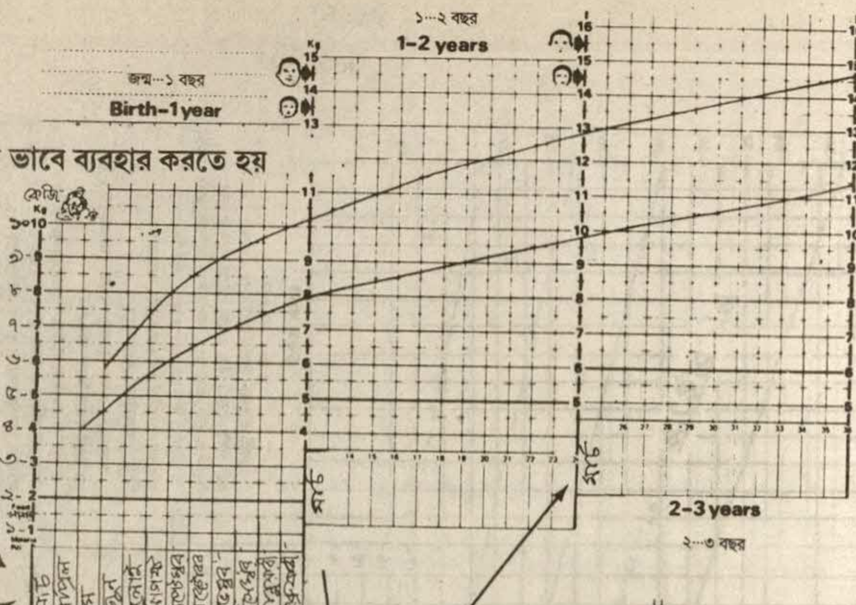
একটি স্বাস্থ্যবান সন্তান মায়ের দুধ ১৮ মাস বয়স পর্যন্ত খাবে। কিন্তু ৪ মাস বয়সের পর মা তাঁর সন্তানকে সুজি, কলা আলু, দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে দেবেন।

সন্তান ৬ মাস বয়সের পর ডাল, শাক সিদ্ধ করে তার রস, বরবটি ইত্যাদি খাওয়াতে আরম্ভ করুন। খিচুরিও খাওয়ানো যেতে পারে।

সন্তানের ১০ মাস বয়সের পর ঝাল মশলা ছাড়া সব কিছুই খেতে দিতে পারেন।

সন্তানের ১৮ মাস বয়সের পর মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো কমিয়ে ঐ সময় ১ পোয়া থেকে আধসের গরু বা মোষের দুধ খাওয়াতে পারেন। আপত্তি না থাকলে ৪ মাস বয়সে ডিম ও মাছ বা মাংসের জুস খাওয়াতে পারেন।

স্বাস্থ্যের পথ চার্টটি কি ভাবে ব্যবহার করতে হয়

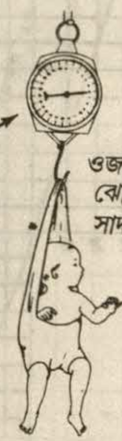


প্রথমে, চার্টের নিচের ছোট চৌখুপিগুলিতে বছরের মাসগুলির নাম লিখুন।

যে মাসে শিশু জন্মেছে, সেটা প্রত্যেক বছরের প্রথম চৌখুপিতে লিখুন। এই চার্টে দেখা যাচ্ছে যে শিশু মার্চ মাসে জন্মেছে।

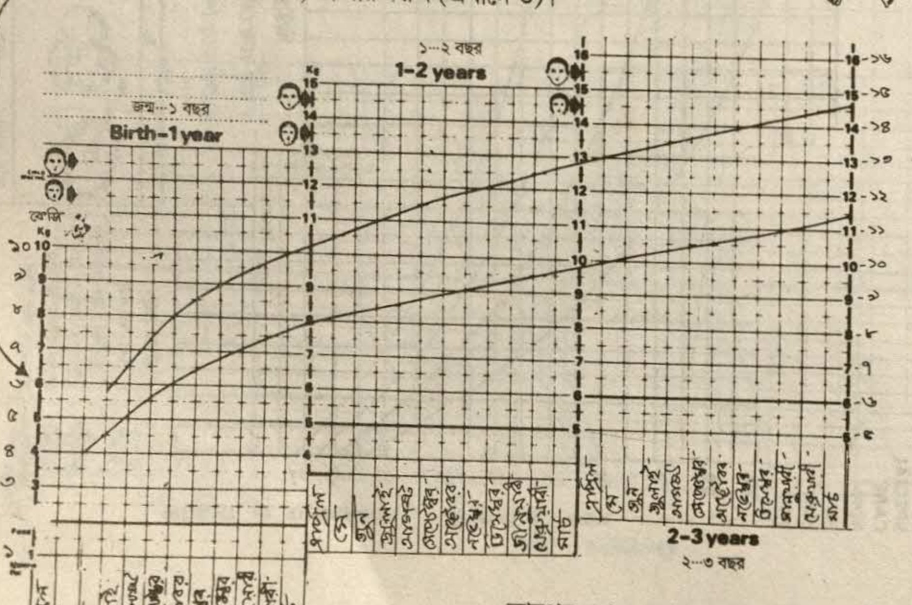
দ্বিতীয়, শিশুর ওজন নিন।

ধরে নিন, শিশু এপ্রিল মাসে জন্মেছে; এখন আগস্ট মাস, শিশুর ওজন হয়েছে ৬ কিলোগ্রাম।



তৃতীয়, কার্ডটা দেখুন।

কার্ডের পাশের দিকে কিলোগ্রাম লেখা আছে।
শিশুর ওজন যত কিলোগ্রাম, তা বার করুন (এখানে ৬)।

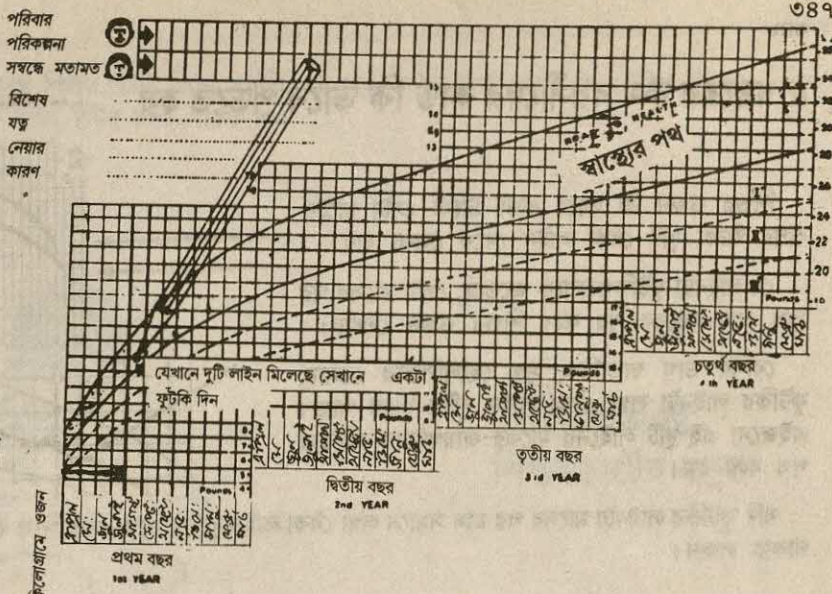


তারপর এখন যে মাস চলছে সেটা (এখানে শিশুর প্রথম বছরের আগস্ট মাস) চার্টের নিচের দিকে খুঁজে বার করুন।

চতুর্থ, ৬ থেকে যে লাইন বেরিয়েছে,

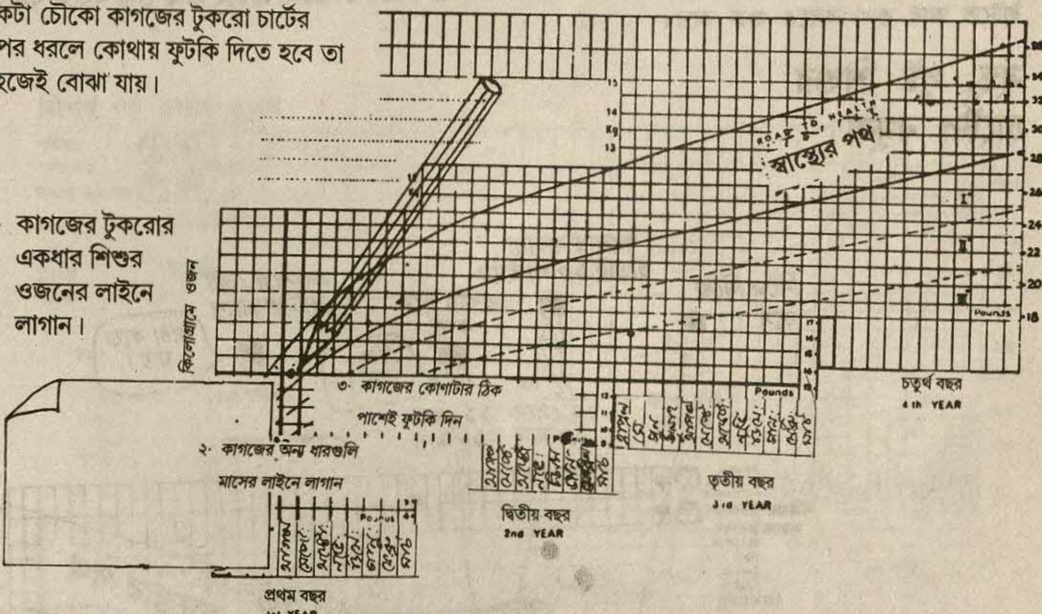
আর

আগস্ট থেকে যে লাইন বেরিয়েছে সে দুটি ধরে এগোন।



একটা চৌকো কাগজের টুকরো চার্টের ওপর ধরলে কোথায় ফুটকি দিতে হবে তা সহজেই বোঝা যায়।

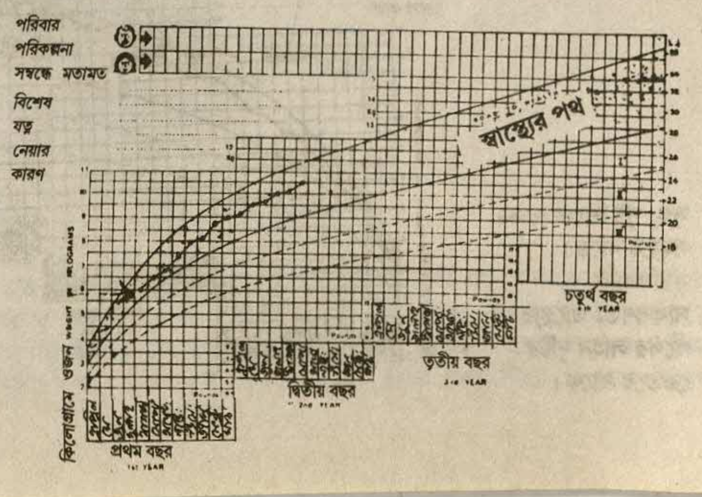
১· কাগজের টুকরোর একধার শিশুর ওজনের লাইনে লাগান।



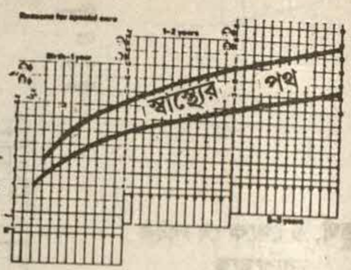
প্রতি মাসে শিশুকে ওজন করে চার্টে একটা ফুটকি বসাবেন।

শিশু সুস্থ থাকলে চার্টে প্রতি মাসের নতুন ফুটকিটা আগেরটার থেকে উঁচুতে থাকবে।

শিশু কতটা ভালোভাবে বাড়ছে তা জানার জন্যে ফুটকিগুলো লাইন টেনে জুড়ে দিন।

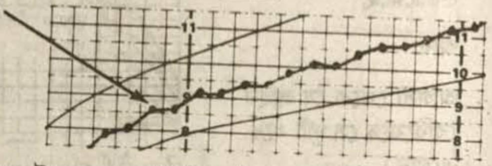


৫ বছরের কম বয়সীদের কার্ড কি ভাবে পড়তে হয়



শিশুর ওজন কি ভাবে বাড়া উচিত সেটা চার্টের ওপর আঁকা দুটি বেঁকা লাইন দেখে বোঝা যায়।

যে লাইনটা ফুটকিগুলোকে জুড়েছে, সেটা মাসের পর মাস আর বছরের পর বছর শিশুর ওজন দেখায়।

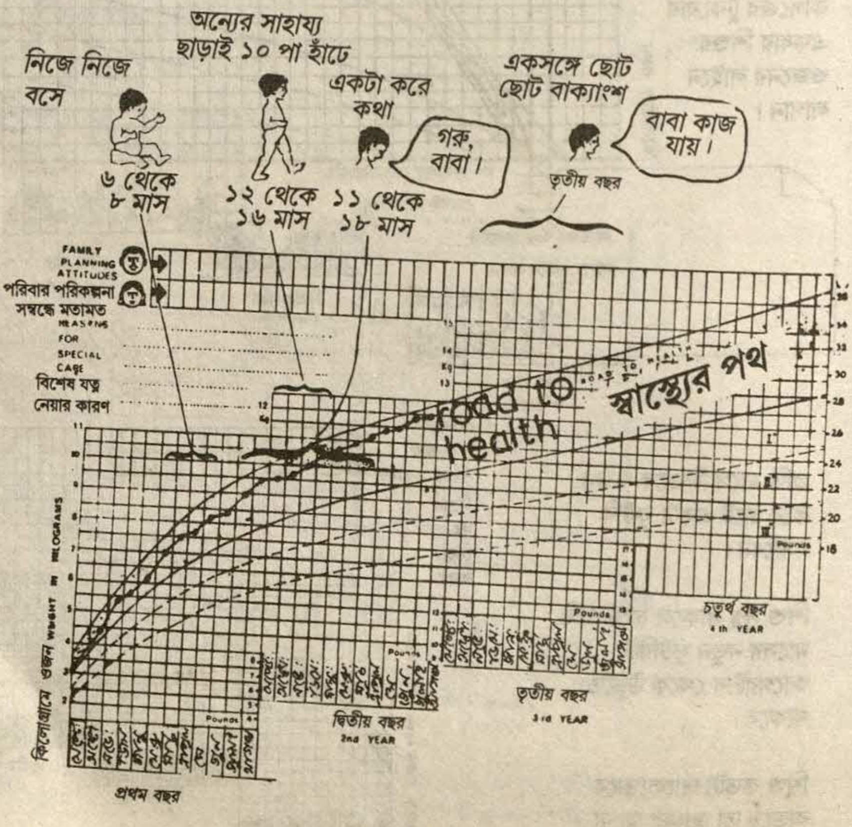


বেশির ভাগ স্বাভাবিক, সুস্থ ছেলেপিলের বেলায়, ফুটকির লাইনটা লম্বা বেঁকা লাইন দুটির মাঝে পড়ে। এইজন্যে এই দুটি লাইনের মাঝের জায়গাটাকে স্বাস্থ্যের পথ বলা হয়।

যদি ফুটকির লাইনটা মাসের পর মাস সমানে লম্বা বেঁকা লাইন দুটোর সঙ্গে একই দিকে উঠে যায়—তাও শিশু সুস্থ থাকার লক্ষণ।

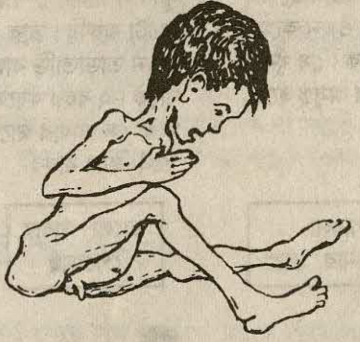
যে **সুস্থ শিশু** যথেষ্ট পুষ্টিকর খাবার পায়, সে সাধারণতঃ নিচে যেমন দেখানো হয়েছে সেই সেই বয়সে বসতে, হাঁটতে আর কথা বলতে শুরু করে।

সুস্থ, পুষ্ট শিশুর চার্টের নমুনা

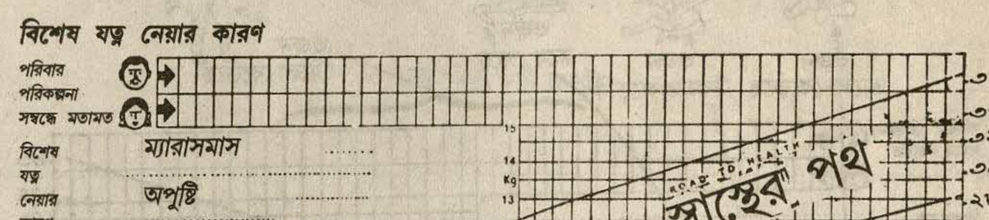


সুস্থ, পুষ্ট শিশুর ওজন সমানে বাড়ে। ফুটকিগুলি সাধারণতঃ স্বাস্থ্যের পথের লাইন দুটির ভেতরে থাকে।

একজন অপুষ্ট, অসুস্থ শিশুর চার্টটি নিচের চার্টের মত হতে পারে। লক্ষ্য করুন যে ফুটকির (শিশুর ওজনের) লাইনটা চার্টে বেঁকা লাইন দুটির সঙ্গে যাচ্ছে না।



রোগা বা অপুষ্ট
শিশুর চার্টের নমুনা



যে শিশুর চার্ট ওপরেরটার মত, তার ওজন সাংঘাতিক রকম কম। এর কারণ হয়তো এই যে তাকে যথেষ্ট পুষ্টিকর খাবার দেয়া হয় না; অথবা, তার যক্ষ্মা বা ম্যালেরিয়ার মত কোনো পুরোনো রোগ আছে; অথবা দুটোই। যতদিন না তার চার্টে দেখা যায় যে তার ওজন বাড়ছে আর স্বাস্থ্যের পথের দিকে ফিরে আসছে, ততদিন তাকে সবথেকে পুষ্টিকর খাবার—যতটা পারা যায়—দেয়া উচিত; আর সম্ভব হলে, তাকে ঘনঘন কোনো স্বাস্থ্যকর্মীকে দেখানো উচিত।

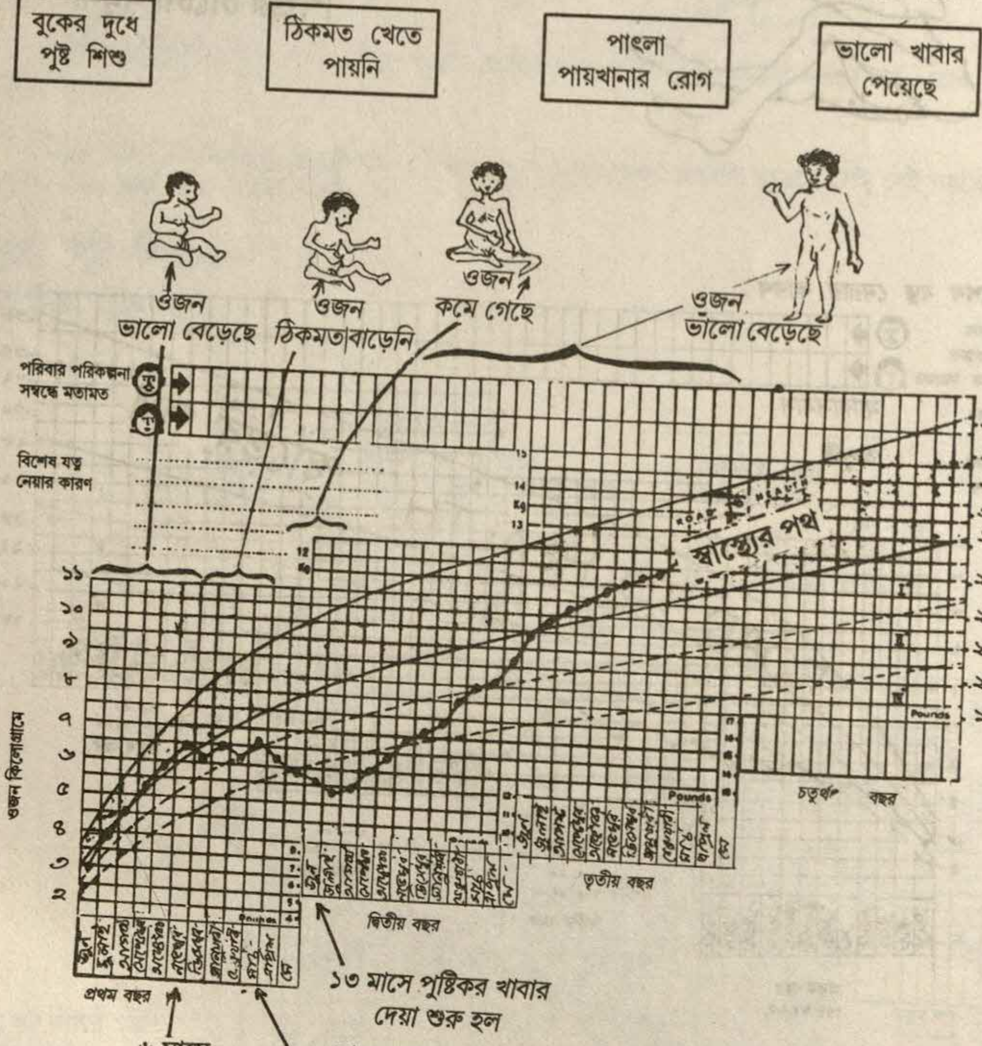
পাঁচ বছরের কম বয়সের চার্টের একটা নমুনা ; এতে শিশুর বেড়ে ওঠা দেখানো হয়েছে :

এই শিশুটিকে তার মা বুকের দুধ খাইয়েছিল বলে প্রথম ৬ মাস তার স্বাস্থ্য ভালো ছিল আর ওজন বেড়েছিল।

শিশুর ৬ মাস বয়সের সময় তার মা আবার পোয়াতি হয়ে তাকে বুকের দুধ দেয়া বন্ধ করে দেয়। শিশুকে আলু আর ভাত ছাড়া আর বিশেষ কিছুই দেয়া হয়নি। তার ওজন বাড়া বন্ধ হয়ে যায়।

১০ মাস বয়সে শিশুটির পুরোনো পাৎলা পায়খানার রোগ হয়ে যায় ; তার ওজন কমে যেতে থাকে। সে খুব রোগা আর অসুস্থ হয়ে যায়।

শিশুটির বয়স যখন ১৩ মাস, তখন তার মা জানতে পারে যে শিশুকে পুষ্টিকর খাবার দেয়াটা কতটা জরুরি। তার ওজন তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে। ২ বছর বয়সের মধ্যে সে আবার স্বাস্থ্যের পথে ফিরে যায়।



৫ বছরের কমবয়সীদের জন্যে কার্ড রাখাটা জরুরি। ওগুলো দেখে মায়েরা বুঝতে পারে কখন তাদের ছেলেপিলেদের আরো পুষ্টিকর খাবার আর বিশেষ যত্নের দরকার। স্বাস্থ্যকর্মীরাও ওগুলো দেখে শিশুর আর তার বাড়ির লোকের কি কি দরকার, তা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারে। মা নিজের কাজ ঠিকমত করছে কি না কার্ড দেখে তাও সে বুঝতে পারে।

অন্যান্য পরিচ্ছেদে শিশুদের যে সব সমস্যার কথা আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলি ফিরে দেখা

এই বইয়ের অন্য অনেক পরিচ্ছেদে যে সব রোগের কথা আলোচনা করা হয়েছে, তার মধ্যে অনেকগুলিই শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। যেগুলি বেশি দেখা যায় তার মধ্যে কতকগুলি ছোট করে আবার আলোচনা করা হচ্ছে। প্রতিটি সমস্যা সম্বন্ধে আরো জানতে হলে যে যে পৃষ্ঠার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, সেগুলি দেখবেন।

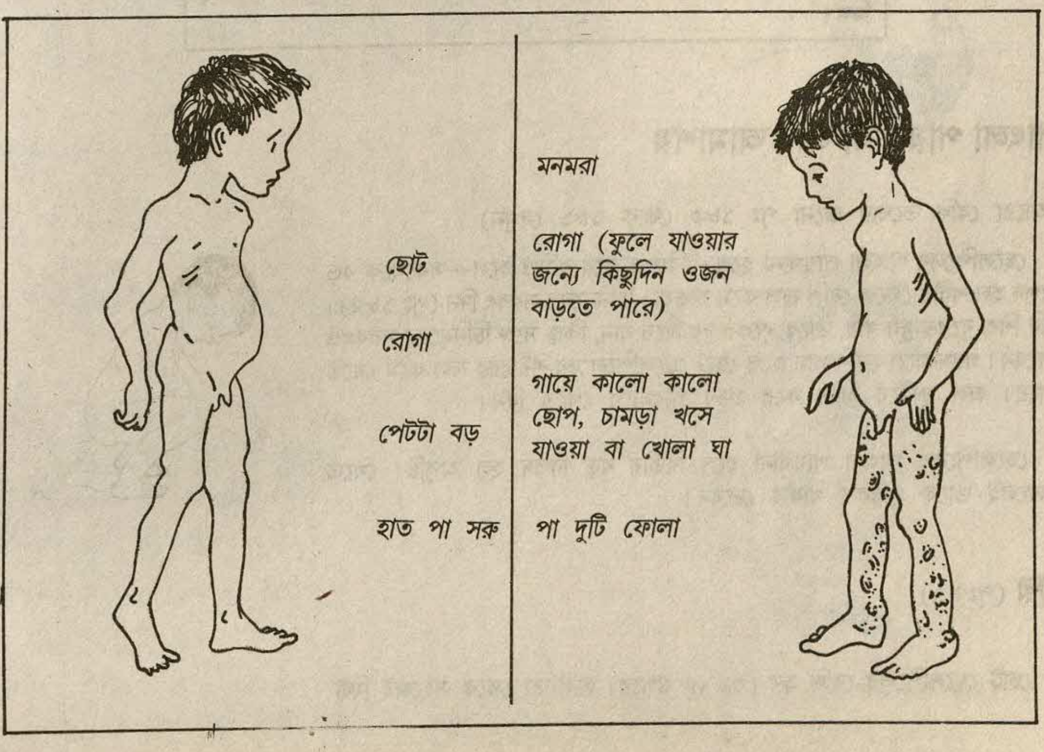
সদ্যজন্মানো শিশুদের বিশেষ যত্ন আর সমস্যার জন্যে পৃঃ ৩১৬ থেকে পৃঃ ৩১৮ দেখুন।

মনে রাখবেন : শিশুদের বেলায়, প্রায়ই, যে কোনো সমস্যা খুব তাড়াতাড়ি গুরুতর হয়ে দাঁড়ায়। যে রোগে বড়দের বেশি ক্ষতি বা মৃত্যু হতে কয়েক দিন বা সপ্তাহ লাগে, তার থেকে একটি ছোট শিশু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা যেতে পারে। কাজেই, **রোগের প্রথম লক্ষণ লক্ষ্য করে তখনি ব্যবস্থা নেয়াটা জরুরি।**

অপুষ্ট ছেলেপিলে

যথেষ্ট খেতে পায় না বলে অনেক ছেলেপিলে অপুষ্ট হয়। ছেলেপিলের কি কি খাবার দরকার সে বিষয়ে আরো আলোচনার জন্যে পরিচ্ছেদ ১১, বিশেষ করে পৃঃ ১৪১ দেখুন। কচি বাচ্চাদের জন্যে পৃঃ ১৪১ আর ১৪২ দেখুন।

এই শিশু দুটি অপুষ্ট



অপুষ্টি থেকে ছেলেপিলেদের অনেক রকম সমস্যা হতে পারে, তার মধ্যে আছে:

কম অপুষ্টিতে:

- শিশু ধীরে বাড়ে
- পেটটা ফুলে যায়
- শরীর রোগা হয়ে যায়
- খিদে চলে যায়
- ফুর্তি থাকে না
- ফ্যাকাসে গা (রক্তাল্পতা) হয়
- নোংরা খাবার ইচ্ছা (রক্তাল্পতা) হয়
- ঠোঁটের কোণে ঘা হয়
- ঘনঘন সর্দি আর অন্য সংক্রমণ হয়
- রাতকানা হয়

আরো সাংঘাতিক অবস্থায়:

- ওজন খুব কম বাড়ে বা একেবারেই বাড়ে না
- পা (কখনো কখনো মুখও) ফুলে যায়
- কালো ছোপ, কালসিটে বা খোলা, ছাল খসে পড়া ঘা হয়
- চুল পাৎলা হয়ে পড়ে যায়
- হাসতে খেলতে ইচ্ছা থাকে না
- মুখের ভেতরে ঘা হয়
- বুদ্ধি স্বাভাবিকভাবে বাড়ে না
- চোখ শুকিয়ে যায় (জেরোসিস)
- অন্ধ হয়ে যায় (পৃঃ ২৭১)

পৃঃ ১৩২-১৩৩-এ ভিজে এবং শুকনো অপুষ্টির তুলনা, তাদের কারণ আর এড়ানোর উপায় দেয়া হয়েছে।

প্রায়ই, পাৎলা পায়খানা বা হামের মত কোনো তীব্র রোগের পর অপুষ্টির লক্ষণগুলি দেখা দেয়। সুস্থ শিশুর থেকে, অসুস্থ শিশু বা যে শিশু অসুখ থেকে উঠেছে তার পুষ্টিকর খাবারের দরকার আরো বেশি।

আপনার ছেলেমেয়েদের যথেষ্ট পরিমাণে শরীর গড়বার আর রক্ষা করবার খাবার, যেমন—দুধ, বরবটি, মুসুরি, ফল, শাকসবজি, ডিম, মাংস আর মাছ দিন।

পাৎলা পায়খানা আর আমাশয়

(আরো বেশি তথ্যের জন্যে পৃঃ ১৮৩ থেকে ১৯১ দেখুন)

ছেলেপিলের পাৎলা পায়খানা হলে—বিশেষ করে বমিও হলে—সবথেকে বড় বিপদ হল শরীর থেকে বেশি জল কমে যাওয়া। চিনিনুনের সরবৎ দিন (পৃঃ ১৮২)। যদি শিশু বুকের দুধ খায়, তাকে বুকের দুধ দিয়ে যান, কিন্তু সঙ্গে চিনিনুনের সরবৎও দেবেন। গরমকালে বেশি ঘাম হলে ছোট ছেলেপিলেদের শরীরের জল কমে যেতে পারে। জল ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে প্রচুর পরিমাণে খেতে দিন।



ছেলেপিলের পাৎলা পায়খানা হলে দ্বিতীয় বড় বিপদ হল অপুষ্টি। খেতে পারলেই তাকে পুষ্টিকর খাবার দেবেন।

জ্বর (পৃঃ ৮৭)

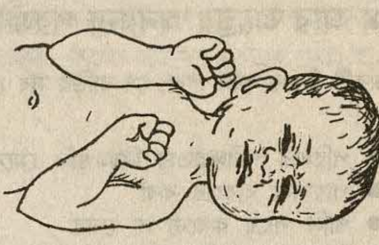
ছোট ছেলেপিলের বেশি জ্বর (৩৯°-র ওপরে) হলে তা থেকে সহজেই ফিট

বা মগজের ক্ষতি হয়। তাড়াতাড়ি জ্বর কমাবার জন্যে তার সমস্ত জামাকাপড় খুলে গাটা ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে তাকে হাওয়া করুন। এছাড়া তাকে ঠিক মাত্রায় এসেটামিনোফেন বা এসপিরিন (পৃঃ ৪১৪) দিন; প্রচুর তরল খাবারও দিন।



ফিট (তড়কা) (পৃঃ ২১৬ দেখুন)

সাধারণতঃ বেশি জ্বর. শরীরের জল কমে যাওয়া, মৃগী আর মেনিনজাইটিস থেকে ছোট ছেলেপিলের ফিট হয়। বেশি জ্বর হলে তাড়াতাড়ি কমিয়ে ফেলুন (পৃঃ ৮৮)। শরীরের জল কমে যাওয়া (পৃঃ ১৮১) বা মেনিনজাইটিস (পৃঃ ২২৫)-এর লক্ষণ আছে কিনা দেখে নিন। যে সব ফিট হঠাৎ হঠাৎ হয়, জ্বর বা অন্য লক্ষণ থাকে না, সেগুলি সম্ভবতঃ মৃগী (পৃঃ ২১৬)—বিশেষ করে ফিটের ফাঁকে ফাঁকে যদি শিশুকে সুস্থ মনে হয়। যে সব ফিটে বা খিচুনিতে প্রথমে চোয়াল, পরে সমস্ত শরীরটা শক্ত হয়ে যায়, সেগুলি ধনুষ্টঙ্কার (পৃঃ ২২২) হতে পারে।



মেনিনজাইটিস (পৃঃ ২২৫)

হাম বা অন্য কোনো রোগের জটিলতা থেকে এই বিপজ্জনক রোগটি হতে পারে। মায়ের যক্ষ্মা থাকলে তার ছেলেপিলের যক্ষ্মার মেনিনজাইটিস হতে পারে। খুব অসুস্থ শিশু যদি মাথা একেবারে হেলিয়ে শুয়ে থাকে, যদি তার ঘাড় এত শক্ত হয়ে যায় যে সামনে নোয়ানো যায় না, আর যদি তার শরীর অদ্ভুতভাবে নড়ে (ফিট), তবে তার হয়তো মেনিনজাইটিস হয়েছে।



রক্তাল্পতা (পৃঃ ১৪৬)

ছেলেপিলের বেলায় যে সব লক্ষণ বেশি দেখা যায়:

- ফ্যাকাসে ভাব, বিশেষ করে চোখের পাতার ভেতরে, মাড়িতে আর নখে
- দুর্বলতা—চট করে ক্লান্ত হয়ে পড়া
- নোংরা খেতে ইচ্ছা

যে সব কারণে সাধারণতঃ হয়:

- ■ খাবারে যথেষ্ট লোহা না থাকলে (পৃঃ ১৪৬)
- ■ অন্ত্রের পুরোনো সংক্রমণ হলে
- ■ হুকওয়ার্ম (পৃঃ ১৯৫) থাকলে
- ■ ম্যালেরিয়া (পৃঃ ২২৭) হলে



এড়ানো আর সারানো:

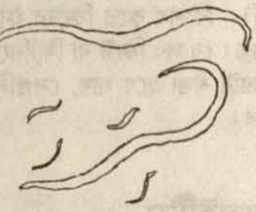
- লোহা ভরা খাবার, যেমন, গাঢ় সবুজ রঙের শাকসবজি, বরবটি, মুসুরি, চিনেবাদাম, মাংস আর ডিম দিন। এছাড়া যে সাদা চিনি বেশি চলে তার বদলে লোহায় ভরা গুড় দিন।

- রক্তাল্পতার কারণটার চিকিৎসা করুন ; হুকওয়ার্ম বেশি থাকলে খালি পায়ে ঘুরবেন না। মাটি বা কাদা দিয়ে হাত ধোবেন না—ওতে কৃমির ডিম থাকে।
- হুকওয়ার্ম বলে সন্দেহ হলে, স্বাস্থ্যকর্মী অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে মলটা পরীক্ষা করে দেখতে পারে। হুকওয়ার্মের ডিম পাওয়া গেলে, তার চিকিৎসা করুন (পৃঃ ৪১২)।
- দরকার হলে আয়রন সল্টের বড়ি খেতে দেবেন (ফেরাস সালফেট, পৃঃ ৪২৪)।

কৃমি আর অন্ত্রের অন্যান্য পরজীবী (পৃঃ ১৯৩)

একটি শিশুর কৃমি হলে, সে বাড়ির সব লোকের চিকিৎসা করানো উচিত। কৃমির সংক্রমণ এড়াতে শিশুদের উচিত :

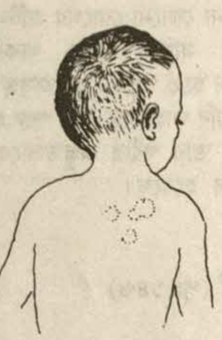
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার নিয়মগুলি মেনে চলা (পৃঃ ১৬৭)
- পায়খানা ব্যবহার করা
- খালি পায়ে কখনো না ঘোরা
- কাঁচা বা আধকাঁচা মাংস কখনো না খাওয়া
- শুধু ফোটানো বা বিশুদ্ধ জল খাওয়া



চামড়ার সমস্যা (পরিচ্ছেদ ১৫)

ছেলেপিলেদের যেগুলি সব থেকে বেশি হয় তার মধ্যে আছে :

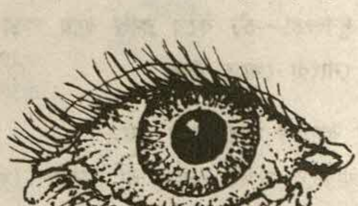
- খোস বা চুলকুনি (পৃঃ ২৪১)
- সংক্রমিত ঘা আর পাঁচড়া (পৃঃ ২৪২ আর ২৪৩)
- দাদ আর অন্য ছত্রাকের সংক্রমণ (পৃঃ ২৪৬)



চামড়ার সমস্যা এড়াতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিধিগুলি (পৃঃ ১৬৭) মেনে চলুন :

- ছেলেপিলেদের ঘনঘন স্নান করান আর উকুনের চিকিৎসা করান।
- ছারপোকা, উকুন আর খোস, চুলকুনি (স্কেবিস) কমাবার চেষ্টা করুন।
- ছেলেপিলের খোস, উকুন, দাদ বা সংক্রমিত ঘা হলে তাদের অন্য ছেলেপিলেদের সঙ্গে খেলতে বা শুতে দেবেন না। এগুলির চিকিৎসা তাড়াতাড়ি করাবেন।

চোখ ওঠা (কনজাংটিভাইটিস) (পৃঃ ২৬৩)



চোখের পাতার ভেতরে দিনে অনেকবার করে একটা এনটিবায়োটিক ড্রপ দিন। ছেলেপিলের চোখ উঠলে তাকে অন্য ছেলেপিলেদের সঙ্গে খেলতে বা শুতে দেবেন না। কয়েকদিনের মধ্যে ভালো না হলে স্বাস্থ্যকর্মীকে দেখাবেন।

সর্দি আর ইনফ্লুয়েঞ্জা (পৃঃ ২০০):



সাধারণ ঠাণ্ডা লাগায় নাক দিয়ে জল ঝরে, অল্প জ্বর, কাশি, প্রায়ই গলা ব্যথা, কখনো কখনো পাৎলা পায়খানা হয়। এটা ছেলেপিলেদের প্রায়ই হয়, কিন্তু কোনো গুরুতর সমস্যা নয়।

এসপিরিন বা এসেটামিনোফেন (পৃঃ ৪১৪) আর প্রচুর তরল খাবার দিয়ে চিকিৎসা করুন। ছেলেপিলেরা চাইলে তাদের বিছানায় শুয়ে থাকতে দিন। ভালো খাবার আর প্রচুর ফল খেলে ছেলেপিলের ঠাণ্ডা লাগা এড়ানো আর তাড়াতাড়ি সারানোয় সাহায্য হয়।

সাধারণ ঠাণ্ডা লাগায় বা ইনফ্লুয়েঞ্জায় পেনিসিলিন, টেট্রাসাইক্লিন এবং অন্য এনটিবায়োটিকগুলো কোনো কাজ করে না। সর্দিকাশিতে ইনজেকশনের দরকার হয় না।

যদি কোনো ছেলেপিলে সর্দিকাশি হয়ে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে, সঙ্গে বেশি জ্বর আর হালকা ঘনঘন শ্বাস থাকে, তবে তার **নিউমোনিয়া** হতে পারে (পৃঃ ২০৮); এনটিবায়োটিক দেয়া উচিত। কানের সংক্রমণ (পরের পৃষ্ঠা) বা গলায় স্ট্রেপটোকক্কাস (পৃঃ ৩৫৬) আছে কিনা তাও লক্ষ্য করুন।

ছেলেপিলেদের স্বাস্থ্যের যে সব সমস্যা অন্য কোনো পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়নি

কানে ব্যথা আর কানে সংক্রমণ :

কানে খোল হলে কান ব্যথা হতে পারে। এই খোলটা স্বাভাবিক। কান পরিষ্কার রাখতে, স্নানের পর একটা কাঠিতে তুলো জড়িয়ে কান মুছে দেবেন। খুব বেশি খোল থাকলে, স্বাস্থ্যকর্মী সেটা বার করে দিতে পারে।



ছোট ছেলেমেয়েদের বেলায় কানের সংক্রমণ প্রায়ই দেখা যায়। সংক্রমণটা প্রায়ই কয়েক দিন সর্দি, নাক বন্ধ বা আটকে থাকার পর শুরু হয়। জ্বর বাড়তে পারে। শিশু প্রায়ই কেঁদে ওঠে আর মাথার পাশটা ঘষে। কখনো কখনো কানে পুঁজ দেখা যায়। ছোট ছেলেপিলের বেলায় কানে সংক্রমণ থেকে কখনো কখনো পাৎলা পায়খানা হয়। কাজেই ছেলেপিলের পাৎলা পায়খানা আর জ্বর হলে তার কান দুটি দেখে নিতে ভুলবেন না।

চিকিৎসা :

- কানের সংক্রমণের চিকিৎসা তাড়াতাড়ি করা দরকার। পেনিসিলিন (পৃঃ ৩৯৭) বা সালফাডায়াজিনের (পৃঃ ৪০২) মতো একটা এনটিবায়োটিক দিন। ৩ বছরের কম বয়সী শিশুদের বেলায় এমপিসিলিন (পৃঃ ৩৯৯) সাধারণতঃ বেশি ভালো কাজ করে। তাছাড়া ব্যথার জন্যে এসপিরিন বা এসেটামিনোফেন দেবেন।
- একটা দেশলাই কাঠিতে তুলো জড়িয়ে সাবধানে কানের পুঁজ পরিষ্কার করে দিন। সম্ভব হলে, কানে ঢোকাবার আগে কাঠিটা এলকোহলে ডুবিয়ে নেবেন। কিন্তু কানে তুলোর গুটি, পাতা বা অন্য কিছু ঢোকাবেন না।
- কান থেকে পুঁজ বেরোলে, ছেলেপিলের নিয়মিত স্নান করা উচিত, কিন্তু সেরে যাবার পরও অন্ততঃ ২ সপ্তাহ পর্যন্ত সাঁতার কাটা বা ডুব দেয়া উচিত নয়।

এড়ানো :

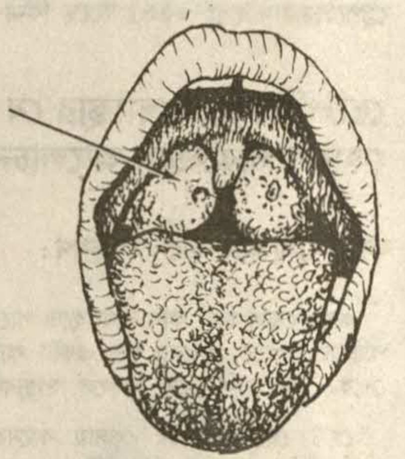
- ছেলেপিলেদের সর্দি হলে, নাক মুছতে—কিন্তু না ঝাড়তে শেখান।
- শিশুদের বোতলে খাওয়াবেন না—বা যদি খাওয়ান, চিৎ করে শুয়ে খাওয়াবেন না—কারণ এতে দুধটা নাক দিয়ে চলে গিয়ে কানের সংক্রমণ ঘটাতে পারে।
- শিশুদের নাক বন্ধ হয়ে গেলে, নুন জলের ড্রপ দিন, আর ২০১ পৃষ্ঠাতে যেমন বলা হয়েছে সেইভাবে শ্লেষ্মাটা টেনে বার করে দিন।

কানের ক্যানালে সংক্রমণ:

কানের ভেতরে যে ক্যানাল বা নলটা চলে গেছে তাতে সংক্রমণ হয়েছে কিনা জানবার জন্যে কানটা আস্তে করে টানুন। এতে ব্যথা হলে, ক্যানালে সংক্রমণ হয়েছে। দিনে ৩ বা ৪ বার ভিনিগার মেশানো জল দিন। (১ চামচ ফোটানো জলে ১ চামচ ভিনিগার দিন)। জ্বর বা পুঁজ থাকলে একটা এনটিবায়োটিকও ব্যবহার করবেন।

ছেলেপিলের কানের পেছনে সাংঘাতিক যন্ত্রণা আর বেশি জ্বর হলে, **তখনি ডাক্তারি সাহায্য নিন।** এর থেকে মেনিনজাইটিস হতে পারে।

গলায় ব্যথা আর টনসিলের প্রদাহ:



এইসব সমস্যা প্রায়ই সাধারণ সর্দি থেকে শুরু হয়। গলার ভেতরটা লাল হয়ে ঢোক গিলতে ব্যথা লাগতে পারে। টনসিল দুটি (গলার পেছনে দু দিকে যে দুটি দলার মত লিমফের গুটি দেখা যায়) বড় আর যন্ত্রণাদায়ক হয়ে সেগুলি থেকে পুঁজ পড়তে পারে। জ্বর বেড়ে ৪০° পর্যন্ত উঠতে পারে।

চিকিৎসা:

- বেশ গরম নুন জল (১ গেলাস জলে ১ চামচ নুন) দিয়ে কুলকুচো করুন।
- ব্যথার জন্যে এসপিরিন বা এসেটামিনোফেন খান।
- ব্যথা আর জ্বর হঠাৎ হলে অথবা ৩ দিনের বেশি চললে, নিচে দেখুন।
- ছেলেপিলের খুব ঘনঘন টনসিলের সংক্রমণ হলে, একটা ছোট অপারেশন করে টনসিল দুটি বাদ দিয়ে দিলে সবথেকে ভালো হয়।

গলা ব্যথা আর বাতের জ্বরের বিপদ:

সাধারণ ঠাণ্ডা লাগা বা ইনফ্লুয়েঞ্জার সঙ্গে যে গলা ব্যথা হয় তাতে সাধারণতঃ এনটিবায়োটিক ব্যবহার করা উচিত নয়, করলে কোনো কাজও হয় না। কুলকুচো আর এসপিরিন দিয়ে চিকিৎসা করুন।

তবে—**স্ট্রেপটোকক্কাল গলা** বলে একরকম গলা ব্যথায় পেনিসিলিন দিয়ে চিকিৎসা করা উচিত। এটা ছেলেপিলে আর কমবয়সীদের বেলায় খুব বেশি দেখা যায়। এটা সাধারণতঃ সর্দি বা কাশির কোনো লক্ষণ ছাড়াই গলায় সাংঘাতিক ব্যথা আর জ্বর দিয়ে হঠাৎ শুরু হয়। মুখের ভেতরের পেছনদিকটা আর টনসিল দুটো খুব লাল হয়ে যেতে পারে। চোয়ালের নিচের লিমফের গুটিগুলো ফুলে গিয়ে ব্যথা লাগতে পারে।

১০ দিন ধরে পেনিসিলিন (পৃঃ ৩৯৭) দিন। পেনিসিলিন সময়ে শুরু করে ১০ দিন ধরে দেয়া হলে বাতের জ্বর হবার ভয়টা কম থাকে। ছেলেপিলের স্ট্রেপ গলা হলে অন্যদের যাতে সেটা না হয়, তার জন্যে তার একেবারে আলাদা খাওয়া শোওয়া উচিত।

রিউম্যাটিক (বাতের) জ্বর:

এই রোগ ছেলেপিলের বা কমবয়সীদের হয়। সাধারণতঃ কারো স্ট্রেপ গলা (ওপরে দেখুন) হবার পর ১ থেকে ৩ সপ্তাহের মধ্যে এটা শুরু হয়।

প্রধান লক্ষণ (সাধারণতঃ এর মধ্যে শুধু ৩টি বা ৪টি লক্ষণ দেখা যায়):



- জ্বর
- গাঁটে, বিশেষ করে কবজি আর গুলফে, পরে হাঁটুতে আর কনুইয়ে ব্যথা। গাঁটগুলো ফুলে গিয়ে প্রায়ই গরম আর লাল হয়ে যায়।
- চামড়ার নিচে, বেঁকা লাল লাইন বা দলা
- বেশি সাংঘাতিক অবস্থায়, দুর্বলতা, হাঁফ ধরা। হয়তো বুকে ব্যথাও।

চিকিৎসা:

- বাতের জ্বর বলে সন্দেহ হলে, স্বাস্থ্যকর্মীকে দেখান। হার্টের ক্ষতি হবার ঝুঁকি থাকতে পারে।
- বেশি মাত্রায় এসপিরিন (পৃঃ ৪১৪) খান। ১২ বছরের ছেলেপিলে দিনে ৬ বার করে ৩০০ মিঃ গ্রাঃ এর ২ টো বা ৩ টে পর্যন্ত বড়ি খেতে পারে। পেটে ব্যথা যাতে না হয় তার জন্যে দুধ বা খাবার সোডার সঙ্গে ওষুধটা দেবেন। কান ভোঁ ভোঁ করতে শুরু করলে মাত্রাটা কমিয়ে দেবেন।
- পেনিসিলিন দেবেন (পৃঃ ৩৯৭)।

এড়ানো:

- বাতের জ্বর এড়াতে, স্ট্রেপ গলা হলে তাড়াতাড়ি পেনিসিলিন দিয়ে ১০ দিনের চিকিৎসা করুন।
- বাতের জ্বর আবার হয়ে হার্টের আরো ক্ষতি যাতে না হয়, তার জন্যে যে ছেলে বা মেয়ের একবার বাতের জ্বর হয়ে গেছে তার গলা ব্যথার প্রথম লক্ষণ দেখা দিলেই ১০ দিন ধরে পেনিসিলিন খাওয়া উচিত। যদি আগেই হার্টের ক্ষতির লক্ষণ দেখা দিয়ে থাকে, তবে তার হয়তো বাকি জীবনটা নিয়মিত পেনিসিলিন খেয়ে যাওয়া বা প্রতিমাসে বেনজাথাইন পেনিসিলিন (পৃঃ ৩৯৯) ইনজেকশন নেয়া উচিত। কোনো অভিজ্ঞ স্বাস্থ্যকর্মী বা ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলবেন।

স্ট্রেপটোকক্কাল গলা হলে তারপরে পেচ্ছাপের ব্যবস্থার যে সংক্রমণ হয়

যে জীবাণুগুলো গলা ব্যথা, টনসিলের বা চামড়ার সংক্রমণ ঘটায় তারাই কখনো কখনো ছেলেপিলেদের পেচ্ছাপের ব্যবস্থাকে আক্রমণ করতে পারে। সেরকম হলে, প্রায় দু সপ্তাহ পরে শিশুর বেশি জ্বর আর পিঠের তলার দিকে ব্যথা হয়। তার মাথা ধরে, বমি বা ফিটও হয়। শিশুর পা, মুখ আর হাত ফুলে যেতে পারে। তার পেচ্ছাপ কমে যায়। পেচ্ছাপটা ঘোলাটে বা রক্তমেশা হতে পারে। নাড়ি দ্রুত চলে।

চিকিৎসা:

★ রক্তচাপ পরীক্ষা করুন।

★ **শিশুর বিছানায় সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার**। পুরোপুরি ভালো না হওয়া পর্যন্ত তার একেবারে বিছানা থেকে ওঠা উচিত নয়।

★ তার প্রতিদিনের পেচ্ছাপটা মেপে রাখবেন। রোজ **ঠিক একই পরিমাণ** জল খেতে দেবেন।

★ তার খাবারে প্রোটিনের পরিমাণ কমিয়ে দিন। তাকে কোনো দুধ, ডাল বা প্রোটিন দেয়া খাবার দেবেন না। একটু ঘি দেয়া সেদ্ধ ভাত দিতে পারেন।

★ শিশুকে একটুও নুন দেবেন না।

★ পেনিসিলিনের ইনজেকশন (পৃঃ ৩৯৮) দিন।

বিপদের লক্ষণ: নিচের লক্ষণগুলির মধ্যে কোনোটি দেখা দিলে তখনি ডাক্তারি সাহায্য নিতে পাঠাবেন।

* নাড়ির গতি বেড়ে যাওয়া
* রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া
* ফোলা বেড়ে যাওয়া
* পেচ্ছাপ বন্ধ হয়ে যাওয়া
* শ্বাসের অসুবিধা

শিশু যদি বিছানায় সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেয় আর কম প্রোটিন আর নুন ছাড়া খাবার খায়, তবে এই অবস্থায় বিপদ থাকবে না।

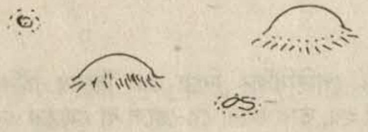
ছোটবেলার সংক্রমক রোগ

জলবসন্ত :



এটা একটা ভাইরাসের ছোটখাট সংক্রমণ। অন্য কারো এই রোগ হলে তার ছোঁয়াতে থাকার পর ২ থেকে ৩ সপ্তাহের মধ্যে ছেলেপিলের এই সংক্রমণটি হয়।

লক্ষণ :



দাগ,
ফোসকা,
মামড়ি

প্রথমে অনেক ছোট ছোট লাল চিড়বিড় করা দাগ বেরোয়। এগুলো ছোট ছোট ফুসকুড়ি বা ফোসকা হয়ে ফুলে উঠে শেষে মামড়ি তৈরি হয়। সাধারণতঃ প্রথমে গায়ে, পরে মুখে, হাতে আর পায়ে বেরোয়। একই সঙ্গে দাগ, ফোসকা আর মামড়ি সবগুলোই হতে পারে। সাধারণতঃ জ্বর কম থাকে।

চিকিৎসা :

সংক্রমণটা এক সপ্তাহের মধ্যে চলে যায়। রোগীকে রোজ সাবান আর অল্প গরম জল দিয়ে স্নান করান। চুলকুনি কমাতে জলে ডালিয়া বা নিমপাতা ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে ছেঁকে তাতে কাপড় ভিজিয়ে লাগান—কিংবা ক্যালামাইন লোশন লাগান। হাতের নখ খুব ছোট করে কেটে দেবেন। যদি মামড়িগুলো সংক্রমিত হয়ে যায়, সেগুলোর ওপর জেনসিয়ান ভায়োলেট বা কোনো এনটিবায়োটিক মলম লাগাবেন।

হাম :



যে সব ছেলেপিলে খুব অপুষ্ট বা যাদের যক্ষ্মা হয়েছে, তাদের পক্ষে এই সাংঘাতিক ভাইরাসের সংক্রমণটি বিশেষ বিপজ্জনক।

সাধারণতঃ হামের রোগীর কাছে থাকার ১০ দিন পর ছেলেপিলের হাম হয়। এটা সর্দির লক্ষণ দিয়ে শুরু হয়, যেমন—জ্বর, নাক দিয়ে জল পড়া, লাল, ব্যথা করা চোখ আর কাশি।

রোগী ক্রমশঃ আরো অসুস্থ হয়ে পড়ে। মুখের ভেতরে অনেক ঘা হতে পারে, পাৎলা পায়খানাও হতে পারে।

দু-তিন দিন পরে মুখের ভেতরে কয়েকটা নুনের দানার মত ছোট ছোট সাদা দাগ বেরোয়। দু-এক দিন পরে র‍্যাশগুলো বেরোয়—প্রথমে কানের পেছনে আর ঘাড়ে, তারপর মুখে আর গায়ে, শেষে হাতে আর পায়ে। র‍্যাশ বেরিয়ে যাবার পর সাধারণতঃ রোগী ভালো হতে শুরু করে। প্রায় ৫ দিনের মধ্যে চামড়া খসে গিয়ে র‍্যাশগুলো চলে যায়—গায়ে কালচে দাগ থেকে যায়।

চিকিৎসা:

- রোগীর শুয়ে থাকা উচিত; প্রচুর তরল জিনিস আর পুষ্টিকর খাবার খাওয়া উচিত। শিশু বুকের দুধ টানতে না পারলে তাকে চামচে করে বুকের দুধ খাওয়ান (পৃঃ ৩২৩)।
- জ্বর আর অস্বস্তি কমাতে এসেটামিনোফেন (বা এসপিরিন) দিন।
- কানে ব্যথা হলে একটা এনটিবায়োটিক দিন (পৃঃ ৩৯৭)।
- যদি নিউমোনিয়া বা মেনিনজাইটিসের লক্ষণ দেখা দেয় বা কানে বা পেটে সাংঘাতিক ব্যথা হয়, ডাক্তারি সাহায্য নিন।

হাম এড়ানো:

যে সব ছেলেপিলের হাম হয়েছে তাদের অন্য ছেলেপিলেদের থেকে দূরে রাখবেন। বিশেষ করে যে সব ছেলেপিলে খুব অপুষ্ট বা যাদের যক্ষ্মা বা অন্য পুরোনো রোগ আছে তাদের রক্ষা করতে চেষ্টা করুন। যে বাড়িতে হাম হয়েছে, সে বাড়ির অন্য ছেলেপিলেদের তখনো হাম না হলেও, তাদের ১০ দিন স্কুলে বা দোকানে বাজারে যাওয়া উচিত নয়।

সময়ে ছেলেপিলেদের হামের টিকে দিয়ে দেবেন।

ছোট ছেলেপিলেরা যাতে হাম থেকে মারা না যায় তার জন্যে সব ছেলেপিলের পুষ্টির দিকে নজর দেবেন। হাম হলে ছেলেপিলেদের আলাদা করে রাখবেন। অন্য ছেলেপিলেদের তাদের কাছে আসতে দেবেন না।

জার্মান হাম:

এগুলি সাধারণ হামের মত অত সাংঘাতিক নয়। এগুলি ৩/৪ দিন থাকে। অল্পস্বল্প র‍্যাশ বেরোয়। মাথার আর ঘাড়ের পেছনের লিমফের গুটিগুলো প্রায়ই ফুলে যায় আর ব্যথা হয়।

রোগীর উচিত বিছানায় শুয়ে থাকা আর দরকার হলে এসপিরিন খাওয়া।

পোয়াতি মেয়ের প্রথম ৩ মাসের মধ্যে জার্মান হাম হলে তার শিশুর ক্ষতি বা বিকৃতি হতে পারে। এই কারণে যে সব পোয়াতি মেয়ের এখনো জার্মান হাম হয়নি—বা হয়েছে কিনা ঠিক জানে না—তাদের উচিত যে ছেলেপিলেদের এই হাম হয়েছে তাদের থেকে দূরে থাকা। **পোয়াতি অবস্থার প্রথম ৩ মাসের মধ্যে কোনো মেয়ের জার্মান হাম হলে তার গর্ভপাত করিয়ে নেয়া উচিত।**

মাম্‌প্‌স:

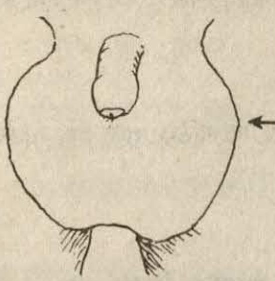
মাম্‌প্‌সের রোগীর থেকে ছোঁয়াচ লাগার পর ২ বা ৩ সপ্তাহ পরে প্রথম লক্ষণগুলো দেখা যায়।

মাম্‌প্‌স হলে প্রথমে জ্বর হয় আর মুখ খুললে বা খেতে গেলে ব্যথা হয়। ২ দিনের মধ্যে কানের নিচে চোয়ালের কোণে একটা নরম ফোলা ওঠে। প্রায়ই এটা প্রথমে এক দিকে, পরে অন্য দিকে হয়।



চিকিৎসা:

প্রায় ১০ দিনের মধ্যে ফোলাটা, ওষুধ ছাড়াই, নিজে থেকে চলে যায়। ব্যথা আর জ্বরের জন্যে এসপিরিন খাওয়া যেতে পারে। রোগীকে নরম পুষ্টিকর খাবার খাওয়ান আর মুখের ভেতরটা পরিষ্কার রাখুন।



জটিলতা (গোলমাল):

বড়দের বা ১১ বছরের বেশি বয়সের ছেলেপিলেদের বেলায়, প্রথম সপ্তাহের পর তলপেটে ব্যথা বা অণ্ডকোষে যন্ত্রণাদায়ক ফোলা (ছেলেদের) বা স্তনে যন্ত্রণাদায়ক ফোলা (মেয়েদের) হতে পারে। এইরকম ফোলা হলে রোগীর চুপচাপ থাকা দরকার আর ব্যথা কমাবার জন্যে ফোলা জায়গাটার ওপর বরফের পুঁটলি বা ঠাণ্ডা ভিজে কাপড় লাগানো উচিত।

মেনিনজাইটিসের লক্ষণ দেখা দিলে ডাক্তারি সাহায্য নিন (পৃঃ ২২৫)।

হুপিং কফ (ঘুংড়ি কাশি):



যার ঘুংড়ি কাশি হয়েছে তার থেকে ছোঁয়াচ লাগার ১ বা ২ সপ্তাহ পর এই রোগ শুরু হয়। ঠাণ্ডা লাগার মত, এই রোগ জ্বর, নাক দিয়ে জল ঝরা আর কাশি দিয়ে শুরু হয়।

২ সপ্তাহ পর ঘড়ঘড়ানি শুরু হয়। রোগী একবারও শ্বাস না নিয়ে ঘনঘন একটানা কেশে যায়—যতক্ষণ না কাশির সঙ্গে এক দলা চটচটে শ্লেষ্মা বেরিয়ে যায় আর একটা জোর ঘড়ঘড়ানির সঙ্গে তার ফুসফুসে জোরে বাতাস ঢুকে যায়। কাশির সময়, বাতাসের অভাবে তার ঠোঁট আর নখ নীল হয়ে যেতে পারে। ঘড়ঘড়ানির পর বমি হতে পারে। কাশির দমকের ফাঁকে ফাঁকে ছেলেপিলেকে বেশ সুস্থ দেখায়।

ঘুংড়ি কাশি প্রায়ই ৩ মাস বা তারো বেশি দিন ধরে থাকে।

১ বছরের কম বয়সের শিশুদের পক্ষে ঘুংড়ি কাশি বিশেষ বিপজ্জনক। কাজেই সময়ে টিকে দিয়ে দেবেন। ছোট শিশুদের ঠিক ঘড়ঘড়ানিটা হয় না—তাই ঘুংড়ি কাশি হয়েছে কিনা বোঝা শক্ত হয়। আপনাদের পাড়ায় যদি ঘুংড়ি কাশি হয়ে থাকে, তবে কোনো শিশুর দমকা কাশির সঙ্গে চোখ দুটি ফোলা ফোলা হলে, **তখনি** ঘুংড়ি কাশির জন্যে তার চিকিৎসা করুন।

চিকিৎসা:

- ঘুংড়ি কাশির প্রথম অবস্থায়, ঘড়ঘড়ানি শুরু হবার আগে টেট্রাসাইক্লিন (পৃঃ ৪০০), এরিথ্রোমাইসিন (পৃঃ ৪০০) বা এমপিসিলিনে (পৃঃ ৩৯৯) কাজ হতে পারে। ৬ মাসের কম বয়সের শিশুদের প্রথম লক্ষণেই চিকিৎসা করা বিশেষ জরুরি।
- সাংঘাতিক ঘুংড়ি কাশির বেলায়, ফেনোবারবিটালে (পৃঃ ৪২২) কাজ হতে পারে, বিশেষ করে কাশির জন্যে যদি রোগীর ঘুম না হয় বা ফিট হয়।
- ওজন কমে যাওয়া আর অপুষ্টি এড়াতে, রোগীকে পুষ্টিকর খাবার দেয়া উচিত। বমি করার একটু পরেই রোগীর খাওয়া উচিত।

জটিলতা:

কাশির থেকে চোখের সাদা অংশে টকটকে লাল রক্তপাত হতে পারে। কোনো চিকিৎসার দরকার নেই (পৃঃ ২৭০)। ফিট কিংবা নিউমোনিয়া (পৃঃ ২০৯) বা মেনিনজাইটিসের (পৃঃ ২২৫) লক্ষণ দেখা দিলে ডাক্তারি সাহায্য নিন।

ঘুংড়ি কাশির কষ্ট থেকে
বাঁচাও ছেলেপিলে,
দিয়ে দিও প্রথম টিকে
দু মাস বয়স হলে

ডিপথিরিয়া :



এটা ঠাণ্ডা লাগার মত জ্বর, মাথাধরা আর গলা ব্যথা দিয়ে শুরু হয়। গলার পেছনে—কখনো কখনো নাকের ভেতরে আর ঠোঁটের ওপরেও—একটা হলদেটে ছাই রঙের ছাল তৈরি হতে পারে। শিশুর ঘাড় ফুলে যেতে পারে। তার শ্বাসে খুব দুর্গন্ধ হয়।

ছেলেপিলের ডিপথিরিয়া হয়েছে বলে সন্দেহ হলে :

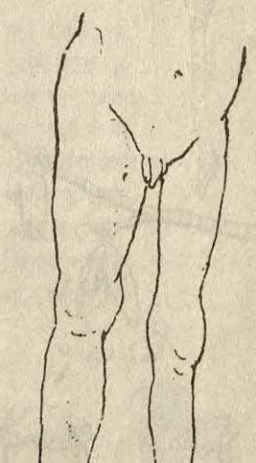
- তাড়াতাড়ি ডাক্তারি সাহায্য নেবেন। ডিপথিরিয়ার জন্যে একটা বিশেষ এনটিটকসিন আছে।
- রোগীকে অন্যদের থেকে আলাদা করে একটা ঘরে শুইয়ে রাখুন।
- পেনিসিলিন দিন।
- অল্প নুন মেশানো গরম জল দিয়ে কুলকুচো করতে দিন।
- তাকে ঘনঘন বা সমানে গরম জলের ভাপে শ্বাস নিতে দিন (পৃঃ ২০৫)।
- রোগীর দমবন্ধ হয়ে নীল হয়ে যেতে শুরু করলে আপনার আঙুলে একটা কাপড় জড়িয়ে তাই দিয়ে তার গলা থেকে ছালটা তুলে ফেলতে চেষ্টা করুন।

ডিপথিরিয়া একটা বিপজ্জনক রোগ কিন্তু ডি পি টি-র টিকে দিয়ে এটা সহজেই এড়ানো যায়। **দেখবেন আপনার ছেলেমেয়েদের যেন টিকে দেয়া হয়।**

ছোটদের পক্ষাঘাত (পোলিও, পোলিওমাইলাইটিস) :

২ বছরের কম বয়সের ছেলেপিলের মধ্যে পোলিও সবথেকে বেশি দেখা যায়।

এই ভাইরাসের সংক্রমণটি ঠাণ্ডা লাগার মত জ্বর, বমি, গা হাত পায়ে ব্যথা দিয়ে শুরু হয়। কখনো কখনো শুধু এইগুলোই হয়। কিন্তু কখনো কখনো শরীরের কোনো অংশ দুর্বল বা অসাড় হয়ে যায়। বেশির ভাগ সময় এটা একটা বা দুটি পায়ে হয়। কিছু দিনের মধ্যে অসাড় পাটি রোগা হয়ে যায়; অন্য পায়ের মত বাড়ে না।



চিকিৎসা :

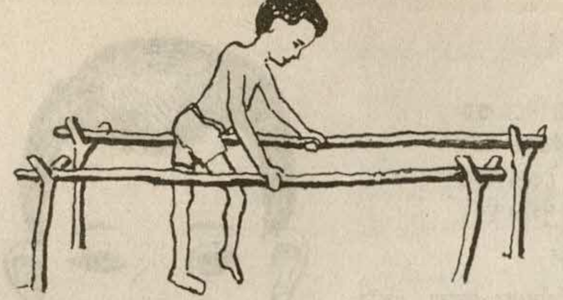
রোগ শুরু হয়ে গেলে, কোনো ওষুধে পক্ষাঘাতটা সারে না। এনটিবায়োটিকে কাজ হয় না। এসপিরিন বা এসেটামিনোফেন দিয়ে আর যেখানে ব্যথা তার ওপর গরম সেঁক দিয়ে ব্যথা কমান। পোলিও চলতে থাকার সময় সেই জায়গায় মালিশ করবেন না। এতে বেশি ক্ষতি হতে পারে।

এড়ানো :

রোগীকে অন্য ছেলেপিলের থেকে দূরে, আলাদা একটা ঘরে রাখুন। রোগীকে প্রতিবার ছোঁয়ার পর মায়ের উচিত নিজের হাত ধুয়ে ফেলা। পোলিও এড়াবার সব থেকে ভালো উপায় হল পোলিওর টিকে।

সব ছেলেপিলে পোলিওর টিকে নিশ্চয় যেন পায়
দুই, তিন আর চারমাসে যেন পোলিওর ড্রপ খায়।

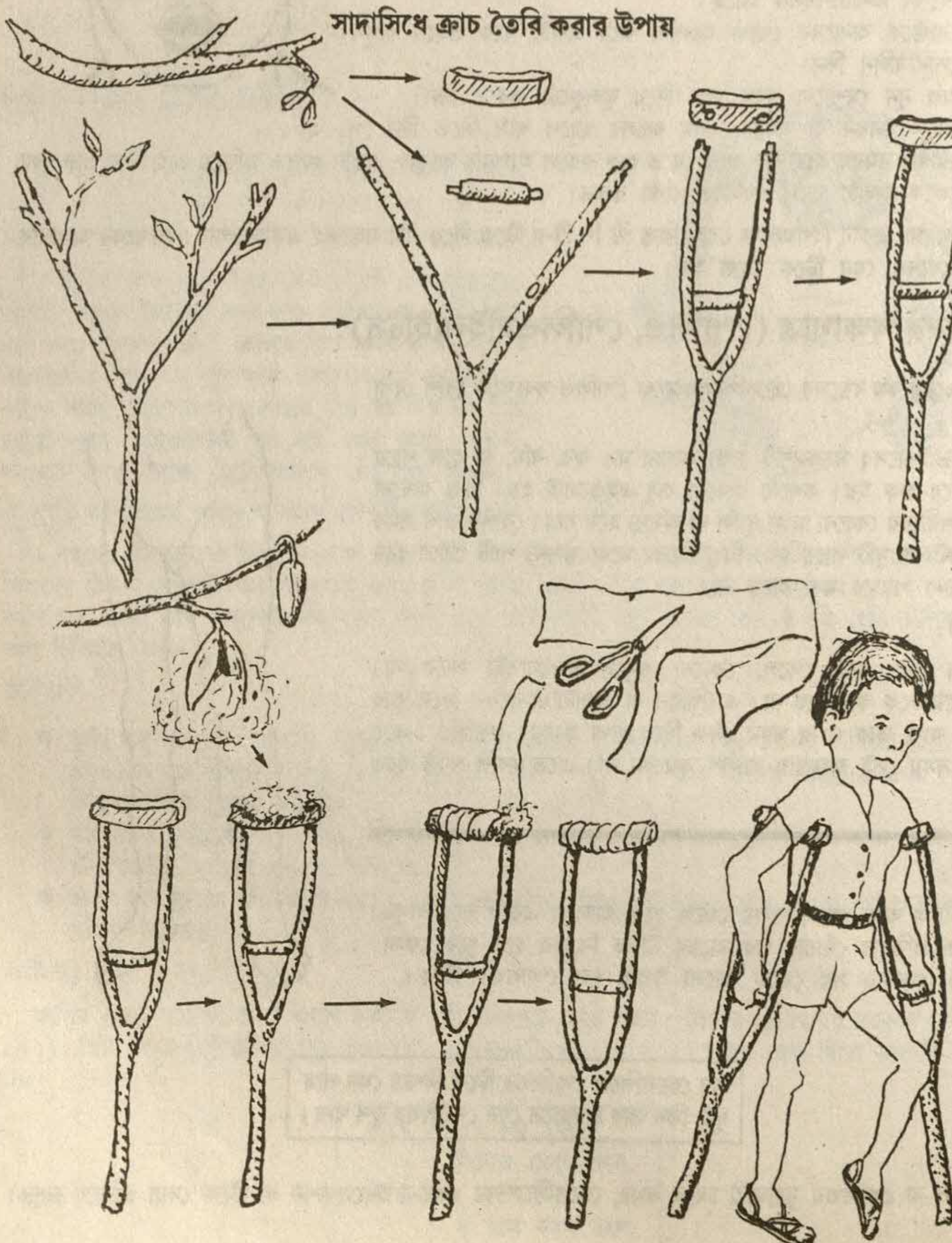
বর্ষাকালে বা পোলিওর মহামারী চলার সময়, ছেলেপিলেদের কোনো ইনজেকশন বা টিকে দেয়া এড়িয়ে চলুন।



পোলিও হয়ে পঙ্গু হয়ে যাওয়া শিশুর পুষ্টিকর খাবার খাওয়া উচিত; আর শরীরের বাকি পেশীগুলি শক্ত করার জন্যে ব্যায়ামও করা উচিত। প্রথম বছরে খানিকটা শক্তি ফিরে আসতে পারে।

শিশু যতটা ভালোভাবে পারে, তাকে ততটা হাঁটতে শিখতে সাহায্য করুন। ধরবার জন্যে এইভাবে দুটি ডাণ্ডা লাগান। পরে তাকে কয়েকটা ক্রাচ (হাঁটবার জন্যে বিশেষ লাঠি) তৈরি করে দিন।

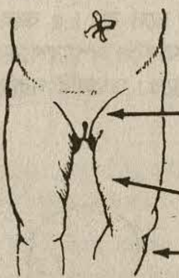
সাদাসিধে ক্রাচ তৈরি করার উপায়



ছেলেপিলে যে সব সমস্যা নিয়ে জন্মায়

সরে যাওয়া পাছা :

কয়েকজন শিশু সরে যাওয়া পাছা নিয়ে জন্মায়—পাছার হাড়ের গাঁট থেকে পাটা সরে আসে। এটা মেয়েদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। সময়ে যত্ন নিলে, চিরকালের জন্যে ক্ষতি হওয়া আর খুঁড়িয়ে চলাটা এড়ানো যায়। কাজেই, জন্মের প্রায় ১০ দিন পর সব শিশুকে পরীক্ষা করে দেখা উচিত তাদের পাছা সরে গেছে কিনা।



১· দুটি পা মিলিয়ে দেখুন। একটা পাছা সরে গিয়ে থাকলে, সেই দিকটাতে এইগুলি দেখা যেতে পারে:

শরীরের যে দিকটা সরে গেছে সেদিকের এই অংশটা ওপরের পা দিয়ে কিছুটা ঢাকা থাকে।

এইখানে খাঁজ কম থাকে।

এইপাটা ছোট দেখায় বা অস্বাভাবিক ভাবে বেঁকে থাকে।

২· দুটি পা হাঁটু মুড়িয়ে এইভাবে ধরুন,



তারপর এইভাবে বড় করে ফাঁক করে দিন।



যদি একটা পা বেশি ফাঁক না করা যায় অথবা, বড় করে ফাঁক করলে লাফিয়ে বা খট করে ওঠে তাহলে সেই দিকের পাছাটা সরে গেছে।

চিকিৎসা:

শিশুর হাঁটু দুটি উঁচু করিয়ে আর ফাঁক করিয়ে রাখুন:

অনেকগুলি কোলোট দিয়ে পুরু করে দিয়ে এইভাবে



অথবা (শিশু যখন ঘুমোয়) তার কোলোটে সেফটিপিন দিয়ে পা দুটি এইভাবে বিছানায় আটকে

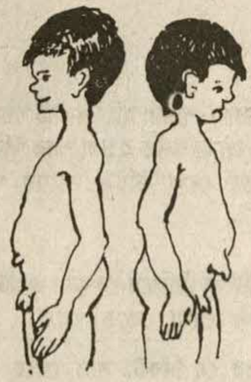


অথবা এইরকম করে



যে সব অঞ্চলে মায়েরা তাদের শিশুদের পা ফাঁক করিয়ে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, সেখানে সাধারণতঃ কোনো চিকিৎসার দরকার হয় না।

নাভির হার্নিয়া (উঁচু হয়ে বেরিয়ে থাকা নাই) :

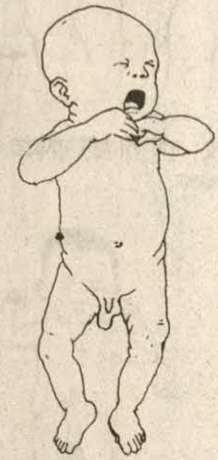


এইভাবে নাই বেরিয়ে থাকাটা কোনো সমস্যা নয়। কোনো ওষুধের বা চিকিৎসার দরকার হয় না। পেটের চারপাশ ঘিরে একটা কাপড় শক্ত করে বেঁধে রাখলে কোনো কাজ হয় না।

এমন কি নাভির এইরকম একটা বড় হার্নিয়াতেও কোনো বিপদ নেই—এগুলো প্রায়ই নিজের থেকেই চলে যায়। ৫ বছর বয়সের পরেও থাকলে অপারেশনের দরকার হতে পারে। ডাক্তারি পরামর্শ নিন।

ফুলে যাওয়া অণ্ডকোষ (হাইড্রোসিল অথবা হার্নিয়া)

যদি কোনো শিশুর অণ্ডকোষের থলির এক দিকটা ফুলে যায় সেটা সাধারণতঃ দুটি কারণে হতে পারে—অণ্ডকোষের থলিটি কোনো তরল জিনিসে ভরে যাওয়া (হাইড্রোসিল); কিংবা থলির ভেতরে অন্ত্রের একটা ফাঁস ঢুকে যাওয়া (হার্নিয়া)।



এ দুটির মধ্যে কোনটা হয়েছে তা বার করার জন্যে ফোলার ওপর টর্চের আলো ফেলুন।

যদি আলোটা সহজেই উল্টোদিক থেকে দেখা যায় তবে হয়তো **হাইড্রোসিল** হয়েছে।

যদি আলোটা উল্টোদিক থেকে দেখা না যায়, আর শিশু কাঁদলে বা কাশলে ফোলাটা বাড়ে তবে ওটা **হার্নিয়া**।

কখনো কখনো হার্নিয়ার ফোলাটা শিশুর অণ্ডকোষের থলির ভেতরে না হয়ে সেটার ওপরে একপাশে হয়।



হাইড্রোসিল, সাধারণতঃ সময়ে, চিকিৎসা ছাড়াই নিজে থেকে চলে যায়। এক বছরের বেশি সময় ধরে থাকলে ডাক্তারি পরামর্শ নেবেন।



হার্নিয়া হলে অপারেশন করবার দরকার হয় (পৃঃ ২১৫)।



ফুলে যাওয়া লিমফের গুটি থেকে এটা বোঝা যায়, (পৃঃ ১০১) কারণ শিশু কাঁদলে বা তাকে খাড়া করে ধরলে হার্নিয়াটা ফুলে ওঠে ; সে চুপচাপ শুয়ে থাকলে ওটা মিলিয়ে যায়।

জড়বুদ্ধি, কালা বা বিকৃত ছেলেপিলে

কখনো কখনো বাপ মায়ের এমন শিশু জন্মায়, যে জন্ম থেকেই কালা বা **জড়বুদ্ধি** হয়। অথবা **জন্মের খুঁত** (শরীরের কোনো অংশে বিকৃতি) নিয়ে জন্মায়। প্রায়ই, এগুলোর কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কাউকে দোষ দেয়া উচিত নয়। সাধারণতঃ এগুলো দৈবাৎ হয়ে গেছে বলেই মনে হয়।

তবে, কতকগুলো ব্যাপারে শিশুর জন্মের খুঁতের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। **বাপ মা যদি কয়েকটি সাবধানতা নেয়, তবে তাদের সন্তানের জন্ম থেকে কোনো গোলমাল হবার ভয় কম থাকে।**

১· পোয়াতি অবস্থায় মায়ের **পুষ্টিকর খাবারের অভাব** হলে, তার শিশুরা জড়বুদ্ধি হতে পারে বা খুঁত নিয়ে জন্মাতে পারে।

সুস্থ ছেলেপিলের জন্ম দিতে হলে পোয়াতি মেয়েদের পুষ্টিকর খাবার খেতেই হবে (পৃঃ ১২৮)।

২· কোনো পোয়াতি মেয়ের খাবারে **আয়োডিনের অভাব** হলে তার শিশুর '*ক্রেটিনিজম*' হতে পারে।

শিশুর মুখ ফোলা ফোলা হয়ে তাকে বোকাটে দেখায়। তার জিভ বাইরে ঝুলে থাকে, কপালে লোমও থাকতে পারে। সে দুর্বল হয়, ভালো করে খায় না, কম কাঁদে আর প্রচুর ঘুমোয়। এইরকম শিশু জড়বুদ্ধি হয়, কালাও হতে পারে। স্বাভাবিক শিশুদের থেকে সে দেরিতে হাঁটতে আর কথা বলতে শুরু করে।



ক্রেটিনিজম

সন্তানের ক্রেটিনিজম হওয়া এড়াতে, পোয়াতি মেয়েদের উচিত সাধারণ নুনের বদলে আয়োডিন দেয়া নুন খাওয়া (পৃঃ ১৫২)।

যদি আপনার শিশুর ক্রেটিনিজম হয়ে থাকতে পারে বলে সন্দেহ হয়, তবে তাকে তখনি স্বাস্থ্যকর্মী বা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। যত তাড়াতাড়ি তাকে বিশেষ ওযুধ (থাইরয়েড) দেয়া হবে সে তত বেশি স্বাভাবিক হবে।

৩· মা পোয়াতি অবস্থায় **ধূমপান** করলে বা **বেশি মদ্যপান** করলে তার শিশুরা ছোট হয়ে জন্মায়, বা তাদের অন্য সমস্যাও হয় (পৃঃ ১৭৮)। বেশি মদ খাবেন না বা বিড়ি সিগারেট খাবেন না—বিশেষ করে পোয়াতি অবস্থায়।

৪· মায়ের **৩৫ বছর বয়স হয়ে যাবার পর** শিশু জন্মালে, সেই শিশুর খুঁত থাকার সম্ভাবনা বেশি থাকে। মঙ্গোলিজম বা ডাউনের রোগ, যেটা কতকটা ক্রেটিনিজমের মত দেখায়, সেটা বিশেষ করে বেশি বয়সের মায়েদের শিশুদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

ভেবেচিন্তে পরিবার পরিকল্পনা করুন, যাতে ৩৫ বছর বয়সের পর আর ছেলেপিলে না হয় (পরিচ্ছেদ ২০)।

৫· **অনেক রকম ওযুধ** পোয়াতি মায়ের পেটে গড়ে ওঠা শিশুর ক্ষতি করতে পারে।

পোয়াতি অবস্থায় যতটা সম্ভব কম ওযুধ ব্যবহার করবেন; যেগুলি নিরাপদ বলে জানেন, দরকার হলে শুধু সেগুলিই ব্যবহার করবেন।

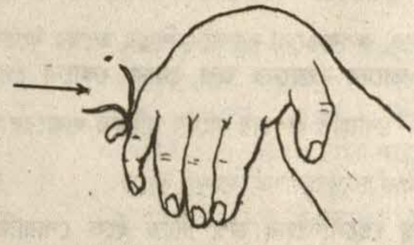
৬· **বাবা আর মায়ের মধ্যে রক্ত সম্বন্ধ থাকলে** (যেমন, মাসতুতো, মামাতো, পিসতুতো বা জ্যাঠতুতো, খুড়তুতো ভাইবোন হলে) ছেলেপিলের খুঁত বা জড়বুদ্ধি হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। **ট্যারা চোখ, হাত বা পায়ে বাড়তি আঙুল, নুলো পা, চেরা ঠোঁট আর গন্নাকাটা,** এগুলি বেশি দেখা যায়।

এইগুলির এবং আরো অন্য সব সমস্যার সম্ভাবনা কমাতে হলে নিকট আত্মীয়কে বিয়ে করবেন না। তাছাড়া, যদি আপনার একটির বেশি সন্তানের জন্মের খুঁত হয়, তবে আর ছেলেপিলে না হওয়াই ভালো (পরিবার পরিকল্পনা পরিচ্ছেদ ২০)।

আপনার শিশু যদি কোনো জন্মের খুঁত নিয়ে জন্মায়, তাকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। এগুলির জন্যে প্রায়ই কিছু করা যায়।

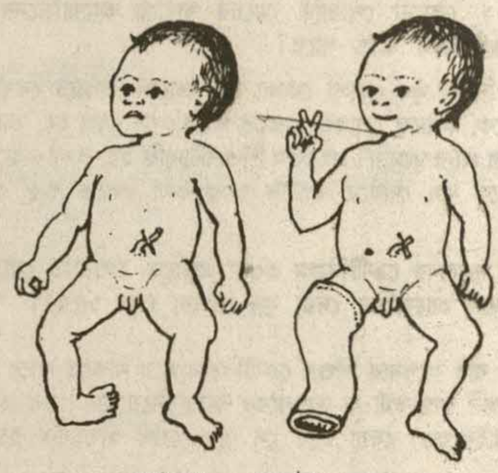
- টেরা চোখের জন্য পৃঃ ২৬৯ দেখুন।

- যদি হাত বা পায়ের বাড়তি আঙুলটা খুব ছোট হয় আর তার ভেতরে হাড় না থাকে, তবে সেটার চারপাশে খুব শক্ত করে একটা সুতলি বেঁধে দিলে সেটা শুকিয়ে খসে যাবে। সেটা যদি আরো বড় হয় আর তার ভেতরে হাড় থাকে, তবে হয় যেমন আছে থাকতে দিন, অথবা অপারেশন করিয়ে বাদ দিইয়ে দিন।



- যদি কচি বাচ্চার পা দুটি ভেতর দিকে ঘোরানো থাকে বা সেটার গড়নে খুঁত থাকে (নুলো পা), তবে পা দুটিকে বেঁকিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় আনার চেষ্টা করুন। যদি এটা সহজে করা যায়, তবে প্রতিদিন কয়েকবার করে করবেন। দুটি (বা একটি) পায়েরই ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে ওঠা উচিত।

যদি শিশুর পা বেঁকিয়ে স্বাভাবিক করতে না পারা যায়, তবে তাকে তখনি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে শিশুর পা দুটি কাস্টের মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করা যাবে। সবথেকে ভালো ফল পেতে হলে **জন্মের ২ দিনের মধ্যেই এটা করা দরকার।**



নুলো পা *কাস্টের মধ্যে*

- যদি শিশুর ঠোঁট বা মুখের তালুটা চেরা হয়, তবে তার বুকের দুধ টানতে অসুবিধে হতে পারে; তাকে চামচ বা ড্রপারে করে খাওয়াতে হতে পারে। অপারেশন করে শিশুর ঠোঁট বা তালু প্রায় স্বাভাবিকের মতো দেখতে করে দেয়া যায়। সাধারণতঃ অপারেশন করার পক্ষে শিশুর সব থেকে ভালো বয়স হল—ঠোঁটের বেলায় ৪ থেকে ৬ মাস আর তালুর বেলায় ১৮ মাস।



চেরা ঠোঁট আর গন্নাকাটা

৭· **প্রসবের সময়ের গণ্ডগোল** থেকে কখনো কখনো শিশুর **মগজে জখম** হয়, এবং তা থেকে সে **স্প্যাস্টিক** হয়ে যায় কিংবা তার **তড়কা** হয়। জন্মের পর শিশু যদি দেরিতে শ্বাস নেয়, কিংবা শিশু জন্মাবার আগে ধাই যদি মাকে কোনো অকসিটসিকের ইনজেকশন দিয়ে থাকে (পৃঃ ৩১২) তবে এইরকম জখমের ভয় বেশি থাকে।

সাবধানে ধাই বেছে নেবেন—শিশু প্রসব হয়ে যাবার আগে আপনার ধাইকে কোনো অকসিটসিক দিতে দেবেন না।

স্প্যাস্টিক শিশু (মগজের পক্ষাঘাত)



পা দুটি কাঁচির মত আড়াআড়ি

স্প্যাস্টিক শিশুর পেশীগুলি আঁট আর কড়া হয়—সেগুলি তার নিজের বশে থাকে না। তার মুখ, ঘাড় বা সারা শরীরটা মুচড়ে যেতে পারে, তার নড়াচড়া ঝাঁকি দিয়ে হতে পারে। প্রায়ই তার পায়ের ভেতরদিকের পেশীগুলি আঁট হয়ে পা দুটি কাঁচির মত আড়াআড়ি হয়ে যায়।

প্রসবের সময় শিশুকে স্বাভাবিক বা হয়তো ন্যাতপেতে মনে হয়। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে পেশীগুলি আঁট হয়ে যেতে পারে। এইরকম শিশু জড়বুদ্ধি হতে বা নাও হতে পারে।

মগজের যে জখম থেকে শিশু স্প্যাস্টিক হয়ে যায়, সেটা কোনো ওষুধে সারে না।

কিন্তু এইরকম শিশুর বিশেষ যত্নের দরকার হয়। দরকার হলে, পায়ের বা পায়ের পাতার পেশী আঁট হয়ে যাওয়া এড়াতে, পাছা সরে যাওয়া (পৃঃ ৩৬৩) আর নুলো পায়ের (পৃঃ ৩৬৬) জন্যে যেমন বলা আছে সেই চিকিৎসা করবেন।

শিশুটিকে উবুড় হতে, বসতে আর দাঁড়াতে—তারপর পৃঃ ৩৬২-তে যেমন দেয়া আছে সেইভাবে হাঁটতে শিখতে সাহায্য করুন (পরের পৃষ্ঠা দেখুন)। কথা বলার অসুবিধে থাকলেও তার মাথা পরিষ্কার থাকতে পারে; আর সুযোগ পেলে সে অনেক কিছু শিখতে পারে। **নিজেকে সাহায্য করতে তাকে সাহায্য করুন।**

ছেলেপিলে যাতে জড়বুদ্ধি হয়ে বা জন্মের খুঁত নিয়ে না জন্মায়, তার জন্যে মায়ের কতকগুলি কাজ করা উচিত:

১· মাসতুতো, মামাতো, পিসতুতো, জ্যাঠতুতো বা খুড়তুতো ভাই বা অন্য কোনো নিকট আত্মীয়কে বিয়ে করবেন না।

২· পোয়াতি অবস্থায় যতটা সম্ভব ভালো খাবেন: যতটা মাছ, মাংস, ডিম, ফল আর শাকসবজি পারেন।

৩· সাধারণ নুনের বদলে আয়োডিন দেয়া নুন খান; বিশেষ করে পোয়াতি অবস্থায়।

৪· পোয়াতি অবস্থায় ধূমপান বা বেশি মদ্যপান করবেন না।

৫· পোয়াতি অবস্থায়, যখনি সম্ভব ওষুধ বাদ দিয়ে চলবেন—যেগুলি নিরাপদ বলে জানেন, শুধু সেগুলি ব্যবহার করবেন।

৬· পোয়াতি অবস্থায়, জার্মান হামের রোগীর থেকে দূরে থাকবেন।

৭· দেখেশুনে ধাই বেছে নেবেন—শিশু জন্মাবার আগে ধাই বা অন্য কেউ যেন মাকে কোনো অকসিটসিক না দেয় তা দেখবেন।

৮· শিশু হলদে (ন্যাবা) হয়ে যেতে শুরু করলে ডাক্তারি সাহায্য নেবেন।

৯· একটির বেশি সন্তানের জন্মের খুঁত থাকলে আর ছেলেপিলের জন্ম দেবেন না (পরিবার পরিকল্পনা পৃঃ ৩২৯ দেখুন)।

১০· ৩৫ বছর বয়স হয়ে গেলে আর ছেলেপিলের জন্ম দেবেন না।

জীবনের প্রথম কয়েক মাসের মধ্যে শিশুর জড়বুদ্ধি হওয়া :

কয়েকজন ছেলেপিলে সুস্থ হয়ে জন্মালেও ঠিকমত বাড়ে না। যথেষ্ট পুষ্টিকর খাবার না খাওয়ার ফলে তারা জড়বুদ্ধি হয়ে যায়। অন্য যে কোনো বয়সের থেকে জীবনের প্রথম কয়েক মাসে মানুষের মগজ বেশি তাড়াতাড়ি বাড়ে। এই কারণে এই বয়সের শিশুর পুষ্টির দরকারটা খুবই বেশি। শিশুর পক্ষে বুকের দুধ সব থেকে ভালো খাবার (শিশুর সব থেকে ভালো খাবার পৃঃ ১৪১ দেখুন)।

ছেলেপিলেকে নতুন জিনিস শিখতে সাহায্য করা :

শিশু যখন বড় হতে থাকে, তখন তাকে যা শেখানো হয়, তার থেকে সে কিছুটা শেখে। পরে, স্কুলে সে যে জ্ঞান বা বিদ্যা শেখে সেগুলি তাকে আরো অনেক কিছু বুঝতে বা করতে সাহায্য করে। স্কুলটা জরুরি হতে পারে।

কিন্তু, ছেলেপিলে বাড়িতে, জলে, জঙ্গলে বা মাঠে ঘাটে অনেক কিছু শেখে। দেখে, শুনে, অন্যদের যা করতে দেখে সেগুলো নিজে করতে চেষ্টা করেও তারা শেখে। লোকে তাদের যা বলে, তা থেকে ছেলেপিলে যা শেখে, তার থেকে তারা অনেক বেশি শেখে লোকের কাজকর্ম দেখে। **দয়ামায়া, দায়িত্বজ্ঞান, সবকিছু ভাগ করে নেয়া—শিশুর শেখার মত এইরকম কতকগুলো খুব জরুরি জিনিস শুধু ভালো উদাহরণ দিয়েই শেখানো যায়।**

ছেলেপিলে ঠেকে শেখে। তদের নিজে নিজে সব কিছু করতে শেখা দরকার—যদিও তা করতে গিয়ে তারা অনেক ভুল করতেই পারে। শিশু যখন খুব ছোট থাকে তখন তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। কিন্তু সে বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিজেকে দেখাশোনা করতে শেখাবেন। তাকে কিছুটা দায়িত্ব দেবেন। তার মতামত আপনার থেকে আলাদা হলেও সেগুলিকে সম্মান করে চলবেন।

শিশু যখন ছোট থাকে, তখন সে কেবল নিজের দরকার মেটানোর কথাই ভাবে। অন্যদের সাহায্য করায় বা পরের জন্যে কাজ করায় যে আনন্দ, সেটা সে পরে ধীরে ধীরে আবিষ্কার করে। ছেলেপিলে সাহায্য করতে এলে তা আগ্রহ দেখিয়ে নেবেন—সেটা আপনার কাছে কত বড় জিনিস তা তাদের বুঝতে দিন।

যে সব ছেলেপিলে ভয় পায় না, তারা অনেক প্রশ্ন করে। যদি বাবা মায়েরা, মাষ্টারমশাইরা, দিদিমনিরা এবং অন্য সকলে সময় করে তাদের প্রশ্নের পরিষ্কার আর সত্যি জবাব দেন; আর উত্তরটা না জানা থাকলে বলে দেন যে জানেন না, তাহলে ছেলেপিলেরা নির্ভয়ে প্রশ্ন করে চলবে; আর বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের চারপাশটা বা গ্রামটা বাস করার পক্ষে আরো ভালো জায়গা করে তুলবে।



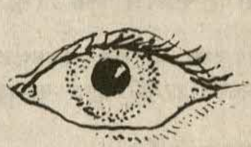
পরিচ্ছেদ

২২ বয়স্থ লোকদের স্বাস্থ্য আর রোগ

যে সব রোগ বেশি বয়সের লোকদের মধ্যে বেশি দেখা যায় সেগুলির এড়ানো আর চিকিৎসার কথা এই পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে।

অন্যান্য পরিচ্ছেদে যে সব সমস্যার কথা বলা হয়েছে তার সারাংশ

দেখার অসুবিধে : (পৃঃ ২৬৮)



৪০ বছর বয়সের পর অনেকের কাছের জিনিস পরিষ্কারভাবে দেখতে অসুবিধে হয়। তাদের চালসে পড়তে থাকে। চশমা নিলে প্রায়ই কাজ হয়।

৪০ বছরের বেশি বয়সের প্রত্যেকের উচিত গ্লকোমার লক্ষণ হচ্ছে কি না সেদিকে নজর রাখা। চিকিৎসা না করে ফেলে রাখলে গ্লকোমা থেকে লোকে অন্ধ হয়ে যেতে পারে। গ্লকোমার লক্ষণ (পৃঃ ২৬৭) দেখা দিলেই ডাক্তারি সাহায্য নেয় উচিত।

ছানি (পৃঃ ২৭০) আর চোখের সামনে মাছি ঘোরার (ছোট্ট ছোট্ট ঘুরে বেড়ানো ফুটকি পৃঃ ২৭২) মত সমস্যাও বুড়ো বয়সে প্রায়ই দেখা যায়। ছোট্ট একটা অপারেশন করে ছানি সহজেই সারিয়ে নেয়া যায়।

দুর্বলতা, ক্লান্তি আর খাওয়াদাওয়ার অভ্যেস :

যখন বয়স কম ছিল তখনকার থেকে, বুড়োবয়সে যে লোকের কাজের ক্ষমতা কম থাকবে, এটা তো বোঝাই যায়। কিন্তু ভালো করে না খেলে তারা আরো দুর্বল হয়ে পড়বে। যদিও বয়স্থ লোকেরা খুব বেশি খায় না, তবু তাদের রোজ কিছুটা করে শরীর গড়ার আর রক্ষা করার খাবার খাওয়া উচিত (পৃঃ ১২৮ থেকে ১৩১)।



পা ফুলে যাওয়া (পৃঃ ২১৪)

এটা নানা রোগ থেকে হতে পারে, কিন্তু বুড়োমানুষদের বেলায় সাধারণতঃ রক্তচলাচল ভালোভাবে না হওয়ার ফলে (পৃঃ ২৫৪) অথবা হার্টের গোলমাল থেকে (পৃঃ ৩৭১) হয়। কারণ যাই হোক **পা দুটি উঁচু করে রাখাই সবথেকে ভালো চিকিৎসা।** হাঁটলেও কাজ হয়—কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে বা পা ঝুলিয়ে বসে থাকবেন না। যখনি পারবেন পা দুটি উঁচু করে রাখবেন।

পায়ে বা পায়ের পাতায় পুরোনো ঘা (পৃঃ ২৮)

এগুলি রক্ত চলাচল কম হওয়ার ফলে হতে পারে—সেটা প্রায়ই ভেরিকোজ শিরা (পৃঃ ২১৩) থেকে হয়। কখনো কখনো বহুমূত্রও (পৃঃ ১৪৯) কতকটা কারণ হয়। অন্য সব সম্ভাবনার জন্যে পৃঃ ২৮ দেখুন।



রক্ত চলাচল ভালো না হওয়ার ফলে যে সব ঘা হয়, সেগুলি সারতে অনেক সময় লাগে।

ঘাটা যতটা সম্ভব পরিষ্কার রাখবেন। ফোটানো জল আর নরম সাবান দিয়ে ধুয়ে ব্যাণ্ডেজটা ঘনঘন বদলে দেবেন। সংক্রমণের লক্ষণ দেখা দিলে পৃঃ ১০১-এ যেমন নির্দেশ দেয়া আছে সেইভাবে চিকিৎসা করবেন।

বসে থাকা বা শোবার সময় পা দুটি উঁচু করে রাখবেন।

পেচ্ছাপ করায় কষ্ট : (পৃঃ ২৭৯)

যে সব বয়স্থ লোকের পেচ্ছাপ করতে অসুবিধে হয় বা যাদের ফোঁটায় ফোঁটায় বা গড়িয়ে গড়িয়ে পেচ্ছাপ হয়, তারা হয়তো প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ড বড় হয়ে যাওয়ার রোগে ভুগছে। পৃঃ ২৭৯ দেখুন।

পুরোনো কাশি : (পৃঃ ২০৫)

যে সব বয়স্থ লোক বেশি কাশে তাদের ধূমপান বন্ধ করা আর ডাক্তারি পরামর্শ নেয়া উচিত। কম বয়সে যক্ষ্মার লক্ষণ দেখা দিয়ে থাকলে বা কাশির সঙ্গে কখনো রক্ত উঠে থাকলে, তাদের যক্ষ্মাও হতে পারে।



লোকটি যদি বেশি ধূমপান করে আর তার কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠে, তবে তার ফুসফুসের ক্যানসার হয়ে থাকতে পারে।

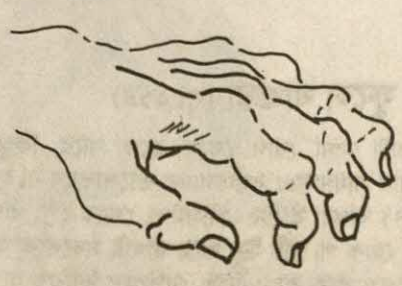
বয়স্থ লোকের কাশির সঙ্গে সাঁই সাঁই করলে বা শ্বাসকষ্ট হলে (হাঁপানি) অথবা তার পাও ফুলে গেলে তার হার্টের গোলমাল হতে পারে (পরের পৃষ্ঠা দেখুন)।

রিউমাটয়েড আরথ্রাইটিস (গাঁটে ব্যথা) : (পৃঃ ২১০)

অনেক বয়স্থ লোকের আরথ্রাইটিস হয়।

আরথ্রাইটিস হলে এইসব করলে সুবিধে হয়:

- যে সব গাঁটে ব্যথা, সেগুলিকে বিশ্রাম দিন।
- গরম সেঁক দিন (পৃঃ ২৩৩)।
- ব্যথা কমাবার কোনো ওষুধ খান; এসপিরিন সবথেকে ভালো। সাংঘাতিক আরথ্রাইটিস হলে খাবার সোডা, দুধ বা প্রচুর জলের সঙ্গে ২/৩ টি করে এসপিরিন—দিনে ৬ বার পর্যন্ত খাবেন। (কান ভোঁ ভোঁ করতে শুরু করলে, কম খাবেন।)



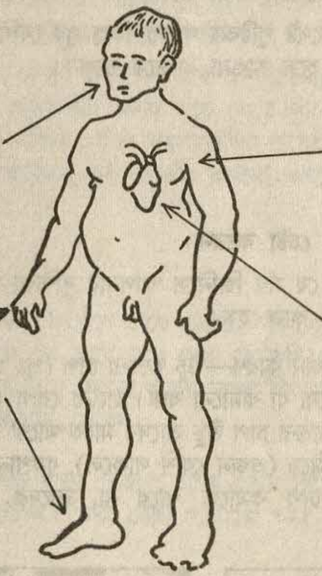
- যে সব গাঁটে ব্যথা সেগুলি যতটা সম্ভব সচল রাখতে নিয়মিত ব্যায়াম করা দরকার।

বুড়ো বয়সের আরো কয়েকটি প্রধান রোগ

হার্টের গোলমাল :

বয়স্থ লোকদের—বিশেষ করে যারা মোটা, যারা ধূমপান করে, বা যাদের রক্তের চাপ উঁচু তাদের—মধ্যে হার্টের রোগ বেশি দেখা যায়।

হার্টের সমস্যার লক্ষণ:

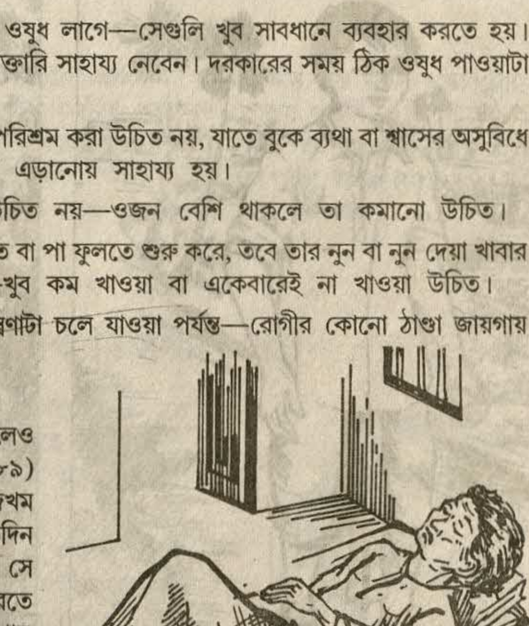


- উৎকণ্ঠা; পরিশ্রমের পর শ্বাসকষ্ট; হাঁপানির মত হঠাৎ কষ্ট—রোগী শুলে সেটা বাড়ে (কার্ডিয়াক হাঁপানি)।
- নাড়ি তাড়াতাড়ি, ক্ষীণ বা অনিয়মিত চলা।
- পা ফোলা--বিকেলের দিকে বাড়ে।
- বুকে, কাঁধে বা ওপর হাতে হঠাৎ যন্ত্রণা—পরিশ্রম করার সময় হয়, কয়েক মিনিট বিশ্রাম করলে আবার চলে যায় (এনজাইনা পেকটোরিস)।
- একটা বিরাট ওজনে বুকটা পিষে যাবার মত তীব্র যন্ত্রণা; বিশ্রাম নিলে যায় না (হার্ট এটাক)।

চিকিৎসা:

- নানারকম হার্টের রোগে আলাদা আলাদা বিশেষ ওষুধ লাগে—সেগুলি খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হয়। কারো হার্টের গোলমাল হয়েছে বলে মনে হলে ডাক্তারি সাহায্য নেবেন। দরকারের সময় ঠিক ওষুধ পাওয়াটা তার পক্ষে জরুরি।
- হার্টের গোলমাল থাকলে লোকের এতোটা কঠিন পরিশ্রম করা উচিত নয়, যাতে বুকে ব্যথা বা শ্বাসের অসুবিধে হয়। তবে নিয়মিত ব্যায়াম করলে হার্ট এটাক এড়ানোয় সাহায্য হয়।
- হার্টের সমস্যা থাকলে তেলা খাবার খাওয়া উচিত নয়—ওজন বেশি থাকলে তা কমানো উচিত।
- যদি কোনো বয়স্থ লোকের হঠাৎ হঠাৎ শ্বাসকষ্ট হতে বা পা ফুলতে শুরু করে, তবে তার নুন বা নুন দেয়া খাবার খাওয়া উচিত নয়। বাকি জীবনটা তার নুন—খুব কম খাওয়া বা একেবারেই না খাওয়া উচিত।
- এনজাইনা পেকটোরিস বা হার্ট এটাক হলে—যন্ত্রণাটা চলে যাওয়া পর্যন্ত—রোগীর কোনো ঠাণ্ডা জায়গায় শান্তভাবে শুয়ে বিশ্রাম নেয়া উচিত।

বুকে ব্যথাটা যদি খুব জোর হয় আর বিশ্রাম নিলেও চলে না যায়, কিংবা রোগীর যদি **শকের** লক্ষণ (পৃঃ ৮৯) দেখা দেয়, তাহলে তার হার্টে হয়তো সাংঘাতিক জখম হয়েছে। রোগীর উচিত—অন্ততঃ এক সপ্তাহ, বা যতদিন তার ব্যথা বা শক থাকে, ততদিন শুয়ে থাকা। তারপর সে উঠে বসতে বা ধীরে ধীরে নড়াচড়া করতে শুরু করতে পারে, কিন্তু তার একমাস বা তারো বেশি সময় খুব শান্ত হয়ে থাকা উচিত। ডাক্তারি সাহায্য নেবার কথা ভেবে দেখবেন।



এড়ানো: পরের পৃষ্ঠা দেখুন।

যে সব অল্পবয়সী লোক বয়স হলেও সুস্থ থাকতে চায় তাদের জন্যে কয়েকটি কথা

অল্প বয়সে একজন যে ভাবে দিন কাটিয়েছে, যা যা খেয়েছে বা যতটা মদ বা ধূমপান করেছে সেসবের ফলেই তার মাঝ বয়সে বা বেশি বয়সে স্বাস্থ্যের অনেক সমস্যা হয়—এগুলির মধ্যে আছে উঁচু রক্তের চাপ, ধমনী শক্ত হয়ে যাওয়া, হার্টের রোগ আর সন্ন্যাসরোগ। আপনার আরো বেশি দিন বাঁচার আর সুস্থ থাকার সম্ভাবনা বেশি হবে যদি আপনি :

১· **ভালোভাবে খাওয়াদাওয়া করেন**—যথেষ্ট পুষ্টিকর খাবার, কিন্তু খুব বেশি ঝালমশলা দেয়া বা তেলা খাবার নয়। বেশি ওজন বাড়া বা মোটা হয়ে যাওয়া এড়িয়ে চলেন।

২· **বেশি মদ না খান।**

৩· **ধূমপান না করেন।**

৪· **শরীর আর মন চালু রাখেন।**

৫· **যথেষ্ট বিশ্রাম নিতে আর ঘুমোতে চেষ্টা করেন।**

৬· **শরীর মন আলগা করতে শেখেন**; যে সব জিনিসে আপনার দুশ্চিন্তা হয় বা মন বিচলিত হয় সেগুলির এমনভাবে মোকাবিলা করেন যাতে কাজ হয়।

হার্টের রোগ আর সন্ন্যাস রোগের দুটি প্রধান কারণ—উঁচু রক্তের চাপ (পৃঃ ১৪৭) আর ধমনী শক্ত হয়ে যাওয়া (আরটেরিওস্‌ক্লেরোসিস)—সাধারণতঃ এড়ানো বা কমানো যায়। হার্টের রোগ আর সন্ন্যাসরোগ এড়ানোর ব্যাপারে উঁচু রক্তের চাপ কমানোটা জরুরি। যাদের রক্তের চাপ উঁচু তাদের মাঝে মাঝে সেটা মাপিয়ে নিয়ে, কমাবার জন্যে কয়েকটা কাজ করা উচিত। যারা খাওয়া কমিয়ে (ওজন বেশি থাকলে), ধূমপান ছেড়ে দিয়ে, ব্যায়াম বাড়িয়ে আর শরীর-মন আলগা করতে শিখে রক্তের চাপ কমাতে পারে না, তাদের বেলায় রক্তচাপ কমাবার ওষুধে (এনটিহাইপারটেনসিভ) কাজ হতে পারে।



এই দুজন লোকের মধ্যে কার বেশি দিন বাঁচার আর বুড়োবয়সে সুস্থ থাকার সম্ভাবনা বেশি? কার হার্ট এটাক বা সন্ন্যাসরোগে মারা যাবার সম্ভাবনা বেশি? কেন? কটা কারণ আপনি গুনে বলতে পারেন?

স্ট্রোক (সন্ন্যাসরোগ, মগজ আর তার শিরা-ধমনীগুলিতে দুর্ঘটনা, সি ভি এ)



বয়স্থ লোকদের বেলায় সাধারণতঃ মগজের ভেতরে রক্তের ডেলার বা রক্তপাতের ফলে *স্ট্রোক বা সন্ন্যাসরোগ* হয়। *স্ট্রোক (আঘাত)* কথাটা ব্যবহার করা হয় এই জন্যে যে এই রোগটি প্রায়ই কোনো জানান না দিয়েই আঘাত করে। রোগী হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে পারে। প্রায়ই তার মুখ লালচে আর শ্বাস কর্কশ হয়ে যায়, নাড়ি জোরে কিন্তু ধীরে চলে। সে কয়েক ঘণ্টা, বা কয়েকদিন ধরে 'কোমা'তে (অজ্ঞান অবস্থায়) থাকতে পারে।

রোগী যদি বাঁচে, তার কথা বলায়, দেখায় বা চিন্তা করায় অসুবিধে হতে পারে, অথবা তার মুখ আর শরীরের একপাশটা অসাড় হয়ে যেতে পারে। অল্পস্বল্প স্ট্রোকে রোগী অজ্ঞান হয় না—কিন্তু এইসব সমস্যাগুলির কয়েকটা হতে পারে। স্ট্রোক থেকে যে সব অসুবিধে হয় সেগুলি কখনো কখনো সময়ের সঙ্গে কমে যায়।

চিকিৎসা:

রোগীর মাথা পায়ের থেকে সামান্য উঁচুতে রেখে তাকে শুইয়ে দিন। সে যদি অজ্ঞান হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তার মাথা পেছনদিকে এককাৎ করে হেলিয়ে দিন, যাতে তার লালা (বা বমি) ফুসফুসে না ঢুকে গিয়ে মুখ দিয়ে গড়িয়ে বেরিয়ে যায়। অজ্ঞান অবস্থায় তাকে মুখ দিয়ে কোনো খাবার, তরল জিনিস বা ওষুধ দেবেন না (অজ্ঞান রোগী—পৃঃ ৯০ দেখুন)। সম্ভব হলে ডাক্তারি সাহায্য নেবেন।

স্ট্রোকের পর, রোগী যদি কিছুটা অসাড় থাকে, তাহলে তাকে একটা লাঠি দিয়ে হাঁটতে, আর তার সুস্থ হাতটা দিয়ে নিজের কাজগুলি করতে সাহায্য করবেন। তার বেশি পরিশ্রম আর রাগ এড়িয়ে চলা উচিত।

এড়ানো: পৃঃ ৩৭২ দেখুন।

দ্রষ্টব্য: যদি কোনো কম বয়সের বা মাঝ বয়সের লোকের মুখের একদিকটা হঠাৎ অসাড় হয়ে যায়—অথচ স্ট্রোকের অন্য কোনো লক্ষণ না থাকে, তবে সেটা মুখের নার্ভের সাময়িক পক্ষাঘাত (বেলস পলসি) হতে পারে। এটা সাধারণতঃ কয়েক সপ্তাহ বা মাসের মধ্যে নিজে থেকেই চলে যায়। কারণটা সাধারণতঃ জানা যায় না। কোনো চিকিৎসার দরকার হয় না, তবে গরম ভেজা সেঁকে উপকার হতে পারে। একটা চোখ পুরো বন্ধ না হলে, সেটা যাতে শুকিয়ে গিয়ে জখম না হয়, তার জন্যে রাত্রে ব্যাণ্ডেজ দিয়ে চোখটা বন্ধ করে রাখবেন।

কালা হয়ে যাওয়া, কান ভোঁ ভোঁ আর মাথা ঝিমঝিম করা



কেউ যখন কোনো যন্ত্রণা বা অন্য লক্ষণ ছাড়াই ধীরে ধীরে কালা হয়ে যায়—সেটা সাধারণতঃ সারানো যায় না, যদিও শোনার যন্ত্রে সাহায্য হতে পারে। কখনো কখনো কানে সংক্রমণ থেকেও লোকে কালা হয়ে যায় (পৃঃ ৩৫৫)।

যদি কোনো বয়স্থ লোক একটা কিংবা দুটো কানে কালা হয়ে যায়, তার সঙ্গে যদি তার প্রচণ্ড মাথা ঝিমঝিম করে, আর কানে জোর ঘণ্টা বাজার শব্দ শোনা যায় বা কান ভোঁ ভোঁ করে, তবে তার হয়তো মেনিয়ারের রোগ হয়েছে। তার ডাইমেনহাইড্রিনেট *(ড্রামামাইন)*-এর মত কোনো এনটিহিস্টামাইন খেয়ে, যতক্ষণ না লক্ষণগুলো চলে যায় ততক্ষণ শুয়ে থাকা উচিত। তার খাবারে একটুও নুন থাকা উচিত নয়। সে তাড়াতাড়ি সেরে না উঠলে বা সমস্যাটা আবার হলে তখনি ডাক্তারি পরামর্শ নেয়া উচিত।

ঘুমের অভাব (অনিদ্রা)

বয়স্থ লোকদের স্বাভাবিকভাবেই কমবয়সীদের থেকে কম ঘুমের দরকার হয়। শীতের বড় রাতগুলিতে তারা না ঘুমিয়েই অনেক ঘণ্টা কাটাতে পারে।

কয়েকটা ওষুধে ঘুম আসার সুবিধে হয়, কিন্তু নিতান্ত দরকার না হলে সেগুলি ব্যবহার না করাই ভালো।

ঘুমের জন্যে কয়েকটি পরামর্শ দেয়া হচ্ছে:

- দিনের বেলা যথেষ্ট পরিশ্রম করবেন।
- কফি বা দুধ ছাড়া চা খাবেন না—বিশেষ করে বিকেলে বা সন্ধ্যেবেলায়।
- ঘুমোতে যাবার আগে এক গেলাস অল্প গরম দুধ বা মধু দেয়া দুধ খাবেন।
- ঘুমোতে যাবার আগে অল্প গরম জলে স্নান করবেন।
- এতেও যদি ঘুমোতে না পারেন, তবে ঘুমোতে যাবার আধঘণ্টা আগে একটা এনটিহিস্টামাইন—যেমন প্রোমেথাজাইন (*ফেনারগান* পৃঃ ৪১৯) বা ডাইমেনহাইড্রিনেট (*ড্রামামাইন* পৃঃ ৪২০) খাবেন।

যে সব রোগ ৪০ বছরের বেশি বয়সের লোকদের মধ্যে বেশি দেখা যায়

লিভারের (যকৃত) সিরোসিস:

৪০ বছরের বেশি বয়সের যে সব লোক অনেক বছর ধরে ঠিকমত খাচ্ছে না আর প্রচুর মদ খেয়ে চলেছে, সাধারণতঃ তাদেরই সিরোসিস হয়।



লক্ষণ:

- হেপাটাইটিসের মতই,—দুর্বলতা, খিদের অভাব, পেটের গোলমাল আর পেটের ডানদিকে লিভারের কাছে ব্যথা দিয়ে—সিরোসিস শুরু হয়।
- রোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগী আরো রোগা হয়ে যেতে থাকে। তার রক্তবমি হতে পারে। সাংঘাতিক অবস্থায় পা ফুলে যায়, পেটেও জল হয়ে সেটা ফুলে শেষে একটা জালার মত দেখায়। চোখ আর চামড়া হলদেটে (ন্যাবা) হয়ে যেতে পারে।

চিকিৎসা:

সিরোসিস সাংঘাতিক হলে, তা সারানো শক্ত। কোনো ওষুধেই বিশেষ কাজ হয় না। সাংঘাতিক সিরোসিস হলে বেশির ভাগ রোগীই মারা যায়। যদি বাঁচতে চান, তবে **সিরোসিসের প্রথম লক্ষণ দেখা দিলেই** নিচের কাজগুলি করবেন:

- আর কখনো মদ খাবেন না! মদ লিভারকে বিষিয়ে দেয়।
- যতটা পারেন ভালোভাবে খাওয়াদাওয়া করবেন: প্রোটিন আর ভিটামিন ভরা খাবার খাবেন।
- সিরোসিসের রোগী যদি ফুলে যায়, তবে তার খাবারের সঙ্গে একটুও নুন খাওয়া উচিত নয়।

এই রোগ এড়ানো সহজ: **মদ খাবেন না।**

গলব্লাডারের (পিত্তকোষের) রোগ :

পিত্তকোষ হচ্ছে লিভারের সঙ্গে আটকানো একটা ছোট থলি। এতে পিত্তি বলে একটা তেতো, সবুজ রস জমে—সেটা স্নেহজাতীয় খাবার হজম করতে সাহায্য করে। ৪০ বছরের বেশি বয়সের মোটা মেয়েদের মধ্যে পিত্তকোষের রোগ সবথেকে বেশি দেখা যায়।



লক্ষণ :

- পেটে—পাঁজরের খাঁচার ডানধারে—তীব্র ব্যথা। কখনো কখনো ব্যথাটা ডানদিকের পিঠের ওপরদিকে পৌঁছে যায়।
- বেশি ঝালমশলা দেয়া বা তেলা খাবার খাওয়ার এক ঘণ্টা বা আর একটু পরে ব্যথাটা উঠতে পারে। সাংঘাতিক ব্যথা থেকে বমি হতে পারে।
- কখনো কখনো জ্বর হয়।
- দু-এক সময় চোখ দুটি হলদে (ন্যাবা) হয়ে যেতে পারে।

চিকিৎসা :

- বেলাডোনা বা ব্যথা কমাবার অন্য কোনো ওষুধ—যেমন ব্যারালগান খান (পৃঃ ৪১৫)। সাধারণতঃ কড়া ব্যথার ওষুধের দরকার হয় (এসপিরিনে কাজ না হতে পারে)।
- রোগীর জ্বর হলে তার টেট্রাসাইক্লিন (পৃঃ ৪০০) বা এমপিসিলিন (পৃঃ ৩৯৯) খাওয়া উচিত।
- তেলা খাবার খাবেন না। যাদের ওজন বেশি (মোটা) তাদের কম খেয়ে ওজন কমানো উচিত।
- রোগ সাংঘাতিক বা পুরোনো হলে ডাক্তারি সাহায্য নেবেন। কখনো কখনো অপারেশনের দরকার হয়।

এড়ানো :

যে সব মেয়ের ওজন বেশি তাদের তা কমানো উচিত (পৃঃ ১৪৮)। ঝালমশলা দেয়া, মিষ্টি আর তেলা খাবার এড়িয়ে চলবেন—আর, খুব বেশি খাবেন না।

পিত্তদোষ :

অনেক দেশে আর অনেক ভাষাতে বদমেজাজী লোকদের পিত্তদোষ আছে বলা হয়। অনেকে বিশ্বাস করে যে কারো পিত্তি বেড়ে গেলে যখন তখন তার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

সত্যি বলতে, বেশির ভাগ বদমেজাজী লোকের পিত্তকোষের বা পিত্তির কোনো দোষ থাকে না। তবে, যাদের পিত্তকোষের রোগ আছে তারা প্রায়ই সেই সাংঘাতিক ব্যথাটা আবার কখন হবে বলে ভয়ে ভয়ে থাকে বলে কখনো কখনো খিটখিটে বা নিজেদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে যায়।

মৃত্যুকে মেনে নেয়া

সাধারণতঃ বুড়োমানুষেরা নিজেদের এগিয়ে আসা মৃত্যুকে মেনে নিতে যতটা তৈরি থাকে,—তাদের যারা ভালোবাসে তারা ততটা থাকে না। যে সব লোক পরিপূর্ণভাবে বেঁচেছে তারা সাধারণতঃ মরতে ভয় পায় না। যতই হোক, মৃত্যু তো জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি।

আমরা প্রায়ই একটা ভুল করি। যে মরতে চলেছে, তাকে যতদিন পারা যায়—যে ভাবেই হোক, বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করি। কখনো কখনো, এতে লোকটির নিজের আর তার বাড়ির লোকের ভোগান্তি আর ধকল আরো বেড়ে যায়। এমন সময় আসে যখন 'আরো ভালো ওষুধ' বা 'আরো ভালো ডাক্তার' না খুঁজে যে মরতে বসেছে তার কাছে থেকে তাকে মদত দিলেই সবথেকে দরদের কাজ হয়। তাকে বুঝতে দিন যে, তার সঙ্গে আপনি যে এতদিন এত আনন্দ, দুঃখ সব ভাগ করে নিয়েছেন তার জন্যে আপনি সুখী, আর আপনি নিজে তার মৃত্যুটা মেনে নিতে পারছেন। শেষের কয়েকটা ঘণ্টায় ওষুধের থেকে অনেক বেশি দরকার হল ভালোবাসার আর মেনে নেয়ার।

বুড়ো মানুষেরা বা অনেকদিনের রোগীরা সাধারণতঃ হাসপাতালে যাবার থেকে বাড়িতে, চেনা জায়গায়, ভালোবাসার লোকদের মাঝে থাকতে বেশি পছন্দ করে। অনেক সময় এতে লোকটি কিছু আগে মারা যেতে পারে। কিন্তু সেটা সবসময় খারাপ নয়। লোকটি কি মনে করছে বা চাইছে—আমরাই বা কি চাই—এগুলি আমাদের বুঝতে হবে। কখনো কখনো, যে মরতে চলেছে সে যদি বোঝে যে তাকে কোনো মতে বাঁচিয়ে রাখার খরচ যোগাতে তার বাড়ির লোকের দেনা হয়ে যাচ্ছে বা ছেলেপিলেরা না খেয়ে আছে, তাতে তার বেশি কষ্ট হবে। সে হয়তো চাইবে যে তাকে শান্তিতে মরতে দেয়া হোক—আর অনেক সময় সেটাই হবে বিবেচনার কাজ।

তবুও কেউ কেউ মৃত্যুকে ভয় পায়। খুব ভুগলেও এই চেনা পৃথিবী ছেড়ে যাওয়া তাদের পক্ষে কঠিন হতে পারে। প্রত্যেক সভ্যতায়, মৃত্যুর বিষয়ে কতকগুলো বিশ্বাস, আর পরের জীবনের সম্বন্ধে কিছু ধারনা আছে। এইসব ধারনা, বিশ্বাস, আর অনেক কালের ভাবধারা মৃত্যুর মুখোমুখি হবার সময় কিছুটা সান্ত্বনা দিতে পারে।

একজনের মৃত্যু হঠাৎ, আচমকা, বা অনেকদিন অপেক্ষা করার পর আসতে পারে। যাকে ভালোবাসি, তাকে তার এগিয়ে আসা মৃত্যুকে মেনে নিয়ে তার জন্যে তৈরি হতে সাহায্য করাটা সহজ ব্যাপার নয়। সাধারণতঃ আমরা অবলম্বন, দরদ আর সমবেদনা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারি না।

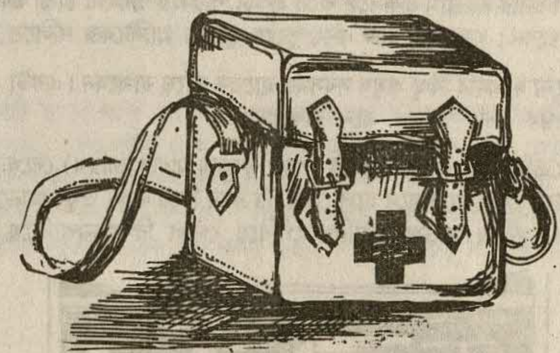
অল্পবয়সী লোক বা শিশুর মৃত্যু কখনো সহজ হয় না। সেখানে দরদ আর সততা দুটোই জরুরি। ছোট ছেলেপিলে—বা যে কেউই মারা যাচ্ছে—সে প্রায়ই সেটা বুঝতে পারে—খানিকটা তার নিজের শরীরের অবস্থা থেকে, আর খানিকটা, যারা তাকে ভালোবাসে তাদের ভয় আর হতাশা দেখে। ছোটই হোক বা বড়ই হোক, যে মারা যাচ্ছে সে যদি সত্যি কথাটা জানতে চায়, তাকে তা বলুন, কিন্তু দরদের সঙ্গে আর, খানিকটা আশা রেখে বলবেন। কাঁদতে হলে কাঁদবেন, কিন্তু তাকে বোঝান যে তাকে ভালোবাসলেও, আর ভালোবাসেন বলেই তাকে চলে যেতে দেবার মত শক্তি আপনার আছে। এতে সেও আপনাকে ছেড়ে যাবার মত শক্তি আর সাহস পাবে। এসব তাকে বলে বোঝাবার দরকার নেই—নিজে বুঝে বোঝাতে হবে।



আমাদের সকলকেই মরতে হবে। হয়তো চিকিৎসকের সবথেকে জরুরি কাজ হল—মৃত্যু যখন আর এড়ানো যায় না বা এড়ানো উচিত নয়, তখন লোককে সেটা মেনে নিতে, আর যারা বেঁচে রইল, তাদের কষ্টটা কমাতে সাহায্য করা।

পরিচ্ছেদ

২৩ ওষুধের বাক্‌স



জরুরি অবস্থার মোকাবিলা করতে প্রত্যেক বাড়িতে এবং প্রত্যেক গ্রামে কিছু কিছু ওষুধপত্র তৈরি রাখা উচিত:

- বাড়ির লোকের কাছে একটা বাড়ির **ওষুধের বাকস** (পৃঃ ৩৮০) থাকা উচিত। তার মধ্যে থাকবে—প্রাথমিক প্রতিবিধান, সাধারণ সংক্রমণ আর স্বাস্থ্যের সাধারণ সমস্যাগুলির জন্যে দরকারি ওষুধপত্র।
- গ্রামে আরো বড়সড় ওষুধের বাকস (গ্রামের **ওষুধের বাকস** পৃঃ ৩৮২) থাকা উচিত। তাতে প্রতিদিনের সমস্যাগুলি মেটানোর মতো সরঞ্জাম ছাড়াও কোনো কঠিন রোগ বা জরুরি অবস্থার মোকাবিলা করার মতো জিনিসপত্রও থাকবে। একজন স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষক, বাবা মা, দোকানদার বা অন্য যাকেই পাঁচজন বিশ্বাস করে এমন কোনো দায়িত্বশীল লোকের কাছে বাকসটা থাকা উচিত। বাকসটা গোছানো আর তার খরচ যোগানোর কাজ, সম্ভব হলে, গ্রামের সকলের মিলে করা উচিত। যারা বেশি দিতে পারে তাদের বেশি দেয়া উচিত। তবে প্রত্যেকের বোঝা উচিত যে **ওষুধের বাকসটা**, যারা টাকা দিতে পারে আর যারা পারে না, তাদের **সকলেরই উপকারের জন্যে**।

ওষুধের বাকসগুলিতে কি কি থাকতে পারে সে সম্বন্ধে পরের পৃষ্ঠাগুলিতে কিছু পরামর্শ দেয়া হল। আপনার এলাকার লোকেদের যেমন দরকার বা সাধ্য তাতে সবথেকে যা ভালো হয় সেইভাবে আপনি এই তালিকাগুলি বদলে নেবেন। যদিও তালিকাতে আধুনিক ওষুধের কথাই বেশি বলা হয়েছে তবুও, নিরাপদ আর কাজে লাগে বলে জানা আছে এমন কিছু দরকারি ঘরোয়া ওষুধও রাখতে পারেন।

প্রত্যেকটা ওষুধ কতটা করে রাখা উচিত?

হাতের কাছে যতটুকু রাখা উচিত শুধু ততটুকু করে ওষুধ ওষুধের বাকসগুলিতে রাখতে বলা হয়েছে। কয়েকটা সমস্যার জন্যে শুধু চিকিৎসা **শুরু** করার মতো পরিমাণ থাকবে। তারপরেই, রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার বা আরো ওষুধ আনতে যাওয়ার দরকার হতে পারে।

কতজন লোকের দরকারে লাগবে, আর খানিকটা ওষুধ শেষ হবার পর আরো ওষুধের জন্যে কতটা দূরে যেতে হবে—বাকসে কতটা ওষুধ রাখবেন তা এই দুটি জিনিসের ওপর নির্ভর করবে। কতটা খরচ হবে আর গ্রামের বা বাড়ির লোকের সাধ্য কতটা, তার ওপরেও এটা নির্ভর করবে। আপনার বাকসের কয়েকটা ওষুধ বেশ দামিই হবে। কিন্তু জরুরি অবস্থার মোকাবিলা করার জন্যে যথেষ্ট দরকারি ওষুধ হাতের কাছে রাখাটা বুদ্ধির কাজ।

দ্রষ্টব্য : প্রসবের বাকসের জন্যে সরঞ্জাম—প্রসবের জন্যে মায়েদের আর ধাইদের যে সব জিনিসপত্র তৈরি রাখা দরকার, সেগুলির তালিকা পৃঃ ৩০০ থেকে পৃঃ ৩০১-এ দেয়া হয়েছে।

আপনার ওষুধের বাকসের যত্ন

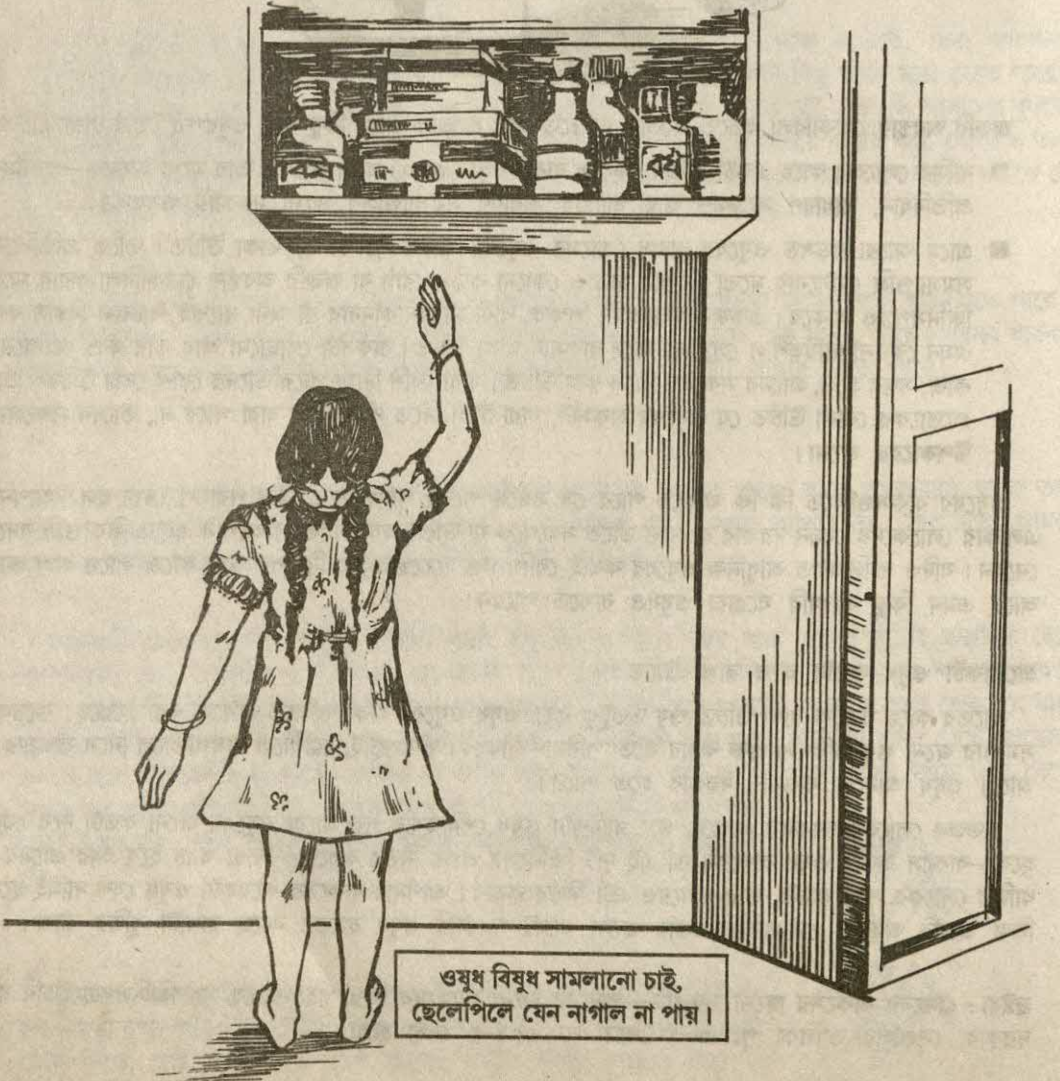
১· *সাবধান:* সব ওষুধ ছেলেপিলের নাগালের বাইরে রাখবেন। বেশি মাত্রায় খেয়ে ফেললে যে কোনো ওষুধই বিষাক্ত হতে পারে।

২· দেখবেন সব ওষুধে যেন ঠিকমত নাম লেখা থাকে আর প্রতিটি ওষুধের সঙ্গে যেন ব্যবহারের বিধিগুলি রাখা থাকে। ওষুধের বাকসের সঙ্গে এই বইটির এক কপি রেখে দেবেন।

৩· সব ওষুধ আর চিকিৎসার সরঞ্জাম একসঙ্গে করে একটা পরিষ্কার শুকনো ঠাণ্ডা জায়গায়—যেখানে আরশোলা বা ইঁদুর নেই সেখানে রাখবেন। যন্ত্রপাতি, গজ এবং তুলো মুখবন্ধ প্লাস্টিকের থলিতে মুড়ে রেখে রক্ষা করবেন।

৪· জরুরি অবস্থার জন্যে দরকারি কিছু ওষুধ সবসময় হাতের কাছে রাখবেন। একটা যেই ব্যবহার করে শেষ হয়ে যাবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটা আবার এনে রাখবেন।

৫· প্রত্যেক ওষুধের ডেট অফ্ এক্স্পায়ারি (কাজ ফুরিয়ে যাবার তারিখ) দেখে রাখবেন। তারিখটা পেরিয়ে গেলে বা ওষুধটা খারাপ হয়ে গেছে বলে মনে হলে সেটা নষ্ট করে দিয়ে নতুন ওষুধ আনবেন। কয়েকটি ওষুধ, বিশেষ করে টেট্রাসাইক্লিন, কাজ ফুরিয়ে যাওয়ার তারিখ পেরিয়ে গেলে বিপজ্জনক হয়ে যেতে পারে।



ওষুধ বিষুধ সামলানো চাই,
ছেলেপিলে যেন নাগাল না পায়।

ওষুধের বাকসের জন্যে সরঞ্জাম কেনা

এই বইয়ে যে সব ওষুধের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে বেশির ভাগ বড় বড় শহরের ওষুধের দোকানগুলিতে কিনতে পাওয়া যায়। যদি কয়েকটি পরিবার বা গ্রামের লোকে মিলে তাদের যা দরকার তা একসঙ্গে কেনে, অনেক সময় দোকানি তাদের কম দামে বিক্রি করতে পারে। কিংবা পাইকারি দোকানদারের কাছে কিনলে দাম আরো কম হয়।

আপনি যে কোম্পানির ওষুধ চাইছেন দোকানে সেটা না থাকলে, অন্য কোম্পানির ওষুধ কিনবেন, কিন্তু তা যে একই ওষুধ সেটা আর তার মাত্রাটা ভালো করে দেখে নেবেন। বোতল বা বাকসের গায়ে ছাপার ছোট অক্ষরে যা লেখা আছে সেটা পড়ে দেখে নেবেন যা চাইছেন ওষুধটা তাই কি না।

ওষুধ কিনবার সময় দাম যাচাই করে নেবেন। ওষুধ একই হলেও অনেক কোম্পানির ওষুধের দাম অন্যগুলোর থেকে বেশি হয়। সাধারণতঃ, বেশি দামি ওষুধ হলেই যে বেশি কাজ হবে তার কোনো মানে নেই। সম্ভব হলে, কোম্পানির নামে না কিনে ওষুধটার সাধারণ নামে কিনবেন, কারণ তাতে সাধারণতঃ অনেক সস্তা পড়ে। কখনো কখনো বেশি পরিমাণে কিনলে পয়সা বাঁচানো যায়। যেমন, একটা ৬০০,০০০ ইউনিটের পেনিসিলিনের শিশির দাম একটা ৩০০,০০০ ইউনিটের শিশির থেকে শুধু একটু বেশি—কাজেই বড় শিশিটা কিনে দু মাত্রার জন্যে ব্যবহার করবেন।



বাড়ির ওষুধের বাক্স

প্রত্যেক পরিবারের ওষুধের বাকসে নিচের জিনিসগুলি রাখা উচিত। এই সরঞ্জাম এবং ওষুধগুলি গ্রামাঞ্চলে বেশির ভাগ সাধারণ সমস্যার চিকিৎসার পক্ষে যথেষ্ট হওয়া উচিত।

এছাড়া, কাজে লাগে এমন কিছু ঘরোয়া ওষুধও আপনার ওষুধের বাকসে রাখবেন।

সরঞ্জাম

ব্যবহার	জিনিস	দাম (লিখে নিন)	কতটা রাখা উচিত	পৃষ্ঠা দেখুন
ক্ষত আর চামড়ার রোগের জন্যে:				
	আলাদা আলাদা বন্ধ খামে জীবাণু মুক্ত গজের পটি	________	২০	১১০,২৬২, ৩০৯
	১, ২, আর ৩ ইঞ্চি গজের গোটানো ব্যাণ্ডেজ	________	প্রতিটি দুটো করে	১০০
	পরিষ্কার তুলো	________	১ ছোট প্যাকেট	৮৫, ৯৬ ৩০০
	স্টিকিং প্লাস্টার ১ ইঞ্চি চওড়া, গোটানো	________	২ রোল	৯৮, ২৬২
	ওষুধ দেয়া সাবান (যেমন লাইফবয় বা সিন্থল)	________	১টি	৪১০
	৭০% এলকোহল ঘষার জন্যে	________	২৫০ মিঃ লিঃ	৮৫, ৩০০ ৩৫৫
	হাইড্রোজেন পেরক্সাইড কালচে রঙের বোতলে	________	১ ছোট বোতল	৯৬, ২২৫ ২৫৪, ২৫৫
	পেট্রোলিয়াম জেলি (ভেসলিন)	________	১ শিশি	১০৪, ১১১ ১৯৪, ২৪২
	সাদা ভিনিগার	________	৫০০ মিঃ লিঃ	২৪২, ২৮৬ ৩৩৮, ৩৫৫
	সালফার	________	১০০ গ্রাঃ	২৪২, ২৪৭ ২৪৬
	টিংচার আয়োডিন ও টিংচার বেনজয়েন	________	প্রতিটি ১ শিশি (১ আঃ বা ৩০ মিঃ লিঃ)	
	কাঁচি (পরিষ্কার, মরচে না পড়া)	________	১ জোড়া	৯৮, ৩০৫ ৩০৮
	ছুঁচলো মুখ দেয়া সন্না বা ফরসেপস	________	১ জোড়া	৯৭, ২১৩

ব্যবহার	জিনিস	দাম (লিখে নিন)	কতটা রাখা উচিত	পৃষ্ঠা দেখুন
টেমপারেচার মাপার জন্যে :				
	থারমোমিটার মুখে দেয়ার মলদ্বারে দেয়ার	______	প্রতিটি ১ করে	৩৬, ৩৭
জিনিসপত্র পরিষ্কার রাখার জন্যে :				
	প্লাস্টিকের থলি	______	কয়েকটা	২৩৭, ৩৭৮

ওষুধ

ব্যবহার	ওষুধ (সাধারণ নামে)	স্থানীয় কোম্পানির নাম (লিখে নিন)	দাম (লিখে নিন)	কতটা রাখা উচিত	পৃষ্ঠা দেখুন
জীবাণুর সংক্রমণের জন্যে :					
	১· পেনিসিলিন ২৫০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি ২,০০,০০০ ইউ	______	______	৪০	৩৯৭
	২· একটি সালফোনামাইড, ৫০০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি	______	______	১০০	৪০২
	৩· টেট্রাসাইক্লিন ২৫০ মিঃ গ্রাঃ ক্যাপসুল	______	______	২৪	৩৯৯
কৃমির জন্যে :					
	৪· মেবেনডাজোল বড়ি বা সিরাপ	______	______	৪০ টি ৫০০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি বা ২ বোতল	৪১১
জ্বর আর ব্যথার জন্যে :					
	৫· এসপিরিন, ৩০০ মিঃ গ্রাঃ (৫ গ্রেন) বড়ি	______	______	৫০	৪১৪
শরীরের জল কমে যাওয়ার জন্যে :					
	৬· সোডিয়াম বাইকার্বোনেট (খাবার সোডা) এছাড়া নুন ও চিনি	______	______	½ কেজি	১৮২
	অথবা, রিহাইড্রেশন সরবৎ করার জন্যে মেশানো গুঁড়ো	______	______	১০ পুরিয়া	৪১৬
রক্তাল্পতার জন্যে :					
	৭· আয়রণ (ফেরাস সালফেট ২০০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি (বড়িতে ফলিক এসিডও থাকলে সবথেকে ভালো)	______	______	১০০	৪২৪

ক্যাপসুল কিনবেন না। ওগুলো খুব দামি, অথচ বড়ির থেকে বেশি কাজ করে না।

ব্যবহার	ওষুধ (সাধারণ নামে)	স্থানীয় কোম্পানির নাম (লিখে নিন)	দাম (লিখে নিন)	কতটা রাখা উচিত	পৃষ্ঠা দেখুন
চুলকুনি (স্কেবিস) আর উকুনের জন্যে :	৮· লিনডেন (গামা বেনজিন হেকসাক্লোরাইড)	______	______	১ বোতল	৪১১
চুলকোনো আর বমির জন্যে :	৯· প্রোমেথাজাইন ২৫ মিঃ গ্রাঃ বড়ি	______	______	১২	৪১৯
চামড়ার অল্পস্বল্প সংক্রমণের জন্যে :	১০· জেনসিয়ান ভায়োলেট (০·৫% তরল ওষুধ) অথবা একটা এনটিবায়োটিক মলম	______	______	১ বোতল ১ টিউব	৪০৯
চোখের সংক্রমণের জন্যে :	১১· এনটিবায়োটিক চোখের মলম (টেট্রাসাইক্লিন)	______	______	১ টিউব	৪১৩
	১২· ২০% সালফাসিটামাইড চোখের ড্রপ	______	______	১ শিশি	৪১৩
কানের সংক্রমণের জন্যে :	১৩· বোরোগ্লিসারিন কানের ড্রপ	______	______	১ শিশি	৪১৪
	১৪· ক্লোরামফেনিকল দেয়া কানের ড্রপ	______	______	১ শিশি	৪১৪
বন্ধ নাকের জন্যে :	১৫· ডিকনজেসট্যান্ট নাকের ড্রপ	______	______	১ শিশি	৪১৮

গ্রামের ওষুধের বাকস

এতে, বাড়ির ওষুধের বাকসের জন্যে যে সব ওষুধের নাম বলা হয়েছে, সেগুলি সবই থাকা উচিত, কিন্তু পরিমাণে বেশি হবে ; কতটা বেশি সেটা নির্ভর করবে গ্রামটা কত বড় আর ওষুধের দোকানের থেকে কত দূরে তার ওপর। গ্রামের বাকসে নিচের তালিকার জিনিসগুলিও থাকা উচিত। এদের মধ্যে অনেকগুলি বিপজ্জনক রোগের চিকিৎসার জন্যে লাগবে। আপনার এলাকায় যে ধরনের রোগ হয় সেই অনুসারে আপনি তালিকাটি বদলে বা বাড়িয়ে নেবেন।

অন্যান্য সরঞ্জাম

ব্যবহার	জিনিসপত্র	দাম	কতটা রাখা উচিত	পৃষ্ঠা দেখুন
ইনজেকশন দেয়ার জন্যে :	সিরিঞ্জ ১ মিঃ লিঃ	______	২	৭৭
	সিরিঞ্জ ৫ মিঃ লিঃ	______	২	
	সিরিঞ্জ ১০ মিঃ লিঃ	______	১	
	৫ মিঃ লিঃ # ২২, ৩ সেঃ মিঃ লম্বা	______	৩-৬	
	# ২৫, ১½ সেঃ মিঃ লম্বা	______	২-৪	

ব্যবহার	জিনিসপত্র	দাম	কতটা রাখা উচিত	পৃষ্ঠা দেখুন
পেচ্ছাপের কষ্টের জন্যে	ক্যাথিটার (রবারের বা প্লাস্টিকের # ১৬ ফ্রেঞ্চ)	———	২	২৮৪
মচকানো আর শিরা ফুলে যাওয়ার জন্যে:	ইল্যাস্টিক ব্যাণ্ডেজ ২ এবং ৩ ইঞ্চি চওড়া	———	৩-৬	১১৫, ২১৩, ২৫৫
শ্লেষ্মা টেনে বার করার জন্যে:	সাকশন বালব	———	১-২	৯৭, ৩০১, ৩০৮
কানের ভেতর ইত্যাদি দেখার জন্যে:	ছোট টর্চ	———	১	৪২, ৩০১, ৩৫৫

অন্যান্য ওষুধ

ব্যবহার	ওষুধ	স্থানীয় কোম্পানির নাম	দাম	কতটা রাখা উচিত	পৃষ্ঠা দেখুন
কঠিন সংক্রমণের জন্যে:					
	১· পেনিসিলিন ইনজেকশন	———	———	২০-৪০	৩৯৮
	২· টেট্রাসাইক্লিন ক্যাপসুল বা বড়ি ২৫০ মিঃ গ্রাঃ	———	———	৪০-৮০	৪০০
এমিবা আর জিয়ারডিয়ার সংক্রমণের জন্যে:					
	৩· মেট্রোনিডাজোল ২০০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি	———	———	৪০-৮০	৪০৭
ফিট, ধনুষ্টঙ্কার আর কঠিন ঘুংরি কাশির জন্যে:					
	৪· ফেনোবারবিটাল ৩০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি	———	———	৪০-৮০	
	আর ২০০ মিঃ গ্রাঃ ইনজেকশন	———	———	১৫-৩০	৪২২
	৫· প্যারালডিহাইড ২ মিঃ লিঃ আর ৫ মিঃ লিঃ এমপুল	———	———	১০-২০	৪২৩
সাংঘাতিক এলার্জির প্রতিক্রিয়া আর সাংঘাতিক হাঁপানির জন্যে:					
	৬· এড্রেনালাইন ইনজেকশন ১ মিঃ গ্রাঃ দেয়া এমপুল	———	———	৫-১০	৪১৯
হাঁপানির জন্যে:					
	৭· এফেড্রিন ১৫ মিঃ গ্রাঃ বড়ি	———	———	২০-১০০	৪১৮
প্রসবের পরের সাংঘাতিক রক্তপাতের জন্যে:					
	৮· মেথিল এরগোটামাইন ম্যালিয়েট	———	———	৬-১২	৪২৩

সব জায়গায় না হলেও অনেক অঞ্চলে অন্য যে সব ওষুধের দরকার হয়:

ব্যবহার	ওষুধ	স্থানীয় কোম্পানির নাম	দাম	কতটা রাখা উচিত	পৃষ্ঠা দেখুন
যেখানে শুকিয়ে যাওয়া চোখ (জেরোসিস) একটা সমস্যা:					
	ভিটামিন-এ ৫০,০০০ আই ভি	———	———	১০-১০০	৪২৪

ব্যবহার	ওষুধ	স্থানীয় কোম্পানির নাম	দাম	কতটা রাখা উচিত	পৃষ্ঠা দেখুন
যেখানে ধনুষ্টঙ্কার একটা সমস্যা:					
	টিটেনাস এনটিটকসিন ৫০,০০০ ইউনিট	________	____	২-৪ শিশি	৪২১
যেখানে টাইফয়েড একটা সমস্যা:					
	ক্লোরামফেনিকল, ২৫০ মিঃ গ্রাঃ ক্যাপসুল	________	____	৫০-২০০	৪০১
যেখানে সাপের কামড় একটা সমস্যা:					
	পলিভ্যালেন্ট এনটিভেনিন	________	____	২-৬	৪২১
যেখানে ম্যালেরিয়া একটা সমস্যা:					
	ক্লোরোকুইন বড়ি ১৫০ মিঃ গ্রাঃ মূল	________	____	৫০-২০০	৪০৫
	প্রাইমাকুইন বড়ি ২৬·৩ মিঃ গ্রাঃ মূল	________	____	১০০-২০০	৪০৫
যেখানে গোদ একটা সমস্যা:					
	হেট্রাজান ৫০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি	________	____	৩০-৫০	৪১৩
যেখানে হুকওয়ার্ম একটা সমস্যা:					
	থিয়াবেনডাজোল, ৫০০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি অথবা অন্য একটা হুকওয়ার্মের ওষুধ	________	____	২৫-১০০	৪১১
যে সদ্য জন্মানো শিশুর ওজন কম তার রক্তপাত এড়াতে বা কমাতে:					
	ভিটামিন-কে ইনজেকশন ১ মিঃ গ্রাঃ	________	____	৩-৬	৪২৫

পুরোনো রোগের জন্যে ওষুধ

গ্রামের ওষুধের বাকসে যক্ষ্মা বা কুষ্ঠের মত পুরোনো রোগের ওষুধ রাখা বুদ্ধির কাজ হতে বা নাও হতে পারে। কারো এইসব রোগ হয়েছে এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে গেলে প্রায়ই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কতকগুলো বিশেষ পরীক্ষা করানোর দরকার হয়—সেখানেই সাধারণতঃ দরকারি ওষুধগুলো পাওয়া যায়। গ্রামের ওষুধের সাজসরঞ্জামের মধ্যে এই ওষুধগুলি রাখা হবে কি না সেটা নির্ভর করবে অবস্থা আর সেখানে যাদের ওপর স্বাস্থ্যের কাজের ভার রয়েছে তাদের চিকিৎসা করার ক্ষমতার ওপর।

টিকে

গ্রামের ওষুধের বাকসের মধ্যে টিকেগুলিকে ধরা হয়নি কারণ এগুলি সাধারণতঃ স্বাস্থ্যদপ্তর থেকেই পাওয়া যায়। তবে ছেলেপিলের বিভিন্ন টিকেগুলি নেবার মত বয়স হলেই তারা সকলেই যেন সেগুলি পায় (পৃঃ ১৭৫) সে বিষয়ে খুব চেষ্টা করা উচিত। কাজেই, বরফে রাখার ব্যবস্থা থাকলে, গ্রামের ওষুধের সরঞ্জামের মধ্যে টিকেগুলি, বিশেষ করে ডি পি টি, পোলিও আর ধনুষ্টঙ্কারের টিকে থাকা উচিত।

গ্রামের দোকানির (বা ওষুধের দোকানদারের) জন্যে কয়েকটি কথা



প্রিয় বন্ধু,

আপনি যদি আপনার দোকানে ওষুধ বেচেন, কি কি ওষুধ কেনা উচিত আর কখন কিভাবে সেগুলি ব্যবহার করতে হয় সে বিষয়ে লোকে হয়তো আপনাকে প্রশ্ন করতে পারে। লোকের জ্ঞান আর স্বাস্থ্যের উন্নতির ব্যাপারে আপনি যা করতে পারেন তা খুবই জরুরি।

খদ্দেরদের ঠিক উপদেশ দিতে আর তারা যাতে তাদের সত্যিসত্যিই যা দরকার শুধু সেই ওষুধগুলি কেনে তা দেখতে এই বইটি আপনাকে সাহায্য করতে পারে।

আপনি তো জানেন যে লোকে তাদের যেটুকু পয়সা আছে তা দিয়ে অনেক সময় এমন সব ওষুধ কেনে যা তাদের কোনো কাজে লাগে না। কিন্তু তাদের স্বাস্থ্যের প্রয়োজন পরিষ্কার করে বুঝে টাকাপয়সা আরো বুদ্ধি করে খরচ করতে আপনি তাদের সাহায্য করতে পারেন। যেমন:

■ যদি লোকে আপনার কাছে এসে কাশির সিরাপ, কেওলিনের মতো পাৎলা পায়খানা এঁটে যাওয়ার ওষুধ, সাধারণ রক্তাল্পতার চিকিৎসার জন্যে ভিটামিন বি-১২ বা লিভার এক্সট্র্যাক্ট, মচকানো বা ব্যথা সারাবার জন্যে পেনিসিলিন অথবা সর্দি হলে টেট্রাসাইক্লিন চায়, তাদের বুঝিয়ে বলুন যে এইসব ওষুধের কোনো দরকার নেই, আর এগুলো ভালোর থেকে ক্ষতিই বেশি করতে পারে। এগুলো ব্যবহার করার বদলে কি করা যায় সে বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করুন।

■ কেউ যদি ভিটামিনের টনিক কিনতে চায়, তাকে সেটার বদলে শাকসবজি, ডিম বা ফল কিনতে উৎসাহ দিন। এইসব খাবারে দামের তুলনায় টনিকের থেকে বেশি ভিটামিন আছে, সেটা বুঝতে তাদের সাহায্য করুন।

■ যখন খাওয়ার ওষুধ সমান ভালো কাজ দেয়, আর বেশি নিরাপদ—যেমন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হয়ে থাকে—তখনো কেউ ইনজেকশন নিতে চাইলে তাকে বুঝিয়ে বারণ করুন।

■ সর্দির জন্যে কেউ যদি সর্দির বড়ি বা অন্য দামি ধরনের এসপিরিন কিনতে চায়, তাকে সাধারণ এসপিরিন কিনে প্রচুর তরল জিনিসের সঙ্গে সেটি খেয়ে পয়সা বাঁচাতে উৎসাহ দিন।

এই সমস্ত কথা লোককে বলা অনেক সহজ হবে যদি আপনি তথ্যগুলি এই বইয়ে দেখে নিয়ে সকলের সঙ্গে একসঙ্গে সেগুলি পড়েন।

সবথেকে বড় কথা, যে ওষুধগুলি কাজে লাগে, শুধু সেইগুলিই বেচুন। বাড়ির আর গ্রামের ওষুধের তালিকায় যা যা দেয়া আছে, তাছাড়া আপনার এলাকায় যে সব রোগ বেশি দেখা যায় সেগুলির জন্যে অন্যান্য দরকারি ওষুধ আর সরঞ্জাম—এইসব জিনিস আপনার দোকানে রাখুন। কম দামের সাধারণ নামের ওষুধ অথবা সবথেকে সস্তা কোম্পানির ওষুধ রাখতে চেষ্টা করুন। কখনো কাজের তারিখ পেরিয়ে যাওয়া, নষ্ট হয়ে যাওয়া বা অদরকারি ওষুধ লোককে বিক্রি করবেন না।

আপনার দোকানটি এমন একটা জায়গা করে তুলুন—যেখানে লোকে নিজেদের স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে শিখতে পারে। লোককে বুদ্ধি করে ওষুধ ব্যবহার করতে যদি সাহায্য করতে পারেন আর, কোনো ওষুধ ব্যবহার করার আগে লোকে যেন সেটার সঠিক ব্যবহার, মাত্রা, ঝুঁকি আর সাবধানতার কথা ভালোভবে জানে সেটা যদি দেখেন, তবে আপনি আপনার সমাজের একটা মস্ত সেবা করতে পারবেন।

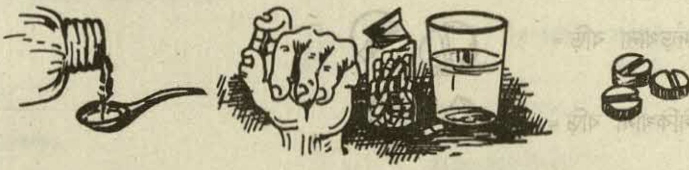
আপনার সৌভাগ্য কামনা করি।

আন্তরিক শ্রদ্ধা জানবেন

ডেভিড ওয়ার্নার

সবুজ পৃষ্ঠা

এই বইয়ে যেসব ওষুধের কথা বলা হয়েছে সেগুলির ব্যবহার, মাত্রা আর সাবধানতা



এই বিভাগে, ওষুধগুলিকে ব্যবহার অনুসারে কয়েকটি দলে ভাগ করা হয়েছে। যেমন, কৃমির সংক্রমণের চিকিৎসার জন্যে যেসব ওষুধ ব্যবহার করা হয়, সে সবগুলিকেই **'কৃমির জন্যে'** এই শিরোনামের নিচের তালিকায় দেয়া হয়েছে।

আপনি যদি কোনো ওষুধ সম্বন্ধে তথ্য চান, তবে পৃঃ ৩৮৯ থেকে যে **ওষুধের তালিকা** দেয়া হয়েছে, সেখানে ওষুধের নামটা খুঁজুন। অথবা পৃঃ ৩৯৩ থেকে যে **ওষুধের অনুক্রমণী** দেয়া হয়েছে সেখানে ওষুধটা খুঁজুন। যে নামটা খুঁজছেন সেটা পেলে, যে পৃষ্ঠার সংখ্যা দেয়া হয়েছে সেখানে দেখুন।

ওষুধের তালিকা—সেগুলির *ব্র্যান্ড* বা মার্কামারা *নাম* (যে সব কোম্পানি তৈরি করে তাদের দেয়া নাম) অনুসারে না করে, তাদের *সাধারণ* (বৈজ্ঞানিক) নাম অনুসারে করা হয়েছে। এর কারণ হল এই যে সাধারণ নাম সবজায়গায় একই ধরনের। কিন্তু কোম্পানির দেয়া নাম এক এক জায়গায় এক এক রকম। তাছাড়া, **কোম্পানির নামে না কিনে সাধারণ নামে কিনলে ওষুধ প্রায়ই বেশি সস্তায় পাওয়া যায়।**

কয়েকটা জায়গায়, সাধারণ নামটার পরে নামকরা কোম্পানির নাম দেয়া হয়েছে। এই বইয়ে কোম্পানির নামগুলি *বেঁকা* হরফে দেয়া হয়েছে। যেমন, **প্রোমেথাজাইন** বলে একটা এলার্জির ওষুধের (প্রোমেথাজাইন হল সাধারণ নাম) একটা কোম্পানির নাম হল *ফেনারগান*।

প্রত্যেক ওষুধের সম্বন্ধে তথ্যের সঙ্গে খানিকটা ফাঁকা জায়গা ——— ছেড়ে রাখা হয়েছে—সেখানে আপনার এলাকায় যেটা সবথেকে বেশি বা সবথেকে সস্তায় পাওয়া যায় সেটার নাম আর দাম আপনি **লিখে দিতে পারবেন**। যেমন, আপনার এলাকায় যে টেট্রাসাইক্লিনটি সবথেকে সস্তায় বা একমাত্র পাওয়া যায়, সেটা যদি *টেরামাইসিন* হয়ে থাকে, তবে আপনি ফাঁকা জায়গাটায় এইভাবে লিখবেন:

টেট্রাসাইক্লিন (টেট্রাসাইক্লিন এইচ সি এল, অকসিটেট্রাসাইক্লিন ইত্যাদি)

নাম: **টেরামাইসিন। ১০০ ক্যাপসুলের জন্যে দাম: ৫৫·০০টা।**

তবে, যদি দেখেন যে **টেট্রাসাইক্লিন** সাধারণ নামে *টেরামাইসিনের* থেকে বেশি সস্তায় কিনতে পারছেন, তাহলে লিখবেন:

নাম: **টেট্রাসাইক্লিন এইচ সি এল। ১০০ ক্যাপসুলের জন্যে দাম ৪৮·৫০ টা।**

দ্রষ্টব্য: সবুজ পৃষ্ঠাগুলিতে যেসব ওষুধের তালিকা দেয়া হয়েছে তার সবগুলিই আপনার বাড়ির বা গ্রামের ওষুধের বাকসে লাগবে না। বিভিন্ন ওষুধের দোকানে আলাদা আলাদা ওষুধ পাওয়া যায় বলে কখনো কখনো এমন অনেকগুলি ওষুধ সম্বন্ধে তথ্য দেয়া হয়েছে যেগুলি একই কাজ করে। তবে বুদ্ধির কাজ হল:

শুধু অল্প কয়েকটি ওষুধ রাখবেন আর ব্যবহার করবেন।

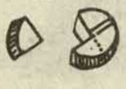
যে কোনো ওষুধ কিনবার সময় ডেট অফ একসপায়ারি (ওষুধটি ব্যবহার করার শেষ দিন) দেখে নেবেন। কাজ ফুরিয়ে যাবার তারিখ পার হয়ে যাবার পরেও কোনো ওষুধ ব্যবহার না করা হয়ে থাকলে, সেটা ফেলে বা নষ্ট করে দেবেন।

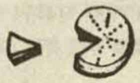
মাত্রা সম্বন্ধে তথ্য :

ভগ্নাংশ কখনো কখনো কিভাবে লেখা হয় :

১/২ বড়ি = আধখানা বড়ি = 

১ ১/২ বড়ি = দেড়খানা বড়ি = 

১/৪ বড়ি = সিকিখানা বড়ি = 

১/৮ বড়ি = একটা বড়ির ১/৮ অংশ(বড়িটাকে আটটি সমান টুকরো করে তার এক টুকরো নেয়া) = 

রোগীর ওজন হিসেবে মাত্রা ঠিক করা :

এই পৃষ্ঠাগুলিতে বেশির ভাগ মাত্রার বিধি রোগীর বয়স অনুসারে দেয়া হয়েছে—এতে ছোটরা বড়দের থেকে কম মাত্রা পায়। তবে, রোগীর ওজন হিসেবে মাত্রা স্থির করলে বেশি সঠিক হয়। যে সব স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে ওজন মাপার যন্ত্র আছে তাদের এই হিসেবটা করার জন্যে বন্ধনীর মধ্যে কিছু তথ্য ছোট করে দেয়া হয়েছে। যদি পড়েন :

(১০০ মিঃ গ্রাঃ/কে জি/দিন)

তার মানে হল দিনে, শরীরের ওজনের প্রতি কিলোগ্রামের জন্যে ১০০ মিঃ গ্রাঃ করে। অর্থাৎ, রোগীর যা ওজন সেটার প্রতি কিলোগ্রামের জন্যে ১০০ মিঃ গ্রাঃ করে ওষুধ ২৪ ঘন্টা ধরে মাত্রা ভাগ করে দেবেন।

যেমন ধরুন, বাতের জ্বরের জন্যে একটি ছেলেকে আপনি এসপিরিন দিতে চান—ছেলেটির ওজন ৩৬ কিলোগ্রাম। বাতের জ্বরের জন্যে এসপিরিনের যে মাত্রা বলা হয়েছে, তা হল ১০০ মিঃ গ্রাঃ/কে জি/দিনে। কাজেই, গুণ করুন :

১০০ মিঃ গ্রাঃ × ৩৬ = ৩৬০০ মিঃ গ্রাঃ

ছেলেটি দিনে ৩৬০০ মিঃ গ্রাঃ এসপিরিন পাবে। একটা এসপিরিনের বড়িতে ৩০০ মিঃ গ্রাঃ এসপিরিন থাকে। ১২ টি বড়িতে ৩৬০০ মিঃ গ্রাঃ হয়। কাজেই, ছেলেটিকে দিনে ছ'বার দুটি করে (বা ৪ ঘন্টা অন্তর অন্তর দুটি করে) বড়ি দেবেন।

বিভিন্ন ওষুধের মাত্রা ঠিক করার এটা একটা উপায়। মাপ আর মাত্রা ঠিক করার সম্বন্ধে আরো তথ্যের জন্যে পরিচ্ছেদ ৮ দেখুন।

দ্রষ্টব্য : শিক্ষক শিক্ষিকা, স্বাস্থ্যপ্রকল্পের পরিকল্পনা যাঁরা করেন, আর এই বইয়ের স্থানীয় পরিবেশকদের জন্যে :

যদি এই বইটি গ্রাম স্বাস্থ্যকর্মীদের ট্রেনিংএর জন্যে ব্যবহার করা হয় কিংবা যদি কোনো স্থানীয় স্বাস্থ্যপ্রকল্প এটির পরিবেশক হয়, তবে এই বইয়ের সঙ্গেই **ওষুধগুলির স্থানীয় নাম আর দাম সম্বন্ধে তথ্যও থাকা উচিত।**

স্থানীয় পরিবেশকরা এই সব তথ্য দিয়ে একটা পৃষ্ঠা তৈরি করে নেবেন, যাতে যে বইটি ব্যবহার করবে সে যেন পৃষ্ঠাটি নকল করে বইয়ে ঢুকিয়ে নিতে পারে। যখনি সম্ভব—**সাধারণ নামের বা সস্তার ওষুধ আর সরঞ্জাম** কাছাকাছি কোথায় পাওয়া যায় সে খবরটাও দিয়ে দেবেন। (ওষুধের বাকসের সরঞ্জাম কেনা পৃঃ ৩৭৯ দেখুন।)

সবুজ পৃষ্ঠার ওষুধগুলির তালিকা

যেমনভাবে দেয়া আছে সেইভাবে তালিকা করা হয়েছে

অম্বল, বুকজ্বালা আর পেটের আলসারের জন্যে: এনটাসিড

শরীরে জলের অভাবের জন্যে

শক্ত মলের (কোষ্ঠকাঠিন্য) জন্যে মৃদু জোলাপ

অল্পস্বল্প পাৎলা পায়খানার জন্যে

নাক বন্ধের জন্যে

কাশির জন্যে

কাশি কমাবার (চেপে দেবার) ওষুধ

কাশির সাহায্যের ওষুধ (এক্সপেকটোরাণ্ট)

হাঁপানির জন্যে

এলার্জির প্রতিক্রিয়া আর বমির জন্যে এনটিহিস্টামাইন

এনটিটকসিন

বিষ খাওয়ার জন্যে

ফিটের (তড়কা) জন্যে

প্রসবের পরের অতিরিক্ত রক্তপাতের জন্যে

অর্শের জন্যে

অপুষ্টি আর রক্তাল্পতার জন্যে

পরিবার পরিকল্পনার উপায় জন্মনিয়ন্ত্রণ

সবুজ পৃষ্ঠার ওষুধগুলির অনুক্রমণী
(বর্ণানুক্রমিক সূচী)

বাংলা বর্ণমালার ক্রম অনুসারে তালিকা করা হয়েছে।

দ্রষ্টব্য: যে সব ওষুধের নাম বইয়ে আছে, অথচ সবুজ পৃষ্ঠায় নেই সেগুলি প্রধান অনুক্রমণীর মধ্যে (হলদে পৃষ্ঠাগুলিতে) দেয়া আছে।

র

ল

শ

স

হ

দরকার বলে জানলে তবেই
ওষুধ করবে ব্যবহার ;
ওষুধের ঠিক ব্যবহার বিধি—
তাও জেনে নেয়া দরকার।

ওষুধ সম্বন্ধে তথ্য

এনটিবায়োটিক

পেনিসিলিন
খুব জরুরি এনটিবায়োটিক

যে সব এনটিবায়োটিক সব থেকে বেশি কাজে লাগে, তার মধ্যে একটি হল পেনিসিলিন। এটি কয়েক ধরনের সংক্রমণে কাজ করে তার মধ্যে অনেকগুলিতে পুঁজ হয়। বেশিরভাগ পাৎলা পায়খানার রোগে, বেশিরভাগ পেচ্ছাপের সংক্রমণে, পিঠের ব্যথায়, কালসিটেতে, সাধারণ সর্দিকাশিতে, জলবসন্তে বা অন্য ভাইরাসের সংক্রমণে (পৃ ২৬ আর ২৭)-এটি কোনো কাজে লাগে না।

পেনিসিলিন মিলিগ্রামে (মিঃ গ্রাঃ) বা ইউনিটে (ইউ) মাপা হয়। পেনিসিলিন জি এর জন্যে ২৫০ মিঃ গ্রাঃ = ৪০০,০০০ ইউ।

সব রকম পেনিসিলিনের (এর মধ্যে এমপিসিলিনও আছে) *ঝুঁকি আর সাবধানতা*:

বেশির ভাগ লোকের পক্ষে পেনিসিলিন খুব নিরাপদ ওষুধ। খুব বেশি খেলেও—পয়সা নষ্ট ছাড়া অন্য কোনো ক্ষতি হয় না। খুব কম খেলে সংক্রমণটা পুরোপুরি যায় না; জীবাণুগুলোরও *প্রতিরোধ* জন্মে যেতে পারে (ধ্বংস করা আরো কঠিন হয়)।

পেনিসিলিন থেকে, **কয়েকজনের এলার্জির প্রতিক্রিয়া হয়।** অল্পস্বল্প এলার্জির প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আছে ফুসকুড়ি বা র‍্যাশ—সেগুলো চুলকোয়। এগুলি, সাধারণতঃ পেনিসিলিন ব্যবহার করার কয়েক ঘণ্টা বা কয়েকদিন পর শুরু হয়ে কয়েকদিন ধরে থাকতে পারে। এনটিহিস্টামাইনে (পৃ ৪১৯) চুলকুনি কমার সাহায্য হয়।

ক্বচিৎ কখনো পেনিসিলিন থেকে **এলার্জির শক** বলে একটা বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়া হয়। পেনিসিলিনের ইনজেকশন দেবার একটু পরেই লোকটি ফ্যাকাসে হয়ে যায়; তার শ্বাসকষ্ট হয়ে শকের অবস্থা হয় (পৃঃ ৮৩)। এরকম হলে, **সঙ্গে সঙ্গে** *এড্রেনালাইনের* **ইনজেকশন দিতে হবে।**
পেনিসিলিনের ইনজেকশন দেবার আগে সবসময় একটা **স্পর্শকাতরতার পরীক্ষা** (পৃঃ ৮১-৮২) করে নেবেন।

সবসময়—স্পর্শকাতরতার পরীক্ষা করার সময় আর পুরো মাত্রার ইনজেকশন দেবার সময় —*এড্রেনালাইন* তৈরি রাখবেন (পৃঃ ৪১৯)।

যার পেনিসিলিনে একবার **কোনো** এলার্জির প্রতিক্রিয়া হয়েছে, তাকে আর **কখনো** কোনো রকম পেনিসিলিন বা এমপিসিলিন দেয়া উচিত **নয়।** কারণ, পরের বারের প্রতিক্রিয়াটা আরো বেশি খারাপ হতে পারে—লোকটি মারাও যেতে পারে।

পেনিসিলিন দিয়ে যেসব সংক্রমণের চিকিৎসা করা যায়, তার বেশিরভাগের চিকিৎসা খাওয়ার পেনিসিলিন দিয়ে বেশ ভালোভাবেই করা যায়। খাওয়ার পেনিসিলিনের থেকে পেনিসিলিনের ইনজেকশনে বিপদ বেশি হয়।

কেবলমাত্র সাংঘাতিক বা বিপজ্জনক সংক্রমণের জন্যে পেনিসিলিনের ইনজেকশন ব্যবহার করবেন।

পেনিসিলিন বা অন্য যে ওষুধে পেনসিলিন আছে—সেগুলির ইনজেকশন দেবার আগে পৃ ৮৪-তে দেয়া সাবধানতাগুলি নেবেন।

পেনিসিলিনে প্রতিরোধ:

যে সংক্রমণে পেনিসিলিন এমনিতে কাজ করে, কখনো কখনো সেটার বেলায় ওষুধটা কাজে লাগে না। এর কারণ এই হতে পারে যে, জীবাণুগুলোর প্রতিরোধ জন্মে গেছে, তাই পেনিসিলিনে তাদের আর ক্ষতি হয় না। যে সব সংক্রমণের কোনো কোনো সময় পেনিসিলিনে প্রতিরোধ জন্মায়, সেগুলির মধ্যে আছে—পাঁচড়া, চামড়ায় পুঁজভরা ঘা আর হাড়ে সংক্রমণ (অস্টিওমাইলাইটিস)।

যদি এগুলির মধ্যে কোনো একটিতে সাধারণ পেনিসিলিনে কাজ না হয়, তবে অন্য কোনো এনটিবায়োটিক দিয়ে দেখা যেতে পারে। কিংবা, বিশেষ ধরনের পেনিসিলিনে (মেথাসিলিন, ন্যাফাসিলিন, অকসাসিলিন, ক্লোকসাসিলিন, ডাইক্লোকসাসিলিন) কাজ হতে পারে।

যদি কোনো গনোরিয়ার রোগীর পেনিসিলিনে প্রতিরোধ হয়, তবে পৃ ২৮০-তে আর পৃ ৪০১-এ যেমন বলা হয়েছে, সেইভাবে টেট্রাসাইক্লিন ব্যবহার করুন।

সাবধান: চামড়ায় কোনো ক্ষতের ওপরে পেনিসিলিনের মলম বা পাউডার ব্যবহার করবেন না। এতে লোকটির পেনিসিলিনে এলার্জি হয়ে যেতে পারে। পেনিসিলিনে, তার প্রতিরোধও জন্মে যেতে পারে। তখন একটা সাধারণ রোগ সারাতে বেশি কড়া আর দামি এনটিবায়োটিক লাগবে।

খাওয়ার পেনিসিলিন

পেনিসিলিন জি বা ভি

চেনা কোম্পানির নাম:
ডেপেন বড়ি, কৃস্টাল ভি, পেনটিড।

এগুলি সাধারণতঃ ২,০০,০০০ বা ৪,০০,০০০ বা ৫,০০,০০০ বা ১০,০০,০০০ ইউ-তে অথবা ৬০ মিঃ গ্রাঃ, ১৩০ মিঃ গ্রাঃ বা ২৫০ মিঃ গ্রাঃ এর বড়িতে পাওয়া যায়।

(শরীর, পেনিসিলিন জি এর থেকে পেনিসিলিন ভি বেশি সহজে নেয়, কিন্তু শেষেরটার দাম বেশি।)

ছোটখাট আর মোটামুটি কঠিন সংক্রমণে ইনজেকশন না দিয়ে বরং খাওয়ার পেনিসিলিন দেয়া উচিত। এই সংক্রমণগুলির মধ্যে আছে:

- দাঁতে ঘা বা সংক্রমণ
- সংক্রমিত ক্ষত আর অনেকরকম সংক্রমিত ঘা
- বেশি ছড়িয়ে পড়া পাঁচড়া
- ইরিসিপেলাস
- কানে সংক্রমণ
- সাইনাসে সংক্রমণ
- গলায় ব্যথা, সঙ্গে হঠাৎ বেশি জ্বর (স্ট্রেপ গলা)
- কয়েক ধরনের ব্রঙ্কাইটিস

সংক্রমণ কঠিন হলে, পেনিসিলিনের ইনজেকশন দিয়ে শুরু করলেই সব থেকে ভাল হতে পারে। কিন্তু অবস্থার উন্নতি হতে শুরু হলে সাধারণতঃ তার বদলে খাওয়ার পেনিসিলিন দেয়া যায়।

দু' তিনদিনের মধ্যে অবস্থার উন্নতি হতে শুরু না করলে, অন্য কোনো এনটিবায়োটিক দেবার কথা ভেবে দেখবেন আর ডাক্তারি পরামর্শ নেবার চেষ্টা করবেন।

খাওয়ার পেনিসিলিনের *মাত্রা*—২,০০,০০০ ইউ এর বড়ি ব্যবহার **করে।**

ছোটখাট সংক্রমণের জন্যে:

বড়দের: ৪,০০,০০০ ইউ (বা ২৫০ মিঃ গ্রাঃ) দিনে চারবার।

ছোটদের: ৬-১২ বছর বয়সের: ২,০০,০০০ ইউ (বা ১২৫ মিঃ গ্রাঃ) দিনে ৪ বার।

ছোটদের: ৬ বছরের কমবয়সের: ১,০০,০০০ ইউ (বা ৬০ মিঃ গ্রাঃ) দিনে ৩ বা ৪ বার।

বেশি কঠিন সংক্রমণের জন্যে: ওপরের মাত্রার দুগুণ দেবেন। **ডাক্তারি সাহায্য নেবেন।**

জরুরি: জ্বর, আর সংক্রমণের অন্যান্য লক্ষণ চলে যাবার পরেও অন্ততঃ দু তিনদিন ধরে পেনিসিলিন খেয়ে যাবেন।

শরীর যাতে ওষুধটাকে বেশি কাজে লাগাতে পারে তার জন্যে **সবসময়, খালি পেটে,**খাওয়ার এক ঘন্টা আগে, **পেনিসিলিন খাবেন।** (এটা পেনিসিলিন ভি এর থেকে পেনিসিলিন জি এর বেলায় বেশি জরুরি।)

পেনিসিলিনের ইনজেকশন

কয়েকটা কঠিন সংক্রমণে পেনিসিলিন ইনজেকশন দেয়া উচিত। এগুলির মধ্যে আছে:

- মেনিনজাইটিস
- সেপটিসিমিয়া
- ধনুষ্টঙ্কার
- কঠিন নিউমোনিয়া
- ক্ষতে খারাপ ধরনের সংক্রমণ
- গ্যাংগ্রিন
- হাড়ে সংক্রমণ হলে আর কোনো হাড় যখন চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে তখন সংক্রমণ এড়ানোর জন্যে।
- গনোরিয়া
- সিফিলিস

পেনিসিলিনের ইনজেকশন নানাভাবে তৈরি হয়ে আসে। কোনো পেনিসিলিনের ইনজেকশন দেবার আগে, তাতে কতটা আর কি ধরনের পেনিসিলিন আছে, সেটা ভাল করে দেখে নেবেন।

পেনিসিলিনের ইনজেকশন ঠিকমত বেছে নেয়া:

কয়েক ধরনের পেনিসিলিন চট করে কাজ করে, কিন্তু কাজটা বেশিদিন থাকে না। অন্য কয়েকটা অনেক ধীরে কাজ করে, কিন্তু কাজটা অনেকদিন ধরে থাকে। কোনো কোনো সময় এক ধরনের—কোনো সময় আবার অন্য ধরনের ওষুধগুলি ব্যবহার করা ভাল।

যে সব পেনিসিলিনের কাজ কম সময় থাকে: এগুলির অনেক নাম হয়। যেমন—কৃস্টালাইন পেনিসিলিন, বেনজিল পেনিসিলিন, একুইয়াস পেনিসিলিন, সলিউবল পেনিসিলিন, সোডিয়াম পেনিসিলিন, পটাসিয়াম পেনিসিলিন আর পেনিসিলিন জি-এর ইনজেকশন। এই সব পেনিসিলিন চট করে কাজ করে, কিন্তু শরীরে অল্পক্ষণ থাকে। তাই এগুলির ইনজেকশন ৬ ঘন্টা অন্তর অন্তর (দিনে ৪ বার) দিতে হয়। খুব কঠিন সংক্রমণে—যখন বেশি মাত্রার পেনিসিলিন লাগে, তখন একটা অল্প সময়ের পেনিসিলিন বেছে নেয়াই সব থেকে ভাল। যেমন, গ্যাস গ্যাংগ্রিন হলে বা চামড়া ফুটো করে হাড় বেরিয়ে এলে।

যে সব পেনিসিলিন মাঝামাঝি সময় কাজ করে: প্রোকেইন পেনিসিলিন বা প্রোকেইন পেনিসিলিন এলুমিনিয়াম মনোস্টিয়ারেট (পি এ এম)। এগুলি আর একটু ধীরে কাজ করে, আর, শরীরে প্রায় একদিন থাকে। তাই, দিনে একবার এগুলির ইনজেকশন দেয়া উচিত। যে সব সংক্রমণে পেনিসিলিনের ইনজেকশন লাগে, তার মধ্যে বেশিরভাগের বেলায় প্রোকেইন পেনিসিলিন বা প্রোকেইনের সঙ্গে একটা কম সময়ের পেনিসিলিন মিশিয়ে দিলে সব থেকে ভাল হয়।

যে সব পেনিসিলিনের কাজ অনেকক্ষণ থাকে: বেনজাথাইন বা বেনেথামাইন পেনিসিলিন। এই সব পেনিসিলিন রক্তের মধ্যে ধীরে ধীরে ঢুকে এক মাস পর্যন্ত থাকে। এগুলির প্রধান কাজ হল স্ট্রেপ গলার চিকিৎসা আর বাতের জ্বর এড়ানো। যে ইনজেকশন দেয়, তার থেকে রোগী যখন অনেক দূরে থাকে, বা যখন পেনিসিলিন খাওয়ার ব্যাপারে রোগীর ওপর নির্ভর করা যায় না, তখন এগুলি কাজে লাগে। অল্পস্বল্প সংক্রমণে একটা ইনজেকশনই যথেষ্ট হতে পারে। বেনজাথাইন পেনিসিলিন, প্রায়ই, বেশি তাড়াতাড়ি কাজ করার পেনিসিলিনগুলির সঙ্গে মেশানো ভাবে পাওয়া যায়।

কৃস্টালাইন পেনিসিলিন (একটা কম সময়ের পেনিসিলিন)

চেনা কোম্পানির নাম: *বেনজিল পেনিসিলিন,* কৃস্টাপেন।

নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ ১০ লাখ ইউ শিশিতে (৬২৫ মিঃ গ্রাঃ) পাওয়া যায়।

কঠিন সংক্রমণের জন্যে কৃস্টালাইন বা যে কোনো কম সময়ের পেনিসিলিনের *মাত্রা*:

প্রতি ৪ বা ৬ ঘন্টায় একটি করে ইনজেকশন দেবেন।

প্রতিবারের ইনজেকশনে দেবেন:

বড়দের: ৫,০০,০০০ ইউ

ছোটদের: ৪-১২ বছর বয়সের: ১,০০,০০০ ইউ
ছোটদের: ২-৩ বছর বয়সের: ৫০,০০০ ইউ
১ বছরের কম বয়সের শিশুদের: ৫০,০০০ ইউ—দিনে দু বার।

দুটি ভাগ করা মাত্রায়

প্রোকেইন পেনিসিলিন (মাঝামাঝি সময় কাজ করার)

চেনা কোম্পানির নাম: *প্রোনাপেন; ডায়াপেন-এফ; মুনোপেন;*।

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———

মাঝারি ধরনের সংক্রমণের জন্যে প্রোকেইন পেনিসিলিনের *মাত্রা*:

দিনে একটি ইনজেকশন দেবেন।

প্রতি ইনজেকশনে দেবেন:

বড়দের: ৩,০০,০০০ থেকে ৬,০০,০০০ ইউ
ছোটদের: ৮-১২ বছর বয়সের: ৩,০০,০০০ ইউ
ছোটদের: ৩-৭ বছর বয়সের: ১,৫০,০০০ ইউ
৩ বছরের কম বয়সের শিশুদের: ৭৫,০০০ ইউ
সদ্য জন্মানো শিশুদের: অন্য কোনো পেনিসিলিন বা এমপিসিলিন পাওয়া গেলে, **এটা দেবেন না**। জরুরি অবস্থায়: ৭৫,০০০ ইউ

খুব সাংঘাতিক সংক্রমণ হলে, ওপরের মাত্রার দুগুণ দেবেন। তবে, একটা কম সময়ের পেনিসিলিন ব্যবহার করাই ভাল।

প্রোকেইন পেনিসিলিনের সঙ্গে কোনো কম সময়ের পেনিসিলিন মেশানো থাকলে, তার *মাত্রা* প্রোকেইন পেনিসিলিনের মতই হবে।

বেনজাথাইন পেনিসিলিন (অনেকটা সময় ধরে কাজ করে)

চেনা কেম্পানির নাম: *বেনাপেন; পেনিডিওর-এপি, পেনিডিওর-এল এ*

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———

ছোটখাট থেকে মাঝারি ধরনের সংক্রমণের জন্যে বেন জাথাইন পেনিসিলিনের *মাত্রা*:

৪ দিন অন্তর অন্তর একটি করে ইনজেকশন দেবেন। ছোটখাট সংক্রমণে একটি ইনজেকশনই যথেষ্ট হতে পারে।

বড়দের: ৬,০০,০০০ ইউ থেকে ১২,০০,০০০ ইউ
ছোটদের: ৮-১২ বছর বয়সের: ৩,০০,০০০ ইউ থেকে ৬,০০,০০০ ইউ
ছোটদের: ৩-৭ বছর বয়সের: ১,৫০,০০০ ইউ থেকে ৩,০০,০০০ ইউ
ছোটদের: ১-৩ বছর বয়সের ১,৫০,০০০ ইউ
১ বছরের কম বয়সের শিশুদের: **দেবেন না**।

বাতের জ্বরের বেলায়:

চিকিৎসা: যদি ১২ বছরের কম বয়সের ছেলেপিলের বাতের জ্বর হয়, তবে প্রোকেইন পেনিসিলিন দেবেন—১০ দিন ধরে দিনে একবার ৩,০০,০০০ ইউ করে। ১২ বছরের বেশি বয়সের ছেলেপিলেদের ১০ দিন ধরে দিনেএকবার ৬,০০,০০০ ইউ করে দেবেন।

যাদের আগে বাতের জ্বর হয়ে গেছে, তাদের **যাতে আবার সংক্রমণটা না হয়**, তার জন্যে দেবেন:

পেনিসিলিন খাওয়ার বড়ি: ২,০০,০০০ ইউ (একটি বড়ি) দিনে দুবার।

অথবা

বেনজাথাইন পেনিসিলিন—৬,০০,০০০ থেকে ৯,০০,০০০ ইউ—মাসে একবার।

গনোরিয়ার বেলায়, দেবেন:

প্রোকেইন পেনিসিলিনের ইনজেকশন—২৪,০০,০০০ ইউ—শুধু একবার

প্রতি পাছায় অর্দ্ধেকটা করে ইনজেকশন দিয়ে দেবেন।

সিফিলিসের বেলায় দেবেন:

সংক্রমণ কতটা সাংঘাতিক সেই অনুসারে ৮ থেকে ১৫ দিন ধরে দিনে একবার ৬,০০,০০০ ইউ করে প্রোকেইন পেনিসিলিনের ইনজেকশন।

অথবা

২৪,০০,০০০ ইউ বেনজাথাইন পেনিসিলিনের ইনজেকশন—শুধু একবার। প্রতি পাছায় অর্দ্ধেক মাত্রা করে ইনজেকশন দেবেন।

এমপিসিলিন: অনেক কাজে লাগার (ব্রড স্পেকট্রাম) পেনিসিলিন

এমপিসিলিন

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———

এমপিসিলিন হচ্ছে একটা *ব্রড স্পেকট্রাম* (অনেক কাজে লাগার) পেনিসিলিন। অন্য সব পেনিসিলিনের থেকে এটি অনেক বেশি ধরনের জীবাণুকে মেরে ফেলতে পারে। এটি অনেক কাজে লাগার অন্যান্য এনটিবায়োটিকের থেকে নিরাপদ। বিশেষ করে শিশুদের আর ছোট ছেলেপিলেদের পক্ষে এটি উপকারি।

যেখানে সাধারণ পেনিসিলিনে সমান ভাল কাজ হতে পারে, সেখানে এমপিসিলিন ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ, এর দাম বেশি আর এর থেকে কখনো কখনো পাৎলা পায়খানা বা থ্রাশ (ছত্রাকের সংক্রমণ) হয়।

খাওয়ার এমপিসিলিন ভাল কাজ করে। এমপিসিলিনের ইনজেকশন শুধু—মেনিনজাইটিস, পেরিটোনাইটিস আর এপেনডিসাইটিসের মত কঠিন রোগে কিংবা যখন রোগী ওষুধটা বমি করে ফেলে বা খেতে পারে না—তখন ব্যবহার করা উচিত।

নিচের রোগগুলির চিকিৎসায় এমপিসিলিন বিশেষ উপকারি:

- সদ্যজন্মানো শিশুর সেপটিসিমিয়া বা কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না এমন রোগে
- ৬ বছরের কম বয়সের ছেলেপিলেদের নিউমোনিয়া বা কানের সংক্রমণে;
- সাংঘাতিক পাৎলা পায়খানার সঙ্গে জ্বরে।

সাধারণ পাৎলা পায়খানার সঙ্গে জ্বর না থাকলে এমপিসিলিন ব্যবহার করবেন না।

- সাংঘাতিক পাৎলা পায়খানার অথবা আমাশয়ের সঙ্গে জ্বরে;
- মেনিনজাইটিসে;
- পেরিটোনাইটিস আর এপেনডিসাইটিসে;
- পেচ্ছাপের ব্যবস্থায় কঠিন সংক্রমণে;

● টাইফয়েডের জ্বরে (ক্লোরামফেনিকল দিয়ে সংক্রমণ সামলানোর পর, অথবা ক্লোরামফেনিকলে কাজ না হলে)।

যে সব লোকের পেনিসিলিনে এলার্জি আছে তাদের এমপিসিলিন ব্যবহার করা উচিত নয়। পেনিসিলিনের *ঝুঁকি আর সাবধানতা*—পৃঃ ৩৯৭ দেখুন।

এমপিসিলিনের *মাত্রা:*

খাওয়ার: (৫০ মিঃ গ্রাঃ/কেঃ জিঃ/দিন)

বড়দের বেলায় ২৫০ মিঃ গ্রামের ক্যাপসুল ব্যবহার করুন।

৩ বছরের কম বয়সের শিশুদের জন্যে, সিরাপ দেবেন—যাতে প্রতি চা চামচে (৫ মিঃ লিঃ) ১২৫ মিঃ গ্রাঃ থাকে।

দিনে ৪ মাত্রা দেবেন।

প্রতি মাত্রায় দেবেন:

বড়দের: ২ ক্যাপসুল (৫০০ মিঃ গ্রাঃ)
ছোটদের: ৮-১২ বছর বয়সের: ১ ক্যাপসুল (২৫০ মিঃ গ্রাঃ)
ছোটদের: ৩-৭ বছর বয়সের: ½ ক্যাপসুল বা ১ চা চামচ (১২৫ মিঃ গ্রাঃ)
৩ বছরের কম বয়সের শিশুদের: ¼ ক্যাপসুল বা ½ চা চামচ (৬২ মিঃ গ্রাঃ)
সদ্য জন্মানো শিশুদের: ৩ বছরের কম বয়সীদের মতই।

ইনজেকশন: কঠিন সংক্রমণের জন্যে—(৫০ থেকে ১০০ মিঃ গ্রা/কে জি/দিন—মেনিনজাইটিসের জন্যে ৩০০ মিঃ গ্রাঃ/কে জি/দিন—পর্যন্ত):
২৫০ মিঃ গ্রামের শিশি—

দিনে ৪ মাত্রা—৬ ঘন্টা অন্তর অন্তর ১ মাত্রা দেবেন:
প্রতি মাত্রায় দেবেন:

বড়দের: ৫০০ মিঃ গ্রাঃ (দুটি ২৫০ মিঃ গ্রামের শিশি)
ছোটদের: ৮-১২ বছর বয়সের: ২৫০ মিঃ গ্রাঃ (একটি ২৫০ মিঃ গ্রামের শিশি)
ছোটদের: ৩-৭ বছর বয়সের: ১২৫ মিঃ গ্রাঃ (২৫০ মিঃ গ্রামের শিশির অর্দ্ধেক)
৩ বছরের কম বয়সের শিশুদের: ৬২ মিঃ গ্রাঃ (২৫০ মিঃ গ্রামের শিশির সিকিভাগ)
সদ্যজন্মানো শিশুদের: ১২৫ মিঃ গ্রাঃ (২৫০ মিঃ গ্রামের শিশির অর্দ্ধেক) দিনে শুধু দুবার

সংক্রমণের লক্ষণগুলি চলে যাবার পরেও অন্ততঃ ২ দিন ধরে এমপিসিলিন দিয়ে যাবেন।

পেনিসিলিনের সঙ্গে স্ট্রেপটোমাইসিন

স্ট্রেপটোমাইসিন যক্ষ্মার চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। এটি পেনিসিলিনের সঙ্গে মিশিয়ে যদি যক্ষ্মা ছাড়া অন্য কোনো রোগের জন্যে দেয়া হয়, তাহলে সেই এলাকায় যেসব যক্ষ্মার জীবাণু আছে, সেগুলির এই ওষুধে প্রতিরোধ জন্মে যাবে। তখন, সেই এলাকায় কারো যক্ষ্মা হলে, রোগটা সারাবার জন্যে তার অনেক বেশি দামের ওষুধ লাগবে।

কোনো রোগের জন্যে পেনিসিলিন মেশানো স্ট্রেপটোমাইসিন একেবারেই দেবেন না। সাধারণ কয়েকটি কোম্পানির নাম হল: ডাইক্রিস্টাসিন, ওমনামাইসিন, প্রোসিলিন-এস।

এরিথ্রোমাইসিন
পেনিসিলিনের বদলে দেবার মত একটি ওষুধ

<u>এরিথ্রোমাইসিন</u>

চেনা কোম্পানির নাম: *এরিথ্রোসিন; থ্রোমাইসিন; এরিসিম।*

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———

এরিথ্রোমাইসিন খুব দামি ওষুধ। যাদের পেনিসিলিনে এলার্জি আছে, তারা পেনিসিলিনের বদলে এটি ব্যবহার করতে পারে।

এরিথ্রোমাইসিন মোটামুটি নিরাপদ ওষুধ। কিন্তু যে মাত্রা বলে দেয়া হয়েছে তার থেকে বেশি যাতে না দেয়া হয় সেদিকে নজর রাখা উচিত। ২ সপ্তাহের বেশি সময় ধরে খাবেন না—কারণ তার থেকে ন্যাবা হতে পারে।

পেটের গোলমাল এড়াতে খাবারের সঙ্গে এরিথ্রোমাইসিন খাবেন।

এরিথ্রোমাইসিনের *মাত্রা*—যাদের পেনিসিলিনে এলার্জি আছে তাদের জন্যে:

দিনে ৪ বার ১ মাত্রা করে দেবেন।

প্রতি মাত্রায় দেবেন:

বড়দের: ৫০০ মিঃ গ্রাঃ (দুটি বড়ি বা ৪ চা চামচ)
ছোটদের: ৮-১২ বছর বয়সের: ২৫০ মিঃ গ্রাঃ (একটি বড়ি বা ২ চা চামচ)
ছোটদের: ৩-৭ বছর বয়সের: ১৫০ মিঃ গ্রাঃ (অর্ধেক বড়ি বা ১ চা চামচ)
৩ বছরের কম বয়সের শিশুদের: ৭৫ থেকে ১৫০ মিঃ গ্রাঃ (¼ থেকে ½ বা ½ থেকে ১ চা চামচ)

এরিথ্রোমাইসিনের সঙ্গে ভিটামিন বি কমপ্লেকসের বড়ি দেবেন।

টেট্রাসাইক্লিন
অনেক কাজে লাগার এনটিবায়োটিক

<u>টেট্রাসাইক্লিন (টেট্রাসাইক্লিন এইচ সি এল, অকসিটেট্রাসাইক্লিন ইত্যাদি)</u>

(চেনা কিন্তু দামি কোম্পানির নাম: *টেরামাইসিন, থ্রিওসাইক্লিন*)।

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———
এটি ক্যাপসুল আর সিরাপে পাওয়া যায়।

টেট্রাসাইক্লিনগুলি *ব্রডস্পেকট্রাম* এনটিবায়োটিক; অর্থাৎ এগুলি অনেকগুলি বিভিন্ন ধরনের জীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করে।

টেট্রাসাইক্লিন খাওয়ার ওষুধ ব্যবহার করা উচিত। কারণ খাওয়ার ওষুধে ইনজেকশনের মতই ভাল কাজ হয়—সমস্যাও অনেক কম হয়।

নিচের রোগগুলিতে টেট্রাসাইক্লিন ব্যবহার করা যায়:

জীবাণু বা এমিবা থেকে যে পাৎলা পায়খানা বা আমাশা হয়;
সাইনাসাইটিস;
শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ (ব্রঙ্কাইটিস ইত্যাদি)
পেচ্ছাপের ব্যবস্থায় সংক্রমণ
কলেরা
ট্র্যাকোমা;
পিত্তকোষের সংক্রমণ

সাধারণ সর্দিকাশিতে টেট্রাসাইক্লিন কোনো কাজে লাগে না। অনেক সাধারণ রোগে এটি পেনিসিলিন বা সালফার মত ভাল কাজ করে না। এটির দামও বেশি। এর ব্যবহার সীমিত রাখা উচিত।

টেট্রাসাইক্লিনের সঙ্গে সবসময় ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স দেবেন। প্রচুর জলও খেতে দেবেন।

ঝুঁকি আর সাবধানতা:

১. পোয়াতি মেয়েদের ৪ মাস পেরিয়ে গেলে টেট্রাসাইক্লিন খাওয়া উচিত নয়, কারণ এর থেকে শিশুর দাঁতে ক্ষতি বা দাগ হয়ে যেতে পারে। **৬ বছরের কম বয়সের ছেলেপিলেদের নিতান্ত দরকার হলে তবেই টেট্রাসাইক্লিন ব্যবহার করা উচিত—তাও কম দিন ধরে, কারণ এর থেকে হাড়ের বাড়া কমে যায়।**
২. টেট্রাসাইক্লিন থেকে পাৎলা পায়খানা বা পেটের গোলমাল হতে পারে—বিশেষ করে অনেকদিন ধরে খেলে।
৩. পুরনো বা কাজ ফুরিয়ে যাবার দিন পার হয়ে যাওয়া টেট্রাসাইক্লিন খাওয়া বিপজ্জনক, কারণ এর থেকে **কিডনির ক্ষতি হয়।**
৪. অপুষ্ট শিশুদের এটি দিলে, তাদের ওজন আরো কমে যেতে পারে।

টেট্রাসাইক্লিনের *মাত্রা* —(২০ থেকে ৪০ মিঃ গ্রাঃ/কে জি দিন): —২৫০ মিঃ গ্রামের ক্যাপসুল আর ৫ মিঃ লিটারে ১২৫ মিঃ গ্রামের মিক্সচার—

দিনে ৪ বার টেট্রাসাইক্লিন খেতে দেবেন।

প্রতি মাত্রায় দেবেন:

বড়দের: ২৫০ মিঃ গ্রাঃ (১ ক্যাপসুল)
ছোটদের: ৮ থেকে ১২ বছর বয়সের: ১২৫ মিঃ গ্রাঃ (১/২ ক্যাপসুল)
ছোটদের: ৪ থেকে ৭ বছর বয়সের: ৮০ মিঃ গ্রাঃ
ছোটদের: ১ থেকে ৩ বছর বয়সের: ৬০ মিঃ গ্রাঃ
১ বছরের কম বয়সের শিশুদের: ২৫ মিঃ গ্রাঃ
সদ্যজন্মানো শিশুদের (অন্য কোনো এনটিবায়োটিক পাওয়া না গেলে): ৮ মিঃ গ্রাঃ

শরীর যাতে টেট্রাসাইক্লিন সব থেকে ভালভাবে কাজে লাগাতে পারে, তার জন্যে, ওষুধটা খাওয়ার আগের বা পরের এক ঘন্টার মধ্যে দুধ, অম্বলের ওষুধ বা লোহা দেয়া খাবার বা ওষুধ খাওয়া উচিত নয়।

বেশিরভাগ সংক্রমণের বেলায়, সংক্রমণের লক্ষণগুলি চলে যাওয়ার পরেও ১ বা ২ দিন ধরে টেট্রাসাইক্লিন খেয়ে যাওয়া উচিত। কয়েক ধরনের পাৎলা পায়খানার রোগ, কয়েক **মাত্রা** খাবার পরেই সেরে যায়। (পাৎলা পায়খানার নানারকম **ওষুধের** জন্যে পৃঃ ১৮৭-১৮৯ দেখুন)

কোনো গনোরিয়া বা সিফিলিসের রোগীর যদি পেনিসিলিনে এলার্জি থাকে, তবে তাকে এইভাবে টেট্রাসাইক্লিনের ক্যাপসুল দেবেন:

গনোরিয়ার জন্যে: ২ দিন ধরে দিনে ৪ বার দুটি করে ক্যাপসুল।
সিফিলিসের জন্যে: সংক্রমণটা কতটা বেশি সেই অনুসারে ২ বা ৩ সপ্তাহ ধরে, দিনে ৪ বার দুটি করে ক্যাপসুল।

চামড়ার ক্ষত বা সংক্রমণের জন্যে টেট্রাসাইক্লিনের মলম ব্যবহার করা উচিত নয়। এর থেকে এলার্জির প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

ট্র্যাকোমার জন্যে টেট্রাসাইক্লিন চোখের মলম ব্যবহার করা যেতে পারে।

ক্লোরামফেনিকল:
টাইফয়েডের জন্যে একটি এনটিবায়োটিক

ক্লোরামফেনিকল (*ক্লোরোমাইসেটিন*)

চেনা কোম্পানির নাম: *ক্লোরোমাইসেটিন; এনটারোমাইসেটিন*

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———

এই ব্রডস্পেকট্রাম এনটিবায়োটিকটি অনেকগুলি নানা ধরনের জীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করে। এটি সস্তা, কিন্তু এটির ব্যবহারে কিছু বিপদ আছে। এই কারণে এর ব্যবহার খুব সীমিত রাখতে হবে।

ক্লোরামফেনিকল শুধু **টাইফয়েডের** জন্যে, অথবা খুব সাংঘাতিক পাৎলা পায়খানায় বা যেসব সংক্রমণ সালফা, পেনিসিলিন, টেট্রাসাইক্লিন বা এমপিসিলিনে ভাল হয় না, সেগুলির জন্যে ব্যবহার করা উচিত।

টাইফয়েড ছাড়া অন্য সব রোগে এমপিসিলিন সাধারণতঃ ক্লোরামফেনিকলের মতই বা তার থেকে বেশি ভাল কাজ করে; আর অনেক নিরাপদও। দুঃখের বিষয়, এমপিসিলিনের দাম খুব বেশি, তাই অনেক সময় তার বদলে ক্লোরামফেনিকল ব্যবহার করতেই হয়।

ক্লোরামফেনিকলের সঙ্গে, সবসময়, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স খেতে দেবেন।

সাবধান: ক্লোরামফেনিকল কারো কারো রক্তের ক্ষতি করে। কচি বাচ্চাদের পক্ষে এটি আরো বেশি বিপজ্জনক—বিশেষ করে যেসব শিশু অসময়ে জন্মায় তাদের পক্ষে। **কচি বাচ্চাদের কঠিন সংক্রমণ হলে ক্লোরামফেনিকল না দিয়ে বরং এমপিসিলিন দেবেন। ১ মাসের কম বয়সের শিশুদের ক্লোরামফেনিকল দেবেন না।**

দেখবেন—ক্লোরামফেনিকলের যে মাত্রা বলা আছে—তার

থেকে বেশি যেন দেবেন না। **শিশুদের জন্যে এই মাত্রাটা খুবই কম** (নিচে দেখুন)।

অনেকদিন ধরে বা বারবার এই ওষুধ ব্যবহার করবেন না।

টাইফয়েডের চিকিৎসায়, রোগটা কমে এলেই, ক্লোরামফেনিকল বন্ধ করে এমপিসিলিন শুরু করবেন। (যেসব এলাকায় ক্লোরামফেনিকলে টাইফয়েডের প্রতিরোধ আছে বলে জানা আছে, সেখানে পুরো চিকিৎসাটাই এমপিসিলিন দিয়ে করা উচিত।)

ক্লোরামফেনিকলের খাওয়ার ওষুধে প্রায়ই ইনজেকশনের থেকে বেশি কাজ হয়, বিপদও কম থাকে। কদাচিৎ যখন রোগী গিলতে পারে না—তখন ছাড়া **ক্লোরামফেনিকলের ইনজেকশন দেবেন না।**

ক্লোরামফেনিকলের *মাত্রা*—(বড়দের ৫০ থেকে ১০০ মিঃ গ্রাঃ/কেজি/দিন): ২৫০ মিঃ গ্রাঃ ক্যাপসুল বা ৫ মিঃ লিটারে ১২৫ মিঃ গ্রামের মিক্সচার।

দিনে ৪ বার খেতে দেবেন।

প্রতি মাত্রায় দেবেন:

বড়দের: ৫০০ থেকে ১০০০ মিঃ গ্রাঃ (২ থেকে ৪ ক্যাপসুল)। টাইফয়েড, পেরিটোনাইটিস এবং অন্যান্য বিপজ্জনক সংক্রমণে বেশি মাত্রাটা দেয়া উচিত (দিনে ৪ বার তিনটি করে ক্যাপসুল—অর্থাৎ সারাদিনে বারটা ক্যাপসুল)।

ছোটদের: ৮ থেকে ১২ বছর বয়সের: ২৫০ মিঃ গ্রাঃ (১ ক্যাপসুল বা ২ চা চামচ মিক্সচার)

ছোটদের: ৩ থেকে ৭ বছর বয়সের: ১২৫ মিঃ গ্রাঃ (½ বা ১ চা চামচ মিক্সচার)

১ মাস থেকে ২ বছর বয়সের শিশুদের শরীরের ওজনের প্রতি কে জি-র জন্যে ২৫ মিঃ গ্রাঃ (⅕ চা চামচ মিক্সচার বা একটি ক্যাপসুলের ১/১০ ভাগ) দেবেন। (এইভাবে, ৫ কে জি ওজনের শিশু একদিনে ১২৫ মিঃ গ্রাঃ—অর্থাৎ ১ চা চামচ মিক্সচার বা ½ ক্যাপসুল পাবে।)

এটা ৪ মাত্রায় ভাগ করে দিতে হবে। প্রতি মাত্রায় শিশু ⅛ ক্যাপসুল বা ¼ চা চামচ মিক্সচার পাবে।

সালফা (বা সালফোনামাইড): সাধারণ সংক্রমণের জন্যে সস্তা ওষুধ

<u>সালফাডায়াজিন, সালফিসোকসাজোল, সালফাডিমিডিন</u> বা <u>'ট্রিপল সালফা'</u>।

চেনা কোম্পানির নাম: *ম্যাড্রিবন; গ্যানট্রিসিন।*

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———

সালফা বা সালফোনামাইডগুলি নানা ধরনের জীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করে। কিন্তু এগুলি অনেক এনটিবায়োটিকের থেকে কমজোরি; তাছাড়া, এগুলি থেকে এলার্জির প্রতিক্রিয়া (চুলকুনি) এবং অন্যান্য সমস্যা হবার সম্ভাবনাও বেশি। তবুও, সস্তা এবং খাওয়া যায় বলে এগুলি কাজে লাগে।

পেচ্ছাপের সংক্রমণের বেলায় সালফাগুলি সব থেকে দরকারি কাজ করে। কয়েক ধরনের কানের সংক্রমণে এবং পাঁচড়া আর অন্য যেসব চামড়ার সংক্রমণে পুঁজ হয়, সেখানে এগুলি ব্যবহার করা যায়।

সব সালফা একরকমভাবে ব্যবহার করা হয় না—তাদের মাত্রাও এক নয়। প্রত্যেকটি সালফোনামাইড ব্যবহার করার আগে সেটির সঠিক ব্যবহার আর মাত্রা দেখে নেবেন। যে সালফাগুলির নাম ওপরে বলা হয়েছে, সালফাথিয়াজোল সেই ধরনেরই ওষুধ—খুব সস্তাও। কিন্তু এর থেকে অনেক উপসর্গ হতে পারে বলে এটি খেতে বলা হচ্ছে না।

সালফাগুলি, পাৎলা পায়খানায় যত ভাল কাজ করত, এখন আর ততটা করে না, কারণ যেসব জীবাণুগুলি থেকে পাৎলা পায়খানা হয়, তাদের অনেকগুলিরই সালফাতে প্রতিরোধ জন্মে গেছে।

সাবধান:

কিডনির যাতে ক্ষতি না হয়, তার জন্যে সালফা খাওয়ার সময় **প্রচুর জল খাওয়া উচিত।**

যদি কোনো সালফা খেয়ে র‍্যাশ, চুলকুনি, গাঁটে ব্যথা, জ্বর বা পিঠের নিচের দিকে ব্যথা হয়, অথবা পেচ্ছাপে রক্ত দেখা যায়, তবে **ওষুধটা বন্ধ করে দিন আর প্রচুর জল খান।**

যার শরীরে জলের অভাব হয়েছে, তাকে কখনো সালফা দেবেন না।

দ্রষ্টব্য: কাজে লাগাতে হলে, সালফাগুলি ঠিক মাত্রায় খেতে হবে—সেটা বেশ বেশিই। দেখবেন যেন কম খাবেন না—কিন্তু বেশিও নয়।

সালফাডায়াজিন, সালফিসোকসাজোল, সালফাডিমিডিন বা ট্রিপল সালফার *মাত্রা* (২৮০ মিঃ গ্রাঃ/কেজি/দিন): —৫০০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি অথবা ৫ মিঃ লিটারে ৫০০ মিঃ গ্রাঃ মিক্সচার—

দিনে ৪ মাত্রা দেবেন—**প্রচুর জলের সঙ্গে!**

প্রতি মাত্রায় দেবেন:

বড়দের: প্রথমবার ৩ থেকে ৪ গ্রাঃ (৬ থেকে ৮ বড়ি) তারপরের মাত্রাগুলিতে ১ গ্রাম (২ বড়ি) করে

ছোটদের: ৮ থেকে ১২ বছর বয়সের: প্রথম মাত্রায় ২ গ্রাম (৪ বড়ি বা ৪ চা চামচ মিক্সচার) তারপরের মাত্রাগুলিতে (২ বড়ি বা ২ চা চামচ) করে

ছোটদের: ৪ থেকে ৮ বছর বয়সের: প্রতি মাত্রায় ৭৫০ মিঃ গ্রাঃ (১½ বড়ি বা ১½ চা চামচ)

ছোটদের: ২ থেকে ৪ বছর বয়সের: প্রতি মাত্রায় ৫০০ মিঃ গ্রাঃ (১ বড়ি বা ১ চা চামচ)

১ বছর বা তার কম বয়সের শিশুদের: **সালফা দেবেন না।** দেবার মত অন্য কোনো ওষুধ না থাকলে, দিনে ৪ বার ২৫০ মিঃ গ্রাঃ (½ বড়ি বা ½ চাচামচ) করে দেবেন।

পেচ্ছাপের ব্যবস্থায় সংক্রমণের জন্যে :

সালফিসোকসাজোল—পৃঃ ২৭৯

সালফামেথিজোল (*ইউরোলিউকোসিল*)

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———

৫০০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি হিসেবে পাওয়া যায়।

পেচ্ছাপের ব্যবস্থায় সংক্রমণের জন্যে সালফামেথিজোলের *মাত্রা*:

১০ দিন ধরে দিনে ৪ মাত্রা দেবেন।

প্রতি মাত্রায় দেবেন:

বড়দের: ৫০০ মিঃ গ্রাঃ (১ বড়ি)

ছোটদের: ৮ থেকে ১২ বছর বয়সের: ২৫০ মিঃ গ্রাঃ ($^1/_2$ বড়ি)

ছোটদের: ৩ থেকে ৭ বছর বয়সের: ১২৫ মিঃ গ্রাঃ ($^1/_4$ বড়ি)

সালফাফেনাজোল (*অরিসুল*)

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণত ৫০০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি হিসেবে পাওয়া যায়।

সালফাফেনাজোলের *মাত্রা*:

বড়দের: প্রথম ২ দিন দিনে ২ বার: ১০০০ মিঃ গ্রাঃ (২ বড়ি)। তারপরে ৩ দিন দিনে ২ বার: ৫০০ মিঃ গ্রাঃ (১ বড়ি)।

ছোটদের: ১৪ বছরের কম বয়সের: দিনে ২ মাত্রা দেবেন। প্রতি মাত্রায় দেবেন:

৫ থেকে ১৪ বছর বয়সের: ৭৫০ মিঃ গ্রাঃ (১$^1/_2$ বড়ি)

২ থেকে ৪ বছর বয়সের: ৫০০ মিঃ গ্রাঃ (১ বড়ি)

২বছরের কম বয়সীদের: ২৫০ মিঃ গ্রাঃ ($^1/_2$ বড়ি)

ট্রাইমেথাপ্রিমের সঙ্গে সালফামেথোকসাজোল (*সেপট্রান, ব্যাকট্রিম*)

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ একটি বড়িতে ৮০ মিঃ গ্রাঃ ট্রাইমেথাপ্রিম আর ৪০০ মিঃ গ্রাঃ সালফামেথোকসাজোল থাকে। হয় ট্রাইমেথাপ্রিম নয় সালফামেথোকসাজোল অনুসারে মাত্রা ঠিক করা যেতে পারে।

পেচ্ছাপের ব্যবস্থায় সংক্রমণের জন্যে মাত্রা:

১০ দিন ধরে ২ মাত্রা করে দেবেন। প্রতি মাত্রায় দেবেন:

বড়দের: ২ বড়ি

ছোটদের: ৮ থেকে ১২ বছর বয়সের: ১ বড়ি

৩ বছরের কম বয়সী শিশুদের: $^1/_2$ বড়ি

পোয়াতি মেয়েদের দেবেন না।

ফেনাজোপাইরিডিন হাইড্রোক্লোরাইড (*পাইরিডিয়াম*)

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারাণতঃ ১০০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি হিসেবে পাওয়া যায়।

সাংঘাতিক সংক্রমণে ফেনাজোপাইরিডিন হাইড্রোক্লোরাইডের *মাত্রা* (খাওয়ার আগে দেবেন):

দিনে ৩ মাত্রা দেবেন। প্রতি মাত্রায় দেবেন:

বড়দের: ২০০ মিঃ গ্রাঃ (২ বড়ি)

ছোটদের: ৯ থেকে ১২ বছর বয়সের: ১০০ মিঃ গ্রাঃ (১ বড়ি)

ছোটদের: ৬ থেকে ৯ বছর বয়সের: ১০০ মিঃ গ্রাঃ (১ বড়ি)—দিনে ২ বার

৬ বছরের কমবয়সীদের জন্যে অন্য কোনো ওষুধ, যেমন, ট্রাইমেথাপ্রিমের সঙ্গে সালফামেথোকসাজোল ব্যবহার করুন।

এই ওষুধটি রোগ সারায় না; তবে, ব্যথাটা কমায়। যে এই ওষুধটি খায়, তার পেচ্ছাপটা লাল হয়ে যায়।

যক্ষ্মার ওষুধ

যক্ষ্মার চিকিৎসায় সর্বদা একসঙ্গে দুটি বা তিনটি যক্ষ্মার ওষুধ ব্যবহার করাটা খুবই জরুরি। শুধু একটা ওষুধ ব্যবহার করলে, সাধারণতঃ, যক্ষ্মার জীবাণুগুলোর সেই ওষুধে প্রতিরোধ জন্মে যায়, আর রোগটার চিকিৎসা বেশি কঠিন হয়ে যায়।

যাতে আবার না হয়, তার জন্যে **যক্ষ্মার চিকিৎসা অনেকদিন —সাধারণতঃ অন্ততঃ ১৮ মাস—ধরে চালানো উচিত।**

যক্ষ্মার ওষুধ দামি নয়। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে এগুলি বিনাপয়সায় পাওয়া যায়। রোগী যদি এই বিনাপয়সার ওষুধগুলি খাওয়া বন্ধ করে দেয়, তবে জীবাণগুলির ওই ওষুধে প্রতিরোধ জন্মে যায়। তারপরে যে নতুন ওষুধগুলি দিতে হয়, সেগুলির দাম খুব বেশি।

যক্ষ্মার চিকিৎসা করতে হলে, সব থেকে ভাল হল তিনটি ওষুধ দিয়ে শুরু করা: **স্ট্রেপটোমাইসিন, আইসোনিয়াজিড** আর অন্য একটা যক্ষ্মার ওষুধ। নিচে দুটির নাম দেয়া হল। সবথেকে সস্তা হল **থিয়াসিটাজোন,** কিন্তু এতে নানা উপসর্গ হয়। **প্যারা এমাইনো স্যালিসাইলিক এসিড (প্যাস)** বেশি ভাল, কিন্তু এর দাম একটু বেশি। সাধারণতঃ এটা ব্যবহার করাই ভাল।

স্ট্রেপটোমাইসিন শুধু ৩ মাস দেয়া উচিত। আইসোনিয়াজিড আর অন্য একটা যক্ষ্মার ওষুধ অন্ততঃ ১৮ মাস ধরে, একবারও বন্ধ না করে খেয়ে যাওয়া উচিত। আবার যাতে যক্ষ্মা না হয়, তার জন্যে **অনেকদিন ধরে পুরো চিকিৎসাটা করে যাওয়া অত্যন্ত জরুরি।**

স্ট্রেপটোমাইসিন

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———

যক্ষ্মার চিকিৎসার জন্যে স্ট্রেপটোমাইসিন একটা জরুরি ওষুধ। **এটি সবসময়ে অন্য ওষুধের সঙ্গে একসঙ্গে ব্যবহার করা উচিত।** যক্ষ্মা ছাড়া অন্য কোনো রোগের জন্যে স্ট্রেপটোমাইসিন দেবেন না। কারণ অন্য রোগের জন্যে বারবার স্ট্রেপটোমাইসিন ব্যবহার করলে, যক্ষ্মার জীবাণুগুলির এতে প্রতিরোধ জন্মে যায়, আর যক্ষ্মার চিকিৎসা বেশি কঠিন হয়ে যায়।

ঝুঁকি আর সাবধানতা:

ঠিক মাত্রার বেশি যাতে না দেয়া হয়, সে বিষয়ে খুব সাবধান হওয়া উচিত। খুব বেশিদিন ধরে খুব বেশি করে স্ট্রেপটোমাইসিন ব্যবহার করলে রোগী কালা হয়ে যেতে পারে।

যদি কান ভোঁ ভোঁ করতে বা কালা হয়ে যেতে শুরু করে, তবে তখনি ওষুধটা খাওয়া বন্ধ করে স্বাস্থ্যকর্মীকে দেখান।

স্ট্রেপটোমাইসিনের *মাত্রা* (৩০ থেকে ৫০ মিঃ গ্রামঃ / কেজি/দিন) —শিশিতে তরল ওষুধ অথবা জলে মেশাবার জন্যে গুঁড়ো ওষুধ যাতে ২ মিঃ লিঃ জলে ১ গ্রাঃ স্ট্রেপটোমাইসিন মেশানো হয় —

যক্ষ্মার চিকিৎসার জন্যে:

খুব সাংঘাতিক অবস্থায় —৩ মাস ধরে প্রতিদিন একটি করে ইনজেকশন দেবেন।

প্রতি ইনজেকশনে দেবেন:

বড়দের: ১ গ্রাঃ (বা ২ মিঃ লিঃ)
ছোটদের: ৮ থেকে ১২ বছর বয়সের: ৭৫০ মিঃ গ্রাঃ (বা ১$^1/_2$ মিঃ লিঃ)
ছোটদের: ৩ থেকে ৭ বছর বয়সের: ৫০০ মিঃ গ্রাঃ (বা ১ মিঃ লিঃ)
৩ বছরের কম বয়সের শিশুদের: ২৫০ মিঃ গ্রাঃ (বা $^1/_2$ মিঃ লিঃ)
কচি বাচ্চাদের শরীরের ওজনের প্রতি কেজির জন্যে ২০ মিঃ গ্রাঃ দেবেন।
কাজেই, ৩ কেঃ জিঃ ওজনের শিশু ৬০ মিঃগ্রা / $^1/_8$ মিঃ লিঃ পাবে।

স্ট্রেপটোমাইসিন সবসময় যক্ষ্মার অন্য ওষুধের সঙ্গে একসঙ্গে দেবেন।

গনোরিয়ার চিকিৎসায় স্ট্রেপটোমাইসিন:

বড়দের গনোরিয়া হলে, তাদের যদি পেনিসিলিনে এলার্জি থাকে, অথবা পেনিসিলিন বা টেট্রাসাইক্লিনে কাজ না হয় **(প্রতিরোধ** —পৃ ৩৯৭ দেখুন), তখন তাদের ৪ গ্রামঃ (৮ মিঃ লিঃ) স্ট্রেপটোমাইসিনের একটিমাত্র মাত্রা দেয়া যেতে পারে। প্রতি পাছায় অর্দ্ধেকটা করে ওষুধ ইনজেকশন করে দেবেন। অন্য সব ওষুধে সংক্রমণটার প্রতিরোধ থাকলে, শুধু তবেই এই ওষুধটা ব্যবহার করবেন।

আইসোনিয়াজিড (আই এন এইচ)

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———

যক্ষ্মার ওষুধগুলির মধ্যে এইটি সব থেকে বেশি কাজ করে। যখনি সম্ভব অন্ততঃ অন্য একটি যক্ষ্মার ওষুধের সঙ্গে এটি দেয়া উচিত।

ঝুঁকি আর সাবধানতা:

কচিৎ কখনো, আইসোনিয়জিড থেকে রক্তাল্পতা, হাতে আর পায়ে স্নায়ুর ব্যথা, পেশী নাচা, এমনকি ফিটও হয়। দিনে ৩ বার একটি করে ভিটামিন বি কমপ্লেকসের বড়ি দিয়ে সাধারণতঃ এইসব উপসর্গ এড়ানো যায়। **উপসর্গ এড়াতে আই এন এইচের সঙ্গে বি কমপ্লেকস বড়ি দেবেন।**

আইসোনিয়াজিডের *মাত্রা* —(১০ থেকে ২০ মিঃ গ্রাঃ / কেঃ জিঃ / দিন)।

অন্ততঃ ১৮ মাস ধরে দিনে একবার আইসোনিয়াজিড দেবেন।

প্রতি মাত্রায় দেবেন:

বড়দের: ৪০০ মিঃ গ্রাঃ (৪ বড়ি)
ছোটদের: তাদের ওজনের প্রত্যেক ৫ কেঃ জিঃর জন্যে ৫০ মিঃ গ্রাঃ ($^1/_2$ বড়ি)

ছোটদের সাংঘাতিক যক্ষ্মা বা যক্ষ্মার মেনিনজাইটিস হলে, অবস্থার উন্নতি হওয়া পর্যন্ত ওপরের মাত্রার দুগুণ দেয়া উচিত।

এমাইনোস্যালিসিলিক এসিড (প্যাস)

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———

ঝুঁকি আর সাবধানতা:

প্যাস থেকে বমি, পাৎলা পায়খানা আর পেটের গোলমাল হতে পারে। খাবারের বা দুধের সঙ্গে খেলে সাধারণতঃ অম্বল এড়ানো যায়। যাদের পেটের আলসার আছে, তাদের প্যাস খাওয়া উচিত নয়।

প্যাসের *মাত্রা* —(২৫০ মিঃ গ্রাঃ / কেঃ জিঃ / দিন) —৫০০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি —

অন্ততঃ ১৮ মাস ধরে দিনে ৩ বার খাবারের সঙ্গে প্যাস দেবেন।

প্রতি মাত্রায় দেবেন:

বড়দের: ৪ গ্রাম (৮ বড়ি)
ছোটদের: ৮ থেকে ১২ বছর বয়সের: ৩ গ্রাম (৬ বড়ি)
ছোটদের: ৩ থেকে ৭ বছর বয়সের: ২ গ্রাম (৪ বড়ি)
তিনবছরের কম বয়সের শিশুদের: ১ গ্রাম (২ বড়ি)

থিয়াসিটাজোন

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———

উপসর্গ: র‍্যাশ, বমি, মাথাঘোরা বা খিদের অভাব হতে পারে।

থিয়াসিটাজোনের *মাত্রা* —(৩ থেকে ৫ মিঃ গ্রাঃ / কেঃ জিঃ / দিন)
—বড়িতে ৫০ গ্রাম থিয়াসিটাজোন থাকে, সঙ্গে আইসোনিয়াজিড থাকতে বা নাও থাকতে পারে —

অন্ততঃ ১৮ মাস ধরে দিনে একবার করে দেবেন।

প্রতি মাত্রায় দেবেন:

বড়দের: ৩ বড়ি (১৫০ মিঃ গ্রাঃ)
ছোটদের: ৮ থেকে ১২ বছর বয়সের: ২ বড়ি (১০০ মিঃ গ্রাঃ)
ছোটদের: ৩ থেকে ৭ বছর বয়সের: ১ বড়ি(৫০ মিঃ গ্রাঃ)
৩ বছরের কম বয়সের শিশুদের: ½ বড়ি (২৫ মিঃ গ্রাঃ)

কুষ্ঠের জন্যে: সালফোন

ড্যাপসোন (ডায়ামিনোডাইফেনিসালফোন, ডি ডি এস/ —কুষ্ঠের জন্যে

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ ১০ মিঃ গ্রাঃ, ২৫ মিঃ গ্রাঃ বা ৫০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি হিসেবে পাওয়া যায়।

কুষ্ঠের চিকিৎসা অন্ততঃ ৪ বছর ধরে—কখনো কখনো সারা জীবন ধরে— চালানো উচিত। যে জীবাণুগুলি থেকে কুষ্ঠ হয়, সেগুলির যাতে ডি ডি এস-এ প্রতিরোধ না জন্মে যায়, তার জন্যে ওষুধটা নিয়মিত খেয়ে যাওয়াটা জরুরি। ফুরিয়ে যাবার আগেই আরো ওষুধ আনিয়ে রাখতে ভুলবেন না।

উপসর্গ: কখনো সখনো, রোগীর 'লেপ্রা প্রতিক্রিয়া' বলে একটা কঠিন সমস্যা হয়। জ্বর, স্নায়ু ফুলে গিয়ে ব্যথা, দলা দলা প্রদাহ হতে পারে। এর থেকে গাঁটে গাঁটে ব্যথা, হাত আর পা ফুলে যাওয়া অথবা চোখের গুরুতর ক্ষতি হয়ে রোগী অন্ধও হয়ে যেতে পারে।

লেপ্রা প্রতিক্রিয়া হলে, সাধারণতঃ, ডি ডি এস খাওয়া চালিয়ে যাওয়া—কিন্তু তার সঙ্গে এসপিরিন আর ক্লোরোকুইন খাওয়াই—সবথেকে ভাল। স্নায়ুতে তীব্র যন্ত্রণা হলে তবেই শুধু কর্টিকোস্টেরয়েড ব্যবহার করবেন। এটা কোনো অভিজ্ঞ স্বাস্থ্যকর্মী বা ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে দেয়া উচিত, কারণ, কর্টিকোস্টেরয়েড থেকেও নানা কঠিন সমস্যা হতে পারে; মাত্রাটাও কমানো বা বাড়ানোর দরকার হতে পারে।

সাবধান: ডি ডি এস একটি বিপজ্জনক ওষুধ। ওটি এমন জায়গায় রাখবেন, যেখানে ছেলেপিলেরা নাগাল পায় না।

ডি ডি এসের *মাত্রা*

(১½ মিঃ গ্রাঃ / কেঃ জিঃ / দিন-দিনে ১০০ মিঃ গ্রাঃ পর্যন্ত)

পুরনো ধরনের চিকিৎসায় ওষুধটা কম মাত্রায় শুরু করে কয়েকমাস ধরে আস্তে আস্তে বাড়ানোটাই বেশি ভাল মনে করা হত। কিন্তু তাতে জীবাণুগুলোর ওষুধটাতে প্রতিরোধ জন্মে যেত।

অল্পস্বল্প কুষ্ঠরোগের জন্যে: অল্পস্বল্প কুষ্ঠ মানে সাধারণতঃ শরীরে শুধু একটা দাগ হওয়া—সেটাতে ছড়িয়ে পড়ার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। দাগটার ধারগুলো সাধারণতঃ পরিষ্কার থাকে।

বড়দের: দিনে ৫০ থেকে ১০০ গ্রাঃ
ছোটদের: ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সের: দিনে ২৫ গ্রাম
ছোটদের: ৫ থেকে ৯ বছর বয়সের: দিনে ২৫ গ্রাম
ছোটদের: ১ থেকে ৪ বছর বয়সের: দিনে ১০ গ্রাম

সাংঘাতিক কুষ্ঠের জন্যে: সাংঘাতিক কুষ্ঠ মানে সারা শরীরে অনেকগুলি দাগ হওয়া; দাগগুলির পরিষ্কার সীমারেখা না থাকা; দাগগুলি বেড়ে গিয়ে একে অন্যের সঙ্গে মিশে যাওয়া; রোগটা স্নায়ুগুলিকেও আক্রমণ করে।

প্রথম ২ সপ্তাহ ধরে ওপরের অল্পস্বল্প কুষ্ঠের মাত্রার অর্ধেক দিয়ে শুরু করুন। তারপর অল্পস্বল্প কুষ্ঠের জন্যে যে মাত্রা—তাই দিয়ে যান।

অন্যান্য ওষুধ

ম্যালেরিয়ার ওষুধ

ম্যালেরিয়ার ওষুধ ৩ রকমভাবে ব্যবহার করা যায়:

১· চিকিৎসা—যার ম্যালেরিয়া রোগ হয়েছে তার। ওষুধটা মাত্র কয়েকদিন ধরে রোজ দেয়া হয়।
২· দমন—রক্তে কোনো ম্যালেরিয়ার পরজীবী থাকার সম্ভাবনা থাকলে, সেগুলিকে ক্ষতি করতে না দেয়া। যে সব অঞ্চলে ম্যালেরিয়া বেশি দেখা যায় সেখানে এই দমন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়—বিশেষ করে যে সব ছেলেপিলে অন্য কারণে দুর্বল বা রুগ্ন থাকে, তাদের রক্ষা করার জন্যে। ওষুধটা প্রতি সপ্তাহে দেয়া হয়।
৩· আধা দমন—এতে লোকটিকে ম্যালেরিয়া থেকে কিছুটা রক্ষা করা হয়; কিন্তু তার শরীরে রোগের সঙ্গে লড়ার ক্ষমতাও গড়ে উঠতে দেয়া হয়। যে সব জায়গায় ম্যালেরিয়া খুব বেশি দেখা যায়, সেখানে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। ২ বা ৪ সপ্তাহ অন্তর অন্তর ওষুধ দেয়া হয়।

ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়ার জন্যে অনেক ওষুধ আছে। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের অনেক জায়গায় কয়েকটা বেশি ভাল আর কম বিপজ্জনক ওষুধে ম্যালেরিয়ার পরজীবীর প্রতিরোধ জন্মে গেছে। তাই, অন্য ওষুধ ব্যবহার করতে হয়। আপনার এলাকায় কোন ওষুধটা সব থেকে ভাল কাজ করে, সেটা স্বাস্থ্যদপ্তর বা কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে জেনে নেয়া দরকার।

অনেক অঞ্চলে, **ক্লোরোকুইন** এখনো ম্যালেরিয়ার জন্যে সব থেকে উপকারী ওষুধ। কয়েক ধরনের ম্যালেরিয়া সম্পূর্ণ সারাতে ক্লোরোকুইনের সঙ্গে **প্রাইমাকুইনও ব্যবহার করার দরকার হতে পারে।**

পাইরিমেথামাইন বেশির ভাগ সময় ম্যালেরিয়া দমনের জন্যে ব্যবহার করা হয়।

ক্লোরোকুইন

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ পাওয়া যায়:

ক্লোরোকুইন ফসফেটের ২৫০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি হিসেবে; অথবা ক্লোরোকুইন সালফেটের ২৫০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি হিসেবে } দুটোতেই ১৫০ মিঃ গ্রাঃ **মূল** ক্লোরোকুইন থাকে———জন্যে দাম———

ইনজেকশন—৫ মিঃ লিটারে ২০০ মিঃ গ্রাঃ———জন্যে দাম———

খাওয়ার ক্লোরোকুইনের *মাত্রা*—১৫০ মিঃ গ্রাঃ মূল ক্লোরোকুইন দেয়া বড়ি—

যাকে ম্যালেরিয়া তীব্রভাবে আক্রমণ করেছে তার চিকিৎসার জন্যে:

৩ দিন ধরে দিনে একবার করে ক্লোরোকুইনের বড়ি দেবেন:

প্রতিদিন দেবেন:

বড়দের: ৪ বড়ি (৬০০ মিঃ গ্রাঃ মূল)
ছোটদের: ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সের ৩ বড়ি (৪৫০ মিঃ গ্রাঃ মূল)
ছোটদের: ৪ থেকে ৮ বছর বয়সের: ২ বড়ি (৩০০ মিঃ গ্রাঃ মূল)
ছোটদের: ১ থেকে ৪ বছর বয়সের: ১ বড়ি (১৫০ মিঃ গ্রাঃ মূল)
১ বছরের কম বয়সের শিশুদের: ১/২ বড়ি (৭৫ মিঃ গ্রাঃ মূল)

ক্লোরোকুইন দিয়ে ম্যালেরিয়া দমনের জন্যে:

প্রতি সপ্তাহে দেবেন:

বড়দের: ২ বড়ি (৩০০ মিঃ গ্রাঃ মূল)
ছোটদের: ৯ থেকে ১২ বছর বয়সের ১১/৩ থেকে ২ বড়ি (২২০ থেকে ৩০০ মিঃ গ্রাঃ মূল)
ছোটদের: ৫ থেকে ৮ বছর বয়সের: ১ থেকে ১১/৩ বড়ি (১৫০ থেকে ২০০ মিঃ গ্রাঃ মূল)
ছোটদের: ১ থেকে ৪ বছর বয়সের: ১/৩ থেকে ২/৩ বড়ি (৫০ থেকে ১০০ মিঃ গ্রাঃ মূল)
১ বছরের কম বয়সের শিশুদের: ১/৪ থেকে ১/৩ বড়ি (৩৭ থেকে ৫০ মিঃ গ্রাঃ মূল)

ওই অঞ্চলে যদি ম্যালেরিয়া খুব বেশি দেখা যায় তাহলে বড়দের একই মাত্রা সপ্তাহে একবারের জায়গায় দুবার দেবেন।

এমিবা থেকে লিভারে যে এবসেস হয় তার চিকিৎসার জন্যে:

বড়দের: দুদিন ধরে দিনে দুবার করে ৩ থেকে ৪ বড়ি (৫০০ মিঃ গ্রাঃ মূল) তারপর ৩ সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন ১১/২ থেকে ২ বড়ি (২৫০ মিঃ গ্রাঃ মূল)

ছোটদের—বয়স বা ওজন অনুসারে কম দেবেন।

ক্লোরোকুইনের ইনজেকশন: কখন দিতে হয়:

ক্বচিৎ কখনো—শুধু খুব জরুরি অবস্থায়—ক্লোরোকুইনের ইনজেকশন দেয়া উচিত। যার ম্যালেরিয়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছে বা যেখানে প্রচুর ম্যালেরিয়া দেখা যায়, সেখানে যে বাস করে, তার যদি বমি বা ফিট (তড়কা) হয় অথবা মেনিনজাইটিসের অন্যান্য লক্ষণ (পৃ ২২৬) দেখা যায়, তবে তার হয়তো সেরিব্রাল (মগজের) ম্যালেরিয়া হয়েছে।

তাকে সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। স্বাস্থ্যকেন্দ্র যদি খুব দূরে হয়, তবে তাকে তখনি ক্লোরোকুইনের ইনজেকশন দিন। মাত্রাটা যেন ঠিক হয়, সে বিষয়ে খুব সাবধান হতে হবে।

ক্লোরোকুইনের ইনজেকশনের *মাত্রা:*—(৪ মিঃ গ্রাঃ / কেঃ জিঃ)—৫ মিঃ লিটারে ২০০ মিঃ গ্রাঃ এমপুল—মাত্রাটা শুধু একবার দেবেন (একেক পাছায় অর্দ্ধেক মাত্রা করে দেবেন)।

ছেলেপিলেদের পক্ষে ক্লোরোকুইনের ইনজেকশন খুব বিপজ্জনক হতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারি সাহায্য নেবেন। ডাক্তারি মতে এটা একটা জরুরি অবস্থা।

প্রাইমাকুইন

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———

কয়েক ধরনের ম্যালেরিয়ার আবার হওয়া এড়াবার জন্যে ক্লোরোকুইনের সঙ্গে প্রাইমাকুইন ব্যবহার করা হয়। তীব্র সংক্রমণে, শুধু এই ওষুধ ব্যবহার করলে ভাল কাজ হয় না।

সাধারণতঃ ২৬.৩ মিঃ গ্রাঃ প্রাইমাকুইন ফসফেটের বড়ি হিসেবে পাওয়া যায়—তাতে ১৫ মিঃ গ্রাঃ মূল প্রাইমাকুইন থাকে।

প্রাইমাকুইনের *মাত্রা:*

১৫ দিন ধরে দিনে একবার করে দেবেন:

প্রত্যেক মাত্রায় দেবেন:

বড়দের: ১ বড়ি (১৫ মিঃ গ্রাঃ মূল)
ছোটদের: ৮ থেকে ১২ বছর বয়সের: ১/২ বড়ি (৭ মিঃ গ্রাঃ মূল)
ছোটদের: ৩ থেকে ৭ বছর বয়সের: ১/৪ বড়ি (৪ মিঃ গ্রাঃ মূল)

পাইরিমেথামাইন

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ ২৫ মিঃ গ্রাঃ বড়িতে পাওয়া যায়।

বেশিরভাগ সময় ম্যালেরিয়া দমন করার জন্যে ব্যবহার করা হয়

ম্যালেরিয়া **দমনের জন্যে**

পাইরিমেথামাইনের *মাত্রা:*

প্রতি সপ্তাহে দেবেন:

বড়দের: ১ থেকে ২ বড়ি (২৫ থেকে ৫০ মিঃ গ্রাঃ মূল)
ছোটদের: ৫ থেকে ১২ বছর বয়সের: ½ বড়ি (১২·৫ মিঃ গ্রাঃ মূল)
ছোটদের: ১ থেকে ৪ বছর বয়সের: ¼ থেকে ½ বড়ি (৬·২৫ থেকে ১২·৫ মিঃ গ্রাঃ মূল)
১ বছরের কম বয়সের শিশুদের: ¼ বড়ি (৬·২৫ মিঃ গ্রাঃ মূল)

ম্যালেরিয়া আধাদমনের জন্যে একই মাত্রা দেবেন—কিন্তু ২ বা ৪ সপ্তাহ অন্তর অন্তর শুধু একবার করে দেবেন।

সাবধান: খুব বেশি পাইরিমেথামাইন খাওয়া বিপজ্জনক ছেলেপিলেদের নাগালের বাইরে রাখবেন।

এমিবা আর জিয়ারডিয়ার জন্যে

এমিবা থেকে যে পাৎলা পায়খানা বা আমাশা হয়, তাতে সাধারণতঃ ঘনঘন পায়খানা হয়, মলে অনেকটা আম, কখনো কখনো রক্তও থাকে। প্রায়ই পেট কামড়ায়; তবে জ্বর কম থাকে বা থাকেই না। এমিবার আমাশার চিকিৎসা **মেট্রোনিডাজোল** দিয়ে করা যায়। দুঃখের বিষয়, মেট্রোনিডাজোলের দাম খুব বেশি। আর একটা কম দামি (কিন্তু তত ভাল নয়) ওষুধ টেট্রাসাইক্লিনের সঙ্গে দেয়া যায়; সেটার নাম **ডাইআয়োডোহাইড্রোকসিকুইন।**

অন্ত্রের সমস্ত এমিবাকে মেরে ফেলতে অনেক দিন ধরে (২ থেকে ৩ সপ্তাহ) খুব খরচের চিকিৎসা করা দরকার। রোগীর লক্ষণগুলি চলে গেলে ওষুধ দেয়া বন্ধ করে, যে কটা এমিবা থেকে গেছে, সেগুলির সঙ্গে শরীরকে নিজেই লড়তে দেয়াই সাধারণতঃ বেশি বুদ্ধির কাজ। যে সব জায়গায় নতুন করে সংক্রমণ হবার সম্ভাবনা খুব বেশি, সেখানে এই কথাটা বিশেষভাবে সত্যি।

জিয়ারডিয়া থেকে যে পাৎলা পায়খানা হয়, তাতে মলটা সাধারণতঃ হলদে আর ফেনাফেনা হয়, কিন্তু তাতে রক্ত বা আম থাকে না।

সবথেকে ভাল ওষুধ হল মেট্রোনিডাজোল, তবে **কুইনাক্রিন** বেশি সস্তা।

টেট্রাসাইক্লিন (পৃ ৪০০ দেখুন)

<u>মেট্রোনিডাজোল</u> (চেনা কোমপানির নাম: *ফ্ল্যাজিল*)

আপনার এলাকায় নাম———

সাধারণতঃ ২০০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি হিসেবে পাওয়া যায়।
———জন্যে দাম———

এমিবা আর জিয়ারডিয়ার থেকে যেসব অন্ত্রের সংক্রমণ হয়, সেগুলিতে, তাছাড়া ট্রাইকোমোনাস থেকে যেসব যোনির সংক্রমণ হয়, তাতে মেট্রোনিডাজোল কাজে লাগে।

সাবধান: মেট্রোনিডাজোল ব্যবহার করার সময় মদ খাবেন না, কারণ তাতে সাংঘাতিক বমির ভাব হয়।

এমিবার আমাশার জন্যে *মাত্রা:* (২৫ থেকে ৫০ মিঃ গ্রাঃ / কেঃ জিঃ / দিন)—২০০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি

১০ দিন ধরে দিনে ৩ বার করে মেট্রোনিডাজোল দেবেন। প্রতি মাত্রায় দেবেন:

বড়দের: ৪০০ থেকে ৮০০ মিঃ গ্রাঃ (২ থেকে ৪ বড়ি)
ছোটদের: ৮ থেকে ১২ বছর বয়সের: ৪০০ মিঃ গ্রাঃ (২ বড়ি)
ছোটদের: ৪ থেকে ৭ বছর বয়সের: ৩০০ মিঃ গ্রাঃ (১½ বড়ি)
ছোটদের: ২ থেকে ৩ বছর বয়সের: ২০০ মিঃ গ্রাঃ (১ বড়ি)
২ বছরের কম বয়সের শিশুদের: ৮০ থেকে ১০০ মিঃ গ্রাঃ (⅓ থেকে ½ বড়ি)

জিয়ারডিয়ার সংক্রমণের জন্যে *মাত্রা:* ৫ দিন ধরে দিনে ৩ বার করে মেট্রোনিডাজোল দেবেন।

প্রতি মাত্রায় দেবেন:

বড়দের: ২০০ মিঃ গ্রাঃ (১ বড়ি)
ছোটদের: ৮ থেকে ১২ বছরর বয়সের: ২০০ মিঃ গ্রাঃ (১ বড়ি)
ছোটদের: ৩ থেকে ৭ বছর বয়সের: ১০০ মিঃ গ্রা (½ বড়ি)
৩ বছরের কম বয়সের শিশুদের: ৫০ মিঃ গ্রাঃ (¼বড়ি)

যোনির ট্রাইকোমোনাস সংক্রমণের চিকিৎসার *মাত্রা:*

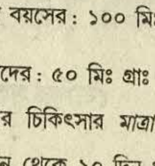
মেয়ে এবং পুরুষ দুজনেরই ৭ দিন থেকে ১০ দিন ধরে দিনে তিনবার একটি বড়ি (২০০ মিঃ গ্রাঃ) খাওয়া উচিত। মেয়েটির এছাড়া যোনির ভেতরে দেবার ওষুধও (পৃ ৪০৯) ব্যবহার করা উচিত। দুজনের একই দিনে চিকিৎসা শুরু করা উচিত।

সাবধান: যোনির ট্রাইকোমোনাস সংক্রমণ খুব সাংঘাতিক হলে শুধু তবেই সেটার জন্যে মেট্রোনিডাজোল খাবেন।

<u>ডাইআয়োডোহাইড্রোকসিকুইন</u> (চেনা কোমপানির নাম: *ডায়োডোকুইন)*

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ ৬৫০ মিঃ গ্রাঃ
যোনিতে ঢোকাবার
বড়ি হিসেবে পাওয়া যায়



এমিবা থেকে অন্ত্রের ছোটখাট সংক্রমণ সারাতে, অথবা টেট্রাসাইক্লিন বা মেট্রোনিডাজোল দিয়ে চিকিৎসা করার পরে ডাইআয়োডোহাইড্রোকসিকুইন ব্যবহার করা যায়। এটা রোগ এড়ানোতে কোনো কাজে লাগে না। **এই ওষুধ** অনেকদিন ধরে ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ এ থেকে চোখের ক্ষতি আর

পক্ষাঘাত হতে এবং পেচ্ছাপ সামলানোর ক্ষমতা চলে যেতে পারে। এর বদলে **আয়োডোক্লোরহাইড্রোকসিকুইন** *(এনটারো ভায়োফর্ম* ২৫০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি) ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু তাতে চোখের ক্ষতি হবার ঝুঁকি বেশি থাকে।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দরকারি ওষুধের তালিকার মধ্যে এই ওষুধগুলি নেই।

এমিবার চিকিৎসায় ডাইআয়োডোহাইড্রোকসিকুইনের *মাত্রা* (৪০ মিঃ গ্রাঃ / কেঃ জিঃ / দিন) —৬৫০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি —ওষুধটা দিনে ৩ বার (অল্পস্বল্প রোগে) বা ৪ বার (বেশি কঠিন রোগে) দেবেন। পুরোপুরি চিকিৎসার জন্যে ১০ থেকে ১৪ দিন ধরে দেবেন।

প্রতি মাত্রায় দেবেন:

বড়দের: ১ বড়ি (৬৫০ মিঃ গ্রাঃ)
ছোটদের: ৮ থেকে ১২ বছর বয়সের: ½ বড়ি (৩২৫ মিঃ গ্রাঃ)
ছোটদের: ৩ থেকে ৭ বছর বয়সের: ¼ বড়ি (১৬০ মিঃ গ্রাঃ)
তিন বছরের কম বয়সের শিশুদের: দেবেন না

যোনিতে ট্রাইকোমোনাসের সংক্রমণের চিকিৎসার জন্যে —যোনিতে ঢুকিয়ে দেবার ডাইআয়োডোহাইড্রোকসিকুইনের *মাত্রা:*

৪ থেকে ৮ সপ্তাহ ধরে দিনে এক বা দুবার একটি করে বড়ি যোনির অনেকটা ভেতরে ঢুকিয়ে দেবেন।

যোনির সংক্রমণের জন্যে

যোনিতে স্রাব, চুলকুনি আর অস্বস্তি নানা সংক্রমণ থেকে হতে পারে। এগুলির মধ্যে সবথেকে বেশি দেখা যায় —ট্রাইকোমোনাস আর থ্রাশ (ছত্রাকের সংক্রমণ বা মনিলিয়াসিস)। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আর ভিনিগার মেশানো জলের ডুস (যোনি ধুয়ে ফেলা) যোনির যে কোনো সংক্রমণেই কাজ দেয়। নিচে বিশেষ ওষুধের তালিকাও দেয়া হল।

যোনির ডুসের (ধোয়ার) জন্যে সাদা ভিনিগার:

———*জন্যে দাম*———

এক লিটার ফোটানো জলে ২ থেকে ৩ বড় চামচ সাদা ভিনিগার মেশান। পৃ ২৮৬তে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে ১ সপ্তাহ ধরে দিনে একবার, তারপর ১ দিন অন্তর একবার ডুস দিন। যোনিতে মলম বা ঢোকাবার ওষুধ দেবার আগে ডুস দিলে সুবিধে হয়।

মেট্রোনিডাজোল —খাওয়ার বড়ি (পৃ ৪০৭)

যোনির ট্রাইকোমোনাস সংক্রমণের জন্যে:

যোনিতে ঢোকাবার ডাইআয়োডোহাইড্রোকসিকুইন *(এই পৃষ্ঠায় দেখুন)*

যোনির ট্রাইকোমোনাস সংক্রমণের জন্যে।

নিসট্যাটিন —বড়ি, মলম আর যোনিতে ঢোকাবার ওষুধ (পৃ ৪১০)

মনোলিয়াসিসের (যোনিতে ছত্রাকের) সংক্রমণের জন্যে।

জেনসিয়ান ভায়োলেট (কৃস্টাল ভায়োলেট) *১% তরল মেশানো ওষুধ (পৃ ৪১০)*

———*জন্যে দাম*———

মনিলিয়াসিস (ছত্রাকের সংক্রমণ) আর যোনিমুখের আর যোনির অন্যান্য সংক্রমণের জন্যে।

৩ সপ্তাহ ধরে দিনে একবার করে জেনসিয়ান ভায়োলেট মাখিয়ে দেবেন।

যোনিতে ঢোকাবার সালফাথিয়াজোল

আপনার এলাকায় নাম———জন্যে দাম———

যোনির জীবাণুর সংক্রমণের (হিমোফাইলাস) চিকিৎসার জন্যে: দিনে ২ বার একটি করে ঢোকাবার ওষুধ যোনির অনেকটা ভেতরে ঢুকিয়ে দেবেন।

যোনিতে দেবার এসেটারসল সাপোজিটরি (এস ভি সি পেসারি)

আপনার এলাকার নাম——— ———জন্যে দাম ———

যোনিতে ট্রাইকোমোনাস সংক্রমণের চিকিৎসার জন্যে: প্রথম কয়েকদিন দিনে দু বা তিনবার একটা বা দুটো সাপোজিটরি (বড়ি) ঢুকিয়ে দেবেন। তারপর ধীরে ধীরে মাত্রায় এবং বারে কমিয়ে দেবেন। শেষে, শুধু মাসিকের ঠিক পরের দিনগুলিতে লাগাবেন।

চামড়ার সমস্যার জন্যে

সাবান আর জল দিয়ে ঘনঘন হাত ধুলে আর স্নান করলে চামড়া আর অন্ত্র দুয়েরই অনেক সংক্রমণ এড়ানোর সাহায্য হয়।

ক্ষত বন্ধ করা আর ব্যাণ্ডেজ করার আগে সাবান আর ফোটানো জল দিয়ে সাবধানে ধুয়ে দেয়া উচিত।

খুসকি, শিশুদের চাপ খুসকি, ব্রণ, অল্পস্বল্প পাঁচড়া, তাছাড়া ছোটখাট দাদ, টিনিয়া আর চামড়ার সংক্রমণের জন্যে, একমাত্র যে চিকিৎসা সাধারণতঃ দরকার হয়, তা হল ঘনঘন সাবান আর জল দিয়ে ঘষে ধুয়ে ফেলা। এর জন্যে, সাবানে **হেকসাক্লোরোফিনের** মত কোনো এনটিসেপটিক থাকলে —যেমন *সিনথলে* আছে —বেশি ভাল হয়।

গন্ধক (সালফার)

সাধারণতঃ হলদে রঙের গুঁড়ো হিসেবে পাওয়া যায়।

———জন্যে দাম———

এছাড়া, অনেক রকম চামড়ার তরল ওষুধ আর মলম হিসেবেও পাওয়া যায়

———জন্যে দাম———

গন্ধক অনেক চামড়ার সমস্যায় কাজে লাগে:

১. নানারকম এঁটুলি এড়াতে আর সারাতে—যেসব মাঠেঘাটে বা বনজঙ্গলে এগুলি বেশি থাকে, সেখানে যাবার আগে আপনার গায়ে, বিশেষ করে পায়ে বা গোড়ালিতে, কবজিতে, কোমরে আর ঘাড়ে গন্ধকের গুঁড়ো মেখে নেবেন।
২. চামড়ার ভেতরের বা ওপরের খোস, গর্ত করা পোকা আর ছোট ছোট এঁটুলির চিকিৎসার সুবিধের জন্যে একটা মলম তৈরি করে নেবেন। ১০ ভাগ পেট্রোলেটাম (ভেসলিন) বা তেলের সঙ্গে ১ ভাগ গন্ধক মিশিয়ে সেটা চামড়ার ওপর লেপে দিন (পৃ ২৪১)
৩. দাদ, টিনিয়া এবং অন্যান্য ছত্রাকের সংক্রমণের জন্যে দিনে ৩ বা ৪ বার এই একই মলম বা গন্ধক আর ভিনিগার মেশানো তরল ওষুধ ব্যবহার করুন।
৪. শিশুদের চাপ খুসকি বা সাংঘাতিক খুসকির জন্যে ওই একই মলম ব্যবহার করা যেতে পারে অথবা মাথায় গন্ধকের গুঁড়ো মাখিয়ে দেয়া যেতে পারে।

জেনসিয়ান ভায়োলেট (কৃষ্টাল ভায়োলেট)

সাধারণতঃ গাঢ় নীল রঙের দানা হিসেবে পাওয়া যায়।

জেনসিয়ান ভায়োলেট, পাঁচড়া, পুঁজভরা ঘা এবং আরো কয়েকটি চামড়ার সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়তে সাহায্য করে। মুখের ভেতরের, যোনিমুখের আর চামড়ার ভাঁজের থ্রাশ (মনোলিয়াসিস) বা ছত্রাকের সংক্রমণের চিকিৎসাতেও এটা ব্যবহার করা যায়। এটা পোড়ার ওপরেও লাগানো যায়।

আধ লিটার জলে ১ চা চামচ জেনসিয়ান ভায়োলেট গুলে নিন। এতে ০·৫% তরল ওষুধ তৈরি হল। এটি চামড়ার ওপরে, মুখের ভেতরে বা যোনির মুখে মাখিয়ে দিন।

পটাসিয়াম পারমাংগানেট

গাঢ় লাল রঙের দানায় পাওয়া যায়।

———জন্যে দাম———

এটার থেকে, সংক্রমিত ঘা ভেজাবার জন্যে ভাল এনটিসেপটিক (জীবাণু মারবার) তরল ওষুধ তৈরি করা যায়। ১ লিটার জলে ১ চিমটি দানা (১০০০ ভাগ জলে ১ ভাগ পটাসিয়াম পারমাংগানেট) দিন।

অর্শ আর মলদ্বার ছিঁড়ে যাওয়ার ব্যথা কমাবার জন্যে সিটজ বাথ (পৃ ২১৩) তৈরি করতেও পটাসিয়াম পারমাংগানেট ব্যবহার করা যায়।

এনটিবায়োটিক মলম

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———

এগুলি দামি ওষুধ, অথচ সাধারণতঃ জেনসিয়ান ভায়োলেটের থেকে বেশি ভাল কাজ করে না। তবে এগুলি থেকে চামড়ায় বা জামাকাপড়ে দাগ লাগে না। এছাড়া পাঁচড়ার মত চামড়ার ছোটখাট সংক্রমণে কাজে লাগে। যেটিতে নিওমাইসিন আর পলিমিকসিন মেশানো থাকে—যেমন *নিওস্পোরিন* বা *পলিস্পোরিন* সেটা—একটা ভাল মলম। টেট্রাসাইক্লিনের মলমও ব্যবহার করা যেতে পারে।

কর্টিকো স্টেরয়েড মলম বা লোশন

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———

এগুলির দাম খুব বেশি। সাংঘাতিক একজিমার (পৃ ২৫৭) চিকিৎসায় এগুলি কাজে লাগে। চামড়ায় সংক্রমণ থাকলে ব্যবহার করবেন না। যে মলমে কর্টিকোস্টেরয়েডের সঙ্গে কোনো এনটিবায়োটিক থাকে, সেটি বাদ দেবেন।

পেট্রোলিয়াম জেলি (পেট্রোলেটাম, *ভেসলিন*)

———জন্যে দাম———

নিচের রোগগুলির চিকিৎসার জন্যে মলম বা প্রলেপ তৈরি করতে কাজে লাগে:

খোস (পরের পৃষ্ঠায় দেখুন)
দাদ (নিচে দেখুন)
পিনকৃমি থেকে চুলকুনি (পৃ ১৯৪)
পোড়া (পৃ ১০৯-১১১)
বুকের ক্ষত (পৃ ১০৪)

জিঙ্ক অকসাইড

———জন্যে দাম———

এটা ক্রীম বা লোশন হিসেবে লাগালে ঘামাচি এড়ানোর সাহায্য হয়। শ্বেতীর সাদা দাগগুলির রোদে পুড়ে যাওয়া (পৃ ২৪৮) এড়াতেও এটি সাহায্য করে।

টিংচার আয়োডিন (মৃদু)

———জন্যে দাম———

ছোট কাটা বা ক্ষতে এটা একটা এনটিসেপটিক হিসেবে ব্যবহার করা যায়। গলগণ্ডেও (পৃ ১৫২) এটা ব্যবহার করা যায়। এক গ্লাস জলে এক ফোঁটা টিংচার আয়োডিন দেবেন। দেখবেন যেন বেশি দেবেন না। কারণ এটা বিপজ্জনক।

দাদ এবং অন্যান্য ছত্রাকের সংক্রমণের জন্যে

অনেক ছত্রাকের সংক্রমণ সারানো খুব শক্ত। পুরোপুরি সামলাবার জন্যে সব লক্ষণ চলে যাবার পরেও অনেকদিন বা সপ্তাহ ধরে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হয়। স্নান আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাও জরুরি।

আনডিসাইলেনিক, বেনজয়িক বা স্যালিসিলিক এসিড দেয়া মলম

চেনা কোমপানির নাম: *হুইটফিল্ড্‌স্ অয়েন্টমেন্ট, টিনিয়াফ্যাকস।*

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———

এইসব এসিড দেয়া মলম, দাদ, মাথার টিনিয়া এবং অন্যান্য চামড়ার সংক্রমণের চিকিৎসায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

সাধারণতঃ এগুলি গন্ধকের সঙ্গে মেলানো থাকে (বা থাকতে পারে)। স্যালিসিলিক এসিড আর গন্ধক দেয়া মলম শিশুদের চাপ খুসকির জন্যেও ব্যবহার করা যায়।

নিজে তৈরি করে নিলে মলম আর লোশনগুলি অনেক সস্তা পড়ে। ৩ ভাগ স্যালিসিলিক এসিড আর/অথবা ৬ ভাগ বেনজয়িক এসিডের সঙ্গে ১০০ ভাগ *ভেসলিন*, পেট্রোলেটাম, খনিজ তেল বা নারকেল তেল অথবা ৪০% এলকোহল মেশান। দিনে ৩ থেকে ৪ বার করে চামড়ার ওপর ঘষে লাগান।

গন্ধকের সঙ্গে ভিনিগার

১০০ ভাগ ভিনিগারে ৫ ভাগ গন্ধক মিশিয়ে তৈরি করা লোশন দিয়ে চামড়ার ছত্রাকের সংক্রমণের সঙ্গে লড়া যায়। এটিকে চামড়ার ওপরে শুকোতে দেবেন। এছাড়া, ১০ ভাগ রান্নার তেলের সঙ্গে ১ ভাগ গন্ধক মিশিয়ে একটা মলম তৈরি করা যেতে পারে।

সোডিয়াম থিওসালফেট (হাইপো)

সাদা দানায় পাওয়া যায়। ছবি তোলার সরঞ্জামের দোকানে হাইপো হিসেবে পাওয়া যায়। ———জন্যে দাম———

চামড়ার **টিনিয়া ভারসিকালার** সংক্রমণের জন্যে (পৃ ২৪৭) ব্যবহার করা হয়।

১ বড় চামচ হাইপো ½ কাপ জলে গুলে একটুকরো তুলো বা কাপড় দিয়ে চামড়ার ওপর মাখিয়ে দিন। তারপর একটুকরো ভিনিগারে ভিজানো তুলো দিয়ে জায়গাটা ঘষে দিন। যতদিন না দাগগুলো চলে যায় ততদিন দিনে দুবার এইরকম করবেন। তারপর আবার যাতে দাগ না হয় তার জন্যে ২ সপ্তাহ অন্তর একবার করে করবেন।

গ্রিসিওফালভিন —চেনা কোমপানির নাম: *গ্রিসোভিন এফ পি*

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ ১২৫ মিঃ গ্রাঃ বড়ি হিসেবে পাওয়া যায়।

খুব মিহি টুকরোয় যেটা পাওয়া যায় সেটা সব থেকে ভাল

এটা খুব দামি ওষুধ। শুধু চামড়ায় সাংঘাতিক ছত্রাকের সংক্রমণে আর মাথায় গভীর টিনিয়ার সংক্রমণে এটি ব্যবহার করা উচিত।

গ্রিসিওফালভিনের *মাত্রা* —(১৫ মিঃ গ্রাঃ / কেঃজিঃ / দিন) —মিহি দানায় বা ১২৫ মিঃ গ্রাঃ বড়ির জন্যে—

দিনে একবার, খেতে দেবেন।

বড়দের: ৫০০ মিঃ গ্রাঃ (৪ বড়ি)
ছোটদের: ৮ থেকে ১২ বছর বয়সের: ২৫০ থেকে ৫০০ মিঃ গ্রাঃ (দিনে ২ থেকে ৪ বড়ি)
ছোটদের: ৩ থেকে ৭ বছর বয়সের: ১২৫ থেকে ২৫০ মিঃ গ্রাঃ (দিনে ১ থেকে ২ বড়ি)
ছোটদের: ৩ বছরের কম বয়সের ১২৫ মিঃ গ্রাঃ (১ বড়ি)

জেনসিয়ান ভায়োলেট —থ্রাশের (ছত্রাকের সংক্রমণের জন্যে (পৃ৪০৮)

নিসট্যাটিন —থ্রাশের জন্যে

চেনা কোমপানির নাম *মাইকোস্ট্যাটিন*

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———

মাখবার পাউডার, যোনিতে দেবার বড়ি আর মলম হিসেবে পাওয়া যায়।

মুখের ভেতরের, যোনির বা চামড়ার ভাঁজের থ্রাশের (মনোলিয়াসিস) চিকিৎসার জন্যে ব্যবহার করা হয়। অন্য কোনো সংক্রমণে এটি কাজে লাগে না।

নিসট্যাটিনের *মাত্রা* —ছোটদের আর বড়দের একই:

চামড়ার ওপর ছত্রাকের সংক্রমণ: যতটা সম্ভব শুকনো রেখে দিনে ৩ বা ৪ বার নিসট্যাটিন মাখাবার পাউডার বা মলম লাগাবেন।

যোনির মুখে বা যোনিতে ছত্রাকের সংক্রমণ: ২ সপ্তাহ ধরে রাত্রে যোনির ভেতরে একটা করে যোনির বড়ি ঢুকিয়ে দেবেন।

খোস এবং উকুনের জন্যে : পোকা মারার ওষুধ

গামা বেনজীন হেকসাক্লোরাইড (লিনডেন) *লরেকসেন*

চেনা কোমপানির নাম: *গ্যামেকসেন*

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———

ক্রীম বা তরল ওষুধ হিসেবে পাওয়া যায়।

খোসের জন্যে —স্নানের পর চামড়ার ওপর লাগান (পৃ ২৪১)। শুধু একবার লাগাবেন। দরকার হলে এক সপ্তাহ পর আবার লাগাবেন।

মাথার উকুনের জন্যে এটা খুব কাজে লাগে। মাথায় একবার লাগাবেন। ৭ দিন পর চুল ধুয়ে ফেলবেন। কচি বাচ্চাদের বেলায় ব্যবহার করবেন না।

বেনজিল বেনজোয়েট ক্রীম বা লোশন

বড়দের: ২৫% ব্যবহার করুন।
ছোটদের: ১২½% ব্যবহার করুন।

পরপর ৩ দিন ঘাড় থেকে শুরু করে সারা শরীরে লাগান —সে সময় জামাকাপড় বদলাবেন না। চতুর্থ দিনে স্নান করে জামাকাপড় ফুটিয়ে নেবেন।

পেট্রোলিয়াম জেলি *(ভেসলিন)* বা তেলের মধ্যে গন্ধক:

অন্য ওষুধগুলি না পাওয়া গেলে এইটি ব্যবহার করবেন।

২০ ভাগ ভেসলিনে বা খনিজ বা রান্নার তেলে ১ ভাগ গন্ধক মিশিয়ে একটা ৫% গন্ধকের মলম তৈরি করুন।

কৃমির জন্যে

শুধু ওষুধ দিয়ে কৃমির সংক্রমণ খুব বেশিদিনের জন্যে দূর করা যায় না। নিজের এবং সাধারণের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিধিগুলি মেনে চলতে হবে। পরিবারের একজনের কৃমি হলে বাড়ির সকলেরই একসঙ্গে চিকিৎসা করানো বুদ্ধির কাজ।

<u>পাইপারজাইন</u>-কেঁচোকৃমি আর সুতোকৃমি বা কুচোকৃমির জন্যে।
চেনা কোম্পানির নাম: *এনটেপার*

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———

পাইপারাজাইনের সাইট্রেট, টারট্রেট, হাইড্রেট, এডিপেট বা ফসফেট হিসেবে পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ পাওয়া যায়:

৫০০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি ———জন্যে দাম———
৫ মিঃ লিঃ মিক্সচারে ৫০০ মিঃ গ্রাঃ ———জন্যে দাম———

কেঁচো কৃমির চিকিৎসা ২ দিনের হয়। **সুতোকৃমির** জন্যে ১ সপ্তাহ ধরে কম মাত্রায় দেয়া হয়। বেশি উপসর্গ হয় না।

কেঁচো কৃমির জন্যে পাইপারাজাইনের *মাত্রা* (৭৫ মিঃ গ্রাঃ/কে জি/দিন) ৫০০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি বা ৫ মিঃ লিঃ মিক্সচারে ৫০০ মিঃ গ্রাঃ দিয়ে—

২ দিন ধরে দিনে ১ বার ১ মাত্রা দেবেন।

প্রতি মাত্রায় দেবেন:

বড়দের: ৪ গ্রাম (৮ বড়ি)
ছোটদের: ৮ থেকে ১২ বছর বয়সের: ৩ গ্রাম (৬ বড়ি)
ছোটদের: ৩ থেকে ৭ বছর বয়সের: ২ গ্রাম (৪ বড়ি)
ছোটদের: ১ থেকে ৩ বছর বয়সের: ১ গ্রাম (২ বড়ি)
১ বছরের কম বয়সের শিশুদের: ২৫০ মিঃ গ্রাঃ (১/২)

সুতোকৃমির জন্যে পাইপারাজাইনের *মাত্রা*: (৫০ মিঃ গ্রাঃ/কে জি/দিন)

এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন ১ মাত্রা দেবেন:

প্রতিমাত্রায় দেবেন:

বড়দের: ২১/২ গ্রাম (৫ বড়ি)
ছোটদের: ৮ থেকে ১২ বছর বয়সের: ৭৫০ মিঃ গ্রাম (১১/২ বড়ি)
ছোটদের: ৩ থেকে ৭ বছর বয়সের: ৫০০ মিঃ গ্রাঃ (১ বড়ি)
৩ বছরের কম বয়সের শিশুদের: ২৫০ মিঃ গ্রাঃ (১/২)

<u>থিয়াবেনডাজোল</u>—নানা রকম কৃমির সংক্রমণের জন্যে:
চেনা কোম্পানির নাম—*মিনটেজোল*

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ ৫০০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি বা ৫ মিঃ লিটারে ১ গ্রাম হিসেবে পাওয়া যায়। এটি হুকওয়ার্ম, হুইপওয়ার্ম আর স্ট্রংগিলইডস বলে আর একরকম কৃমির চিকিৎসায় ব্যবহার করা যায়। কেঁচোকৃমি আর সুতোকৃমিতেও এটি কাজ করে—কিন্তু পাইপারাজাইনে এর থেকে উপসর্গ কম হয়। ট্রাইকিনোসিসের বেলায় এটি কিছুটা উপকার করতে পারে।

সাবধান: থিয়াবেনডাজোল খেলে কেঁচোকৃমি গলা দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। এর থেকে শ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কাজেই, যদি মনে করেন যে, কারো অন্য সব কৃমির সঙ্গে কোঁচোকৃমিও আছে, তাহলে থিয়াবেনডাজোল দেবার আগে প্রথমে পাইপারাজাইন দিয়ে চিকিৎসা করাটা বুদ্ধির কাজ হবে।

উপসর্গ: থিয়াবেনডাজোল থেকে প্রায়ই ক্লান্তি, গা বমিবমি, মাথা ঝিমঝিম করে, কখনো কখনো বমিও হয়।

থিয়াবেনডাজোলের *মাত্রা*—(৫০ মিঃ গ্রাঃ/কে জি/দিন)—৫০০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি বা ৫ মিঃ লিঃ মিক্সচারে ১ গ্রাম—
৩ দিন ধরে দিনে দুবার বড়িগুলি চিবিয়ে খাওয়া উচিত।

প্রত্যেক মাত্রায় দেবেন:

বড়দের: ১৫০০ মিঃ গ্রাঃ (৩ বড়ি বা ১১/২ চা চামচ)
ছোটদের: ৮ থেকে ১২ বছর বয়সের: ১০০০ মিঃ গ্রাঃ (২ বড়ি বা ১ চা চামচ)
ছোটদের: ৩ থেকে ৭ বছর বয়সের: ৫০০ মিঃ গ্রাঃ (১ বড়ি বা ১/২ চা চামচ)
৩ বছরের কম বয়সের শিশুদের: ২৫০ মিঃ গ্রাঃ (১/২ বড়ি বা ১/৪ চা চামচ)

<u>মেবেনডাজোল</u> (*ওয়ার্মিন, মেবেক্স*)

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ ১০০ মিঃ গ্রাঃ বড়িতে পাওয়া যায়।

এটা একটা নতুন ওষুধ, থিয়াবেনডাজোলের মত, কিন্তু আরো ভাল। হুকওয়ার্ম, হুইপওয়ার্ম, স্ট্রংগিলইডস, কেঁচোকৃমি আর সুতোকৃমি সারাতে কাজে লাগে। মেশানো সংক্রমণে ভাল কাজ করে। বেশি কৃমির সংক্রমণ হলে, সেটার চিকিৎসার সময় কিছু পেট কামড়ানো বা পাৎলা পায়খানা হতে পারে। কিন্তু থিয়াবেনডাজোল খাবার সময় সাধারণতঃ বমি বা অন্য যেসব সাংঘাতিক উপসর্গ দেখা যায়, মেবেনডাজোল থেকে সেগুলো হয় না। মেবেনডাজোলের বেলায়, কেঁচোকৃমির চিকিৎসার জন্যে আগে অন্য ওষুধ ব্যবহার করার দরকার হয় না।

সাবধান: পোয়াতি মেয়েদের বা ২ বছরের কমবয়সী শিশুদের মেবেনডাজোল দেবেন না।

মেবেনডাজোলের *মাত্রা*—১০০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি দিয়ে—
—ছোটদের আর বড়দের একই মাত্রা দেবেন।

কুচোকৃমির জন্যে শুধু একবার একটি বড়ি।

কেঁচোকৃমি, হুইপওয়ার্ম, হুকওয়ার্ম আর স্ট্রংগিলইডসের জন্যে: ৩ দিন ধরে দিনে ২ বার (সকালে আর সন্ধ্যেয়) ১ বড়ি (সবশুদ্ধ ৬ বড়ি)।

বেফেনিয়াম—হুকওয়ার্মের জন্যে

চেনা কোম্পানির নাম: *এল কোপার*

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ ৫ গ্রামের প্যাকেটে আসে।

পোয়াতি মেয়েদের বেফেনিয়াম দেয়া উচিত নয়। যেসব ছেলেপিলের বেশি রক্তাল্পতা বা অপুষ্টি আছে, ভাল না হয়ে ওঠা পর্যন্ত তাদেরও এটি দেয়া উচিত নয়। এটি হুকওয়ার্ম আর কেঁচোকৃমির জন্যেও বেশ ভালই কাজ করে; রোগীকে কেঁচোকৃমির জন্যে আগে অন্য চিকিৎসা করার দরকার হয় না।

হুকওয়ার্মের জন্যে বেফেনিয়ামের *মাত্রা*—৫ গ্রামের পুরিয়া দিয়ে:

শুধু এক মাত্রা খেতে দেবেন।

বড়দের আর ৫ বছরের বেশি বয়সের ছেলেপিলেদের: ৫ গ্রাম (১ প্যাকেট)

৫ বছরের কম বয়সের ছেলেপিলেদের: ২১/২ গ্রাম (১/২ প্যাকেট)

বেফেনিয়াম থেকে গা বমিবমি হতে পারে, তাই চিনি মেশানো কোনো ফলের রসের সঙ্গে দেবেন।

ফিতেকৃমির জন্যে

নিকলোসেমাইড—ফিতেকৃমির সংক্রমণের জন্যে

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ ৫০০ মিঃ গ্রাঃ চিবিয়ে খাবার বড়ি হিসেবে পাওয়া যায়।

নিকলোসেমাইড সম্ভবতঃ ফিতেকৃমির জন্যে সবথেকে ভাল ওষুধ—এর থেকে উপসর্গও সবথেকে কম হয়। কিন্তু এটির দাম খুব বেশি। অন্ত্রের বেশিরভাগ ধরনের ফিতেকৃমির বিরুদ্ধে এটি কাজ করে, কিন্তু অন্ত্রের বাইরের সিস্টের বিরুদ্ধে করে না।

ফিতেকৃমির জন্যে নিকলোসেমাইডের *মাত্রা*—৫০০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি দিয়ে—

শুধু এক মাত্রা ভাল করে চিবিয়ে গিলে ফেলবেন। ওষুধটা খাওয়ার আগের বা পরের ২ ঘণ্টায় কিছু খাবেন না।

বড়দের আর ৮ বছরের বেশি বয়সের ছেলেপিলেদের: ২ গ্রাম (৪ বড়ি)

ছোটদের: ২ থেকে ৮ বছর বয়সের: ১ গ্রাম (২ বড়ি)

২ বছরের কম বয়সের শিশুদের: ৫০০ মিঃ গ্রাঃ (১ বড়ি)

গোদের জন্যে

ডাইএথিল কারবামাজাইন

চেনা কোম্পানির নাম: *হেট্রাজান*

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ ৫০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি হিসেবে পাওয়া যায়।

উপসর্গ: এই ওষুধটি ব্যবহারের ফলে সাংঘাতিক এলার্জির প্রতিক্রিয়া হতে পারে; এলার্জির ওষুধ দিয়ে সেসব কিছুটা সামলানো যেতে পারে (পৃঃ ২২৯)।

কোনো অভিজ্ঞ স্বাস্থ্যকর্মীর নির্দেশ ছাড়া এই ওষুধটি ব্যবহার করবেন না।

ডাইএথিল কারবামাজাইনের *মাত্রা*—(৬ মিঃ গ্রাঃ/কে জি/দিন)

৭ থেকে ২১ দিন ধরে দিনে ৩ মাত্রা করে দেবেন।

প্রতি মাত্রায় দেবেন:

বড়দের: ১৫০ মিঃ গ্রাঃ (৩ বড়ি)

ছোটদের: ১২ বছরের কম বয়সের: ৬ মিঃ গ্রাঃ/কে জি/দিন—৩ মাত্রায় ভাগ করে।

চোখের জন্যে

সালফাসিটামাইড চোখের ড্রপ:

চেনা কোম্পানির নাম: *লোকুলা, এলবুসিড*

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———

১০ মিঃ লিঃ বোতলে ১০%, ২০%, আর ৩০% এ সাধারণতঃ পাওয়া যায়।

এটি চোখ ওঠা আর ট্র্যাকোমার চিকিৎসায় কাজে লাগে।

চোখ ওঠার জন্যে

চিকিৎসা: পৃঃ ২৬৪-তে যেমন বলা হয়েছে সেইভাবে দিনে ৩ বার চোখ দুটি ধুয়ে ফেলুন।

যতদিন না সংক্রমণ চলে যায়, যে চোখটা উঠেছে তার নিচের পাতার ভেতরে ১০ মিনিট অন্তর অন্তর ২০% সালফাসিটামাইড চোখের ড্রপ দিন।

সংক্রমণ ছড়িয়ে যাওয়া এড়াতে: যার চোখ উঠেছে তার কাছাকাছি যারা এসেছে, অথবা যারা তার সঙ্গে একই বাড়িতে থাকে, অথবা যাদের পাড়ায় অনেকের চোখ উঠেছে, তাদের সকলেরই দুচোখে ১/২ বা ১ ঘণ্টা অন্তর অন্তর ২০% সালফাসিটামাইড চোখের ড্রপ নেয়া উচিত। যদি একটা চোখ ওঠে, তবে ওপরে যেমন বলা হল, সেইভাবে সেটার চিকিৎসা করবেন, আর অন্য চোখটাতেও আধঘণ্টা অন্তর অন্তর চোখের ড্রপ দেবেন। দেখবেন ড্রপারটা যেন চোখটা না ছোঁয়।

ট্র্যাকোমার জন্যে

সংক্রমিত চোখটি দিনে ৩ বার ধুয়ে তাতে ২০% সালফাসিটামাইড চোখের ড্রপ দিন। ৩ মাস ধরে এইরকম

করবেন। পুরোপুরি চিকিৎসার জন্যে সালফা বড়িও খাবেন (পৃঃ ২৬৫)।

এনটিবায়োটিক চোখের মলম—চোখ ওঠার জন্যে

দরকারি উদাহরণ: **অকসিটেট্রাসাইক্লিন বা ক্লোরটেট্রাসাইক্লিন** চোখের মলম।

চেনা কোম্পানির নাম—*টেরামাইসিন মলম*

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———

যেসব চোখের সংক্রমণের, সালফাসিটামাইড চোখের ড্রপে প্রতিরোধ আছে, সেগুলির জন্যেও এই চোখের মলমগুলি ব্যবহার করা যায়।

উপকার পেতে হলে, চোখের মলম চোখের পাতার ভেতরে লাগাতে হয়, বাইরে নয়। দিনে ৩ বা ৪ বার লাগাবেন। শুতে যাবার আগে চোখের মলম লাগালে মামড়ি হয় না।

সিলভার নাইট্রেট চোখের ড্রপ ১%—সদ্য জন্মানো শিশুদের চোখ রক্ষা করার জন্যে।

————জন্যে দাম————

জন্মাবার পরেই, শিশুর প্রতি চোখে ১ ফোঁটা করে ১% সিলভার নাইট্রেট দিয়ে দেবেন। এতে শিশুর চোখ গনোরিয়ার সংক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। সব শিশুদের এইভাবে রক্ষা করা উচিত।

কানে ব্যথা আর কানের সংক্রমণের জন্যে

বোরোগ্লিসারিন কানের ড্রপ—কানের খোলের জন্যে

————জন্যে দাম————

কানের অল্পস্বল্প সংক্রমণের বেলায় দিনে ১ বা ২ বার ২ থেকে ৩ ফোঁটা বোরোগ্লিসারিন দিয়ে দেবেন।

ক্লোরামফেনিকল দেয়া কানের ড্রপ

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ ১০ মিঃ লিঃ ড্রপে ৫% পাওয়া যায়।

কানের সাংঘাতিক সংক্রমণের বেলায়, দিনে ২ বা ৩ বার পরিষ্কার তুলো দিয়ে কান পরিষ্কার করে, তারপরে ক্লোরামফেনিকল দেয়া কানের ড্রপ দেবেন। এক একবারে অন্ততঃ ৩ থেকে ৫ ফোঁটা দেবেন।

ব্যথার জন্যে : ব্যথা কমাবার ওষুধ

দ্রষ্টব্য: অনেক ধরনের ব্যথা কমাবার ওষুধ আছে, তার মধ্যে কয়েকটা বিপজ্জনক (বিশেষ করে যেগুলিতে **ডাইপাইরোন** আছে)। যেগুলিকে আপনি মোটামুটি নিরাপদ বলে ঠিক জানেন, যেমন **এসপিরিন** আর **এসেটামিনোফেন**, শুধু সেগুলিই ব্যবহার করবেন। বেশি কড়া ব্যথা কমাবার জন্যে **কোডিন** (পৃঃ ৪১৮) দেখুন।

এসপিরিন (এসেটিস্যালিসিলিক এসিড)

চেনা কোম্পানির নাম: *ডিসপ্রিন*

আপনার এলাকায় নাম————

সাধারণতঃ পাওয়া যায়:

৩০০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি———জন্যে দাম———

ছোটদের জন্যে ৭৫ মিঃ গ্রাঃ বড়ি অথবা ছোটদের এসপিরিন——— জন্যে দাম———

এসপিরিন একটি খুব উপকারী, সস্তা ব্যথা কমাবার ওষুধ। এটি ব্যথা, জ্বর আর প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। কাশি আর চুলকুনি কমাতেও এটি কিছুটা সাহায্য করে।

ব্যথা, আথ্রাইটিস আর সর্দিকাশির জন্যে অনেকরকম ওষুধ বিক্রি করা হয়—সেগুলিতে এসপিরিন থাকে। কিন্তু সেগুলির দাম বেশি, অথবা সেগুলি সাধারণতঃ শুধু এসপিরিনের থেকে বেশি উপকার করে না।

ঝুঁকি আর সাবধানতা:

১. পেটে ব্যথা বা বদহজমের জন্যে এসপিরিন খাবেন না। এসপিরিনটা এসিড—এতে সমস্যাটা বেড়ে যেতে পারে। একই কারণে, **যাদের পেটে আলসার আছে তাদের কখনো এসপিরিন খাওয়া উচিত নয়।**
২. কারো কারো এসপিরিন খেলে পেটে ব্যথা বা বুকজ্বালা হয়। এটা এড়াবার জন্যে দুধ, একটু খাবার সোডা, অথবা প্রচুর জল কিংবা খাওয়ার সময় এসপিরিন খাবেন।
৩. যার শরীরে জলের অভাব হয়েছে, তার ভালভাবে পেচ্ছাপ হতে শুরু না হওয়া পর্যন্ত, তাকে ১ মাত্রার বেশি এসপিরিন দেবেন না।
৪. ১ বছরের কম বয়সের শিশুদের এসপিরিন না দেয়াই ভাল। হাঁপানির রোগীদের এসপিরিন না দেয়া ভাল, কারণ এর থেকে টান উঠতে পারে।
৫. এসপিরিন ছেলেপিলেদের নাগালের বাইরে রাখবেন। অনেকটা খেলে এটা তাদের পক্ষে বিষাক্ত হতে পারে।

এসপিরিনের *মাত্রা*—ব্যথা বা জ্বরের জন্যে: ৩০০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি (৫ গ্রেন)—

৪ থেকে ৬ ঘণ্টা অন্তর (বা দিনে ৪ থেকে ৬ বার) একবার করে খাবেন।

প্রতি বারে খাবেন:

বড়দের: ১ বা ২ বড়ি (৩০০ থেকে ৬০০ মিঃ গ্রাঃ)
ছোটদের: ৮ থেকে ১২ বছর বয়সের: ১ বড়ি (৩০০ মিঃ গ্রাঃ)
ছোটদের: ৩ থেকে ৭ বছর বয়সের: ½ বড়ি (১৫০ মিঃ গ্রাঃ)
ছোটদের: ১ থেকে ২ বছর বয়সের: ¼ বড়ি (৭৫ মিঃ গ্রাঃ)

(সাংঘাতিক আথ্রাইটিস বা বাতের জ্বরের জন্যে মাত্রাটা দুগুণ করা যেতে পারে। অথবা ১০০ মিঃ গ্রাঃ/কে জি/দিন দেবেন। যদি কানে ভোঁ ভোঁ করে তবে মাত্রাটা কমিয়ে দেবেন।)

—ছোটদের ৭৫ মিঃ গ্রাঃ এসপিরিন—

ছেলেপিলেদের দিনে ৪ বার এসপিরিন দেবেন:

৮ থেকে ১২ বছর বয়সের: ৪ বড়ি (৩০০ মিঃ গ্রাঃ)
৩ থেকে ৭ বছর বয়সের: ২ থেকে ৩ বড়ি (১৫০ থেকে ২২৫ মিঃ গ্রাঃ)
১ থেকে ২ বছরের শিশুদের: ১ বড়ি (৭৫ মিঃ গ্রাঃ)
১ বছরের কম বয়সের শিশুদের: এসপিরিন দেবেন না।

এসেটামিনোফেন (প্যারাসিটামল)—ব্যথা আর জ্বরের জন্যে

নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ ৫০০ মিঃ গ্রাঃ বড়িতে পাওয়া যায়। সিরাপ হিসেবেও পাওয়া যায়।

ছেলেপিলেদের পক্ষে এসপিরিনের থেকে এসেটামিনোফেন বেশি নিরাপদ। এতে পেটের গোলমাল হয় না, তাই যাদের পেটের আলসার আছে তারা এটা ব্যবহার করতে পারে।

এসেটামিনোফেনের *মাত্রা*—ব্যথা আর জ্বরের জন্যে: ৫০০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি অথবা ৫ মিঃ লিঃ সিরাপে ১২৫ মিঃ গ্রাঃ।

দিনে ৪ বার এসটোমিনোফেন খাওয়াবেন।

প্রতি মাত্রায় দেবেন:

বড়দের: ৫০০ মিঃ গ্রাঃ থেকে ১ গ্রাঃ (১ বা ২ বড়ি)
ছোটদের: ৮ থেকে ১২ বছর বয়সের: ৫০০ মিঃ গ্রাঃ (১ বড়ি)
ছোটদের: ৩ থেকে ৭ বছর বয়সের: ২৫০ মিঃ গ্রাঃ (১/২ বড়ি)
ছোটদের: ৬ মাস থেকে ২ বছর বয়সের: ১২৫ মিঃ গ্রাঃ (১/৪ বা ১ চা চামচ সিরাপ)
৬ মাসের কম বয়সের শিশুদের: ৬২ মিঃ গ্রাঃ (১/৮ বড়ি বা ১/২ চা চামচ সিরাপ)

এরগোটামাইনের সঙ্গে ক্যাফিন (*কেফারগট*)—মাইগ্রেনের মাথাধরার জন্যে

নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ ১ মিঃ গ্রাঃ এরগোটামাইন দেয়া বড়ি হিসেবে পাওয়া যায়।

এরগোটামাইনের সঙ্গে ক্যাফিনের *মাত্রা*—মাইগ্রেনের জন্যে:

বড়দের: মাইগ্রেনের প্রথম লক্ষণ দেখা দিলে দুটি বড়ি খাবেন। তারপর আধঘণ্টা অন্তর অন্তর একটি করে বড়ি খাবেন—যতক্ষণ না ব্যথাটা চলে যায়। কিন্তু সবশুদ্ধ ছটার বেশি বড়ি খাবেন না।

সাবধান: এই ওষুধটি ঘন ঘন খাবেন না। পোয়াতি অবস্থায় খাবেন না।

ক্ষত বন্ধ করার সময় ব্যথা কমাবার জন্যে এনেসথেটিক

লিডোকেইন (*জাইলোকেইন*)

২% (সঙ্গে এপিনেফ্রিন থাকতে বা নাও থাকতে পারে)

নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ ইনজেকশনের জন্যে এমপুল বা শিশিতে পাওয়া যায়।

কোনো ক্ষত সেলাই করার আগে সেটার চারধারে লিডোকেইনের ইনজেকশন দিয়ে দেয়া যায়, যাতে জায়গাটা অসাড় হয়ে গিয়ে ব্যথা না লাগে।

প্রায় ১ সেঃ মিঃ করে তফাতে চামড়ার মধ্যে আর নিচে—দু জায়গাতেই ইনজেকশন দিয়ে দিন। ইনজেকশন দেবার আগে সিরিঞ্জের ঠেলবার অংশটা পেছন দিকে টেনে নিতে ভুলবেন না। চামড়ার প্রতি ২ সেঃ মিঃ এর জন্যে প্রায় ১ মিঃ লিঃ অসাড় করার ওষুধ দেবেন। ক্ষতটা পরিষ্কার হলে, সেটার ধারগুলোর ভেতরেই ইনজেকশন দিতে পারেন। যদি ক্ষতটা নোংরা হয়, তবে তার চারপাশের চামড়া পরিষ্কার করে তার মধ্যে দিয়ে ইনজেকশন দেবেন। তারপর **খুব যত্ন করে ক্ষতটা পরিষ্কার করে** তবে সেটা বন্ধ করবেন।

বেশির ভাগ ক্ষত সেলাই করার সময় এপিনেফ্রিন দেয়া লিডোকেইন ব্যবহার করবেন। এপিনেফ্রিন দিলে অসাড় ভাবটা বেশিক্ষণ থাকে আর রক্তপাত সামলাতে সাহায্য করে।

হাতপায়ের আঙুল, লিঙ্গ, কান আর নাকের ক্ষতের জন্যে এপিনেফ্রিন ছাড়া লিডোকেইন ব্যবহার করবেন। এটা জরুরি, কারণ এপিনেফ্রিন এইসব জায়গায় রক্তচলাচল বন্ধ করে দিয়ে ভীষণ ক্ষতি করতে পারে।

এপিনেফ্রিন দেয়া লিডোকেইনের আরো ব্যবহার: **নাক দিয়ে সাংঘাতিক রক্তপাত হলে,** একটু তুলো এই ওষুধে ভিজিয়ে নাকের মধ্যে গুঁজে দিন। এপিনেফ্রিনে শিরাগুলো চেপে বন্ধ হয়ে গিয়ে রক্তপাত সামলাতে সাহায্য করবে।

প্রোকেইন হাইড্রোক্লোরাইড—বিছের হুল ফোটানোর জন্যে

চেনা কোম্পানির নাম—*নোভোকেইন*

আপনার এলাকায় নাম——— ———জন্যে দাম———

ব্যথা কমাতে, বিছের হুল ফোটানোর জায়গাটার চারপাশে, ১% ওষুধের ২৫ মিঃ লিঃ ইনজেকশন করে দিন।

পেট কামড়ানোর জন্যে পেট ব্যথা কমাবার ওষুধ

বেলাডোনা (সঙ্গে ফেনোবারবিটাল থাকতে বা নাও থাকতে পারে)

(*বেলাডিনাল—এন*)

নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ ৮ মিঃ গ্রাঃ বেলাডোনা দেয়া বড়ি হিসেবে পাওয়া যায়।

পেট ব্যথা কমাবার নানা ওষুধ আছে। তার বেশিরভাগের মধ্যেই বেলাডোনা বা ওই ধরনের কিছু ওষুধ (এট্রোপিন, হায়োসিয়ামাইন) আর অনেক সময় ফেনোবারবিটাল (ফেনোবারবিটোন) থাকে। এই ওষুধগুলি নিয়মিত ব্যবহার করে যাওয়া উচিত নয়। তবে, পেটে বা অন্ত্রে ব্যথা বা কামড়ানোর (শূলব্যথা) চিকিৎসার জন্যে কখনো কখনো ব্যবহার করা যেতে পারে। মূত্রাশয়ের সংক্রমণ বা পিত্তকোষের প্রদাহের ব্যথা কমাতে এগুলি সাহায্য করতে পারে। আলসারের চিকিৎসায় মাঝে মাঝে এগুলি কাজে লাগে।

বেলাডোনার *মাত্রা*—পেট কামড়ানোর জন্যে:

—৮ মিঃ গ্রাঃ বেলাডোনা দেয়া বড়ি—

বড়দের: দিনে ৩ থেকে ৬ বার ১ বড়ি

ছোটদের: ৮ থেকে ১২ বছর বয়সের: দিনে ২ বা ৩ বার ১ বড়ি

ছোটদের: ৫ থেকে ৭ বছর বয়সের: দিনে ২ বা ৩ বার ½ বড়ি

৫ বছরের কম বয়সের ছেলেপিলেদের দেবেন না।

সাবধান এইসব ওষুধ বেশি খেলে বিষাক্ত। ছেলেপিলেদের নাগালের বাইরে রাখুন।

যাদের গ্লকোমা আছে তাদের বেলাডোনা বা এট্রোপিন দেয়া ওষুধ ব্যবহার করা উচিত নয়।

অম্বল, বুকজ্বালা আর পেটের আলসারের জন্যে: এনটাসিড (অম্বলের ওষুধ)

এলুমিনিয়াম হাইড্রোকসাইডের সঙ্গে ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোকসাইড (বা ট্রাইসিলিকেট) দেয়া

নাম———— ————জন্যে দাম————

সাধারণতঃ ৫০০ মিঃ গ্রাঃ থেকে ৭৫০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি অথবা ৫ মিঃ লিঃ মিক্সচারে ৩০০ থেকে ৫০০ মিঃ গ্রাঃ হিসেবে পাওয়া যায়।

এগুলি অম্বল বা বুকজ্বালার জন্যে মাঝে মাঝে, বা পেটের (পেপটিক) আলসারের চিকিৎসার অংশ হিসেবে নিয়মিত, খাওয়া যায়। এনটাসিড খাওয়ার সবথেকে ভাল সময় হল, খাওয়ার ১ ঘন্টা আগে আর শোবার সময়। দুটি বা তিনটি বড়ি চিবিয়ে খাবেন। পেটের সাংঘাতিক আলসারের জন্যে প্রত্যেক ঘন্টায় ৩ থেকে ৬ বড়ি (বা চা চামচ) খাওয়া দরকার হতে পারে।

সোডিয়াম বাইকারবোনেট (খাবার সোডা)

সাদা গুঁড়ো হিসেবে পাওয়া যায় ————জন্যে দাম————

অম্বলের ওষুধ হিসেবে এটি খুব সীমিতভাবে ব্যবহার করা উচিত—কারো কচিৎ কখনো পেটের গোলমালের সঙ্গে বুকজ্বালা বা অম্বল হলে। **পুরোনো বদহজম বা পেটের (পেপটিক) আলসারের চিকিৎসায় এটি ব্যবহার করা উচিত নয়।** এতে, প্রথমদিকে, কাজ হচ্ছে বলে মনে হলেও, পেট থেকে বেশি এসিড বেরিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যায়। আগের রাত্রে মদ খেয়ে লোকের যে কষ্টকর অবস্থাটা হয়, তার জন্যেও খাবার সোডা কাজে লাগে। এই কারণে (কিন্তু অম্বল সারাতে নয়) এটি এসপিরিনের সঙ্গে খাওয়া যায়। *এলকাসেলজার* হল খাবার সোডা আর এসপিরিন মেশানো ওষুধ। **মাঝে মাঝে** এনটাসিড হিসেবে ½ চা চামচ খাবার সোডা জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাবেন। এটি ঘন ঘন খাবেন না।

দাঁত পরিষ্কার করার জন্যে খাবার সোডা বা খাবার সোডার সঙ্গে নুন মিশিয়ে, মাজনের বদলে ব্যবহার করা যেতে পারে (পৃঃ ২৭৪)।

চিনি নুনের সরবৎ তৈরি করার জন্যে খাবার সোডার ব্যবহার: পৃঃ ১৮২ আর কিছু পরে দেখুন।

সাবধান: যাদের কয়েক রকম হার্টের গোলমাল আছে অথবা পা বা মুখ ফুলে যায়, তাদের খাবার সোডা বা যেসব খাবারে বেশি সোডিয়াম আছে (যেমন নুন) সেগুলি খাওয়া উচিত নয়।

শরীরে জল কমে যাওয়ার জন্যে

রিহাইড্রেশন মিক্স

নাম———— ————জন্যে দাম————

সাধারণতঃ ১ লিটার সরবৎ তৈরি করার জন্যে প্যাকেটে পাওয়া যায়।

সাধারণ চিনি দিয়ে চিনি নুনের সরবৎ তৈরি করার নির্দেশ পৃঃ ১৮২-তে দেয়া আছে।

কয়েকটি দেশের স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে আলাদা আলাদা প্যাকেটে ১ লিটার চিনি নুনের সরবৎ তৈরি করার জন্যে মেশানো গুঁড়ো সরবরাহ করা হয়। এই মেশানো গুঁড়োতে সাধারণ চিনির (*সুক্রোজ*) বদলে *গ্লুকোজ* থাকে। গ্লুকোজ সাধারণ চিনির থেকে বেশি সরল। এটিকে শিশুর শরীর বেশি সহজে নিতে পারে। গ্লুকোজ তরল খাবারটাকে বেশি তাড়াতাড়ি শিশুর শরীরে যেতে সাহায্য করে। শিশুর খুব সাংঘাতিক পাৎলা পায়খানা হলে অথবা খুব অপুষ্টি থাকলে, চিনির বদলে গ্লুকোজ ব্যবহার করাটা বিশেষ জরুরি। এছাড়া, প্যাকেটের মেশানো গুঁড়োতে সাধারণতঃ নুনের পরিমাণ বজায় রাখতে সাহায্য করে।

যদি আপনার কাছে গ্লুকোজ আর পটাসিয়াম ক্লোরাইড—দুটোই থাকে, তবে পৃঃ ১৮২-তে যেটি দেয়া হয়েছে, তার বদলে নিচের সরবৎটি তৈরি করুন।

মেশান:

ফোটানো জল—১ লিটার (৪ কাপ)

গ্লুকোজের গুঁড়ো—২০ গ্রাম বা ৮ মাথাভাঙা চা চামচ

সাধারণ নুন (সোডিয়াম ক্লোরাইড) ২ গ্রাম বা ½ মাথাভাঙা চা চামচ

খাবার সোডা (সোডিয়াম বাইকারবোনেট)—২ গ্রাম বা ½ মাথাভাঙা চা চামচ

পটাসিয়াম ক্লোরাইড—১·৫ গ্রাম বা ⅓ মাথাভাঙা চা চামচ

যদি আপনার কাছে গ্লুকোজ থাকে, কিন্তু পটাসিয়াম ক্লোরাইড না থাকে, তবে আগের পরিমাণের শুধু অর্ধেক নুন আর খাবার সোডা ব্যবহার করবেন।

ওপরের জিনিসগুলির কোনোটিই না থাকলে, শরীরে জল যোগাবার তরল খাবার হিসেবে ভাতের ফেন দিতে পারেন।

শরীরের জল কমে যাওয়ার চিকিৎসার জন্যে পৃঃ ১৮২ দেখুন।

শক্ত মলের (কোষ্ঠকাঠিন্যের) জন্যে : মৃদু জোলাপ

পৃঃ ২২-এ নানারকম মৃদু আর কড়া জোলাপের ব্যবহার আর অপব্যবহারের বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যাবে। জোলাপ বড় বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কড়া, যন্ত্রণাদায়ক মল নরম করার জন্যে শুধু মাঝে মাঝে এগুলি ব্যবহার করা উচিত। **যার পাৎলা পায়খানা, পেটে ব্যথা বা শরীরে জলের অভাব হয়েছে, তাকে কখনো জোলাপ দেবেন না।** ২ বছরের কম বয়সের ছেলেপিলেকে জোলাপ দেবেন না।

মল নরম করার জন্যে, সাধারণতঃ সবথেকে ভাল হল প্রচুর ছিবড়ে দেয়া খাবার—যেমন ভুষি বা সাবু। প্রচুর তরল খাবার আর প্রচুর ফল খেলেও কাজ হয়।

মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া (ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোকসাইড)—মৃদু জোলাপ আর অম্বলের ওষুধ

নাম———— ————জন্যে দাম————

সাধারণতঃ দুধের মত তরল ওষুধ হিসেবে পাওয়া যায়।

মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়ার *মাত্রা*:

অম্বলের ওষুধ হিসেবে:

বড়দের আর বড় ছেলেপিলেদের: দিনে ৩/৪ বার ১/২ থেকে ১ চা চামচ

মৃদু জোলাপ হিসেবে:

শোবার সময় ১ মাত্রা দেবেন: বড়দের আর ৮ বছরের বেশি বয়সের ছেলেপিলেদের: ১ থেকে ২ বড় চামচ

ছোটদের: ২ থেকে ৭ বছরের বয়সের: ১/২ থেকে ১ বড় চামচ

২ বছরের কম বয়সের ছেলেপিলেদের: দেবেন না।

এপসম নুন (ম্যাগনেসিয়াম সালফেট)—জোলাপ হিসেবে আর চুলকুনির জন্যে

নাম———— ————জন্যে দাম————

সাধারণতঃ সাদা গুঁড়ো আর দানা হিসেবে পাওয়া যায়

এপসম নুনের *মাত্রা*:

মৃদু জোলাপ হিসেবে—নিচের পরিমাণমত এপসম নুন জলে মিশিয়ে খেয়ে নেবেন:

বড়দের: ১ থেকে ২ চা চামচ

ছোটদের: ৬ থেকে ১২ বছর বয়সের: ১/২ থেকে ১ চা চামচ

ছোটদের: ২ থেকে ৬ বছর বয়সের: ১/৪ থেকে ১/২ চা চামচ

২ বছরের কম বয়সের শিশুদের: দেবেন না।

চুলকুনি বন্ধে সাহায্য করতে—১ লিটার জলে ৮ চা চামচ এপসম নুন মিশিয়ে, যে জায়গাটা চুলকোয়, সেখানের চামড়ার ওপর ঠাণ্ডা করে ঢেলে দিন বা সেঁক হিসেবে দিন।

ইসফগুলও কোষ্ঠকাঠিন্যের পক্ষে ভাল। ১ থেকে ২ চা চামচ জল দিয়ে খাবেন। খাবারের সঙ্গে খাবেন।

খনিজ তেল (তরল প্যারাফিন) আজকাল আর দেয়া হয় না।

অল্পস্বল্প পাৎলা পায়খানার জন্যে : পাৎলা পায়খানা কমার ওষুধ

কেওলিনের সঙ্গে পেকটিন (কেওপেকটেট, পেকটোক্যাব)

নাম———— ————জন্যে দাম————

সাধারণতঃ দুধের মত মিক্সচার হিসেবে পাওয়া যায়।

এটা অল্পস্বল্প পাৎলা পায়খানাকে ঘন (কম জোলো) করে অসুবিধেটা কমাতে পারে। **এতে পাৎলা পায়খানার কারণটা সারে না আর শরীরের জলের অভাব এড়াতে সাহায্য হয় না।** পাৎলা পায়খানার চিকিৎসার জন্যে এটা কখনো দরকার হয় না। এই ওষুধ বেশি ব্যবহার করে প্রচুর পয়সা নষ্ট করা হয়।

৬ বছরের কম বয়সের ছেলেপিলেদের এটি দেবেন না।

নাক বন্ধ হওয়ার জন্যে

বন্ধ নাক খুলতে, সাধারণতঃ ২০১ পৃষ্ঠায় যেমন বলা হয়েছে, সেইভাবে একটু নুন মেশানো জল টেনে নেয়া ছাড়া আর কিছু দরকার হয় না। কখনো কখনো বন্ধ নাক খোলার ড্রপ ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন:

এফিড্রিন বা ফেনিলেফ্রিন দেয়া নাকের ড্রপ (*নিও-সাইনেফ্রিন*)

নাম———— ————জন্যে দাম————

এগুলি নাক বন্ধ হলে বা নাক দিয়ে জল পড়লে ব্যবহার করা যেতে পারে, বিশেষ করে যদি লোকটির কানের ভেতরে সংক্রমণ হয়ে থাকে (বা প্রায়ই হয়)।

বন্ধ নাক খোলার জন্যে নাকের ড্রপের *মাত্রা*:

২০১ পৃষ্ঠাতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে একেক ফুটোয় ১ বা ২ ফোঁটা দেবেন। এটা দিনে ৪ বার করবেন। বেশি দিন ধরে ব্যবহার করবেন না বা এইসব ওষুধ ব্যবহারের অভ্যেস করে ফেলবেন না।

এফিড্রিন বড়ি দিয়ে তৈরি নাকের ড্রপের জন্যে পৃঃ ৪১৯ দেখুন।

কাশির জন্যে

কাশি দিয়ে, শরীর, যেসব বাতাসের নল ফুসফুসে যায় সেগুলো পরিষ্কার করে দেয়, আর এইসব নলে যে সমস্ত জীবাণু আর শ্লেষ্মা থাকে, সেগুলোকে ফুসফুসে ঢুকতে দেয় না। কাশি, শরীরের নিজেকে রক্ষা করার ব্যবস্থার অংশ; তাই যেসব ওষুধ কাশি থামিয়ে বা কমিয়ে দেয়, সেগুলি অনেক সময় উপকারের থেকে ক্ষতিই বেশি করে। যে সমস্ত শুকনো কাশি কষ্ট দেয় আর রাত্রে ঘুমোতে দেয় না, শুধু সেগুলির জন্যেই এই **কাশি কমাবার** (বা *চেপে দেবার*) ওষুধগুলি ব্যবহার করা উচিত। **কাশির সাহায্যকারী** (বা *একসপেকটোরাণ্ট*) বলে অন্য কয়েকটি ওষুধ আছে, সেগুলি শ্লেষ্মাটা তরল করে কাশির সঙ্গে বেরিয়ে আসাটা সহজ করে দেয়। বেশির ভাগ কাশির জন্যে কাশি কমাবার ওষুধের থেকে কাশির সাহায্যকারী ওষুধ ব্যবহার করাই ভাল।

সত্যি বলতে, দুরকম কাশির সিরাপই (কাশি কমাবার আর কাশির সাহায্যকারী) দরকারের থেকে অনেক বেশি ব্যবহার করা হয়। বেশির ভাগ চলতি কাশির ওষুধে খুব কম কাজ হয়, বা কোনো কাজই হয় না,—শুধু পয়সা নষ্ট হয়। **কাশির সব থেকে ভাল আর সব থেকে দরকারি ওষুধ হল জল।** প্রচুর জল খেলে আর গরম জলের ভাপে শ্বাস নিলে—বেশির ভাগ কাশির সিরাপের থেকে—শ্লেষ্মা তরল করতে আর কাশি কমাতে অনেক বেশি সাহায্য করে। নির্দেশের জন্যে পৃঃ ২০৫ দেখুন। এছাড়া, পৃঃ ২০৬-এ একটি বাড়িতে তৈরি কাশির সিরাপের নির্দেশ দেয়া আছে।

কাশি কমাবার (চেপে দেবার) ওষুধ: কোডিন আর ক্লোরাল হাইড্রেট

নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ কাশির সিরাপ বা তরল ওষুধ হিসেবে পাওয়া যায়। (কোডিন বড়ি হিসেবেও পাওয়া যায়, সঙ্গে এসপিরিন থাকতে বা নাও থাকতে পারে।)

কোডিন ব্যথা কমাবার একটি কড়া ওষুধ—কাশি কমাবারও খুব কড়া ওষুধ। কিন্তু এটাতে অভ্যেস (নেশা) হয়ে যায় বলে এটা পাওয়া কঠিন হতে পারে। এটি প্রায়ই, কাশির সিরাপে, অন্য ওষুধের সঙ্গে মিশিয়ে, অথবা বড়ি হিসেবে পাওয়া যায়। ওষুধের সঙ্গে যে নির্দেশগুলি দেয়া থাকে, মাত্রার জন্যে সেগুলি মেনে চলবেন। ব্যথা কমানোর থেকে কাশি কমাতে কম মাত্রা লাগে। কাশি কমাতে—বড়দের বেলায়—৭ থেকে ১৫ মিঃ গ্রাঃ কোডিন সাধারণতঃ যথেষ্ট হয়। ছোটদের, বয়স বা ওজন অনুসারে, আরো কম দেয়া উচিত (পৃঃ ৭৪)।

ক্লোরাল হাইড্রেট একটি শান্ত করার ওষুধ—যেসব ছেলেপিলে কাশির জন্যে রাতে ঘুমোতে পারে না, তাদের এটি দেয়া যেতে পারে। ঘুংড়ি কাশিতে এটি বিশেষ কাজে লাগে। ঘুংড়ি কাশির জন্যে ফেনোবারবিটালও ব্যবহার করা যায় (পৃঃ ৪২২)।

কাশি কমাবার জন্যে ক্লোরাল হাইড্রেটের *মাত্রা*:

—চলতি মানের ক্লোরাল কাশির মিক্সচার (ক্লোরাল এলিক্সির বি পি সি) ব্যবহার করে—

দিনে ৪ মাত্রা পর্যন্ত দেবেন, তার বেশি নয়।

২ বছরের বেশি বয়সের ছেলেপিলেদের: ১০ মিঃ লিঃ (২ চা চামচ)

২ বছরের কম বয়সের ছেলেপিলেদের: ১১/৪ থেকে ১১/২ চা চামচ।

আরো ছোট শিশুদের আরো কম মাত্রা দেয়া উচিত।

কাশির সাহায্যকারী (এক্সপেকটোরাণ্ট): পটাসিয়াম আয়োডাইড

নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ ৩০০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি বা একটা চলতি মানের (সুসিক্ত) তরল ওষুধে পাওয়া যায়।

ফুসফুসের ভেতরে যে নলগুলি চলে গেছে সেগুলির পুরু শ্লেষ্মা আলগা করে দিতে **পটাসিয়াম আয়োডাইড** সাহায্য করে।

কাশির সাহায্যকারী হিসেবে পটাসিয়াম আয়োডাইডের *মাত্রা*:

দিনে ৩ বা ৪ বার দেবেন।

বড়দের: একটি ৩০০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি বা ১০ ফোঁটা তরল ওষুধ ছোটদের বয়স বা ওজন অনুসারে আরো কম করে দেয়া উচিত (পৃঃ ৭৪)।

হাঁপানির জন্যে

ঠিকমত হাঁপানি এড়াবার আর সামলাবার জন্যে পৃঃ ২০৪ দেখুন।

এফেড্রিন

নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ ১৫ মিঃ গ্রাঃ (আর ২৫ মিঃ গ্রাঃ) বড়ি হিসেবে পাওয়া যায়।

হাঁপানির ছোটখাট আক্রমণ সামলাতে, আর কঠিন আক্রমণগুলির ফাঁকে ফাঁকে তা এড়াতে এফেড্রিন কাজে লাগে। ফুসফুসে যে নলগুলি ঢুকেছে সেগুলি খুলে দিতে এটি সাহায্য করে; তাতে বাতাস বেশি সহজে চলাচল করতে পারে। নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কাইটিস থেকে শ্বাসকষ্ট হলেও এটি ব্যবহার করা যায়।

এফেড্রিন প্রায়ই **থিওফাইলিন** বা **এমাইনোফাইলিনের** সঙ্গে—কখনো কখনো **ফেনোবারবিটালের** সঙ্গে—মেশানো হিসেবে পাওয়া যায়। এই মেশানো হাঁপানির ওষুধের একটা চেনা কোম্পানির নাম হল *টেডরাল*; তবে, এটির দাম বেশি।

হাঁপানির জন্যে এফেড্রিনের *মাত্রা*—(১ মিঃ গ্রাঃ/কে জি/দিনে ৩ বার)

—১৫ মিঃ গ্রাঃ বড়ি ব্যবহার করে—

দিনে ৩ বার খেতে দেবেন।

প্রতি মাত্রায় দেবেন:

বড়দের: ১৫ থেকে ৬০ মিঃ গ্রাঃ (১ থেকে ৪ বড়ি)
ছোটদের: ৫ থেকে ১০ বছর বয়সের: ১৫ থেকে ৩০ মিঃ গ্রাঃ (১ থেকে ২ বড়ি)
ছোটদের: ১ থেকে ৪ বছর বয়সের: ১৫ মিঃ গ্রাঃ (১ বড়ি)
১ বছরের কম বয়সের শিশুদের: **দেবেন না**।

নাক বন্ধ হয়ে গেলে, এফেড্রিন দেয়া নাকের ড্রপ ব্যবহার করা যেতে পারে। এক চা চামচ জলে একটি বড়ি গুলে এটি তৈরি করা যেতে পারে।

স্যালবুটামলও (এসথালিন) ব্যবহার করা যায়।

২ মিঃ গ্রাঃ আর ৪ মিঃ গ্রাঃ বড়ি হিসেবে পাওয়া যায়।
বড়দের: দিনে ৩ বার ৪ মিঃ গ্রাঃ করে
ছোটদের: ০·৪ মিঃ গ্রাঃ/কে জি/দিনে—৩টি ভাগ করা মাত্রায়

থিওফাইলিন বা এমাইনোফাইলিন

নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ নানা মাত্রায় বড়ি আর সিরাপ হিসেবে পাওয়া যায়।

হাঁপানি সামলানোর বা আক্রমণ এড়ানোর জন্যে *মাত্রা*:
—(৩ থেকে ৫ মিঃ গ্রাঃ/কে জি/প্রতি ৬ ঘণ্টায়):

১০০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি ব্যবহার করে:

বড়দের: প্রতি ৬ ঘণ্টায় ২ বড়ি
ছোটদের: ৭ থেকে ১২ বছর বয়সের: প্রতি ৬ ঘণ্টায় ১ বড়ি
৭ বছরের কম বয়সের ছেলেপিলেদের: প্রতি ৬ ঘণ্টায় ½ বড়ি
কচি শিশুদের: **দেবেন না**

অবস্থা সাংঘাতিক হলে, অথবা ওপরের মাত্রা দিয়ে হাঁপানি সামলানো না গেলে, এর দুগুণ দেয়া যেতে পারে, কিন্তু তার বেশি নয়।

এড্রেনালাইন (এপিনেফ্রিন, *এড্রেনালিন*)

নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ ১ মিঃ লিঃ এমপুলে ১ মিঃ গ্রাঃ হিসেবে পাওয়া যায়।

এইসবের জন্যে এড্রেনালাইন ব্যবহার করা উচিত:

১. **হাঁপানির সাংঘাতিক আক্রমণে** যখন শ্বাসকষ্ট হয়
২. পেনিসিলিন ইনজেকশন, ধনুষ্টঙ্কারের এনটিটকসিন বা ঘোড়ার সিরাম থেকে তৈরি অন্য এনটিটকসিনের ফলে **সাংঘাতিক এলার্জির প্রতিক্রিয়া** (পৃ ৮৩) বা এলার্জির শক হলে।

হাঁপানি বা এলার্জির শকের জন্যে এড্রেনালাইনের *মাত্রা*—১ মিঃ লিঃ তরল ওষুধের এমপুলে ১ মিঃ গ্রাঃ দিয়ে—

(হাঁপানির বেলায়) প্রথমে নাড়ি গুনে নিন। তারপর ইনজেকশন দিন:

বড়দের: ⅓ মিঃ লিঃ
ছোটদের: ৭ থেকে ১২ বছর বয়সের: ⅕ মিঃ লিঃ
ছোটদের: ১ থেকে ৩ বছর বয়সের: ⅛ মিঃ লিঃ
১ বছরের কম বয়সের শিশুদের: **দেবেন না**।

দরকার হলে আধ ঘণ্টা পর দ্বিতীয় মাত্রা, আরো ২ ঘণ্টা পর তৃতীয় মাত্রা দেয়া যেতে পারে। ৩ মাত্রার বেশি দেবেন না। প্রথমবার ইনজেকশন দেয়ার পর নাড়ির গতি যদি প্রতি মিনিটে আগের থেকে ৩০ বারের থেকে বেশি বেড়ে যায়, তবে দ্বিতীয় মাত্রা দেবেন না।

এড্রেনালাইন ব্যবহার করার সময়, যা বলা আছে, তার থেকে বেশি পরিমাণে যেন কখনো না দেয়া হয়—সেটা দেখবেন।

এলার্জির প্রতিক্রিয়া আর বমির জন্যে এনটিহিস্টামাইন

এনটিহিস্টামাইন ওষুধগুলি শরীরের ওপর নানাভাবে কাজ করে:

১. এগুলি এলার্জির প্রতিক্রিয়া—যেমন, চামড়ায় চুলকোনো র‍্যাশ বা দলা, চাকা চাকা দাগ, হাঁচিকাশি, আর এলার্জির শক কমাতে বা এড়াতে সাহায্য করে।
২. যানবাহনে যাবার সময়ের গা বমি বা বমি এড়াতে বা সামলাতে সাহায্য করে।
৩. এগুলি থেকে প্রায়ই ঘুমের ভাব আসে। এনটিহিস্টামাইন ব্যবহার করার সময় বিপজ্জনক কাজ বা যন্ত্রপাতি চালানো বাদ দেবেন।

প্রমেথাজাইন *(ফেনারগান)* আর **ডাইফেন হাইড্রামাইন** *(বেনাড্রিল)* কড়া এনটিহিস্টামাইন; এগুলি থেকে খুব ঘুম আসে।

ডাইফেনহাইড্রিনেট *(ড্রামামাইন)* ডাইফেনহাইড্রামাইনের মতই, যানবাহনেআসা যাওয়ার গা বমির জন্যেই সব থেকে বেশি দেয়া হয়। তবে, অন্য কারণে বমি হলে, প্রমেথাজাইন সাধারণতঃ আরো ভাল কাজ করে।

ক্লোরফেনিরামাইনের দাম কম, আর ঘুমও কম আসে। এই কারণে, দিনের বেলা চুলকুনি কমাতে ক্লোরফেনিরামাইন ব্যবহার করাই অনেক সময় সব থেকে ভাল। রাত্রে প্রমেথাজাইন ভাল কাজ করে, কারণ চুলকুনি কমাবার সঙ্গে সঙ্গে এটি ঘুমও আনে।

সাধারণ সর্দিতে এনটিহিস্টামাইনগুলি কোনো কাজ করে বলে কোনো প্রমাণ নেই। এগুলি প্রায়ই দরকারের থেকে বেশি ব্যবহার করা হয়। এগুলি বেশি ব্যবহার করা উচিত নয়।

সাধারণভাবে, হাঁপানির জন্যে এনটিহিস্টামাইনগুলি ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ, এগুলি শ্লেষ্মা পুরু করে শ্বাস নেয়া আরো কষ্টকর করে দিতে পারে।

ওষুধের বাকসে সাধারণতঃ একটা এনটিহিস্টামাইন রাখাই যথেষ্ট। প্রমেথাজাইন রাখাই ভাল। এটি সবসময় পাওয়া যায় না বলে, অন্য এনটিহিস্টামাইনগুলির মাত্রাও দেয়া হল।

সাধারণ নিয়মে, এনটিহিস্টামাইনগুলি মুখে খেতে দেয়াই সব থেকে ভাল। কেবলমাত্র সাংঘাতিক বমি সামলাতে অথবা কোনো এনটিটকসিন (ধনুষ্টঙ্কার, সাপের কামড় ইত্যাদির জন্যে) দিলে যদি এলার্জির শক হবার বিশেষ ভয় থাকে তবে তার আগে—ইনজেকশন দেয়া উচিত।

প্রমেথাজাইন *(ফেনারগান)*

নাম———

সাধারণতঃ পাওয়া যায়:

২৫মি. বড়ি হিসেবে ———জন্যে দাম———

ইনজেকশনে—১ মিঃ লিঃ এমপুলে ২৫ মিঃ গ্রাঃ ——— জন্যে দাম———

প্রমেথাজাইনের *মাত্রা*—(১ মিঃ গ্রাঃ / কেঃ জিঃ / দিনে)— —২৫ মিঃ গ্রাঃ বড়ি দিয়ে—

দিনে ২ বার খেতে দিন।

প্রতি মাত্রায় দিন:

বড়দের: ২৫ থেকে ৫০ মিঃ গ্রাঃ (১ বা ২ বড়ি)
ছোটদের: ৭ থেকে ১২ বছর বয়সের: ১২·৫ থেকে ২৫ মিঃ গ্রাঃ ($^1/_2$ বা ১ বড়ি)
ছোটদের: ২ থেকে ৬ বছর বয়সের: ৬ থেকে ১২ মিঃ গ্রাঃ ($^1/_4$ বা $^1/_2$ বড়ি)
১ বছর বয়সের শিশুদের: ৪ মিঃ গ্রাঃ
১ বছরের কম বয়সের শিশুদের: ৩ মিঃ গ্রাঃ

পেশীতে দেবার (আই এম) ইনজেকশন—১ মিঃ লিটারে ২৫ মিঃ গ্রাঃ দিয়ে—

একবার ইনজেকশন দিন; দরকার হলে ২ থেকে ৪ ঘণ্টা পর আবার দেবেন।

১ মাত্রায় ইনজেকশন দেবেন:

বড়দের: ২৫ থেকে ৫০ মিঃ গ্রাঃ (১ থেকে ২ মিঃ লিঃ
ছোটদের: ৭ থেকে ১২ বছর বয়সের: ১২·৫ থেকে ২৫ মিঃ গ্রাঃ ($^1/_2$ থেকে ১ মিঃ লিঃ)
৭ বছরের কম বয়সের ছেলেপিলেদের: ৬ থেকে ১২ মিঃ গ্রাঃ ($^1/_4$ থেকে $^1/_2$ মিঃ লিঃ)
১ বছরের কম বয়সের ছেলেপিলেদের: ২·৫ মিঃ গ্রাঃ (০·১ মিঃ লিঃ)

ক্লোরফেনিরামাইন *(এভিল)*

নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ ৪ মি.গ্রা. বড়ি হিসেবে (অন্য মাপের বড়ি বা সিরাপ হিসেবেও) পাওয়া যায়।

ক্লোরফেনিরামাইনের *মাত্রা:*

দিনে ৩ থেকে ৪ বার ১ মাত্রা করে খাবেন।

প্রতি মাত্রায় দেবেন:

বড়দের: ৪ মিঃ গ্রাঃ (১ বড়ি)
১২ বছরের কম বয়সের ছেলেপিলেদের: ২ মিঃ গ্রাঃ ($^1/_2$ বড়ি)
শিশুদের: ১ মিঃ গ্রাঃ ($^1/_4$ বড়ি)

ডাইমেনহাইড্রিনেট *(ড্রামামাইন)*

নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ ৫০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি হিসেবে পাওয়া যায়। তাছাড়া, ১ চাচামচ সিরাপে ১২·৫ মিঃ গ্রাঃ হিসেবে, আর মলদ্বারে দেবার সাপোজিটরি হিসেবেও পাওয়া যায়।

এটা সাধারণতঃ যাতায়াতের সময়ের গা বমির জন্যে বিক্রি হয়; কিন্তু অন্যান্য এনটিহিস্টামাইনের মত এলার্জির প্রতিক্রিয়া কমাতে আর ঘুম আনতেও ব্যবহার করা যায়।

ডাইমেনহাইড্রিনেটের মাত্রা:

দিনে ৪বার পর্যন্ত খাবেন।

প্রতি মাত্রায় দেবেন:

বড়দের: ৫০ থেকে ১০০ মিঃ গ্রাঃ (১ বা ২ বড়ি)
ছোটদের: ৭ থেকে ১২ বছর বয়সের: ২৫ থেকে ৫০ মিঃ গ্রাঃ ($^1/_2$ থেকে ১ বড়ি)
ছোটদের: ২ থেকে ৬ বছরর বয়সের: ১২ থেকে ২৫ মিঃ গ্রাঃ ($^1/_4$ থেকে $^1/_2$ বড়ি)
২ বছরের কম বয়সের শিশুদের: ৬ থেকে ১২ মিঃ গ্রাঃ ($^1/_8$ থেকে $^1/_4$ বড়ি)

এনটিটকসিন

সাবধান:

ঘোড়ার সিরাম থেকে তৈরি সব এনটিটকসিন—যেমন, ধনুষ্টঙ্কারের এনটিটকসিন আর সাপে কামড়ানো আর বিছের হুলফোটানোর জন্যে এনটিটকসিনগুলি থেকে সাংঘাতিক এলার্জির প্রতিক্রিয়া হবার ঝুঁকি থাকে (এলার্জির শক পৃ ৮৩ দেখুন)। কোনো এনটিটকসিন ইনজেকশন দেয়ার আগে, জরুরি **অবস্থার জন্যে সবসময় হাতের কাছে *এড্রেনালাইন* রাখবেন।** যে সব লোকের এলার্জি আছে বা যাদের আগে ঘোড়ার সিরাম থেকে তৈরি কোনোরকম এনটিটকসিন দেয়া হয়েছে, তাদের এনটিটকসিন দেয়ার ১৫ মিনিট আগে প্রমেথাজাইন *(ফেনারগান)* বা ডাইফেনহাইড্রামাইনের *(বেনাড্রিল)* মত কোনো এনটিহিস্টামাইনের ইনজেকশন দিয়ে দেয়াটা বুদ্ধির কাজ।

বিছের এনটিটকসিন বা এনটিভেনিন

নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ ইনজেকশনের গুঁড়ো ওষুধ হিসেবে পাওয়া যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিছের হুল ফোটানোর জন্যে বিভিন্ন এনটিভেনিন তৈরি হয়।

যে সব এলাকায় বিপজ্জনক বা মারাত্মক ধরনের বিছে আছে, শুধু সেখানেই বিছের হুল ফোটানোর এনটিভেনিন ব্যবহার করা উচিত। সাধারণতঃ শুধু ছোট ছেলেপিলেদের গায়ে, বিশেষ করে তাদের শরীরের ওপরের দিকের প্রধান অংশে হুল ফোটালে, তবেই এনটিভেনিন দরকার হয়। সবথেকে ভাল কাজ পেতে হলে, হুল ফোটানোর পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছেলেপিলেদের এনটিভেনিন ইনজেকশন দেয়া উচিত।

এনটিভেনিনের সঙ্গে, সাধারণতঃ ব্যবহারের পুরো নিয়মগুলি দেয়া থাকে। সেগুলি যত্ন করে মেনে চলবেন। বড়সড় ছেলেপিলেদের থেকে, যারা ছোটখাট, তাদের প্রায়ই বেশি এনটিভেনিন লাগে। ২ বা ৩ শিশি লাগতে পারে।

বড়দের পক্ষে, বেশির ভাগ বিছেই বিপজ্জনক নয়। এনটিভেনিনের ব্যবহারে কিছু বিপদ আছে, তাই বড়দের এটি না দেয়াই সাধারণতঃ ভাল।

সাপের কামড়ের এনটিভেনিন বা এনটিটকসিন

নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ ইনজেকশনেরর জন্যে বোতলে বা বাকসে পাওয়া যায়।

পৃথিবীর নানা জায়গায় বিষাক্ত সাপের কামড়ের জন্যে এনটিভেনিন বা শরীরকে বিষ থেকে রক্ষা করার ওষুধ তৈরি করা হয়েছে। যদি আপনি এমন এলাকায় থাকেন যেখানে লোককে কখনো কখনো বিষাক্ত সাপে কামড়ায় বা তা থেকে তারা মারা যায়, তবে, কি এনটিভেনিন পাওয়া যায় তা জেনে, **সময় থাকতে সেগুলি যোগাড় করে হাতের কাছে রেখে দেবেন।**

নিচের ঠিকানায় পলিভ্যালেন্ট এনটিভেনিন পাওয়া যায়:

হাফকিন ইনস্টিটিউট
আচার্য দন্‌ডে মার্গ
প্যারেল
বোম্বাই ৪০০০১৬

সাপের কামড়ের এনটিভেনিনের সঙ্গে সাধারণতঃ ব্যবহারের নিয়মগুলি দেয়া থাকে। ব্যবহার করার দরকার হবার **আগেই** সেগুলি পড়ে রাখবেন। সাপটা যত বড় হবে, বা লোকটি যত ছোট মাপের হবে, তত বেশি পরিমাণে এনটিভেনিন লাগবে। প্রায়ই ২ বা তার বেশি শিশি দরকার হয়। সবথেকে ভাল কাজ পেতে হলে, কামড়ের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এনটিভেনিন ইনজেকশন দেয়া উচিত।

এলার্জির শক এড়ানোর জন্যে দরকারি সাবধানতাগুলি নিতে ভুলবেন না (পৃ ৮৩)

টিটেনাস (ধনুষ্টঙ্কারের) এনটিটকসিন

নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ ২০,৪০ আর ৫০ হাজার ইউনিটের শিশিতে পাওয়া যায়

কারো বড় খোলা ক্ষত হলে তাকে ধনুষ্টঙ্কারের এনটিটকসিন দেয়া উচিত। তার সঙ্গে একটা টিটেনাস টক্সয়েডের ইনজেকশনও দিতে হয়।

যে সব দূরের গ্রামের লোকদের কখনো ধনুষ্টঙ্কারের টিকে দেয়া হয়নি, সেখানের ওষুধের বাকসে অন্তত ৫০,০০০ ইউনিট টিটেনাস এনটিটকসিন থাকা উচিত। কাজ পেতে হলে লোকটির ধনুষ্টঙ্কার হবার আগেই তাকে টিটেনাস এনটিটকসিন দিতে হয়। পেশীতে দেবার ইনজেকশন হিসেবে শরীরের বড় বড় পেশীতে (পাছা আর উরুতে) দেবেন। রোগীর যদি হাঁপানি বা অন্য এলার্জি থাকে, অথবা তাকে যদি আগে ঘোড়ার সিরাম থেকে তৈরি কোনো এনটিটকসিন দেয়া হয়ে থাকে, তবে এনটিটকসিনের ইনজেকশন দেবার ১৫ মিনিট আগে প্রমেথাজাইনের মত কোনো এনটিহিস্টামাইনের ইনজেকশন দিয়ে দেবেন। সাধারণ মাত্রা হল পেশীতে ১৫০০ থেকে ৩০০০ ইউনিট।

এনটিটকসিন দিয়ে চিকিৎসা করলেও ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণগুলি সাধারণতঃ ক্রমে বেড়ে চলে। পৃ ২২৫ এ চিকিৎসার অন্য যে সব উপায়ের কথা বলা হয়েছে সেগুলি সমান বা বেশি জরুরি। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু করুন আর তাড়াতাড়ি ডাক্তারি সাহায্য নিন।

বিষ খাওয়ার জন্যে

ইপিকাকের সিরাপ—বমি করানোর জন্যে

নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ সিরাপ হিসেবে পাওয়া যায় **(এলিকসিরটা ব্যবহার করবেন না)**

কেউ বিষ খেলে বমি করানোর জন্যে এটি দেয়া হয়। **লোকটি যদি কড়া এসিড, ক্ষার, পেট্রোল বা কেরোসিন খেয়ে থাকে তবে এটা দেবেন না।**

পৃ ১১৮-তে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে পেটের ভেতরটা ধুয়ে দেয়া উচিত।

ইপিকাকের *মাত্রা:*

যে কোন বয়সের জন্যে ১ বড় চামচ। লোকটি বমি না করলে অবধঘণ্টা পর আবার দেবেন।

কাঠকয়লার গুঁড়ো (বা যে কাঠকয়লা চট করে কাজ করে) —বিষ খাওয়ার জন্যে

———জন্যে দাম———

কাঠকয়লা পেটের বিষ টেনে শুষে নিয়ে সেটাকে কম ক্ষতিকর করে দেয়।

কাঠকয়লার গুঁড়োর *মাত্রা:*

কতটা বিষ খাওয়া হয়েছে তার ওপর নির্ভর করে ৫০ মিঃ গ্রাঃ পর্যন্ত দেয়া যায়।

ফিটের (খিচুনি) জন্যে

ফেনোবারবিটাল (ফেনোবারবিটোন)

সাধারণতঃ পাওয়া যায়:

১৫ মিঃ গ্রাঃ বড়ি ———জন্যে দাম———

১ মিঃ লিঃ এমপুলে ২০০ মিঃ গ্রাঃ —জন্যে দাম———

ফিট (খিচুনি) আর ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপ (পেশীতে যন্ত্রণাদায়ক টান ধরা) এড়াবার সাহায্যের জন্যে ফেনোবারবিটাল খাওয়া যায়। মৃগীর ফিট আর খিচুনির জন্যে কখনো কখনো এটা **ডাইফেনিলহাইড্যানটয়েনের** সঙ্গে মিশিয়ে দেয়ার দরকার হয়। মৃগীর জন্যে, প্রায়ই, ওষুধটা সারাজীবন ধরে খেয়ে যেতে হয়। ফিট এড়াবার জন্যে সবথেকে কম যা দরকার, সেই মাত্রায় দেয়া উচিত। ঘুংড়ি কাশি কমাতে বা সাংঘাতিক বমি সামলানোয় সাহায্য করতেও কম মাত্রায় ফেনোবারবিটাল দেয়া যায়।

সাবধান: খুব বেশি ফেনোবারবিটাল থেকে শ্বাস ধীর বা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এর কাজ ধীরে আরম্ভ হয়ে অনেকক্ষণ (২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত, বা রোগীর পেচ্ছাপ না হলে আরো বেশিক্ষণ) থাকে। **দেখবেন —খুব বেশি যেন দেবেন না!**

ফেনোবারবিটালের *মাত্রা* (৩ থেকে ৬ মিঃ লিঃ / কেঃ জিঃ / দিনে) —৩০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি দিয়ে —

দিনে ৩ বার ১ মাত্রা করে খেতে দেবেন।

প্রতি মাত্রায় দেবেন:

বড়দের: ৩০ থেকে ১২০ মিঃ গ্রাঃ (১ থেকে ৪ বড়ি)
ছোটদের: ৭ থেকে ১২ বছর বয়সের: ১৫.থেকে ৩০ মিঃ গ্রাঃ (½ থেকে ১ বড়ি)
৭ বছরের কম বয়সের ছেলেপিলেদের: ১৫ মিঃ গ্রাঃ (½ বড়ি)

ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপ সামলাতে —ওপরে যা বলা হয়েছে তার দ্বিগুণ ফেনোবারবিটাল দিতে হতে পারে— তবে, তার বেশি দেবেন না।

মৃগীর ফিট বা বাড়াবাড়ি রকম ধনুষ্টাঙ্কারের আক্ষেপ বন্ধ করতে ফেনোবারবিটালের ইনজেকশন দেয়া যায়।

ফেনোবারবিটাল ইনজেকশনের *মাত্রা* —১ মিঃলিটারে ২০০ মিঃ গ্রাঃ এমপুল দিয়ে —

পেশীতে একটি ইনজেকশন দিন

বড়দের: ২০০ মিঃ গ্রাঃ (১ মিঃ লিঃ)
ছোটদের: ৭ থেকে ১২ বছর বয়সের: ১৫০ মিঃ গ্রাঃ (¾ মিঃ লিঃ)
ছোটদের: ২ থেকে ৬ বছর বয়সের: ১০০ মিঃ গ্রাঃ (½ মিঃ লিঃ)
২ বছরের কম বয়সের শিশুদর: ৫০ মিঃ গ্রাঃ (¼ মিঃ লিঃ)

ফিট বন্ধ না হলে, ১৫ মিনিট পরে আরো ১ মাত্রা দেয়া যেতে পারে, কিন্তু তার পর আর দেবেন না। ধনুষ্টঙ্কারের বেলায়, মাত্রাটা দিনে ৩ বার দেবেন। আক্ষেপটা কমে গেলে, মাত্রাটা এক এক বারে একটু করে কমাতে শুরু করবেন।

ডাইফেনিলহাইড্যানটয়েন (ফেনিটয়েন, *ডাইল্যানটিন*)

নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ ১০০ মিঃ গ্রাঃ ক্যাপসুল হিসেবে পাওয়া যায়।

এটি মৃগীর ফিট এড়ানোয় সাহায্য করে। ওষুধটা সাধারণতঃ সারাজীবন ধরে খেতে হয়। ফেনোবারবিটালের সঙ্গে একসঙ্গে খেলে কখনো কখনো এটাতে বেশি ভাল কাজ হয় বা কম মাত্রা লাগে। ফিট এড়ানোর জন্যে সবথেকে কম যে মাত্রা লাগে, তাই দেয়া উচিত।

উপসর্গ: ডাইফেনিলহাইড্যানটয়েন থেকে কারো কারো মাড়ি ফুলে যায় বা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়। এটা বেশিরকম হলে, বদলে অন্য একটা ওষুধ ব্যবহার করা উচিত।

ফিটের জন্য ডাইফেনিলহাইড্যানটয়েনের *মাত্রা* (৫ মিঃ গ্রাঃ / কেঃ জিঃ / দিনে)
—১০০ মিঃ গ্রাঃ ক্যাপসুল দিয়ে দিনে একবার নিচের মাত্রা দিয়ে শুরু করুন:

প্রতি মাত্রায় দিন:

বড়দের: ১০০ থেকে ৩০০ মিঃ গ্রাঃ (১ থেকে ৩ ক্যাপসুল)
ছোটদের: ৬ থেকে ১২ বছরর বয়সের: ১০০ মিঃ গ্রাঃ (১ ক্যাপসুল)
৩ বছরের কম বয়সের ছেলেপিলেদের: ৫০ মিঃ গ্রাঃ (½ ক্যাপসুল)

এই মাত্রা দিয়ে ফিট পুরোপুরি এড়ানো না গেলে, এর দ্বিগুণ মাত্রা পর্যন্ত দেয়া যেতে পারে, কিন্তু তার বেশি নয়।

ফিট বন্ধ করা গেলে, মাত্রাটা এক এক বারে একটু করে কমাতে চেষ্টা করবেন, যতদিন না ফিট এড়াবার জন্যে সবথেকে কম মাত্রাটা বার করতে পারেন।

ডায়াজিপাম (*ভেলিয়াম*)

নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ ১ মিঃ লিঃ তরল ওষুধে ৫ মিঃ গ্রাঃ ইনজেকশন হিসেবে পাওয়া যায়।

ডায়াজিপামের ব্যবহার ফেনোবারবিটালের মতই, কিন্তু এটির দাম অনেক বেশি। এটি এখানে দেয়া হয়েছে, কারণ কখনো কখনো ফেনোবারবিটাল না পাওয়া গেলেও এটি পাওয়া যায়।

মৃগীর ফিট বন্ধ করতে বড়দের মাত্রা হল ৫ থেকে ১০ মিঃ গ্রাঃ। দরকার হলে ২ ঘন্টা পর আবার দেবেন।

ধনুষ্টঙ্কারের বেলায় প্রায় সমস্ত আক্ষেপগুলি সামলানোর মত যথেষ্ট পরিমাণে দেবেন। ৫ মিঃ গ্রাঃ দিয়ে (ছোটদের আরো কম) শুরু করে, দরকারমত আরো দেবেন, কিন্তু একবারে ১০ মিঃ গ্রাঃ বা সারাদিনে ৫০ মিঃ গ্রাঃ এর বেশি দেবেন না। দরকার হলে ডায়াজিপাম আর ফেনোবারবিটাল একসঙ্গে দেয়া যায়, কিন্তু খুব বেশি যেন না দেয়া হয়—সেদিকে নজর রাখা দরকার।

প্রচণ্ড ভয় (হিস্টিরিয়া) বা দুশ্চিন্তার বেলায়ও *ভেলিয়াম* কাজে লাগতে পারে, কিন্তু এসবের বেলায় এটির ব্যবহার খুব সীমিত হওয়া উচিত।

পেশীতে ডায়াজিপামের ইনজেকশন দিলে কষ্ট হয়। এটি শিরায় ইনজেকশন করাই ভাল, কিন্তু খুব ধীরে ধীরে দিতে হয়।

খুব বেশি ডায়াজিপাম থেকে শ্বাস ধীর বা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সাবধান, যেন খুব বেশি দিয়ে ফেলবেন না।

প্যারালডিহাইড

আপনার এলাকায় নাম————

সাধারণতঃ পাওয়া যায়:

মুখে খাওয়ার বা মলদ্বারে দেয়ার তরল ওষুধ হিসেবে:

————জন্যে দাম————

২ মিঃ লিঃ ও ৫ মিঃ লিঃ ইনজেকশনের এমপুল হিসেবেও:

————জন্যে দাম————

সাবধান: কেবল প্যারালডিহাইডের জীবাণুমুক্ত এমপুল ব্যবহার করা উচিত। তরল ওষুধটির রং খয়েরি হয়ে গেলে ব্যবহার করা উচিত নয়।

রোগীর হেপাটাইটিস বা ফুসফুসের রোগ থাকলে তাকে প্যারালডিহাইড দেবেন না।

প্যারালডিহাইডের মাত্রা:

খাওয়ার জন্যে: ৫ থেকে ৩০ মিঃ লিঃ তরল ওষুধ
মলদ্বার দিয়ে দেয়ার জন্যে: ১৫ থেকে ৩০ মিঃ লিঃ তরল ওষুধ
ছোটদের জন্যে: (০·১৫ মিঃ লিঃ / কেঃ জিঃ)

ইনজেকশন:

ছোটদের: ৬ থেকে ১২ বছর বয়সের: ৬ মিঃ লিঃ (তিনটি ২ মিঃ লিঃ এমপুল)

ছোটদের: ১ থেকে ৫ বছর বয়সের: ২·৫ থেকে ৫ মিঃ লিঃ (১$\frac{১}{৪}$ থেকে ২$\frac{১}{২}$ টি ২ মিঃ লিঃ এমপুল)

১ বছর অবধি বয়সের শিশুদের: ০·৫ থেকে ২ মিঃ লিঃ ($\frac{১}{৪}$ থেকে ১ টি ২ মিঃ লিঃ এমপুল)

প্রসবের পরের সাংঘাতিক রক্তপাতের জন্যে:

কোনো মেয়ের প্রসবের পরের রক্তপাত সামলাবার জন্যে ওষুধের ঠিক এবং ভুল ব্যবহারের বিষয়ে তথ্যের জন্যে পৃ ৩১২ দেখুন। সাধারণ নিয়ম হল— **শিশু জন্মাবার পর তবেই শুধু রক্তপাত বন্ধ করতে অকসিটসিকগুলি (এরগোনোভাইন, অকসিটসিন ইত্যাদি) ব্যবহার করা উচিত।** প্রসব তাড়াতাড়ি করতে বা প্রসবের সময় মাকে শক্তি যোগাতে এগুলি ব্যবহার করা মা আর শিশু দুজনের পক্ষেই বিপজ্জনক। শিশু যতক্ষণ না জন্মায় ততক্ষণ এই ওষুধগুলি কখনোই দেয়া উচিত নয়। ফুলটাও বেরিয়ে আসার আগে না দিলে আরো ভাল হয়।

ফুলটা বেরোবার আগে (কিন্তু শিশু জন্মাবার পরে) যদি বেশি রক্তপাত হয়, তবে $\frac{১}{২}$ মিঃ লিঃ (৫ ইউনিট) অকসিটসিন পেশীতে ইনজেকশন দেয়া যেতে পারে। **ফুল বেরোবার আগে এরগোনোভাইন ব্যবহার করবেন না** কারণ তাতে ওটির বেরোনো বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

পিটুইট্রিন অকসিটসিনের মতই, কিন্তু আরো বিপজ্জনক; জরুরি অবস্থায়—যখন অকসিটসিন আর এরগোনোভাইন পাওয়া যায় না,—তখন ছাড়া আর কখনো ব্যবহার করা উচিত নয়।

সদ্য জন্মানো শিশুর রক্তপাত বন্ধ করতে ভিটামিন কে (পৃ ৪২৫) ব্যবহার করুন।

এরগানোভাইন বা এরগোমেট্রিন ম্যালিয়েট *(এরগোট্রেট মেথারজিন)*

নাম————

সাধারণতঃ পাওয়া যায়:

১ এমপুল ইনজেকশনে ০·২ মিঃ গ্রাঃ

————জন্যে দাম————

অথবা

·০২ মিঃ গ্রাঃ বড়ি হিসেবে ————জন্যে দাম————

ফুল বার হয়ে আসার পর সাংঘাতিক রক্তপাত এড়াতে বা কমাতে।

এরগোনোভাইন ইনজেকশনের *মাত্রা:*

ফুল বার হয়ে আসার পর সাংঘাতিক রক্তপাতের (২ কাপের বেশি) জন্যে পেশীতে ১ বা ২ এমপুল (০·২ থেকে ০·৪ মিঃ লিঃ) এরগোনাভাইন ইনজেকশন (অথবা অত্যন্ত জরুরি অবস্থায় শিরায় ১ এমপুল ইনজেকশন) দেবেন। দরকার হলে আধ বা এক ঘন্টা পর আর এক মাত্রা দেয়া যায়। রক্তপাত কমে এলেই এর বদলে এরগোনোভাইন বড়ি দেবেন।

এরগোনোভাইন খাওয়ার ওষুধের *মাত্রা*—০·২ মিঃ গ্রাঃ বড়ি দিয়ে—প্রসবের পরের সাংঘাতিক রক্তপাত এড়াতে অথবা

কমাতে (বিশেষ করে যেসব মায়ের রক্তাল্পতা আছে, তাদের) ফুল বেরিয়ে আসার পর থেকে শুরু করে, দিনে ৩ বা ৪ বার একটি করে বড়ি দেবেন। রক্তপাত বেশি হলে প্রতি মাত্রায় দুটি বড়ি দেয়া যায়।

অকসিটসিন *(পিটোসিন)*

নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ ১ মিঃ লিঃ এমপুলে ১০ ইউনিট হিসেবে পাওয়া যায়।

শিশু জন্মাবার **পর** ফুল বার হবার **আগে** মায়ের সাংঘাতিক রক্তপাত বন্ধ করায় সাহায্য করতে এটা দেয়া হয় (এতে ফুল বার হবারও সাহায্য হয়, কিন্তু সাংঘাতিক রক্তপাত বা খুব দেরি না হলে এই কারণে ব্যবহার করা উচিত নয়)।

শিশু জন্মাবার পর মায়ের জন্যে অকসিটসিনের *মাত্রা:*

½ মিঃ লিঃ (৫ ইউনিট) ইনজেকশন দিন। যদি সাংঘাতিক রক্তপাত হয়ে চলে, ১৫ মিনিট পর আর একটা ½ মিঃ লিঃ ইনজেকশন দিন।

অর্শের জন্যে

অর্শের সাপোজিটরি (মলদ্বারে ঢোকাবার ওষুধ)

নাম——— ———জন্যে দাম———

এগুলি মলদ্বারে ঢোকাবার জন্যে বিশেষ বুলেটের আঁকারের ওষুধ। এতে অর্শ ছোট হয়ে যেতে সাহায্য হয়, যন্ত্রণাও কমে। এই ওষুধ অনেক রকমের হয়। যেগুলি **সাময়িকভাবে** সব থেকে বেশি কাজ করে—কিন্তু বেশি দামি—সেগুলিতেও সাধারণতঃ **কর্টিকোস্টেরয়েড** থাকে। বিশেষ মলমও পাওয়া যায়। এরকম দুটি মলম হল প্রিপেয়ারেশন এইচ আর লিগনোকেইন জেলি—এগুলির কাজ আগে যা বলা হয়েছে সেইরকম।

মাত্রা:

প্রতিদিন মলত্যাগ করার পর আর শুতে যাবার আগে একটি করে সাপোজিটরি মলদ্বারে ঢুকিয়ে দেবেন। মল নরম করার জন্যেও কিছু দেয়া যেতে পারে।

অপুষ্টি আর রক্তাল্পতার জন্যে

মেশানো (বা মালটি) ভিটামিন

নাম——— ———জন্যে দাম———

এগুলি নানাভাবে পাওয়া যায়, কিন্তু বড়িগুলি সাধারণতঃ সব থেকে সস্তা, কাজও ভাল করে। ভিটামিনের ইনজেকশন ক্বচিৎ কখনো দরকার হয়; এগুলিতে পয়সা নষ্ট হয়, অকারণে কষ্ট হয়, কখনো কখনো এবসেস (ফোড়া) হয়। টনিক বা এলিকসিরগুলিতে প্রায়ই সব থেকে দরকারি ভিটামিনগুলি থাকে না, আর যেটুকু কাজে লাগে তার তুলনায় এগুলির দাম খুব বেশি। সব থেকে ভাল ভিটামিন পাওয়া যায় পুষ্টিকর খাবার থেকে। যদি বাড়তি ভিটামিন দরকার হয়, ভিটামিনের বড়ি ব্যবহার করুন।

কয়েক ধরনের অপুষ্টির বেলায় বাড়তি ভিটামিনে কাজ হতে পারে। দেখবেন, যে বড়িগুলি দেয়া হচ্ছে, তাতে যেন রোগীর যে প্রধান ভিটামিনগুলি দরকার, সেগুলি থাকে (পৃ ১৩৯)।

চলতি মানের বড়ি ব্যবহার করলে সাধারণতঃ দিনে একটি বড়িই যথেষ্ট।

ভিটামিন এ—রাতকানা আর জেরোসিসের জন্যে

নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ পাওয়া যায়: ২০০,০০০ ইউনিট ক্যাপসুল
৬০ মিঃ গ্রাঃ রেটিনল
(আরো কম মাত্রায়ও পাওয়া যায়)
আর ১০০,০০০ ইউনিটের ইনজেকশন হিসেবে

সাবধান: অতিরিক্ত এ ভিটামিন থেকে ফিট হতে পারে। খুব বেশি দেবেন না। ছেলেপিলেদের নাগালের বাইরে রাখবেন।

এড়ানোর জন্যে: যেসব এলাকায় ছেলেপিলেদের মধ্যে রাতকানা আর জেরোসিসের সমস্যা বেশি দেখা যায়, সেখানে তাদের বেশি করে হলুদ রঙের ফল আর সবজি, আর গাঢ় সবুজ রঙের শাক, তাছাড়া ডিম আর মেটের মত আমিষ খাবারও খাওয়ানো উচিত। মাছের লিভারের তেলে প্রচুর এ ভিটামিন থাকে। অথবা এ ভিটামিনের ক্যাপসুল দেয়া যায়। ৬ মাসে একটা করে ক্যাপসুল দেবেন, এড়ানোর জন্যে তার বেশি লাগে না।

চিকিৎসার জন্যে: একটা এ ভিটামিনের ক্যাপসুল (২০০,০০০ ইউনিট) খেতে দিন। এক সপ্তাহের মধ্যে চোখ ভাল না হলে আর একটা ক্যাপসুল দিন। অবস্থা সাংঘাতিক হলে তখনি একটা এ ভিটামিনের ১০০,০০০ ইউনিটের ইনজেকশন দিয়ে দিন।

আয়রন সালফেট (ফেরাস সালফেট)—রক্তাল্পতার জন্যে

নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ ২০০ বা ৩০০ বা ৫০০ মিঃ গ্রাঃ বড়িতে (তাছাড়া ছোটদের জন্যে ড্রপ, মিক্সচার বা এলিক্সিরে পাওয়া যায়)।

বেশির ভাগ রক্তাল্পতার চিকিৎসায় ফেরাস সালফেট কাজে লাগে। ফেরাস সালফেট—খাবার ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করতে সাধারণতঃ অন্ততঃ ৩ মাস লাগে। তাতেও যদি অবস্থার উন্নতি না হয়, তাহলে হয়তো রক্তাল্পতার কারণ লোহার অভাব ছাড়া অন্য কিছু। ডাক্তারি সাহায্য নিন। অসুবিধে হলে ফলিক এসিড দিয়ে চিকিৎসা করে দেখুন।

ফেরাস সালফেট থেকে কখনো কখনো পেটের গোলমাল হয় তাই এটি খাবারের সঙ্গে খাওয়াই সব থেকে ভাল। ৩ বছরের কম বয়সের ছেলেপিলেদের জন্যে একটা বড়ির সিকিভাগ খুব মিহি করে গুঁড়িয়ে খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া যেতে পারে।

সাবধান: দেখবেন যেন মাত্রাটা ঠিক থাকে। খুব বেশি ফেরাস সালফেট বিষাক্ত। বড়িগুলি ছেলেপিলেদের নাগালের বাইরে রাখবেন।

রক্তাল্পতার জন্যে ফেরাস সালফেটের *মাত্রা:* —২০০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি দিয়ে—

দিনে ৩ বার খাবারের সঙ্গে দেবেন।

প্রতি মাত্রায় দেবেন:

বড়দের: ২০০ থেকে ৪০০ মিঃ গ্রাঃ (১ থেকে ২ বড়ি)
৬ বছরের বেশি বয়সের ছেলেপিলেদের: ২০০ মিঃ গ্রাঃ (১ বড়ি)
৩ থেকে ৬ বছরের ছেলেপিলেদের: ২৫ থেকে ৫০ মিঃ গ্রাঃ ($^১/_৮$ থেকে $^১/_৪$ বড়ি) মিহি করে গুঁড়িয়ে খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে

ফলিক এসিড—কয়েক ধরনের রক্তাল্পতার জন্যে

নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ ৫ মিঃ গ্রাঃ বড়িতে পাওয়া যায়।

যেসব রক্তাল্পতায় শিরার মধ্যের রক্তকোষগুলি নষ্ট হয়ে যায়—যেমন ম্যালেরিয়ায়—সে সবের চিকিৎসায় ফলিক এসিডের দরকার হতে পারে। রক্তাল্পতার রোগীর যদি পিলেটা বড় হয় বা তাকে যদি হলদে দেখায়, তবে তার ফলিক এসিডের দরকার হতে পারে, বিশেষকরে যদি ফেরাস সালফেট দিলেও তার রক্তাল্পতা তেমন না কমে। যেসব শিশুকে ছাগলের দুধ খাওয়ানো হয়, বা যেসব পোয়াতি মেয়েদের রক্তাল্পতা বা অপুষ্টি আছে, তাদের প্রায়ই আয়রন ছাড়াও ফলিক এসিডের দরকার হয়।

গাঢ় সবুজ রঙের শাক, মাংস বা মেটে খেয়ে অথবা ফলিক এসিডের বড়ি খেয়ে ফলিক এসিড পাওয়া যায়। ছোটদের জন্যে, সাধারণতঃ, ২ সপ্তাহের চিকিৎসাই যথেষ্ট হয়। কিন্তু কয়েকটি এলাকায় ছেলেপিলেদের *থ্যালাসেমিয়া* বলে একধরনের রক্তাল্পতা থাকলে, তাদের কয়েক বছর ধরে চিকিৎসা করতে হয়। যেসব পোয়াতি মেয়েদের রক্তাল্পতা আর অপুষ্টি আছে, তারা পুরো পোয়াতি অবস্থাটাতে প্রতিদিন ফলিক এসিড খেলে উপকার পাবে।

রক্তাল্পতার জন্যে ফলিক এসিডের *মাত্রা:* —৫ মিঃ গ্রাঃ বড়ি দিয়ে—

দিনে একবার খেতে দেবেন।

বড়দের আর ৩ বছরের বেশি বয়সের ছেলেপিলেদের: ১ বড়ি (৫ মিঃ গ্রাঃ)
৩ বছরের কম বয়সের ছেলেপিলেদের: $^১/_২$ বড়ি (২$^১/_২$ মিঃ গ্রাঃ)

ভিটামিন বি-১২ (সায়ানোকোবালামিন) **শুধু** পার্নিসাস রক্তাল্পতার জন্যে:

এটি যাতে ব্যবহার না করা হয় সেইজন্যেই এটির কথা বলা হচ্ছে। ভিটামিন বি ১২ শুধু এক ধরনের রক্তাল্পতাতেই কাজে লাগে যা খুব কম দেখা যায়, যা ৩৫ বছরের কম বয়সের লোকদের মধ্যে বা আমাদের দেশের লোকদের মধ্যে প্রায় কখনোই দেখা যায় না। দরকার না থাকলেও, শুধু রোগীদের কিছু একটা দেবার জন্যে অনেক ডাক্তার এটি দেন। **ভিটামিন বি-১২-র জন্যে পয়সা নষ্ট করবেন না** আপনার রক্ত পরীক্ষা করে আপনার *পার্নিসাস রক্তাল্পতা* হয়েছে সেটা জানা না গেলে কোনো ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীকে এটি দিতে দেবেন না।

কে ভিটামিন (ফাইটোমেনাডিওন, ফাইটোনাডিওন)

নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ ২·৫ মিঃ লিঃ দুধের মত তরল ওষুধের এমপুলে ১ মিঃ গ্রাঃ হিসেবে পাওয়া যায়।

যদি কোনো সদ্য জন্মানো শিশুর শরীরের কোনো অংশে (মুখ, নাড়ি, মলদ্বার) থেকে রক্তপাত হতে শুরু করে, সেটা কে ভিটামিনের অভাব থেকে হতে পারে। শিশুর উরুর বাইরের দিকে ১ মিঃ গ্রাঃ (১ এমপুল) কে ভিটামিনের ইনজেকশন দিন। রক্তপাত হতে থাকলেও এর বেশি দেবেন না। যে সব শিশু খুব ছোট **(২ কেঃ জিঃ-র কম)** হয়ে জন্মায়, **তাদের রক্তপাতের ঝুঁকি কমাতে ০·৫ মিঃ গ্রাঃ কে ভিটামিন দেয়া যেতে পারে।**

প্রসবের পর মায়ের রক্তপাত সামলাতে কে ভিটামিন কোনো কাজে লাগে না।

ভিটামিন বি—৬ (পাইরিডকসাইন)

সাধারণতঃ ১০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি হিসেবে পাওয়া যায় ———জন্যে দাম———

যেসব যক্ষ্মার রোগীকে **আইসোনিয়াজিড** দিয়ে চিকিৎসা করা হয়, তাদের কখনো কখনো ভিটামিন বি-৬ কমে যায়। এই অবস্থা এড়াতে আইসোনিয়াজিড খাবার সময় প্রতিদিন ১০ মিঃ গ্রাঃ করে ভিটামিন বি-৬ খাওয়ানো যেতে পারে। অথবা, যাদের এই ভিটামিনটি কমে গিয়ে সমস্যা দেখা দেয়, শুধু তাদেরই এটা দেয়া যায়। লক্ষণের মধ্যে আছে—হাত বা পায়ের পাতায় ব্যথা বা চিনচিন করা, পেশী নাচা, ভয় ভয় ভাব আর ঘুম না আসা।

ভিটামিন বি-৬ এর *মাত্রা*—আইসোনিয়াজিড খাওয়ার সময়:

প্রতিদিন একটি করে ১০ মিঃ গ্রাঃ বড়ি খান।

পরিবার পরিকল্পনার নানা উপায়—জন্ম নিয়ন্ত্রণ

পৃ ৩৩৫-এ জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ির ব্যবহার, ঝুঁকি এবং সাবধানতার কথা বলা হয়েছে। মেয়েদের মাসিক ঠিকমত হওয়ার জন্যে তার শরীরে যে দুটি রাসায়নিক জিনিস বা **হরমোন** তৈরি হয়, সেই ধরনের দুটি হরমোন জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়িতে থাকে। এই দুটি হরমোনের নাম *ইস্ট্রোজেন* আর *প্রোজেস্টেরোন।* পিলগুলি নানা কোমপানির নামে পাওয়া যায়। আপনার পক্ষে কোনটি সব থেকে ভাল হবে সে বিষয়ে সব থেকে কাছের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মাতৃশিশু কল্যাণকেন্দ্রে বা কোনো অভিজ্ঞ স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে খোঁজ নিন।

চেনা কোমপানির জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ির নাম:

মিনোভলার—ই ডি, নরলেসট্রিন, অরলেস্ট-২৮, অরথোনোভিন ১/৫০, অরথোনোভিন ১/৮০, ওভরাল, ওভুলেন, প্রাইমোভলার ৩০, প্রাইমোভলার ৫০।

কনডোম (রাবার, নিরোধ)

নাম——— ———জন্যে দাম———

সাধারণতঃ তিনটির মোড়কে পাওয়া যায়।

কনডোম নানা কোমপানির পাওয়া যায়, কয়েকটির দাম অন্যগুলির থেকে অনেক বেশি। কয়েকটি তেল মাখানো; কয়েকটি নানা রঙের হয়।

পৃ ৩৩৬-এ কনডোমের ব্যবহার আর যত্নের বিষয়ে বলা হয়েছে।

ডায়াফ্রাম

নাম——— দাম———

সবথেকে ভাল কাজ পেতে হলে ডায়াফ্রামের সঙ্গে একটা বিশেষ ক্রীম বা জেলি ব্যবহার করা উচিত। যোনিতে ঢোকাবার আগে ডায়াফ্রামের মুখের চারপাশে জেলিটা মাখিয়ে নেয়া উচিত (পৃ ৩৩৬)।

জেলি বা ক্রীমের নাম———

দাম———

জন্মনিয়ন্ত্রণের ফেনা ওষুধ

নাম——— দাম———

ফেনা ওষুধের বিষয়ে আলোচনার জন্যে পৃ ৩৩৩ দেখুন।

জরায়ুর ভেতরে ঢোকাবার নানা জিনিস (আই ইউ ডি)

নাম——— দাম———

ভেতরে ঢোকাবার জন্যে
যে ফি স্বাস্থ্যকর্মীকে দিতে হবে:—

আই ইউ ডি-র বিষয়ে তথ্যের জন্যে পৃ ৩৩৬ দেখুন। অনেক ধরনের পাওয়া যায়। একটা সবথেকে পুরোনো আর ভাল হল **লিপিস লুপ**। আরো নুতন একটা জিনিস ভাল কাজ করে—সেটির নাম **কপার টি**। **ড্যালকন শিল্ড** বলে একরকম আই ইউ ডি অন্যগুলির থেকে বেশি সমস্যা সৃষ্টি করে—এগুলি বযবহার করা উচিত নয়।

যেসব মেয়েদের কখনো ছেলেপিলে হয়নি, তারাও আই ইউ ডি ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু তাদের বেলায় এগুলি বেরিয়ে আসার বা অন্য গোলমাল হবার সম্ভাবনা বেশি।

মাসিকের সময় বা ঠিক তার পরের সময়টা আই ইউ ডি পরানোর পক্ষে সব থেকে ভাল।

শব্দতালিকা

এই শব্দতালিকাটি বর্ণমালা অনুসারে করা হয়েছে
অ আ······· ক খ······· থেকে ঁ পর্যন্ত

তারকা (*) চিহ্ন দেয়া শব্দগুলি সাধারণতঃ এই বইয়ে ব্যবহার করা হয়নি। তবে সেগুলি ডাক্তাররা প্রায়ই ব্যবহার করেন, অথবা ওষুধের মোড়কে বা বাকসে যে তথ্য দেয়া থাকে তাতে পাওয়া যায়।

এই শব্দতালিকায় বেশির ভাগ রোগের নাম পাবেন না। অনুক্রমণী (হলদে পৃষ্ঠাগুলি) দেখে রোগের বিষয়ে বইয়ে পড়ে নিন।

অ

অকসিটসিক—কতকগুলি বিপজ্জনক ওষুধ, যা জরায়ু আর তার রক্তবাহী নলগুলি কুঁচকে দেয়। এগুলি কেবল শিশু জন্মাবার পর মায়ের অতিরিক্ত রক্তপাত সামলাতে ব্যবহার করা উচিত।

অকালে জন্মানো শিশু—যে শিশু মায়ের পোয়াতি অবস্থায় ৯ মাস শেষ হবার আগেই জন্মায় আর যার জন্মের সময়ের ওজন ২ কেজির কম থাকে।

অজ্ঞান হয়ে যাওয়া—জ্ঞান হারানো দেখুন।

অঞ্জনি—চোখের পাতার ওপরে—সাধারণতঃ ধারের দিকে—সংক্রমণের ফলে যে লাল, ফোলা দলা হয়।

অনুবীক্ষণ—যে লেন্‌স্ লাগানো যন্ত্র দিয়ে খুব ছোট জিনিসকেও বেশ বড় দেখায়।

অণ্ডকোষ—পুরুষের দু পায়ের মাঝে যে থলিতে তার শুক্রাশয় (বিচি) দুটি থাকে।

অতিরিক্ত বাতাস চলাচল—খুব ভয় পাওয়ার ফলে দ্রুত আর গভীর শ্বাস।

* **অনিদ্রা**—যে অবস্থায় কারো ঘুমের ইচ্ছে বা দরকার হলেও সে ঘুমোতে পারে না।

অন্ত্র—নাড়িভুঁড়ি। খাদ্যনালির যে নলের মত অংশ পাকস্থলি থেকে মলদ্বার পর্যন্ত খাবার আর শেষে আবর্জনা বয়ে নিয়ে যায়।

অন্ত্রের পরজীবী—কৃমি আর অন্য ছোট প্রাণী যারা অন্ত্রে ঢুকে পড়ে রোগের সৃষ্টি করে।

অন্ত্রের তৈরি সুতো বা সেলাই করার জিনিস—প্রসবের দ্বারের ছেঁড়া সেলাই করার জন্য বিশেষ সুতো। অন্ত্রে তৈরি সুতো ধীরে ধীরে শরীরে মিশে যায়। ফোঁড়গুলো কেটে বার করে দিতে হয় না।

* **অপথালমিক**—চোখের বিষয়ে।

অপুষ্টি—শরীরের যা যা দরকার সেই সব খাবার যথেষ্ট না খেলে স্বাস্থ্যের যে সব সমস্যা হয়।

অর্শ—মলদ্বারের ধারে বা ভেতরে ছোট ছোট যন্ত্রণাদায়ক ফোলা বা দলা। এগুলো আসলে ফুলে যাওয়া বা ভেরিকোজ শিরা।

অল্পতা—কোনো কিছু যথেষ্ট না থাকা। অভাব। যেমন—রক্তাল্পতা।

অসংক্রামক রোগ—যে রোগ একজনের থেকে অন্য একজনের মধ্যে ছড়ায় না।

অস্বাভাবিক—প্রায় বা সাধারণতঃ যা দেখা যায় তার থেকে আলাদা কিছু। যা স্বাভাবিক নয়।

আ

আইরিস—চোখের মণির চারপাশের রঙিন বা কালচে অংশ।

আউন্স—ওজনের একটি মাত্রা। প্রায় ২৮ গ্রামের সমান।

আটকানো—কোনো কিছু বেধে যাওয়া। রাস্তা বন্ধ হওয়া। যেমন—নাড়িভুঁড়ির পথ আটকানো খুব সাংঘাতিক, বিপজ্জনক অবস্থা।

আলসার—চামড়া বা শরীরের নরম কোনো পরদা ছিঁড়ে যাওয়া; চামড়া বা চোখের ওপরে পাকস্থলিতে, বা নাড়িভুঁড়িতে পুরোনো ঘা।

ই

ইতিহাস—রোগের বৃত্তান্ত। রোগীকে বা অন্যদের প্রশ্ন করে রোগ সম্বন্ধে যা যা জানা যায়—যেমন, কি ভাবে শুরু হয়েছে; কখন কমে বা বাড়ে; কিসে কাজ হয় বলে মনে হয়; বাড়ির বা পাড়ার আর কারো হয়েছে কি না—ইত্যাদি।

ইনটাসাসেপশন—নাড়িভুঁড়ির একটা অংশ কাছাকাছি আর একটা অংশের মধ্যে ঢুকে যাওয়া। এর থেকে প্রায়ই নাড়িভুঁড়ির পথ বিপজ্জনকভাবে আটকে যায়।

ইনট্রামাসকিউলার (আই এম) ইনজেকশন—পেশীতে—

সাধারণতঃ ওপর হাতে বা পাছায় দেবার ইনজেকশন। যে ইনট্রাভেনাস (আই ভি) ইনজেকশন সরাসরি শিরার মধ্যে দেয়া হয়, তা থেকে এটা আলাদা।

ইনফ্লুয়েঞ্জা—বেশি সর্দি, সঙ্গে প্রায়ই জ্বর আর গাঁটে গাঁটে ব্যথা, কখনো কখনো পাৎলা পায়খানাও থাকে।

ইনসুলিন—মানুষের প্যানক্রিয়াসে একরকম জিনিস (এনজাইম) থাকে, তার ওপর রক্তে কতটা চিনি থাকবে সেটা নির্ভর করে। বহুমূত্রের রোগীদের কখনো কখনো ইনসুলিনের ইনজেকশনের দরকার হয়।

ইমিউনাইজেশন (টিকে)—যে সব ওষুধ কতকগুলি বিশেষ রোগ, যেমন, ডিপথিরিয়া, ঘুংড়ি কাশি, ধনুষ্টঙ্কার, পোলিও, যক্ষ্মা, হাম আর আসল বসন্ত থেকে মানুষকে রক্ষা করে।

উ

উপযুক্ত—কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে বা অবস্থায় যা সব থেকে সহজ, নিরাপদ আর যেটার কাজে লাগার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি।

ঋ

ঋতুবন্ধ—যে সময় মেয়েদের স্বাভাবিক ভাবেই মাসিক রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়—সাধারণতঃ ৪০ থেকে ৫০ বছর বয়সের মধ্যে।

এ

এওর্টা—হার্ট থেকে শরীরে রক্ত বয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রধান ধমনী বা নল।

* **একসপায়ারি**—ওষুধের বাকস বা শিশির ওপরে যে মাস আর বছর লেখা থাকে—যা থেকে জানা যায় কখন থেকে ওই ওষুধে আর কাজ হবে না। এই তারিখ পার হয়ে গেলে বেশির ভাগ ওষুধ ফেলে দিতে হয়।

* **একসপেকটোরান্ট**—কাশির সঙ্গে শ্বাসের রাস্তা (ফুসফুস, ব্রঙ্কাই ইত্যাদি) থেকে কফ বার করে দিতে সাহায্য করার ওষুধ। কাশি সারাবার ওষুধ।

একিউট এবডোমেন—পেটের একটা জরুরি অবস্থা, যাতে প্রায়ই অপারেশনের দরকার হয়। পেটে সাংঘাতিক যন্ত্রণার সঙ্গে বমি হলে অথচ পাৎলা পায়খানা না হলে একিউট এবডোমেন বোঝাতে পারে।

* একল্যামপসিয়া—হঠাৎ ফিট হওয়া—বিশেষ করে পোয়াতি অবস্থায় বা প্রসবের সময়। এটা পোয়াতি অবস্থায় টকসিমিয়ার (বিষক্রিয়ার) ফল।

এনটাসিড—পাকস্থলিতে অতিরিক্ত এসিড হলে তা সামলাবার আর পেটের গোলমাল কমাবার ওষুধ।

এনটি এমেটিক—বমি সামলাবার ওষুধ। এগুলি বমি বা গা বমিবমি ভাব কমাতে সাহায্য করে।

এনটি টকসিন—কোনো বিষ বা টকসিনের বিরুদ্ধে বা সেটাকে অকেজো করে দিতে যে ওষুধ কাজ করে। এটি প্রায়ই ঘোড়ার রক্তের জলীয় অংশ থেকে তৈরি করা হয়।

এনটি বায়োটিক—জীবাণুর সংক্রমণের সঙ্গে যুদ্ধ করার ওষুধ।

এনটি ভেনিন (এনটি ভেনম)—সাপের বা অন্যকিছুর বিষ থেকে যে বিষক্রিয়া হয় তার চিকিৎসার জন্যে যে টকসিন ব্যবহার করা হয়।

এনটি সেপটিক—যে সাবান বা তরল ওষুধ দিয়ে জীবাণুর জন্ম এড়ানো বা বন্ধ করা যায়।

এনটি স্প্যাসমোডিক—পেট মোচড়ানো বা কামড়ানো কমাবার ওষুধ।

এনটি হিস্টামাইন—হে ফিভার বা চুলকুনির মত এলার্জির চিকিৎসার জন্যে ওষুধ। এগুলি বমি সামলাতে আর ঘুম আনতেও সাহায্য করে।

এনালজেসিক—ব্যথা কমাবার ওষুধ।

এনেমা—কোন কিছু (যেমন সাবান) জলে গুলে মলদ্বার দিয়ে ঢুকিয়ে মলত্যাগ করানোর উপায়।

এপেনডিক্স—বৃহদন্ত্রের (নাড়িভুঁড়ির মোটা অংশ) সঙ্গে আটকানো আঙুলের মত থলি।

এবসেস—জীবাণুর বা অন্যকিছুর সংক্রমণের ফলে যে পুঁজের থলি তৈরি হয়। ফোড়া।

এমিবা—শুধু অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখা যায় এমন সব ছোট্ট প্রাণী। এরা পাৎলা পায়খানা, আমাশয় আর লিভার এবসেস ঘটাতে পারে।

* **এমেটিক**—যে ওষুধ বা তরল জিনিস দিয়ে বমি করানো হয়। কেউ বিষ খেলে এটি ব্যবহার করা হয়।

এলার্জি, এলার্জির প্রতিক্রিয়া—বিশেষ বিশেষ জিনিস শ্বাসের সঙ্গে নিলে, খেলে, ইনজেকশনে নিলে বা ছুঁলে কোনো কোনো লোকের যে চুলকানো র‍্যাশ, চাক, হাঁচি, কখনো কখনো শ্বাসকষ্ট বা শক হয়।

এসকারিস—কেঁচোকৃমি। এই বড় কৃমিগুলি মানুষের নাড়িভুঁড়িতে থেকে অস্বস্তি, বদহজম, দুর্বলতা আর কখনো কখনো অন্ত্রে বাধা (আটকানো) ঘটায়।

এড়ানো—রোগ শুরু হবার আগেই তা বন্ধ করার উপায়।

ঐ

ঐতিহ্য—এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে—উদাহরণ দিয়ে বা মুখে মুখে—যে সব অভ্যেস, বিশ্বাস বা রীতিনীতি চলে আসে।

ও

* **ওটিক**—কানের ব্যাপার।

ওভারি—মেয়েদের পেটে জরায়ুর পাশে দুটি ছোট থলি। এগুলিতে যে ডিম জন্মায় তা পুরুষের শুক্রের সঙ্গে মিলে শিশু তৈরি হয়।

ওরাল—মুখ দিয়ে। ওরাল ওষুধ হল খাওয়ার ওষুধ।

ক

কনাজাংটাইভা—চোখেরসাদা অংশ আর চোখের পাতার ভেতর দিকটা রক্ষা করার জন্যে একটা পাৎলা পর্দা।

* **কনট্রাইনডিকেশন**—যে ক্ষেত্রে বা অবস্থায় কোনো বিশেষ ওষুধ ব্যবহার করা উচিত নয়। (অনেক ওষুধ পোয়াতি অবস্থায় ব্যবহার করা উচিত নয়)

কনট্র্যাকশন—পেশী কুঁচকে বা ছোট হয়ে যাওয়া। মেয়েদের প্রসব বেদনার সময় জরায়ু জোরে জোরে কুঁচকে যায় আর শিশুকে জরায়ু থেকে ঠেলে বার করে দিতে সাহায্য করে।

কনট্রাসেপটিভ (জন্মনিরোধক)—পোয়াতি হওয়া বন্ধ করার উপায়।

কর্ণিয়া—চোখের পর্দা বা জানালা— যা আইরিস আর মণিকে ঢেকে থাকে।

কফ—ফুসফুসের অস্বাভাবিক বেশি পুঁজভরা শ্লেষ্মা—যা কেশে বার করে দিতে হয়।

কমপোস্ট—গাছগাছড়া আর জীবজন্তুর মলমূত্র মিশিয়ে পচিয়ে সে সার হয়। খড়, ঝরাপাতা, পচা গাছপালা, জীবজন্তুর মলমূত্র আর অন্য সার থেকে সব থেকে ভাল কমপোস্ট হয়।

কলোস্ট্রাম—মায়ের বুকে প্রথম যে দুধটা আসে। জলের মত দেখালেও এটি প্রোটিনে ভরা আর এটি শিশুকে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

কড়া—পায়ে যেখানে চটি বা জুতো চাপ দেয় বা একটা আঙুল অন্যটার ওপর চেপে যায়, সেখানে চামড়া শক্ত, পুরু হয়ে যন্ত্রণা দেয়।

কারবোহাইড্রেট—শ্বেতসার আর চিনি জাতীয় খাবার—যা শক্তি যোগায়। যেমন—চাল, গম, ভুট্টা, আলু, চিনি, পাকা কলা ইত্যাদি।

কাস্ট—ভাঙা হাড় জোড়া না লাগা পর্যন্ত সেটা ঠিক জায়গায় রাখার জন্যে যে গজ আর প্লাস্টারের শক্ত ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার করা হয়।

কাঁচকলা—এক ধরনের কলা যাতে শ্বেতসার আর আঁশ থাকে—এটি রান্না করে খাওয়া হয়।

কিডনি (বৃক্ক)—পিঠের নিচে বরবটির আকারের দুটি বড় যন্ত্র। রক্ত থেকে আবর্জনা ছেঁকে পেচ্ছাপ তৈরি করে।

কিডনির পাথর—কিডনিতে ছোট ছোট পাথর হয়ে পেচ্ছাপের নল বেয়ে নেমে যায়। এগুলি থেকে পিঠের নিচের দিকে, কোমরে, পেচ্ছাপের নলে বা তলপেটে তীব্র ব্যথা হতে পারে। মূত্রাশয়ে গিয়ে পেচ্ছাপের নলে আটকে গেলে পেচ্ছাপ হতে কষ্ট হয় বা হয়ই না।

কিলোগ্রাম (কে জি)—এক হাজার গ্রাম। এক কে জি তে এক সেরের একটু বেশি হয়।

কীটনাশক—পোকা মারার বিষ। যেমন—ডি ডি টি আর লিনডেন।

কুফল—কোনো ওষুধ ব্যবহারের ফলে যে সব সমস্যা হয়।

কুঁচকি—শরীরের সামনের দিকে যে অংশ থেকে পা দুটি বেরিয়েছে। যৌনাঙ্গের দু পাশের জায়গা।

* **কেরাটোম্যালেসিয়া**—চোখ ঘোলাটে আর নরম হয়ে শেষে অন্ধ হয়ে যাওয়া। এ ভিটামিনের অভাব থেকে হয়।

কৈশোর—যে সময়টায় ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে ওঠে—১৩ থেকে ১৯ বছর বয়েস।

কোম্পানির নাম—কোনো কোম্পানি তাদের জিনিসকে যে নাম দেয়। কোম্পানির বিশেষ নামের যে ওষুধ বিক্রি হয় তা প্রায়ই সাধারণ নামে বিক্রি হওয়া একই ওষুধের থেকে বেশি দামের হয়।

কোমা—গভীর অজ্ঞান অবস্থা। এটা রোগ, আঘাত বা বিষ থেকে হয়। রোগী প্রায়ই শেষ পর্যন্ত মারা যায়।

কোলোটের র‍্যাশ—শিশুর কোলোট বা বিছানা পেচ্ছাপে ভিজে থাকলে তার দু পায়ের মাঝে যে লালচে, চিড়বিড় করা র‍্যাশ দেখা যায়।

কোষ্ঠকাঠিন্য—শুকনো, শক্ত, কষ্টকর মল। মলত্যাগ খুব কম হয়।

কোয়াসিওরকর (ভিজে অপুষ্টি)—যথেষ্ট প্রোটিন না খাওয়ার ফলে সাংঘাতিক অপুষ্টি। শিশুর কোয়াসিওরকর হলে তার পা, হাত আর মুখ ফুলে যায় আর খসা ঘা হয়।

ক্যানসার—কোনো টিউমার বা দলা যা বেড়েই চলে। কতকগুলি বাড়তে বাড়তে শেষে মৃত্যু ঘটায়।

ক্রেটিনিজম—যে অবস্থায় শিশু জড়বুদ্ধি আর প্রায়ই কালা হয়ে জন্মায়। এটি সাধারণতঃ মায়ের পোয়াতি অবস্থায় খাবারে আয়োডিনের অভাব থেকে হয়।

* **ক্ষয়**—যক্ষ্মার পুরনো নাম।

খ

খনিজ পদার্থ—শরীরের যে সব সরল ধাতুর দরকার হয়, যেমন—লোহা, ক্যালসিয়াম, আর আয়োডিন।

খিল ধরা—কোনো পেশীতে টান ধরে যন্ত্রণা হওয়া।

খুঁত—শরীরে বা মনে যে সমস্যা নিয়ে শিশু জন্মায়, তা হল জন্মের খুঁত, যেমন—গন্নাকাটা, চেরা টাকরা, ঠুঁটো পা বা হাতে বা পায়ে বাড়তি আঙুল।

গ

গজ—নরম, ফাঁক ফাঁক করে বোনা কাপড়—ব্যাণ্ডেজ তৈরি

করতে ব্যবহার করা হয়।

গতি—একটি নির্দিষ্ট সময়ে যতবার কিছু হয়। যেমন—মিনিটে যতবার নাড়ি ধুকধুক করে তা হল নাড়ির গতি।

গন্নাকাটা—ওপরের ঠোঁট মুখ থেকে নাক পর্যন্ত চেরা। কোনো কোনো শিশু এ নিয়ে জন্মায়।

গলগণ্ড—গলার নিচের দিকে ফোলা (থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড বেড়ে যাওয়া)। খাবারে আয়োডিনের অভাব থেকে হয়।

গলব্লাডার (পিত্ত কোষ)—লিভারের সঙ্গে আটকানো একটি ছোট পেশীযুক্ত থলি। এতে যে পিত্তি জমে তা স্নেহজাতীয় খাবার হজম করতে সাহায্য করে।

গর্ভ—জরায়ু দেখুন।

গর্ভপাত—জরায়ুর মধ্যে গড়ে ওঠা শিশু বা ভ্রূণের মৃত্যু। এরকম হলে কখনো কখনো ডেলা সমেত জোর রক্তপাত হয়।

গা বমি বমি—পেটের অস্বস্তি বা গোলমাল। বমির ভাব।

গাছগাছড়া—বিশেষ করে ওষুধ হিসেবে বা রোগ সারাবার জন্যে যেগুলির দাম আছে।

গোদ—একরকম পোকা (পরজীবী) শরীরের লিমফের ব্যবস্থার ক্ষতি করলে এই রোগ হয়। একরকম মশা এই রোগ ছড়ায়। মশা গোদের রোগীর রক্তের সঙ্গে পোকাগুলি টেনে নিয়ে পরে যাকে কামড়ায় তার রক্তে সেগুলি ঢুকিয়ে দেয়।

জ্ঞান হারানো—রোগ বা আঘাত পেয়ে ঘুমিয়ে পড়ার মত অবস্থা—যা থেকে জাগানো যায় না। অজ্ঞান অবস্থা।

গ্রাম (গ্রা)—ওজনের একটি মেট্রিক মাত্রা। এক কিলোগ্রামে এক হাজার গ্রাম থাকে।

গ্লুকোজ—সরল চিনি, যা শরীর চট করে সহজে কাজে লাগাতে পারে। ফলে আর মধুতে পাওয়া যায়। রিহাইড্রেশন সরবতে দেয়ার জন্যে সাদা গুঁড়ো হিসেবে কিনতে পাওয়া যায়।

চ

চা চামচ—ওষুধ ইত্যাদি মাপার চামচ, যাতে ঠিক ৫ মিঃ লিঃ ধরে।

চাক—চামড়ার ওপর শক্ত, পুরু উঁচু উঁচু দাগ। ভীষণ চুলকোয়। সবগুলি একসঙ্গে বেরোতে বা মিলিয়ে যেতে পারে। অথবা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলে যেতে পারে। এগুলি একরকম এলার্জি।এগুলিকে আমবাতও বলে।

চিনি—মধু, চিনি বা ফলে থাকে। মিষ্টি খাবার—যা শক্তি যোগায়।

চিহ্ন —রোগীকে পরীক্ষা করার সময় রোগটা ধরার জন্যে যে সব জিনিস বা অবস্থা খুঁজতে হয়। এই বইয়ে, লক্ষণ কথাটি চিহ্ন বোঝাতেও ব্যবহার করা হয়েছে।

চেরা টাকরা—কোনো কোনো শিশু চেরা বা অস্বাভাবিকভাবে ফাঁক টাকরা নিয়ে জন্মায়।

ছ

ছড়ানো—একজনের থেকে অন্যদের মধ্যে (রোগ) চলে যাওয়া।

ছানি—চোখের পর্দা (লেনস) ঘোলাটে হয়ে দেখার অসুবিধে হয়। চোখের মণির ওপর আলো ফেললে ছাইরঙের বা সাদাটে দেখায়। সাধারণতঃ বয়স্থ লোকদের হয়।

ছোঁয়াচ—কারো সংক্রামক রোগ হলে তার ছোঁয়াচ (ছোঁয়া বা কাছাকাছি আসা) থেকে অন্য একজনের সেই রোগ হতে পারে।

ছোঁয়াচে রোগ—যে রোগ সহজে একজনের থেকে অন্যের মধ্যে ছড়ায়।

জ

***জটিলতা**—রোগ চলতে থাকার সময় কখনো কখনো অন্য যে সব স্বাস্থ্যের সমস্যা দেখা দেয়। যেমন—হাম থেকে একটা বিপজ্জনক জটিলতার ফলে মেনিনজাইটিস হতে পারে।

জননেন্দ্রিয়—শরীরে প্রজননতন্ত্রের (বংশবৃদ্ধির) অংশগুলি, বিশেষ করে যৌন অঙ্গ।

জরায়ু—মেয়েদের পেটে যে থলিতে শিশু গড়ে ওঠে।

জরুরি অবস্থা—হঠাৎ এমন কোনো সাংঘাতিক রোগ হওয়া বা আঘাত লাগা, সঙ্গে সঙ্গে যার চিকিৎসা করতে হয়।

জলের থলি—জরায়ুর ভেতরে যে থলিতে শিশু থাকে। এটি ভেঙে এর ভেতরের তরল জিনিসটি বেরিয়ে এলে সাধারণতঃ বোঝা যায় যে প্রসব শুরু হয়েছে।

জড়বুদ্ধি—চিন্তা, কাজ, মন বা অনুভূতির অস্বাভাবিক কম বৃদ্ধি।

জিয়ারডিয়া—শুধু অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা যায় এমন একরকম ছোট্ট জীবাণু। এটি অন্ত্রে সংক্রমণ ঘটায়, তার ফলে হলদে ফেনাফেনা পাৎলা পায়খানা হয়।

জীবাণু—ছোট্ট ছোট্ট জীব—যা শুধু অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা যায়। এগুলি থেকে নানা রকমের সংক্রামক রোগ হয়।

জেরোসিস বা জেরোপথ্যালমিয়া – এ-ভিটামিনের অভাবে চোখ অস্বাভাবিক ভাবে শুকিয়ে যাওয়া।

জোলাপ (কেড়া)—এগুলি খেলে পাৎলা পায়খানা হয়।

জোলাপ (মৃদু)—কোষ্ঠকাঠিন্যের ওষুধ, এতে মল নরম করে আর বেশি বার মলত্যাগ করায়।

জ্বর—শরীরের তাপ স্বাভাবিকের থেকে বেশি হওয়া। যে সব রোগে শরীরের তাপ বেড়ে যায় সেই সব রোগগুলিকে এই সাধারণ নাম দেয়া । হয়। কিন্তু এর মধ্যে কখনো কখনো অনেক কঠিন রোগও থাকে যেগুলি শুধু 'জ্বর' নয়।

ঝ

ঝুঁকি—আঘাত, নষ্ট হওয়া, ক্ষতি বা জখম হওয়ার সম্ভাবনা। বিপদ।

ট

টকসিক—বিষাক্ত।

টকসিমিয়া—শরীরের ভেতরে কোনোরকম বিষ থাকার ফলে যে রোগ হয়। যেমন পোয়াতি অবস্থার টকসিমিয়া, পেচ্ছাপের টকসিমিয়া (ইউরিমিয়া)।

***টপিকাল**—চামড়ার জন্যে টপিকাল ওষুধ চামড়ার ওপর লাগাতে হয়।

টাকরা—মুখের ভেতরের ওপর দিকটা; তালু।

টিউমার—একটা অস্বাভাবিক দলা, যাতে প্রদাহ থাকে না।

টিক—পোকার মত ছোট্ট প্রাণী। এরা শুঁড়ি দিয়ে চলে আর চামড়ার তলায় মাথা গুঁজে রক্ত শোষে।

টিকে—ইমিউনাইজেশন দেখুন।

টেনডন—যে শক্ত দড়ির মত জিনিস দিয়ে পেশীগুলি হাড়ের সঙ্গে আটকানো থাকে। (যা দিয়ে দুটি হাড় একসঙ্গে আটকানো থাকে সেই লিগামেন্টগুলি আলাদা জিনিস।)

টেমপারেচার—মানুষের শরীরের তাপের মাপ—ডিগ্রীতে মাপা হয়।

টেরিজিয়াম—চোখের কোণ থেকে যে মাংস গজিয়ে কর্ণিয়ার ওপর চলে আসে।

ট্যাপিওকা—শ্বেতসার জাতীয় খাবার, গরম দেশে জন্মায়। আমাদের দেশে সাবু বলতে এটাই বোঝায়

ট্রপিকাল—পৃথিবীর গরম দেশগুলির বিষয়ে।

ড

ডাইনি লাগা—ডাইনি বিদ্যে দিয়ে মন্ত্র করে বা বশে রাখা; তুক করা। কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে, ডাইনি তুক করেছে বা নজর দিয়েছে বলেই তারা অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

ডারমাটাইটিস—চামড়ায় সংক্রমণ বা চিড়বিড়ানি।

***ডারমাল**—চামড়ার বিষয়ে।

ডিকনজেসট্যান্ট—নাক বা সাইনাস বন্ধ হয়ে গেলে তা কমাতে যে ওষুধ সাহায্য করে।

ডিহাইড্রেশন—শরীরে জল কমে যাওয়া, জলের অভাব।

ত

তন্ত্র—শরীরের কয়েকটা যন্ত্র আর অংশের একসঙ্গে কোনো বিশেষ কাজ করা। যেমন—মূত্রতন্ত্র (পেচ্ছাপের ব্যবস্থা) রক্ত পরিষ্কার করে আর পেচ্ছাপ বার করে দেয়।

তড়কা—যে ফিট সামলানো যায় না। শরীরের কোনো অংশ বা পুরো শরীরটাই লাফিয়ে ওঠে, যেমন মেনিনজাইটিস বা মৃগীতে হয়।

তীব্র—যা হঠাৎ হয়, বেশিক্ষণ থাকে না। তীব্র রোগ—পুরোনোর উল্টো।

তুক—যাদু করা বা মন্ত্র করা—ডাইনিরা করে বলে অনেকে বিশ্বাস করে।

থ

থারমোমিটার—শরীরের তাপ মাপার যন্ত্র। ফারেনহাইট বা সেন্টিগ্রেডের ডিগ্রী দেয়া হয়।

থুতু—রোগীর ফুসফুস থেকে কাশির সঙ্গে যে শ্লেষ্মা আর পুঁজ (কফ) বার হয়।

থ্যালেসিমিয়া—একরকম বংশগত রক্তাল্পতা শুধু কয়েকটা দেশে দেখা যায়। এতে শিশুর ২ বছর বয়সের মধ্যে খুব রক্তাল্পতা হতে পারে। তার লিভার আর পিলেও বড় হয়ে যায়।

দ

দাওরা—উত্তর ভারতে, যে কোনো হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, বুক ধড়ফড় করা বা ব্যথাকে দাওরা নাম দিয়ে অন্য রোগের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়।

দাগড়া—চামড়ার ওপর উঁচু দলা বা লম্বা দাগ। সাধারণতঃ আঘাত বা এলার্জি থেকে হয়।

দারুণ শ্রান্তি—অতিরিক্ত ক্লান্ত ভাব।

দূষিত করা—ছোঁয়া দিয়ে ময়লা, নোংরা বা সংক্রমিত করা। যেমন, ইনজেকশনের সিরিঞ্জ না ফুটিয়ে নিলে, পরিষ্কার দেখালেও তা প্রায়ই দূষিত থাকে আর সংক্রমণ ঘটাতে পারে।

ধ

ধমনী—যে সব নল হার্ট থেকে সারা শরীরে রক্ত বয়ে নিয়ে যায়।। ধমনীতে নাড়ির ধুকধুক পাওয়া যায়। শিরাগুলি শরীর থেকে হার্টে রক্ত নিয়ে আসে—তাতে নাড়ি থাকে না।

ন

নজর দেয়া—লোককে যাদু করার বা তাদের ক্ষতি করার ক্ষমতা আছে এমন কারো দৃষ্টি বা তাকানো। অনেকে এটা বিশ্বাস করে।

নরম তালু—কচি বাচ্চার মাথার ওপরে নরম অংশ।

নাই—নাভিকুণ্ড; পেটের মাঝখানে যেখানে নাড়িটা লাগানো ছিল।

নাভি—নাই।

নার্ভ (স্নায়ু)—মগজ থেকে শরীরে সমস্ত অংশে যে সরু সুতোর মত জিনিস চলে গেছে। এগুলি দিয়ে সব কিছু টের পাওয়া যায়, আবার নড়াচড়ার নির্দেশও আসে।

নাড়ি (১)—এক মিনিটে হার্ট যতবার ধুকধুক করে।

নাড়ি (২)—যে দড়ি শিশুকে তার নাই দিয়ে মায়ের গর্ভের ফুলের সঙ্গে জুড়ে রাখে।

নাড়িভুঁড়ি—অন্ত্র।

নাড়ির হার্ণিয়া—নাইটা উঁচু হয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসা। নাড়িভুঁড়ির একটা ফাঁস অন্ত্রের বাইরের থলির মধ্যে দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে এলে এটা হয়।

নিষেধ—কোনো এলাকার লোকেদের বিশ্বাসের জন্যে যা এড়িয়ে যাওয়া, বন্ধ করে দেয়া বা করতে না দেয়া হয়।

নিরোধ—জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে পুরুষের ব্যবহারের উপায়। কনডোম।

*নেসাল—নাকের বা নাকের বিষয়ের।

ন্যাবা (জণ্ডিস)—চোখ আর চামড়া হলদে হয়ে যাওয়া। এটি লিভার, পিত্তকোষ, প্যানক্রিয়াস বা রক্তের রোগের লেক্ষণ।

ন্যারো স্পেকট্রাম এনটিবায়োটিক—যে সব ওষুধ শুধু কয়েক ধরনের জীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করে।

প

পক্ষাঘাত—শরীরের কোনো অংশে বা পুরো শরীরটা নাড়াবার ক্ষমতা চলে যাওয়া।

পথ্য—বিশেষ অবস্থায় একজনের যে ধরনের আর যতটা খাবার খাওয়া উচিত বা উচিত নয়।

পরজীবী—যে সব পোকামাকড় বা ছোট্ট প্রাণী অন্য প্রাণী বা মানুষের শরীরে থেকে তাদের ক্ষতি করে যেমন, ওঁটুলি, কৃমি আর এমিবা।

পরিবার পরিকল্পনা—কখন সন্তান হবে আর কখন হবে না, জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতির সাহায্যে তা ঠিক করা।

পাকস্থলি—পেটে যে থলির মত যন্ত্রে খাবার হজম হয়।

পাৎলা পায়খানা—ঘন ঘন তরল মল হওয়া।

পার্নিসাস এনিমিয়া—পার্নিসাস মানে ক্ষতিকারক। ভিটামিন বি-১২ এর অভাবে এই রক্তাল্পতা হয়। এটা খুব কমই দেখা যায়।

পায়খানা—মলমূত্র ত্যাগ করার জন্য বিশেষ ঘর বা জায়গা।

পাঁচ বছরের কমবয়সীদের প্রকল্প—যে পরিকল্পনায় বা ব্যবস্থায় মায়েরা তাদের শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্যে কি কি দরকার তা শেখে, নিয়মিত ক্লিনিকে এসে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করায় আর ৫ বছর বয়স অবধি তাদের বেড়ে ওঠার রেকর্ড (স্বাস্থ্যের পথে চার্ট) রাখে।

পিত্ত—তেতো সবুজ তরল জিনিস। লিভারে তৈরি হয়ে পিত্তকোষে জমা হয়। স্নেহজাতীয় জিনিস হজম করতে সাহায্য করে।

পিথম—দক্ষিণ ভারতের অনেক লোক বিশ্বাস করে যে অনেক খাবারে পিথম থাকে বলে সেগুলি খেলে ক্ষতি হয়।

পিলে—পাঁজরের নিচে বাঁ দিকে হাতের মুঠির মাপের একটি যন্ত্র। এর কাজ—রক্ত তৈরি করায় আর তা ছেঁকে দেয়ায় সাহায্য করা।

পুরোনো রোগ—অনেক দিনের রোগ, বা যে রোগ ঘন ঘন হয়। তীব্র নয়।

পুষ্টিকর খাবার—শরীর বাড়ার, সুস্থ থাকার আর রোগের সঙ্গে লড়ার জন্যে যে সব খাবারের দরকার।

পেচ্ছাপ—শরীরের তরল আবর্জনা।

পেট পরিষ্কার হওয়া—মলত্যাগ হয়ে শরীরের শক্ত আবর্জনা বার হয়ে যাওয়া।

পেট্রোলিয়াম জেলি (ভেসলিন)—চামড়ার মলম তৈরি করতে যে তেলা জেলি ব্যবহার করা হয়।

পেরিটোনিয়াম—অন্ত্র আর শরীরের দেয়ালের মাঝের পাৎলা পর্দা—বা অন্ত্রের থলি।

পেরিটোনাইটিস—পেরিটোনিয়মে বিপজ্জনক সংক্রমণ। পেটটা পাটার মত শক্ত হয়ে রোগীর খুব যন্ত্রণা হয়, বিশেষতঃ পা দুটি টান করে শুতে গেলে।

পোস্টপার্টাম—প্রসবের পর।

পোস্টপার্টাম হেমারেজ—প্রসবের পর মায়ের অতিরিক্ত রক্তপাত।

পোয়াতি অবস্থা—মায়ের পেটে শিশুর থাকার সময় (৯ মাস)।

পোয়াতির মুখোস—পোয়াতির মুখে, স্তনে বা পেটের মাঝখানে যে কালচে দাগ স্বাভাবিকভাবেই হতে পারে।

প্যানক্রিয়াস—পাকস্থলির নিচে, বাঁ দিকে একটা থলি, যাতে ইনসুলিন তৈরি হয়।

প্যানাস—ট্র্যাকোমার মত কয়েকটা চোখের রোগে কর্ণিয়ার ওপরধারে যে সব ছোট্ট শিরা দেখা যায়।

প্রতিক্ষিপ্ত ব্যথা—পেটটা ধীরে কিন্তু শক্তভাবে টিপে হঠাৎ হাত সরিয়ে নিলে পেটে যে অত্যন্ত তীব্র ব্যথা হয়। এই ব্যথা একিউট এবডোমেনের লক্ষণ।

প্রতিবর্তী কাজ—ইচ্ছে করে নয়, আপনা থেকেই যে প্রতিক্রিয়া বা নড়াচড়া হয়।

প্রতিরোধ—স্বাভাবিক ভাবে ক্ষতি করে এমন জিনিসের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করার গড়ে ওঠা ক্ষমতা। যেমন, কয়েকটি এনটিবায়োটিকের বিরুদ্ধে অনেক জীবাণুর প্রতিরোধ জন্মে

গেছে।

প্রদাহ—শরীরের কোনো অংশ লাল, গরম আর যন্ত্রণাদায়ক হয়ে যাওয়া—প্রায়ই সংক্রমণ থেকে হয়।

প্রলাপ—মনের গোলমাল। রোগী অস্বাভাবিক ভাবে নড়াচড়া করে আর কথা বলে।

প্রসবব্যথা—জরায়ু হঠাৎ কুঁচকে বা শক্ত হয়ে যাওয়া, যা থেকে বোঝা যায় যে শিশু জন্মাচ্ছে।

প্রাণী—যাদের প্রাণ আছে (পশুপাখি, গাছপালা)।

প্রাথমিক প্রতিবিধান—কারো রোগ হলে বা কেউ আঘাত পেলে তাকে তখনি যে জরুরি যত্ন আর চিকিৎসা করা হয়।

প্রোটিন—ঠিকমত বেড়ে ওঠা আর শরীরে ক্ষমতা রাখার জন্যে দরকারি শরীর গড়ার খাবার।

প্রোফাইলেকটিক—কোনো কিছু এড়াবার উপায়।

প্রোলাপ্স্—শরীরের কোনো অংশ নিজের জায়গা থেকে পিছলে বা ঝুলে পড়া। যেমন, ঝুলে পড়া মলদ্বার বা জরায়ু।

প্ল্যাসেন্টা (ফুল)—জরায়ুর ভেতরে যেখানে মায়ের শরীরের সঙ্গে শিশু লেগে থাকে, সেখানে নরম ফোঁপরা একটা জিনিস। স্বাভাবিক অবস্থায় শিশু প্রসব হবার পর ২৫ মিনিট থেকে আধ ঘণ্টার ভেতরে ফুল বেরিয়ে আসে।

প্ল্যাসেন্টা প্রিভিয়া—যে অবস্থায় ফুলটা জরায়ুর বেশি নিচের দিকে থেকে জরায়ুর মুখ আটকে দেয়। তাতে বিপজ্জনক রক্তপাতের ঝুঁকি থাকে। পোয়াতি অবস্থার শেষ দিকে রক্তপাত প্ল্যাসেন্টা প্রিভিয়ার লক্ষণ। তেমন হলে পোয়াতির তখনি হাসপাতালে যাওয়া উচিত।

ফ

ফনটানেল—শিশুর মাথার তালুর নরম অংশ।

ফলিক এসিড—একটি পুষ্টিকর খাবার, শাক সবজিতে পাওয়া যায়।

ফলিক্ল্—ছোট্ট ছোট্ট দলা।

ফসল পালটাপালটি করা—একই জমিতে একের পর এক আলাদা আলাদা ফসল বোনা—যাতে জমিটা বছর বছর আরো উর্বর হয়।

ফার্মাসী—যে দোকানে ওষুধপত্র আর স্বাস্থ্যের অন্য সরঞ্জাম বিক্রি হয়।

ফারেনহাইট (ফাঃ)—একরকম তাপের মাত্রা। সুস্থ লোকের গায়ের স্বাভাবিক তাপ হল ৯৮·৬° ফাঃ। জল ৩২° ফাঃ তাপে জমে যায় আর ২১২° ফাঃ তে ফোটে।

ফিট—রোগের হঠাৎ আক্রমণ যা থেকে তড়কা বা খিচুনি হয়, কখনো কখনো জ্ঞানও চলে যায়।

ফিটাস—ভ্রূণ। জরায়ুর মধ্যে গড়ে ওঠা শিশু।

ফোড়া—ফুলে ওঠা, প্রদাহযুক্ত দলা, যার মধ্যে পুঁজ থাকে।

ফ্র্যাকচার—হাড় ভাঙা।

ফ্লু—ইনফ্লুয়েঞ্জা।

ব

বড় চামচ—যে চামচের মাপ ৩ চা চামচ বা ১৫ মিঃ লিঃ।

বংশগত—বাবা মার থেকে ছেলেপিলেরা যা পায়।

বিকলাঙ্গ—শরীরের কোনো অংশের অস্বাভাবিক গড়ন।

বিছানার ঘা—যে সব বেশি অসুস্থ লোক বিছানায় নড়াচড়া বা এপাশ ওপাশ করতে পারে না, তাদের যে পুরোনো ঘা হয়।

বিশ্বাস—কোনো দৃঢ় ধারণা। ভুল হলেও অনেক সময় কিছুটা কাজ করে।

বীজাণু—খুব ছোট্ট প্রাণী, যা শরীরে ঢুকে বাড়ে, আর সংক্রমণ ঘটাতে পারে। জীবাণু।

বুকজ্বালা—বুকের নিচের দিকে বা পেটের ওপর দিকে জ্বালার ভাব।

বুস্টার—আগের টিকেগুলি নেয়ার এক বা কয়েক বছর পর আবার একই টিকে নেয়া।

বৃক্ক—*কিডনি* দেখুন।

ব্রঙ্কাই—ফুসফুসে যাওয়ার সরু সরু নল, যার মধ্যে দিয়ে শ্বাস নেবার সময় বাতাস ঢোকে।

ব্রডস্পেকট্রাম এনটিবায়োটিক—যে ওষুধ অনেক ধরনের জীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করে।

ব্রণ—চামড়ার একরকম সমস্যা, এতে মুখে, বুকে বা পিঠে ছোট ছোট ফুসকুড়ি হয়, তাতে সাদা মুখ বা পুঁজ থাকে, কখনো কখনো কালো মুখ বা ময়লাও থাকে। অল্পবয়সীদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

ব্রীচ প্রসব—যে প্রসবে শিশুর পাছা বা পা আগে বেরিয়ে আসে।

ব্লাডপ্রেসার (রক্তের চাপ)—শিরা আর ধমনীর ওপর রক্ত যে চাপ দেয়—যন্ত্রে মাপা হয়। এটা বয়স আর স্বাস্থ্য অনুসারে বদলে যায়।

ভ

ভাইরাস—জীবাণুর থেকেও ছোট প্রাণী। এরা সংক্রামক রোগ ঘটায়।

ভিটামিন—শরীর রক্ষার জন্যে দরকারি খাবার।

ভেরিকোজ শিরা—অস্বাভাবিকভাবে ফোলা শিরা। প্রায়ই দলা দলা আর আঁকাবাকা হয়। সাধারণতঃ বয়স্থ লোকদের, পোয়াতি মেয়েদের আর অনেক ছেলেপিলে হলে, মায়েদের এটা হয়।

ভেসলিন—*পেট্রোলিয়াম জেলি* দেখুন।

ভ্রূণ—জরায়ুর মধ্যে খুব ছোট অবস্থায় শিশু।

ম

মঙ্গোলিসম্ (ডাউনস সিনড্রোম)—এই রোগে আক্রান্ত শিশু জড়বুদ্ধি, চেরা চোখ, গোল বোকাবোকা মুখ, আর বেঁটে বেঁটে আঙুল সমেত চওড়া হাতের তেলো নিয়ে জন্মায়।

মণি—চোখের মাঝে আইরিসের ঠিক মাঝখানে গোল ফুটো যা কালো দেখায়। এটা উজ্জ্বল আলোতে ছোট হয়ে যায়, অন্ধকারে বড় হয়।

মদ্যপতা—অতিরিক্ত মদ খাওয়ার ইচ্ছে, যা সামলানো যায় না।

মল—শরীরের শক্ত আবর্জনা।

মল থেকে মুখে—একজনের মল থেকে তার বা অন্যদের মুখের মধ্যে—সাধারণতঃ খাবার, জল বা আঙুল দিয়ে রোগ ছড়িয়ে যাওয়া।

মলদ্বার—দুপায়ের মাঝে যে ফুটোতে অন্ত্র এসে শেষ হয়েছে।

মলদ্বার ছিঁড়ে যাওয়া—কখনো কখনো শক্ত মল হলে মলদ্বার ছিঁড়ে যায়। এতে প্রচণ্ড ব্যথা আর জ্বালা হয়—সেটা মলত্যাগের পর দু তিন ঘন্টা থাকে। মলদ্বারে ছেঁড়া জায়গাটা থেকে রস বার হয়, তা থেকে চুলকুনি হয়। এতে সংক্রমণ হয়ে যেতেও পারে।

মলনালি—নাড়িভুঁড়ির শেষ অংশ যা মলদ্বারে গিয়ে শেষ হয়েছে।

মলম—চামড়ার ওপর লাগাবার প্রলেপ বা নরম ওষুধ।

মহামারী—একটা এলাকায় অনেকের একসঙ্গে একটা রোগ হওয়া।

মাইগ্রেন—সাংঘাতিক দপদপ করা মাথাধরা, কখনো কখনো মাথার শুধু একদিকে হয়। এ থেকে প্রায়ই বমি হয়।

মানসিক—মনের ব্যাপার।

মাসিক—মেয়েদের প্রতিমাসে রক্তস্রাব।

মিঃ গ্রাঃ—এক গ্রামের এক হাজার ভাগের এক ভাগ।

মিঃ লিঃ—এক লিটারের এক হাজার ভাগের এক ভাগ।

মেমব্রেন—পাৎলা, নরম আবরণ যা মানুষ, জীবজন্তু আর গাছপালার কিছু অংশকে ঢেকে রাখে।

মুখে মুখ দিয়ে শ্বাস—কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসের কাজ চালানো। এই উপায়ে যার শ্বাসের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে তাকে আবার শ্বাস নিতে সাহায্য করা হয়।

মূত্রতন্ত্র—পেচ্ছাপের ব্যবস্থা। শরীরে কয়েকটা অংশ, যেমন কিডনি, মূত্রাশয়, পেচ্ছাপের নল—পেচ্ছাপ তৈরি করতে আর সেটা শরীর থেকে বার করে দিতে কাজ করে।

মূত্রনালি—পেচ্ছাপের নল; মূত্রাশয় থেকে শুরু হয়ে পেচ্ছাপের ফুটো অবধি গেছে।

মূত্রাশয় (ব্লাডার)—যে থলিতে পেচ্ছাপ জমা হয়।

মূল্যায়ন—কোনো কিছুর সার্থকতা বা কোনো প্রকল্পে কতটা কাজ হয়েছে তা জানার চেষ্টা। প্রকল্পের আগের আর পরের অবস্থা তুলনা করে এটা করা হয়।

ম্যারাসমাস (শুকনো অপুষ্টি)—যথেষ্ট না খেলে যে অবস্থা হয়। উপোস। রোগী খুব রোগা হয়ে যায়, তার ওজন কমে যায়; পেটটা প্রায়ই ফুলে যায়।

ম্যাসটাইটিস (স্তনে এবসেস)—স্তনে সংক্রমণ থেকে হয়। সাধারণতঃ শিশুকে বুকের দুধ দেবার প্রথম কয়েক সপ্তাহে বা মাসে হয়। স্তনের একদিকটা গরম আর লাল হয়ে ওঠে।

য

যন্ত্র—শরীরের কোনো অংশ, যা মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ (গোটাগুটি), আর কোনো বিশেষ কাজ করে। যেমন, ফুসফুস হল শ্বাসের জন্যে বিশেষ যন্ত্র।

যৌন রোগ—যে রোগ যৌন সংস্পর্শে ছড়ায়।

যোনি—মেয়েদের যৌন অঙ্গের দ্বার থেকে জরায়ুর মুখ পর্যন্ত অংশটি।

র

রক্ষা করার খাবার—ভিটামিন আর খনিজ জিনিসে ভরা খাবার। এগুলি খেলে শরীর সুস্থ থাকে, আর রোগকে ঠেকানো বা রোগের সঙ্গে লড়া যায়।

রক্ত চলাচল—হার্ট পাম্প করার ফলে ধমনী আর শিরাগুলি দিয়ে রক্ত যাতায়াত করা।

রক্তাল্পতা (এনিমিয়া)—এই রোগে লাল রক্তকণা কমে গিয়ে রক্তটা পাৎলা হয়ে যায়। ক্লান্তি, সাদাটে চামড়া, শক্তির অভাব ইত্যাদি এ রোগের লক্ষণ।

রাইনাইটিস—নাকের ভেতরে নরম পর্দায় প্রদাহ। প্রায়ই এলার্জি থেকে হয়। হে ফিভার।

রাপচার—*হার্নিয়া* দেখুন।

রিহাইড্রেশন ড্রিংক—ডিহাইড্রেশন বা শরীরে জলের অভাব কমাবার জন্যে সরবৎ। ফোটানো জল, চিনি, নুন আর খাবার সোডা দিয়ে বাড়িতে তৈরি করা যায়।

ল

লক্ষণ—লোকে নিজের রোগ সম্বন্ধে যা কিছু বোঝে বা বলে। এই বইয়ে লক্ষণ আর চিহ্ন একসঙ্গে ধরা হয়েছে।

লিগামেন্ট—সরু দড়ির মত যেসব অংশ হাড়ের গাঁটগুলি ঠিক জায়গায় রাখতে সাহায্য করে।

***লিঙ্গুয়াল**—জিভের ব্যাপার।

লিটার (লিঃ)—তরল জিনিসের মেট্রিক পদ্ধতির মাপ। ১ লিটার জলের ওজন ১ কিলোগ্রাম।

লিভার—পাঁজরের নিচে ডান দিকে একটা বড় যন্ত্র। এটি রক্ত পরিষ্কার করতে আর শরীর থেকে বিষ বার করে দিতে সাহায্য করে।

লিমফের গ্রন্থি—শরীরের বিভিন্ন অংশে চামড়ার নিচে ছোট ছোট দলা, এগুলি জীবাণু ধরার ফাঁদ। সংক্রমিত হলে যন্ত্রণাদায়ক হয় আর ফুলে যায়। যক্ষ্মা আর ক্যানসার হলে এগুলি প্রায়ই ফুলে যায়, কিন্তু যন্ত্রণা হয় না।

***লুব্রিক্যান্ট**—তেল বা ক্রীম যা দিয়ে কিছু পেছল করা হয়।

ল্যাথিরিজম—বেশি খেসারির ডাল খেলে যে রোগ হয়। মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ আর বিহারের কিছু কিছু অংশে এই ডালের চাষ হয়। এটি প্রায়ই মজুরি হিসেবে মজুরদের দেয়া হয়।

শ

শক—একটি বিপজ্জনক অবস্থা। রোগী খুব দুর্বল বা অজ্ঞান হয়ে যায়। তার ঠাণ্ডা ঘাম হয়, নাড়ি দ্রুত কিন্তু ক্ষীণ হয়ে যায়। শরীরে জলের অভাব, অতিরিক্ত রক্তপাত, আঘাত, পুড়ে যাওয়া বা কঠিন রোগ থেকে এটি হয়।

শরীরে জলের অভাব—যে অবস্থায় শরীরে যতটা জল যায়, তার থেকে বেশি বেরিয়ে যায়।

শূলব্যাথা—অন্ত্রে জোরে কুঁচকে যাওয়া বা টান পড়া থেকে পেটে তীব্র ব্যথা।

শ্লেষ্মা—যে পুরু, হড়হড়ে তরল জিনিসটি নাক, গলা, পাকস্থলি, অন্ত্র আর যোনির নরম আবরণকে ভিজিয়ে রাখে আর রক্ষা করে।

শ্বাসের কাজ—শ্বাস নেয়া আর ফেলা। শ্বাসতন্ত্রের মধ্যে আছে ব্রঙ্কাই, ফুসফুস এবং অন্য কয়েকটি অংশ।

শ্বাসের গতি—এক মিনিটে একজন যতবার শ্বাস নেয়।

শ্বেতসার—ভুট্টা, চাল, গম, সাবু, আলু ইত্যাদির মত শক্তি যোগাবার খাবার।

স

সকালের বমি—পোয়াতি অবস্থায় প্রথম কয়েক মাসে, সাধারণতঃ সকালের দিকে যে গা বমি বমি বা বমি হয়।

সঙ্গতি—কোনো কাজ বা জিনিস তৈরি করতে যা যা লাগে। লোকজন, জমি, পশুপাখি, গাছপালা, টাকাকড়ি, কাজে দক্ষতা ইত্যাদি যা কিছু সকলের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যে ব্যবহার করা হয়।

সন্ন্যাস বা স্ট্রোক (সি ভি এ)—হঠাৎ জ্ঞান, অনুভব শক্তি বা নড়াচড়া করার ক্ষমতা চলে যাওয়া।

সমাজ—একদল লোক যারা একই গ্রাম বা এলাকায় বাস করে। যাদের জীবনধারা, পছন্দ অপছন্দ আর সমস্যা একই ধরনের।

সরে যাওয়া—নিজের জায়গা বা গাঁট থেকে হাড় পিছলে বেরিয়ে যাওয়া।

সংক্রমণ—জীবাণু বা অন্য প্রাণী যে রোগ ঘটায়। সংক্রমণ শরীরের কোনো অংশে যেমন আঙুলে বা পুরো শরীরেই হতে পারে, যেমন—হাম।

সংক্রমিত—যাতে সংক্রমণ হয়েছে, যেমন সংক্রমিত ঘা।

সংক্রামক রোগ—যে রোগ সহজেই একজনের থেকে অন্যদের মধ্যে ছড়ায়। ছোঁয়াচে।

সাইকেল এমবুলেন্স—এটি সহজে তৈরি করা যায়। চাকা দেয়া একটা ফ্রেমের ওপর একটা স্ট্রেচার তৈরি করে সেটাকে সাইকেলে আটকে দেয়া হয়। এতে রোগীকে অনেক তাড়াতাড়ি আর আরামে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া যায়।

সাইনাসের গোলমাল (সাইনাসাইটিস)—মাথার ভেতরে যে ফাঁকা জায়গা নাকের মধ্যে এসে শেষ হয়েছে সেটি সাইনাস। সাইনাসাইটিস হল এই জায়গার প্রদাহ। এ থেকে চোখের ওপরে ও নিচে ব্যথা হয়।

সাধারণ নাম—ওষুধের বৈজ্ঞানিক নাম। বিভিন্ন কোম্পানির দেয়া নাম নয়।

সাপোজিটারি—মলদ্বারে বা যোনির ভেতরে ঢুকিয়ে দেবার জন্যে লম্বাটে বড়ি।

সাপ্রেসান্ট—কোনো কিছুকে আটকে, থামিয়ে বা কমিয়ে রাখার ওষুধ—যেমন কাশি থামাবার ওষুধ।

সাবধানতা—ক্ষতি এড়াতে বা জরুরি অবস্থার জন্যে তৈরি থাকতে আগে থাকতে যে যত্ন নেয়া হয়।

সারভিকস—যোনির পেছনে জরায়ুর দ্বার বা মুখ।

সাসপেনসন—তরল জিনিসে গোলা গুঁড়ো ওষুধ।

সিস্ট—শরীরে অস্বাভাবিক, জলীয় জিনিসে ভরা থলির মত বেড়ে যাওয়া অংশ।

সুক্রোজ—আখ বা বীট থেকে যে সাধারণ চিনি হয়। শরীর গ্লুকোজ যত সহজে নেয় এটা তত সহজে নয়।

সুচ্যর—কাটা জায়গা সেলাই করার জন্যে ছুঁচ সুতো দিয়ে তৈরি ফোঁড়।

সূতিকার জ্বর (পোস্টপার্টাম ইনফেকশন)—প্রসবের পর মায়ের যে জ্বর বা সংক্রমণ হয়।

সেন্টিগ্রেড (সেঃ)—গরম ঠাণ্ডার মেট্রিক মাপ। সুস্থ লোকের শরীরের স্বাভাবিক তাপ হল ৩৭° সেঃ। জল ০° সেঃ তে জমে যায় আর ১০০° সেঃ তে ফোটে।

সেপটিসিমিয়া—রক্তে সংক্রমণ। একে রক্ত বিষিয়ে যাওয়াও বলে।

সেরিব্রো ভাসকিউলার একসিডেন্ট *(সি ভি এ)*—স্ট্রোক।

সেঁক—শরীরের কোনো অংশের ওপর পাট করা কাপড় বা প্যাড গরম বা ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে লাগানো।

স্টেথোস্কোপ—শরীরের ভেতরের শব্দ, বিশেষ করে হার্টের ধুকধুক শোনার যন্ত্র।

স্টেরাইল—(১) পুরোপুরি পরিষ্কার বা জীবাণুমুক্ত। সাধারণতঃ কোনো জিনিস ফুটিয়ে বা গরম করে সেটাকে স্টেরাইল করা হয়।

স্টেরাইল—(২) ছেলেপিলের জন্ম দেবার ক্ষমতা না থাকা।

স্টেরিলাইজ—(১)ফুটিয়ে বা গরম করে জিনিসপত্র জীবাণুমুক্ত করা।

স্টেরিলাইজ—(২) মেয়ে বা পুরুষকে অপারেশন করে বা ওষুধ দিয়ে বরাবরের মত ছেলেপিলে হওয়া বন্ধ করা।

স্তনের এবসেস—*ম্যাসটাইটিস* দেখুন।

স্নেহজাতীয় খাবার—যে খাবারে শক্তি জড়ো করা থাকে। যেমন চর্বি, ঘি, মাখন, তেল ইত্যাদি।

স্প্যাজম—হঠাৎ কোনো পেশী কুঁচকে যাওয়া, যা সামলানো যায় না। অন্ত্রে স্প্যাজম হলে শূলব্যথা হয়। হাঁপানি হলে ব্রঙ্কাইয়ে স্প্যাজম হয়। ধনুষ্টঙ্কার হলে চোয়ালে আর অন্য পেশীতে স্প্যাজম হয়।

স্প্যাস্টিক—মগজ জখম হওয়ার ফলে পেশী সবসময়ে অস্বাভাবিকভাবে কুঁচকে যাওয়া। স্প্যাস্টিক ছেলেপিলের পা দুটি প্রায়ই কাঁচির মত আড়াআড়ি থাকে।

স্প্রেইন—মচকে যাওয়া। গাঁট মুচড়ে গেলে লিগামেন্ট বা টেনডনে যে কালসিটে বা টান পড়ে বা ছিঁড়ে যায়।

স্যাঙ্কার—লিঙ্গ, আঙুল বা ঠোঁটের ওপর ঘা বা আলসার—এতে ব্যথা হয় না। এটা সিফিলিসের প্রথম দিকের লক্ষণ।

স্রাব—তরল জিনিস, শ্লেষ্মা বা পুঁজ বার হয়ে যাওয়া।

স্বাভাবিক—সাধারণতঃ যা হয়। যাতে কোনো গোলমাল নেই।

স্বাস্থ্য কর্মী—যে পাড়ার সকলের স্বাস্থ্য ভাল করার জন্য কাজ করে।

স্বাস্থ্যের পথে চার্ট—যাতে শিশুর ওজন মাসে মাসে দাগ দিয়ে দেখা যায় শিশু স্বাভাবিকভাবে বাড়ছে কি না।

স্বাস্থ্যবিধি—নিজেকে পরিষ্কার আর সুস্থ রাখার কতকগুলি নিয়ম আর অভ্যাস।

হ

হরমোন—শরীরের নানা অংশে তৈরি বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক জিনিস—এরা বিশেষ বিশেষ কাজ করে। যেমন, ইস্ট্রোজেন আর প্রোজেস্টেরোন মেয়েদের মাসিক আর পোয়াতি হওয়া ঠিক করে।

হাইপারটেনশন—হাই ব্লাড প্রেসার বা উঁচু রক্তের চাপ।

হাইপোকনড্রিয়া—মন গড়া রোগের জন্যে অত্যন্ত দুশ্চিন্তা।

হাত আগে করে জন্মানো—প্রসবের অস্বাভাবিক অবস্থা। এটা জরুরি অবস্থা। এতে ডাক্তারের সাহায্য লাগে।

হার্নিয়া (রাপচার)—পেটের চারপাশের পেশীর কোথাও ফাঁক হয়ে বা ছিঁড়ে নাড়িভুঁড়ির একটা ফাঁস ঠেলে বেরিয়ে চামড়ার নিচে একটা দলা তৈরি করা।

হিস্টিরিয়া—(১)সাধারণভাবে, খুব ঘাবড়ে যাওয়া, ভয় আর মানসিক কষ্টকে হিস্টিরিয়া বলে।

হিস্টিরিয়া—(২)ডাক্তারি ভাষায়, ভয় আর বিশ্বাস থেকে জন্মানো একটা রোগের লক্ষণ।

শেখানোর জন্যে জিনিসপত্র পাওয়ার ঠিকানা

এক্রো, সি-১৭ কমিউনিটি সেন্টার সফদরজঙ্গ ডেভেলপমেন্ট এরিয়া নিউ দিল্লী —১১০ ০১৬	পরামর্শ পাওয়া যায়
বিজনেস ম্যানেজার ফার্ম ইনফরমেশন ইউনিট ডিরেক্টরেট অব একস্‌টেনশন মিনিষ্ট্রি অব এগ্রিকালচার শাস্ত্রী ভবন, নিউ দিল্লী-১ অথবা ডিস্ট্রিক্ট অফিসার	কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন
ক্যারাভাস ১৫, সিভিল লাইন্‌স জব্বলপুর, মধ্যপ্রদেশ	ফিল্ম ষ্ট্রিপস্‌ ও ফিল্ম
কেয়ার তামিলনাড়ু ডি পি আই কম্পাউণ্ড কলেজ রোড মাদ্রাজ —৬০০ ০০৬	পুষ্টি সংক্রান্ত ভিসুয়াল এড্‌
ক্যাথলিক হসপিটালস এসোসিয়েশন অব ইনডিয়া সি বি সি আই সেন্টার, অশোক প্লেস নিউ দিল্লী —১১০ ০০১	
সি এইচ ই বি টেম্পল লেন কোটলা রোড নিউ দিল্লী, অথবা সব থেকে কাছের স্টেট হেল্‌থ এডুকেশন ব্যুরো	ফিল্ম, পুস্তিকা ও ফ্ল্যাশকার্ড
ক্রীশ্চান মেডিকাল কলেজ এণ্ড হসপিটাল ভেলোর ৬৩২ ০০4	প্রাচীরপত্র, ফ্ল্যাশকার্ড, ফ্ল্যানেলগ্রাফ ইংরাজীতে ও স্থানীয় ভাষায়
ক্রীশ্চান মেডিকাল এসোসিয়েশন অব ইনডিয়া ক্রীশ্চান কাউন্সিল লজ নাগপুর —৪৪০ ০০১	
কনসার্ন (সঈদপুর অফিস) হাউস ২৮৩ রোড ২৬ ধানমণ্ডি, ঢাকা-৫ বাংলাদেশ	বাংলায় ভিসুয়াল এড্‌

ডিরেক্টর জেনারেল অব হেল্‌থ সারভিসেস
নির্মান ভবন
নিউ দিল্লী —১১০ ০০১

ডিস্ট্রিক্ট মেডিকাল অফিসার

স্থানীয় ভাষায় পুস্তিকা ও প্রাচীরপত্র

ইমানুয়েল হসপিটাল এসোসিয়েশন
৮০৮/৯২ নেহরু প্লেস
নিউ দিল্লী —১১০ ০১৯

গান্ধীগ্রাম ইনষ্টিটিউট অব রুরাল হেল্‌থ এণ্ড ফ্যামিলি প্ল্যানিং
পোঃ আমবাথুরাই আর. এস.
ডিস্ট্রিক্ট মাদুরাই —৬২৪ ৩০৯
তামিলনাডু

গান্ধী মেমোরিয়াল লেপ্রসী ফাউণ্ডেশন
হিন্দ নগর
ওয়ার্ধা —৪৪২ ১০৩

হিন্দ কুষ্ঠ নিবারণ সঙ্ঘ
১ রেড ক্রশ রোড
নিউ দিল্লী —১১০ ০০১

ইনডিয়ান একাডেমি অব পেডিয়াট্রিকস
কৈলাশ দর্শন, কেনেডি ব্রীজ
বম্বে —৪০০ ০০৭

ইনডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকাল রিসার্চ
আনসারি নগর
নিউ দিল্লী —১১০ ০১৬

ইনডিয়ান রেড ক্রশ
১ রেড ক্রশ রোড
নিউ দিল্লী —১১০ ০০১

প্রাচীরপত্র, ফ্ল্যাশকার্ড, পুস্তিকা।স্থানীয় ভাষায় লেখার জন্য প্রাদেশিক শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে

আই টি ডি জি
পার্নেল হাউস, উইলটন রোড
লণ্ডন এস ডব্লিউ ১, ইংল্যাণ্ড

সাধারণ প্রযুক্তিবিদ্যার উপর পুস্তিকা, প্রযুক্তিবিদ্যার সমস্যার বিষয়ে পরামর্শ দেয়া হয়।

লেপ্রসী হসপিটাল
পি বি ২৪
মুজাফ্‌ফরপুর
বিহার —৮৪২ ০০১

কুষ্ঠ বিষয়ে পুস্তিকা

লিটারেসি হাউস
পোঃ আলমবাগ
লক্ষ্ণৌ —২২৬ ০০৫

মেডিকোফ্রেণ্ডস সার্কেল
২১ নির্মান সোসাইটি
ভাদোদরা —৩৯০ ০০৫

এঁদের ইস্তাহারে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা থাকে

মিশন ট্যাবলেট ইনডাসট্রি
বাঙ্গারাপেট
কর্নাটক —৫৬৩ ১১৪

কমদামে ভি. এইচ. এ. সভ্যদের জন্য বড়ি

ন্যাশনাল এনভায়রনমেণ্টাল ইনজিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট
নেহরু মার্গ
নাগপুর —৪৪০ ০২০

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউট্রিশন
হায়দ্রাবাদ —৫০০ ০০৭

পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অব মেডিকাল রিসার্চ
চণ্ডীগড়
ডিপার্টমেণ্ট অব চাইল্ড হেল্‌থ

শান্তা ভবন কমিউনিটি হেল্‌থ প্রোগ্রাম
বক্স ২৫২
কাঠমাণ্ডু, নেপাল

স্লাইড, ফ্লিপ্ চার্ট
ভি. এইচ. এ. আই. মারফৎ পাওয়া যায়

এস এল আর লেপ্রোসেরিয়া
কারিগিরি
তামিলনাডু —৬৩২ ১০৬

কুষ্ঠ বিষয়ক পুস্তিকা

এস কে আই পি
৭২, ব্রিগেড রোড
বাঙ্গালোর —৫৬০ ০২৫

হাসপাতালের কর্মীদের জন্য পেশাগত প্রশিক্ষণ সম্বন্ধে খবরাখবর

স্টেট হেল্‌থ এডুকেশন ব্যুরো

স্থানীয় ভাষায় পুস্তিকা ও প্রাচীরপত্র বিনামূল্যে পাওয়া যায়

স্টেট ভল্যাণ্টারি হেল্‌থ এসোসিয়েশন

ষ্টেট ভি. এইচ. এ. প্রমোশনাল সেক্রেটারী স্থানীয় সঙ্গতি বিষয়ে খবরাখবর দিতে পারেন। বারটি রাজ্যে এরূপ কর্মী আছেন।

টাটা ম্যাকগ্র হিল ইনটারন্যাশনাল
বুকস কোম্পানি
২১২/৪ আসফ আলী রোড
নিউ দিল্লী —১১০ ০০১

ম্যানেজমেণ্ট বই।

টীচিং এড্‌স এট লো কস্ট (ট্যাল্‌ক্‌)
ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেল্‌থ
৩০ গিলফোর্ড স্ট্রীট
লণ্ডন ডাব্লিউ সি ১ এন ১ ঈ এইচ

স্লাইড সেট্‌, ওজন চার্ট, ওজন চার্টের জন্য এড (ফ্ল্যানেলগ্রাফ ইত্যাদি), বিনামূল্যে ইংরাজীতে পুস্তিকা। বেশীর ভাগ ট্যাল্‌ক্‌ দ্রব্যাদি ভি. এইচ. আই এর মাধ্যমে পাওয়া যায়।

দি লেপ্রসী মিশন
কেয়ার অব ফিলাডেলফিয়া লেপ্রসী
হসপিটাল সালুর

টিউবারকিউলোসিস এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া
৩নং রেডক্রস্‌ রোড, নিউ দিল্লী ১১০ ০০১
ও রাজ্য শাখাগুলি

ভি· এইচ· এ· আই
৪০, ইনস্টিটুসানাল এরিয়া
সাউথ অফ আই· আই· টি·
নিউ দিল্লী—১১০ ০১৬

ফ্ল্যানেল গ্রাফ, বই, ফ্লিপ চার্ট ইত্যাদি তালিকা পাওয়া যায়।
ইংরাজী ও স্থানীয় ভাষায় লেখা।
ম্যানেজমেণ্ট ট্রেনিং (হাসপাতাল)

ভিটা (ভি. আই. টি. এ)
৩৭০৬ রোঢ আইল্যাণ্ড এভিনিউ
মাউণ্ট রেনিয়ার
মেরিল্যাণ্ড ২০৮২২
ইউ. এস. এ

ওয়ার্ল্ড হেল্‌থ অর্গানাইজেসান্‌
ইন্দ্রপ্রস্থ এষ্টেট্‌
রিং রোড
নিউ দিল্লী —১১০ ০০২

ওয়ার্ল্ড নেবার্স
৫১১৬ নর্থ পোর্টল্যাণ্ড এভিনিউ
ওক্‌লাহোমা সিটি
ওক্‌লাহোমা —৭৩১১২

ফিল্ম ষ্ট্রিপ, ম্যানুয়াল,
ফ্লিপ চার্ট ইংরাজী ও হিন্দীতে।
ভি. এইচ. এ. আইয়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষে পাওয়া যায়।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলাণ্টারি হেলথ্ অ্যাসোসিয়েশন-এ যে সকল পুস্তিকা পাওয়া যায় তার কয়েকটি



অনুক্রমণী

ছ

জ

ট

ঠ

ড

ত

থ

দ

ভ

হ

যারা পড়তে জানে না তাদের ওষুধ দেবার জন্যে মাত্রার জন্যে ফাঁকা জায়গা দেয়া কার্ড

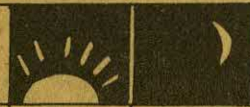


নাম :

ওষুধ :

রোগ :

মাত্রা :

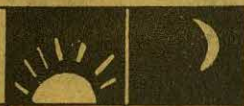


নাম :

ওষুধ :

রোগ :

মাত্রা :



নাম :

ওষুধ :

রোগ :

মাত্রা :



নাম :

ওষুধ :

রোগ :

মাত্রা :

দরকার মতো কেটে নিন।



নাম :

ওষুধ :

রোগ :

মাত্রা :



নাম :

ওষুধ :

রোগ :

মাত্রা :



নাম :

ওষুধ :

রোগ :

মাত্রা :



নাম :

ওষুধ :

রোগ :

মাত্রা :


স্বাস্থ্য আমার অধিকার

কয়েকটি জরুরি চিহ্ন সম্পর্কে তথ্য

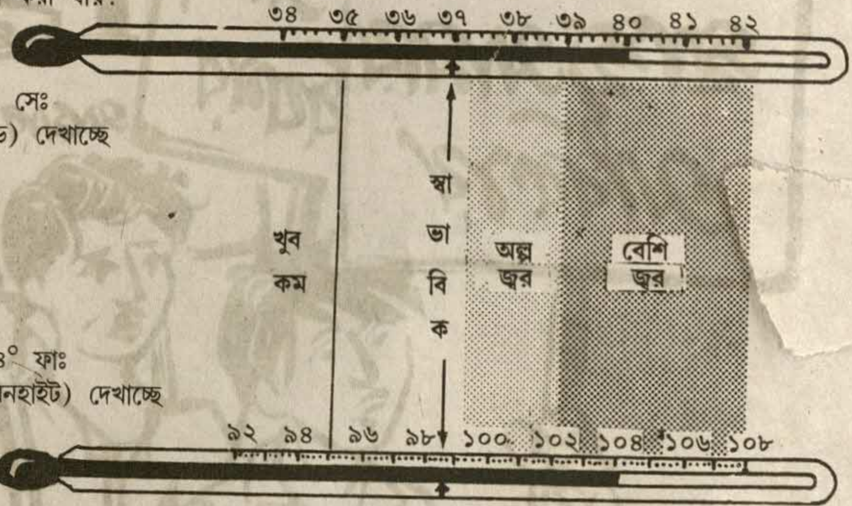
টেমপারেচার (তাপ)

দুরকম মাত্রা দেয়া থারমোমিটার পাওয়া যায়। সেন্টিগ্রেড (সেঃ) আর ফারেনহাইট (ফাঃ)। কারো টেমপারেচার মাপতে যে কোনো একটা ব্যবহার করা চলে।

এইভাবে দুটিকে তুলনা করা যায়:

সেন্টিগ্রেড

এই থারমোমিটার ৪০° সেঃ
(চল্লিশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) দেখাচ্ছে



ফারেনহাইট

এই থারমোমিটারে ১০৪° ফাঃ
(একশ চার ডিগ্রী ফারেনহাইট) দেখাচ্ছে

নাড়ি বা হার্টের ধুক্‌ধুক্

বিশ্রামের অবস্থায় লোকের
- বড়দের..... মিনিটে ৬০—৮০ বার ধুক্‌ধুক্ হল স্বাভাবিক
- ছেলেপিলেদের...... মিনিটে ৮০—১০০ বার ধুক্‌ধুক্ হল স্বাভাবিক
- শিশুদের...... মিনিটে ১০০—১৪০ বার ধুক্‌ধুক্ হল স্বাভাবিক

সাধারণতঃ প্রত্যেক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (সেঃ) জ্বরের সঙ্গে হার্টের ধুক্‌ধুক্ মিনিটে ২০ বার করে বাড়ে।

শ্বাস

বিশ্রামের অবস্থায় লোকের
- বড়দের আর বড় ছেলেপিলেদের.....মিনিটে ১২—২০ বার হল স্বাভাবিক
- ছেলেপিলেদের.....মিনিটে ৩০ বার পর্যন্ত হল স্বাভাবিক
- শিশুদের.....মিনিটে ৪০ বার পর্যন্ত হল স্বাভাবিক

মিনিটে ৪০ বারের বেশি হালকা শ্বাস হলে সাধারণতঃ নিউমোনিয়া বোঝায় (পৃঃ ২০৯ দেখুন)।

ব্লাড প্রেশার (রক্তচাপ)

(যে সব স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে ব্লাডপ্রেসার মাপার যন্ত্র আছে, তাদের জন্যে এটা দেয়া হচ্ছে।)

বিশ্রামের অবস্থায় লোকের — ১২০/৮০ হল স্বাভাবিক; কিন্তু এর অনেক বেশি/কম হয়।

শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পর, দ্বিতীয় বার পড়ার সময় যদি ১০০ এর বেশি দেখা যায়, সেটা উঁচু রক্তচাপের বিপজ্জনক লক্ষণ (পৃঃ ১৪৭ দেখুন)।

রোগীর রিপোর্ট

ডাক্তারি সাহায্য চাইতে যাওয়ার সময় ব্যবহার করার জন্যে :

রোগীর নাম ———————————————————— বয়স———

ছেলে———মেয়ে———সে কোথায় রয়েছে ? ————————————————

ঠিক এখন প্রধান রোগ বা অসুবিধেটা কি ? ————————————————

————————————————————————————

————————————————————————————

এটা **কখন** শুরু হয়েছিল ? ————————————————————

এটা কিভাবে শুরু হয়েছিল ? ————————————————————

এই সমস্যা রোগীর আগে কখনো হয়েছিল কি ?———কখন ? ————————————

জ্বর আছে কি ?———কতটা ?———জ্বর কখন আসছে আর কতক্ষণ ধরে থাকছে ? ——————

যন্ত্রণা ?———কোথায় ?———কি ধরনের ? ————————————————

নিচের যে কোনোটির ব্যাপারে গোলমেলে বা অস্বাভাবিক কিছু আছে কি ?

চামড়া :———————————কান : ——————————————

চোখ :———————————**মুখ ও গলা :** ——————————————

জননেন্দ্রিয় : ————————————————————————

পেচ্ছাপ : বেশি না কম ?———রং ?———করতে কষ্ট ? ————————————

বিবরণ দিন :———————২৪ ঘণ্টায় কবার ?———রাত্রে কবার ? ————————

মল : রং ?———রক্ত বা আম ?———পাৎলা পায়খানা ? ————————————

অল্পস্বল্প না সাংঘাতিক ?———কৃমি ?———কি ধরনের ? ————————————

শ্বাস : মিনিটে কবার ?———গভীর, হালকা না স্বাভাবিক ? ————————————

শ্বাস কষ্ট (বিবরণ দিন) :———————কাশি (বিবরণ দিন) : ————————

——————— সাঁই সাঁই করছে ?———শ্লেষ্মা আছে ?———তাতে রক্ত আছে ?———

পৃঃ ৪২-এ **বিপজ্জনক রোগের লক্ষণের যে তালিকা দেয়া হয়েছে তার মধ্যে কোনোটি রোগীর আছে কি ?** ———

কোনটি ? (বিশদ বিবরণ দিন) ————————————————————

————————————————————————————

অন্যান্য লক্ষণ : ————————————————————————

রোগী ওষুধ ব্যবহার করছে কি ?———কি ওষুধ ? ————————————————

রোগী কি এর আগে এমন কোনো ওষুধ ব্যবহার করেছিল, যার ফলে তার চুলকুনিযুক্ত চাক, ডেলা বা আমবাত বেরিয়েছিল, অথবা অন্য কোনো এলার্জির প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ?———কি ওষুধ ————————

রোগীর অবস্থা : বিশেষ গুরুতর নয়———গুরুতর——— খুব গুরুতর ————————

অন্য যা কিছু তথ্য আপনার জরুরি বলে মনে হবে, সেগুলি এই কাগজের পেছন দিকে লিখে দেবেন।

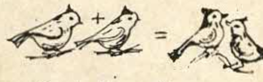
সংক্ষিপ্তকরণ (লম্বা বা বড় শব্দ ছোট করে লেখা ; কয়েকটা অক্ষরে পুরো কথাটা বোঝায়।)

পৃঃ = বইয়ের পৃষ্ঠা



+ মানে **এবং** বা **যুক্ত**

= মানে **একই** বা **সমান**



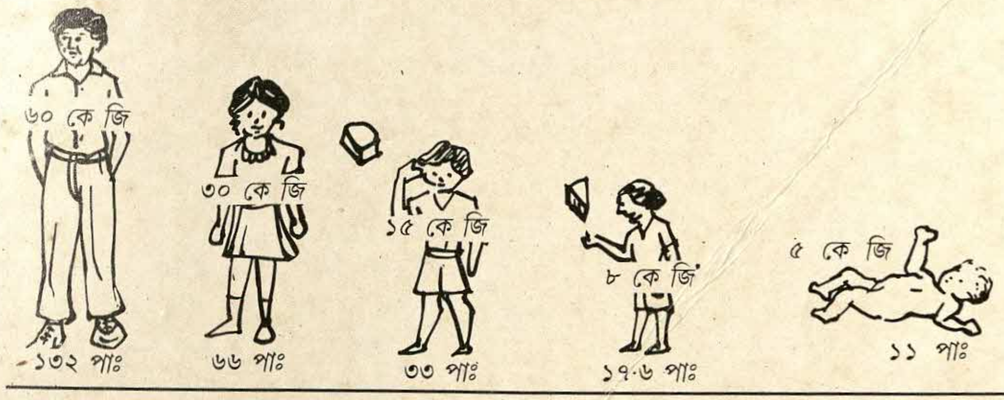
১ + ১ = ২

% = শতকরা

ওজন (একটা জিনিস কত ভারী)

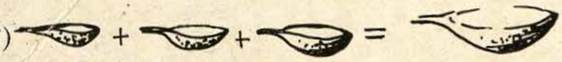


১ পাউণ্ড = ৪৫৪ গ্রাম (গ্রাঃ)
১০০০ গ্রাম = ১ কিলোগ্রাম (কিলো কে জি)
১ গ্রাম = ১০০০ মিঃ গ্রাঃ

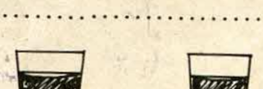


আয়তন (একটা জিনিস কতটা জায়গা নেয় ; তরল জিনিস ওজন করার জন্যে)

১০০০ মিলিলিটার (মিঃ লিঃ) = ১ লিটার
১ মিলিলিটার = ১ কিউবিক সেন্টিমিটার (সি সি)



৩ চা চামচ = ১ বড় চামচ .... ৩ চামচ = ১ বড় চামচ
১ চা চামচ = ৫ মিলিলিটার
১ বড় চামচ = ১৫ মিলিলিটার
৩০ মিলিলিটার = প্রায় ১ আউন্স (জল).... ৩০ মিঃ লিঃ হল প্রায় এক আউন্স



যেখানে ডাক্তার নেই

শুধু প্রাথমিক প্রতিবিধানের বই নয়। এর মধ্যে এমন অনেক জিনিস আছে যার সঙ্গে গ্রামবাসীর স্বাস্থ্যের সম্পর্ক আছে : পাৎলা পায়খানা থেকে শুরু করে যক্ষ্মা পর্যন্ত ; উপকারি আর ক্ষতিকর ঘরোয়া ওষুধ থেকে শুরু করে কিছু আধুনিক ওষুধ সাবধানে ব্যবহার করা পর্যন্ত। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া আর টিকের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। প্রসব আর পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধেও খুঁটিয়ে বলা হয়েছে। লোকে নিজের জন্যে কি কি করতে পারে, তা বুঝতে, আর কোন্ কোন্ সমস্যায় অভিজ্ঞ স্বাস্থ্যকর্মীর সাহায্য দরকার তা চিনতেও এ বইটি সাহায্য করে।



এই বইটি এদের জন্যে :

যে গ্রামবাসী স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে দূরে থাকে। অনেক সাধারণ রোগ এড়াতে, চিনতে আর সেগুলির চিকিৎসা করতে সে কি কি করতে পারে তা সহজ কথায় আর ছবিতে বোঝানো হয়েছে।

গ্রামের স্কুলের **শিক্ষক বা শিক্ষিকা**। অসুস্থ আর আহত লোককে দরকারি পরামর্শ দিতে, তাদের দেখাশোনা করতে এ বইটি সাহায্য করবে। তাছাড়া, এ বইয়ে তিনি তাঁর আশেপাশের ছেলেপিলেদের—বড়দেরও—স্বাস্থ্য, পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা আর পুষ্টির সমস্যাগুলি সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার জন্যে নানা নির্দেশ পাবেন।



গ্রামের সব ধরনের **নেতারা** সমাজকর্মীরা, উন্নয়ন কর্মীরা, যে সব লোক সব কাজকর্মে উৎসাহ আর প্রেরণা দেয় তারা—অথবা নিজের সমাজের স্বাস্থ্য আর সুস্থ থাকা নিয়ে ভাবে, এমন যে কেউ।



এই সংস্করণে গ্রাম স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্যে একটি ভূমিকা দেয়া হয়েছে; তাতে সমাজের সকলের প্রয়োজন বুঝবার, পরস্পরের জ্ঞান ভাগ করে নেবার আর স্বাস্থ্যের উন্নতির কাজে সকলের হাত লাগাবার উপায়গুলি আলোচনা করা হয়েছে।

মায়েরা আর ধাইরাও বাড়িতে প্রসব হওয়া, মায়ের যত্ন আর শিশুর স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে পরিষ্কার আর সহজে বোঝা যায় এমন সব তথ্য পাবেন।